শিকলনামা

ভগীরথ মিশ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
—মাঘ, ১৩৭২

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

শিকলনামা

কুমড়ো লতার মিথ্যে ফুল

রাত খুব গভীর হলে পর মা এল ঘরে।

চারপাশ একেবারে শুনশান হয়ে গেলে, টুপটাপ পাতা ঝরার শব্দ পাওয়া যায় পৃথিবী অতখানি নিঃশব্দ হলে পর, এল মা। এল, কিন্তু ঢুকল না ঘরের মধ্যে। আমি জানতাম, মা ঢুকবে না।

অগোছালো বিছানায় আধশোয়া বসেছিলাম আমি, বাঁ হাতে জ্বলছিল সিগারেট, বিছানার গা ঘেঁসে ছোট্ট টিপয়ের ওপর আধাআধি হুইস্কির বোতল, ডান হাতে ধরে থাকা গ্লাসেও আধাআধি, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভারী হয়ে গিয়েছে ঘরের বাতাস, এমন একটি চরিত্রহীন ঘরের মধ্যে কী করেই বা ঢোকে মা! চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এবং আমি দেখতে পেলাম, মায়ের দু'চোখের কোণে আমার চিরকালের চেনা টলোমলো পিচুটি।

রোজই এমনি সময়ে আসে মা। মদ খেয়ে বেহেড অবস্থায় আচমকা মা এসে পড়লে, রোজদিনই আমি লজ্জিত, বিব্রত হয়ে পড়ি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যেদিন, মা এসে পড়বে এই আশঙ্কায় আমি মদ থেকে সরিয়ে রাখি নিজেকে, মা কিন্তু কিছুতেই আসে না সেদিন। আমি অনেক অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করে থাকি, কিন্তু আসে না সে। আসলে, ওই দিনগুলোতে, বাইরের এবং ভেতরের কলরবগুলো শান্ত হয় না যে। কিছুতেই শুনশান হয় না যে রাতের পৃথিবী। অথচ, চারপাশের পৃথিবী একেবারে ঝরা পাতার শব্দ শোনার মতো নিস্তব্ধ না হলে কিছুতেই আসবে না মা। এটা তার চিরকালের অভ্যেস।

সেই বাচ্চা বয়েসেও দেখেছি, সন্ধেয়-সন্ধেয় রাতের খাবার খাইয়ে দিয়ে বড়পিসি কিংবা ন'কাকিমা আমাকে শুইয়ে দিল বিছানায়, মশারি টাঙিয়ে চারপাশ পরিপাটি করে গুঁজে দিল, হ্যারিকেনের বাতি আধাআধি নিভিয়ে বসিয়ে দিল ঘরের এককোণে, আমার সারা মন তখন মায়ের কোলের জন্য উন্মুখ, কিন্তু কিছুতেই আসত না মা। বাইরের ঘরে, সদরের বারান্দায় তখন আড্ডা দিচ্ছে, গাঁয়ের গণ্যমান্যদের সঙ্গে, জেঠু। বন্ধুদের জুটিয়ে নিয়ে তাস খেলছে সেজকাকা আর ন'কাকা। সশব্দে তুরুপ মারছে তাস। ঝগড়া করছে পিট ভাগাভাগি নিয়ে। মোহরদি নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে রেডিয়োতে অনুরোধের আসরের গান শুনছে। রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ তুলে রাঁধছে জেঠিমা কাকিমা'রা। আর, এতসব কোলাহলের মধ্যে মা যে কোথায় রয়েছে, কে জানে!

মা আসত অনেক অনেক পরে। গণ্যমান্যরা বিদায় নিতেন, কাকাদের তাসের বন্ধুরা চলে যেত, জেঠু-কাকুরা রাতের খাওয়া সারত, জেঠিমা-কাকিমাদের খাওয়ার পর্ব চুকত, সব দরজা জানালায় সশব্দে খিল-ছিটকিনি পড়ত, বাবা এসে ঢুকতেন মশারির ভেতরে, ধীরে ধীরে শুনশান হয়ে আসত সারা বাড়ি, মা আসত তারও ঢের পরে, এবং আধো-অন্ধকার বিছানার মধ্যে ঢুকে আমার পাশটিতে শরীরটা এলিয়ে দিতে দিতে সহসা আবিষ্কার করত, আমি তখনও জেগে রয়েছি। ঢলঢলে মুখখানি আমার মুখের একেবারে কাছটিতে ঝুঁকিয়ে দিয়ে খুব চাপা গলায় বলত, ঘুমোসনি?

আমি জবাব দিতাম না। তখন আমার বুকের মধ্যে কুয়াশার মতো অভিমান। এতক্ষণে আমার কাছে আসার সময় হল তোমার! মায়ের মন তো, ঠিক ছুঁয়ে ফেলত আমার অভিমানটাকে। আমাকে একেবারে

বুকের মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে চোখ বুজত, কিন্তু কোলের মধ্যে ঠাসবন্দী আমি নিশ্চিতভাবে টের পেতাম, অনেকক্ষণ অবধি নিঃশব্দে জেগে থাকত মা। বরং আমিই কখন জানি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতাম। এবং তলিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে যেতাম, সকালবেলায়, ঘুম যখন ভাঙবে, চোখ না খুলেই আমি বুঝে ফেলব, মা নেই কাছে।

মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় আমরা বড়পিসির চারপাশে বৃত্তাকারে বসতাম। আমি, মোহরদি, টুপাই...। বড়পিসি আমাদের গল্প বলত। রূপকথার পরীর গল্প। রাতের বেলায়, দিনের প্রাণীরা সব ঘুমুলে পর, আকাশে চাঁদ উঠলে, রুপোলি জ্যোৎস্নায় পাখনা ভাসিয়ে আকাশ থেকে পরীরা নেমে আসে রোজ। তারা দিঘির জলে স্নান করে, সদর উঠোনে খেলা করে, নাচে, গান গায়..., রাত পোহানোর আগেই বাগানের সব ক'টি কুঁড়িকে মাখনের মতো নরম আঙুল দিয়ে ছোঁয়, আর তাতে করেই কুঁড়িগুলোর আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙে, পাপড়ির পর্দাগুলো সরিয়ে মুখ দেখায় ওরা, অবাক বিস্ময়ে ভোরের পৃথিবীকে দেখতে থাকে।

বড়পিসির মুখে রোজ রোজ পরীর গল্প শুনতে শুনতে আমরা মাঝে মাঝে বায়না ধরি, পরীকে দেখব, পিসি।

বড়পিসি হাসে। কী করিয়া দেখবি? সে যে অনেক রাত! তোরা তখন ঘুমোস।

—পরীরা কেন দিনের বেলায় আসে না?

—বারে! তাই আবার আসে? দিনের আলোয়, রোদ্দুরে, ওদের মোমের শরীর গলিয়া যাবেনি?

—তাহলে রাতের বেলাতেই দেখব ওদের।

—তাই বা কেমন করিয়া হয়? ওরা আসে অনেক রাতে। তখন তো তোরা ঘুমিয়া কাদা।

আমি বলতে গিয়েও থেমে যাই যে, আমি ঘুমোই নে। মা না আসা অবধি আমি জেগেই থাকি।

রোজ রোজ, প্রতি রাতে, এইভাবে, আকাশ থেকে পরীর দল এসে বাগানের সবকটি কুঁড়িকে আঙুলের মায়াবি ছোঁয়ায় ফুটিয়ে দিয়েই উড়ে যায়,—এমনতরো গল্প বড়পিসির মুখে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আমার। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙলে চোখ বোজা অবস্থায় যখন টের পেতাম, মা কখন জানি নিঃশব্দে চলে গেছে, রাতের পরী (মাকে তো ছেলেবেলায় তেমনই মনে হত আমার) গলে যাবার ভয়েই হয়ত বা হাবিয়ে গিয়েছে দিনের আলো ফোটার আগেই, তখন বুকের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি জমত অভিমানের কুয়াশা, কি না, যাওয়ার আগে আমার চোখ নামক ফুলদুটিকে আঙুলের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে দিয়ে গেল না কেন মা? তারপর, সারাদিন মাকে অস্থির চোখে অবিরাম খুঁজতাম আমি, কিন্তু দিনের বেলায় কদাচিত দেখা পেতাম তার, কোথায় যেন হারিয়ে যেত, লুকিয়ে থাকত মা, আসত, গভীর রাতে, পরীর মতো।

আজও তাই আসে মা, গভীর রাতে, আমার শুনশান নিস্তব্ধ পৃথিবীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। আজও এল। এবং আমি দেখতে পেলাম, মায়ের দু'চোখের কোণে জমে ওঠা পিচুটি আজ বড়ই টলোমলো।

ছেলেবেলায়, তখন আমার জ্ঞানবুদ্ধি নেহাতই কম, মাঝে মাঝে বলে উঠতাম, মা, তোমার চোখের কোণে পিচুটি।

—কই, কোথায়? মা ত্রস্ত হাতে আঁচল টেনে নিয়ে চোখের কোণাদুটো ঘসত, আঁচলের খুঁটটা বারবার পরীক্ষা করত, কই, কোথায়?

মায়ের আঁচলে কিছুই উঠে আসত না, আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেতাম মায়ের চোখের কোণ জুড়ে জমাট পিচুটির তাল। শুধু পিচুটিই নয়, মায়ের ফরসা গালে একজোড়া অস্পষ্ট জলের ধারাও দেখতে পেতাম আমি। কখন জানি বইতে বইতে শুকিয়ে গিয়েছে জলের ধারাদুটি।

মাঝে মাঝে বলে উঠতাম, মা, তুমি কাঁদছিলে?

—না। কেন? সহসা চমকে উঠত মা।

—তোমার দু'গালে জলের ধারা, শুকিয়ে গিয়েছে।

—কই, কোথায়? মা ত্রস্ত হাতে তুলে নিত শাড়ির আঁচল, খুব দ্রুত হাতে মুছে ফেলতে চাইত গাল, কই, কোথায়?

কখনও বা আমি খুব কাছটিতে গিয়ে পরখ করতাম মায়ের গালদুটো, কচি আঙুল দিয়ে ঘসতাম, বাস্তবিক কোনো শুকিয়ে যাওয়া জলের ধারা দেখতে পেতাম না সেখানে, কিন্তু তবুও কেন জানি হঠাৎ হঠাৎ মায়ের মুখে নজর পড়লেই মনে হত, ফরসা গালদুটি চিরে বইতে বইতে শুকিয়ে গিয়েছে, প্রাচীন নদীর খাতের মতো, অতি অস্পষ্ট এক জোড়া জলের ধারা।

আমার বাবারা ছিল পাঁচ ভাই, দু' বোন। বড়পিসি ছিল ভাই-বোনদের সবার বড়। নাম তার সুহাসিনী। খুব অল্প বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী মরেছিল বছরটাক বাদে। সেই থেকে বড়পিসি ভাইদের সংসারে, একেবারে গার্জিয়ানের ভূমিকায়। সে-ই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল জেঠুর, এবং দু' কাকার। আমার বাবা ছিল মেজো। বড়পিসির ইচ্ছে ছিল তার গঙ্গাজলের বোনের সঙ্গে বিয়ে দেয় বাবার। ঠাকুমা তখনও অবধি বেঁচে ছিল। বড়পিসির গঙ্গাজলের কুৎসিৎ বোনটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। দেখে শুনে মাকেই ঘরে আনে ঠাকুমা। ওই একটি ক্ষেত্রে বড়পিসির কথা খাটেনি আমাদের সংসারে।

আর, ছোটপিসি, নাম তার বিলাসিনী, ন' কাকার পরের বোন সে, হাবিয়ে গিয়েছে সেই আমাদের ছেলেবেলায়, হারিয়ে গিয়েছে সকলের স্মৃতি থেকে, কেবল ঠাকুমা যদ্দিন বেঁচে ছিল, প্রবীণ পড়শিদের মুখে শুনেছি, চোখের আড়াল হলেই বুক ভাসাত চোখের জলে।

যেদিন প্রথম স্বামীর ঘরে এসেছিল মা, সারা বাড়িটা নাকি খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে ছিল মা। টাকাকড়ি সোনাদানা, বাসনকোসন, প্রায় কিছুই আনেনি বাপের বাড়ি থেকে। শুধু একটা বস্তু এনেছিল, অনেক রাজরাজেশ্বরীর কাছেও থাকে না তা, সেটা হল তার শরীর জুড়ে অতুল রূপ! চাঁপাকলার মতো গায়ের রঙ ছিল মায়ের, ঢলঢলে পানপাতার তুল্য মুখখানি, আর, কোমর অবধি কালো চুলের রাশ! গোবরের মধ্যে পদ্মফুলটি ফুটে ছিল অনাদরে, ঠাকুমা খুঁজেপেতে তুলে এনে পরিয়ে দিলে বাবার গলায়।

মাকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে পড়শিরা, ধন্য ধন্য রব ওঠে চতুর্দিকে।

বাবা ছিলেন সে তুলনায় নিতান্তই সাধারণ। খুবই আলাভোলা মানুষ ছিলেন তিনি, বৈষয়িক নয় একতিল, সবাই তাকে একটু বোকাসোকা মানুষ বলেই ভাবত। মাকে দেখা মাত্তর সবাই তাই আড়ালে মন্তব্য করে, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!

সংসারের কোনো কাজেই কখনও তেমনভাবে আসেননি বাবা। চাষবাস, দাদন-কর্জ, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, সব কিছুতেই তিনি ছিলেন নিতান্তই আনাড়ি। সামান্য কবিরাজি করতেন। নিজের শোবার ঘরের তাকে, শিশিতে-বয়ামে যত্ন করে ভরে রাখতেন সৈন্ধব লবণ, বচ, শুঁট, পিপুল, সেঁকো বিষ, মধু, ইন্দ্রযব, অশ্বগন্ধা, শিলাজুত...আরও অনেক কিছু। রোগী আসত সামান্যই। হাত উপুড় করত না কেউ। তাও বাবা ওদের জন্য যত্ন করে ওষুধ বানাতেন। দিনভর হামানদিস্তায় কত কিছু ছেঁচতেন, খল-নুড়িতে কতকিছু মণ্ড বানাতেন। ওইসব করেই কেটে যেত তাঁর সময়, যদিও তাঁর ওইসব যাবতীয় কাজকে নিতান্ত অকাজ বলেই মনে করত বাড়ির সবাই।

যেদিন প্রথম আমাদের ঘরে এল মা, তার পরপরই হপ্তাখানেকের মধ্যে গোটা তিন-চার অলুক্ষণে ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎই একদিন আমাদের সদর পুকুরের ঠাস বোঝাই মাছ একে একে ভেসে উঠল জলে। সারা পুকুরের জল জুড়ে যেন রাশিরাশি গন্ধরাজ ফুল ভাসছে। দিনদুয়েক বাদে আমাদের সদর উঠোনের প্রাচীন নিমগাছটা ডগা থেকে শুকোতে শুরু করল। আর, সপ্তম দিনে, তখনও অষ্টমঙ্গলা পেরোয়নি, আচমকা বুড়ি ঠাকুমা বিনা নোটিশেই চলে গেলেন ওপারে। পরপর তিনটি দুর্ঘটনায় যখন সারা বাড়ির বয়স্ক মুখগুলি শ্রাবণের আকাশের মতো থমথমে, ঠিক তখনই বড়পিসি একেবারে বিধাতার মতো রায় দিল, নতুন বউটিই অলুক্ষণে, অপয়া।

অকস্মাৎ যেন হুঁশ হল সবাইয়ের। সংসারের হারিয়ে যাওয়া অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীটিকে প্রতিটি ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে আচমকা ওটা নজরে পড়ে গেলে যেমনটি হয় মানুষের, সহসা তেমনই

এক আবিষ্কারের দৃষ্টিতে সবাই ফিরে তাকাল মায়ের দিকে। এবং জেঠিমাসহ পাড়ার প্রবীণাদের কারুর কারুর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল মায়ের উঁচু কপাল, নিচের পাটিতে বিজোড় দাঁত, দু'পায়ের মধ্যমা আঙুল দুটি বেখাপ্পা লম্বা জাতীয় এমন কিছু লক্ষণ, যা শুনে অন্যদের মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে, ফুটে থাকা পদ্ম ফুলটির ভেতরে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে এমনই এক মৃত্যুকীট, যার মৃদু দংশনেও নীল হয়ে যেতে পারে মানুষ।

আচমকা মায়ের নতুন বেনারসীতে লেগে গেল এমনই এক আঁশটে গন্ধ, গন্ধটা এমনই তীব্র, বিকট হয়ে ধাক্কা মারতে লাগল চারপাশের মানুষজনের নাকে, আর তাই দেখে মা এমনই অপ্রস্তুত, বিব্রত, লজ্জিত ও বিপন্ন হয়ে পড়ল যে, সে বুঝি সবাইয়ের থেকে তফাতে সরে থাকতে পারলে বেঁচে যায়।

চারপাশের সমস্ত মানুষের মধ্যে গা মিশিয়ে বসবাস করেও একটা মানুষ কেমন করে অপয়া হয়ে যায়, তার সবদিক থেকে স্বাভাবিক শরীরের মধ্যে এমন কী বাড়তি উপাদান থাকে, যার ফলে তার মুখের দিকে তাকালেই কিংবা সে অন্যজনের দিকে তাকালেই মানুষটির যাত্রা পণ্ড হয়ে যায়, সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়, সে হাত দিয়ে কোনো গাছকে ছুঁলে সেই গাছে কেনই বা আর ফল ধরবে না, সেই ছেলেবেলা থেকেই এসব আমার কাছে এক চরম বিস্ময়। তার কপালটা সামান্য উঁচু হলে, নিচের দাঁতের পাটিতে একটা বিজোড় দাঁত থাকলে, কিংবা পায়ের একটা আঙুল একটুখানি বড় হলে কেমন করে সেই মানুষটির মধ্যে অন্যের ক্ষতি করবার ক্ষমতা জন্ম নেয়, কেমন করে তার দু'চোখের নজরে জমে থাকে বিষ, এ আমার কাছে চিরকালই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। পিসিমা, জেঠিমারা কিংবা পাড়ার প্রবীণারাও এসব রহস্য ভেদ করতে অক্ষম। এসবের জবাব জানা নেই তাদেরও। আর, জানা নেই বলেই অপয়া মানুষটি চারপাশের মানুষজনের চোখে এমনই রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে এবং সেই রহস্যময়তা সাধারণ মানুষের মনে এমনই এক অচেনা ভয়ের জন্ম দেয় যে, তার মুখের দিকে তাকালেই, তার চোখে চোখ রাখা মাত্রই, এক ধরনের শিরশিরানি অস্বস্তি জাগে বুকে। অপয়াপনা, এমনই বিমূর্ত তার উপস্থিতি, এমন হাওয়ার মতো অশরীরী, অলীক, ভাবতে গেলেই গা ছমছম করে। নিদারুণ ভয়ে শিউরে ওঠে মানুষ। বাঘ-ভাল্লুক, বিষধর সাপ, কিংবা দত্যিদানার চেয়েও মানুষ বেশি ভয় পায় অপয়া মানুষটিকে। কেন কি, ওরা তো বাহ্যত, দৃশ্যত ভয়ঙ্করই, কিন্তু, একটা জলজ্যান্ত মানুষ, আর পাঁচজনের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া, বাহ্যত কোনো তফাৎ নেই অন্যদের সঙ্গে, বরং আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে, বুদ্ধি-বিচক্ষণতায়, স্নেহ-মমতায় অনেকের চেয়ে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, অথচ তার মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে মানুষের ক্ষতি করে দেবার মতো এক অলীক ক্ষমতা যাতে করে তার মুখ দেখে কাজে বেরোলে সে কাজ পণ্ড হবেই, শুকনো বিপদ আচমকা ধেয়ে আসবে, শুকনো ডাঙায় এক গলা জল! সে নজর ফেলা মাত্তর দুধেল গাইয়ের বাঁট যাবে শুকিয়ে, ছুঁয়ে ফেলা মাত্তর জালি-সুদ্ধু সবজির গাছটি মরে যাবে, কোনো শুভকাজে সে উপস্থিত থাকলে বিঘ্ন ঘটবেই তাতে!

মায়ের মধ্যে কোনোদিন কোনো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেনি কেউ। বরং অনেকের চেয়ে স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক ছিল সে। মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্যে তার তুলনা ছিল না। আর, সেটাই ছিল পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণাদের কাছে বেশি সন্দেহজনক, কিনা, গভীর দিঘির আপাতশান্ত টলটলে জলের তলাতেই সর্বনাশ ওৎ পেতে থাকে। থির-মৌনী পাথর কাটে, অর্থাৎ কিনা ক্ষীণকায়া ঝরনার আপাত নিরিহ তিরতিরে জলের ধারাই কালক্রমে কেটে কেটে ক্ষইয়ে ফেলে তলার শক্ত পাথর। কাজেই, আমার মায়ের শরীরে ও আচরণে শ্রীছাঁদ আর স্বাভাবিকতার বাহুল্যই তাকে বেশি সন্দেহজনক করে তোলে অন্যদের কাছে। এবং সেই কারণেই চারপাশের সকলের চোখে আজীবনকাল হীন, ব্রাত্য, সর্বনাশী হয়ে রইল সে।

মা যখন ঘরে এল, আমি তো তখন জন্মাইনি, কাজেই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিনি সেই অন্তঃসলিলা প্রক্রিয়াটিকে যাতে করে মা তিলতিল অপয়া হয়ে গেল সকলের চোখে, ভীতিকর হয়ে উঠল, তবে বড় হতে হতে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ করেছি, কেমন করে মা'টি আমার একটা লজ্জাকর অপমানের বোঝা মাথায় বয়ে বয়ে বেড়াত, কেমন করে ওই বোঝাটির ভারে সারাক্ষণ হেঁট হয়ে থাকত সে, একটু একটু করে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল। কেমন করে কেউ শুভকাজে বেরোবার মুহূর্তে মা আপনা থেকেই সরে যেত

আড়ালে। পুজোআচ্চায় উৎসবে-পার্বণে, কেমন জড়সড় হয়ে সর্বদা খরগোসের মতো লুকিয়ে রাখত নিজেকে। সবজির খেতে জল দেওয়া, সার দেওয়া, নিড়োনো, যা আমাদের মতো চাষিবাসী সংসারে আকছার করত বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা, মায়ের ক্ষেত্রে সেটা ছিল নিষিদ্ধ এক জগৎ। কেন কি, ততদিনে রটে গিয়েছিল, মায়ের হাতে সবজি তো ফলেই না, বরং তার হাতের ছোঁয়ায়, চোখের নজরে শুকিয়ে যায় ফল-ফুলারি। বাড়ির গাভিন গাইটিকে জাবনা খাওয়ানোও মায়ের ক্ষেত্রে ওই একই কারণে বারণ ছিল।

এই দুঃসহ অপমানকর জীবনের প্রথম পর্বে মা কোনও প্রতিবাদ করেছিল কিনা, কিংবা কেঁদেকেটে আকুল হয়েছিল কিনা জানা নেই আমার, তবে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমি লক্ষ করেছি, মা নীরবে মেনে নিয়েছে তার মাথায় চেপে থাকা নিদারুণ অপবাদের বোঝাটিকে, বিনা বাক্যব্যয়ে বোঝাটিকে বয়ে নিয়েই চলেছে সে। শুধু তাই নয়, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও অনুভব করেছি যে, মায়ের ভেতরের ওই অশরীরী অলীক সর্বনাশা ক্ষমতাটিকে যে কেবল চারপাশের মানুষজনই ভয় পায় তাই নয়, মা নিজেও সেই ভয়ে জড়োসড়ো। নিজের ভেতরের ওই অচেনা মানুষটাকে নিয়ে তার নিজেরই মনের মধ্যে তিলতিল জমাট বেঁধেছে এক জাতের অলীক ত্রাস।

যেদিন আমার হাতেখড়ি হল, অঘোর চক্রবর্তী, আমাদের পারিবারিক পুরোহিত, এলেন খড়ি দেওয়াতে, আমাকে নিয়ে সারা সকাল উৎসব হল খুব আমাকে চান করানো হল, নতুন কাপড় পরানো হল, ঠাকুর পূজার পর মেঝেতে বালি বিছিয়ে দেওয়া হল, আর আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল নলখাগড়ার কলম। বড়পিসি আমাকে কোলে নিয়ে বসল। অঘোর জেঠু কলমশুদ্ধু আমার ডানহাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বালির ওপর আমাকে 'অ' লেখালেন। সারাক্ষণ বাবা, জেঠু, কাকারা, জেঠিমা, কাকিমারা, মোহরদি এবং পাড়ার দু'চারজন ভিড় করে রইল আমার চারপাশে। অনুষ্ঠানের শেষে আমি প্রথম ঠাকুরকে, তারপর পুরোহিতমশাইকে, পরে অন্যদের গড় হয়ে প্রণাম করলাম একে একে, মা কিন্তু একবারও সামনে আসেনি। সারাটা সময় কোথায় কোথায় যেন লুকিয়ে কাটাল মা।

বিকেল নাগাদ যখন মায়ের দেখা পেলাম, এক বুক গাঢ় অভিমান নিয়ে শুধিয়েছিলাম, হাতেখড়ির সময় তুমি ছিলে না কেন? কেন আমাকে কোলে নিয়ে বসলে না, যেমনটি বসেছিল কল্পনাথের বেলায়, ওর মা?

আমার গলায় আটকে থাকা কান্নার দলাটিকে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেছিল মা। কিন্তু কোনওরূপ ছলছাতুরির আশ্রয় নেয়নি। অকপটে বলেছিল, ছিঃ, কেমন করিয়া থাকব? আমি না অপয়া? তোকে পড়াশুনো শিখিয়া মানুষ হইতে হবেনি?

না, ওইটুকু বয়েসেও যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, কোনো চাপা অভিমান থেকে কথাগুলো বলেনি মা। বরং আমার মনে হয়েছিল, একটা দৃঢ় বিশ্বাসের জায়গা থেকেই বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো। অর্থাৎ ততদিনে মা নিজেই মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, সে অপয়া।

আমি ওই বয়েসেই কেমন করে জানি বুঝতে পারছিলাম, মায়ের গায়ের অপবাদের কালিটা একটু একটু করে ছিটিয়ে দেবার একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেমন চালু ছিল চারপাশে, মায়ের নিজের মধ্যেও নিজেকে অপয়া বলে বিশ্বাস করবার একটা অনুরূপ প্রক্রিয়াও চালু ছিল নির্ঘাৎ। দুটো প্রক্রিয়ার কোনটিরই সূচনা পর্বটিকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেনি আমার, কারণ তখনও অবধি জন্মাইনি আমি। যখন জন্মালাম, জ্ঞানবুদ্ধি হল, ততদিনে দুটো প্রক্রিয়াই নির্দিষ্ট পরিণতি পেয়ে গিয়েছে এবং মা তার মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়া বোঝাটিকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। আমি কেবল মায়ের টুকরো টুকরো কথা, রামুদাদার জবানবন্দী আর কল্পনাথের কাকা বাণীবিনোদ চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ থেকে না-দেখা পর্যায়গুলিকে আন্দাজ করে নিয়েছি মাত্র।

পরবর্তীকালে, স্কুলের পড়া শেষ করে যেদিন আমি মেদিনীপুরের কলেজে ভর্তি হতে চলেছি, জেঠু-কাকুরা, জেঠিমা-কাকিমারা, বড়পিসি, এমন কি রামুদাদাও সদর উঠোনে হাজির হয়েছে আমাকে বিদায় দেবার জন্য, গড় হয়ে একের পর এক প্রণাম সারতে গিয়ে হিসেবে কম পড়ল একজন। মুখ তুলে

দেখলাম, একজনই কম, আমার মা। অবাক কিছু হইনি, বরং এমনটাই আশা করেছিলাম আমি, শিক্ষায় ব্যাঘাত ও বিঘ্নের আশঙ্কায় মা-আমার যথারীতি চিলেকোঠার ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী করে ফেলেছে নিজেকে।

কিন্তু হাতেখড়ির দিনটির সঙ্গে কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনটির আকাশপাতাল ফারাক, কাজেই আমি পিছু ফিরলাম, ভিড় ঠেলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেলাম চিলেকোঠার ঘরে। সদর উঠোনের দিকে যে ছোট্ট জানলাটা, তার গরাদে মুখখানি চেপে ধরেছে মা, পেছন থেকে আমাকে দেখবারই বাসনা তার, কিন্তু আমি জানি, কিছুতেই এমন শুভ মুহূর্তে আমার ওপর ফেলবে না তার বিষ-নজর, সেই কারণেই জানলায় মুখ চেপে প্রাণপণে চোখ বুজে বসে রয়েছে নির্ঘাৎ। ফলে, আমি যে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, টেরই পায়নি মা। যখন আমি 'মা' বলে ডাকলাম, ভীষণ রকম চমকে উঠে, পিছু ফিরে, আমাকে দেখা মাত্তর ভয়ে-তরাসে আঁচল দিয়ে মুখখানি ঢেকে ফেলল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, মায়ের সারা শরীর বাঁশপাতার মতো তিরতিরিয়ে কাঁপছে। দেখতে দেখতে খুব রাগ হয়ে গেল আমার। আঁচলসহ তার হাতদুটোকে প্রবল টানে সরিয়ে দিলাম মুখ থেকে।

বললাম, চোখ খোল। খোল বলছি।

মুখে কোনও ভাষা ছিল না মায়ের, কেবল দু'দিকে প্রবলভাবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

সেদিন অনেক সাধ্য-সাধনায় অবশেষে চোখ খুলেছিল মা। আতঙ্কে, আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে যেতে যেতে বলেছিল, তোর ক্ষতি হয়্যাবে খোকা।

আরও রেগে গিয়ে বলি, কিচ্ছু হবেনি। তুমিও বিশ্বাস কর এসব? একটা বাজে সংস্কার..., বজ্জাত লোকদের দেওয়া মিথ্যে অপবাদ...।

অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে মা। আমি বুঝতে পারি, আমার কথাগুলোকে বিশ্বাস করবার ইচ্ছে কিংবা মনের জোর তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই তার মনে।

মাকে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে আসি। সকলের সাক্ষাতে গড় হয়ে প্রণাম করি। বলি, যতক্ষণ না চোখের আড়াল হচ্ছি, তাকিয়ে রইবে আমার দিকে। তুমাকে আমার দিব্যি রইল।

আমার জনমদুঃখিনী মায়ের নিদারুণ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ওটাই আমার প্রথম প্রতিবাদ, যদিও কলেজ থেকে ফিরে এসে রামুদাদার মুখে শুনেছি, সেদিন, সারাটা দিন ধরে, কিস্তিতে কিস্তিতে সবাই গঞ্জনা দিয়েছে মাকে।

'জনমদুঃখিনী মা আমার' কথাটার মধ্যে অনেকখানি আবেগের ফেনা লেগে থাকে। কিন্তু ফেনাটা শুকিয়ে গেলেও মায়ের চোখে তো দেখতে পেয়েছি, চিরকালই টলোমলো করেছে জল, অন্তত জ্ঞান পড়বার পর থেকেই দেখে আসছি, চোখের আড়াল হলেই মায়ের চোখ দুটি বারবার অজান্তে ভরে গেছে জলে। সেই দেখবার মধ্যে তিলমাত্র আবেগের ফেনা নেই। মায়ের সেই অবিরাম চোখের জল জমাট পাথরের মতো কঠিন বাস্তব।

ততদিনে, কেবল আমাদের পরিবারেই নয়, গোটা পাড়ায়, সারা গাঁয়ে, এমন কি সারা তল্লাট জুড়ে মায়ের অপয়া নামটি ছড়িয়ে পড়েছে ছাতিম ফুলের কটুগন্ধের মতো। ফলে, মানুষজন পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে তাকে। মানুষজনের বাড়িতে উৎসবে-পার্বণে, বিয়ে-শাদি-অন্নপ্রাশনে জনে জনে নেমন্তন্ন পেত বাড়ির সবাই, কেবল মাকে কেউ তেমন করে আগ বাড়িয়ে ডাকত না কখনোই। মাও, দেখেছি, না যেতে পারলেই খুশি হত সব চাইতে বেশি। এত বড় পরিবারে, এত বড় গাঁয়ে সে সব অর্থেই ছিল ব্রাত্য, একঘরে, কুষ্ঠরোগীর মতো অস্পৃশ্য, পরিত্যাজ্য। মায়ের কতখানি জানি নে, কিন্তু আমার ছোট্ট বুকখানি এক দুরুহ লজ্জায়, অপমানে প্রতি-নিয়ত তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি পুড়ত।

পড়শির বাড়িতে বিয়ে, আমাদের পুরো পরিবার নিমন্ত্রিত, সবাই বসল সাজতে, জেঠিমা-কাকিমারা তোরঙ্গ থেকে বের করল তুলে রাখা শাড়ি, গয়না, মা তখন হয়তো বা পুকুরঘাটে বসে দুরমুশিয়ে কাপড় কেচে চলেছে, কারণ, ওই উৎসব, নিমন্ত্রণ, তার কাছে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর। তাই, বিয়েবাড়িতে যাবার আনন্দে যখন হিল্লোল বইছে সারা বাড়িতে, ওই তুমুল হাওয়ায় মায়ের বুকের

মধ্যেকার দুঃখিনী গাছের ডালগুলোতে একটি পাতাও নড়ে না।

মায়ের প্রতি গাঁয়ের মানুষের যে কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, তা নয়। বরং তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল প্রায় সবাই। কিন্তু ওই যে, মানুষটি সম্পর্কে একটা অচেনা ভয়। সংস্কারবদ্ধ মানুষ তারা, বালবাচ্চা গরু-ছাগল নিয়ে ঘর-সংসার করে, ছোটোখাটো প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভালো কিংবা মন্দ নিয়ে তাদের তাবৎ দুঃখ, আনন্দ, যাবতীয় সাফল্য-বিফলতাবোধ। কী থেকে কী হয়ে যায়, এমনই এক অলীক আশঙ্কায় সর্বদাই সিঁটিয়ে থাকত ওরা। ভয় পাওয়া কেন্নোর মতো গুটিয়ে রাখত নিজেদের। ওই অচেনা ভয় আর আশঙ্কার কাছে এতটাই অন্ধ নতজানু ছিল তারা, বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেচনা সবকিছুই অসাড় হয়ে যেত। কি না, পান থেকে চুন খসলে যদি সংসারের প্রিয়জনগুলির কোনো অকল্যাণ, সর্বনাশ হয়! শুধু ওরাই তো নয়, মা নিজেও তো আমার সামনে বিড়বিড় করে বলত, সত্যিই তো আমার লাগানো কুমড়ো গাছে জালি এলনি রে খোকা, টসটসে ফুলগুলা জালিবিহনেই শুকিয়া গেল! অথচ, আমার গাছটাই তো সবচেয়ে লকলকে হয়েছিল।

মায়ের নিজের মুখে এমন কথা শুনে, আমি তাজ্জব। জেঠিমা-কাকিমাদের সঙ্গে মায়ের কুমড়ো চাষের কথা আমি শুনেছি রামুদাদার মুখে। তখন তো আমি জন্মাইনি। মায়ের দুর্ভাগ্যের একেবারে গোড়ার পর্বের কথা সে-সব। সে প্রসঙ্গ পরে।



মায়ের সেই ধারাবাহিক লাঞ্ছনার দিনগুলোতে সারা গাঁয়ের তেমন কেউই এসে দাঁড়ায়নি ওর পাশে, সমবেদনার হাত রাখেনি পিঠে। কেবল দু'চার জন মাত্র মানুষ ছিল এর ব্যতিক্রম। তাদের মধ্যে একজন নন্দ গুচ্ছাত, অপরজন আমাদের পুরোহিত অঘোর চক্রবর্তীর ছোটোভাই এবং আমার সহপাঠী কল্পনাথের কাকা বাণীবিনোদ চক্রবর্তী।

সুরেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর দুই ছেলে অঘোরনাথ আর বাণীবিনোদকে ভাটপাড়ায় পাঠিয়েছিলেন টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য। শিক্ষান্তে অঘোরনাথ হলেন শাস্ত্রের বদহজমে কাবু, সংস্কারাচ্ছন্ন এক শুচিবাই পুরোহিত, ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তার অর্থব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করবার চেয়ে শাস্ত্রগ্রন্থকে পুজো করাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। অন্যদিকে, বাণীবিনোদ ফিরে এলেন ঘোর নাস্তিক হয়ে। ঠাকুর-দ্যাবতার মাহাত্ম্য বোঝাবার চেয়ে তিনি গ্রামের মানুষকে সুযোগ পেলেই বোঝাতেন পৃথিবীতে ধর্ম, ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদের সৃষ্টি ও বিবর্তনের ইতিহাস। ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করতে করতেই নাকি তাঁর মনে এই ধারণাগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য, গ্রামের মানুষেরা বড় একটা পাত্তা দিত না বাণীবিনোদকে, যদিও বাৎসরিক সিংহবাহিনীর পুজোর সময় চণ্ডীপাঠের দায়িত্বটা তাঁর ওপরেই বর্তাতো, কেন কি, অত নির্ভুলভাবে চণ্ডীপাঠ, অঘোর চক্রবর্তী তো'নয়ই, এলাকার কোনো পুরোহিতই করতে পারত না।

বাণীবিনোদ-কাকু, এই দুনিয়ায় আমার দেখা সবচেয়ে রহস্যময় মানুষটি, সারাটি জীবন ধরে যাঁকে আবিষ্কার করতে করতে হিমশিম খেয়েছি আমি, মাঝে মাঝেই বলতেন, জানিস তো, পশুদের সংস্কার মানুষের চেয়ে ঢেরগুণ বেশি? এতদ্দ্বারা তিনি মানুষের প্রশংসা করতেন, নাকি সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিতেন, তা বুঝতে আমার অনেক বছর কেটে গিয়েছিল। তবে, সেই শৈশব থেকে আজ অবধি হাজারো শোকেতাপে যতখানি আশ্রয় পেয়েছি তাঁর কাছে, এ জীবনে ভোলা মুশকিল।

এই দুনিয়ায় আরও দু'একজনের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকবার একটা সুযোগ এসেছিল আমার জীবনে। প্রথমজন হল, অঘোর-জেঠুর ছেলে কল্পনাথ। প্রাইমারি স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল সে, বন্ধুও ছিল খুবই, কিন্তু প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তাকে সর্বদাই মনে হত কতই না অচেনা, একেবারে দূর আকাশের পাখি। তার কাছে আজীবন কাল কৃতজ্ঞ থাকবার সুযোগ আমি মুহূর্তের অসতর্কতায় নষ্ট করে ফেলেছি। ক্লাস-থ্রিতে পড়বার সময় সে আমাকে দিয়েছিল একটা মিঠে নুড়ি। চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য নুড়ি-কাঁকরের মধ্যে থেকে মিঠে নুড়িটিকে চিনে নেবার ক্ষমতা আমাদের সবাইয়ের মধ্যে কেবল ওরই ছিল। সেই

নুড়ি থেকে মিঠে রস বেরোনোর আগেই আমি তা হারিয়ে ফেলি। সেই থেকে সারা মুখে তিক্ত-কষায় স্বাদ নিয়েই বেঁচে রয়েছি।

এর পরই নাম করতে হয় শিখা বউদির। শহর থেকে আসা সেই এক অনাত্মীয়া মহিলা আমার ক্ষতস্থানে আকৈশোর সমবেদনার প্রলেপ লাগিয়েছে।

এছাড়া, যার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, সে হল আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদী যমুনা। গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ ওকে তাচ্ছিল্য ভরে ডাকত, যমী খাল। যমের বোন যমীর সঙ্গেই নাকি যোগ তার নামে ও চরিত্রে। কাজেই, এক ধরনের অশুভবোধ জড়িয়ে থাকত ঐ নদীর শরীরে। আমার মায়ের মতোই অন্তঃসলিলা বিদ্বেষের শিকার ছিল নদীটাও। সেই কারণেই বোধ করি, নদীটার প্রতি আমার ছিল এক ধরনের প্রচ্ছন্ন মমতা। দুঃখের মুহূর্তগুলিতে নদীটাই ছিল আমার বিশ্বস্ততম আশ্রয়।

এ পর্যন্ত যে-ক'জনার কথা বললাম, এদের কাউকেই ভুলতে পারি না আমি, তবুও সবার আগে নন্দ জেঠার নামটাই করতে চাই। কারণ, সেই শিশু বয়েসে এই মানুষটির প্রতিই সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়েছিলাম আমি।

নন্দ জেঠা ছিল জাতে ছুতোর। গরুর গাড়ির চাকা, হাল-চাষের লাঙল, ফাল-জোয়াল,--এই সবই বানাত সে। ছোটোখাটো শীর্ণ খাঁচার মানুষটি ছিল চিরকালই অতি নিরীহ, নির্বিরোধী এবং মুখচোরা। বাষট্টির নির্বাচনের আগে অবধি আমরা জানতেই পারিনি যে, নন্দ জেঠা কমিউনিস্ট পার্টি করে।

তখন আমাদের গাঁয়ে কমিউনিস্ট বলতে একজনও ছিল না। আমাদের গ্রামটা ছিল বর্ধিষ্ণু ও সচ্ছল। জোতদারদের সংখ্যা ছিল আশেপাশের অন্য গাঁগুলোর তুলনার ঢের বেশি। ফলে, পুরো গ্রামটাই ছিল কংগ্রেসের দুর্গ। আমাদের পুরো পরিবারটাও ছিল আকাট কংগ্রেসি। কারণ, আমাদের ছিল সচ্ছল পরিবার। জোতজমি, পুকুর, বাগান ছিল ভালোই। আমাদের ছেলেবেলায় সচ্ছল মানুষেরা কংগ্রেস করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারত না। আর, গাঁয়ে-গঞ্জে বিধান রায় ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেসিদের নয়নের মণি। তো, এমন একটি কংগ্রেসি দুর্গের মধ্যে যে, একজন কমিউনিস্টের বসবাস, কেউ কল্পনাও করেনি কোনোদিন। বাষট্টির নির্বাচনের মুখে গাঁয়ের মানুষ প্রথম জানতে পারল যে, গাঁয়ের মধ্যে একজন কমিউনিস্টের বসবাস, এবং সে হল নন্দ গুচ্ছাত। সবাই বিস্ময়ে থ' হয়ে যায়। কেন কি, এমন নিরীহ গোবেচারা মানুষটি কবে কবে কমিউনিস্ট হয়েছে, মানুষজন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তা!

বাষট্টির নির্বাচন আমার কাছে একটি স্মরণীয় ঘটনা। শুধু যে নন্দ জেঠার উপস্থিতি আমাদের গাঁয়ের নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় একটা বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল তাই নয়, ওই খর্বকায় শীর্ণ মানুষটির প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতায় একেবারে ভিজে গিয়েছিলাম আমি। আশৈশব আমার দেখা এই নির্দয় পৃথিবীতে কৃতজ্ঞ থাকবার মতো অন্তত একজন মানুষকে আবিষ্কার করতে পেরে অস্থির মনটা কিঞ্চিৎ শান্ত হয়েছিল আমার।

তখন তো নির্বাচন মানে নাগাড়ে দু'তিন মাস দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই নয়, তখন নির্বাচন মানেই বিধান রায়..., জহরলাল..., কংগ্রেস। মাঠে তো আর নেই কেউ। একেবারে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া। বিরোধী বলতে দু' একজন দাঁড়াত অবশ্য, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দাঁড়াত একজন 'কাস্তে-ধানের শীষ' প্রতীকে, লোধা-কোড়া-সাঁওতাল পাড়ার কিছু মানুষ ভোট দিত ওকে। বড়রা বলত, রাতের বেলায় ধানের শীষ-কাটা পার্টি। পি-এস-পি'র থেকেও দাঁড়াত একজন, বড়রা বলত, পরম সুবিধাবাদী পার্টি...। দাঁড়াত বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত, পনেরো আনা ভোট পড়ত কংগ্রেসের বাক্সে, কেন কি, বিধান রায়ের, জহরলালের পার্টি সেটা, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বাঘা যতীন, সুভাষ বোসের পার্টি, যদিও শেষোক্ত চারজন এবং ওদের সহযোদ্ধাদের কোনও কালেই স্বীকার করেনি কংগ্রেস, বরং পদে পদে তাদের বিরোধিতা করেছে চিরকাল। আর, তখন নির্বাচন মানেই একটা উৎসব-উৎসব ব্যাপার, আমাদের ইস্কুল যাবার বালাই নেই। সেখানেই তো ভোটকেন্দ্র, কাজেই, আমাদেরও আগের দিন থেকে ছুটি।

ভোটের দিন খুব সকাল থেকেই, যেমন করে গাঁয়ের পুজো-পার্বণে মণ্ডপ সাজানো হয় রঙিন

কাগজের শেকল দিয়ে, সেই আদলে প্রাইমারি স্কুলের পুরো চত্বর জুড়ে টাঙানো হত পতাকার শেকল। রঙিন পতাকা শয়ে শয়ে; গেরুয়া-সাদা-সবুজ, মধ্যিখানে জোড়া-বলদের ছবি। তেলেভাজার দোকান দিত বটকেষ্ট দাস, ফুলুরি ভাজত খাঁটি সরষের তেলে, সাদা কলাই করা থালায় চূড় করে সাজিয়ে রাখত সাঁতলানো ছোলাসেদ্ধ, ঘন খয়েরি বরণ, তেল-চকচকে শরীর, আর, আদিবাসী নাচের সময় নাচিয়ে মেয়েরা যেমন খোঁপায় গুঁজে নেয় আধডজনটাক পাখির পালক, ঠিক সেই আদলে লাল করে ভাজা লঙ্কা গুঁজে দিত ওই ছোলার মধ্যে। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান দিত মদন গুচ্ছাইত, সেই দোকানে চাটনি-লজেন্সও থাকত কাঁচের বয়ামে।

দিনের প্রথম প্রহরে মূলত গরিব-গুরবোরা, মুনিশ-মাইন্দারের দল ঠেসাঠেসি, গুঁতোগুতি করে ভোট দিত। ভোট দিয়েই মালিকের বাড়িতে খাটতে দৌড়ত তারা। ভোট দেবার খুব একটা যে আঠা থাকত ওদের, তা নয়, কিন্তু সকাল থেকেই কংগ্রেসের কিছু অত্যুৎসাহী ছোকরা, গাঁয়ের জোতদারদেরই ছেলেপুলে ওরা, পাড়ায় পাড়ায় হানা দিয়ে, একেবারে দাদন আদায়ের কায়দায় দরজায় ঘা মেরে, টেনে তুলে, তাড়িয়ে আনত ওদের, চল্, চল্, ভোট দিতে হবে যে!—হ্যাঁ, ঠিকই তো, ভোট তো দিতেই হবে। বাবুদের ভোট, না দিলে চলে? এক্ষেত্রে দাদন ওয়াশীল না করবার মতো অপরাধ সেটা। তার ওপর ফের খোদ বাড়ি বয়ে এসেছেন। কারা? না, মালিক-মনিবের ছেলেপুলেরা, সম্বৎসর যাদের ক্ষেতে-খামারে খাটাবাটা করতে হয়। কাজেই, এ অনুরোধ তো ফেলা চলে না। অতএব দলে দলে দ্রুতপায়ে চলেছে মুনিশ-মাইন্দার শ্রেণির লোক, পাশে-পাশে ভোট দেবার কৌশল বোঝাতে বোঝাতে চলেছে মনিবপুত্ররা, ভোট-কেন্দ্রের ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্ত অবধি কানের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছে সার কথাটি, একেবারে জোড়া বলদের পেটে, এ্যাঁ? আর কোনওদিকে তাকানো নয়। তাও সংশয় থেকে যায়, কী বুঝতে কী বুঝল, কতখানি বুঝল, কে জানে! এই তো খানিক আগে, কামার পাড়ার বিপিন বুড়ো, ভোট-ঘরে ঢুকে আর বেরোয় না কিছুতেই। দশ মিনিট কেটে যায়, তার বেরোবার নামটি নেই। কী হল জেঠা? ভোটটা দিয়ে বেরিয়ে এস। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ওখানে?—আরে, দাঁড়া রে বাপ...। জবাব আসে ভোটঘরের ভেতর থেকে,—জোড়াবলদটাকেই তো দেখতে পাচ্ছিনি। দ্যাখ কাণ্ড! বুড়ো ওই ভোটঘরের ভেতরেই একজোড়া জ্যান্ত বলদ খুঁজছে! তো, বাঙালি ভোটাররাই যদি এমনটা করে, তবে আদিবাসী মুনিশ-মাইন্দারদের ওপর আর কতখানি নির্ভর করা চলে! গেল ভোটে, সাতান্নতে, হল তো তেমনটাই। লণ্ঠন চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল পি-এস-পি'র শিবেন রায়। লোকটার খুব পপুলারিটি ছিল এলাকায়। আমাদের গাঁয়ের কংগ্রেসের চাঁইরা ভেবে নিয়েছিল, কংগ্রেসের কিছু ভোট কাটবেই শিবেন। তার জন্য অবশ্য ভাবনার কিছু নেই, তবে কিছু ভোট কাটবে শালা। ভোট শেষ হওয়ার পর, ছোকরার দল দ্যাখে, ইস্কুলের লাগোয়া পুকুর ঘাটে গিয়ে ভোট-বাবুরা বালি দিয়ে রগড়ে রগড়ে হ্যারিকেন সাফ করছে। পাশটিতে গিয়ে তাদের তো চক্ষু চড়কগাছ! হ্যারিকেনের গায়ে শয়ে শয়ে ভোটের ছাপ, অর্থাৎ লণ্ঠন চিহ্নধারী শিবেন রায়ের বারোআনা ভোট পড়েছে বুথের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা হ্যারিকেনের গায়ে! অতএব, এ শালারা যে শেষ অবধি কোথায় মারতে কোথায় মারবে ছাপ, খোদার মালুম!

এইভাবে তো সকালটা কাটল, দুপুরের পর থেকেই সম্পন্ন, আধা সম্পন্ন বাড়িগুলোতে হানা দিল দেওরের দল, কই গো বউদিরা, পাউডাব মাখা শেষ হল তুমাদের? ভোটবাবুরা যে তোমাদের দেখবে বলিয়া হা-পিত্যেশ করিয়া বুসিয়া রইছে!

—আহা, মরণ, দাঁড়াও, হয়ে এল।

তখন রান্নাবাড়া শেষ। খাওয়া দাওয়াও শেষের মাথায়। দেওরের দল চলে যেতে যেতে বলে যায়, জলদি-জলদি তৈরি হয়ে লাও, একটু বাদেই আসতিছি। বেশি পাউডার মাখবার আবশ্যক নেই, ইস্কুল মাঠে শয়ে-শয়ে মানুষের হাঁটাচলায়, হাওয়ায় মন-মন পাউডার ভাসতিছে।

বৌদির দল হেসে লুটিয়ে পড়ে।

বলে তো গেল, তবে জলদি বললেই কি জলদি হয় সবকিছু? উৎসবে-পার্বণেই হোক, ভোটের জন্যই হোক, কিংবা ডেলিভারির জন্য হাসপাতালে, মেয়েদের সাজগোজ করে বেরোতে একটুখানি

সময় লাগবেই। দোতলার কোন্ ঘরের কোন্ তোরঙ্গের কোন্ কানাচে রয়েছে সাধের শাড়িটি, আলমারি-সিন্দুকের কোন্ খোপে রয়েছে পছন্দের হার-বাজু-পাশাঝুমকোর সেট, রোজ রোজ তো লাগে না এসব, কালেভদ্রে বেরোয়, খুঁজে পেতে বের করতে সময় লাগবে না? তো, সেসব খুঁজে পেতে পরা হল, পরিপাটি করে চুল বাঁধা হল, মুখে স্নো-পাউডার মাখা হল, দু'পায়ে শ্রীমতী তরল আলতা পরা হল, মাংসের ঝোলে, নামানোর আগে ঘি-গরমমশলা ছড়ানোর মতো, বেরোবার আগে আগেই শাড়িতে ছেটানো হল কান্তা সেন্ট, সবার শেষে এলাচদানা দিয়ে তৈরি একখিলি পান মুখে দিয়ে ঠোঁটদুটি লাল করতে করতে দল বেঁধে বউড়ি-ঝিউড়িদের ভোট দিতে বেরোনো। গন্ধে মাতোয়ারা পথঘাট, পিছু পিছু দেওরের দল বিভোর, কোথায় কীভাবে ছাপ মারতে হবে তার কৌশল শেখাতে একেবারে নিবিড় হয়ে আসে।

আমাদের তো ভোট নেই, আমরা শুধু ঘুরে বেড়াই। আমি, গজানন, কল্পনাথ, দিবাকর, খুদিরাম, ঝংকার..., ফুলুরি আর ছোলা সেদ্ধ খাই, শুধু একটি মাত্তর ধান্দা আমাদের, ভোটের মেলাটি ভাঙলে পর, কাড়াকাড়ি করে পতাকার শেকলগুলোকে অধিকার করা, তারপর বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যে-যার উঠোনে। আর, তাতেই ঘটল বিপত্তি। স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলের থার্ডপণ্ডিত কেশববাবুর হাতে খুব চড়-চাপড় খেল স্কুলের হেডপণ্ডিত কামাখ্যা ভট্টর ছোটো ছেলে গজা, পোশাকি নাম তার গজানন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলের সব পড়ুয়াকে জাতীয় পতাকা বানিয়ে আনতে বলেছিলেন থার্ডপণ্ডিত-কাম-ব্রতচারী শিক্ষক কেশববাবু। ওই নিয়ে প্রভাতফেরি হবে। তো, আমরা আগের দিন সারা বিকেল পরিপাটি করে জাতীয় পতাকা আঁকলাম ফুলস্কেপ কাগজে। রান্নাঘর থেকে হলুদ বাটা চুরি করে, চুন মিশিয়ে বানালাম গেরুয়া রঙ, নীল কালির সঙ্গে হলুদবাটা মিশিয়ে সবুজ, মধ্যিখানে আঁকলাম একখানা গরুর গাড়ির চাকা। বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে দিল রামুদাদা, বেলের আঠা দিয়ে পতাকাটিকে কঞ্চির সঙ্গে আচ্ছা করে সাঁটলাম।

পরের দিন ওই পতাকার জন্যই কেশববাবুর হাতে চড়চাপড় খেয়ে গেল গজা। গেরুয়া-সবুজের মধ্যবর্তী সাদা এলাকায় সে এঁকেছে পরিপাটি একজোড়া বলদ। এঁকেছে মানে, ঘরে এনে রাখা ভোটের পতাকার থেকে জোড়াবলদদুটিকে সুন্দরভাবে ট্রেস করেছে। মার খাওয়ার আগে অবধি আমাদের সামনে বিতাং করে বোঝাচ্ছিল ট্রেস করবাব কৌশল। স্বাধীনতার পতাকার ওপর ভোটের পতাকাটি ফেলে প্রথমে জোড়াবলদের আউটলাইনে চেপে চেপে দাগ দিয়েছে সূচোলো পেনসিল দিয়ে, তারপর ওই দাগে দাগে কালি বুলিয়েছে। একে গজা হেডপণ্ডিতের ছেলে, তায় আজীবন কংগ্রেসি কামাখ্যা ভট্ট বিয়াল্লিশে নাকি থানা ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন দু'তিন বার, গোঁফের ডগা থেকে সেই ঘিয়ের সুবাস আজও ধাক্কা মারে নাকে, বিভোর করে দেয়, প্রহারের কারণটা শুনেই বুঝতে পারেন, ব্যাপারটাকে 'ক্ষমাসুন্দর' চোখে দেখা যেত। কেশবস্যারের দিকে দৃষ্টির অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেই তিনি ছেলেকে বোঝাতে থাকেন পতাকার মাহাত্ম্য। পতাকা একটাই, তবে, স্বাধীনতা দিবসে মধ্যিখানে চাকা, আর ভোটের সময় জোড়াবলদ, এই যা ফারাক।

জ্ঞানবুদ্ধি পাকা হওয়ার পর বুঝেছিলাম, কামাখ্যা ভট্টর কাছে যা ছিল মামুলি ব্যাপার, কেশব স্যারের কাছে তা ছিল না, কারণ, পরে-পশ্চাতে জেনেছিলাম, তিনি ছিলেন ভেতরে ভেতরে কমিউনিস্ট। জোড়াবলদ মার্কা পতাকাকে মনে মনে ঘেন্নাই করতেন। জাতীয় পতাকা আর কংগ্রেসের পতাকা এক হওয়ায় তাঁর মনে যার-পর-নাই বিদ্বেষ ছিল।

তো, বাষট্টির ভোটে আচমকা আত্মপ্রকাশ করল নন্দ গুচ্ছাত। গ্রামের শেষপ্রান্তের বটতলায় লাগিয়ে দিল ভোটের মিটিং। গঞ্জ থেকে এলেন এক ভদ্র গোছের ধুতি-শার্ট পরা নেতা। ডজনখানেক 'কাস্তে-ধানের শীষ' মার্কা ঝাণ্ডা পুঁতে দেওয়া হল বটতলায়। আর, শ্রোতা হিসেবে জড়ো হল পাশের লোধাপাড়ার জনা পঞ্চাশেক মানুষ।

খুব হম্বিতম্বি করে বক্তৃতা দিলেন নেতাটি। মিটিং গেল ভেঙে।

তখন, সে-সব দিনে, রাতের বেলায় ধানের শীষ কেটে নেয়, এমন অপবাদ ছিল লোধাদের সম্পর্কে। জেঠুদের মতো পাক্কা কংগ্রেসিরা টিটকিরি করে বলল, ঝাণ্ডা দেখেই তো মালুম হচ্ছে, কাস্তে দিয়ে রাতের বেলায় ধানের শীষ কাটিয়া লিবার পার্টি উটা। ঠাট্টা-মশকরা চলল বটে, নন্দ গুচ্ছাত, কাবাব্‌মে আচমকা হাড্ডি-সে, রাতারাতি ভিলেন বনে গেল সারা গাঁয়ে, কিন্তু কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। এবং তারই পরিণতিতে আমাদের গাঁয়ে, সেই প্রথম, ভোটের হপ্তাটাক আগে ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট ভিক্ষার রেওয়াজ চালু হল। কামাখ্যা ভট্ট, অঘোর চক্রবর্তীরা দল বেঁধে এলেন আমাদের বাড়িতে, মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককে জনে জনে অনুরোধ জানালেন, ভোটটা যেন কংগ্রেসের বাক্সেই পড়ে। রতিকান্ত, রাধাকান্ত, সতীকান্ত, নিশিকান্ত, শ্রীকান্ত, তোমাদের আর বলবো কি, ভোটটা জোড়া বলদেই দিও। বড় বৌমা, সেজো বউমা, ন'বৌমা, সুহাসিনী, জোড়াবলদেই দিও, অ্যাঁ? ভোটটা দিতে যেও কিন্তু।

আমি লক্ষ করলাম, মা যদিও এসে সন্তর্পণে দাঁড়িয়েছিল সকলের পেছনে, ওরা কিন্তু মাকে একবারের তরেও অনুরোধ জানাল না।

অভিমানে ভারী হয়ে এল আমার বুক, ওইদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বড় হব যখন, ভোটের বয়েস হবে আমার, জোড়াবলদকে কিছুতেই ভোট দেব না, কিছুতেই নয়।

কামাখ্যা ভট্টদের পরপরই ক'দিন বাদে গঞ্জের নেতাটিকে সঙ্গে নিয়ে, পেছনে জনা দশবারো লোধা যুবক, আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়াল নন্দ গুচ্ছাত। খুব অপ্রসন্ন মুখে তাদের অ্যালাউ করলেন জেঠু, কেন কি, তারা এসেছে ভোটের কথা বলতে, একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া চলে না।

নন্দ গুচ্ছাত এবং গঞ্জের নেতাটি জোড়হস্তে সবাইকে অনুরোধ জানাল, ভোটটা যেন তাদের প্রার্থীর পক্ষে 'কাস্তে ধানের শীষ' প্রতীকে দেওয়া হয়। জনে জনে অনুরোধ জানাল তারা, আমার মাও বাদ গেল না। মেজো বউমা, যেও কিন্তু।

দেখতে দেখতে নন্দ মিস্ত্রীব প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় ভিজে গেল আমার কচি বুক। আমি জানি, নেহাতই অপয়া জ্ঞানে আমার মাকে জোড়া-বলদে ভোট দেবার অনুরোধ জানাননি কামাখ্যা ভট্টর দল, পাছে অপয়া মানুষের ভোট পড়লে তীরে এসেই ভরাডুবি ঘটে! যে মানুষের হাতের ছোঁয়ায় কুমড়ো গাছের মকমকে ফুল জালিবিহনেই শুকিয়ে যায়...। ওই দিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বড় হয়ে কমিউনিস্টদেরই ভোট দেব।



মা আমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে রয়েছেন। বিছানায় আধশোওয়া বসে বসে চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা মা'কে দেখছিলাম আমি। মায়ের দু' চোখে নীরব ভর্ৎসনা ছিল।

বড় অসহায় লাগছিল নিজেকে। মৃদু গলায় বলি, মদ আমি কোনোকালেই খেতাম না মা, তুমি তো জানোই, কেবল তোমার জন্য মদ খাওয়া ধরেছি আমি, কেবল তোমার জন্যই এখনও খাই, আজও খাচ্ছি।

বাস্তবিক, জীবনে কোনোদিন মদ খাব এমনটা স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। মদকে আমি ঘেন্না করেছি চিরকাল, মদ খাওয়াকেও। তখন সবে স্কুল-কলেজের গণ্ডী পার হয়ে ল' কলেজে ঢুকেছি, কত ধরনের ছেলের সঙ্গে মেলামেশা ছিল আমার। সবাই তো ভালো ছিল না। কেউ মদ খেত, কেউ খারাপ পাড়ায় যেত, কেউ বা লুকিয়ে রেস খেলত...। তাদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল খুবই, কিন্তু কেউই আমায় হাজার ঝুলোঝুলি করেও মদ ধরাতে পারেনি। প্রাণের বন্ধুদের দু'একজন, অনিন্দ্য, মুকুল, পার্থ, আমার বুকের মধ্যে আজীবনকাল জমাট বেঁধে থাকা পাষাণটার খোঁজ পেয়েছিল ওরা, মাঝে মাঝেই উসকাত, দু' এক পেগ খা, অনেক হালকা হয়ে যাবি। ওদের কথা কানে তুলিনি আমি।

পড়াশুনোয় কোনোকালেই খুব ভালো ছিলাম না। পরীক্ষায় তেমন তেমন ফল করে সবাইকে চমকে

দেবার মতো বুদ্ধি আমার মগজে নেই বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য সত্যিই আমার মগজে তেমন বুদ্ধি ছিল কিনা, যাচাই করবারও সুযোগ পাইনি। সেই শিশুকাল থেকে পুরো কৈশোর, যৌবন এমন বিষণ্ণভাবে কেটে গেল আমার, মানসিকভাবে সারাক্ষণ এতখানি বিপর্যস্ত রইলাম আমি, এত লজ্জা আর অপমানে তিলতিল পুড়তে থাকল বুক, বিনা অপরাধেও এমন আসামীর জীবন কাটাতে হল আজীবনকাল, মগজের মধ্যে সদাসর্বদা এমন দাউ দাউ জ্বলতে থাকল দাবানল, প্রতিটি বইয়ের পাতায় পাতায় এমন আঁকা হয়ে রইল শুকিয়ে আসা কুমড়োর ফুলগুলি, মন দিয়ে পড়াশুনো করে সম্মানীয় মানুষ হয়ে ওঠার বিষয়টি এতখানি হাস্যকর লাগল, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'মানুষ' হওয়ার স্বপ্ন কোনোদিন তৈরিই হল না আমার মধ্যে। পড়াশুনোয় তেমন করে মনই বসাতে পারলাম না কোনোদিন। কোনোরকমে বি-এটা পাশ করে যে কোনো ধরনের একটা চাকরির জন্য পাগলের মতো ঘুরতে লাগলাম চতুর্দিকে। ততদিনে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ওপারে। আর, আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোটপিসি, বিলাসীপিসি নামে একটা বিমূর্ত অবয়ব নিয়ে যে আশৈশব বেঁচে ছিল আমাদের মনে, ততদিনে সগৌরবে উদয় হয়েছে আমাদের সংসারে। যদিও তার বাস রাজধানী কলকাতায়, কিন্তু স্পষ্ট টের পেতাম, আমাদের পুরো সংসারটা জুড়ে রয়েছে সে।

খুব অল্প বয়সেই চলে গেলেন বাবা। দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কাউকে জানান দেননি কখনোই। শেকড়-বাকড় দিয়ে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতেন। যখন আগাগোড়া ফুলতে শুরু করলেন, সদরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন জেঠুরা, ততদিনে খুবই দেরি হয়ে গিয়েছে।

বাবা অকস্মাৎ চলে যাওয়ায় মায়ের শেষ আশ্রয়টুকুও গেল। একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে গেল সে!

অবশ্য বাবার কাছে তেমন আশ্রয় কবেই বা পেয়েছে মা! আশ্রয় দেবার মতো ডালপালা তেমন একটা ছিল না বাবার শরীরে। চিরকালের মুখচোরা, ভোলেভালা, ছন্নছাড়া মানুষটি নিজেই মনে মনে অবলম্বন খুঁজে বেড়াতেন। মাকে নিয়ে, এমন কি, নিজেকে নিয়েও কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়তে চাইতেন না, বলা ভালো, পারতেন না। ততখানি ক্রোধ কিংবা অসূয়া ধাবণ করতেই পারতেন না শরীরে কিংবা মনে। এ সংসারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে আসা অপমান ও গ্লানি তাঁকে হয়তো-বা কষ্ট দিয়ে থাকবে মনে মনে, কিন্তু একাত্ম করে তুলতে পারেনি। কারোর বেদনার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য যে একটি সংবেদনশীল মনকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হয়, বাবার বুকের মধ্যে মায়ের জন্য যদি সেই সংবেদনশীলতার কোনো লেশ থেকেও থাকে, কিন্তু তা ক্রিয়াশীল ছিল না একেবারেই। ফলে, মা, তার চরম দুর্যোগের দিনগুলোতে বাবার ছায়ায আশ্রয় পায়নি তিলেকের তরেও। মাকেও দেখিনি বাবাব সামনে তার বেদনার জায়গাটিকে একবারের তরেও মেলে ধরতে। বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রথম পর্বে মা হয়তো বা একটুখানি আশ্রয়ের জন্য বাবার দুয়োরে টোকা মেরে থাকবেন, কিন্তু বারংবার টোকা মেরেও সাড়া না পাওয়ায় ধীবে ধীরে হয়তো বা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন একেবারেই। অন্তত আমার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর যে ক'বছর বেঁচে ছিলেন বাবা, চরম ঝড়-ঝঞ্ঝাব মুহূর্তেও এক চিলতে আশ্রয়ের জন্য বাবার দুয়োরে মাকে এক দিনের জন্যও টোকা মারতে দেখিনি আমি। এ নিয়ে কোনো অভিযোগ করলেই তাৎক্ষণিক জবাব পেয়েছি. কী হবে বলে! তবুও. নেহাতই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কজনিত সংস্কারবশত, হয়তো বা, মায়ের মনের একেবারে পাতালপ্রদেশে বাবা এক ধরনের প্রতীকী আশ্রয় হিসেবে টিকে ছিলেন, ঠিক যেমন করে পাড়ার বটতলায় সিঁদুর মাখানো পাষাণ খণ্ডটি, কোনোদিন সুস্পষ্টভাবে কাউকে কোনো সঙ্কট থেকে উদ্ধার না করলেও মানুষজন নেহাতই সংস্কারবশে তার সামনে মাথা নোয়ায়, 'মানসিক' করে, অনেক কিছু আশা করে তার কাছে।

মায়ের সেই প্রতীকী আশ্রয়টুকুও একদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। এই বিশাল, জটিল, ক্রূর জগৎসংসারে মা একেবারেই অনাথিনী হয়ে গেল।

সেই থেকে, সেন্ট্রাল জেলের লোহার গরাদের আশ্রয়ে চলে যাওয়া অবধি মায়ের প্রতি মুহূর্তের যাপনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশীদার ছিলাম আমি।

আর, আমার ওই হারিয়ে পাওয়া বিলাসীপিসি, বাবার মৃত্যুতে একমাত্র তাঁকেই আন্তরিকভাবে চোখের জল ফেলতে দেখেছিলাম। অনেক পরের কথা সেসব।

বাবার মৃত্যুর সময়ে বিলাসীপিসি নিরুদ্দেশ ছিল। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল, বাবার মৃত্যুর খবরে খুব কাঁদল সে। বিলাসীপিসির বয়ানে, গোটা সংসারে ওই একটি মাত্তর মানুষ নাকি ওকে তলিয়ে যাওয়ার থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবার কথার কীই বা মূল্য ছিল সংসারে!

যা বলছিলাম, বাস্তবিক, সেই ছেলেবেলা থেকেই, বড় হওয়ার তো নয়ই, কোনো ধরনের কোনও স্বপ্নই ছিল না আমার বুকে। যদিও, সেই ছেলেবেলা থেকে, প্রতি রাতে আমাকে কোলের মধ্যে শুইয়ে অনেক স্বপ্ন দেখাবার চেষ্টা চালিয়ে যেত মা, বড় হওয়ার, 'মানুষ' হওয়ার স্বপ্ন, কিন্তু কোনো মতেই স্বপ্ন দেখতে চাইতাম না আমি, স্বপ্ন দেখতে ভয় পেতাম। জাগরণে পাঠ্য বইয়ের পাতায় পাতায় যে ছবিগুলিকে ফুটে উঠতে দেখতাম, স্বপ্নের মধ্যেও ধেয়ে আসত সেই সব দুঃসহ ছবিগুলি..., জালি বিহনে শুকিয়ে যাওয়া রাশি রাশি কুমড়ো ফুলের ছবি সব, যা দেখে মা নিজেই নিজেকে ভয় পেতে শুরু করেছিল, সত্যিই তো আমার পোঁতা কুমড়ো গাছে জালি এলনি রে, খোকা! আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি সেটা। কই, এলনি তো!

কুমড়ো ফুলগুলির, একনাগাড়ে জল না পেয়ে, জীবন্মৃত অবস্থা, ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। বড়পিসি বলে, হবেই তো, জলবিহনে গাছও বাঁচে না, ফুলও শুকিয়া যায়।

মা ব্যাকুল হয়ে প্রতিবাদ করে, জল তো রোজই দিই, দিদি। তোমাদের সঙ্গেই তো দিই। তবে? তবে?

কাকি—জেঠিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বড়পিসির দিকে। এমন জটিল উপপাদ্যর মীমাংসা খোঁজে সবাই। বড়পিসির থেকেই আশা করে ওই মীমাংসা।

সেই দিনগুলো আমি দেখিইনি, তখন আমি জন্মাইনি। মায়ের এই সংসারে আসার একেবারেই প্রথম পর্বের কথা সেসব। কিছুটা বাড়ির পুরনো মাইন্দার রামুদাদার মুখে শোনা, কিছুটা ছোটকাকার থেকে, বাকিটা মায়ের মুখ থেকে একটু একটু করে কিস্তিতে কিস্তিতে, পুরোপুরি না-শুকোনো ফোঁড়াব বুক থেকে টিপেটিপে দৈনন্দিন পুঁজ বের করবার মতোই ব্যাপারটা, দু'দিক থেকে অনেকখানি টিপে ধরলে হয়তো বা সামান্য পুঁজ বেরোল, নিদেন সামান্য রক্তমেশা রসানি গোছের।

...সবজি খেতে কুমড়োগাছ লাগিয়েছে বাড়ির চার বউ এবং বড়পিসি। কমপিটিশনে ফলাচ্ছে। যে-যার পৃথক পৃথক গাছ। মাও প্রতিযোগিনীদের একজন। প্রত্যেকে রোজ বিকেলে যে-যার গাছে জল দেয়, সার দেয়, নিড়ানি...সেবা-শুশ্রূষা... দেখিয়ে দেয়, লুকিয়ে দেয়। সেজো কাকি যদি লুকিয়ে ঢেলে দেয় দু'আঁজলা কাঠ-কয়লার ছাই তো জেঠি মা ঢেলে এল এক জামবাটি ভাতের ফ্যান, কিনা, ভাতের ফ্যানে গাছের খাবার রয়েছে খুবই। ঠিক যেমন করে, একান্নবর্তী পরিবারে নিজেদের বাচ্চাকে আর পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে সরটা, চাঁচিটা, দইয়ের মালাইটা, এক টুকরো বাড়তি ফল, মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেলতে বলে মায়েরা!

আমার মা ওই প্রতিযোগিতায় বড় একটা ছিল না। সারাদিন, সারাক্ষণ এমনই লুকিয়ে থাকতে তৎপর থাকত মা, আমার প্রতি আলাদা মনোযোগ দেবার মানসিকতাই ছিল না তার। কুমড়ো চাষেব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে কিছুতেই চায়নি মা। সে তখন দুনিয়ার সব কিছুর থেকেই পালাতে তৎপর। বড়পিসিই মাকে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়ে, নামিয়ে দেয় খেলাটায়।

মায়ের কুমড়োগাছটা ছিল সবজি খেতের একপ্রান্তে। সবাই যখন, ফি-বিকেলে, হৈ-হৈ করে জল দিত যে-যার গাছে, মা তখন থাকত দৃশ্যপটের পুরোপুরি বাইরে। সবাই যখন জলটল দিয়ে ফিবে এল, শুনশান হয়ে গেল সবজি-খেত, মা গিয়ে একা একা জল ঢালত তার গাছটিতে। শুধু জল ঢালা ছাড়া বাড়তি কোনো যত্নপাতি করবার মতো উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলই না মায়ের মধ্যে, তবুও অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি লকলকিয়ে বাড়তে লাগল তার কুমড়ো গাছটি, বাড়তি ডাল বেরোল অনেকগুলি, পাতার রঙ হল ঘন সবুজ, দেখতে দেখতে বড়পিসি বলে, কী লো মেজো, তুইই তো সবার আগে রয়েছিস!

তবে যে নামতে চাইছিলিনি কিছুতেই।

একদিন সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মায়ের কুমড়ো লতাটিতেও ঝেঁকে ফুল এল। গাঢ় হলুদ ফুলগুলো টসটসে পাপড়ি মেলে হয়তো বা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত মায়ের মুখের দিকে, কারণ, ওরা তো আর মানুষ নয়, ওরা ফুল, স্বর্গ থেকে সরাসরি নেমে এসেছে ধুলোকাদার পৃথিবীতে। দুনিয়ার সব ফুলেরাই তো তাই। সম্ভবত ফুল ফোটার ওই দিনগুলোতে মায়ের বুকের মধ্যে একটা মৌচাক তৈরি হয়ে থাকবে, চারপাশে ফুল ফুটলেই তো আশেপাশের গাছ-গাছালির ডালে মৌচাকগুলো গড়ে ওঠে।

সবজি-খেতের অধিকাংশ কুমড়ো ফুলের বুক ঠেলে যখন একে একে মুখ দেখাতে লাগল গাঢ় সবুজ রঙের জালি, তখনই টের পাওয়া গেল, মায়ের শরীরে, মাছের আঁশটে গন্ধের মতো, লেপটে থাকা সেই অলীক উপাদানটিকে। কারণ, সবাই বিস্ময়ে পাথর হতে হতে দেখল, কেবল তার কুমড়ো লতাটিতেই কোনো জালি ধরেনি। অন্যদের কুমড়ো ফুলগুলো যখন জালি ধরবার পরপরই কর্তব্য শেষ বিবেচনায় গুটিয়ে নিতে লাগল যে-যার পাপড়ি, মায়ের গাছের ফুলগুলোও জালি ছাড়াই ঠিক তেমনি করেই শুকিয়ে যেতে লাগল, এবং ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে সম্ভবত যে মানুষটি যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় কেঁপে উঠেছিল, সে আমার মা। কারণ, অন্য কেউ নয়, সে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে নিজেকে। তারই নিজের মেহনতে তৈরি অকাট্য প্রমাণ এক ঝাঁক লাউডগা-সাপের মতো জড়াজড়ি করে শুয়ে রয়েছে সবজি-খেতের শেষ প্রান্তে।

বড়পিসির মধ্যে কোনো বিস্ময়বোধ ছিল না। খুব নিরুত্তাপ স্বাভাবিক গলায়, শরীরের ঠাসবুনোট ঘামাচিতে অনাড়ম্বর আঁচড় কাটতে কাটতে মন্তব্য করেছিল, অবাক হওয়ার কী আছে? এ তো জানা কথাই। কেবল গাছের গোড়ায় সার-জল ঢাললেই কি ফল ধরে?

তাবও অনেক পরে, আমার তখন আট ন' বছর বয়েস, বিলাসীপিসির খোঁজ পাওয়া গেল যখন, তারও বছর-দুই বাদে অনেক রশি টানাটানির পর, যখন সে সাড়ম্বরে ঢুকল আমাদের বাড়িতে, বড়পিসি একই মন্তব্য করেছিল, কারণ, সোনাদানায় সারা শরীর ভরে গেলেও কোনো সোনার চাঁদকে পেটে ধরতে পারেনি বিলাসীপিসি।

তো, সবাইয়ের গাছে ইয়াব্বড় সাইজের কুমড়ো ধরেছিল সে মরসুমে, মায়ের গাছটিই কেবল টসটসে সবুজ পাতার অলীক মায়া বিস্তার করে, রাশি রাশি মিথ্যে-ফুল ফুটিয়ে সকলের সঙ্গে একটু একটু করে শুকিয়ে গেল।

মায়ের সম্পর্কে আর বেশি কিছু বোঝার দরকারই ছিল না পড়শিদের। দুনিয়ার কোনও অলীক ব্যাপারই এরচেয়ে বেশি প্রমাণ নিয়ে হাজির হয় না সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেব কাছে। সেই থেকে মানুষজন সত্যি সত্যি ভয় পেতে লাগল মাকে। কেবল ছোটকাকা নাকি, একমাত্র, তার স্বভাবসুলভ সাংকেতিক ভাষায় মন্তব্য করেছিল, রাজার মা ডাইনি, আমি কারুকে খাইনি।

ওই মন্তব্যের অর্থ ঠিক-ঠিক কেউ বুঝেছিল কিনা, অন্তত যাদের উদ্দেশে বলা, আমার সঠিকভাবে জানা নেই তা।



আমার যখন সবেমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, তখনও ছোটকাকার বিয়ে হয়নি। তুখোড় ফুটবল খেলোয়াড় তখন সে, চারপাশের টুর্নামেন্টগুলোতে বিভিন্ন দলের হয়ে দাপিয়ে খেলছে। মরসুমে প্রায় রোজদিনই খেপ খেটে বেড়ায় ছোটকাকা, ফরোয়ার্ডে খেলত, সুযোগ পেলেই শোনাত আমাকে, জানিস, যদি একটা গোল দিতে পারি, রাতের বেলায় পোনা মাছের মুড়ো, দু'টো গোল দিতে পারলে মাছ-মাংস দুটোই।

—আর, গোল দিতে না পারলে?

—স্রেফ আলু-পোস্ত আর ডাল। চাটনি অবধি নয়।

তবে, গোল ছোটকাকা দিতই। এমন ম্যাচের কথা কল্পনাও করতে পারে না কেউ, যাতে অন্তত

একখানা গোল দেয়নি ছোটকাকা।

সেই সে একদিন বিমর্ষ মুখে ফিরে এল ম্যাচ খেলে, যেন মনে তার সুখ নেই একতিল। সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের ঘরে।

সকলে তো তাজ্জব! ছোটকাকা ম্যাচ খেলে ফিরে এলে তো পুরো একবেলা, ইচ্ছে থাক চাই না থাক, ওর রানিং কমেন্ট্রি শুনতে হবেই সবাইকে, কেমন করে অবিশ্বাস্যভাবে একের পর এক গোল করেছে সে। পচা ঘোষের থিকে বল পায়া তিনটাকে কাটিয়া, স্রেফ কোমরের মোচড়ে দুটোকে ছিটকিয়া দিয়া বক্সের কাছে পৌঁছিয়া গেছি, হঠাৎ দেখি বাঁ দিক থেকে ছুটিয়া আসিতেছে হারু দত্ত, একেবারে বাজপাখির মতো। ভাবলাম, যদি সোজাসুজি গোলের দিকে দৌড়াই, পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি হারু পাইয়া যাচ্ছে আমাকে। ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিবেই। আমি করলাম কি...। তারপর, ছোটকাকার উত্তেজিত বয়ানে, মেধা, দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয়ে করা সে এক অবিশ্বাস্য, রোমহর্ষক গোল, যার বর্ণনা শুনতে শুনতে ওই বয়েসে কতবার যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে আমার! সেই ছোটকাকা, এসেই শুয়ে পড়ল নিজের ঘরে!

বাড়ির ছোটছেলে হওয়ার সুবাদে, একটা সময় গেছে, যখন বাড়ির সবাইয়ের স্নেহ, আদর এবং মনোযোগ ষোলআনাই পেয়ে এসেছে ছোটকাকা। যদিও ইদানীং, তার চার দাদার ছেলেমেয়েরা জন্মানোর পর, একেবারে ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারছে না, তবুও, না হোক চার-চারটে বউদি তার, আমার মাকে বাদ দিলে তিনজন তো বটেই, তার ওপর বড়পিসি, যদিও বড়পিসির কাচ্চাবাচ্চা নেই, কিন্তু আমাদের সংসারে কোনো শিশু জন্মালে তাকে স্নেহ-আদর বিলোবার সবচেয়ে বেশি অধিকার তো ছিল তারই, তার ওপর আমরা কচিকাঁচারা, ছোটকাকার আদরের ভাইপো-ভাইঝির দল, আমরা তো রয়েইছি। তখনও অবধি ছোটকাকার জন্য কোনো কাকিমা না আসায় আমাদের সব্বাইয়ের অভিভাবকত্বে তার দিন কাটে। কাজেই, কোনো কারণে যদি মুষড়ে গিয়ে থাকে ছোটকাকার মন, তার জন্য অধিক সময় গুমরে গুমরে শোকপালনের অধিকার তার কাছ থেকে কেড়ে নিতাম আমরা।

অতএব, কিস্তিতে কিস্তিতে সবাই যেতে লাগল ছোটকাকার ঘরে, নরমে-গরমে জেরা চলল অবিরাম, এবং এতগুলি ঝানু উকিলের উপর্যুপরি জেরায় একসময় ভেঙে পড়তেই হল তাকে। ছলোছলো চোখে, প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে সে জানাল, গতকালের ম্যাচে একটাও গোল করতে পারেনি, যদিও পাঁচ গোলে জিতেছে তার টিম। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ছোটকাকার ছলোছলো চোখের ভাষাটি এমনই আন্তরিক যে, এক সময় আর অবিশ্বাস করবার উপায় রইল না। ফলে, সারা বাড়ি জুড়ে শুরু হল শোকপালন, এবং যুগপৎ ছোটকাকার দগদগে ক্ষতস্থানটিতে যন্ত্রণাহারিণী নানাবিধ মলম লাগানোর আয়োজন। লাগাতার সমবেদনার পাশাপাশি ছোটকাকার দলের অন্য ফরোয়ার্ডদের স্বার্থপরতা, কিনা ইচ্ছে করেই একটাও গোল করবার মতো বল বাড়ায়নি, বিপক্ষ দলের ডিফেন্সের খেলোয়াড়দের গুণ্ডামি এবং রেফারির পক্ষপাতিত্বের প্রতি বারংবার কটাক্ষের পাশাপাশি ন'কাকার ছোট শালা বারীন, এক আগাপাস্তলা হামবাগ ছোকরা সে, তখন ঘনঘন আসছিল আমাদের বাড়িতে, দুনিয়ার কত রথী-মহারথী খেলোয়াড় জীবনের কতগুলো ম্যাচে একটাও গোল করতে পারেনি, মুখে মুখে সেই তথ্য-পরিসংখ্যান আউড়ে যেতে লাগল, আর, তার এমন অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে জেঠুর বড় মেয়ে, তখনই পনেরো, তার ভালো নাম অপরাজিতা, ডাক নাম মোহর, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বারীনমামার দিকে।

এক সময় ছোটকাকা বিছানা ছেড়ে উঠল, চান-খাওয়া সারল, তারপর আমাদের নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে চলে গেল যমুনা নদীর পাড়ের লাগোয়া খাঁ-খাঁ ধানের খেতে। তখন, আমাদের সেই ছেলেবেলায় যমুনা নদীটি ছিল আমাদের যাবতীয় শোক সন্তাপের আশ্রয়। কোনও কারণে মন খারাপ হলেই আমরা সটান চলে যেতাম নদীটির কাছে!

সন্ধে নাগাদ সারাবাড়ি জুড়ে, মূলত মেয়েদের মধ্যে গুজগুজ-ফুসফুস শুরু হল।

পাড়ার ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলে আমি তখন সবেমাত্র ছোটকাকার সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি, বড়পিসির

একটা মন্তব্যেই বুঝে ফেলি, গতকাল ছোটকাকার গোল না করতে পারার যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার মায়ের ওপর। এবং খেলতে বেরোবার মুহূর্তে মা লুকিয়ে থাকলেও ঠিক কোন্ মুহূর্তে কোন্ অ্যাঙ্গল্ থেকে ছোটকাকার সঙ্গে তার এক ঝলক চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল, এবং বড়পিসি কোন্ অ্যাঙ্গল থেকে তা দেখে ফেলেছিল, ততক্ষণে তার একটা ডগোমগো ছবি আঁকা সারা।

আমি দুরু দুরু বুকে দেখতে থাকলাম, বিশ্বাসটা দাবানলের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সকলের মনে। এবং মা সবাইয়ের দৃষ্টির বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে প্রাণপণে।

আমি জানতাম, ঐ নিয়ে বাড়ির কেউই চোপা করবে না মাকে, সামান্য তিরস্কার কিংবা খোঁটাও নয়, কিন্তু সকলের ওই ঔদার্য মায়ের কোনও কাজেই আসবে না, কারণ, ততক্ষণে মা, সবজি খেতের হলুদ কুমড়ো ফুলগুলোর মতোই, নাগাড়ে জল না পাওয়ার দরুণ নয়, অন্য কোনো রহস্যময় কারণে শুকিয়ে ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছে। মায়ের তখন বাস্তবিক এক জীবন্মৃত অবস্থা। লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতোই অবস্থা তার। এবং আমার কাছেই ছিল তার সবচেয়ে লজ্জা। আত্মজর কাছে হীন হয়ে থাকবার গ্লানিতে একেবারে আচারের মতো জরে যেত মা। আর, জেঠিমা, বড়পিসি ও কাকিমারা ওই আচারটুকু, সবজি খেতের এক কোণে বসে বিকেলের নরম রোদ্দুরে পিঠ পেতে দিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে খেত সবাই মিলে। তাদের জিভে-টাকরায় তৃপ্তির টকাটক আওয়াজ উঠত ঘনঘন। মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিত সামান্য বড় হয়ে ওঠা মোহরদি, এবং সে যেহেতু ওদের কথায় ষোলআনা সায় দিয়ে কথা বলত, কেউ তেমন আপত্তি করত না বড়দের কথার মধ্যে ঢুকে পড়বার জন্য।

তারিয়ে তারিয়ে আচার খাওয়ার পাট চুকিয়ে, সূয্যি ডোবার আগে আগে সবাই যে-যার সবজি ক্ষেতে জল দিত, সার দিত। মা থাকত না ওই দলে। কোনরূপ প্রতিযোগিতাতেই ছিল না সে। কুমড়ো চাষেও সামিল হয়েছিল ওই একবারই। ওই শেষ। তারপরেও ফি-মরসুমে ওরা সবজি খেতে বৈকালিক খেলায় মেতেছে, গাঢ় হলুদ ফুলে ভরে গিয়েছে কুমড়ো লতাগুলি, মা একবারও যায়নি সবজি খেতের আশেপাশে। আর, পরবর্তীকালে, আমি ফি-রাতে, আধাআধি হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে সবজির খেতটি প্রত্যক্ষ করি, খেতের একেবারে শেষ প্রান্তের কুমড়ো লতাটিতে জালিবিহীন শুকিয়ে রয়েছে রাশি রাশি হলুদ ফুল।

রামুদাদা আমাদের বাড়ির বহুদিনের পুরনো মাইন্দার, চাষের কাজে তার আজীবনের অভিজ্ঞতা, একান্তে বলেছিল আমাকে, তোর মায়ের গাছের কুমড়া ফুলগুলার ভেতরটা নখ দিয়া কেউ খুঁটিয়া দিত রোজ। নইলে প্রায় প্রতিটি ফুলই ছিল মাদী। আর গাছটা ছিল সবার চাইতে তরতাজা।

রামুদাদা খুব ভিতু প্রকৃতির মানুষ ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, সংসারে আজীবনকাল পোড় খাওয়া মানুষটি অতিমাত্রায় সতর্ক ও সাবধানী ছিল। আমাদের বিশাল পরিবারের হাজারো স্রোত-প্রতিস্রোত থেকে নিজেকে অতি সাবধানে সরিয়ে রাখবার উদ্দেশে প্রতি মুহূর্তে গুনে গুনে হিসেব কষে পা ফেলতে হয় তাকে। মায়ের কুমড়ো গাছের ফুলগুলোর বুক খুঁটে খুঁটে ফাঁকা করে দেবার গোপন তথ্যটা সে, তাই, প্রকাশ্যে বলতে পারেনি কাউকেই। কেবল আমাকেই, অনেক পরে, আমাকে দিয়ে অনেকগুলো দিব্যি করিয়ে নিয়ে একান্তে জানিয়েছিল।

তাতে করে অবশ্য কোনও লাভ হয়নি আমার কিংবা মায়ের। আর, আমি ওই নিয়ে কোনো ঝড় তোলা তো দূরের কথা, সামান্য উচ্চবাচ্য অবধি করতে পারিনি। একে তো ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জন্মের ঢের আগে, এতদিন বাদে সে কথা খুঁচিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না, তাছাড়া মায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া তিলতিল ওই অত বড় বোঝাটা কেবলমাত্র এক কুমড়ো খেতের বাসি খবর দিয়ে একতিলও হালকা করা যেত না। মাঝের থেকে মায়ের ক্ষতস্থানটা আঁচড় লেগে আরও বিষিয়ে উঠত।



এতদিন বাদে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে বড়পিসিই এসব তিলতিল রটিয়েছিল মায়ের নামে। কিন্তু কেন রটিয়েছিল সেটাই এখনও অবধি আমার কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

হতে পারে, আমার মায়ের রূপ ছিল খুব, আর বড়পিসি ছিল নিতান্তই কুরূপা, মাকে দেখামাত্তর ধন্য ধন্য রব উঠেছিল চতুর্দিকে, হতে পারে, সেই কারণেই, নেহাতই মেয়েলি ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে বড়পিসি বেছে নিয়েছিল ওই কদর্য পথ। হতে পারে, আপন গঙ্গাজলের বোনটিকে ঘরে আনতে না পারার পরাজয় ভুলতে পারেনি বড়পিসি। এই ভাবেই গায়ের ঝাল মেটানো। হতে পারে, ছেলেবেলা থেকে বড়পিসির একেবারে ন্যাওটা, হাতের পুতুল আমার বাবাটি মায়ের অগাধ রূপের মধ্যে ডুবতে চাইছিল, আর, বালবিধবা বড়পিসি, তার ব্যর্থ যৌবনের জ্বালা নিয়ে, এমন সুখকর দৃশ্য সইতে পারেনি মনেমনে। বাবা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে এমন আশঙ্কায় খানিকটে বিষ উগরে দিয়েছিল মায়ের গায়ে। সেই বিষে মা মরল না বটে, কিন্তু চিরকাল জীবন্মৃত হয়ে রইল।

মায়ের বুকের ধিকিধিকি আগুন কখন সেই ছেলেবেলায় চারিয়ে গিয়েছিল আমার বুকের ভেতরেও। আমাদের পরিবারের আরও একজন যে সেই আগুনে আক্রান্ত, সেটা টের পেলাম আরও অনেক পরে।

তখন আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি, একদিন আচমকা আমার হুল্লোড়বাজ ছোটকাকা আমায় একান্তে ডেকে বলল, জলদি জলদি পাশটা কর্ দেখি, চেষ্টা চরিত্র করিয়া একটা চাকরি জুটিয়া লে, তারপর মেজো বউদিকে লিয়া কাটিয়া পড়্। শহরে-টহরে বাসা ভাড়া লিয়া থাক্। আর কতদিন এই্ লরকযন্ত্রণা সইবে উ!

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কোনও কিছুই তিলমাত্র দৃশ্যমান নয়, ঘরের মধ্যে কেউ রয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই, অকস্মাৎ এক পলকের জন্য বিদ্যুৎ চমকাল, ওই আলোয় চকিতে দেখে ফেললাম মানুষটিকে। ছোটকাকার ভেতরটাকে এক ঝলক আলোয় তেমনি করেই দেখা হয়ে গেল আমার। অথচ, খেলাধুলোয়, আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়ে দেওয়া মানুষটি এতাবৎকাল এমন কোনও আভাস দেয়নি যে, তার বুকের মধ্যেও মাকে নিয়ে একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে চিরকাল, গোপনে রক্তাক্ত করছে তাকেও।

ছোটকাকার সেদিনের ওই একান্ত পরামর্শ আমার ভেতরে একটা স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল। স্বপ্নটা সংগোপনে বুকের মধ্যে লালন করতে করতে কলেজের সিঁড়িগুলো ভাঙছিলাম। আচমকা একটা ঝড়ো হাওয়া সবকিছু তছনছ করে দিল। এবং সেই সর্বনাশী হাওয়ার কেন্দ্রমূলে ছিল মোহরদি।

একটা চাকরি অবশ্য কোনো গতিকে জোটাতে পেরেছি আমি, সরকারি দপ্তরে কেরানির চাকরি, দমদমে একখানা কামরা ভাড়াও নিয়েছি, চাকরি করছি, নাইট-কলেজে ল'টাও পড়ছি, কিন্তু ছোটকাকার চকিতের দেখানো স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেবার মতো পরিস্থিতি যখন তৈরি হল, ততদিনে বুকের ভেতর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে স্বপ্নটা, মৌচাকটা ভাঙব ভাঙব বলে যেদিন সময় পেলাম ভাঙবার, সব মধু নিঃশেষে খেয়ে নিয়ে, মৌচাকটিকে ফাঁকা-ফোঁপরা করে, উড়ে গিয়েছে মৌমাছির ঝাঁক।

এখন মায়ের সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয় আমার, গভীর রাতে, একান্তে, তাও তরল পানীয় দিয়ে মস্তিষ্কের সচেতন কলকব্জাগুলিকে অসাড় করে দেবার পর।

জ্বলন্ত মস্তিষ্কটাকে অন্তত কিছুক্ষণের তরে অসাড় করে দেবার জন্য আমি প্রতি রাতে ঘুমের বড়ি খেতে শুরু করেছিলাম প্রথম প্রথম। কিছুদিন বাদে ঘুমের বড়ি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে ঘুম ভেঙে যায়, সারারাত আর আসে না। তার বদলে একটা ক্ষুধার্ত ইঁদুর সারারাত ধরে আমার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলিকে ধারালো দাঁতে কেটে কেটে ছিন্নভিন্ন করে।

সেই মুহূর্তে একদিন প্রাণের বন্ধুরা, অনিন্দ্য, মুকুল, পার্থ, আমার ল' কলেজের বন্ধু তারা, বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, একদিন আমার হাতে ধরিয়ে দিল তরল পানীয়র গ্লাস।

বলল, খা, ভালো লাগবে।

প্রথমটায় আমি খেতে চাইনি, কিন্তু ওদের পীড়াপীড়ির কাছে একদিন আমাকে হার মানতেই হল।

আসলে, ততদিনে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে, তা সে যাই হোক না কেন, কোনওরূপ প্রবল প্রতিরোধ

গড়ে তোলার মতো মনের জোর পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছি আমি। আর সেই হারিয়ে ফেলাটাই হয়ে গেল আমার কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

প্রথম দিনই, দু'পেগ খাওয়ার পর, আমি টের পেলাম, ভেতরে-বাইরে অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছি, ভেতরের জমাট বেঁধে থাকা যন্ত্রণাটা গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। মগজের মধ্যে কেমন অসাড় হয়ে আসছে সবকিছু। বুকের ভেতরের যাবতীয় দুঃখ, ব্যথা, অপমান, অভিমান—তাদের তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে অনেকখানি। বোধ-বুদ্ধি-চেতনা, সবকিছুই কেমন ভোঁতা ভোঁতা লাগছে। আর, সব মিলিয়ে, বহুদিন বাদে খুব ভালো লাগছে আমার।

সেই রাতেই মা এল, গভীর রাতে, আমার এক-কামরার ডেরায়, সেই প্রথম।

তারপর থেকে প্রতিদিন, সন্ধে হলেই, আমি প্রাণপণে জড়িয়ে ধরতে চাইতাম ওই তরল সময়টিকে...ধীরে ধীরে একেবারে মজে গেলাম।

বন্ধুদের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় গলে যাচ্ছিলাম আমি। পরের দিন সেটা প্রকাশ করায় অনিন্দ্য মুখ টিপে হাসে। বলে, বড্ড বকবক করছিলি সারাক্ষণ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে আমার, কী বলেছিলাম আমি? হ্যাঁ রে, কী বলেছিলাম?

—কী সব কুমড়ো-টুমড়োর কথা বলছিলি সারাক্ষণ। আমরা বুঝতে পারিনি।

ততক্ষণে লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি, অনুতাপে পুড়তে লেগেছি নিঃশব্দে। আড়চোখে গভীর সন্দেহ নিয়ে তাকাই অনিন্দ্যর মুখের দিকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে চাই, ওর মুখের কথা বাস্তবিক কতখানি মনের কথা!

তরল পানীয় পেটে পড়লেই, প্রতি রাতে মা আসার আগে, আমার দমদমের এক-কামরার ডেরায় একে একে হাজির হত অনেকেই। জেঠু-জেঠিমা, ...কাকা-কাকিমারা ...নন্দ জেঠা, বাণীবিনোদ কাকা. সবাই, আর, আমার কৈশোরের একান্ত আশ্রয়, যমুনা নদী। মিছিলের একেবারে শেষে থাকত মোহরদি।



মোহরদি আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়।

কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর মধ্যে এমন একটা ডাঁসা-ডাঁসা ব্যাপার ছিল, নিজের জেঠতুতো দিদি বলে মনেই হত না ওকে। আসলে, আমার চোখের সুমুখে খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল মোহরদি। যখন সে সবে প্রাইমারি স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, তখনই ওর চোখের তারায় অচেনা ঝিলিক দেখে মুগ্ধ স্তম্ভিত হয়ে যেতাম আমি।

তখন থেকেই আমাদের বাড়িতে বারীনমামার আনাগোনা। মোহরদির পায়ের গোছ তখন সবে পুরুষ্টু হতে শুরু করেছে, গালের ত্বক পাকা জামরুলের মতো স্বচ্ছ হয়েছে, যখন-তখন ঠোঁট উলটে আহ্লাদীপনা রপ্ত করছে সে, আর, ওই যে, দু'চোখের তারায় ওই অচেনা ঝিলিক। তখন কথায় কথায় খিলখিলিয়ে খুব হাসত মোহরদি, হাসতে হাসতে খুব লীলায়িত ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়তে পারত। ওই সময় থেকেই তার ঘন ঘন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে থাকবার শুরু। এবং মাঝে মাঝে ঝোলা ফ্রকের কুঁচি দু'হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরত। ততদিনে তার ফ্রক ঠেলে উঁকি মারছে একজোড়া পদ্মচাকি বুক।

বারীনমামা আমার ন'কাকির ছোট ভাই, মাঝারি গড়ন, মাথার চুল এবং চোখের মণি কটা রঙের, তাতে করে ওকে খুব চোখে-মুখে লাগে। ক্লাস টেনেই পড়া ছেড়েছে ও। তখন পুরোপুরি বেকার, যদিও সারাক্ষণ তার চোখেমুখে লেপটে থাকত ব্যস্তসমস্ত ভাব। যে ক'দিন আমাদের বাড়িতে এসে থাকত, এমন একখানা ভাব করত যেন ওর দেশের গাঁয়ে-ঘরে, ওর ওই স্বল্প অনুপস্থিতির কারণে, বিশ্ব-সংসারটা থেমে রয়েছে। অবশ্য সেজন্য যে সাত-তাড়াতাড়ি ফিরে যেত তা নয়, কিন্তু যতদিন থাকত, সারাক্ষণ হা-হুতাশ করত এই বলে যে, তার ওই থেকে যাওয়াতে শুধু তাদের পরিবারেরই নয়, পুরো তল্লাটের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার হরেক কৌশল ওই বয়েসেই আয়ত্ত

করেছিল বারীনমামা।

দুনিয়ার প্রায় সব বিষয়েই তার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য মজুত থাকত সর্বদাই। দেশ-বিদেশের প্রতিটি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় এবং তাঁদের সম্পর্কে প্রচুর গোপন তথ্য তার কণ্ঠস্থ ছিল।

বারীন মামার এইসব 'প্রতিভা' নিয়ে সব চেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল মোহরদির। এবং যেহেতু আমরা ছোট ছিলাম, বারীনমামা আমাদের তেমন একটা পাত্তা দিত না কোনওকালেই, আমরা তার অর্ধেক কথাও বুঝে উঠতে পারতাম না। কেবল মোহরদিই নাকি ঠিকঠিক বুঝত বারীনমামার যাবতীয় ব্যঞ্জনামণ্ডিত কথা। মোহরদি নয়, বারীনমামাই দাবি করত তেমনটা। কোনো গূঢ় তত্ত্ব উচ্চারণ করেই বারীনমামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলত, তোরা ওসব বুঝবিনি। মোহর ঠিকই বুঝেছে। এবং তার জবাবে মোহরদি এমন গূঢ় দৃষ্টিতে তাকাত আমাদের দিকে, দেখা মাত্রই আমাদের যা কিছু সংশয় ঘুচে যেত।

দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞানের কথা নিয়ে বারীনমামা আর মোহরদির এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারটা তলে তলে কত দূর অবধি ব্যাপ্ত হয়েছে, আমরা ছোটরা তার নাগাল পাইনি দীর্ঘকাল। শুধু লক্ষ করতাম, মোহরদি বারীনমামা বলতে অজ্ঞান। আমাদের মধ্যে যে-কোনো বিষয়ে তর্ক উঠলেই বলে ওঠে, বিশ্বাস না হয় বারীনমামাকে জিজ্ঞেস করিস।

কিছুদিন বাদেই লক্ষ করলাম, বারীনমামার ওপর রীতিমতো জুলুম করছে মোহরদি। বারীনমামা যে-কদিন এসে থাকে আমাদের বাড়িতে, তখন আসছিলও ঘনঘন, থাকছিলও বেশিদিন, মোহরদি সারাক্ষণ ওকে, 'এটা করিয়া দাও, ওটা আনিয়া দাও, সেটা বলিয়া দাও' করতেই থাকে। তার ফরমায়েশের বুঝি অন্ত নেই। দেখতে দেখতে আমাদেরই বিরক্তি ধরে যেত, কিন্তু অবাক কাণ্ড এই যে, বারীনমামা তিলমাত্র বিরক্ত বোধ করত না, বরং মোহরদি যতই জুলুম চালাত, বারীনমামার মুখখানি ঠিক নতুন আধুলির মতো চকচক করে উঠত।

মোহরদি তখন নাইন কি টেনে পড়ে। হাইস্কুলটা ছিল মাইল দেড়েক দূরে, আমাদের গাঁয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে। মোহরদি হেঁটেই যেত স্কুলে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে, একটা জব্বর ভাতঘুম লাগিয়ে, সাড়ে তিনটে নাগাদ বারীনমামা ন' কাকার সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে যেত গ্রাম পরিক্রমায়।

তেমনই একদিন, পড়ন্ত বিকেলে, মোহরদিকে সাইকেলের রডে বসিয়ে নিয়ে ফিরে এল বারীনমামা। তার নিজস্ব বয়ানে, শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে ফিরতেছিলাম, দেখি, মোহর হাঁটিয়া হাঁটিয়া ফিরছে, তুলিয়া লিয়া আইলাম।

শুধু মোহরদিরই নয়, বারীনমামা জেঠু-জেঠিমারও অনেক ফ্যাক খেটে দিত। তার ওপর মোহরের প্রতি এতখানি স্নেহ-সহানুভূতি দেখতে দেখতে মনটা গলে গেল জেঠু-জেঠিমার। আর, বারীনমামা যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরকে দু'বেলা পড়িয়ে দিতে লাগল, জেঠিমা একেবারে গলে জল। জেঠু-জেঠিমার কাছে বারীনমামার কদর গেল বেড়ে। তাতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বারীনমামা রোজ বিকেলে পাঁইপাঁই সাইকেল চালিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরোতে লাগল, একটুবাদে মোহরদিকে রডে বসিয়ে নিয়ে ফিরে এল। হপ্তাটাক বাদে মোহরদিই একদিন বায়না ধরে বসল, ও বারীনমামা, আমার আজ দেরি হয়্যা গেছে খুব, সাইকেলে একটুখানি পৌঁছিয়া দাও না গো। ফলে, এটাও একটা দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়াল বারীনমামার।

ভাইবোনদের মধ্যে মোহরদির পরেই আমি সবার বড়। ওই বয়েসেই কেমন করে যেন টের পেতাম, মোহরদি আর বারীনমামার মধ্যে একটা রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে অতি সংগোপনে, এবং একেবারেই অন্তঃসলিলা সেই সম্পর্ক। ওই বয়েসে এ-ও জেনে গিয়েছিলাম, দু'জনের সামাজিক সম্পর্কের নিরীখে সেটা অন্যায়, পাপ, সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। অথচ কথাটা আমি খুলে বলতে পারলাম না কাউকেই। আমার ভয় করল, যদি মামা-ভাগ্নীর পবিত্র সম্পর্ক নিয়ে একটা পাপ চিন্তা মনে এসেছে বলে সবাই আমাকে তিরস্কার করে, ধিক্কার দেয়!

একদিন মোহরদিকে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল বারীনমামা।

সারা পরিবারের মাথায় যেন সশব্দে বাজ পড়ল।

ভীষণ বড়লোক না হলেও বিভিন্ন কারণে গাঁয়ে একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল আমাদের। সেই একযুগ আগে বরের সঙ্গে খড়্গপুরে গিয়ে বিলাসীপিসির আর কোনওদিন না ফেরার ঘটনাটা বাদ দিলে, সেই মর্যাদায় টোল পড়েনি তখনও অবধি। কাজেই দাদু, জেঠু, সেজকাকা, ন'কাকা—সকলেই গাঁয়ের বিচার-আচারে, উৎসবে-পার্বণে প্রথম সারিতেই থেকেছেন চিরকাল। মহীরুহ গাছের মতো মাথা উঁচু করেই বাস করেছেন তাঁরা। আচমকা একটি ঝড়ো হাওয়া প্রায় সবক'টি গাছের মগডালগুলিকে ভেঙেচুরে মাটির ওপর আছড়ে ফেলল।

চিরকাল মাথা উঁচু করে হাঁটা মানুষগুলো এক লহমায় যেন লজ্জায়-ঘেন্নায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। আর, তখনই বোঝা গেল, মায়ের ব্যাপারে সবাই একজোট থাকলেও, তলায় তলায় প্রত্যেকের মনে পরস্পরের প্রতি কুটিল চোরাস্রোত বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। ফলে, ন'কাকিমা তার 'ভোলেভালা' ভাইটিকে 'চিবিয়ে খাওয়ার' অপরাধে দিনরাত কেঁদে কঁকিয়ে, মোহরদি আর তার গর্ভধারিণীকে নিরন্তর অভিশম্পাত করে, এবং ভগবান 'যিনি দিনকে রাত করেন' এবং ওপর থেকে দেখতে পেয়েছেন সবকিছু, তাঁর ওপরেই শেষ বিচারের ভার অর্পণ করে খেলাটাকে জমিয়ে দেয়। অন্যদিকে সেজো কাকিমা তার সাড়ে-পাঁচ বছরের 'বড় হতে থাকা' মেয়েটির ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কিত হতে হতে এবং 'আগের হালুয়া যে পথে যায়/পরের হালুয়াও সেই পথে যায়' গোছের আপ্তবাক্যে মতি রাখবার ছলে, বিষয়টাকে নিয়ে ক্রমাগত চটকাতে থাকে, ঠিক যেমন করে আঙুলের ডগায় নিয়ে মনের সুখে আচার চটকায় গর্ভিণী রমণীরা। আর, বালবিধবা বড়পিসি, আজীবন অতৃপ্ত, অভুক্ত সেই রমণীটি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার যে-কোনও সুখ-সম্ভোগই যার বুকের মধ্যে চিরকাল ঈর্ষার আগুন জ্বেলে দেয়, প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল, মোহরের মতো একজন উঠতি যুবতী আচমকা একটা শক্ত-সমর্থ পুরুষ পেয়ে যাওয়াতে, যে বয়েসে স্বামীকে হারিয়ে বড়পিসি রাতের পর রাত অভুক্ত থেকেছে। বাহ্যত, বড়পিসি ভাইদের পরিবারের মানসম্মান ধুলোয় লুটোনোর চেয়েও মামা-ভাগ্নীর মতো পবিত্র সম্পর্কটি যৌনসম্ভোগের দ্বারা কলুষিত হওয়ার মহাপাপে মোহর, বারীনমামা এবং তাদের নিকট আত্মীয়দের কী কী সর্বনাশ হতে পারে তার নতুন নতুন তালিকা বানাতে লাগল রোজ। আর, তিন দিক থেকে ক্রমাগত সাঁড়াশি আক্রমণে জেঠিমা আচমকা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। দিনে দিনে তিন ঈর্ষাতুর রমণীর বিদ্বেষ এতখানি উথলে উঠতে লাগল যে, খুব মিনমিনে গলায় 'এক হাতে কি তালি বাজে' গোছের বালির বাঁধ দিয়ে তাকে কিছুতেই আটকাতে পারল না জেঠিমা। তার যাবতীয় আশঙ্কা ধীরে ধীরে আতঙ্কে পরিণত হচ্ছিল এই কারণে যে, বড়পিসির পেশ করা তালিকার সর্বপ্রথম সর্বনাশটির আশঙ্কা তো জেঠু-জেঠাইমাসহ পরিবারের সকলেই করছিল, আবার না বিলাসীর দশা হয় এই মেয়েটারও। তাকেও তো বিয়ে করে ঘরে তুলেছিল এমনই এক উড়নচণ্ডী ছন্নছাড়া পাষণ্ড, তার খেসারত তো মেয়েটাকে দিতে হল সারাজীবন ধরে। আবার না ওই বিয়োগান্ত নাটকটির পুনরাবৃত্তি ঘটে এ সংসারে! এবং যেহেতু জেঠুই বিলাসীপিসির বিয়ের ব্যাপারে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' তত্ত্ব অনুসারে জেঠু-জেঠিমাকেই না তার চরম খেসারত দিতে হয়!

দিন কতক বাদে খবর পাওয়া গেল দু'জনের। একেবারে কালিঘাটের মন্দিরে মালাবদল পর্ব সেরে মোহরদি'কে ঘরে তুলেছে বারীনমামা। সুখেই নাকি ঘরকন্না করছে ওরা।

শুনেই সারা তল্লাটে টি-টি পড়ে যায়। বড়পিসি 'অমন কামুকী, বিকৃত সুখের মুখে' ঝাঁটা মারবার ইচ্ছে প্রকাশ করতে থাকে ঘনঘন। এবং মোহরদি ও বারীনমামার দেহজ সম্পর্ককে একজাতের চতুষ্পদ প্রাণীর ভাদ্র মাসের আচরণের সঙ্গে তুলনা করে বারবার। ন'কাকিমা মাঝে মধ্যে, বিশেষ করে বাড়িতে কোনো পাড়া-পড়শি কিংবা বাইরের লোকের আমদানি হলে, বিনা নোটিশে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে প্রকাশ্যে, কেন কি, সোনার টুকরো ভাইটি তার, কত জায়গা থেকে কত শাঁসালো সম্বন্ধ এসেছিল, সোনাদানা, ফার্নিচারে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল ঘর, কিন্তু এমন এক কুহকিনী, কালনাগিনীর পাল্লায় পড়ল

যে, তার জীবনটা একেবারে 'বরবাদ' হয়ে গেল!

জেঠিমা এমনিতে খুব ঝগড়াটে স্বভাবের চিরকাল, কিন্তু মোহরদির ব্যাপারে ননদ-জা'দের যাবতীয় অভিযোগ ও গঞ্জনা মুখ বুজে সয়ে যেত। আর, জেঠু, চিরকাল সংসারের সবাইয়ের ওপর হম্বিতম্বি করা যার স্বভাব, চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াত সারাক্ষণ। বহুদিন বাদে সেই প্রথম মনে হল, জেঠিমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে আমার মা। ঠিক তেমনই অপরাধী চোখ-মুখ, মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়বার প্রবণতা, আর দু'চোখের কোণে জমে থাকা পিচুটির তাল। অথচ, এতদিন বাদে আমার মনে হয়, এমন করে চোরের মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখবার কোনও কারণই ছিল না জেঠিমার। কেন জেঠিমারই এত লজ্জা, অপরাধবোধ? উলটোটাও তো হতে পারত। জেঠিমা তড়পাত, অভিশম্পাত দিত, আর ন' কাকিমা, তার গুণধর ভাইটির 'সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর' কারণে লুকিয়ে বেড়াত চোরের মতো! সম্পর্কে মামা হয়ে একটা 'ফুলের মতো নিষ্পাপ' মেয়েকে, যে কিনা তার ভাগ্নী, ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার এবং বিয়ে করবার পাপ সহোদরের সঙ্গে সঙ্গে তার দিদির সর্বাঙ্গেও তো জড়িয়ে যেতে পারত! কারণ, তার সহোদরের যাবতীয় কুকর্মের দায় তো তাকে বহন করতেই হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সারা গাঁয়ের মানুষ এতবড় একটা কেলেঙ্কারির জন্য বারীনমামাকে বড় একটা দোষারোপ করল না। কেন কি, 'উঠতি বইসের ছোকরা সে, একেবারে আগুনের মতো গনগনাচ্ছে, ঘি পাইলে সেই আগুন তো দাউদাউ করিয়া উঠবেই।' তাবাদে, চিরটাকাল, সেই শাস্ত্র-পুরাণের যুগ থেকেই, পুরুষরা তো নিষ্ক্রিয়ই থাকে, নারীরাই তো সক্রিয়। সেই কারণেই মনু থেকে শঙ্করাচার্য অবধি তাদের নরকের কীট বলেছেন। তারা পুরুষকে ঘি-ঢেলে জ্বালায়, উসকায়, বিপথগামী করে। ঋষি বিশ্বামিত্র তো ধ্যানই করছিলেন, মেনকাই তো বারবার সুমুখে লেচেকুঁদে তাঁকে উসকাচ্ছিল। ঘোর শূচিবাই অঘোরনাথ চক্রবর্তী, আমাদের কুল-পুরোহিত, কপালের তাবৎ বলিরেখায় ঢেউ তুলে বলেছিলেন, শিব আর কালীর আচার-আচরণটাই দ্যাখ না হে। শিব, তিনি ভোলা মহেশ্বর, নিষ্ক্রিয়, ভূমিশয্যায় শায়িত, তার বুকের ওপর নৃত্য জুড়েছে কালী। খাটোগলায় সমবয়েসীদের একান্তে বলেছিলেন, জান তো, পুরুষদের চাইতে মেয়েদের আটগুণ বেশি কাম। সতীকান্তর মেয়াটা শঙ্খিনী জাতের। শঙ্খিনী নারীদের কাম সবচাইতে বেশি।

বাণীবিনোদ-কাকা শুনে বলেছিলেন, দাদার আর দোষ কি! হাজার হাজার বছর ধরিয়া মেয়েদের সম্পর্কে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এসব প্রচার চালানো হয়েছে। আসলে, যেদিন উৎপাদনব্যবস্থা থেকে মেয়েদের হটিয়ে দেওয়া হইল, তাদের কেবল সন্তান উৎপাদন ও পালনের মেসিন বানিয়ে দেওয়া হইল, সেদিন থেকেই মেয়েদের লাঞ্ছনার শুরু। মেয়েরা বহির্বিশ্বকে দেখিয়া ফেললে, আরও দেখতে চাইলে, ঘরের বাইরে বারাইতে চাইলে, সন্তান উৎপাদন ও পালনের কারখানাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়্যা যায়। কাজেই, আমদানি হইল, মেয়েদের তরে, হাজার কিসিমের নীতি-নিয়মের বেড়ি, শুধু তার শরীরে নয়, তার ভাবনা-চিন্তায়, হৃদয়ে-মগজে...। সন্তান উৎপাদন তো ভারী এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল সেকালে। অনেক মানুষের তখন প্রয়োজন ছিল সমাজে। তো, মানুষ তার প্রয়োজনের সামগ্রীগুলিকে তৈরি করিয়া লিবার জন্য কারখানা বানিয়েছে যুগে যুগে। তার জন্য মেসিনপাতি বসিয়েছে। মেয়েরাও সে যুগে ছিল শিশু নামক এক অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের মেসিন। আর, মেসিন যদি বলে, আমি কারখানার মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া মালিকের সঙ্গে সঙ্গে তালে তাল মিলিয়া, দুনিয়াময় ঘুরিয়া বুলবো, তো সেটা সহ্য করবে মালিক? একটা কারখানার মেসিনসহ সবকিছু যেমন মালিকের সম্পত্তি, ঠিক তেমনই মেয়ারাও সে যুগে হয়্যালো পুরুষের কারখানার অনেক কিসিমের সম্পত্তির মধ্যে একটি। সম্পত্তিকে তো কেবল ভোগই করা চলে। আসলে, সে-যুগে বাঁচিয়া থাকবার জন্য খাদ্যসংগ্রহ করাটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষের মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন জড়িত ছিল তার সঙ্গে। তখন বাহুবলই ছিল মানুষের প্রধান বল। তো, একে তো অধিক বাহুবলের অধিকারী, তার উপর দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহ করার সুবাদে পুরুষই হয়্যালো একটি গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি। যখন পরিবারপ্রথা চালু হইল, একই কারণে, পুরুষই হইল পরিবারটির মাথা। মালিক। অন্যরা সব আজ্ঞাবহ। কারণ সে খাদ্য জোগায়, এবং তার শরীরে শক্তি বেশি। তো, মনিব-চাকর বিবাদে কবে আর মনিবেরা দোষ স্বীকার করেছে! যত দোষ

তো অধস্তনর। সুখ-সম্ভোগ ভাগাভাগির প্রশ্নে কবে আর সাম্য থাকে মালিক-চাকরে! কাজেই, স্ত্রী মরিয়ালে স্বামী আবার বিয়ে করবে, কিন্তু স্বামী মরিয়ালে স্ত্রী আজীবনকাল কৃচ্ছ্রসাধন করবে। স্বামী তিন-চারটা বিবাহ করবে, একাধিক বাঁঢ় পুষবে, আর, স্ত্রী পর-পুরুষের দিকে তাকানো মাত্তর তাকে কুলটা আখ্যা দিবা হবে। এই সমাজে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকবার যাবতীয় দায় তো কেবল মেয়াদেরই! পুরুষের সে দায় কেনই বা থাকবে! সে যে মালিক। সমাজের, সংসারের চালক। তার কোনো দোষই তো দোষ নয়।

বাণীবিনোদ-কাকা, চিরকাল গ্রামে পড়ে রয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সামান্যই, এমন একজন মানুষের মুখ থেকে মাঝে মাঝে এমন দুরুহ কথা বেরিয়ে আসত, কতবার শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি আমি।

বাণীবিনোদ-কাকা কথাগুলো মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কথা, স্মৃতি, মনের দরজায় মৃদু মৃদু টোকা মারতে থাকে। কত কালের কথা সেসব, কতকালের স্মৃতি, মনের মধ্যে এতদিন কোথায় ছিল এরা, কেন ছিল!

মদ খাওয়ার একটা মজা হল এই যে, মনটা ফুটন্ত জলের কড়াই হয়ে যায়। তখন তলার তাবৎ জল ঠেলে উঠতে থাকে ওপরে, আর ওপরের জল ডুব মারে তলায়। বাস্তবিক, মদ যেমন অনেক স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়, পাশাপাশি, মগজের বাক্সটার একেবারে তলায় সেই পাতাল প্রদেশে দৃষ্টির অগোচরে পড়ে থাকা কথা, স্মৃতি, হযতো বা দীর্ঘ অবহেলায় পুরু ধুলো জমেছে ওদের শরীরে, ভুসভুস করে ভেসে উঠতেও থাকে। সেসব স্মৃতি যে কবে জমেছিল, এত অবহেলা নিয়ে কেনই বা, কার স্বার্থে এতদিন থিতু ছিল মগজে, ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাই আমি। ইদানীং রোজ রাতে, সামান্য পান করলেই, ওরা ভুসভুস করে ভেসে উঠতে থাকে. ঠিক যেমন করে গাঁয়ে-ঘরে শত্রুতা করে কেউ কারোর পুকুরে ফলিডল জাতীয় কীটনাশক ঢেলে দিলেই জলের তলার সমস্ত মাছ, মরা, আধমরা, ভেসে ওঠে ওপরে। কিংবা, গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা ইঁদুরের মতো পুরনো, পচা, অজীর্ণ, অদাহ্য স্মৃতিগুলো এতদিন বাদে খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে।

তখন ভাবনার রশির ওপর হাঁটতে থাকি আমি। হেঁটে মজা পাই।

ভাবনার রশির ওপর হাঁটবার মধ্যে যেমন ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি, এক ধরনের মজাও রয়েছে তাতে। এক নম্বর মজা হল, রশির ওপর একবার হাঁটতে শুরু করলে এক পলকের জন্যও থামা চলে না। থামলেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার ভয়। কাজেই, একবার শুরু করলেই এক পা অন্য পা'কে ক্রমাগত উসকাতে থাকে। তখন এক হাঁটা থেকে দু'হাঁটা, দু'হাঁটা থেকে তিন হাঁটা, হাঁটি হাঁটি পা-পা, চলতেই থাকে ভাবনার হেঁটে চলা। যেমন, শত্রুতা করে কীটনাশক ঢেলে দিলে মাছের ভেসে ওঠা জাতীয় উপমাটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে চাগিয়ে দেয় অবশ্যম্ভাবী পরের প্রশ্নটিকে, কিনা স্মৃতিগুলোকে পুকুরের মাছের মতো ভাসিয়ে দেবার জন্যই কি তবে কীটনাশক ঢেলে দেবার ভঙ্গিতে গলায় রোজ রোজ মদ ঢেলে দিই আমি? তাহলে, একই সুতোয় বাঁধা পরের প্রশ্ন, কারো সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যই কি গলায় বিষ ঢালি আমি নিত্যিদিন? যদি তাই হয়, তবে কার সঙ্গে আমার সেই শত্রুতা?

এইখানে আমার ভাবনার একটা ছোট্ট স্টপেজ, কেন না, শেষের প্রশ্নটা এক জাতের ধন্দ তৈরি করে দেয় মনে। এক কথায় এর জবাব মেলে না। একবার মনে হয়, বড়পিসি ও জেঠিমা-কাকিমাদের সঙ্গেই শত্রুতাটা। কখনও মনে হয়, মায়ের সঙ্গেই, কারণ, সে-ই আমাকে উপহার দিয়েছে এই আশৈশব ক্ষতস্থানটি। কখনও বাবাই সেই ভিলেন, যিনি অগ্নিসাক্ষী করে নিজস্ব স্ত্রীলোকটিকে সবদিক থেকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিলমাত্র কথা রাখেননি। মায়ের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি মুখর হলে কী হত বলা যায় না। কখনও বা মনে হয়, সেটাই বেশি বেশি করে মনে হয় ইদানীং, আমার যাবতীয় শত্রুতা বুঝি স্রেফ নিজের সঙ্গেই। নিজেকে তিলতিল ধ্বংস করে ক্ষতস্থানগুলি থেকে তীক্ষ্ণ চিমটে দিয়ে কাঁটাগুলোকে টেনে তুলতে তুলতে আমি নিজের প্রতিই নির্মম প্রতিশোধ নিতে থাকি বুঝি। ওই প্রতিশোধ নেবার মধ্যে একধরনের দাদচুলকোনো আনন্দ রয়েছে, যার প্রথম পর্বে তৃপ্তি, দ্বিতীয় পর্বে

জ্বালা।

এই যে যন্ত্রণাকর স্মৃতিগুলোকে রোজ রোজ মনের পাতালপ্রদেশ থেকে ভেসে উঠতে বাধ্য করা, বারোয়ারি আড্ডায় হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে নয়, একা একা বসে, একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পান করলেই তেমনটা ঘটে। তখন বর্তমানটা একটু একটু করে ভোঁতা, ঝাপসা হয়ে এলে, মনটা আস্তে আস্তে করে ডুব দিতে থাকে পাতালে। আর, পাতালের হিমশীতলতার মধ্যে বহুকালের ওই শ্যাওলা জমা সিন্দুকটার ডালা অল্প অল্প করে খুলে যায়। তখন সিন্দুকের মধ্যে হাত নামিয়ে দিলেই ছোঁয়া লেগে যায়, হঠাৎ-হঠাৎ এমন সব সামগ্রীর শরীরে, যার অস্তিত্বটাই পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

আমি তাই একা একাই পান করতে ভালোবাসি। তাতেই অধিক নিরাপদ বোধ করি। হৈ-হুল্লোড়ে আড্ডায় বসে পান করাটা আমার অসহ্য ঠেকে। আগেই বলেছি যে, মদের একেবারে প্রেমে পড়ে গিয়েছি আমি, আর, আমার বিশ্বাস, প্রেম করতে হয় নিভৃতে। চারপাশের হাজাবো ঝড়ো হাওয়ার থেকে তাকে সংগোপনে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। প্রেম করতে গিয়ে, মনের একান্ত কথাগুলিকে প্রকাশ্যে উচ্চকিত ভাষায় উচ্চারণ করাকে আমার বেহায়াপনা বলে মনে হয়। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আমার এক ধরনের চাপা মনোমালিন্য রয়েছে। তারা আমাকে তাদের আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কতই না সাধ্য-সাধনা করে। আমি কিছুতেই যাইনে। একেবারে প্রাণের বন্ধুদের দু'এক জন, অনিন্দ্য, মুকুল, পার্থ, যেদিন ক্বচিৎ আমার দমদমের ডেরায় চলে আসে, আমি দেখেছি, সন্ধেটা আমার বরবাদ হয়ে যায়। ওদের নিয়ে আসরটা বসাই বটে, কিন্তু সারাটা সন্ধে ওদের সঙ্গে আমাকে জলের ওপর ভেসেই থাকতে হয়। ডুব দেওয়াটা আব কিছুতেই হয়ে ওঠে না সেদিন, ডুব দিতে ভয় করে, বড়সড় ক্ষতি হয়ে যাবার ভয়। কাজেই, সেই সন্ধেয় মান্ধাতার আমলের শ্যাওলা জড়ানো সিন্দুকটার মধ্যে হাত চারিয়ে ছোঁযা যায় না কত কালের সেই সামগ্রীগুলোকে। আর, মদ খেয়ে ভেসে থাকা, সে যে কী কষ্টকর অভিজ্ঞতা, পান করবার আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যায়। সব চেয়ে বড় কথা, মা আর সে রাতে আসে না। আমিও সারা সন্ধে ভেসে ভেসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বন্ধুরা চলে যাওয়া মাত্তর ঘুমিয়ে পড়ি।

অনিন্দ্যর অভিমানটাই সবচেয়ে বেশি। সেই কলেজ জীবন থেকেই সে আমার প্রাণের বন্ধু, আমার অনেক সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনার সহমর্মী, সাথী, যদিও আমার নিরন্তর বয়ে বেড়ানো ক্ষতটাকে এ যাবৎ একবারের তরেও দেখাইনি তাকেও। এমনিতে ওর সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোই লাগে আমার, মনের ক্ষতগুলোতে সামান্য প্রলেপ জমে। কিন্তু পান করবার সময় আমি যে তার সঙ্গ চাই নে, সহ্য করতে পারি নে, ওকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য হাজারো কৌশলের আশ্রয় নিই, এটা বুঝতে পেরে, মনে মনে বড়ই কষ্ট পায় ও, বুকের মধ্যে পলির মতো পুরু অভিমান জমে। আমি ওকে বোঝাতে পারিনে, কেন সবার সঙ্গে পান করায় আমার এতখানি আপত্তি, খোলসা করে বলতে পারি নে, কেন সর্বসমক্ষে পান করা আমার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। ফলে, আমাকে আরও জটিল হয়ে উঠতে হয়, রহস্যময় আচরণ করতে হয়, তাতে করে ওর কষ্টটা আরও বেড়ে যায়। আর ওর কষ্ট দেখতে দেখতে আমিও দগ্ধে দগ্ধে মরি।

ছোটকাকা একদিন আচমকা একটা স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল বুকে। একটা চাকরি-বাকরির জোগাড় করে নিয়ে মেজো বউদিকে লিয়া চলিয়া যা, শঙ্কর, শহরে বাড়ি ভাড়া লিয়া মা-ব্যাটাতে থাক্। সেখানে হাজার জনের মধ্যেও মানুষ বড় একা, কেউ কারোর খোঁজ রাখে না, এক-একটি দ্বীপ সবাই, এক-একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র দ্বীপ। সেই স্বপ্নটা বড় নিটোল হচ্ছিল বুকের মধ্যে, আচমকা একদিন মোহরদি ফিরে এসে স্বপ্নটাকে খান খান করে ভেঙে দিলে।

মোহরদি চলে যাওয়ার পর জেঠিমা প্রকাশ্যে গুম মেরে গেলেও আমি একাধিকবার দেখে ফেলেছি, আড়ালে মেয়ের জন্য চোখের জল মোছে সে। বড়পিসিও মোহরদির জন্য মাঝে মাঝেই হা-হুতাশ করতে লাগল। হাজার দোষ করলেও, মোহরদি যেখানেই থাকুক সুখে থাকলেই যে ওরা খুশি, সেটা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগল বারবার। এবং 'কুপুত্র যদিচ হয়, কুমাতা কদাপি নয়', গোছের প্রবাদ-প্রবচন ওদের মুখে খইয়ের মতো ফুটতে লাগল দিনরাত।



বিয়ের মাস ছয়েক বাদে মোহরদি আর বারীনমামা একদিন যুগলে এল আমাদের বাড়িতে।

সারা গাঁয়ে আর একপ্রস্থ ঢি-ঢি পড়ল।

ভেবেছিলাম, জেঠু-জেঠিমা কালসাপের মতো ফুঁসে উঠে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নিঃশব্দে মেয়ে-জামাইকে বরণ করল ওরা।

মোহরদিকে খুশিতে একেবারে ডগোমগো লাগছিল। অপরাধবোধের প্রাথমিক অস্বস্তিটা কেটে যাওয়ার পরপরই সে ঘটা করে আঁকতে বসল তাদের দাম্পত্যজীবনের ডগোমগো ছবি। তার ছবি আঁকা আর ফুরোয় না।

প্রথম দিনটা এভাবেই কাটল। ততক্ষণে আমরা বড়দের নানা টুকরো-টাকরা কথাবার্তার সূত্র ধরে জেনে গিয়েছি যে, জেঠু-জেঠিমা এবং বড়পিসিরাই গোপনে যোগাযোগ করেছিল মোহরদির সঙ্গে। যথাযথ অভয় দিয়ে এও জানিয়েছিল যে, যদিও ওদের এমন দুষ্কর্ম তাদের সামাজিক মানমর্যাদার অনেকখানি ক্ষতি করেছে, তবুও তারা মোহরদি এবং বারীনমামাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, কেন কি, যা হবার তাতো হয়েই গেছে, নিয়তির লিখন তো কেউ খণ্ডাতে পারে না, অতএব অযথা রাগ পুষে রেখে কী লাভ! মোহরদি নির্ঘাৎ মনে মনে মুখিয়ে ছিল, প্রিয়জনদের জন্য হয়তো বা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মনে মনে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে যুগলে।

খবর পেয়ে পাড়া-পড়শি ঝেঁটিয়ে এল নতুন বর-কনেকে দেখতে। জেঠু-জেঠিমাদের মনোগত ইচ্ছেটা সম্ভবত তাদেরও অজানা ছিল না, কাজেই, নতুন দম্পতিকে দেখতে এসে তারা প্রায় প্রত্যেকেই আবিষ্কার করে ফেলল যে, বর-বধূকে সুন্দর মানিয়েছে।

দ্বিতীয় রাতে ভুরিভোজন সেরে মোহরদি আর বারীনমামা শুলো দোতলার দক্ষিণমুখো ঘরটাতে। মাঝরাত থেকে বমি শুরু হল বারীনমামার। ভোরের আগেই সারা গা হিম হয়ে এল। সকালবেলায় হাসপাতালে যাওয়ার পথেই উর্ধ্বলোকে চলে গেল সে।

থানায় কেউ খবর দিয়েছিল। কে দিয়েছিল আজ অবধি জানি নে আমি। দুপুর নাগাদ পুলিশ এসে দাহ কববার আগেই লাশ আটকাল। পোস্টমর্টেমে জানা গেল, পেটে পাওয়া গেছে সেঁকো বিষ। তদন্ত শুরু হল জোর কদমে। এই পরিবারে সেঁকো বিষ থাকত কেবল বাবারই জিম্মায়। কবিরাজি ওষুধ বানাতে ব্যবহার হত ওই বিষ। বাবার অন্তে সেই বস্তু মায়ের হেফাজতেই থাকবার কথা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, মেয়ে-জামাইযের শোকে কেঁদে বুক ভাসাতে ভাসাতে, জেঠিমা আর বড়পিসি ফাঁস কবল এমন সব খবর, সেই ফাঁস এমনই শক্তপোক্ত, তাতে একেবারে পরিত্রাণহীন আটকে গেল মা। পুলিশ একটা ফাঁকা শিশি পেল, যার মধ্যে পাওয়া গেল সেঁকো বিষের গুঁড়ো। কোথায় গেল তবে শিশির মাল, এমন প্রশ্নটা জেঠিমা কিংবা বড়পিসি উসকে দেওয়া মাত্তর পুলিশ এক হাতে লুফে নিল ক্যাচ। কেউই তেমন কবে ভাবল না যে, বাবা বর্তমানেই শিশিটা খালি হয়ে যেতে পারে। জেঠিমা ও বড়পিসি এও জানাল যে, তারা মাকে, খাওয়া-দাওয়ার পর এক ফাঁকে দোতালায় গিয়ে দ্রুত নেমে আসতে দেখেছে। যেহেতু তার আগে জেঠিমা নিজের হাতে জলের গেলাসটি ঢাকনা চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল বারীনমামাদেব মাথার কাছে, এবং ওই রাতে আর কেউই ওঠেনি দোতালায়, আর ওই গ্লাসেই, অবশিষ্ট জলে, যেহেতু পাওয়া গিয়েছে সেঁকো বিষ, পুলিশ এবার যা বোঝার বুঝে লিক।

পুরো বিচারের সময়টা জেল-হাজতেই থাকতে হল মাকে। বিচারে যাবজ্জীবন জেল হল তার।

ততদিনে মোহরদির পুনরায় বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বড়পিসির গঙ্গাজলের ভাইপোর সঙ্গে। মোহরদি সেখানেও সুখে ঘরকন্না করছে।

মায়েব যখন বিচার চলছিল আদালতে, জেঠিমা আর বড়পিসির আচার-আচরণ লক্ষ করতে করতে আমার মনের মধ্যে গভীব সন্দেহ দানা বাঁধছিল, কোনো একটা গূঢ় বিষয়ে দু'জনের মধ্যে জুতসই আঁতাত হয়েছে কিছু। সারাক্ষণ অন্যের চোখের আড়ালে চুপিচুপি, প্রায় নিঃশব্দে, কখনও বা কেবলই ইশারায় কতকিছু কথা বলত ওরা, কখনও বা খুব গভীর আলোচনায় ডুবে যেত। কথাবার্তার ফাঁকে

ফাঁকে ওদের দু'চোখের মণি ক্রূর হয়ে উঠত। যেন কোনো কারণে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত, এমনতরো আশঙ্কার মেঘও জমে থাকত ওদের মুখমণ্ডলে।

প্রায় পাথরের মতো ভাবলেশহীন মুখে ফাটকের আড়ালে চলে গেল মা। বারেকের তরেও প্রতিবাদ জানাল না কোনও কিছুর। কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে একবারের জন্যও বলল না, আমি নির্দোষ, বিশ্বাস কর তোমরা। আমার হাজার পীড়াপীড়িতে কেবল একটা কথাই তোতাপাখির মতো আওড়াল বার বার, মেরেছি কি মারিনি, ওপরওয়ালাই সব দেখেছেন।

ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে একেবারে পাগলিনীর পারা হয়ে গিয়েছিল ন'কাকি। প্রথম প্রথম সকলের মতো মাকেই ঘাতিনী বলে মনে হয়েছিল তারও। শোকের ফেনাটা মরে যেতেই, যখন ভাবনাটা স্বচ্ছ হয়ে এল, দিনদিন যেন দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেল সে। ন' কাকার সঙ্গে প্রায় নখেদাঁতে লড়াই চালিয়ে সংসার থেকে পৃথক হয়ে গেল।

আমাদের এতদিনের একান্নবর্তী পরিবারটি এতদিনে ভাঙল।

মা জেলে যাওয়ার পর নিজেদের বাড়িতে আমি কদাচিৎ যেতাম। ক্বচিৎ গেলে-টেলে ন'কাকার বাড়িতেই থাকতাম। ন'কাকিই প্রায় জবরদস্তি টেনে নিয়ে যেত আমাকে। আমার ওপর তার আকস্মিক উছলে ওঠা মমতা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে যেতাম।

বহুদিন বাদে, এক অতি একান্ত ও দুর্ব্বল মুহূর্তে, ন'কাকি আমায় উপহার দিল একটি নিদারুণ বীজ। নানান কারণে, নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করতে করতে এমনই এক নিয়তি-সর্বস্বতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ন'কাকি, মাঝে মাঝেই, প্রায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার অনিবার্যতায় বলে উঠত, 'সবই মানুষের কপাল, বাপ। কপালের উপর হাত নেই কারোরই।'

একদিন এক অতি দুর্বল মুহূর্তে তার সঙ্গে যোগ করল আরও গুটিকয় বাক্য, 'নইলে কেই বা ফুঁসলালো, কেই বা জীবন দিয়ে তার খেসারত দিল! কে বা মারল, কে বা জেল খাটতিছে!'

আমার সারাশরীর শিরশির করে উঠেছিল, শরীরের তাবৎ রক্ত সহসা এমন বেগবান হয়ে উঠল, আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

কাকিমার দেওয়া বীজটাকে আমি মাটিতে পুঁতে দিই, নিয়মিত সারজল জোগাই, আর তার ফলে যে চারাগাছটি জন্মাল, কালক্রমে ডালেপালায় বাড়তে বাড়তে এমনই মহীরুহ হয়েছে যে, আজ আর আমার মনে কোনোই সন্দেহ নেই, জেঠিমা এবং বড়পিসিরই যুগ্ম পরিকল্পনায় মরতে হয়েছে বারীনমামাকে এবং তার পেছনের গোপন, জটিল কারণগুলোও আমি প্রায় নির্ভুলভাবে আন্দাজ করতে পারি।

বারীনমামাকে হয়তো বা এককালে পছন্দ করত জেঠিমা। কিন্তু সম্পর্কে মামা হয়ে নিজের ভাগ্নীকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে জগৎ-সংসারে যে মহাপাপের নজির সৃষ্টি করল সে, জেঠিমাদের পুরো পরিবারটিতে ঢুকিয়ে দিল সেই মহাপাপের দায়ভাগ;'দুনিয়ার সামনে চিরকালের মতো ওদের হীন করে দিল, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি জেঠিমা। তার বুকের মধ্যে তিলতিল জমেছিল কালনাগিনীর প্রতিহিংসা। তার ওপর ছিল জেঠিমার বুকের মধ্যেকার ওই জলজ্যান্ত আতঙ্ক,—যাবতীয় রস চুষে-টুশে নিয়ে, সখসাধ মিটলে পর, বিলাসীর মতোই না এই মেয়েটাকেও ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দেয় বারীন নামে পাষণ্ড ছোকরাটি! হিংসা, ভয়ের গর্ভেই তো জন্ম তার, কাজেই, বারীনমামাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে ওই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার পাশাপাশি পথের কাঁটাটিকে উৎখাত করে মোহরদিকে মুক্ত করবার ইচ্ছেটিও হয়তো বা দুর্বার হয়ে ওঠে জেঠিমার মনে। লোক মারফত মেয়ে-জামাইকে ক্ষমা করে, অভয় দিয়ে, সম্ভবত, সেই কারণেই ডাকিয়ে এনেছিল বাড়িতেই। এতদ্বারা কেবল যে বারীনমামাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল তাই নয়, তার প্রতি যে জেঠিমাদের কোনরূপ রাগ কিংবা ক্ষোভ নেই সেটা আগাম প্রকাশ করবার মাধ্যমে খুনের ব্যাপারে নিজেদের 'নির্দোষ' থাকার ভিতটাকে এক ধাপ গেঁথে রাখাও গেল।

জেঠিমাদের পরবর্তী কার্যক্রম আমার সন্দেহকে আরও পাকাপোক্ত করেছিল, কেন কি, মায়ের

বিচার তখনও অবধি শেষ হয়নি, তার আগেই সাত-তাড়াতাড়ি বড়পিসির গঙ্গাজলের ভাইপোর সঙ্গে মোহরদির বিয়ে দিয়ে যেন গঙ্গাস্নান করে ফিরেছিল জেঠু-জেঠিমা।

কিন্তু বড়পিসির মনস্তত্ত্বটি অতখানি সরল ছিল না। সেই ছেলেবেলা থেকে ওকে যতটুকু চিনেছি, ভাইঝির জীবনটা নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা পুরো পরিবারের সুনাম কলঙ্কিত হওয়া গোছের প্যানপ্যানে কারণে উতলা হওয়ার পাত্রী সে মোটেই নয়। তা সত্ত্বেও জেঠিমার সঙ্গে সমান তালে যে গাঁটছড়াটা বেঁধেছিল বড়পিসি, তার কারণ সম্ভবত আরও অনেক গভীরে। সম্ভবত নিজের গঙ্গাজলের বোনকে ডিঙিয়ে, আমার মায়ের এই সংসারে ঢুকে পড়া, অগাধ রূপের ডালি নিয়ে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে একটুকরো উজ্জ্বল আলো হয়ে থাকা, তার রূপ নিয়ে চারপাশে ধন্য ধন্য রব ওঠা, এবং ওই 'সর্বনাশা' রূপের কুণ্ডে চিরকালের ন্যাওটা ভাইটির তিলতিল ডুবতে থাকা ইত্যাদির সমবেত অভিঘাতে বড়পিসির বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল বহুকাল আগে, সে আগুন নেভেনি কোনোদিনও, আজও তার বুকের মধ্যে সেই দহন অব্যাহত। নিতান্ত গরিব বাড়ির মেয়ে হয়েও কেবল চোখ ধাঁধানো রূপের জোরে বড়পিসির প্রশ্নহীন কর্তৃত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছিল মা, যে সর্বনাশা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল বড়পিসির বুকে, সারা জীবন তিলতিল প্রতিশোধ নিয়েও সে আগুন বুঝি নেভেনি।

আমার ধারণা, বড়পিসির বুকের সেই জটিল চরিত্রের আগুন মায়ের চরম সর্বনাশের পরেও নিভবে না। তার রিক্ত, বঞ্চিত, উপোসী শরীর ও মন ভুরিভোজে মত্ত যে-কোনো যুবক-যুবতীকে দেখলে ডাইনিতুল্য আচরণ করে। এমন কি বিয়ের দু'মাস বাদে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসার পর মোহরদি-বারীনমামার ডগোমগো সম্পর্কটি দেখতে দেখতে বড়পিসির চোখের কোটরে একাধিকবার জ্বলন্ত কয়লা দেখেছি আমি।

কাজেই, দু'জনের দু'ঢিলে একটা পাখিকে বধ করা হল। জেঠাইমা মোহরদি'কে রাহুমুক্ত করে আবার বিয়ে দিতে পারল, বড়পিসিও মিটিয়ে নিল মায়ের প্রতি তার শেষ আক্রোশ।

একদিন অনিন্দ্য তার অভিমানটা উগরে দেয়।

খাস, অথচ আমাদের সঙ্গে বসে খেতে চাস না, ঘেন্না করিস নাকি আমাদের? একসঙ্গে বসে পান করবার যোগ্য বলে মনে করিস না? মনে রাখিস, এতে আমরা ইনসাল্টেড ফিল করি।

অনিন্দ্যর অনুযোগটা আমার বুকে শেল হয়ে বেঁধে। নিজের অবস্থা খোলসা করে বোঝাতে না পারায় আমি অসহায় বোধ করি। অনিন্দ্য, মুকুল, পার্থ,—বন্ধু হিসেবে ওদের তুলনা নেই, কিন্তু তাও যে কেন ওদের অতি সামান্য একটা দাবিকে আমি বারবার এড়িয়ে যাই, সেটা কী করেই বা বোঝাই ওদের! আমি তো জানি, পেটে দু'পেগ পড়ামাত্তর আমি কী পরিমাণ প্রগল্‌ভ হয়ে উঠি! ভেতরের যাবতীয় গোপন কথা, অপমান, লাঞ্ছনা, বহুকালের অজীর্ণ, অদাহ্য স্মৃতিগুলো যেন কালসাপের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠতে থাকে ওপরে। আমার সারাশরীর দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে, গা গুলোতে শুরু করে, প্রবল বমি পায়, এবং ওইসবের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এক সময় ভেতরের সবকিছু ওলাওঠার ভেদবমির মতো হড়হড়িয়ে উগরে দিতে থাকি। আর ওই বমিতে থাকে শুধুই আমার মা, তার সারাজীবনের যাবতীয় দহন, একটা জালি-না-আসা কুমড়ো গাছকে নিয়ে আমাদের দুজনের যাবতীয় দুঃসহ লজ্জাগুলি। আমি যে ওদের সামনে সবকিছু উগরে দিচ্ছি, ওই বেসামাল সময়েও আমি তা বুঝতে পারি। নেশা কেটে গেলে সেজন্য আমার প্রবল আপশোশ হয়, দুঃসহ অনুতাপে নিঃশব্দে পুড়তে থাকি আমি, চরম লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি নে বন্ধুদের সুমুখে।

কিন্তু এত কথা, বুকের মধ্যেকার একান্ত এই গ্লানির কথা, কী করেই বা অনিন্দ্যদের সামনে প্রকাশ করি আমি! দু'একবার বলতে গিয়ে দেখেছি, অপরিসীমা লজ্জা আমাকে ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। কিন্তু অনিন্দ্যরা কষ্ট পাচ্ছে, এটা ভেবেই খুব খারাপ লাগছিল আমায়। তাই একদিন, আসল কথাটা ফাঁস না করেই খুব আলগা ভঙ্গিতে বলি, ওসব কিছু নয়, ভুল বুঝিস নে আমাকে, আসলে মদ খেয়ে

খুব আগডুম-বাগডুম বকি তো, খুব ডিসটার্বিং এবং ডিসগাস্টিং হয়ে উঠি, কে কী ভেবে বসবে—।

অনিন্দ্য আমার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে থাকে সে। বলে, হ্যাঁ, বকিস অবশ্য খুব। কোনও মাথামুণ্ডু নেই সেসব কথার। কী সব কুমড়ো গাছ, কুমড়ো ফুল...। অনিন্দ্য বলতে বলতে থেমে যায়।

—কুমড়ো বুঝি খুব পছন্দের জিনিস তোর? মুকুল চোখ মটকে হাসে।

—হতেই পারে। পার্থর তাৎক্ষণিক সংযোজন,—কুমড়ো খুব উপকারি ফল। আশি মণ কুমড়ো খেলে শরীরে পাক্কা এক ফোঁটা রক্ত হয়।

এসব কথা নিছক ঠাট্টার ছলেই বলে ওরা, কিন্তু শুনতে শুনতে আমার কানের লতি নিঃশব্দে পুড়তে থাকে। লজ্জায়, ঘেন্নায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলি, সে আমার একেবারে নিজস্ব কথা সব, একান্তভাবে আমার গুপ্ত সিন্দুকের সামগ্রী, আমার ওই সিন্দুকটাকে, প্লীজ, দেখতে চাস নে তোরা, আমাকে আর কখনোই সকলের সঙ্গে মদ খেতে বলিস নে।



মাকে আমি মাঝেমাঝেই দেখতে যাই।

সেই রায় বেরোবার দিনে তার যে ভাবলেশহীন মুখখানি দেখেছিলাম, যা দেখে যে-কোনো মানুষেরই মনে হতে পারে, মা বুঝি রায়ের মর্মটাই বুঝতে পারেনি, জেলে মাকে দেখতে গেলে এখনও দেখতে পাই, সেই একই ধরনের ভাবলেশহীন মুখ।

রায় বেরোবার পর পর আমি খুব ছেলেমানুষের মতো মায়ের কাছটিতে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, হাকিমের রায়টা তুমি বুঝতে পেরেছ, মা? তোমার যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। যাবজ্জীবন!

আসলে, মাকে সাবাক্ষণ অমন কাঠ-কাঠ পাষাণপ্রতিমা হয়ে থাকতে দেখে আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মায়ের বুকের ভেতরটা একটু একটু করে জমাট বেঁধে যাচ্ছে না তো, একেবারে কংক্রিটের মতো জমাট, যা এতখানি নিরেট যে বাইরের থেকে এক চিলতে বায়বীয় বস্তুও ঢুকতে পারবে না কিছুতেই। মানুষ তো এমন অবস্থায় দম আটকে আচমকা মরে যায়।

কিন্তু আমার কথায় মা ধীবে ধীরে মুখ ফেরায়, খুব নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রায় ঘুমঘুম চোখে উচ্চারণ কবে, হ্যাঁ, যাবজ্জীবনই তো। তারপরই ধীরপায়ে পুলিশ-ভ্যানে উঠে পড়ে।

নিয়মিত জেলে যেতে যেতে আমি লক্ষ করছিলাম, মায়ের ভেতরের সেই পাষাণ-পাষাণ ভাবটা যেন একটু একটু গলছে। চোখেমুখে ইদানীং সামান্য স্বাভাবিক লাগে। আমি গিয়েছি খবর পেলে এমন আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দেখা-করবার-ঘরে ঢোকে, মনে হয় যেন হোস্টেল থেকে আমার বাড়ি আসার খববে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। বেশ মমতা মাখানো গলায় শুধোয়, খোকা, কেমন আছু রে? অমন রোগা লাগতিছে কেন তোকে?

দুনিয়ার সব মায়ের মতো আমার মা-ও আমাকে রোগা দেখে চিরকাল। ছেলেবেলা থেকে শুনতে শুনতে আর ইদানীং অবাক হইনে কথাটা শুনে। বলি, আমি ভালোই আছি। তুমি কেমন আছ মা?

ঐ অর্থহীন প্রশ্নটা যে আমি কেন করি, নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় তা। শুধু অর্থহীনই নয়, একজন যাবজ্জীবন কয়েদিকে কেমন আছে জিজ্ঞেস করা, খুব নিষ্ঠুরতাও সেটা। প্রশ্নটা বিপজ্জনকও তো বটে। কেন কি, আমার প্রশ্নের জবাবে মা যদি বলে বসে, 'মরে বেঁচে আছি রে খোকা, জীয়ন্তে নরকযন্ত্রণা চলছে আমার', কী বলে সান্ত্বনা দেব মাকে, এবং নিজেকে! তবুও প্রশ্নটা, একটা প্রজন্মবাহিত সংস্কারের মতো, মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় প্রতিবারেই।

—ভালো আছি রে। মা খুব হিমশীতল গলায় জবাব দেয়, এখানে খুব ভালো আছি। এরা খুব ভালো।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার খুব স্থির বিশ্বাস জন্মায় মনে, মা স্রেফ আমাকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যেই বলছে না কথাটা, পাছে ওর দুঃখের কথা শুনে আমার বুক ফেটে যায়, সেই কারণে মন-ভোলানো কথা নয় ওটা, মা সত্যি সত্যি ভালো আছে।

আমি অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি।

যদিও ইদানীং জেলে কয়েদিদের থাকবার ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ লাঘব করবার জন্য অনেক সংস্কারমূলক কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে, তাদের টিভি দেখতে দেওয়া হয়, গান শুনতে দেওয়া হয়, গান, আবৃত্তি, নাটক করতে দেওয়া হয়, ব্যক্তিগত দক্ষতা অনুসারে কাজ দেওয়া হয়, তাদের লেখাপড়ারও ব্যবস্থা করা হয়..., কিন্তু তা বলে মা যদি বলে, বাড়ির বদলে জেলে সে ভালোই আছে, তাহলে হয় তাকে অবিশ্বাস করতে হয়, নয়তো বুঝে নিতে হয়, তার সংসারের জীবনটা আরও কত যন্ত্রণাময়, নারকীয় ছিল।

খুব উজ্জ্বল চোখে মা বলে, জানিস খোকা, এখানে আমাকে কেউ অপয়া, অলুক্ষণে বলে না। এখানে কেউ কাজে বারাবার সময় আমাকে লুকিয়া রইতে হয় না। আমি যে অপয়া, এখানে কেউ জানেই না সেটা।

—তুমি মোটেই অপয়া নও। অপয়া বলে কিছু হয় না। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি।

আমার আচমকা চিৎকারে মা একটু চমকে ওঠে। হকচকিয়ে যায়। পর মুহূর্তে আমার দিকে ঘোর অপ্রসন্ন চোখে তাকায়। আমার কথাটা যে অবিশ্বাস্য, কথাটা যে মোটেই পছন্দ হয়নি মায়ের, কেবল চোখের চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তা। আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের মুখে এমনই এক চালাক-চালাকি হাসি খেলে যায়, যেন নিজের কোনো এক কুকর্মের কথা ফাঁস না হওয়াটাকে এক ধরনের সৌভাগ্য বলে মনে করছে সে।

একদিন মা বলল, জানিস খোকা, এরা আমাদের মতো চার-পাঁচজন মেয়ে-কয়েদিকে একটুকরা করিয়া জমি বরাদ্দ করেছে। আমরা উখেনে সবজির চাষ করতিছি।

—ভালোই তো। আমি মাকে উৎসাহ জোগাই,—তুমি তো সবজি ভালোই লাগাও। সেই যে একবার কুমড়োর বীজ পুঁতেছিলে।

—তুই কী করে জানবি তা? মা খুব ঠোঁট ফোলায়, তোর তো তখন জন্মই হয়নি।

—আমি জানি। শুনেছি। তোমার গাছটাই সবচেয়ে লকলকে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ফুল ধরেছিল তোমারই গাছে।

মায়ের চোখদুটো একটু একটু করে নিভে আসে। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে, ফুল ধরেছিল বটে, কিন্তু একটাও ফল ধরেনি।

—সেটা তোমার দোষে নয়। সে অন্য বৃত্তান্ত। খুব সম্ভব তুমিও মনে মনে জান তা। না জানলে, বলব আরেক দিন।

আমাকে আর বলতে হল না, মা নিজেই একদিন বলে দিল কথাটা। আমার আসার খবর পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এল দেখা-করবার-ঘরে। হাঁফাচ্ছিল। দম না নিয়েই বলতে লাগল, জানিস খোকা, এ মরসুমে সব মেয়ে-কয়েদির মধ্যে সবজি ফলানোতে আমি ফার্স্ট হয়েছি। এই এ্যাত্তো বড়ো কুমড়ো ফলিয়েছি আমি! অ্যাই অ্যাত্তো বড়!

আমি লক্ষ করছিলাম, কুমড়োর সাইজ দেখাতে গিয়ে মায়ের হাতের চেটোজোড়ার মধ্যেকার দূরত্ব একটু একটু করে বেড়েই চলেছে।

—আমারটাই প্রথম হয়েছে। দেখবি? দেখবি কুমড়োটা?

মায়ের উচ্ছ্বাস যেন বাধা মানতে চাইছিল না কিছুতেই। জেলরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বলে, এই, আমার ফলানো কুমড়োটা এনে আমার ছেলেকে দেখাতে দেবে তোমরা? দাও না গো। বলতে বলতে কারোর অনুমতির তোয়াক্কা না করে মা ছুটতে ছুটতে চলে যায়, একটু বাদেই দু'হাতে বয়ে নিঁয়ে আসে প্রকাণ্ড এক মিষ্টি-কুমড়ো, গাঢ় হলুদ রঙ তার, সারা শরীরে ঢেউখেলানো ভাঁজগুলি প্রকট।

দু'চোখ আকাশে তুলে মা বলে,—এই দ্যাখ্ খোকা, এটা আমি ফলিয়েছি। আমি নিজেব হাতে ফলিয়েছি।

উচ্ছ্বাসে, আনন্দে মায়ের দু'চোখের মণিজোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সারা শরীর ভিজে

যাচ্ছিল ঘামে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। আর, কপালের আড়াআড়ি রক্তবাহী শিরাদুটি চিতি সাপের মতো ফুলে উঠেছিল।

আমি ভয়ে, উদ্বেগে, আশঙ্কায়, মাকে প্রবল শক্তিতে জড়িয়ে ধরি, মা, মা-গো, শান্ত হও মা, দোহাই তোমায়, স্থির হও।

সন্ধের একটু আগে আগে অনিন্দ্যকে বললাম, আজ একটু মদ খেতে ইচ্ছে করছে। চল্, কোথাও গিয়ে বসি। মুকুল, পার্থদের ডাক। সঞ্জয়, গোরা, দেবাশিসদেরও।

অনিন্দ্য প্রবল বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমি নিজের থেকে মদের আসরে যেতে চাওয়ায়, সে আমার মধ্যে এক ধরনের মানসিক অসংলগ্নতা খুঁজে পায় বুঝি। বলে, আজ থাক। আর একদিন হবে।

—আজই হবে। আলবৎ হবে। মাইরি বলছি, আজ আমার মদ না খেলেই নয়।

অনিন্দ্য কটমট করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে চায়। বলে, তুই তো সবার সঙ্গে মদ খেতে চাস না।

—আজ খাব। সবাইয়ের সঙ্গে বসে খাব।

অনিন্দ্য খুব ভাবনায় পড়ে যায় বুঝি। বলে, কেন? ইচ্ছে করলে নিজের ঘরে বসেই খা না রোজকার মতো।

—বলছি না, সবাইয়ের সঙ্গে খাব আজ। আমি চিৎকার করে ধমক দিই ওকে। পরমুহূর্তে গলায় খুব অনুনয় ফুটিয়ে বলি, আজ একা একা মদ খেলে বুক ফেটে মরেই যাব আমি। বিশ্বাস কর্।

অনিন্দ্যর চোখেমুখে বিস্ময়ের পারদটা চড়চড়িয়ে উঠছিল। তাও আমরা সন্ধেয় সন্ধেয় রওনা দিলাম দেবাশিসদের মেসে।

ভরভরন্ত আসরে আমার অকস্মাৎ উপস্থিতি সবাইকে চমকে দেয়।

দেবাশিস ঠাট্টা করে বলে, একি! সূর্য আজ কোন্ দিকে উঠেছে? তুই নাকি মদ খাওয়ার ব্যাপারে পর্দা প্রথাকে মান্য করিস?

—আজ প্রথাটা ভাঙলাম। আমি সহজ করে হাসি।

প্রথম থেকেই স্থির করে নিয়েছিলাম, আজ আর সতর্কতার বর্মটা পরব না। একেবারে মুক্ত মনে মদ খাব। কারণ, আজ আর আমার কিছুই লুকোনোর নেই, বরং সব্বাইকে বুক খুলে হাট করে দেখাবার মতো কিছু ছবি জমেছে। বুকের মধ্যে কিছু কথা।

পেগ দু'তিন খাওয়ার পর বুকটা খুব হালকা লাগল। খুব পলকা পলকা লাগছিল শরীরটা। একটা অচেনা খুশি, ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো উপচে পড়তে চাইছিল।

—অ্যাই, আজ কিন্তু বকবক করবি নে। অনিন্দ্য চোখ পাকিয়ে বলে।

—কেন? আমি প্রায় ফুঁসে উঠি,—তোরা আমার কথা বলা বন্ধ করতে চাস? আমার বাকস্বাধীনতা হরণ করতে চাস? নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই জড়ানো জড়ানো ঠেকছিল। টেবিলে সজোরে চাঁটি মেরে বলি, আলবৎ বকবক করব। বাধা দিলে ঘুষি মেরে মুখ গুঁড়িয়ে দোব।

বন্ধুরা একযোগে হাসতে থাকে,—বল্, বল্, তোর যত খুশি, যা খুশি, বল্।

—আরে, মদ তো এক জাতের পারগেটিভ। পার্থ বলে ওঠে, মুখ দিয়ে বাওয়েল ক্লিয়ার করবার পারগেটিভ। নাভিমূল থেকে জমানো কথা টেনে বের করে আনে।

—সেই জন্যেই তো মদ খাওয়া। নইলে—। মুকুল সায় দেয়

আমিও সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকি।

বলি, আরও একটা কথা আছে। মনের সব কথা সবাইকে তো খোলসা করে বলা যায় না। কেবল প্রাণের বন্ধুদের কাছেই বলা যায় ওইসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা। বুক উজা-ড় করে বলা যায়।

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলি আমি। বলি, আজ তোদের একটা দারুণ খবর দোব। শুনে ভালো লাগবে তোদের। খুশি হবি। আমার মা না, জানিস, জেলের খেতে কুমড়ো ফলিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। এই অ্যাত্তো বড় কুমড়ো ফলেছে তার হাতে! অ্যাই অ্যাত্তো বড়! বিশ্বাস কর্, এই অ্যাত্তো বড়! দ্যাখ্ না, দ্যাখ্ না, এই অ্যাত্তো বড়!

বলতে বলতে আমার দু'টো হাত চেটোসুদ্ধু বিস্তৃত হতে থাকে দু'দিকে। প্রবল মদের ঘোরেও আমি বুঝতে পারি, আমার হাতদুটো দু'দিকে প্রসারিত হতে হতে কখন জানি ধনুকের মতো বাঁক নিতে শুরু করেছে। আমি ধনুকটাকে ক্রমাগত বাঁকাতে থাকি। তাতে করে আমার দাপনা-জোড়া টনটন করে ওঠে। এবং সেই যন্ত্রণায় কিংবা অন্য কোনও গূঢ় কারণে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।

আর, যতই কাঁদতে থাকি, বুকের মধ্যেকার বহু যুগের জমাট পাষাণখণ্ডটি ঠিক স্কচের গ্লাসের মধ্যে বরফের কিউবের মতো গলতে থাকে...। গলতে থাকে...। গলতে থাকে...।

গলে... গলে... গলে... একসময় আমার দু'গাল বরাবর একজোড়া যমুনা নদী হয়ে বইতে থাকে। বইতেই থাকে...।

পরিচ্ছেদ দুই

মিঠে নুড়িটা হারিয়ে ফেলেছি



কল্পনাথ সেই ছেলেবেলায় আমাকে মিঠে-নুড়ি চিনিয়েছিল।

আমাদের দুজনেরই বয়েস তখন নয় কি দশ। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে খালি গায়ে যাই। সেই তখন থেকেই কল্পনাথকে আমার রহস্যময় লাগত। তার দৃষ্টিতে এক ধরনের ভেসে বেড়ানো ভাব ছিল। আর, তাইতেই সে আমাদের মধ্যে থাকতে থাকতেই কখন জানি সবার অলক্ষ্যে অনেক দূরে চলে যেত।

একদিন লক্ষ করলাম, স্কুলে, আমার পাশটিতে বসে কী যেন একটা চুষে চলেছে কল্পনাথ। তখন ক্লাসে কামাখ্যা পণ্ডিত যোগ শেখাচ্ছে, আর ঐ ফাঁকে, মুখের মধ্যে কী একটা চুষতে চুষতে কামাখ্যা পণ্ডিতের যোগের ক্লাস থেকে নিজেকে একটু একটু করে বিয়োগ করে নিচ্ছে কল্পনাথ। হারিয়ে যাচ্ছে কোন্ দূর আকাশে। এক সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ক্লাসঘরে নেই কল্পনাথ।

আমি আর ঐ মুহূর্তে ওকে জাগাতে সাহস পাইনে। কিন্তু মনের মধ্যে কৌতূহলটা জোঁকের মতো ফুলতে থাকে।

জল খাওয়ার ছুটি হয় দুপুর গড়িয়ে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসা মাত্তর আমি ঘিরে ধরি ওকে,— কী চুষিস রে?

কল্পনাথ জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসতে থাকে।

আমি ওর পিছু ছাড়ি নে।

একসময়, খুব একান্তে, দু'চোখে ঝিলিক তুলে বলে, মিঠা-নুড়ি।

শুনে আমি তাজ্জব! আমার ঐ ছোট্ট জীবনে এমন কোনও নুড়ির কথা তখনো অবধি শুনিনি। বলি, যাহ্, নুড়ি ফের মিঠা হয় নাকি?

শুনে কল্পনাথ আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যেন আমার মতো বোকা, গোমুখ্যু সে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। পরমুহূর্তে এমন রমণীয় ভঙ্গিতে রসটুকু চুষে গিলে নেয়, দেখে মনে হয়, গুড়ের মতো মিঠে না হয়ে যায় না। আমি লোভে লোভে তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। আলতো ঢোঁক গিলি অজান্তে। বলি, দেখি তো, কেমন দেখতে নুড়িটা।

অতি সন্তর্পনে নুড়িটাকে জিভের ডগায় এনে হাজির করে কল্পনাথ। নুড়িটার গায়ে চোখ বিঁধিয়ে দেখতে থাকি আমি। কাবলি ছোলার আকার, ঘন খয়েরি রঙ, চারপাশ থেকে গোল। দীর্ঘক্ষণ চুষবার দরুন, বা অন্য কোনও কারণে, নুড়িটাকে বেশ তেল-চকচকে লাগছিল।

কিন্তু এ জাতের নুড়ি আমি প্রচুর দেখেছি। রানীহাঁস দিঘির পাড়ে, রাংটিয়ার ডাঙায়, কিংবা মোরাম-বিছানো রাস্তার দু'ধারে এমন ঘন খয়েরি রঙের নুড়ি রাশি রাশি ছড়ানো থাকে। আমাদের ঐ মাকড়াপাথর-প্রধান এলাকায়, এমন নুড়ির কোনও অভাব নেই। পরে বড় হয়ে জেনেছি, ঐ জাতের পাথরের নাম ল্যাটেরাইট। সে-কথা কল্পনাথকে বলায় ওর ঠোঁটের ডগায় বিজ্ঞের হাসি। তাচ্ছিল্যও। বলে, আছে, ঢের আছে, তবে সবার শরীর থিকে তো আর মিঠা রস বেরোয় না। মাথায় পাগড়ি তো কতজনারই থাকে, বিবেকানন্দ হন ক'জনা? ঐ রাশিরাশি নুড়ির মধ্যে থাকে এক-আধটা মিঠা-নুড়ি। খুঁজিয়া লিতে হয়।

—কী করিয়া চিনিস?

—চিনতে হ-য়। উপায় আছে। যে চেনে, সে পায়।

মনে মনে স্বীকার করি, মিঠেনুড়ি আমি চিনিনে। ভারী অসহায় লাগে। কল্পনাথের কাছে একেবারে আত্মসমর্পন করে বসি।

—আমায় একটা মিঠানুড়ি খুঁজিয়া দে' ভাই।

আমি ক্রমাগত আবদার ধরি।

পরের দিন, সারা সকালের অক্লান্ত প্রয়াসে, রানীহাঁস দিঘির পাড়ে চিরুনি-তল্লাসি চালিয়ে, অজস্র খয়েরি নুড়ির ভেতর থেকে অবশেষে একটা নুড়ি খুঁজে পায় কল্পনাথ। খুব করুণা দেখানোর ভঙ্গিতে আমাকে দেয় তা। আমি হ্যাংলার মতো হাত পেতে, প্রসাদ নেবার ভঙ্গিতে, গ্রহণ করি। সঙ্গে সঙ্গেই মুখে পুরে চুষতে শুরু করি।

সারা সকাল...দুপুর...বিকেল...নুড়িটাকে চুষতে চুষতে জিভ, টাকরা ব্যথা হয়ে গেল আমার। ইতিমধ্যে কল্পনাথ আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়েছে অনেকবার। আমার চোখমুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

স্কুলে জল খাওয়ার ছুটি হলে পর কল্পনাথকে বলি, কই রে, মিঠা স্বাদ তো পাচ্ছিনি।

কল্পনাথ ভারী বিরক্ত, অপ্রসন্ন মুখে তাকায় আমার দিকে। জবাব দেয় না।

স্কুলের ছুটি হলে পর একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। মুখের মধ্যে অবিরাম নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল নুড়িটা। একসময় আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, কখন রস বারাবে রে? চুষতে চুষতে মুখ যে ব্যথা হয়্যালো।

কল্পনাথ নিঃশব্দে হাসে। করুণার হাসি। বলে, এক্ষুনি কি? আমি বলে কাল বিকাল থেকে নাগাড়ে চুষতে চুষতে এতক্ষণে অল্প অল্প মিঠা রস পাচ্ছি।

তারপর, সারা বিকেল, সন্ধে..., নুড়িটাকে চুষতে চুষতে রাতের বেলায় একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম। হয়তো বা তন্দ্রার ঘোরেও চুষেছিলাম কিছুক্ষণ, তারপর আর মনে নেই।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই জিভ চরে বেড়ায় মুখময়। ধ্বক করে ওঠে বুক! নুড়িটা মুখের মধ্যে নেই! ঘুমের ঘোরে তবে কি মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়?

তড়াক করে উঠে বসি। সারা বিছানা তন্নতন্ন করে খুঁজি। বালিসের খোল, ওয়াড়, বিছানার চাদর, তুলে ঝেড়ে পরীক্ষা করি বারবার। খাটের তলায়, মেঝের ওপর আঁতিপাতি খুঁজতে থাকি পাগলের মতো।

মোহরদি, আমার জেঠতুতো দিদি, ততদিনে আমাদের মতো ছোট ভাইবোনগুলোর ওপর নিরুঙ্কুশ খবরদারি করবার যাবতীয় অলিখিত অধিকার পেয়ে গিয়েছে সে, ভুরু কুঁচকে বলে, কী খুঁজতিছু রে?

আর, মোহরদির কথার সূত্র ধরে সেজোকাকি, ন'কাকি, বারীনমামা, সব্বাই আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ফালাফালা করতে থাকে। আমার কী বস্তুটি হারাল, সেটা না জানা অবধি বুঝি স্বস্তি পাচ্ছে না কেউই।

ততক্ষণে হাহাকারে পুড়ে যাচ্ছে বুক। কোথায় হারিয়ে গেল, কেন হারিয়ে গেল? রাতের বেলায়, আধো ঘুমের ঘোরে, নুড়িটাকে এ-গাল ও-গাল করতে করতে, স্পষ্ট মনে আছে, অল্প অল্প মিঠে রস ঝরাচ্ছিল ওর শরীর। সারা মুখ ভরে যাচ্ছিল মিঠে রসে। স্বপ্ন নয় এটা। স্বপ্ন হতে পারে না কিছুতেই। আমি সত্যি সত্যিই আধো জাগ্রত অবস্থায় পেয়েছি সেই স্বাদ। যদিও আমার কথা বিশ্বাস করেনি কেউই। মা করেনি, বাবা করেনি, জেঠিমা'রা, মোহরদি, বারীনমামা, রামুদা, ডালিম কেউই না। সবাই বলেছে, স্বপ্ন। কিন্তু আমি তো জানি, এ দুনিয়ায় কোনটা স্বপ্ন, আর কোনটা বাস্তব।

নুড়িটা হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের তরে। সারা দুনিয়া আঁতিপাতি খুঁজেও পাইনি।

কল্পনাথ শুনে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করেছে। যাগ্‌গে, হারিয়েছু তাহলে!

তারপর কেটে গেছে কতকাল! নুড়িটাকে ভুলতে পারিনি আজও। ভুলতে পারিনে যে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার মুখের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছিল ঐ দুর্লভ জাতের নুড়ি। এবং অবিরাম চুষতে

থাকার ফলে গভীর রাতে সে ঝরিয়েছিল বিন্দু বিন্দু অমৃতকণা। সেই পলকের অমৃতক্ষরণ, আজও যেন মাঝে মধ্যে জিভের ডগায় স্বাদ পাই তার। আজ অবধি যেন জিহ্বায়, টাকরায়, কণ্ঠনালীতে ঐ এক রাতের স্বাদু অনুভূতিটুকুকে বহন করে চলেছি আমি।

কল্পনাথ তারপর বহুদিন, দেখা হলেই বলেছে, আমি জানতাম। হারাবেই ওটা তুমি, হারাবেই।

এইভাবে কল্পনাথ সেই ছেলেবেলাতেই আমার কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তার পুরো জীবনটাই বুঝি আগাগোড়া রহস্যে মোড়া।

সারা সকাল মিঠে নুড়িটার জন্য হাহাকার করে বিকেল বেলায় আমি ক্ষীরকুলতলায় ডালিমকে চেপে ধরি। ডালিম, বল্ না, কল্পনাথ কি সত্যি সত্যি মিঠে নুড়ি চেনে? সত্যি সত্যিই কি মিঠে স্বাদের কোনও নুড়ি রয়েছে এই দুনিয়ায়!

চোখ মটকে ডালিম বলে, আমাকেও দিতে চাইছিল। অনেক করিয়া লোভ দেখাচ্ছিল। আমি ওই ফাঁদে পা দিইনি।

—না রে ডালিম, মিছা নয়, শেষরাতে সত্যি সত্যি মিঠা রস বারাচ্ছিল অর শরীর থিকে।

ডালিমের চোখের কোণায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে পরিহাস। বলে, মিঠা-নুড়ি চাই তোমার?

আমি ডালিমের হাতটা সজোরে চেপে ধরি, তুই জানিস, মিঠে নুড়ি কোথায় পাওয়া যায়?

ডালিম আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। বলে, জানি বৈকি। এসো আমার সঙ্গে। এক আনা লাগবে কিন্তু।

এক আনা কি, আমি তখন একটা মিঠে নুড়ির জন্য আমার সর্বস্ব দিতেও রাজি।

ডালিম আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেমাকি পায়ে হাঁটতে থাকে। তার ডবল কুঁচিওয়ালা গোলাপি ফ্রক দুলতে থাকে হাওয়ায়। একেবারে থামে গিয়ে সনাতন হাজরার লজেন্স-বিস্কুটের দোকানে। বলে, এক আনা দাও।

আমি পকেট থেকে পয়সা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিই। ঐ দিয়ে গুটিকয় কাবলি ছোলার সাইজের রঙিন লজেন্স কিনে একটা আমার দিকে এগিয়ে দেয় ডালিম। একটা নিজের মুখে পুরে নেয়। বাকিটা প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়।

রেগেমেগে লজেন্সটা ছুঁড়ে দিই রাস্তায়।

তা দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ডালিম। বলে, তোমরা দুটিতে সমান পাগল। একজোড়া পাগল জুটেছে আমার কপালে।

বলতে বলতে জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে ডালিম।

ডালিমের বয়েস তখন সাত।



আমি আর কল্পনাথ। আমাদের দুজনের মধ্যে চিরকালই ছিল দুস্তর ফারাক। ওর মুখে সর্বদাই থাকত একটা মিঠে নুড়ি। সারাক্ষণ মিঠে রস বেরোত ওটার থেকে। সেই রসেই সে মজে থেকেছে চিরকাল। আমার নুড়িটার থেকে সবে মিঠে রস বেরোচ্ছিল, তারপরই তো একদিন ঘুমের ঘোরে হারিয়েই গেল ওটা। কাজেই, আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকা দুটি বিপরীত মেরুর মানুষ। চিরটাকাল।

স্কুলের ছুটির পর সামনের মাঠে রবারের বল নিয়ে খেলছি আমি, কল্পনাথ, গোরাচাঁদ, খুদিরাম গজানন, ঝংকার, দিবাকর, শিখাবউদির ভাই ভণ্ডুল,—এক সময় লক্ষ করি, কল্পনাথ আমাদের মধ্যে নেই। একটা রবারের বল নিয়ে আচমকা যখন জীবন-মরণ কাড়াকাড়িতে মত্ত আমরা, কল্পনাথ তখন আমাদের থেকে নিঃশব্দে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে নিজেকে। চলে গিয়েছে তার নিজস্ব রাজ্যের অন্দরমহলে।

সন্ধিপুর গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে রানহাঁস দিঘি। দীঘির চারপাশে উঁচু পাড়। আঁকো, বৈঁচি, শিয়ালকাঁটার ঝোপ। আঁশফল আর ভাট-তপনির দুর্ভেদ্য জঙ্গল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে অজস্র পশুপ্রাণী,

পাখিপাখাল, কীটপতঙ্গের বসবাস।

ওটাই কল্পনাথের নিজস্ব সাম্রাজ্য। ওখানকার প্রতিটি প্রাণী, কীটপতঙ্গ, গাছগাছালের সঙ্গে তার নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক।

বুঝতে পারি, সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে ওখানেই চলে গিয়েছে কল্পনাথ। ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনমনে।

এর আগে আমি আর ডালিম দু'একবার গিয়েছি ওর সঙ্গে। দেখেছি, গাছগাছাল আর পশুপ্রাণীদের নিয়ে ওর হাজারো কাণ্ডকারখানা।

ঝোপের মধ্যে লজ্জাবতী লতারা আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বিকেলের মিঠে রোদ্দুরের স্বাদ নিচ্ছে সর্বাঙ্গে, কল্পনাথ বসে পড়েছে ওদেরই পাশটিতে। বলে, এই দ্যাখ্, নমস্কারী গাছ। এক্ষুনি সারা শরীর দিয়া নমস্কার করবে তোকে। বলেই লতাটির প্রতিটি পাতাকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে আর মিটিমিটি হেসেছে। কল্পনাথের হাতের ছোঁয়ায় লজ্জাবতীর চিরেল জোড়াপাতাগুলো ঠিক জোড়হস্তে নমস্কার করবার ভঙ্গিতে মিশে গিয়েছে পরস্পর।

কল্পনাথ বলে, বড্ড ঘুমকাতুরে গাছ। এই জাগিয়া রইছে তো এই ঘুমিয়া পড়ল। তারপর সে নিষ্পলক বসে বসে দেখেছে, কেমন করে প্রতিটি পাতার তিলতিল ঘুম ভাঙে।

দিঘির ঈশেন কোণে বৃদ্ধ তেঁতুলের তলায় বিশাল উইঢিবি। তার মধ্যে অসংখ্য গলিঘুঁজি, সুড়ঙ্গ। পিঁপড়েদের এক নিজস্ব গোলকধাঁধার রাজ্যি সেটা। ভেতরে-বাইরে দিনরাত অসংখ্য পিঁপড়ের অবিরাম আনাগোনা। কল্পনাথ কখন জানি বসে পড়েছে ওদের পাশটিতে। বুঁদ হয়ে দেখছে ওদের ব্যস্তসমস্ত হাঁটাহাঁটি। নিরন্তর ক্রিয়াকলাপ। ওর মুখেই আমি প্রথম শুনেছিলাম, পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে কথা কয়। হাসিঠাট্টা, রঙ-তামাশা করে। আনাগোনার ফাঁকে ওরা নাকি দু'দণ্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর কুশল বিনিময় করবেই, যা আজকের দিনের মানুষেরাও বড় একটা করে না। লাল-পিঁপড়েরা কী কৌশলে উইপোকা শিকার করে, একদল কেমন করে অন্য দলের ডিম, বাচ্চা কেড়ে নেয়, তাই নিয়ে কেমন করে ওদের মধ্যে আকছার লড়াই বেধে যায়, কেমন করে পরাজিত পিঁপড়েদের বন্দী করে নিয়ে যায় বিজয়ী পিঁপড়েরা, সেসব গল্প ভারী নিমগ্ন গলায় বলতে ভালোবাসত কল্পনাথ। শোনাত লাল-পিঁপড়েদের সঙ্গে ডেঁয়ো-পিঁপড়েদের যুদ্ধের জলজ্যান্ত বিবরণ। এমন করে বলত, যেন সেও ঐ যুদ্ধের সক্রিয় একজন বিশ্বস্ত সৈনিক।

কীটপতঙ্গ, গাছপালা, আকাশ-বাতাস, বিশ্বভুবন নিয়ে বিচিত্র সব কাহিনী শোনাত কল্পনাথ। সবই অবশ্য তার নিজের দৃষ্টিতে দেখা। তার নিজস্ব ভুবনের গল্প সেসব। সেই ভুবনটাকে সে পারতপক্ষে সরজমিনে দেখাত না অন্যকে। সর্বদাই আড়াল করে রাখত প্রাণপণে। সারা স্কুলের অতঅত সহপাঠীর মধ্যে কেবল আমিই তার ঐ স্বরচিত ভুবনে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছিলাম। আর পেত ডালিম। তবে সেজন্য কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি আমাকে। অবশেষে, বহু সাধ্যসাধনার পর একদিন আমাকে আর ডালিমকে সঙ্গে নিয়েছিল কল্পনাথ। আমাদের সেই প্রথম।

যেদিন আমরা প্রথম কল্পনাথের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওর সেই স্বরচিত কল্পলোকে, রওনা দেবার কালে কল্পনাথ জামাপ্যান্টের পকেটে এবং স্কুল-ব্যাগে ভরে নেয় কাঁচা টককুল, জর্দার কৌটোতে ভরে নেয় গুড়, পকেটে ভরে নেয় শুটকি মাছ, বিস্কুট, চাল, খোলাসহ চিনেবাদাম, কলাইদানা...। তখন পড়ন্ত বিকেলের লালচে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে গাছগাছালির ডালেপালায়, পুরো জায়গাটাকে রহস্যময় লাগছে। তেঁতুল গাছের ডালেডালে, ভাট-তপ্নির ঝোপেঝাড়ে, পাখিপাখাল ততক্ষণে রাত্রিবাসের আয়োজনে ব্যস্ত। বনকলমির একটা লিকলিকে ডালের ওপর বসে রয়েছে একটা গরবিনী ফিঙে। দিঘির অগ্নিকোণে ধ্যানে বসে পাথর হয়ে গিয়েছে একটা বক।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কুচলা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায় কল্পনাথ। গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে একটা গভীর সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের মুখে একমুঠো কলাইদানা রেখে দিয়ে সামান্য তফাতে সরে যায় কল্পনাথ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে তিন-চারটে ধেড়ে ইঁদুর। কল্পনাথ এবং আমাদের উপস্থিতিকে

পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে কুড়মুড়িয়ে খেতে থাকে কলাইদানা।

কল্পনাথ বলে, আজ আর এর বেশি আনতে পারিনি রে, এই দিয়া আজকের দিনটা চালিয়া লে।

ইঁদুরগুলো পিটপিট করে তাকায় কল্পনাথের দিকে। তারপর সুরুৎ সুরুৎ করে ঢুকে পড়ে গর্তের ভেতর।

কল্পনাথ আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে। বলে, বেজায় ক্ষেপিয়া গ্যাছে। চোখ দেখিয়া বুঝতে পারলিনি? আসলে এত কমে ওদের কী হয়, বল্?

বলতে বলতে ঝোপের ভেতরে চোখ চারায় কল্পনাথ। বার-দুই হাততালি দিতেই একটা ডাহুক মুখ দেখায় ঝোপের ভেতর থেকে। কল্পনাথ একটা ছোট্ট শুটকি মাছ ছুঁড়ে দিতেই ডাহুকটা পায়েপায়ে এসে মাছটা মুখে নিয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে যায়।

কল্পনাথ এবার বুড়ো তেঁতুলের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। দু'তিনটে খোলাশুদ্ধু চিনেবাদাম মাটির ওপর রেখে দেওয়া মাত্তর গাছ থেকে লেজ উঁচিয়ে ছুটে আসে গোটা-দুই কাঠবেড়ালি। বাদামগুলোকে মুখে নিয়েই উঠে পড়ে গাছের ডালে।

একটা চিনেবাদাম তখনও অবধি পড়ে রয়েছে দেখে এদিক-ওদিক তাকায় কল্পনাথ। বলে, আজ সুন্দরী কোথায় রে, বলরাম? কোথা গেল সে?

গাছের ডাল থেকে একটা কাঠবেড়ালি কিঁচকিঁচ করে ওঠে।

কল্পনাথ বলে, কী বললি? বেড়াতে গেছে? কোন্ আক্কেলে বেড়াতে গেল সে? সে জানে না, আমি আসবো আজ?

অন্য কাঠবেড়ালিটাও কিঁচ-কিঁচ করে ওঠে।

কল্পনাথ চোখ পাকিয়ে বলে, ইস্! মজা আর কি! সুন্দরীর ভাগের বাদামটা ওঁকে দিতে হবে! বড্ড পেটুক হয়েছু তুই, জগন্নাথ। অত নুলো ভালো নয়। শোন্, সুন্দরী আইলে বলিয়া দিস, আমি আইসিয়া ফিরিয়া গেছি। বলতে বলতে মাটির ওপর পড়ে থাকা চিনেবাদামটা তুলে নিয়ে পিছু ফেরা মাত্তর গাছের ডাল থেকে দুই কাঠবেড়ালির সমবেত কিঁচ-কিঁচ আওয়াজ ভেসে আসে।

ঘাড় ঘুরিযে কল্পনাথ হাসতে হাসতে বলে, অত সাধতে হবেনি। ঠিক সময়ে আইস্‌বো কাল।

বলতে বলতে তেঁতুল গাছটার উল্টোদিকে যায় কল্পনাথ। গুঁড়ি থেকে অনেক ওপরে একটা ঢাউস কোটর। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ডাক পাড়তে থাকে কল্পনাথ, হিরামন, ও হিরামন—, বারাবি, নাকি ফিরিয়া যাবো?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোটরের ভেতর থেকে মুখ দেখায় একটা টিয়ে। কল্পনাথ পকেট থেকে একটা পাকা লঙ্কা বের করে দোলাতে থাকে পাখিটার সামনে।

পাখিটা উড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় লঙ্কাটাকে।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে কল্পনাথ। বলে, কত বড় হইলো রে তোর বাচ্চারা? উড়তে শিখেছে?

পায়ের তলায় লঙ্কাটাকে চেপে ধরে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে হিরামন।

কল্পনাথ বলে, ভাবিসনি, এই তো সবে সাতদিনও পারায়নি। পাখনা মেলতে একটুখানি সময় দিবিনি ওদের্‌কে?

কল্পনাথের কথা শেষ না হতেই আবার ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে হিরামন।

কল্পনাথ বলে, তা, বাচ্চা ওরা, দুবলা তো টুকচার হবেই। জোরকদমে পোকামাকড় খাওয়াতে থাক্। না খেতে চাইলে জোর করিয়া ঠাসিয়া দিবি অদের মুখে। দেখবি, দু'দিনেই শরীরে বল পাবে।

ততক্ষণে দিঘির উল্টোদিকের পোড়ো শিবমন্দিরের চুড়োয় আর পাঁচিলে বসে সমানে কলরব তুলেছে মুখপোড়া হনুমানের দল।

দিঘির এপাড় থেকেই ধমকে ওঠে কল্পনাথ, চুপ কর্। চিল্লিয়া কানের পোকা বার করিয়া দিচ্ছে! একটুও যদি ধৈর্য থাকে! বলি, আগে ছোটদের খাওয়াবো, নাকি তোদের মতো ধেড়েদের? বিবেচনার মাথা খাইয়া বুসিয়া আছু নাকি?

কিন্তু কল্পনাথের কথা কানে তোলে না হনুর দল। তারা মহা কলরব করতে করতে ঝুপঝুপ করে নেমে আসে গাছ থেকে। আমাকে আর ডালিমকে দেখে বুঝি সামান্য সংশয়ে ছিল, কল্পনাথ বলে, ভয় পাসনি। বন্ধু।

শোনামাত্র কল্পনাথ ও আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ওরা। কল্পনাথের জামা ধরে টানাটানি জুড়ে দেয়।

পকেট থেকে একমুঠো টককুল বের করে হনুগুলোর সামনে ধরে দেয় কল্পনাথ। কাড়াকাড়ি করে কুলগুলো নিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে, বসে খেতে শুরু করে দেয় ওরা। খেতে খেতে কেউ কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে সামান্য দাঁত খিঁচোতেই কল্পনাথ জোর ধমক দেয়, আহা, রাগটি তো রয়েছে ষোলআনা! এদিকে রাবণের গুষ্টিকে পেট ভরিয়া খাবাতে গেলে তো রোজদিন এক-গাছ কুল লাগবে। আসবে কুথ্থিকে, অ্যাঁ? জবাবে, একটা হনুমান কিচির-মিচির করে উঠতেই ওর দিকে কটমট করে তাকায় কল্পনাথ। বলে, কী বললি? পেয়ারা? খুব নোলা হয়েছে, না? রোজ রোজ তোদের জন্য পরের গাছে পেয়ারা চুরি করতে গিয়া ধরা পড়িয়া মার খাই আর কি!

রাগে গুমরোতে গুমরোতে কল্পনাথ পা বাড়ায় দিঘির দক্ষিণপাড়ের দিকে। কাঁটাখোঁচা দু'হাতে সরিয়ে ঢুকে পড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। পিছু পিছু আমরাও।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে একচিলতে মতো জায়গা। ওখানে চূড় করা রয়েছে পাথর। কল্পনাথ দু'হাত দিয়ে পাথরগুলো সরাতেই দেখতে পাই গোটা-দুই জর্দার কৌটো।

উবু হয়ে বসে কল্পনাথ। দেখি, কৌটোতে অনেকগুলো ফুটো। ঢাকনা খুলতেই আমার দু'চোখ কপালে উঠে যায়। কৌটোর মধ্যে একজোড়া সোনামণি পোকা! সারা শরীর সবুজ, পাখনা দুটো সোনালি। ডিম পেড়েছে পোকাগুলো। হেগেছেও প্রচুর।

কৌটোর মধ্যে তখনো ছিল কিছু অর্ধভুক্ত পাতা। ঐ পাতাগুলো ফেলে দিয়ে কল্পনাথ নতুন পাতা ভরে দেয় কৌটোতে। ফিসফিস করে বলে, লে, খাইয়া-দাইয়া জলদি জলদি ডিমগুলা ফুটিয়া ফ্যাল্ দেখি। অকর্মার ধাড়ি সব! ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে আর কদ্দিন লাগবে তোদের, অ্যাঁ?

কৌটোগুলো যথাস্থানে রেখে পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসে কল্পনাথ। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে আসি উইঢিবিটার কাছে। একাধিক সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকছে বেরোচ্ছে পিঁপড়ের দল।

সুড়ঙ্গের কাছাকাছি খানিকটে গুড় ঢেলে দেয় কল্পনাথ। উবু হয়ে বসে পাশটিতে। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়েগুলো অল্পক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসে। চাপ বেঁধে যায় গুড়ের ওপর। কল্পনাথ বুঁদ হয়ে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য।

একসময় হাতে খানিকটে গুড় নিয়ে পিঁপড়েগুলোর নাগালের মধ্যে রাখে হাতখানা। একটু বাদে ওর হাতের ওপর উঠে আসে অনেক পিঁপড়ে।

আমি আঁতকে উঠে বলি, একি! কামড়িয়া দিবে যে!

কথায় আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কল্পনাথ। বলে, কেন? পরমুহূর্তে মিষ্টি হাসিতে ভরে যায় ওর মুখ। বলে, আমাকে এরা কামড়ায় না।

বেশ খানিকক্ষণ পিঁপড়েগুলোকে হাতে ধরে গুড় খাইয়ে একসময় ওদের এক-এক করে নামিয়ে দেয় মাটিতে। তারপর শুকনো পাতায় হাত মুছে নেয়।

ততক্ষণে সুয্যি ডুবুডুবু। ঝোপঝাড়ের মধ্যে নানা জাতের পাখি কলকলানি জুড়েছে অবিরাম।

কল্পনাথ সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বলে, দেখতিছু তো, কারোরই দু'দণ্ড তর সয় না! আমার তো দুটামাত্তর পা, না কী? সবাইকে খাওয়াতে খাওয়াতে যাবো তো। তোদের মতো আমার তো একজোড়া পাখনা নেই যে, ফুরুৎ করিয়া উড়িয়াবো চোখের নিমেষে।

বলতে বলতে ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি একচিলতে ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে কল্পনাথ একটা পুঁটলি খুলে মুঠোটাক চাল ছড়িয়ে দেয় জমিতে। আর, সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজি ঘটে যায়। চারপাশের ঝোপঝাড় থেকে রাজ্যের চড়াই, শালিখ, আর কাক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে চালগুলোর ওপর। গলায় বিচিত্র

আওয়াজ তুলে খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে চালগুলো।

আমরা সামান্য তফাতে বসে দেখতে থাকি দৃশ্যটা।

খেতে খেতে কেউ কেউ বেখাপ্পা গলায় ডেকে উঠছিল। তাই শুনে কল্পনাথ তো রেখে খাপ্পা। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, পুঁচকে পাজিগুলার কথা শুনলি? বলে কিনা, এইটুকুন খাবার দেবার চেয়ে নাকি না দেওয়াই ভালো। ওরে, এসব তোদের জন্য বাড়ির মা-কাকিমাদের নজর এড়িয়ে চুরি করিয়া আনতে হয়। তিলমাত্র কৃতজ্ঞতা যদি থাকে! ঠিক আছে, কাল থেকে আর আসছিনি আমি। শোনা মাত্র পাখিগুলো দ্বিগুণ কলকল করতে থাকে। কল্পনাথ গুম মেরে থাকে। একটু বাদে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আবার তোষামোদি করা হচ্ছে! গরু মারিয়া জুতা দান!

এমনি করে রোজ সারা বিকেল ধরে রানীহাঁস দিঘির পাড়ের তাবৎ পশুপ্রাণী, পাখিপাখালকে খাওয়াত কল্পনাথ। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, ওদের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিত আলাদা আলাদা। ওদের সঙ্গে গল্পগাছা, ঠাট্টামস্করা, খুনসুটি করত। দু'পক্ষের মধ্যে মান-অভিমানের পালা চলত কোনও কোনও দিন।

পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, রোজ রোজ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দেবার কারণেই পশুপ্রাণীগুলো কল্পনাথের আওয়াজ পাওয়া মাত্র বেরিয়ে আসত ঝোপঝাড় কিংবা সুড়ঙ্গ থেকে। অভ্যেসবশেই আসত ওরা। রোজরোজ ওকে দেখতে দেখতে প্রাণীগুলোর ভয় ভেঙে গিয়েছিল। আর, ওরা নিজেদের মর্জিমতো আওয়াজ তুলতো গলায়, কল্পনাথ নিজের মতো করে তা বুঝে নিয়ে মনগড়া জবাব দিয়ে যেত। কিন্তু সে দৃঢ় গলায় দাবি করত, রানীহাঁস দিঘির পাড়ের সব পশুপাখির, গাছগাছালের ভাষা সে বোঝে। ওরাও বোঝে কল্পনাথের কথাগুলো। যেহেতু, কল্পনাথকে যেটুকু চিনেছি, ধাপ্পা দেওয়া ওর ধাতে নেই, সেই কারণেই ওর কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে আমার বিশ্বাস হয়েছে, পশু-পাখিদের গলার বিচিত্র আওয়াজগুলোর অর্থ নিজের মতো করেই ধরে নিত কল্পনাথ। বুকের মধ্যেকার প্রবল বিশ্বাস থেকেই সে করত ওটা। এবং বুকের মধ্যে নিখাদ বিশ্বাস করত যে, পশুপাখিগুলোর কথার মানে সে ঠিকঠিক বুঝেছে। এমন কি, গুড়মাখা হাতের চেটোয় পিঁপড়েগুলো যখন ঘুরে বেড়াত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পিঁপড়েগুলো অবশ্যই কামড়াত ওকে, কিন্তু কল্পনাথ স্বীকার করত না তা। অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করত স্রেফ মনের জোরে, কেবল এইটুকু প্রমাণ করতে যে, পিঁপড়েগুলো ওকে কামড়ায় না। কিংবা অন্ধ বিশ্বাসের আতিশয্যে সে টেরই পেত না দংশনের যন্ত্রণা। মানুষের ক্ষেত্রে এমনটা নাকি শোনা গেছে যে, ঠাণ্ডা বলে বিশ্বাস করাতে পারলে গরম শিকের ছোঁয়াও নাকি টের পায় না মানুষ, ফোস্কাও নাকি পড়ে না। আবার, প্রচণ্ড গরম এমন বিশ্বাস জন্মালে পরে ঠাণ্ডা লোহার শিকের ছোঁয়ায়ও নাকি ফোস্কা পড়ে যায় গায়ে। আসলে, মানুষের মন বড় বিচিত্র। আবার এমনটাও অবশ্যই হতে পারে, পিঁপড়েগুলো গুড় খাওয়ায় এতটাই মশগুল হয়ে থাকত যে, কামড়াতেই ভুলে যেত। সঠিক জানি নে আমি। বুঝতে পারিনি এর আসল রহস্য। শুধু এটাই দিনের পর দিন দেখেছি যে, পশুপাখি, গাছগাছালের সান্নিধ্যে গেলে একেবারে আত্মীয়ের মতো একাত্ম হয়ে যেত কল্পনাথ। সেই একাত্মতায় কোনও খাদ ছিল না।

ওদের বাড়ির মধ্যে একমাত্র ডালিমকেই সবচেয়ে ভালোবাসত কল্পনাথ। বলত, সারা বাড়িতে একমাত্র ওই একজনই আমাকে বোঝে।

বলি, সে কি? সে তো তোকে পাগল বৈ কিছুই ভাবে না।

সেকথায় কল্পনাথের সারা মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। বলে, আসলে, পাগল ছাড়া পাগলকে কে চিনতে পারে, বল্?

সব মিলিয়ে, সেই ছেলেবেলাতেই কল্পনাথ আমাদের চোখে একটুখানি চেনা, অনেকখানি অচেনা। যেন পড়ন্ত বিকেলের মায়াবি কনে-দেখা রোদ্দুর। আমাদের উঠোনে আমাদের মধ্যেই হুটোপুটি করে খেলতে খেলতে আচমকা সে সবার অলক্ষ্যে দূর আকাশের পাখি। পাশাপাশি বসবাস, একসাথে পড়ি, খেলি, পুকুরে ডুব-সাঁতার কাটি, পালাগানের আসরে বসে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ঢুলতে থাকি, কিন্তু

প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, কল্পনাথ কাছে থেকেও কাছে নেই। সে বুঝি সর্বদাই এক সুদূর ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। তার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বুঝি সারা জীবনেও অতিক্রম করবার নয়। এই কাছে তো এই দূরে। এই মনে হয় গলা জড়িয়ে ধরে আহ্লাদে ঝুলে পড়া চলে, এই মনে হয় ওকে ছোঁয়াও সম্ভব নয়।

সব মিলিয়ে কল্পনাথ যেন ওই দক্ষিণপাড়ার বেদে বৈরাগী।

আমি জয়াকে কখনও ডালিমের কথা বলিনি।

কেন বলিনি সে ব্যাপারে আমার নিজের মনেও ধন্ধ রয়েছে।

জয়ার সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা চিরকালই বেশ ভালো। আমার জীবনের প্রায় সব কথাই বলেছি ওকে। কিন্তু ডালিমের প্রসঙ্গটা কেন যে ওর সামনে কখনো তুলিনি, সে কথা আমার নিজের কাছেও আজ অবধি স্পষ্ট নয়।

সন্ধিপুর গাঁয়ের সুরেশ্বর চক্রবর্তীর তিন ছেলে। প্রমোদনাথ, অঘোরনাথ আর বাণীবিনোদ। খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার ওঁদের। সুরেশ্বর পূজাপাঠ, কোষ্ঠীগণনা, যজমানি, এইসব নিয়েই থাকতেন। শাস্ত্রপুরাণে খুব পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন আজীবনকাল খুব সৎ আর ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। বড় ছেলে প্রমোদনাথ অল্প বয়েস থেকেই খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। বিয়ে-থা করেননি তিনি। জ্যোতিষ, কোষ্ঠীগণনা এবং কবিরাজি চিকিৎসা করে খুব নামডাক হয়েছিল চারপাশে। আমরা খুব ভয় পেতাম ওঁকে।

বাকি দু'ছেলেকেই শাস্ত্রশিক্ষা করতে ভাটপাড়ায় পাঠিয়েছিলেন সুরেশ্বর। সেই সুবাদে অঘোরনাথ এবং বাণীবিনোদ ভাটপাড়ার গুরুগৃহে ছিলেন দীর্ঘদিন। অঘোরনাথের ছিল প্রাইমারি অবধি বিদ্যে। বাণীবিনোদ অবশ্য ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়েছিলেন। খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন বাণীবিনোদ। তো, দীর্ঘকাল ভাটপাড়ায় কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন ওঁরা, অঘোরনাথ যতটা ধার্মিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সংস্কারাচ্ছন্ন এবং শুচিবাইগ্রস্ত, বাণীবিনোদ ততটাই নাস্তিক। ঈশ্বরে তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না বাণীবিনোদের। দৃঢ় গলায় বলতেন, ঈশ্বরই এযাবৎ মানুষের চতুরতম আবিষ্কার। ঈশ্বরের জন্মদাতা পিতা হল মানুষই।

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল বাণীবিনোদের। একেবারে গুলে খেয়েছিলেন ওগুলো। কিন্তু দাবি করতেন, শাস্ত্রপুরাণ পড়তে পড়তে, বুঝতে বুঝতেই ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় বিশ্বাস চলে গিয়েছে। জাতপাতেও তিলমাত্র বিশ্বাস ছিল না তাঁর। কোনও প্রকারের কুসংস্কারই ঠাঁই পেত না মনে। শাস্ত্র-পুরাণকে ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাসই করতেন না। ছেলেবেলায় তিনিই আমার দেখা একমাত্র মুক্তমনের মানুষ।

দেখেশুনে হতাশ অঘোরনাথ বলতেন, ছিল একটি সুপুষ্ট ফল, এখন পচিয়া গিয়া মদের তুল্য।

অন্য গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে ফি-বছর দুর্গাপূজাতে চণ্ডীপাঠ করবার জন্য ডাক পড়ত বাণীবিনোদেরই। কেন কি, তাঁর মতো শুদ্ধ উচ্চারণে চণ্ডীপাঠ করতে কেউই পারত না আমাদের এলাকায়।

পরবর্তীকালে, যখন একটুখানি বড় হলাম, বাণীবিনোদের সঙ্গে খুব জমে গেল কল্পনাথের। অঘোরনাথের একমাত্র পুত্রসন্তান হওয়ার সুবাদে কল্পনাথ বাণীবিনোদের ভাইপো। আর সেই সূত্রে আমরা, অর্থাৎ কল্পনাথের সহপাঠীরা সবাই তাঁর ভাইপো। তিনি আমাদের সবাইয়ের বাণীকাকা।

খুব সুন্দর করে কথা বলতেন বাণীকাকা। গাঁয়ের স্কুলে পড়াকালীন আমরা সময় পেলেই ঘিরে বসতাম ওঁর চারপাশে। ওঁর কথা শুনতে শুনতে কখন জানি কেটে যেত সময়। তিনি আমাদের কিস্তিতে কিস্তিতে শোনাতেন পৃথিবীতে ধর্ম, ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্টবাদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস। বোঝাতেন, মানুষের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক। কেবল আমাদেরই নয়, সুযোগ পেলে অন্যদেরও তিনি বোঝাতে চাইতেন ওইসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বগুলি। বলা বাহুল্য, গাঁয়ের মানুষ ওকে শ্রদ্ধা করত,

কিন্তু ওঁর ওইসব তত্ত্বগুলোকে বড় একটা আমল দিত না। আর অঘোরনাথ, ছোট ভাইয়ের এহেন অধঃপতনে মুহ্যমান তিনি, জনান্তিকে আক্ষেপ করে বারবার বলতেন ওই কথাগুলো, ছিল সুস্বাদু ফল, পচিয়া গিয়া এখন সুরা।

জমিদারবাড়িতে যখন কম্বুকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করতেন বাণীবিনোদ, আমরা বিস্ময় প্রকাশ করে শুধিয়েছি ওঁকে, এই বলেন, বিশ্বাস করেন না, আবার গদগদ গলায় পাঠ করেন...।

শুনে বাণীবিনোদ ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ধর্মের কথা ভাবিয়া তো পাঠ করি না, নিজের কথা ভাবিয়া পাঠ করি। পুরো চণ্ডীটাতে, বুঝলি, শব্দগুলো এমনভাবে সাজানো, আবৃত্তি করতে করতে মনের মধ্যে উদ্দীপনা পাই। যেমন ধর্, স্বদেশী গান, কবিতা, যেমন ধর্ স্লোগান, কিংবা ঔজস্বিনী বক্তৃতা, মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরি করে কিনা? আসলে, শব্দের একটা রহস্যময়তা রয়েছে। শব্দ ক্রিয়া করে মানুষের মনে, মস্তিষ্কে। এই ধর্, তোকে কেউ বাবু-বাছা বললে তোর মনে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া, আবার শালা বললে, অন্যরকম। একটা মাত্র শব্দে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, আবার চিরতরে ভাঙিয়া যায়। শুধু মানুষ নয়, পশুপ্রাণী, গাছপালা, এমন কি জড়বস্তুর ওপরও শব্দের প্রভাব অপরিসীম। শব্দের কী মাহাত্ম্য দ্যাখ্, কুকুরকে তু-তু করিয়া ডাকলে সে ছুটিয়া আইস্‌বে তোর কাছে, কু-কু করিয়া ডাকলে কিন্তু আসবেনি। আবার হাঁসকে চো-চো আওয়াজ করিয়া ডাক্, কিংবা বেড়ালকে চুক-চুক করিয়া, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আইস্‌বে তোর পাশ। হাঁসকে তু-তু করিয়া, কিংবা কুকুরকে চো-চো করিয়া ডাকলে অরা সাড়া দিবে? কেন এমনটা হয়? শব্দগুলোর অর্থ কি অরা বোঝে? বোঝে না। তবু কেন ওরা ছুটিয়া আসে কিংবা আসে না? সেই কারণেই বলছিলাম, শব্দ ভারী রহস্যময়। কোন্ শব্দ যে কার মনে কেমন করিয়া ক্রিয়া করে, সাধারণভাবে বুঝিয়া ওঠা মুশকিল। আসলে, শব্দগুলো মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়া আঘাত করে। যাকে বলে, সাউন্ড-ইফেক্ট। ধ্বনি-মাহাত্ম্য। কবিতা, গান, স্লোগান, চেঁচামেচি, হাসি অথবা মড়াকান্না, মানুষের মনের মধ্যে সবকিছুরই সাউন্ড-ইফেক্ট আলাদা আলাদা। রাগপ্রধান গান শুনেছু? শুনিয়া দেখিস, কথা প্রায় নেই বললেই চলে, কেবল ধ্বনির ওঠানামা; তাতেই একটা রাগ শুনতে শুনতে প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যায়, অন্যটাতে বুকের মধ্যে হু-হু করিয়া উঠে, বিষাদে ভরিয়া যায় মন, চোখ ফাটিয়া জল আসে। আবার এমন রাগও রয়েছে, শুনলে পরে শরীরে-মনে দৃপ্তভাব জাগে।

অনেকক্ষণ ধরে খুব রহস্যময় গলায় কথাগুলো বলে যেতেন বাণীকাকা। আমরা ওই বয়েসে সবটা বুঝতাম না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগত খুবই।

প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে ভারী এক মমতাবোধ ছিল বাণীকাকার বুকে। মাঝেমধ্যেই কথাবার্তায় প্রকাশ হয়ে পড়ত তা।

বলতেন, মানুষ জাতটা, বুঝলি, যত বুদ্ধিমান, ততই বোকা। কবি কালিদাসের মতোই বোকা সে। গাছের যে-ডালে বসিয়া আছে, ওই ডালটাকেই কাটিয়া ফেলতে চায়। তাই তো যথেচ্ছ পশুপ্রাণী শিকার করিয়া, নির্বিচারে গাছগাছাল কাটিয়া, মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই প্রকৃতি ও পরিবেশের এমন হাল করেছে, যাতে করে তার নিজেরই জীবনসংশয় আজ।

আমরা সমবেত গলায় প্রশ্ন তুলি, কেন এমনটা করে মানুষ?

—করে, কারণ, মানুষ বাইরে যতটা সভ্য, ভেতরে ততটাই বর্বর, লুটেরা। গায়ের জোরেই ভোগ করতে চায় দুনিয়ার সবকিছু। যেন এই দুনিয়াটা অদেরই কেনা তালুক! অথচ এই পৃথিবীটা তো তৈরি হয়েছে তার সব বাসিন্দাদের জন্য। কেবলমাত্র মানুষের জন্য তো নয়। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছগাছাল, সবাইয়ের তো এই পৃথিবীর সবকিছুর ওপর সমান অধিকার। কিন্তু মানুষ নামক জাত-লুটেরারা কবে আর সেকথা বুঝেছে! এই বলে বাণীকাকা সরাসরি চোখ রাখেন সুবিকাশের দিকে, কেন কি, মুখুজ্যা বংশের ছেলে সে। তার বাপ-দাদারা এলাকার জবরদস্ত জমিদার। প্রজা উৎপীড়নে বড়ই নামডাক ওদের চিরকাল।

এতদিন বাদে ভাবি, ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ, সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারে জন্মেও এতটা মুক্তমনা কী করে হলেন বাণীকাকা! দুনিয়ার সবকিছুর সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ধারণা কেমন করে গড়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে!

কেমন করে গড়ে উঠেছিল এমন প্রখর বাস্তববোধ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে সবকিছুকে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা, ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

অঘোর জেঠুর পাঁচ মেয়ের মধ্যে ডালিমই ছিল সবার ছোট। ডালিম এবং তার চার দিদির মধ্যিখানে কল্পনাথ।

অঘোর জেঠু ছিলেন আজীবনকাল খুব কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। জীবনের সবকিছুকেই তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। যা কিছু করতেন, কর্তব্যবশেই করতেন। খাওয়া-দাওয়া, মলত্যাগ, প্রেম, রমণ, সবকিছুই একেবারে নিয়ম মেনে করে যেতেন তিনি, কোনও আবেগের বশে নয়, নেহাত্ই কর্তব্যবশে। খুব বৃদ্ধ বয়েসে যখন নানান কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, শয্যাশায়ী, তখনো তাঁকে যদি কেউ আলটপকা শুধোত, কী করছেন? তার জবাবে অঘোর জেঠু বলতেন, সাধনা করছি। বাঁচবার সাধনা। যদি তার জবাবে কেউ শুধিয়ে বসত, এখনো আপনার বাঁচার এত সাধ? তো তার জবাবে অঘোর জেঠু বলতেন, সাধ নয়, সাধনা। আমার কোনও সাধ নাই জীবনে। বাঁচিয়াও যে আছি এতকাল, সাধ করিয়া নয় মোটেই। আসলে, বাঁচাটা আমার কর্তব্য। আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে একটি মাত্র কারণে। সেটা হইল বাঁচিয়া থাকা। প্রাণ নামক যে আশ্চর্য ভোমরাটিকে দান করা হইল জন্মমুহূর্তে, সেটিকে মৃত্যু নামক রাক্ষসের করাল থাবা থেকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমার কর্তব্য। জানো তো, জন্মমুহূর্তে প্রত্যেক জীবকে বিধাতাপুরুষ বলিয়া দেন, তোকে একটা অমূল্য চিজ দান করা হইল। জীবন। যতদিন পারিস তাকে বাঁচিয়ে রাখিস। তুই কবে মরবি, কেমন করিয়া মরবি, তা ভাববার জন্য আমি রয়েছি, আরও অনেকেই রয়েছে। তুই কেবল চেষ্টা করিয়া যা, কতদিন, কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকতে পারিস। সেটাই তোর একমাত্র সাধনা। কাজেই, জীবনে যা-কিছু করেছেন অঘোর-জেঠু, সবই নিতান্তই কর্তব্যবশে করেছেন। কোনও ব্যক্তিগত আবেগ ছিল না তার মধ্যে। দুনিয়ার সবকিছুর প্রতি সেই কারণেই বুঝি এক ধরনের ঔদাসীন্য ছিল তাঁর।

কল্পনাথ বাবার থেকে তেমন কিছুই নেয়নি। কেবল ওই ঔদাসীন্য ছাড়া। সে ছিল সব অর্থেই এক অন্য জগতের উদাসীন বাসিন্দা।

ডালিম সেই ছেলেবেলা থেকেই ছিল খুবই ডাকাবুকো। একেবারে ছেলেদের মতোই গাছকোমরে ছিল সে। কতবার যে মাড়োতলার বটগাছের ডালে চড়ে বসে রয়েছে, আমি গাছের তলা দিয়ে যাওয়ামাত্তর ওপর থেকে হুপ্ আওয়াজ তুলে ভয় দেখাতে চেয়েছে আমাকে! বলত, আমি শাকচুন্নি। তোমার ঘাড় মটকাবো বলিয়া বুসিয়া আছি তখন থেকে। হরবখত গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ত, দিঘির জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটত। সমবয়েসি ছেলেদের সঙ্গে কাপড়ের বল নিয়ে পাল্লা দিয়ে খেলত। আমি আর কল্পনাথ যখন শেষ বিকেলে রানীহাঁস দিঘির পাড়ে গাছগাছাল, পশুপ্রাণী, কীট-পতঙ্গের সঙ্গে মশগুল রয়েছি, মাঝে মাঝেই শুঁকতে শুঁকতে একেবারে অকুস্থলে গিয়ে হাজির। একা একা। প্রথমে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নানান জাতের আওয়াজ তুলে আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। ওঁ কঁল্প—, আমাকে মাঁছ দেঁ—নইলে তোঁদের ঘাঁড় মঁটকাবো—। বলাই বাহুল্য কল্পনাথ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলত সেটা। একা একা এতটা পথ আসার জন্য ধমক দিত ডালিমকে। ডালিম তখন হাসতে হাসতে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিত আমাদের সঙ্গে। রেগে যেত বটে, তবে মনে মনে খুশিই হত কল্পনাথ। ছোট বোনটার ওপর কিছুতেই রাগ করতে পারত না সে। বরং ওর হাত দিয়েই কাঠবিড়ালিগুলোকে বাদাম কিংবা হিরামনকে পাকা লঙ্কা দিত। আমাদের সঙ্গে যখন সন্ধের আঁধার গায়ে মেখে ঘরে ফিরত ডালিম, ততক্ষণে ওকে খুঁজে খুঁজে বাড়ির সবাই হেদিয়ে পড়েছে। তখনই সবাই বলাবলি করত, এ মেয়ে শ্বশুর-ঘর করতে পারবে না।

আমার চেয়ে তার বয়েসের ব্যবধান বছর চারেক। আমি আর কল্পনাথ যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, ডালিম তখন সবে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছে। যে-কোনো কারণেই হোক, খুব ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল আমার বড়ই ন্যাওটা। নিজের দাদা কল্পনাথের চেয়ে আমার প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব ছিল চিরকালই বেশি। কল্পনাথের বোন হিসেবে সে ছিল আমাদের যে-কোনও সফরের সঙ্গী। বিশেষ করে এই ধরনের

ফল-পাকুড় সংগ্রহের, কিংবা মেলা-পার্বণে যাওয়ার বেলায় আমি ডালিমকে সঙ্গে নিতে চাইতাম।

কল্পনাথের সব দিদিই আমাকে খুবই ভালোবাসত, যদিও বিন্দুদি অর্থাৎ কল্পনাথের মেজদির প্রতি আমার টানটা ছিল সবচেয়ে বেশি। তার জন্য বুঝি আমি ওই বয়েসে হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারতাম। কল্পনাথের দিদিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল সে। একেবারে তাকিয়ে থাকবার মতো রূপ ছিল তার। সে তুলনায় ডালিম অতখানি রূপবতী ছিল না। কেবল তার চোখদুটো ছিল এমনই মায়াবি, এমনই গভীরতা ছিল চোখের মণিতে, ওই চোখদুটোই আমাকে কিশোর বয়েসে সারাক্ষণ টানত। তাবলে আমাদের মধ্যে প্রেম হয়নি কখনোই। কোনও মিষ্টি সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি ডালিমের সঙ্গে। বরং ওর সঙ্গে খুনসুটি-মারামারির সম্পর্কটাই ছিল বেশি।

পাড়ার যে ক্ষীরকুল গাছটার তলায় আমরা ভোর হলে ছুটে যেতাম পাকা ক্ষীরকুলের লোভে, নিশিকান্ত ওঝা ওই গাছের মগডালে সতীশ দাশের দ্বিতীয়পক্ষের ভূতটাকে, বড়ই নেইআঁকড়া ছিল সে, কৌটোয় ভরে তুলে দিয়ে এসেছে এক অমাবস্যার রাতে। চিরনির্বাসিত করে দিয়েছে ভূতের সমাজ থেকে। সেই গাছের তলায় ডালিমকে প্রায়ই দেখতে লাগল সবাই। আমিও। আসলে, পাকা ক্ষীরকুল ছিল ডালিমের বড়ই প্রিয়। ওই টানে, আমাদের সঙ্গে প্রায়ই ভিড়ে যেত সে। কখনো কখনো এমনটা হয়েছে, খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙামাত্তর আমি দৌড় মেরেছি ক্ষীরকুলতলার উদ্দেশে। পৌঁছে দেখি, ফুল-ফুল ছাপা গোলাপি ফ্রক পরে ডালিম দ্রুতহাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে তলায় পড়ে থাকা পাকা ফলগুলি। এমননিতে খুব উদার মনের মেয়ে ছিল ডালিম, বিশেষ করে আমার বেলায় তার উদারতার কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। ওদের বাড়িতে কোনও ভালো জিনিস কেউ নিয়ে এলে, মিঠাই, লজেন্স..., আমি গোপনে তার ভাগ পেতাম, কোনও সময় একবার, কোনও সময় দু'বার। অর্থাৎ কল্পনাথও এসব লোভনীয় সামগ্রীর ভাগ দিত আমাকে। কিন্তু সে যদি ক্বচিৎ ভুলে যেত, কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে দিয়ে উঠতে না পারত, ডালিমের কিন্তু এ ব্যাপারে একবারের জন্যও ব্যত্যয় হত না। কিন্তু কেবল ক্ষীরকুলের বেলায় সে ছিল চিরকালই বেজায় স্বার্থপর। আগে এসে চোদ্দআনা কুল কুড়িয়ে ফেলেছে বলে আমাকে তার সামান্য হলেও ভাগ দেবে, তেমনটি হওয়ার জো ছিল না। হাজার অনুনয়েও তাকে সে ব্যাপারে তিলমাত্র টলানো যেত না। কিন্তু কোনো দিন যদি আগে পৌঁছনোর সুবাদে আমি কুড়োতাম চোদ্দআনা ফল, তার থেকে অন্তত দশআনা ওকে দিতেই হত। যতক্ষণ না দিচ্ছি, সারাক্ষণ ঘ্যানর-ঘ্যানর করে কানের পোকা বের করে দিত। কিনা, পেটে ব্যথা কচ্ছিল বলিয়া সারারাত ভাল ঘুম হয়নি, তাই শেষ রাতে চোখদুটা লাগিয়া গেছল, সেই কারণেই ঘুমটা ভাঙতে একটু দেরি হয়্যা গেছে, কিন্তু তাই বলে যে-গাছের তলা থেকে তারা সমবেতভাবে রোজ ফল সংগ্রহ করে, সেই ফলের ওপর যেহেতু তাদের দুজনেরই সমান দাবি, কাজেই, যে আগে এসেছে সে যদি সবগুলি ফল কুড়িয়ে ফেলে তো তার একটা অংশ অন্য হকদারকে দেওয়াটা নাকি আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তবে, সেই একটা অংশ কেন কুড়োনো ফলের সিংহভাগ হবে, তার জবাবে সে গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাটাকেই শ্রেয় মনে করত।

সেবার খুব রটে গেল, আগামী ১৯শে চৈত্র সৃষ্টির শেষদিন। ওইদিন সকালে পুব আকাশে সারবন্দী দ্বাদশ সূর্যের উদয় হবে। দুপুরের মধ্যেই সবকিছু জ্বলেপুড়ে খাক। আশঙ্কা, আতঙ্ক, নিঃশব্দ প্রতীক্ষা, সখসাধ মিটিয়ে নেওয়া, প্রিয়জনকে দেখে আসা, ভালোমন্দ খেয়ে নেওয়া, পালাক্রমে সারা গ্রাম জুড়ে এসব চলতে থাকে পুরোদমে। অঘোর জেঠুর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে হোমযজ্ঞ চলতে থাকে।

ক্ষীরকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছলোছলো চোখে ডালিম বলেছিল, উনিশ তারিখের পর এই ক্ষীরকুল গাছটা আর রইবেনি, বল শঙ্করদা?

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, শুধু ওই গাছটা? ভূ-ভারতে কেউই বাঁচিয়া রইবেনি। তুই, আমি কেউ না।

শুনে চোখদুটো আরও ছলোছলো হয়ে উঠেছিল ডালিমের। বলে, আমরা দুজনাতেই একসাথে যমরাজের থানে যাবো, বলো? আলাদা আলাদা যাবোনি।

ফি-বছর শীতে কেশিয়াড়িতে টকি বসত। তাঁবুর তলায় খড়ের আসনে বসে টকি দেখা। হাফ-টাইমে চানাচুর...র... গর...র.ম। পালা হত 'বহুৎ দিন হুয়ে', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'লক্ষহীরা'...। আমাদের টকি দেখতে যাবার যাবতীয় আয়োজন থেকে শুরু করে ফিরে আসা অবধি পুরো পর্বটাই ছিল বর্ণাঢ্য।

তো, কেশিয়াড়িতে সেবার টকি এল। আমার বড়পিসি এসবের খোঁজ রাখত সবচেয়ে বেশি। সে-ই সমবয়েসিদের পাশাপাশি মা-মাসির বয়েসিদেরও তাতিয়ে একজোট করত। সে-ই কী পালা হচ্ছে তার খোঁজখবর জোগাড় করত।

সেবার চলছিল 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। দু'তিনটি পরিবার গরুর গাড়ি সাজিয়ে রওনা দিল টকি দেখতে। কল্পনাথদের দুটো গাড়ি। তাতে কল্পনাথের দিদিরা ছিল, আর ছিল ডালিম। কল্পনাথ ছিল আমাদের গাড়িতে। আমি, কল্পনাথ, বড়পিসি, মোহরদি। রামুকাকা ছিল গাড়োয়ান। ছোটকাকা বসেছিল রামুকাকার পাশে। গাঁ'টা না পেরোতেই ডালিম বায়না ধরল সে আমাদের গাড়িতে আসবে। শেষ অবধি আমাদের গাড়িতে ওকে আনতেই হল। গাড়িতে থিতু হয়েই চানাচুরের তিনটি 'বস্তা' কেনার জন্য সে কল্পনাথের থেকে একআনা আর আমার থেকে দু'আনা আদায় করবার জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল। শেষ অবধি পয়সাটা দাবিমতো আদায় করেই ক্ষ্যান্ত হল সে।

যেবার আমাদের গাঁয়ে প্রথম থিয়েটার হল, ডায়োনামো বসল, মাইক এল, সারা সন্ধিপুর গ্রামটা একেবারে নেচে উঠেছিল। যেন মজে আসা যমী খালে অকস্মাৎ জোয়ার এল।

ধাপে ধাপে পুরো ব্যাপারটার সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় তিন মাস আগে। পালা স্থির হল—'রক্ততর্পণ' আর 'লালপাঞ্জা'। মৃগেন সুর এল ওস্তাদ হয়ে। সে একাঙ্গী নির্বাচন করল কল্পনাথকে। সখী সেজে নেচেনেচে গাইবার জন্য ছ'জন বালিকাও নির্বাচন করল। ডালিমও এল ওই দলে। শুধু নির্বাচিতই হল না, ডালিম হল সামনের সারির ডাঁইয়া নাচিয়ে। আর, ততদিনে আমরা জেনে গিয়েছি, নাচিয়েদের মধ্যে সামনের সারির ডাইনের নাচিয়েটিই সবার সেরা। ওই জায়গাটি পাওয়ার পর ডালিমের কেমন লেগেছিল জানি নে, কিন্তু আমার মনে স্ফূর্তির অন্ত ছিল না।

তারপর মৃগেন সুর পালার গানগুলোতে সুর দিল, নাচের তালিম দেওয়া শুরু করল একেবারে অ-আ-ক-খ ধরে...।

একদিন কাঁথি থেকে ভাড়ায় স্টেজ এল। ড্রপসিন, দৃশ্য অনুসারে ব্যবহার করবার জন্য অনেকগুলো ব্যাকসিন, উইংস...। বাঁশ বেঁধে স্টেজের ফ্রেম বানানো হল। বিভিন্ন বাড়ি থেকে চৌকি এনে স্টেজের মেঝে হল। ড্রপসিন, ব্যাকসিন আর উইংস খাটিয়ে যখন স্টেজ তৈরির কাজ শেষ হল, গোটা সন্ধিপুর গ্রাম ভেঙে পড়ল তা দেখতে। ওই ক'টা দিন আমি, কল্পনাথ, গজানন, ঝংকার প্রায় সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতাম স্কুল মাঠের আশেপাশে।

খড়গপুর থেকে ডায়োনামা এল। তারা দিনভর, রাতভর পুরো স্কুলমাঠ জুড়ে তার খাটাল। ডায়োনামোটাকে বসানো হল মুখুজ্জ্যাদের হাস্কিং মেসিন রাখবার ঘরে।

বেলদা থেকে মাইক এল আগের দিন। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ফুল স্পীডে চালু হল মাইক, যাতে করে অ্যাতো বড় গাঁয়ের কোনও প্রান্তের মানুষই না অভিযোগ করতে পারে যে, সমান হারে চাঁদা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের দিকে মাইকের গান যথেষ্ট পরিমানে শ্রবণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তখন নানান দিকে কাজ চলছে। সারাক্ষণ এর দরকার হচ্ছে ওকে, ওর দরকার হচ্ছে তাকে। মাইক সে কাজে বড়ই সহায় হল। নগেন বায়েন এক মাতব্বর। সে মাইকম্যানের পাশটিতে বসে রইল সারাক্ষণ, আর, যার যখন যাকে দরকার হল, বলা মাত্তর মাইকে 'অ্যালাউন্স' করে দিতে লাগল, কিনা, গণেশ ভঞ্জ...গণেশ ভঞ্জ...আপনি যেখানেই যে অবস্থায় থাকুন না কেন, অবিলম্বে ইস্টেজের পাশে গিয়া ফণিভূষণ জানার সহিত সাইক্ষাৎ করুন। গণেশ ভঞ্জ...গণেশ ভঞ্জ...আপনি যেখানেই থাকুন...। এতদ্দ্বারা, সারা মেলা জুড়েই নয়, সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল গণেশ ভঞ্জ আর ফণি জানার নাম। দুজনের বাড়ির বউড়ি-ঝিউড়িরা তাদের আপনজনের নামটি মাইকের গলায় শুনতে পেয়ে যারপরনাই চমৎকৃত, উচ্ছ্বসিত, পাশে বসে থাকা সখীতুল্য বউটির গায়ে ঠেলা দেয়, অই শুন্, শুন্ না লো, তোদের দাদার নাম মাইকে বলতিছে। মেলায়

ঘুরতে ঘুরতে ওই দুই ব্যক্তির ছেলেমেয়েগুলোও আহ্লাদে আটখানা, কিনা, ওই শুন্, আমার বাবাকে কেমন বারবার ডাকতিছে! তাতে করে যারপরনাই ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে সমবয়েসিরা। তাদের মধ্যে দুঃসাহসী পচা দলাই সমবয়েসিদের দৃষ্টি এড়িয়ে সটান চলে যায় মাইক রুমের সামনে। অল্পক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একসময় মরিয়া হয়ে ঢুকেই পড়ে।

নগেন বায়েনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে আবদার জোড়ে, আমার বাবাকে একটু মাইকে ডাকিয়া দিবে?

নগেন বায়েনও যেকোনও উপলক্ষ্যে মাইকে চেঁচাতেই চায়, কেন কি, তার ঘরওয়ালিও তো ততক্ষণে একে-তাকে শোনাতে লেগেছে, কিনা, হুই শুনো, তুমাদের দাদার গলা! এই ক'দিন তো মানুষটার নাওয়া খাওয়া অবধি বন্ধ, কেন কি, উ ছাড়া 'অ্যালাউন্স' কইর্‌বার লোক নাই।

পচার আবদার শুনে মাইকে গলা সাধবার একটা সুযোগ পেয়ে যায় বটে নগেন বায়েন, কিন্তু সহসা ধরা দিতে চায় না। ধমকে উঠে শুধোয়, ক্যানে, তোর বাপকে কুন্ রাজকাজ্জে কার দরকার হইল?

পচা তার কোনও জুতসই জবাব দিতে না পেরে কেবল পায়ের নখ দিয়ে মাটি খোঁচাতে থাকে।

—তোর বাপের নাম কি?

পচার বাপের ডাকনাম বোকা, আর পোশাকি নাম ব্যোমকেশ দলাই। পচা কিন্তু পোশাকি নামটাই বলে, কেন কি, সারা গাঁ জুড়ে মেসিনে ছড়িয়ে পড়বে তার বাপের নাম, সে নামটি পোশাকি না হলে মানায়?

একটুক্ষণ পচার দিকে তাকিয়ে থাকে নগেন বায়েন। একসময় ফরমায়েশ করে, যা, একটা জদ্দাপান কিনিয়া লিয়া আয়।

অতি সামান্য দাবি নয় সেটা। এক খিলি পানের দাম দু'পয়সা। পচার কাছে মেলা দেখা বাবদ গুটি চারেকের বেশি পয়সা নেই। কিন্তু নিজের বাপের নাম মাইকের গলায় চাউর করতে গিয়ে তার থেকে দুটি পয়সাই খরচ করতে রাজি সে। দৌড় মারে পান-সিগারেটের দোকানের দিকে।

এমনিতে তখন গাঁয়েঘরে ভাজা-দোক্তা খাওয়ার চল্। সুবাসিত জর্দা দিয়ে নিয়মিত পান খেত জমিদার হিরন্ময় মুখুজ্জার মা মন্দাকিনী। মেদিনীপুর শহর থেকে কিনে আনা হত সে জর্দা। নগেন বায়েনের পক্ষে নিয়মিত জর্দাপান খাওয়া এক স্বপ্ন বৈ নয়। তো, জর্দাপানটি মুখে পুরে সে মাইকে ফুঁ দেয় জোরে জোরে তিন বার। এই ফুঁ দেবার দুটো উদ্দেশ্য। এক, মাইকটি চালু রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া, দুই, সমবেত সবাইকে আগাম সঙ্কেত দেওয়া যে, একটা ঘোষণা হতে চলেছে, যাতে করে তারা আগাম উৎকর্ণ হয়ে থাকতে পারে এবং ঘোষিত তথ্যগুলি প্রথম থেকে শুনতে পারে।

একসময় নগেন বায়েন ঘোষণা করে ব্যোমকেশ দলাইয়ের নাম। বারবার তিনবার। প্রতিবারেই তাকে মাইক-ঘরের সামনে চলে আসতে বলে।

পচা ততক্ষণে তার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে গেছে। উদ্দেশ্য, তার বাপের নাম যখন মাইকে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, তাই শুনতে শুনতে তার বন্ধুদের চোখমুখের কী হাল হয়, তা স্বচক্ষে তারিয়ে তারিয়ে দেখা। কিন্তু তিনবারের মধ্যে দু'বার ডাকবার পরও যখন বন্ধুদের মধ্যে কোনই হেলদোল দেখা গেল না, তখন অগত্যা পচাকেই বাড়তি উদ্যোগ নিতে হয়। সে বলে ওঠে, হাই শুন্, আমার বাবাকে মাইকে ডাকছে!

বন্ধুরা বিশ্বাসই করতে চায় না, কিনা, কাকে না কাকে ডাইক্‌ছে, তোর বাপের নাম তো বোকা দলাই। বাস্তবিক বোকার পোশাকি নামটি যে ব্যোমকেশ, গাঁয়ে-ঘরে ক'জনাই বা জানে তা! পচাকেও মনে মনে স্বীকার করতে হয় তা। সে বারবার বন্ধুদের মনে প্রত্যয় জাগাবার চেষ্টা চালায় যে, তারই বাপকে ডাকা চলছে মাইকে, কিনা অতখানি গুরুত্ব পেয়ে গেছে তার বাপ। কিন্তু বন্ধুদের তা বিশ্বাসই করাতে পারে না কিছুতেই, মাঝের থেকে করকরে দুটো পয়সা জর্দাপানের পেছনে বেরিয়ে যাওয়ার দুঃখটা সে ভুলতে পারে না কিছুতেই।

তৃতীয় দিনে কামাখ্যা পণ্ডিতের ব্যাটা গজানন ঘটাল এক কাণ্ড। নগেন বায়েনকে পান এবং সিগারেট ঘুষ দিয়ে ডালিমকে ডেকেছিল ষষ্ঠীপুকুরের পাড়ে। ডালিম যায়নি, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে খুব হৈচৈ

হয়েছিল। নেহাত পণ্ডিমশাইয়ের ছেলে, নইলে গজাননের কপালে দুঃখু ছিল সেবার।

তখন আমি প্রায় রোজদিনই যেতাম কল্পনাথদের বাড়িতে। কেবল আমিই নয়, কল্পনাথের অন্য বন্ধুরাও যেত। ঝংকার, গজানন...। ডালিম তাদের সঙ্গে দাদার মতো মান্যতা সহকারে কথাবার্তা বললেও আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার বেলায় পুরো তরিকাটাই যেত বদলে। আমার সঙ্গে তার ছিল আগাগোড়া এক ধরনের খুনসুটির সম্পর্ক। আমাকে জ্বালাতন করে, জব্দ করে, খুবই মজা পেত সে। ভীম-একাদশীর মেলায় আমরা একবয়েসি ছেলেরা একসঙ্গে ঘুরতাম। মেয়েরা বড়দের নজরদারির মধ্যে থেকে নিজেদের মতো ঘুরত, যাত্রাগান শুনত। কিন্তু ফি-সন্ধ্যায় মেলায় ঢুকে ওই জনসমুদ্র থেকে ডালিম আমাকে খুঁজে বের করতই। আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত যুধিষ্ঠিরকাকার জিলিপির দোকানে। কোনদিন আমার ঘাড় ভেঙে জিলিপি খেয়ে, কোনওদিন জিলিপির পরও আমার পয়সায় একটি উড-পেনসিল, কিংবা পেনসিন কাটবার মেসিন, নিদেন একটা ইরেজার বাগিয়ে নিয়ে ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যেত।

একটু যখন বড় হয়েছে, সিক্স-সেভেনে পড়ছে, তখনই তার মধ্যে লজ্জা-সরমের উন্মেষ ঘটেছিল। তখনই কল্পনাথের অন্য বন্ধুদের থেকে এক ধরনের গা বাঁচানো ব্যাপার লক্ষ করতাম তার মধ্যে। কেবল আমার ক্ষেত্রেই তার তিলমাত্র আড়ষ্টতা ছিল না। আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত অবলীলায়। কথায় কথায় গুম গুম করে কিল বসিয়ে দিত পিঠে। আমার সঙ্গে যে-কোনও রকম আচরণে তিলমাত্র সঙ্কোচ ছিল না তার। আমাদের বাড়িতে এলে সে অবলীলায় ঢুকে পড়ত আমার ঘরে। আমি হয়তো পড়ছি তখন, সে ঘরে ঢুকেই বইপত্তর সব এলোমেলো করে দিত নিমেষে। বলত, ঢের পড়াশোনা হয়েছে। আর পড়তে হবেনি। উঠ, মা তোমাকে ডাকতিছে।

কল্পনাথের মা, আমাদের মহেশ্বরী-জেঠিমা, আমাকে ভালবাসতেন খুবই। তাঁর যাবতীয় ফাইফরমায়েশ খাটবার জন্য আমাকেই মনে পড়ত তাঁর। কাজেই, ডালিমের হাতের টানে আমি রওনা দিতাম কল্পনাথের বাড়ির দিকে।

বলছিলাম দক্ষিণপাড়ার বেদে-বৈরাগীর কথা। অতি সাধারণ একটি মানুষের খোলস ভেঙে আচমকা বেরিয়ে পড়ত একজন অচেনা মানুষ। আমাদের কল্পনাথও ঠিক তাই।

বেদে-বৈরাগীর আসল নাম বৈরাগী দাস। একেবারে কাঁচা বয়েসে ঘর ছেড়েছিল সে। একদল বেদে এসে ওই সময়টায় তাঁবু টাঙিয়েছিল পরশুরামের ডাঙায়। বেদেদের একটা মেয়েতে মজেছিল বৈরাগী। ওর টানেই ঘর ছেড়েছিল। ওকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিল। বারোআনা জীবন বেদেদের তাঁবুতে কাটিয়ে একেবারে পড়ন্ত বেলায় যখন ফিরে এল গাঁয়ে, ওকে চেনা মুশকিল। পরনে কুর্তা-পাজামা, দু'হাত মিলিয়ে চার-পাঁচখানা মোটা মোটা পাথর বসানো আংটি, প্রতিটির মাথায় তিন-চারটে [illegible] মুণ্ডু। গলায় কালো সুতোয় খাটো করে বাঁধা তাবিজ। বাঁ কানে তামার ছোট্ট দুল। পায়ে নাগরা। সুর্মা আঁকা চোখদুটিতে কোন্ এক অচেনা মুলুকের দুর্বোধ্য ছায়া। নাকের তলায় টাঙির মতো গোঁফ।

প্রথম যেদিন আগড় ঠেলে নিজের বাড়ির উঠোনে ঢুকেছিল বৈরাগী, ওর নিজের বউই, শীতের বিকেলে উঠোনের এককোণে বসে বসে রোদ্দুর পোহাচ্ছিল সে, বৈরাগীকে দেখে ভয়ের তানে চেঁচাতে চেঁচাতে তীরবেগে ঢুকে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে। ঝনাৎ শব্দে দরজা দিয়েছিল সদরে। তার চিল্লানিবু সারাৎসার বুঝে নিয়ে দামড়া ছেলে-ভাইপোগুলো লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল উঠোনে, কেন কি, বৈরাগীর বউয়ের কান্নাজড়িত বয়ান অনুসারে, লোকটা নাকি উঠোনে ঢুকেই মুচকি মুচকি হাসছিল, আর হাতের ইঙ্গিতে ওকে বারংবার ডাকছিল।

মাথায় লাঠির গা পড়বার আগের মুহূর্তে, ছেলে নাকি ভাইপোদের, কার যেন চোখের তারায় বুঝি

চকিতের তরে ভেসে উঠেছিল একটা চেনা মুখের আদল। আর তাতেই সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে যায় বৈরাগী।

বৈরাগী যখন ফিরে আসে, আমরা তখন প্রাইমারি স্কুলের নিচু ক্লাসের পড়ো সব। মনে আছে, অন্তত হপ্তাটাক ধরে সারা গাঁ ভেঙে পড়েছিল বৈরাগীকে দেখতে। ওকে নিয়ে এক ধরনের সোরগোল পড়ে গিয়েছিল গাঁয়ে। বৈরাগীকে নিয়ে, তার পোশাক আশাক, টাঙ্গির মতো গোঁফ, দেহাতি ভাষায় বাতচিৎ, সবকিছু নিয়েই তখন গল্প ছড়াচ্ছে সারা গাঁয়ে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে সেই গল্প, শাখাপ্রশাখায় বাড়ছে, ফুল-ফলও ধরছে সেই গাছের ডালেডালে। সন্ধিপুরের হাওয়ায় ভাসছে এক অলৌকিক বৈরাগী দাস। সবাই ডাকছে বেদে বৈরাগী।

মেয়েরা আর বাচ্চারা অনেকদিন অবধি ভিড়ত না ওর ধারেকাছে। আমাদেরও কেমন জানি ভয় করত ওকে।

একদিন, সেই প্রথম, আমাদের বয়েসিদের মধ্যে কল্পনাথই সাহস করে চলে গেল বেদে বৈরাগীর এক্কেবারে কাছটিতে। সে প্রসঙ্গ পরে।

সবাই যখন কাতারে কাতারে ভিড় করছে বেদে বৈরাগীর উঠোনে, মুখে মুখে যখন এন্তার গল্প ছড়াচ্ছে ওকে নিয়ে, গাঁয়ের জমিদার হিরন্ময় মুখুজ্যা, তখন সবে জমিদারি-উচ্ছেদ আইন পাশ হলেও তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, বেদে বৈরাগী সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। মুখুজ্যা মশাই তো আর স্বয়ং যেতে পারেন না বেদে বৈরাগীর বাড়িতে, কাজেই, বেদে বৈরাগীই দর্শন দিতে গেল জমিদার-বাড়িতে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে সে করজোড়ে জানাল যে, সে এই এলাকার রাজাবাবুকে দর্শন করতে এসেছে।

ততদিনে শরীর থেকে ধড়াচুড়ো পুরোপুরি খুলে ফেলেছে বৈরাগী। কুর্তা ছেড়ে ন'হাতি ধরেছে। চোখের সুর্মা ঘসে ঘসে তুলে ফেলেছে চোদ্দআনা।

ওকে দেখে হিরন্ময় মুখুজ্যা বেশ খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। একসময় বাঘের ঝাপট নিয়ে বলেন, তোকে কে দেখতে চেয়েছে রে? আমি দেখতে চেয়েছি বেদে বৈরাগীকে। তুই তো আমাদের লগনা দাসের ব্যাটা বৈরাগী দাস। যা, বেদে বৈরাগী হইয়া আয়।

ফলে, বৈরাগীর শরীরে পুনরায় উঠল কুর্তা-পাজামা, নাগরা চড়ল পায়ে, চোখের পাতায় সুর্মার গাঢ় রেখা, গলায় তাবিজ...।

মুখুজ্যা মশাই বললেন, হ্যাঁ, তোকেই দেখতে চেয়েছিলাম। বেড়ে মানিয়েছে! যাত্রাপালার মারাঠা-বর্গী ভাস্কর পণ্ডিত যেন। ছোট ফণীকেও ফেল মারিয়ে দিয়েছু ব্যাটা।

জমিদার বাড়িতে সেদিন তার বেদে-জীবনের অনেক গল্প শুনিয়ে-টুনিয়ে, বাবুদের ভেলকির খেলা দেখিয়েটেখিয়ে ফিরে এসেছিল বৈরাগী। তারপর আর কোনওদিনও কুর্তা-পাজামা চড়েনি ওর গায়ে। নাগরাও ঢোকেনি পায়ে।

দেখতে দেখতে পুরোপুরি বৈরাগী দাস হয়ে গেল লোকটা। অতি সাধারণ এক চাষাভুষো গেঁয়ো মানুষ মাত্র। তার মুখের ভাষা থেকে চলে গেল হিন্দি টান। মাঠেঘাটে, আর পাঁচটা চাষাভুষোর মতো, খাটাবাটা করে অন্ন জোটাতে লাগল বৈরাগী। তার অনেক আগে থেকেই অবশ্য কল্পনাথ ওর কাছে আনাগোনা জুড়েছে। কল্পনাথের পিছুপিছু আমিও। ওর হাতসাফাই আর ভেলকির টানেই যেতাম আমি। কল্পনাথ কিসের টানে যেত কে জানে!

তখন প্রায় ষাটের ওপর বয়েস বৈরাগীর। তাও, যখন ফিরে আসে গাঁয়ে, শরীরে বেশ বাঁধুনি ছিল। কিন্তু বাংলার জল-হাওয়ায় বছরটাক না কাটাতেই সেই শরীর ধ্বসে পড়ল একেবারেই। খুব দ্রুত অশক্ত হয়ে উঠল সে। শরীরে বাসা বাঁধল চৌষট্টি কিসিমের রোগব্যাধি। অল্পেতেই হাত-পা কাঁপত। সব মিলিয়ে বেদে বৈরাগী হারিয়ে ফেলেছিল তার যাবতীয় মহিমা। এমন কি তার টাঙ্গির মতো গোঁফজোড়াটিও পাতলা হয়ে আসছিল দ্রুত। তখন সবাইয়ের চোখে সে একেবারেই সাধারণ এক গেঁয়ো বুড়ো মাত্তর।

কিন্তু যত সাধারণই হয়ে যাক, বৈরাগী দাস একটা বিশেষ সময়ে অসাধারণ হয়ে উঠত আমাদের সামনে। যখন দশের সামনে হাত-সাফাইয়ের খেলা দেখাত। ওই একটা বিদ্যেই তো সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরেছিল সে। সোনাদানা, টাকাকড়ি, কিছুই আনতে পারেনি। আমাদের অনুনয়ে কাঁপাকাঁপা হাতে যখন হাতসাফাই আর ভেলকির খেলা দেখাতে শুরু করত, আমাদের চোখের সামনেই আচমকা আমূল বদলে যেত লোকটা। হিন্দি-দেহাতি ভাষার খই ফুটত মুখে। শুরু হত অনর্গল বক্তৃতা। কাঁপাকাঁপা দুটি হাতের দশটি আঙুল অকস্মাৎ যেন মায়াবি হয়ে উঠত। সুর্মাবিহীন দু'চোখের তারায় মরে আসা আলো আবার ফিরে পেত তাদের জেল্লা। চোখের মণিজোড়ায় ঘনঘন বিজলি চমকাত। সেই মুহূর্তে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম, বেদে-বৈরাগীর দু'চোখে সুর্মার গাঢ় রেখা। অথচ সুর্মা পরা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে, অতি সাধারণ এক গেঁয়ো বুড়ো আমাদের চোখের সামনে অকস্মাৎ অসাধারণ, অচেনা হয়ে উঠত। ঠিক আমাদের কল্পনাথের মতো।

বেশ কিছুক্ষণ চৌকশ বক্তৃতা দেবার পর যখন আমরা বেশ বুঁদ হয়ে গিয়েছি, তখনই বেদে-বৈরাগী শুরু করত একের পর হাতসাফাইয়ের খেলা। কিন্তু শেষের দিকে কাঁপাকাঁপা হাতে খেলা দেখাতে গিয়ে কখনো সখনো তার অবসন্ন আঙুলগুলো হয়ত বা বিশ্বাসঘাতকতা করত। আমরা, বাচ্চারা হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে উঠতাম, কিনা, বৈরাগী জেঠু, তুমি ধরা পড়িয়া গেলে। বৈরাগী দাঁত কিড়িমিড়ি করে দেহাতি ভাষায় গালি পাড়ত, আমাদের নয়, নিজের অঙ্গজাত বিশ্বাসঘাতক আঙুলগুলোকে। সেই সঙ্গে আরও কাউকে যেন গালি পাড়ত অস্পষ্ট ভাষায়। আমরা, বাচ্চারা তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারতাম না।

কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের মানুষ এমন কি বাচ্চারা অবধি বেদে-বৈরাগীর প্রতি যাবতীয় কৌতূহল হারিয়ে ফেলল। কেবল কল্পনাথই দিনদিন এঁটুলির মতো লেপটে রইল ওর সঙ্গে। বেদে বৈরাগীর বাড়িতে যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিত না সে। কিছুদিন বাদে সহপাঠীদের মুখ থেকে কানাঘুযোয় শুনতে পেলাম, বেদে-বৈরাগীর কাছে যাদুবিদ্যা শিখছে কল্পনাথ।

এর কিছুদিন বাদে, আমাদের দুজনের বয়েস তখন পনেরো-ষোল, একদল বেদে এল আমাদের গাঁয়ে। পরশুরামের ডাঙায় তাঁবু ফেলল।

সেই আমার প্রথম তাঁবুবাসী মানুষজনকে এত কাছ থেকে দেখা।

মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বাচ্চা মিলিয়ে দলে ছিল জনাকুড়ি। সঙ্গে রামছাগল, সাপ, বেজি, বানর এবং একাধিক বাঘা বাঘা কুকুর। মেয়েরাও মরদদের মতো বুক চিতিয়ে হাঁটত। কোমরে গোঁজা থাকত বাঁকানো ছুরি। দিনরাত নিজেদের মধ্যে খুব চিৎকার করে ঝগড়া করত ওরা। কথায় কথায় ছুরি বের করত।

প্রতিদিন সকাল-সকাল দলে দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ত ওরা। মেয়ে-পুরুষ পৃথক পৃথক দল। পুরুষেরা সঙ্গে নিত সাপ, বেজি, বাঁদর..., মেয়েরা নিত জড়িবুটি, শিকড়বাকড়, নানা জাতের পাথর, ঝুটা কস্তুরি, মৃগনাভি, ধনেশ পাখির হাড়, তেল, ভালুকের চর্বি...। গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় দিনভর ঘুরত ওরা। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে সঙ্গের জিনিসগুলো বেচত। ফরমায়েশ করলে ভেলকি আর হাতসাফাইয়ের খেলাও দেখাত। তার জন্য আলাদা পয়সা অথবা চাল-ডাল অথবা সবজি নিত। মরদেরা সাপ, বেজি, বাঁদরের খেলা দেখাত, ডুগডুগির শব্দ তুলে গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চাদের জুটিয়ে নিত নিজেদের পেছনে, আর তাতে করেই দু'দিনের মধ্যে রটে গেল, ওরা ছেলেধরাও বটে। বাচ্চার বাপ-মায়েরা সাবধান। ফলত, প্রতিটি ঘরেই বাচ্চাদের বাইরে বেরোনো কার্যত বন্ধ হয়ে গেল।

একা একা ওদের তাঁবুর কাছাকাছি যাবার সাহস আমার কোনকালেই হত না। কিন্তু কল্পনাথের বুকে ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। কাজেই, আমরা দু'জনে একদিন চলে গেলাম পরশুরামের ডাঙায়।

তখন উনুন জ্বালিয়ে রান্না চড়িয়েছে মেয়েরা। মরদেরা ছুরিছোরায় শান দিচ্ছে। রামছাগলটাকে দুইছে একটা বুড়ি। আমাদের দেখে কমবয়েসি মেয়েগুলো খিলখিলিয়ে হাসে। রঙিন ঘাগরা দুলিয়ে বারংবার হেঁটে যায় পাশ দিয়ে।

শেষ অবধি আমাদের দেখে কিছুই বলল না বেদেরা। বরং বয়স্ক গোছের একজন ইসারায় কাছে

ডাকল।

গেলাম।

বুড়ো বলল, বৈঠিয়ে খোকাবাবু।

বসলাম। আর, আমাদের দেখবার জন্য চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ের দল। নিজেদের মধ্যে দেহাতি ভাষায় অনর্গল কথা বলছিল ওরা। বুঝতে পারিনে, কিন্তু আন্দাজ করি, আমাদের নিয়েই কথা বলছে।

একসময় সাহসে ভর করে শুধোই, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

সে কথায় ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। হো-হো করে হাসে। বেদেদের বাড়ি! বলে, এখানে আমাদের বাড়িঘর এই ডাঙাতে।

বোকার মতো প্রশ্ন করায় ততক্ষণে চোখেচোখে ধমক খেয়েছি কল্পনাথের কাছে। সামলে নিয়ে শুধোই, এর আগে কোথায় ছিলে?

মুরুব্বি বেদে জবাব দেয়, পরানপুর।

সেদিন ওরা আমাদের খেতে দিয়েছিল খাঁটি জংলি মধু, আর এক ধরনের শুকনো ফল, খেজুর জাতীয়, খুবই ভালো লেগেছিল। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল একটি অল্প বয়েসি মেয়েকে। টুকটুকে ফরসা গায়ের রঙ ওর। ছিপছিপে শরীর। ফিতে বাঁধা বিনুনি ঝুলছিল পিঠের ওপর। গলায় ছিল একাধিক ঝুটো পাথরের মালা। সুর্‌মা আঁকা চোখদুটিতে কী যেন ছিল, চোখদুটো বারবার টানছিল আমাকে। গাঢ় লাল রঙের ঘাঘরা পরেছিল মেয়েটি, জংলাছাপ চোলি। কী যে ভালো মানিয়েছিল ওকে! আমাদের বয়েসিই হবে, সামান্য বেশিও হতে পারে। আমাদের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল মেয়েটি। তার চোখের তারায় ছিল এক ধরনের বিষণ্ণতা। সবাই যখন কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ছিল এর-ওর গায়ে, মেয়েটি ছিল কী আশ্চর্য রকমের শান্ত, কেবল ওর চোখের তারাদুটিতে লুকিয়ে ছিল দুর্বোধ্য এক ভাষা।

সেদিন ফেরার পথে ওর কথাই সারা পথ ভাবলাম আমি।

পরে জানলাম, ওর নাম সর্‌তিয়া। কল্পনাথই বলল আমায়।

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। কী করে জানল সে মেয়েটির নাম? আমরা তো এই প্রথম এলাম এদের তাঁবুতে। কিন্তু বারবার প্রশ্ন করেও কল্পনাথের থেকে কোনও জবাব পাইনি সেদিন।

এখন মনে হয়, মেয়েটির নাম সত্যি সত্যি সর্‌তিয়া ছিল তো? নাকি, ওটাও কল্পনাবিলাসী কল্পনাথের মস্তিষ্কজাত নাম? কারণ, যতই বয়েস বেড়েছে, বোধবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, ততই আমার বিশ্বাসটা পোক্ত হয়েছে যে, কল্পনাথের মগজের মধ্যে সেই শিশুকাল থেকেই কেমন করে যেন জমে রয়েছে অনেক নাম, জায়গা, দৃশ্যপট, ছবি, বাস্তব, আধা-বাস্তব, অবাস্তব..., বাকিটা পুরোপুরি কল্পনা।

বাণীকাকা মাঝে মাঝে একটা কথা বলতেন। হঠাৎ-হঠাৎ শুধোতেন, এই, তোর বয়স কত রে?

বলি, কত আর, পনেরো-ষোল।

বাণীকাকা বলেন, ধুশ।

অবাক হয়ে বলি, তবে?

বাণীকাকা বলেন, তার চেয়ে ঢের বেশি।

বলি, কত বলে মনে হয় তোমার?

বাণীকাকা একটুখানি ভাবেন, ধর্‌, পাঁচ হাজার বছর, কিংবা দশ হাজার, পনেরো, বিশ হাজারও হতে পারে, কিংবা তার চেয়েও বেশি।

বদ্ধ পাগলের দিকে যেমন চোখে তাকায় মানুষ, আমিও হয়ত বা তেমন চোখে তাকিয়ে ছিলাম বাণীকাকার দিকে, তাই দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকেন তিনি। বলেন, খুব সোজা করে বললেও ব্যাপারটা বুঝতে পারবি কিনা সন্দেহ। তবুও বলছি, শোন্‌। তোর বাপ-মায়ের থেকেই তো জন্মেছু তুই? না-কি?

খুব গভীরভাবে না বুঝলেও ওই বয়েসে এটুকু বুঝি যে, বাপ-মায়ের শরীর থেকেই কিছু কিছু

উপাদান নিয়ে আমার জন্ম।

বাণীকাকা বললেন, তোর শরীরে তবে তোর বাপ-মায়ের একটু একটু রয়েছে। তোর বাপ-মা যাদের থেকে জন্মেছে, তাদের শরীর থেকে একটু একটু লিয়েছে তারা। সেই একটু-একটুর থেকে সামান্য হলেও তোর শরীরে ঢুকেছে। এইভাবে পেছোতে থাক্, বুঝতে পারবি, কত বছর আগের মানুষের শরীরী উপাদান লুকিয়ে রয়েছে তোর এই ছোট্ট শরীরে। আর, শরীর মানে তো শুধু রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জাই নয়, ভাবনা, চিন্তা, স্মৃতি, সবকিছু।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন বাণীকাকা। বলেন, বুঝতে পারলি না তো? আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই ব্যাপারটা। ধর্, এক শিশি নীল রঙ, সেটা ঢাললি এক বালতি জলে, পুরো জলটাতেই তো নীলটা মিশিয়া গেল। এবার তা থেকে এক মগ জল লিয়া মেশালি আর এক বালতি জলে। ওই বালতির জলে শিশির নীল রঙটার খানিকটা হলেও মিশিয়া রইল কিনা? এইভাবে যদি পরপর হাজার বালতি জলে আগের বালতি থেকে এক মগ করে নিয়ে মেশাতে থাকিস, তো শেষের বালতিটাতে নগণ্য পরিমাণ হলেও মিশিয়া রইবে শিশির ওই নীল রঙ। তখন যদি বালতির জলকে শুধোনো যায়, ওহে জল, তুমি তোমার শরীরে ওই প্রথম শিশির নীল রঙ বহন করতিছো কিনা? কী জবাব দিবে ওই জল? জবাব দিবে, হ্যাঁ, বহন করতিছি বৈকি। তো, ওই শিশির নীল রঙটুকু যদি পাঁচ, দশ, পনেরো, কিংবা বিশ হাজার বছর আগের হয়, তো জলকে স্বীকার করতেই হবে, অত বছর আগের উপাদান রয়েছে ওর শরীরে।

ব্যাপারটা সামান্য বোধগম্য হলেও ওই বয়েসে পুরোটা বুঝিনি। কিন্তু এখন ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই, বাণীকাকা কেমন করে বলত এসব কথা! সম্প্রতি জীনতত্ত্ব যা-সব কথা বলছে, বাণীকাকা কেমন করে জানত তা! আর, তখনই আমার মনে হয়, কল্পনাথের মগজেও কি জমে ছিল হাজার হাজার বছর আগেকার এক প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির ভাণ্ডার, যেখান থেকে তুলে এনেছিল সে একটি মেয়ের নাম। সর্‌তিয়া! যেখান থেকেই সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল গাছগাছাল, পশুপ্রাণী, কীটপতঙ্গের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কটিকে!

বেদের মেয়েগুলো ভরদুপুরে আসত গেরস্তের বাড়িতে। তাদের পরনে থাকত রঙিন ঘাঘরা, চোলি। হাতে-পায়ে মোটা মোটা খাড়ু। গলায়-কানে ঝুটো পাথরের মালা। কাঁধে ঝুলত হাজার সামগ্রীতে ঠাসা বিশাল পুঁটলি।

তখন বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে বড় একটা থাকত না কেউ। মেয়েগুলো সদর দরজার মুখে আসর পেতে বসত। এক অদ্ভুত পাঁচমেশালি ভাষায় ভাব জমাত গেরস্থের বউড়ি-ঝিউড়ির সঙ্গে। পুঁটলি থেকে বের করত শেকড়-বাকড়, পাথর, ঝুটো-কস্তুরি, মৃগনাভির সম্ভার। বউড়ি-ঝিউড়িরা বাড়ির পুরুষদের লুকিয়ে চুরিয়ে এটা-ওটা কিনত। কেনাকাটা চুকেবুকে গেলে পর কমবয়েসিরা বায়না ধরত হাতসাফাই আর ভেলকির খেলা দেখাবার জন্য। রাজি হত ওরা। চেয়ে নিত কিছু আলু, বেগুন, কাঁচালঙ্কা...। ওগুলোই চোখের সুমুখে বারেবারে হাপিস করে দিত, আবার বের করে দিত অবলীলায়। এ-হাত থেকে ও-হাতে, হাত থেকে ঝুলিতে, ঝুলি থেকে গেরস্ত বউটির কোঁচড়ে, খুব কাছ থেকে খুব সচ্ছন্দে অবাক হয়ে যাওয়ার মতো খেলা দেখাত ওরা। কী ওদের বাকচাতুর্য, কথাবার্তায় কী মোহিনী ছাঁদ! গেরস্থের মেয়েগুলোর তাক লেগে যেত। ভেলকি দেখানোর বদলে চাল তো ওরা পেতেই, ভেলকির উপকরণ হিসেবে চেয়ে নেওয়া আলু, বেগুন, লঙ্কা, জাতীয় সবজিগুলোও ওদেরই প্রাপ্য হত স্বাভাবিকভাবেই, কেন কি, কোন্ নিচু জাতের লোক ওরা, কোন্ ধর্মের তারও নেই ঠিক, ওদের হাতে ঘসাঘসি খাওয়া সবজিগুলো আবার ফেরৎ নেয় নাকি কেউ!

পরে কল্পনাথ আমাকে বলেছে, জানিস তো, আসলে, এটাও ওদের ভেলকির মাধ্যমে সবজি সংগ্রহের একটা চতুর পদ্ধতি। এটাও এক ধরনের ভেলকির পর্যায়েই পড়ে। নচেৎ পাথর, নুড়ি, কিংবা অন্য হাবিজাবি জিনিস দিয়েও দেখানো যেত ওই খেলা। আমি কিন্তু বিষয়টাকে এইভাবে দেখিনি, মানে, মাথাতেই খেলেনি ওটা। কল্পনাথ কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

জড়িবুটি, তেল-মলম বিক্রি করা এবং ভেলকি দেখানো ছাড়াও হাত দেখা, নখদর্পন, কাকচরিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ভবিষ্যতবাণীও করত ওরা। হাজার সমস্যা সঙ্কটে হাবুডুবু খেতে থাকা গেরস্ত মানুষের কাছে তার টান ছিল অবিশ্বাস্য। একজনের যখন হাত দেখা চলত, চারপাশে ভিড় জমিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনত বহুজন। হাত দেখতে দেখতে ওরা এক-একজনের সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করে বসত, এমনই অনায়াসে, একেবারে যেন বিধাতার গলায় উচ্চারণ করত কথাগুলো, সবাই চমকে উঠত। আর, যার সম্পর্কে কথাগুলো বলা হল, সে তখন ঘেমে নেয়ে একসা। তারপর চলত ওষুধ বাতলানোর কাজ। পাথর, তাবিজ, স্বপ্নে পাওয়া ফুল, বাঘের নখ, ভালুকের দাঁত, পেচকের বিষ্ঠা...। চলত বাত-বেদ্‌নার, মৃগী-পাগলামোর ইলাজ। রাতকানা, নাকডাকা, দুঃস্বপ্ন দেখবার প্রতিবিধান। দলের সবগুলি মেয়ে তিন-চারটে দলে ভাগ হয়ে ঘুরে বেড়াত আশেপাশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়।

একটা দলে থাকে ওই মেয়েটা, কল্পনাথ যার নাম বলেছে সর্‌তিয়া। ওই দলটাকেই মনে মনে খুঁজতে থাকি আমি। ওই দলটা আশেপাশের কোনও পড়শির বাড়িতে ঢুকলে, পায়েপায়ে হাজির হই ওখানে।

হাত দেখে পাড়ার শান্তবুড়ির সম্পর্কে দিন-তিনচার আগের একটা দল যা-যা বলেছিল, তিন-চার দিন বাদে আর একটা দল এসে হুবহু একই কথা বলল। শুনে সবাই তাজ্জব হয়ে যায়। আমিও। যেটুকু সন্দেহ ছিল মনে, একেবারেই ঘুচে গেল। ওই নিয়ে পাড়া জুড়ে মেয়েমহল তোলপাড়। জ্যোতিষবিদ্যার অভ্রান্ততা নিয়ে হাজার মন্তব্য হাজারজনের। সে আলোচনা আর ফুরোয় না কিছুতেই।

ওই সময়েই কল্পনাথের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলাম।

একদিন কল্পনাথ আমায় একান্তে বলল, জানিস তো, আজকের দলে ছিল আগের দলের একজন। শান্তবুড়ি সম্পর্কে মন্তব্যটা করেছিল ওই মেয়েটাই।

শুনে আমার বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। কাজেই, শুরু হল আমাদের যৌথ গোয়েন্দাগিরি। এবং এক হপ্তার মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। বুঝলাম, কল্পনাথের কথাই ঠিক। ওরা প্রতিদিনই নিজেদের মধ্যে দল বদলা-বদলি করে নেয়। প্রতিটি দলে থাকে এমনই একজন, যে আগেও ওই পাড়ায় এসেছে এবং অনেক বাড়ির হাঁড়ির খবর জেনে গিয়েছে আগেই। কোন্ বুড়ির কী বিমার, কোন্ মেয়ের কী গোপন সমস্যা, যা ওরা জানতে পারে একবার, সহজে ভোলে না তা।

কিন্তু যে কথাটা ভেবে সবচেয়ে তাজ্জব হয়েছিলাম আমি, সেটা হল, কল্পনাথ কেমন করে পয়লা চটকায় ধরে ফেলল চালাকিটা? কতখানি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণের শক্তি থাকলে এটা পারে মানুষ! আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত আমি তখনই স্থির করে ফেলি, এবার ওরা এমনটা করলেই হাটে হাঁড়িটা ভেঙে দেবো।

শুনে হাঁ-হাঁ করে ওঠে কল্পনাথ। বলে, খবরদার ওই কাজটি করিসনি।

বলি, কেন? ওরা মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা কামাচ্ছে।

কল্পনাথ খুব নিরাসক্ত গলায় বলে, কী হবে ফাঁস করিয়া? ওরা করিয়া খাচ্ছে। নইলে বাঁচবে কী করিয়া? চাষ করে না, দোকানদারি, ব্যবসা কিছুই করে না, এটাই তো ওদের পেশা, তাই না?

দিন কয়েক বাদে সামান্য কয়েকটা নুড়ি নিয়ে এ-হাত ও-হাত করতে করতে কল্পনাথ দেখিয়ে দিল, বেদের মেয়েগুলোর দেখানো গুটিকয় হাতসাফাইয়ের খেলা। খুবই অপটু হাতে দেখাল বটে, তবে বুঝতে কষ্ট হয় না, ভালো করে রপ্ত করলে খেলাগুলো দেখানো সম্ভব। অন্তত হাত চালাচালির, কিংবা হাপিস করবার কৌশলগুলো আর অজানা রইল না আমার কাছে।

বলি, শিখলি কোথায় রে? বেদেরা শিখিয়েছে তোকে?

কল্পনাথ মিটিমিটি হাসতে থাকে। মাথা নেড়ে বলে, কেউই শেখায়নি, খেলাগুলো বারবার দেখতে দেখতে আমি নিজেই বুঝিয়া ফেলছি।

এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম কল্পনাথ সম্পর্কে। আমরাও তো দিনের পর দিন খেলাগুলো দেখেছি। বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনি কৌশলগুলো। কিন্তু কল্পনাথ ঠিকই বুঝে ফেলেছিল। কতখানি পাকা নজর হলে এমনটা পারে মানুষ!

আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠি, এবার যখন দেখাবে খেলাগুলো, হাটে হাঁড়িটা ভাঙিয়া দুবো।

কল্পনাথ এবারও বিরক্ত হয় খুবই। চোখ দিয়ে ধমকায় আমাকে, বললাম না, ওরা করিয়া খাচ্ছে। এটাই অদের পেশা।

দেখতে দেখতে সর্‌তিয়ার সঙ্গে আমার এক ধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল। আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম পুরোপুরি। সম্ভবত আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল ওই নীলনয়না মেয়েটিও। যদিও মেয়েটার সঙ্গে আমার কোনও ধরনের কথাবার্তাই হয়নি একদিনের তরেও, কিন্তু হাঁটতে চলতে, গেরস্থের বাড়িতে খেলা দেখাতে দেখাতে, আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হত প্রায়ই। সমবয়েসি এত ছেলের ভেতর আমাকে যে সে আলাদাভাবে চিনতে পারে, সেটা স্পষ্ট ফুটে উঠত তার নীলনয়নে। আরও অনেক কিছুই ফুটে উঠত ওর চোখের তারায়, যার পৃথক পৃথক অর্থ অতি সহজেই করতে পারতাম আমি। এবং তার থেকে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত টানতাম, সর্‌তিয়াও আমার প্রেমে পাগল হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আমার স্পষ্ট মনে হত, নীরব ইঙ্গিতে কিছু একটা বোঝাতে চাইছে সে বারবার। তার সেই ইঙ্গিতের পাঠোদ্ধার করতে পারিনি কোনওদিনই। হয়ত পারতাম, যদি আরও কিছুদিন থাকত ওরা পরশুরামের ডাঙায়। কিন্তু বেদে-বৈরাগী এমন হুলস্থূল বাধাল, এমন কোমর বেঁধে লাগল ওদের পেছনে, এমন নানা জাতের ভয় ঢোকাতে লাগল গেরস্থের মনে, এবং তার ফলে সবাই মিলে এমন চাপ সৃষ্টি করল ওদের ওপর, রাতারাতি তাঁবু তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল কোথায় কে জানে!

বেদেদের ওপর বৈরাগী দাসের অমন সাপের মত রোষ কেন, ওই বয়েসে বুঝতে পারিনি তা। হাত সাফাইয়ের খেলা দেখাতে দেখাতে যখন বৈরাগীর হাতের অবসন্ন আঙুলগুলো বেইমানি করত, তখন অকথ্য ভাষায় আঙুলগুলোকে গালি পাড়ত সে। আরও কাউকে যেন গালি পাড়ত, বুঝতে পারিনি তার মর্মার্থ। কিন্তু বড়রা বুঝত। তারাই বলাবলি করত আড়ালে আবডালে। তার সবগুলোকে জুটিয়ে-পুটিয়ে কল্পনাথ যে সিদ্ধান্ত টেনেছিল, তা হল, বৈরাগী দাস যে বেদের মেয়েটার প্রেমে পড়ে গাঁ ছেড়েছিল, পরবর্তীকালে বিয়ে করেছিল তাকেই। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছিল ওদের। কিন্তু ওই বউকে নিয়ে একদিনের তরেও সুখী হতে পারেনি বেচারা। দু'জনের মধ্যে চিন্তায়-ভাবনায় ছিল আকাশপাতাল ফারাক। বৈরাগী দাস তার বেদে-বউকে নিয়ে থিতু হতে চেয়েছিল, চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করবার স্বপ্ন দেখত সে। একটা স্থায়ী ভূমিতে শিকড় চারাবার আজন্ম সাধ ছিল তার মনে। বেদে-বউয়ের সেটাই ছিল সবচেয়ে অপছন্দের। সে মেয়ে একঠাঁই থিতু হতে চায়নি কিছুতেই। সে কেবল আজীবনকাল হাঁটতে চেয়েছিল। চরে বেড়াতে চেয়েছিল আজীবনকাল, বিচরণশীল ভেড়াদের মতো, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাহাড়ে-প্রান্তরে...। সে মেয়ে নাকি বলত, থিতু হব জীবনে একবারই। একেবারে শেষদিনে। তার আগে নয়। ছেলেটা হয়েছিল তাগড়া জোয়ান। বেদে-মায়ের রক্ত বুঝি সে বেশি পরিমাণে বহন করত শরীরে। সে ছিল গোঁয়ার, মাথাগরম, বেপরোয়া এবং দুর্বিনীত। সব মিলিয়ে দাঁতাল বন-শুয়োর একটি। কিংবা লালচোখো বুনো মোষ। বাঙালি বাপের মতো একটা ভেতো আদমিকে মনেমনে ঘেন্না করত। একটু বড় হওয়া মাত্রই প্রকাশ হতে থাকে সেটা। বেদে-বউও তাকে মনেমনে তাচ্ছিল্য করত। আসলে, নেশাটুকু কেটে যাওয়ার পর থেকে বৈরাগীর সবকিছুই খুব তেতো লাগত ওই মেয়ের কাছে। শেষের দিকে নাকি সরাসরি বলে ফেলত তেমন কথা। কিনা, তুমি পুরুষই নও। লিঙ্গওয়ালে জেনানা একটি।

ওদের বোঝাবার নাকি অনেক চেষ্টাই করেছে বৈরাগী। হেরে গেছে। শেষ অবধি অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়ে এল। সেই কারণেই নাকি বেদেদের ওপর এমন অন্ধ রোষ তার মনে।

কিন্তু বেদেদের তাড়াবার জন্য তার অমন উঠে পড়ে লাগবার পেছনে নাকি অন্য কারণও ছিল। একদিন রটে গেল, বেদেদের ওই দলে বৈরাগীর মেয়েটাও রয়েছে। বৈরাগী নাকি লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখাও করেছে। পাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, সেই কারণেই নাকি বৈরাগী ওদের তাড়াবার জন্য অমন কোমর বেঁধে লেগেছিল।

বেদের দল একদিন চলে গেল। আচমকাই চলে গেল ওরা। সর্‌তিয়ার সঙ্গে শেষ দেখা করবার

সুযোগ পাইনি আমি। সে দুঃখ আমার সারা জীবনেও যাবে না। এখনো অবধি একান্ত হলে ওই একজোড়া নীল চোখের গূঢ় ইশারা বুকের মধ্যে অনুভব করি।

বেদের দল চলে গেল বটে, কিন্তু ততদিনে বৈরাগী আর তার বেদে-মেয়েকে নিয়ে কত যে গালগল্প রটে গিয়েছে সারা গাঁয়ে! কিন্তু আমার আর সর্‌তিয়ার সেই হাবুডুবু গাঢ় প্রেমের কাহিনী সকলেব অগোচরে রয়ে গেল।

তাই কি? একদিন তবে আচমকা কেন বলল কল্পনাথ, যাবার বেলায় সর্‌তিয়া তোর তরে কেঁদেছিল।'

কেমন করে বলল কথাটা! ঘুণাক্ষরেও ওকে কোনওদিন কিছু বলিনি তো! কেমন করেই বা জানল সে, সর্‌তিয়া আমার জন্যই কেঁদেছে?

কিন্তু তাও আমি বিশ্বাস করলাম কল্পনাথের কথা। আমি তো জানিই, কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল কল্পনাথের! সাদা চোখে ধরা পড়ে না, এমন কতকিছুই যে ধরা পড়ে যেত ওর চোখে! ওই চোখদুটিও সে পেয়েছিল ওর কাকা বাণীবিনোদের থেকে।

কল্পনাথ ছাড়াও আমার সেই গোপন কৈশোরপ্রেমের কথা আরও একজন জানত বলে মনে হয়েছিল আমার। কল্পনাথের ছোট বোন ডালিম। আমার নিজস্ব ধারণা, ওই বয়েসে সেও কোনও গতিকে আন্দাজ করেছিল ব্যাপারটা। একদিন আমাকে একান্তে পেয়ে বেশ সাংকেতিক ভাষায় বলেছিল, তুমি তো আবার একটা মিঠা নুড়ি পাইয়া গেছলে।'সেটাও হারিয়ে গেল?

অথচ তখন তার বয়েস বড় জোর বারো।



তারপর কবে কবে যে ডালিম আমার চোখের সুমুখে বড় হয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি।

বিন্দুদির মতো সুন্দরী ছিল না ডালিম, তবে তার গায়ের রঙ ছিল টকটকে ফরসা। কাটাকাটা চোখমুখ। পাতলা ঠোঁট। আর সব মিলিয়ে তার মধ্যে এক ধরনের আলগা চটক ছিল।

যখন তার বিয়ের কথা উঠল, আমি আর কল্পনাথ তখন কলেজের ছাত্র, আর ডালিম আমাদের গাঁয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল থেকে সবে মাধ্যমিক পাশ করেছে।

একবার কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে শুনি, ডালিমের জন্য পাত্রের খবর এসেছে। পাত্রের বাড়ি সুদর্শনপুর। বেলদার কাছাকাছি এক গ্রাম। তবে গাঁয়ের পাশ দিয়ে পিচ রাস্তা গিয়েছে বলে, ওদের মধ্যে এক ধরনের শহুরে-শহুরে ভাব। ছেলেটির নাম মাখন। প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করে আর এগোয়নি। তবে বাড়ির অবস্থা খুবই ভালো। যথেষ্ট পরিমাণে জমি-জিরেত, পুকুর-বাগান ছাড়াও পাত্রের বাপ রেশন-দোকানের ডিলার।

অঘোর জেঠু ততদিনে চার-চারটি মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে একেবারে বিধ্বস্ত। তিনি ততদিনে প্রৌঢ়ত্বের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন। মাথার চুল হয়েছে ধবধবে শাদা। গায়ের চামড়া ঢিলে। সারা মুখে এক ধরনের 'যাই যাই' ভাব। কেবল পাঁচ কন্যার শেষতমটিকে অরক্ষণীয়া দেখে যেতে হবে, এটাই ছিল তাঁর অষ্টপ্রহরের আক্ষেপের বিষয়। কাজেই, অবস্থাপন্ন বাড়ির প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করা বেকার ছেলেই তাঁর কাছে অনেক।

বেলদাবাজারের মতো শহরের লাগোয়া গাঁয়ের পাত্র ডালিমকে দেখতে আসবে। শুনেই সবাইয়ের মনে এক ধরনের সম্ভ্রম জেগেছিল বুঝি।

বিন্দুদি বলল, পরশু আসতিছে অরা। তুই কিন্তু সারাদিনই আমাদের বাড়িতে থাকবি। শহরের মানুষ অরা। অদের হালচালই আলাদা। তোরা শহরে পড়াশুনা করতিছু, অদের আদবকায়দা তোরা ছাড়া আর কে বুঝবে! আর, কল্পটা তো সর্বদা হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়। মাটিতে পা রাখিয়া হাঁটা তার ধাতে নেই। কাজেই, তোর উপরই অতিথি সামলানোর পুরা দায়িত্ব।

সেই প্রথম ডালিমকে খুব গম্ভীর লাগছিল আমার। বেশ থমথমে মুখ করে দু'একবার আমার সামনে দিয়ে এল গেল, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনওরূপ রগড় করল না সেদিন। সেদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, ডালিম কবে কবে বড় হয়ে গিয়েছে।

যেদিন পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে ডালিমকে, তার আগের দিন সারা বিকেল বসে বসে নানা রকমের প্ল্যান তৈরি হল। কোথায় বসানো হবে, জলখাবারের ব্যবস্থা কী হবে, দুপুরের রান্নাতে কী কী পদ হবে, সবকিছুই ঠিক করা হল ভাবনাচিন্তা করে। বেলা দশটার মধ্যে যদি পৌঁছে যায় তো প্রথমেই লেবুর সরবৎ, তারপর গাওয়া ঘিয়ের লুচি, আলুভাজা, সুজির হালুয়া আর মোহনভোগ। দুপুরে ভাতের সঙ্গে মাছ ও মাংস দুইই রাখতে হবে। সকালবেলাতেই জেলেপাড়ার নগেন এসে মাছ ধরে দিয়ে যাবে। বেলদাবাজার থেকে আসবে মাংস। দুটো পদই রাঁধবে বিন্দুদি। বিন্দুদির রান্নার হাত ছিল খুবই ভালো। মুখে লেগে থাকত।

যেদিন ওরা আসবে, সকাল থেকে আমি ডালিমদের বাড়িতে মজুত। বোনেদের মধ্যে ইন্দুদি আর ইরাদি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে পারেনি। কেবল সিন্ধুদিই এসেছে। আর বিন্দুদি তো বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়িতেই থাকে। আমি দেখলাম, বিন্দুদি আর সিন্ধুদি মিলে সকাল থেকেই জলখাবারের বন্দোবস্ত করছে। লুচির জন্য ময়দাতে ময়েন দিয়ে লেচি বানাচ্ছে। কড়াইতে সুজি চড়িয়েছে। ভাজবার জন্য আলু আর বেগুন কেটেকুটে হলুদ-নুন মাখানোও সারা। এর মধ্যেই চান সেরে নিয়েছে বিন্দুদি। এবার দুপুরের রান্না চড়াবে সে। সদর পুকুর থেকে মাছ ধরে কেটেকুটে দিয়ে গেছে নগেন। বেলদা বাজার থেকে মাংসও এসে গেল যথাসময়ে।

এনামেলের হাঁড়িতে যখন মাংস চড়িয়েছে বিন্দুদি, তখনই জেঠিমা অর্থাৎ কল্পনাথের মা, কথাটা পাড়লেন।

বললেন, মাংসটা ডালিমই রেঁধেছে কইলে কেমন হয়?

আমরা সবাই জানি, বিন্দুদির রান্নার হাতটা চমৎকার। কাজেই, মাংসটা যে ভালোই হবে, সে ব্যাপারে আমাদের মনে কোনরূপ সংশয় নেই। জেঠিমার ইচ্ছে, একটা ভালো পদকে ডালিমের নামে চালিয়ে দিয়ে ডালিমকে ডিস্টিংশনে পাশ করিয়ে দেওয়া। ডালিমের তাতে একেবারেই মত নেই, কিন্তু দিদিরা সবাই একবাক্যে রায় দিয়ে বসে, মাংসটা ডালিমের রান্না বলেই চালানো হবে।

ডালিম খেপে গিয়ে বলে, যদি মাংসটা ভালো না হয়?

—তখন ডাহা ফেল। আমি ওর পেছনে লাগি, তখন বরপক্ষ ওই মাংস খায়্যা সেই যে বেলদার পথ ধরবে, আর এ পথ মাড়াবেনি।

অন্য দিন হলে ডালিম সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠত। কোমর কষে ঝগড়া শুরু করে দিত আমার সঙ্গে। হয়ত বা আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাকে আঁচড়ে কামড়ে একসা করে ছাড়ত। কিন্তু সেদিন ডালিম কিছুই বলল না, কিছুই করল না, কেবল আমার দিকে খুব অচেনা চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল।

বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সেই চেনা ডালিম ভেতরে ভেতরে একেবারেই বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

মাটির উনুনে এনামেলের হাঁড়িতে মাংসটা যখন কষা চলছিল, গন্ধটা বেরিয়েছিল খাসা, রঙটিও বেশ খোলতাই হয়েছিল। আমি বিন্দুদির পাশটিতে বসে সবকিছু এগিয়ে দিচ্ছিলাম। একসময় কষা-টসা শেষ হলে পর মাংসে জল দিল বিন্দুদি। টগবগিয়ে ফুটতে লাগল ঝোল। বিন্দুদি রান্নার জায়গা ছেড়ে চলে যাবার আগে আমাকে হুকুম দিয়ে গেল, ঝোলটা একটুখানি ফুটলে পর জ্বালনটা কম কমিয়া দিবি। অল্প আঁচে ফুটবে ঝোল। ফুটতে ফুটতে গাঢ় হবে। আর, মাছগুলা রইল, দেখিস যেন বিড়ালে মুখ না দেয়।

বিন্দুদি চলে গেল গরম মসলা গুঁড়ো করতে। আমি উনুনশাল আগলে বসে রইলাম।

বসে বসে জ্বালনের তদারকি করছি, মাঝে মাঝে হাঁড়ির মধ্যে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি। ঝোলের রঙটি বেশ খোলতাই হয়েছে। খুসবুও বেরোচ্ছে দারুণ। পাশ দিয়ে যারা হাঁটাচলা করছে, জনেজনে

ডেকে ডেকে দেখাতে থাকি ঝোলের রূপ।

বলি, দেখিয়া যাও সবাই, ডালিম কী সুন্দর মাংস রান্না করেছে।

শুনে কল্পনাথের দিদিরা সবাই মুখ টিপে হাসতে থাকে।

ডালিম কিন্তু একবারের তরেও রান্নার জায়গায় আসেনি। কিন্তু দূর থেকে সবকিছু দেখছে সে। সবাইয়ের সব কথা শুনছে।

ওকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি চেঁচিয়ে বললাম, ডালিম, তুই কোত্থিকে শিখলি রে অমন মাংস রান্না?

শুনে ডালিম এমন চোখে তাকাল আমার দিকে, বুঝি চোখ দিয়েই ভস্ম করে দেবে আমাকে।

একসময়, তখন রান্নার কাছে আমি ছাড়া আর কেউই ছিল না, উনুনের জ্বালন কমিয়ে দিয়েছি আমি, হাঁড়ির মধ্যে অল্প আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে মাংস, এমনি সময় ডালিম নিঃশব্দে রান্নার জায়গায় আসে। আমার পাশটিতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ওকে।

চান সেরে একখানা নীল রঙের পাটভাঙা শাড়ি পরেছে ডালিম। সঙ্গে হাতায় কারুকার্য করা নীল রঙের ব্লাউজ। শাড়ির কুঁচি লুটিয়ে পড়েছে মাটি অবধি। গলায় সরু চেন চিকচিকিয়ে উঠছে। পায়ে রুপোর সরু মল। কপালে নীল রঙের টিপ। একমাথা কালো ভেজা চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। একটা মিষ্টি সৌরভ ভেসে আসছে ওর শরীর থেকে। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর লাগছিল ওকে। একেবারেই অচেনা।

ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি আমি। ডালিম কিন্তু একেবারেই হাসে না। তার বদলে হাঁড়ির ভেতরে চোখ চারিয়ে ফুটতে থাকা মাংসের রঙ দেখতে থাকে।

খুব গম্ভীর লাগছিল ওকে। তাও আমি ওর পিছু লাগার লোভ সামলাতে পারিনে। একসময় খুব চাপা গলায় বলি, ভালোই তো রেঁধেছু। পাত্রপক্ষ খায়্যা ধন্য ধন্য করবে। বলা যায় না, আজই পালকির ব্যবস্থা করিয়া তোকে বউ করিয়া লিয়া না যায়।

আমার কথায় ডালিম তেমন করে বাজে না। বরং আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে ওর মুখ।

আমি ওর গাম্ভীর্যকে পাত্তা না দিয়ে বলি, দিবো নাকি এই ফাঁকে মাংসে এক মুঠা নুন ফেলিয়া?

এতক্ষণে ডালিম আমার দিকে অবাক চোখে তাকায়। এতক্ষণে মুখ খোলে সে। বলে, কেন? নুন ফেলিয়া দিলে কী হবে?

—পাত্রপক্ষ মুখে তুলতে পারবেনি।

—তাতে কী হবে? ডালিম ডাগর চোখে তাকায়।

—তোর বিয়ের সম্বন্ধটা ভাঙিয়াবে।

ডালিম আবার আমার দিকে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। আমার চোখে সরাসরি চোখ রাখে কিছুক্ষণ। একসময় মৃদু গলায় বলে, দাও না, ভয় দেখাচ্ছ কাকে? দাও না এক মুঠা নুন ফেলিয়া। দেখি কত সাহস।

আমি হাসতে থাকি। বলি, সেই ছেলেবেলা থিকে যা জ্বালিয়েছু আমাকে, শোধটা তুলতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু থাক্। সম্বন্ধটা ভাঙিয়ালে আমার মাথার চুলগুলা ছিঁড়িয়া শেষ করিয়া দিবি তুই।

ডালিম আমার মুখের ওপর চোখ রাখে। থির পলকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরপায়ে চলে যায়।



বাণীকাকার সেদিনের ওই বক্তৃতাটা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। কখনও কখনও নিজের মধ্যেও হাজার-হাজার বছর আগের স্মৃতি খুঁজে খুঁজে হয়রান হতাম আমি। মাঝে মাঝেই ভেতর পানে হাতড়াতাম সেই কারণে। কিন্তু তেমন চেষ্টা আমার ক্ষেত্রে বৃথাই হয়েছিল। দু'চার বছর আগেকার কথাও ভুলে যেতাম আমি। কিন্তু কল্পনাথের ক্ষেত্রে, যতই দিন যেতে লাগল, কথাটা বারবার মনে হতে লাগল আমার। আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাসটা ক্রমে ক্রমে গাঢ় হতে লাগল যে, কল্পনাথের রক্তে-মজ্জায়, চিন্তায়-চেতনায় কী করে যেন মিশে রয়েছে হাজার হাজার বছর আগের স্মৃতি। অনেক দিক থেকে অনেক ভাবেই তার প্রমাণ পাচ্ছিলাম আমি।

মনে পড়ে যায়, সেই আমাদের ছেলেবেলায় কল্পনাথদের উঠোনে একটা সজনে গাছ ছিল। সেই গাছের ডালে একটা কাক বসেছে। তার নজর রয়েছে উঠোনে শুকোতে দেওয়া ফুলবড়িগুলোর ওপর। কল্পনাথের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে কর্তব্যবশত আমি হুশ-হাশ শব্দ করে কাকটাকে উড়িয়ে দিতে যেতেই প্রবলভাবে বাধা দিয়ে ওঠে কল্পনাথ।

বলে, থাক্, ওড়াস্‌নি।

উৎকণ্ঠিত গলায় বলি, জেঠিমার শুকাতে দেওয়া বড়িগুলা ছোঁ মারিয়া লিয়া যাবে যে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কল্পনাথ খুব অবিচল গলায় বলে, লিয়া যাক। ওটা আমার পোষা কাক।

ওই নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক বেধে যায় কল্পনাথের।

বলি, কাক আবার কারোর পোষা হয় নাকি? কাক কি পোষ মানে? যতোসব!

কিন্তু সেকথায় কর্ণপাত করে না কল্পনাথ। সে বারংবার দাবি করতে থাকে, কাকটাকে সে পুষেছে। কাকটা নাকি ওর ভীষণ ন্যাওটা। ওর নাকি সব কথাই শোনে। কখনো নাকি চোখের আড়াল করে না কল্পনাথকে।

বলতে বলতে কল্পনাথ কাকটার দিকে তাকায়। বলে, কী রে, সকাল থেকে কিছু খাসনি?

অমনি কাকটা ক্যা-ক্যা করে ডেকে ওঠে।

কল্পনাথ বলে ওঠে, তা বলে ফুলবড়ির ওপর নজর দিসনি। মা-কাকিমা মারিয়া ঠ্যাং ভাঙিয়া দিবে তোর। অ্যাই, অন্যদিকে তাকা বলতিছি।

কাকটা ঘাড় ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকায় কল্পনাথ। কাকটাকে বলে, এখন যা দেখি, যাহ্ এখান থেকে। মণ্ডলদের বাগানে পেয়ারা পেকেছে, খা গে যা।

কাকটা অল্পক্ষণ চুপটি করে বসে থাকে। তারপর আচমকা উড়ে যায়।

—দেখলি? কল্পনাথের গলায় গুমোর। বলে, আসলে, আমি যে ওর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভাই সেটা তো জানে কাকটা।

—জ্ঞাতিভাই মানে?

—মানে, একজাতের পাখির থেকেই আমি প্রথম জন্ম নিই। সেটা অবশ্য পুরোপুরি কাক ছিল না। সে পাখির নাম ছিল দ্রোণ। আমি, বাণীকাকা, আমরা সবাই ওই একই পাখিরই বংশ।

কিন্তু ওই বয়েসেই আমার মনে হয়েছিল, এসব কি কল্পনাথের স্রেফ উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, নাকি যা-খুশি প্রলাপ বকছে ও! আমার মনে হল, ওই কাকটার সঙ্গে কল্পনাথের কোনও কথাই হয়নি। কাকটা ডেকেছে, তাকিয়েছে, উড়ে গেছে, সবই করেছে তার নিজের মর্জিতে। কল্পনাথ যা করল, বলল, সবই ওর কল্পনা, নয়ত প্রলাপ।

ভাবতে ভাবতেও কেমন খিঁচ বেধে যায় মনে। একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের বাচ্চা ছেলের কল্পনা কখনও হাজার-হাজার বছরের ওপারে পৌঁছে যেতে পারে? অথচ, কল্পনাথকে যা-যতটুকু দেখেছি, চিনেছি, প্রলাপ বকবার কিংবা ধোঁকা দেবার ছেলে সে নয়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই বাণীকাকার সেদিনের কথাগুলো ঘাই মারতে থাকে মনে। তবে কি,

কল্পনাথ তার মগজে বহন করতে থাকা হাজার হাজার বছরের স্মৃতি থেকেই বলছে এসব কথা! কেমন জানি ধন্ধে পড়ে যেতাম আমি। বারবার।

একদিন খালপাড়ে নিমগাছটার তলায় বসে রয়েছি দুজনে। মগডালে অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছে একটা কাক।

আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হেগে দিল মাথায়।

এক সময় কাকটাকে তাড়াতে যেতেই হাঁ-হাঁ করে উঠল কল্পনাথ, এ-কি, তাড়াচ্ছু কেন?

বলি, যদি মাথায় হাগিয়া-টাগিয়া দেয়?

কল্পনাথ স্পষ্টতই বিরক্ত হয়, কিচ্ছু করবেনি।

শুনে আমার রাগ হয়ে যায়। বলি, কেমন করে অতটা জোর দিয়া বলতিছু তুই?

কল্পনাথ আমার দিকে সরাসরি তাকায়, ওটা তো আমার ওই পোষা কাকটা। দ্রোণ। ওকে তো আমাদের উঠানের সজনে গাছে কতবার দেখেছু তুই। আমার পিছুপিছু এসেছে। বলেই হাসে কল্পনাথ, ব্যাটা পাক্কা গোয়েন্দা, সর্বদাই ফেউয়ের মতো আমার পিছু পিছু ঘুরতিছে। আমি কোথায় যাই, কী করি, সব ওর নখদর্পনে। বলতে বলতে মগডালের দিকে তাকায় কল্পনাথ। চেঁচিয়ে বলে, অ্যাই দ্রোণ, পুলিশে চাকরি করবি তুই? গোয়েন্দা দপ্তরে? বল্, চেষ্টা করবো?

বলতে বলতেই কাকটা হুশ করে উড়ে গেল। আর, তাই দেখে কল্পনাথ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, ব্যাটা ধরা পড়িয়া গেছে। গোয়েন্দারা ধরা পড়িয়া গেলে আর ওখানে থাকবেনি।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি কল্পনাথের দিকে। কল্পনাথের কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও ওই নিয়ে আর কথা বাড়াইনে। কেন কি, তখন আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছি, কল্পনাথ জেনে বুঝে ধাপ্পা দিচ্ছে না। দেয় না। বুকের মধ্যে গাঢ বিশ্বাসবশত তাব বাস্তবিক মনে হচ্ছে, সজনের এবং নিমগাছের ডালের কাকদুটো এক এবং অভিন্ন, এবং ওরই পোষা কাক ওটা। ওর সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, আবার ওর ওপরে গোয়েন্দাগিরিও করে।

কল্পনাথের বুকের মধ্যেকার ওই গভীর বিশ্বাসটাকে কোনদিনও ভাঙতে চাইনি আমি। কারণ, এমন নিখাদ বিশ্বাসকে ভাঙবার জন্য যে পবিমাণ পাল্টা বিশ্বাস প্রয়োজন, কোনওকালেই তা ছিল না আমার।

কল্পনাথ জেনে বুঝে মিছে বলে না, ধাপ্পা দেয় না, এই বিশ্বাসটা বুকের মধ্যে চিরটাকাল অক্ষয় থাকলে বুঝি খুবই খুশি হতাম আমি। কিন্তু আমার ধারণা, তা থাকেনি। কখনও কখনও সেই বিশ্বাসে অল্পস্বল্প হলেও চিড় ধরেছে বৈকি। সেটাও আমার কাছে এক-একটি ধাঁধার তুল্য। গাঢ় মনোবেদনারও কারণ। কেন কি, কল্পনাথকে আমি যে আসনে বসিয়েছি চিরকাল, তাকে মিথ্যেবাদী বা ধোঁকাবাজ ভাবতে আমার বুকে বেদনা জমে। কিন্তু তাও কল্পনাথকে কোনো কোনো ঘটনায় তেমনটা মনে হয়েছে আমার।

আসলে, কল্পনাথ খুব সোজা-সরল কোনোদিনই নয় আমার কাছে। ওকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে এক চিরকেলে রহস্যময়তা। ওই যে বললাম, এক্কেবারেই দূর আকাশের পাখি। কিংবা যেন এক উঁচু পাড়ওয়ালা নদী। যেন সরু খাতে অনে-ক নিচে জল। সে জল আমি ছুঁতে পারি নে। তবু পাড়েপাড়ে হাঁটতে ভালো লাগে। সে এক তীব্র আকর্ষণ, ব্যাখ্যার অতীত। মাঝেমাঝে ওকে স্বপ্নে দেখি। একবেলা ওকে না দেখলে ভালো থাকে না মন। দূরের নদীতে সূর্যের আলো পড়ে, চিকচিক করে বালি, ঝিলমিল করে জল, একঠ্যাংয়ে বক দিনভর বসে থাকে সাধকের মতো, পুরো দৃশ্যটাকে স্বপ্ন বলে মনে হয়। অপার্থিব লাগে। অথচ, চকচকে বালি, ঝিকিমিকি জল, সাধনরত বক..., এর কতটুকু যে সত্যি, আর কতটা যে মিথ্যে, অলৌকিক মায়া, কাছে না গেলে কী করে বুঝব? এর অনেকটাই তো স্রেফ দৃষ্টিবিভ্রমও হতে পারে! কাছে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে বুঝব কেমন করে? কিন্তু কাছে যাবই বা কী করে? এত উঁচু পাড় সে নদীর, জলের কাছাকাছি পৌঁছনো যে মোটেই সহজ নয়। নদী তাই অচেনা থেকে যায়, অপার রহস্যময় থেকে যায় কল্পনাথও। আমার বন্ধু, সহপাঠী, প্রাণের দোসর হয়েও তার বসবাস অল্পই মাটিতে, বেশিটা আকাশে। সে এক উল্টো গাছ। তার শিকড়-বাকড় আকাশের নীল মাটিতে, ডালপালা

ধরিত্রীমুখো, ফুল-ফল সবই পৃথিবীর সবুজ চাঁদোয়ায়। আমাদের পাশাপাশি বসবাস করেও সে ছিল আমাদের থেকে দূরবর্তী এক মানুষ। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে আচমকা উধাও হয়ে যেত, কোথায় যে চলে যেত, কেবল নিজেই জানত তা।

প্রায়দিনই বিকেলে স্কুল ছুটির পর সতী-পুকুরের পাড়ে খেলা জমে উঠত আমাদের। 'সীতাহরণ' খেলা। একটা দল রামের, অন্যটা রাবণের।

রাবণের প্রাসাদে বন্দিনী সীতা, রামের দল তাকে উদ্ধার করবে। মাঠের মধ্যিখানে বসে রয়েছে সীতা, চেড়ীর দল তাকে ঘিরে রয়েছে। দম বন্ধ করে বোল দিতে দিতে চেড়ীর দলকে দূরে তাড়িতে দিতে পারলে, সীতা সেই সুযোগে দৌড়ে চলে আসবে রামের শিবিরে। কিন্তু শিবিরে পৌঁছনোর আগে কোনও চেড়ী ওকে ছুঁয়ে দিলে, সীতা তৎক্ষণাৎ মরে যাবে।

খেলাটা যখন জমে উঠেছে, তখনই সহসা আবিষ্কার করি, কল্পনাথ আমাদের মধ্যে নেই। কখন জানি এক ফাঁকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে সে। যেদিন সে হারিয়ে যেত, সেদিন আর কিছুতেই পাওয়া যেত না ওকে। কেবল আমি আর ডালিমই জানতাম তার হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা।

আসলে, কল্পনাথের সমাজটা ছিল আমাদের চেয়ে ঢের বড়। মানুষ বাদেও দুনিয়ার আর যাবতীয় গাছ-গাছাল, পশুপাখি, লতাগুল্ম, কীটপতঙ্গ, এমন কি আকাশের তারা-নক্ষত্র, সবাই ছিল সেই সমাজের বাসিন্দা। একজন ঘোরতর সামাজিক মানুষের মতো কল্পনাথ ওদের সকলের সঙ্গে মহানন্দে মিলেমিশে বাস করত।

একদিন আমাকে অবাক করে দিয়ে কল্পনাথ বলল, সে নাকি মন্ত্রবলে মরা গাছ বাঁচাতে পারে।

সমবয়েসী হওয়া সত্ত্বেও ওই বয়েসে কল্পনাথের মধ্যে এক ধরনের ভারিক্কিভাব এসে গিয়েছিল, যার ফলে আমাদের সর্বদাই মনে হত, ও আমাদের চেয়ে বয়েসে ও জ্ঞানে ঢের বড়। তার হাঁটা-চলা এবং কথা বলার মধ্যে, তার ভ্রূভঙ্গিতে, গলার স্বরে, এমন এক ধরনের আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠত, কথা বলবার সময় চোখের মণিজোড়া এমনই বাঙ্ময় আর সঙ্কেতপরায়ণ হয়ে উঠত যে, তার প্রতি ওই বয়েস থেকেই এক ধরনের মান্যতা জন্মেছিল আমার মনে। তবুও কল্পনাথের কথা শুনে আমি চরম অবিশ্বাস নিয়ে তাকাই ওর দিকে।

কল্পনাথ আমার সেই অবিশ্বাসটাকে উপভোগ করে একটুক্ষণ। গলায় খুব দৃঢ়প্রত্যয় ফুটিয়ে বলে, একদিন তোকে দেখাব।

সেটা বোধ করি পৌষের শেষ অথবা মাঘের প্রথম। একদিন কল্পনাথের সঙ্গে ওলদা-চণ্ডীর জঙ্গলে গেলাম আমি আর ডালিম। কল্পনাথই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

আমাদের গাঁ থেকে জঙ্গলটা সামান্য দূরে। তবুও জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার কথায় ওই বয়েসে বুক ঢিপঢিপ করত আমার। কল্পনাথ কিন্তু অকুতোভয়, গটগট করে হেঁটে গেল, যেন জঙ্গলের মধ্যে সবকিছুই ওর চেনা, জঙ্গলটাই ওর আসল ঘর। যেন আমাদের গাঁয়ের টারজান সে। যেন সেই জঙ্গল-বাড়ির সবাই ওর আত্মার আত্মীয়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাচীন গাছ। পুরোপুরি নিষ্পত্র।

কল্পনাথই আঙুল দিয়ে গাছটা দেখাল আমাকে।

সে এক অচেনা জাতের গাছ। গায়ের বাকল খসখসে, কালচে। তেমন গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি। আমাদের গাঁয়ে কিংবা আশেপাশের এলাকায় ওই জাতের গাছ একটাও নেই। পাতাবিহীন গাছটা এতটাই ন্যাড়া যে, প্রথম দর্শনেই মনে হয়, মরে গিয়েছে।

শীতের সময় আমাদের এলাকায় অনেক গাছই পাতা ঝরিয়ে দেয়। কোনও জাতের গাছে আধাআধি, কোনওটাতে বা পুরোপুরি, তখন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে গাছটাকে। কিন্তু তার গুঁড়িতে-কাণ্ডে, ছালে-বাকলে জীবনের চিহ্ন বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি, একেবারে পাশটিতে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও ওই গাছটার শরীরে প্রাণের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। এমন কি, খসখসে ছালের অনেকখানি খুবলে দেখলাম, শুকিয়ে গিয়েছে ঢের আগে। বুঝলাম, এ গাছটা আর বাস্তবিক বেঁচে নেই। একেবারেই

মরে গিয়েছে।

চোখে-মুখে চরম অবিশ্বাস ফুটিয়ে কল্পনাথের দিকে তাকাই। বলি, ওই মরা গাছটাকে বাঁচিয়ে তুলবি তুই? পারবি?

মুখ টিপে হাসে কল্পনাথ। বলে, দাঁড়া।

গাছটার থেকে অল্প তফাতে একটা ডোবা মতো। কল্পনাথ গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসে। দু'তিনটা শালপাতাকে কাঠি দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাটি বানায় দু'টো। একটাতে ভরে নেয় বুনো ফুল আর দুব্বো ঘাস, অন্যটাতে জল। পুবমুখো হয়ে আসনপিঁড়ি বসে গাছটার তলায়। তারপর পুজো করবার আদলে ফুল-দুব্বো ছুঁড়ে দিতে দিতে বিড়বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে চলে। তার দু'চারটি শব্দ ছাড়া প্রায় সবটাই অস্পষ্ট থেকে যায় আমার কাছে।

অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্র পড়ে পড়ে পুজো করে কল্পনাথ। এক সময় শালপাতার বাটিতে রাখা জলের সবটুকু ঢেলে দেয় গাছের তলায়। তারপর গাছটাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে খুব গম্ভীর মুখে বাড়ির পথ ধরে। কল্পনাথের দেখাদেখি আমরাও গাছটাকে প্রণাম করেছিলাম সেদিন।

এইভাবে, অন্তত দু'হপ্তাকাল ধরে চলল কল্পনাথের নিয়মিত বৃক্ষপূজা। প্রতিদিনই আমিই ওর সঙ্গী। কোন-কোনও দিন ডালিমও। মন্ত্রগুলো যতটুকু-যা শুনতে পেয়েছি, বোধগম্য হয়নি তার অর্থ।

একসময় কল্পনাথকে শুধোই, মন্ত্রগুলোর মানে কী?

আমার দিকে খুব সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কল্পনাথ। একসময় খুব গম্ভীর গলায় বলে, মন্ত্রের মানে জানতে নেই, তাহলেই মন্ত্রের ক্ষমতা নষ্ট হয়্যা যায়।

আমার চোখেমুখে অবিশ্বাস দেখে তৎক্ষণাৎ আমার বোধগম্য একটি উদাহরণ তুলে আনে কল্পনাথ। বলে, আচ্ছা, বল্ দেখি, 'জয় জয় দেবী, চরাচর সারে/কুচযুগ শোভিত মুকুতা হারে/বীণা-পুস্তক রঞ্জিত হস্তে/ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে' মন্ত্রটার মানে কী?

বলি, এটা তো সরস্বতী পূজার মন্ত্র।

—ঠিক। বেশ জব্বর মন্ত্র কিনা?

স্বীকার করতেই হয় কল্পনাথের কথাটা। ফি-বছর সরস্বতী পূজার দিনে পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় কামাখ্যা পণ্ডিত এই মন্ত্রটাই আওড়ান। আমরা সবাই ভক্তিভরে মন্ত্রটা আওড়াতে আওড়াতে হাতের ফুল দেবীর দিকে ছুঁড়ে দিই।

কল্পনাথ বলে, মন্ত্রটার মানে হল, দেবী সরস্বতী, তুমিই এই দুনিয়ার সেরা, তোমার জয় হোক। তোমার বুকে দুলছে মুক্তার হার, তোমার রাঙানো হাতে রয়েছে বীণা ও বই। বিদ্যার দেবী সরস্বতী, তোমায় প্রণাম করি।

বলতে বলতে চোখ নাচায় কল্পনাথ, কী? মানেটা শোনার পর মন্ত্রটাতে আর তেমন ভক্তি জন্মাচ্ছে আগের মতো?

কল্পনাথ বলবে কি, শুনতে শুনতে আমিই তো নিজের থেকে নাক সিঁটকেছি। এমন সাদামাটা কথা নিয়েও যে মন্ত্র হয়, আমি চাষি পরিবারের ছেলে কেমন করেই বা জানব তা!

কল্পনাথ ওর আগের কথার খেই ধরে বলে, ভক্তিটাই যদি নষ্ট হয়্যা যায়, তবে আর ওই মন্ত্রে কাজ হবে কী করিয়া? বাণীকাকা বলে, ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। বলে, ভক্তি আর বিশ্বাসে রাস্তার কুকুরও ঠাকুর হয়্যা যায়। আবার ভক্তি না থাকলে, ঠাকুরও কুকুরের অধম হয়্যা যায়।

ততক্ষণে ভেতরে ভেতরে লজ্জিত হয়েছি আমি। গাছ-বাঁচানোর মন্ত্রটার মানে আর কোনওদিনই জানতে চাইনি কল্পনাথের কাছে। কেবল রোজরোজ কল্পনাথের আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে অবাক নয়নে দেখতে থেকেছি।

আরও হপ্তা-দুই বাদে একদিন গাছটার কাছে গিয়ে সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কল্পনাথের চোখদুটি। গাছটার দিকে আঙুল তাক করে বলে, দ্যাখ্।

অবাক হয়ে দেখি, সত্যিসত্যিই গাছটার প্রতিটি ডগা কচিকচি সবুজ অঙ্কুরে ভরে গিয়েছে।

গাছটার থেকে চোখ ফেরাতে পারিনে অনেকক্ষণ। একসময় যখন কল্পনাথের দিকে তাকাই, দেখি, সেও আমার মতোই অগাধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে গাছটার দিকে।

যেদিন কচি পাতায় ঝলমল করে উঠল গাছটা, কল্পনাথ 'বড় পূজা'র আয়োজন করল। সেদিন নতুন ফ্রক পরে ডালিমও এসেছে আমাদের সঙ্গে।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে গাছটাকে পুজো করল কল্পনাথ। গুড়, দুধ, পাকাকলা, আতপচাল, ফল ও মণ্ডা দিয়ে ভোগ দিল। পুজোর পরে প্রসাদ পেলাম আমরা দু'জনে। প্রসাদ পেল আশেপাশের পাখিপাখাল, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, পিঁপড়ে, মৌমাছিরাও।

তারও বছর-দুই বাদে, তখন আমরা সবে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি, একদিন বাংলার টেস্টবইটা ওলটাতে ওলটাতে চমকে উঠি আমি।

বইটার মধ্যে একখানা কবিতা ছিল, যা পড়তে পড়তে আমি বুঝতে পারি, গাছ-পূজা করতে করতে এটাই মন্ত্র হিসেবে আওড়াত কল্পনাথ। কবিতাটি হল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল/কোন দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় রে দূর্বা কোমল...।"

পরের দিনই চেপে ধরি কল্পনাথকে। বলি, তুই গাছ-পূজার সময় মন্ত্র বলিয়া যা পড়ছিলি, ওটা তো আসলে একটা কবিতা। আমাদের নতুন বইতেই তো রয়েছে।

কল্পনাথ সামান্যও টাল খায় না। বলে, তাতে কি? বাণীকাকু বলে, ভক্তিভরে যা-ই উচ্চারণ করবি, তাই মন্ত্র।

—তাই আবার হয়? আমি প্রতিবাদ করে উঠি,—ভক্তিভরে গালাগাল দিলেও তা মন্ত্র হয়্যাবে?

কল্পনাথ সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখে। খুব স্পষ্ট গলায় বলে, হ্যাঁ, হয়্যাবে বৈকি। সেটা কু-মন্ত্র। তাতে মাইন্ষের ক্ষতি হবে। কাকু তাই তো বলেছে।

এতদিনে হয়ত বা বুঝতে পারি, সেদিনের কল্পনাথের কাণ্ডকারখানায় অলৌকিক কিছু ছিল না। যা ঘটেছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে। অনেক গাছই পাতা ঝরায় শীতে, ওই অচেনা জাতের গাছটাও ঝরিয়েছিল। কিন্তু গাছটা ছালে-বাকলের কর্কশতায়, ডালপালার রুক্ষতায় এমনই বদলে ফেলেছিল ওর রূপ, একেবারে মরা বলেই মনে হয়েছিল। এখন বুঝি, পাতা ঝরে গেলে ওই জাতের সব গাছকেই মরা মরা লাগে। প্রকৃতির নির্দিষ্ট নিয়মে আবার শীতের শেষে পাতা ছেড়েছিল গাছটা। কিন্তু আমার মনে এমন ধন্ধ রয়েই গিয়েছে যে, কল্পনাথও কি সত্যি সত্যি জানত না তা? ও কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত গাছটা ওর মন্ত্র আর পুজো-অর্চনার জোরেই বেঁচে উঠেছে? ওই নিয়ে আমার মনে ধন্ধ রয়েছে আশৈশব। যদি এমনটা হয় যে, কল্পনাথের মনের মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না, কথাটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত সে, তাহলে তো মেনে নিতেই হয় যে, সেই সুদূর অতীতে, মানুষ যখন জানত না একটি গাছের বেঁচে থাকা আর মরে যাবার রহস্যটি, সেই তাদের বৃক্ষপূজার দিনগুলি স্মৃতি হয়ে বেঁচে রয়েছে কল্পনাথের অবচেতনে।

কিন্তু যদি জেনেশুনে ওই বয়সে আমার সঙ্গে চালাকি করে থাকে সে, তাহলে ওর পরবর্তীকালের অনেক কর্মকাণ্ডকেই নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে কল্পনাথ আমার চোখে অনেকখানি বদলে যেতে পারে, যা আমি মনে মনে একেবারেই চাইনে।

অন্ততপক্ষে কল্পনাথের পরী দেখার পর্বটা নিয়ে তো তবে নতুন করে ভাবতেই হবে আমাকে।

পাত্রপক্ষের খুবই পছন্দ হয়েছিল ডালিমকে। দেনাপাওনাতেও আটকাল না তাই। কাজেই, অঘ্রাণে এক শুভদিন দেখে প্রায় বিনা পণেই ডালিমের বিয়ে হয়ে গেল মাখনের সঙ্গে।

অঘোর-জেঠু বুঝি এতদিনে পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ পেলেন।

কনের সাজে যখন সাজানো হল ডালিমকে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি চোখ সরাতে পারিনি।

বেনারসী শাড়িতে অঙ্গ ঢেকে, মাথায় টোপর পরে, সারা গায়ে অলংকার চড়িয়ে, কপালে সিঁদুরের ঢাউস টিপ পরে ডালিম চলে গেল শ্বশুরবাড়িতে।

বিয়ের ক'দিন আমি প্রায় সারাক্ষণই ছিলাম কল্পনাথদের বাড়িতে। বিয়েতে আমার খাটাখাটির বহর দেখে সবাই ধন্য ধন্য করল। কিন্তু ডালিমের মুখ থেকে একটি বাক্যও বেরোল না। এমন কি একচিলতে কৃতজ্ঞতাও নয়। কেবল বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার খানিক আগে, আমি যখন ওর বাক্স-প্যাঁটরা, বিছানাপত্তরগুলো নামিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেবার ব্যাপারটা তদারকি করছি, তেমনি সময়ে, একফাঁকে আমাকে একা পেয়ে ডালিম খুব মৃদু গলায় বলল, তুমাকে মেডেলটা দেওয়া বাকি রয়্যালো। পরের বারে যখন আসবো, মেডেলটা দিয়া যাবো।

আমি হাসতে হাসতে শুধোই, মেডেল কিসের জন্য?

—বা-রে! ডালিম তার কাজল পরা চোখদুটোসহ ভুরুজোড়াকে বাঁকিয়ে বলল, ক'দিন এত খাটাখাটি করলে, মেডেল একটা তুমার পাওনা হয়েছে বৈকি।

সেই প্রথম, আমি যেন ডালিমের কথার মধ্যে হূল জাতীয় কিছুর সন্ধান পেলাম। কিন্তু কেন আমার প্রতি ওর ওই বিদ্রূপবাণটি ঝলসে উঠেছিল সেদিন, বহুদিন তার অন্ধিসন্ধি বুঝে উঠতে পারিনি।

বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় বরকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরল ডালিম। দু'জনে মিলে থাকল ক'দিন। তখনই আমরা মাখনের সঙ্গে একটু আধটু মেশামেশির সুযোগ পেলাম।

মাখনের মধ্যে এক ধরনের মেয়েলি ব্যাপার ছিল। বেশ সুর করে কথা বলত সে। আর নিজেদের গ্রাম ও নিজের পরিবারটিকে নিয়ে তার মধ্যে ছিল সীমাহীন গুমোর। বিশেষ করে নিজের গর্ভধারিণীটির প্রতি তার ছিল যারপরনাই অন্ধ ভক্তি। প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সে তার নিজের মতামতের আগে মায়ের মতামতটাকেই তুলে ধরত বেশি বেশি করে।

প্রথম দিনটা পুরোটাই সে তার ধুলিধুসরিত জুতোজোড়াটির জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে হা-হুতাশ করতে লাগল, কিনা, ওদের এলাকা দিয়ে পিচ রাস্তা যাওয়ায় জুতোতে নোংরা লাগে না বললেই চলে। শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা হওয়ার মুহূর্তে তাই ওর মা নাকি পইপই করে বলেছিল, ওই ধুলো-কাদার দেশে এমন দামি পাম্‌-শু পরিয়া যাসনি খকা। জুতার দশা হবে বর্ষাকালের আমসির পারা। অথচ যাচ্ছি কিনা শ্বশুরবাড়ি, চপ্পল পরিয়া আসা চলে?

বলতে বলতে হাহাকার করে ওঠে মাখন, কিন্তু দ্যাখো, শেষ অবধি মায়ের ভবিষ্যৎবাণীই ফলল। এই ধুলোকাদার দেশে 'পাম্‌-শু'র যা হাল হয়েছে, বাড়ি ফিরলে মা আর আস্ত রাখবেনি। বাবাকেই বকিয়া শেষ করবে, কিনা, এমন মুলুকে ছেলের বিয়ে দিলে, ধুলোকাদায় একসা।

প্রথম কিস্তি কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছিল, মাখন বেশ রসিক ছেলে। কথাবার্তায়ও চৌকস।

যেদিন এল, সঙ্গে এনেছিল একটা বাহারি সুটকেস। তার কভারটা ছিল ঢিলে, বেঢপ। মাখনের গায়ের পাঞ্জাবিটাও বেশ ঢিলেঢালা। আমরা ওই নিয়ে সামান্য হাসাহাসি করায় মাখন একটুও টোল খায় না। সারামুখে যারপরনাই গুমোর ফুটিয়ে বলে, আমাদের ওদিকে সবকিছুই ঢিলেঢালা কেনার রেওয়াজ। পোশাক-আশাক, জুতো, সবকিছুই মাপের থেকে কিছুটা ঢিলেই কেনে আমাদের এলাকার লোকেরা।

মাথার মাঝ বরাবর লম্বা সিঁথি কাটতে দেখে আমরা যখন 'বুড়ারাই এমন করিয়া সিঁথি কাটে' বলে ওকে ক্ষেপাতে লাগলাম, মাখন তখন গলায় গুমোর ফুটিয়ে বলে উঠল, আমাদের মুলুকে সবাই মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি কাটে। সেটাই আমাদের রেওয়াজ। বাঁদিকে সিঁথি কাটাটাকে একেবারেই পছন্দ করি না আমরা।

সেবার আমি দু'তিনের বেশি থাকিনি গাঁয়ে। ডালিমও বিয়ের পর প্রথম বাপের বাড়ি এসেছে। ফলে, পাড়ার বউড়ি-ঝিউড়িরা তাকে ঘিরে রইল সারাক্ষণ। তার শ্বশুরবাড়ির একই গল্প বারেবারে শুনেও বুঝি আশ মেটে না ওদের। সেবারে আর ডালিমের সঙ্গে একলাটি দেখা হয়নি আমার। মাঝে মাঝে দূর থেকে ডালিমের গদগদ মুখখানি দেখতে দেখতেই হোস্টেলে ফিরে যেতে হয়েছে আমাকে।

মাস দুয়েক বাদে আমি একদিন বাড়ি ফিরছি, দেখি, বাসের উলটো কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডালিম। পাশে মাখন। সেদিন বাসে ভিড় ছিল খুব। আমি আর ঠেলেঠুলে ওর কাছে যাবার চেষ্টা করলাম না।

বেলদা থেকে পাঁচিয়াড়, আধ ঘণ্টার পথ। মাঝপথে একখানা সিট পেয়ে গেল ডালিম। মাখন দাঁড়িয়ে রইল পাশটিতে।

তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। একটু বাদেই সন্ধে নামবে। আমার একটুখানি রাগ হল মাখনের ওপর। নতুন বউকে নিয়ে কেউ এই অবেলায় বাড়ি থেকে বেরোয়! বাস থেকে নেমে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। ডালিমই বা কোন্ আক্কেলে বেরোল এই শেষবেলায়!

পাঁচিয়াড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে গেল। আর তখনই ডালিম দেখতে পেল আমাকে। একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। ওমা, শঙ্করদা, তুমি কোত্থেকে?

মাখন আমাকে চিনতে পারেনি। ডালিমই বেশ ঘটা করে আমার পরিচয় দিল। শঙ্করদাকে মনে পড়ছে না তোমার? দাদার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিয়ের সময় কত খাতির করেছিল তোমায়। অষ্টমঙ্গলার সময়ও দেখেছ ওকে।

মাখন বোকা বোকা হাসে। বলে, আমার সহজে কারোর মুখ মনে থাকে না। মা বলে, বেশি উলটা-পালটা লোকের মুখ মনে রাখলে, আসল কথাগুলা ভুলিয়াবো।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়েছে। গোটা এলাকা জুড়ে একটু একটু করে সন্ধে নেমে আসছে। পাখিপাখালের দল দ্রুত ফিরে যাচ্ছে যে-যার বাসায়। মাঠ জুড়ে ঘুমপাড়ানি হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

আমরা তিনজনাতে আলপথে হাঁটতে শুরু করলাম।

সবার আগে আমি, আমার পেছনে ডালিম, মাখন ছিল সবার পেছনে।

মাঠের সব ধান কাটা হয়ে গেছে অনেক দিন। আমাদের চারপাশে দিগন্ত জুড়ে খাঁ-খাঁ খেত। একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে।

পিছু ফিরে মাখনের দিকে তাকাই। সে আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছে না। সম্ভবত এমন আলপথে হাঁটবার অভ্যেস নেই তার।

বলি, একটু পা চালিয়ে হাঁটতে হবে যে। নইলে পৌঁছতে বেশ রাত হয়্যাবে।

মাখন পেছন থেকে জবাব দেয়, আমাদের এর চেয়ে বেশি জোরে হাঁটার রেওয়াজ নেই। আমাদের এলাকায় বেশি জোরে কেউ হাঁটে না। মা বলে, দুমদাম হাঁটতে নেই। তাতে করিয়া খানা-খন্দে পা পড়তে পারে।

ক্রমশ একটু একটু করে অন্ধকার ঢেকে ফেলল আমাদের তিনজনকেই। সামনে পেছনে কিছুই ভালো করে দেখা যায় না।

ডালিম বলল, বাপরে, কী অন্ধকার!

বলি, এমন অন্ধকারে, ফুরফুরে হাওয়ায় সাপেরা কিন্তু হাওয়া খাইতে বেরায়।

সাপের কথায় ডালিম আঁতকে ওঠে।

আমি ওকে সাহস জোগাই, ভয় পাসনি, এক্ষুনি চাঁদ উঠবে। গেল-পরশু পূর্ণিমা গেছে।

কুলাসিনির কাছাকাছি আসতেই চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় ভরে গেল দশদিক। এতক্ষণ গাঢ় অন্ধকার থাকায় চারপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু চাঁদ উঠতেই চারপাশটা আবছা আলোয় ভরে গেল। সে আলো বড়ই মায়াবি। চারপাশটাকে রহস্যময় লাগছিল। গাছের ডালপালাগুলোকে দুলতে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি অশরীরীদের হাত।

সামনেই শ্মশান। আমরা সবাই ছেলেবেলা থেকেই শ্মশানটাকে চিনি।

ডালিম শিউরে উঠে বলে, ও শঙ্করদা, আমার ভয় কত্তিছে।

পিছু ফিরে ওকে এক ঝলক দেখে নিই। বলি, আমি তো সঙ্গে আছি। ভয় কি তোর?

—আ-হা, খুব বীরপুরুষ তুমি? বেম্মদৈত্য যদি ছুটিয়া আসে, তুমি আমাকে রক্ষা কত্তে পারবে?

—পারবো না? কী বলিস? ছেলেবেলা থেকে শ্মশানে-মসানে কত্তো ঘুরেছি।

সহসা ডালিম চুপ মেরে গেল। একটু একটু করে থমথমে হয়ে উঠল ওর মুখ। একসময় খুব চাপা গলায় বলল, তোমার সাহসের কথা আর বলোনি। তোমার যে কত সাহস, সে আমার দেখা আছে।

—কী বললি? আমার সাহস নাই? আমি পিছু ফিরে কটমট করে তাকাই ডালিমের দিকে।

আধো জ্যোৎস্নায় আমার চোখে চোখ রাখে ডালিম। থমথম করছিল ওর মুখ।

আমি আবার মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকি। আমার সামনে জ্যোৎস্নাটা একটু একটু করে আলো ছড়াতে থাকে।

আচমকা পেছন থেকে ডালিম মৃদু গলায় বলে ওঠে, সাহস থাকলে ওইদিন মাংসের হাঁড়িতে একমুঠা নুন ফেলিয়া দিতে পারতেনি?

আমি ঝাঁ করে পিছু ফিরি। ডালিমের চোখে সরাসরি চোখ রাখি।

দেখি, মায়াময় জ্যোৎস্নায় ডালিমের চোখদুটো থমথম করছে।

ঠিক তার পরমুহূর্তেই এক টুকরো কালো মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিল।

সে সন্ধেয় আর আমার চোখে কিছুতেই চোখ মেলায় না ডালিম।



কল্পনাথ বাস্তবিক মিথ্যাচারী ছিল, নাকি আগাগোড়া কল্পনাবিলাসী, এ ধন্ধ বুঝি আমার এ জীবনে যাবার নয়। ওই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে, কল্পনাথ আমাকে, সেই আমাদের ছেলেবেলায়, একবার পরী দেখিয়েছিল।

কল্পনাথ দাবি করত, রানীহাঁস দিঘির পাড়ে সে পরী দেখেছে। একবার নয়, মাঝেমাঝেই নাকি পরীর সঙ্গে দেখা হয় তার।

মিঠে নুড়ি চোষা থেকে শুরু করে অভয়ারণ্যে পশুপ্রাণীদের সঙ্গে কথা বলা, কাক পোষা, মরা গাছ বাঁচানো, সেই ছেলেবেলা থেকে পর পর এত-এত অবাক করা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে সে, তখন আর কল্পনাথের কোনও কথাকেই অবিশ্বাস্য মনে হয় না তাই। কাজেই, আমি বায়না ধরি, আমাকে কবে পরী দেখাবি, বল্?

কল্পনাথ আমাকে পরী দেখাবে বলে ক্রমাগত লোভ দেখাতে থাকে, কিন্তু তার আর সময় হয় না কিছুতেই।

তখন আমরা পড়ার বইতে অনেক পরীর গল্প পড়ছি। পরীদের নিয়ে আমাদের মনে কৌতূহলের ইয়ত্তা নেই। কাজেই, আমি কল্পনাথকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলি। তার দেখা পরীটির রূপ, গায়ের রঙ, পাখনার সাইজ, সবকিছু নিয়ে আমার মনে প্রবল কৌতূহল।

কল্পনাথ মুখে মুখে পরীর রূপের বর্ণনা দিয়ে চলে। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি। রানীহাঁস দিঘির জলে বিশেষ দিন-তিথিতে সে নাকি সিনান করতে আসে। কল্পনাথ নাকি মাঝে মাঝেই দেখেছে ওকে। শুধু দেখাই নয়, পরীটি নাকি কল্পনাথকে বিলক্ষণ চেনে। এবং কল্পনাথ দাবি করে, পরীটি নাকি ওকে খুবই পছন্দ করে। ওকে দেখে দূর থেকে হাসে। এমন কি মাঝে মাঝে ওকে মিঠাইও খাওয়ায়।

রাণীহাঁস দিঘিতে পরী আনাগোনার ব্যাপারটা নিয়ে বহু জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু কল্পনাথ ছাড়া আর কেউই দাবি করেনি যে, সে পরীকে স্বচক্ষে দেখেছে। অথচ তখনও অবধি একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, আর যা হোক, কল্পনাথ কখনো মিছে বলে না।

একদিন কল্পনাথ আমাকে সত্যিসত্যি পরী দেখাল।

সন্ধ্যার মুহূর্ত সেটা, কল্পনাথ তার স্বরচিত অভয়ারণ্যের তত্ত্বাবধানের কাজ সেরেছে সবে, দুজনে

রানীহাঁস দিঘির জলে হাত-পা ধুতে নেমেছি, আচমকা আধো আলো-আঁধারিতে, রানীহাঁস দিঘির অগ্নিকোণে, অর্থাৎ আমাদের উল্টোদিকের ঘাটে সে এল।

ঘাটের অদূরেই একটা বিশাল প্রাচীন বটগাছ। তার তলায় এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল সে।

কল্পনাথই ওকে দেখতে পেয়েছে প্রথমে। আঙুল দিয়ে দেখাল আমাকে। ফিসফিস করে বলল, ওই দ্যাখ, পরী।

শুনেই আমি বাক্যহারা। সারা শরীরের রোম খাড়া হয়ে উঠল নিমেষে। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলাম, ওই আলো-আঁধারিতে, অস্পষ্ট নারীমূর্তিটিকে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে গায়ের সাদা পাখনাজোড়া খুলে রাখল ডাঙায়, তারপর একেবারে উদোম হয়ে জলে নাবল, পায়েপায়ে এগিয়ে এল বুকজলে। কেবল মুখখানি তার রানীহাঁস দিঘির পদ্মের মতো ফুটে রইল জলের বুকে।

আমরা ততক্ষণে পাশের ঝোপের আড়ালে সরে গিয়েছি। ওখান থেকে দম বন্ধ করে দেখছি ওকে।

অনেকক্ষণ ধরে সিনান করল সে। একসময় সিক্ত, নগ্ন মূর্তিখানি পায়েপায়ে উঠল জল থেকে। তারপর পাড়ের ওপরে রাখা ফটফটে সাদা রঙের পাখনাজোড়া পরে নিয়ে ধীরপায়ে চলে গেল।

উল্টোদিকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম পুরো দৃশ্যটা।

এতক্ষণ আমার ধারণা হয়েছিল, আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি সে, কিন্তু সে ধারণা ভেঙে গেল, কেন কি, চলে যাওয়ার আগে, একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাদের দিকে পিছু ফিরে তাকাল সে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পুনরায় ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল। এক সময় হারিয়ে গেল পরশুরামের ডাঙায়।

ফিসফিস করে বলি, তুই যে বলিস, তোকে নাকি মিঠাই খাওয়ায়।

কল্পনাথ নিঃশব্দে মাথা দোলায়।

বলি, কই, দিল না তো।

কল্পনাথ সেকথার জবাব দিল না। ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল অগ্নিকোণের দিকে।

বটগাছটার তলায় গিয়ে দেখলাম, একটা মোটা শেকড়ের ওপর একটা শালপাতার ঠোঙ্গায় একটি বোঁদের নাড়ু।

কল্পনাথ নিঃশব্দে ঠোঙ্গাটি তুলে নেয়।

বলি, দুজনের জন্য একটা মাত্তর নাড়ু কেন?

—তুই আসবি, সেটা জানত না তো।

—পরীরা আগাম কিছু জানতে পারে না? আমার গলায় অভিমান।

পরীটা আসে পরশুরামের দিক থেকে। কল্পনাথ জানাল।

পরীটাকে স্বচক্ষে দেখবার পরবর্তী ক'টা দিন আমার যে কী অবস্থা!

এত বড় একটা ঘটনা, জনে জনে বলতে ইচ্ছে করছে, পেট ফেঁপে জয়ঢাক, অথচ কাউকেই সেটা বলতে পারছি না, কেন কি, কল্পনাথ পইপই করে বলে দিয়েছে, কথাটা কাউকেই বলা চলবে না, তাহলেই নাকি পরীটা আর দেখা তো দেবেই না, বলা যায় না, আমাদের ক্ষতিও করতে পারে।

একদিন আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না। শিখা বউদির কাছে একান্তে ফাঁস করে দিলাম কথাটা।

শিখা বউদি শহরের মেয়ে। মাত্র বছরটাক আমাদের পাড়ার বল্লভদার বউ হয়ে এসেছে। গাঁয়ের সবকিছুকে নিয়ে তার তখনও অবধি এক ধরনের নাক সিঁটকানো ভাব।

দু'চোখে গাঢ় অবিশ্বাস ফুটিয়ে বলে, তোরা গাঁয়ের ছেলেরা কী বোকা রে! পরী বলে কিছু আছে নাকি বাস্তবে? ওসব তো রূপকথার গল্প।

—আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু বিশ্বাস কর বউদি, আমি আর কল্পনাথ স্বচক্ষে দেখেছি।

চোখের তারায় যারপরনাই অবিশ্বাস ফুটিয়ে শিখাবউদি বলে, একদিন দেখাতে পারিস আমাকে?

নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করব না।

কল্পনাথকে বললাম কথাটা। কিন্তু কল্পনাথ শিখাবউদিকে পরী দেখাতে রাজি নয়। শুধু শিখাবউদি কেন, দুনিয়ার কাউকেই সে এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে নারাজ। কাজেই, আমাকেই সে দায়িত্ব নিতে হল।

কাউকে কিছু না জানিয়ে শিখাবউদিকে নিয়ে একদিন সন্ধের মুখে গিয়ে হাজির হলাম রানীহাঁস দিঘির উত্তর পাড়ে। একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইলাম দুজনে। কিন্তু আমাদের কপালটাই খারাপ ছিল বুঝি, সন্ধের আঁধার গাঢ় হল, রাত বাড়তে লাগল, পরী কিন্তু এল না।

ঘরে ফেরার পথে শিখাবউদি সারাটা পথ আমাকে টিটকিরি দিতে দিতে ফিরল।

আমার রাগ হচ্ছিল কল্পনাথের ওপর। ও থাকলে নির্ঘাৎ আসত পরীটা। পরীটার ওপরও নিদারুণ অভিমান জাগল আমার মনে। কিনা, নাই বা এল কল্পনাথ, আমরা যে সারা সন্ধে তোমার জন্য বসে বসে মশার কামড় খেলাম, একটিবার দেখা দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

আমি বুক ঠুকে শিখাবউদিকে বললাম, পরী আমি তোমাকে দেখাবোই।

তারপর..., একদিন নয়, পরপর তিন দিন শিখাবউদিকে নিয়ে গেলাম রানীহাঁস দিঘির পাড়ে, কিন্তু পরীটা এল না। অথচ এর মধ্যে কল্পনাথের সঙ্গে গিয়ে আমার একাধিকবার দেখা হয়েছে পরীর সঙ্গে। এও বাস্তবিক এক রহস্য আমার কাছে। শুধু কল্পনাথ এবং পরীটার জন্যই আমি শিখাবউদির কাছে খাটো হয়ে গেলাম।

তারপর বহুদিনই শিখাবউদি আমাকে ওই নিয়ে খোঁটা দিয়েছে। মেলায়, পার্বনে, শত মানুষের জমায়েতে, কোনও সুরূপা রমণীকে দেখিয়ে আচমকা বলে উঠেছে, ওই দ্যাখ, তোর সেই পরী।

অনেকদিন বাদে, তখন আমি প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে হাইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি, ভীম-মেলায় শক্তিপদর সঙ্গে দেখা।

শক্তিপদ আমাদের সঙ্গেই পড়ত। পরশুরাম থেকে আসত সে। এখন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাপের চাষবাস, ব্যবসাপাতি দেখছে।

মেলার মধ্যে দেখা হতেই শক্তিপদ আমার ও কল্পনাথের আলাপ করিয়ে দিল তার এক বৌদির সঙ্গে।

চোখ তুলে দেখলাম তাকে। তার চোখের তারায়, ঠোঁটের হাসিতে এক ধরনের যাদুকরী মায়া ছিল। আমরা চারজনাতে মেলাটাকে চক্কর মারলাম বারকয়েক। তেলেভাজা, জিলিপি একঠোঙায় ভাগ করে খেলাম।

একসময় আচমকা শক্তিপদর বৌদিকে শুধিয়ে বসি, তোমাদের গাঁয়ের ওই পরীটা এখনো আছে?

—কে পরী? কোন পরী?

—তোমাদের গাঁয়ের দিক থেকেই তো আসত।

—আমাদের গাঁয়ের দিক থেকে আসত? শক্তিপদর বৌদি আমার দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকে।

—আসতই তো। তোমাদের গাঁয়ের দিক থেকে মাঝেমাঝেই আসত রানীহাঁস দিঘিতে সিনান করতে।

শক্তিপদর বৌদি বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, তারপর খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, ওই গাঁয়ে বউ হয়ে আসা ইস্তক শুনছি, একটা পরী নাকি কোথা থেকে যেন এসে রানীহাঁস দিঘিতে সিনান করে। তুমরা তবে দেখেছও তাকে!

বৌদির দু'চোখে জমাট কৌতুক।

শক্তিপদর সামনে এভাবে বেইজ্জত হওয়াতে মনেমনে রেগে যাই। বলতে যাচ্ছিলাম, তোমাকেও দেখাতে পারি, কিন্তু নিঃশব্দে আমার হাতে চাপ দেয় কল্পনাথ। চোখের তারা এবং ভুরুতে ভঙ্গিমা তুলে আমাকে কথাটা বলতে নিষেধ করে।

আমি কল্পনাথের অধিকাংশ ইঙ্গিতই তখন বুঝতে পারতাম, বন্ধুদের মধ্যে কেবল আমিই পারতাম। আমি থেমে গেলাম।

তারপর, অনেক বছর পরে, তখন আমি ওকালতি করছি মেদিনীপুর কোর্টে, একদিন সে একলাটি এল আমার সেরেস্তায়। খুব চেনামুখ বলে মনে হল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

বছর পঞ্চাশ বয়েস। খুবই ভেঙে পড়া চেহারা। ম্লান হেসে বলল, আমি পরী। চিনতে পারলেনি আমায়?

সেদিন খুবই ব্যস্ত ছিলাম আমি। ভালো করে বুঝতেই পারিনি মেয়েটি ঠিক কী বলছে। বলি, কে পরী? কোন্ পরী? কোন গ্রাম?

—সে কি! রোজ দুটিতে আমাকে দেখতে আসতে রাণীহাঁস দিঘির উত্তর পাড়ে। কত নাড়ু খাইয়েছি তোমাদের। ভুলিয়া গেলে?

আমি বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে থাকি মহিলার দিকে। কেন কি, ততক্ষণে আমার মনে পড়ে গেছে, মহিলা আর কেউ নয়, শক্তিপদর বৌদি।

কথায় কথায় জানতে পারি, শক্তিপদর দাদা মারা গিয়েছে। বৌদিকে অসহায় পেয়ে শক্তিপদ তার দাদার সমস্ত সম্পত্তি আত্মস্যাৎ করে বৌদিকে পথে বসাতে চায়। মামলা করে সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে চায় ওর বৌদি। সেই কারণেই আমার কাছে এসেছে সে।

সেদিন শক্তিপদর বৌদির সঙ্গে মামলা নিয়ে অনেক কথাই হল। কিন্তু আমি কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারিনি, রোজ রোজ সন্ধের আঁধার গায়ে মেখে একা একা কেন সে আসত রানীহাঁস দিঘিতে চান করতে? কেনই বা দিনের পর দিন নাড়ু খাওয়াত আমাদের? আর, তখনই আমার মনে ওই প্রশ্নটা পুনরায় ঘাই মারতে থাকে, কিনা, পরীটার আসল পরিচয় কি ওই বয়েসেই জেনে গিয়েছিল কল্পনাথ? নাকি, আমার মতোই ওকে পরী বলে ভেবেই শিহরিত হত সে? কল্পনাথের যা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় ততদিনে পেয়েছি, তাতে করে এমনটা ভেবে নেওয়া বড়ই কঠিন যে, শক্তিপদর বৌদি কল্পনাথের দৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে পেরেছিল। তাহলে তো এটাই ভেবে নিতে হয় যে, কল্পনাথ জেনেশুনেই আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল। আর, তাহলে তো কল্পনাথ সম্পর্কে আমার আশৈশব অনেক ধারণা, মূল্যায়ণ ও বিশ্বাসকেই মন থেকে মুছে ফেলতে হয়।



আগেই বলেছি, খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন বাণীকাকা।

ছেলেবেলায় আমরা সময় পেলেই ঘিরে বসতাম ওঁর চারপাশে। ওঁর কথা শুনতে শুনতে কখন জানি কেটে যেত সময়। তিনি আমাদের কিস্তিতে কিস্তিতে শোনাতেন পৃথিবীতে ধর্ম, দেবতা, জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস। বোঝাতেন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা। কেন দেবতারা জন্মালেন, কেমন করে স্বর্গ ও নরক তৈরি হল, নিজের মতো করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতেন সবকিছুর।

বলতেন, তখন দেবতার সৃষ্টি না করিয়া, স্বর্গ-নরক সৃষ্টি না করিয়া, মানুষের উপায় ছিলনি রে। একটিবার ভাব্ দেখি, সারা পৃথিবীর তাবৎ জমিনের বারোআনাই বনজঙ্গল, দুর্গম, দুর্ভেদ্য। মাঝে মাঝে জনবসতি। শুধু লড়াই করিয়া দিন কাটে মানুষের। প্রকৃতির হাজারো খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে লড়াই, বনজঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার, সাপ-খোপ, মশা-মাছি, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প—সবকিছুর সঙ্গে লাগাতার নখেদাঁতে লড়াই। তারই মধ্যে যেটুকু সম্পদ, খাবারদাবার, জমিন-জলাশয়, বাঁচিয়া থাকবার যৎকিঞ্চিৎ যা উপাদান তখনো অবধি সনাক্ত করতে পেরেছে মানুষ, তার দখল লিয়ে, বিলিবন্দোবস্ত লিয়ে, অবিরাম চলতিছে মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ। আকছার ঘটতিছে অপরাধ। মানুষের তো তখঁন প্রায় বর্বরের মতো জীবনধারা, পাশবিক শক্তিই সবকিছুর প্রধান নিয়ন্তা। আর, তখন তো এযুগের মতো দু'হাত অন্তর থানা-ফাঁড়ি ছিলনি, পুলিশ-সিপাই ছিলনি, জেল-হাজত, আদালত, মোটামোটা আইনের বই, কিছুই তো ছিলনি। অত রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া, টেলিফোন, রেডিও,—যাতে করে অপরাধ ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর পায়্যাবে আইনরক্ষকের দল, হুটার বাজিয়া পৌঁছিয়া যাবে অকুস্থলে,—তখনকার

সমাজপতি আইনরক্ষকেরা চোখেও দেখেনি এসব। তেমন কোনও পাকাপোক্ত আইনই ছিলনি, তার রক্ষক! আইন বলতে যা বলা হইত, তা ছিল আসলে রাজা-রাজড়া নামক কিছু লুটেরা গোষ্ঠীপতির লুণ্ঠনের সহায়ক ফরমান। তো, ভাবিয়া দ্যাখ্, ঠাকুর-দেবতা, পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, কর্মফল, অদৃষ্ট, জন্মান্তর,—এসব সৃষ্টি না করিয়া উপায় ছিল সে যুগের সুস্থ, চিন্তাশীল মানুষদের? নিরন্তর দ্যাবতাদের রোষ-গোঁসা আর নরকের ভয় না দেখালে, স্বর্গের লোভ না দেখালে ঐসব দিনের আধা-বর্বর মানুষের পাশবিক কার্যকলাপে রাশ টানা যাইত? কাজেই, একথা আজ আর না মানিয়া উপায় নেই যে, সেদিন ঠাকুর-দ্যাবতারা বহু নিরীহ মানুষকে বাঁচিয়েছেন জহ্লাদ মানুষের লোভ-লালসা, হিংসার আগুন থেকে।

—তবে আর ঠাকুর-দেবতাকে অত গাল পাড় কেন? ধর্মকেই বা অত ঘেন্না কর কেন?

—গাল পাড়ি, ঘেন্না করি এই কারণেই যে, যে-শালগ্রাম শিলাটি দিয়ে মানুষ একদিন হাজার জনের জানপ্রাণ বাঁচিয়েছে, এখন চাঁড়ালের হাতে পড়িয়া, তা দিয়া দু'বেলা পেঁয়াজ-রসুন আর মশলা পেষা চলতিছে। ওরে, সে ঠাকুর-দেবতা, সে ধর্ম কি আর আছে রে? থাকলে পরে ধর্মই হয়্যা উঠত মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কিন্তু যুগেযুগে যা হয়েছে আর কি, মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে এক উদ্দেশ্যে, ধুরন্ধরেরা তাকে ব্যবহার করেছে নিজেদের ধান্ধা মেটাতে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মানুষ যখন ঠাকুর-দ্যাবতাকে খুব ভয় পাচ্ছে, সম্ভ্রম দেখাচ্ছে, পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, অদৃষ্ট, নিয়তি,—এগুলাকে যখন খুব মানতিছে, দেখতে দেখতে গজিয়া উঠল ঠাকুর-দেবতাদের এজেন্ট অর্থাৎ পেশাদার পুরোহিতের দল। রাজা পদবাচ্য লুটেরা গোষ্ঠীপতিদের সঙ্গে রাতারাতি গাঁটছড়া বাঁধিয়া ফেলল তারা। ধর্মকে আয়ুধ করিয়া তারা নবোদ্যমে শুরু করল নরমেধ যজ্ঞ। তারা অধিক লুণ্ঠনের স্বার্থে জাতপাত বানাল, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ বানাল, আর রাজাকে ঠাকুর-দেবতাদের বংশধর বানিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথটাকে একেবারেই বুজিয়ে দিল। কারণ, রাজার বিরোধিতা করা মানেই তো দ্যাবতাদের কোপে পড়া। সেই থেকে এখনো অবধি ওই ধারাই চলতিছে। শালগ্রাম শিলা দিয়ে মশলা পেষাই। এক নাগাড়ে মশলা পিষতে পিষতে শিলাটাই ক্ষইয়া গেছে বারোআনা।

কথাগুলো বলতে বলতে বাণীকাকা এমনই একটা নিখুঁত ছবি আঁকতেন, শুনতে শুনতে একটা রহস্যে মোড়া আদিম সময়কে যেন ঝাপসা দেখতে পেতাম আমি। আর, ছবিটা আঁকবার বেলায় তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠত এমনই এক ধরনের মগ্নতা, দেখতে দেখতে মনে হত, হাজার হাজার বছরের ওপার থেকে তুলে এনে তিনি যে-সময়টাকে এমন নিপুণভাবে এঁকে ফেললেন আমাদের সামনে, ওই সময়কালে তিনিও হাজির ছিলেন ওই দৃশ্যপটে। কেন কি, আমার বিশ্বাস, কেবল ইতিহাসের বই থেকে তথ্য নিয়ে কেউ অত নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে না। আর, ওই কথাটি ভাবতে গেলেই বাণীকাকাকে আদিম অতীতের গন্ধ মাখানো এক রহস্যময় মানুষ বলে মনে হত আমার।

তবে, বাণীকাকা যে আমার চোখে শুধু একজন রহস্যময় মানুষই ছিলেন তাই নয়, তাঁর মধ্যে যৎপরোনাস্তি স্ববিরোধিতাও লক্ষ করেছি আমি৷ সেটা অনেকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে অনেক ঘটনায়।

কখনো মনে হত তিনি ঈশ্বরবিরোধী, নাস্তিক, এক মুক্তমনের আধুনিক মানুষ, কখনো মনে হত তাঁর মনের মধ্যে হাজার হাজার বছরের পুরোনো মানুষটি আজও অবধি বেঁচে রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আগের দিনের মানুষজন ঢের বেশি বর্বর ছিল, আবার পাশাপাশি তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, আগের দিনের মানুষের নৈতিকতার মাণ আজকের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। তাঁকে যতবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, আগের মানুষ আজকের তুলনায় কত বর্বর ছিল। আগের দিনে মৃগয়ার নামে নির্বিচারে পশুহত্যা ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান বিনোদন। হাজার হাজার মানুষকে পশুর মতো ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের ক্ষেতে-খামারে দাস বানিয়ে খাটানো হত। প্রকাশ্য হাটে-বাজারে মানুষ কেনাবেচা চলত। সৈন্যদল সাজিয়ে এলাকার পর এলাকা লুণ্ঠন করাকে অভিযান বলা হত। এবং সেই 'বীরত্ব'কে সম্ভ্রম জানানো হত। মানুষকে ঘৃণা করা, জাতপাত আর অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ—এ সবই আগের দিনের মানুষের তৈরি। ধর্মের মতো নির্মম শোষণপ্রক্রিয়াটিও সৃষ্টি করেছে আগের দিনের মানুষ। ঈশ্বরের মতো খুড়োর কলের রাঙা মুলোটিও মানুষের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওরাই। একজন পুরুষের শতশত

শয্যাসঙ্গিনী, হারেমের নামে, কৌলিন্যের নামে, ওরাই চালু করেছে। তবুও ন্যায়নীতি বলে যা-যতটুকু মানত মানুষ, কেবলমাত্র দ্যাবতাদের অভিশাপ, মরবার পরে নরকভোগ, পরজন্মে ইতর প্রাণী হয়ে জন্মানো, আর ইহজন্মে রাজারাজড়ার দেওয়া নিদারুণ শাস্তির ভয়ে। কী বর্বর শাস্তিপ্রথা চালু করেছিল আগের দিনের সমাজপতিরা! কাজেই, যাদের শাস্তির ভয় ছিল, তারা ভয়েভক্তিতে নীতিবাগীশ হত, যাদের সে ভয় ছিল না অর্থাৎ যারা শাস্তির উর্ধ্বে ছিল, রাজারাজড়া, অভিজাত আর পুরোহিতের দল, তারা কিছুই মানত না। তারা যা বলত, করত, তাই হয়ে যেত আইন, নীতি। এযুগের মানুষ বরং সেইসব বর্বর ব্যবস্থার অনেক কিছুই ভাঙতে চাইছে। না, কোনও আইনের পীড়নে বাধ্য হয়ে নয়, নিজেদের অন্তর্গত নীতিবোধ থেকেই ভাঙছে সেসব। নির্বিচারে পশুনিধন, মানুষ কেনাবেচা, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, অভিযানের নামে দেশের পর দেশ নির্বিচারে লুণ্ঠন, এসব আজকের মানুষই বন্ধ করতে চাইছে।

বাণীকাকা শুনতেন সবই, কিন্তু আমাদের কথায় খুব একটা প্রভাবিত হতেন বলে মনে হয় না। তবে নৈতিকতার মান কোন্ যুগে কেমন ছিল, সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের দ্বিমত থাকলেও, জীবনে নৈতিকতাকে সবার ওপরে স্থান দিতেন তিনি।

অথচ একদিন গাঁয়ে গিয়ে শুনলাম একেবারেই বিপরীত ঘটনা। শুনলাম, তিনি নিয়মিত পারুল কাকিমার বাড়িতে আনাগোনা জুড়েছেন। কথাটা শোনামাত্তর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

পারুল কাকিমা যখন বিধবা হন, তখন তাঁর ভরা যৌবন। পারুল কাকিমা আর একটিমাত্র মেয়েকে রেখে রসিককাকু আচমকা চলে গেলেন ওপারে। মেয়েটার বয়েস তখন এগারো-বারোর বেশি নয়। শোনা যায়, পারুল কাকিমার বাপ-মা মারা গিয়েছে ছেলেবেলায়। ভাইগুলো পাষণ্ড, ভাজগুলো খাণ্ডার। পারুল কাকিমার কোনও খোঁজই নেয় না ওরা। ফলে, রসিককাকু মারা যাওয়ার পর পারুল কাকিমা পড়লেন অথৈ জলে। জমিজিরেত যেটুকু ছিল, ভাসুর-দেওররা সুযোগ বুঝে হাতিয়ে নিতে চায়। নানাভাবে হেনস্থা করতে চায় পারুল কাকিমাকে। সবচেয়ে বড় শত্তুর তাঁর ভরা যৌবন। অনেকেরই লালসাভরা দৃষ্টি ঐদিকে। কিন্তু ওদের দলে যে বাণীকাকার মতো মানুষও সামিল হবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি।

তখন বাণীকাকার ব্যাপার নিয়ে সারা গাঁময় ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিভা কাকিমা অর্থাৎ বাণীকাকার স্ত্রী নাকি ইতিমধ্যেই দু-দুবার বিষ খেয়েছিলেন আত্মহত্যার বাসনায়।

আমি কিন্তু প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিনি গ্রামের মানুষের কথা। বাণীকাকা এতটা নিচে নাববেন, এটা ভাবতেও কষ্ট হত আমার।

একদিন লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাণীকাকার মুখোমুখি হলাম।

বললাম, একটা কথা তোমায় সরাসরি জিজ্ঞেস করতে চাই, বাণীকাকা। যদিও আমি তোমার ছেলের বয়েসি—।

আমি নিশ্চিত, বাণীকাকা বুঝতে পেরেছিলেন আমি কোন্ কথাটি শুধোতে চাইছি। খুব নির্বিকার গলায় বললেন, সঙ্কোচ করছিস কেন? প্রাপ্তেতু ষোড়ষে বর্ষে—ছেলেও বন্ধুর মতো।

বললাম, পারুল কাকিমা আর তোমাকে নিয়ে যা-সব শুনতে পাচ্ছি, সত্যি?

—কী শুনতে পাচ্ছু?

—তুমি নাকি নিয়মিত পারুলকাকিমার কাছে আনাগোনা করতিছো? ওখানেই নাকি সারাক্ষণ পড়িয়া থাকতিছো? ওর মেয়েটার বিয়ে হচ্ছিলনি, তুমিই নাকি ওকে চেষ্টাচরিত্র করিয়া বিয়ে দিয়া দিছ, পারুলকাকিমাকে ঝাড়া হাত-পা করবার জন্য?

বাণীকাকা বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। একসময় খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, হ্যাঁ, পারুলের কাছে যাই আমি। ঠিকই শুনেছু তুই। পারুল আমার রক্ষিতা।

আমি বিস্ময়ে থ' হয়ে যাই। বাণীকাকাকে তিরস্কার করবার ভাষাও খুঁজে পাইনে বুঝি। তাঁকে ঘেন্না করবার উপযুক্ত অভিব্যক্তিও বুঝি ফোটাতে পারিনে মুখে।

বলি, রক্ষিতা হয়ত অনেকেই রাখে, কিন্তু ওকে লিয়ে তুমি নাকি এমন সব পাগলামো করতিছো, যাতে করে তোমার পরিবার, শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখ পুড়িয়া থাক?

—যেমন? বাণীকাকা খুব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে।

—যেমন, নিভা কাকিমা যখন বিষ খেয়ে মরতে বসেছেন, তুমি নাকি তাকে হাসপাতালে লিয়ে গিয়ে সারিয়ে তুললে, কিন্তু যেদিন ওকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে লিয়ে এলে, নিভা কাকিমা বাড়ির চৌকাঠ পেরোনোর আগেই নাকি তুমি রওনা দিলে পারুল কাকিমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ, গিয়েছি তো। কারণ, সেও তো উৎকণ্ঠায় ছিল। তোর নিভা কাকিমার মরণ-বাঁচন লিয়ে তার মনেও তো উদ্বেগের অন্ত ছিলনি।

—কেন? তার উদ্বেগ কিসের জন্য? আমি ব্যঙ্গ সহকারে বলি,—নিভা কাকিমা মরলে তো তার ষোলআনা লাভ।

বাণীকাকা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

একসময় মৃদু হাসলেন তিনি।

বললেন, ভুল। ভেবেছু, আমাকে লিয়ে পারুল আবার নতুন করে সংসার পাততে চাচ্ছে? কিংবা আমি চাচ্ছি? ওরে, আমার এই ঘর-সংসার, ঘরে অমন সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বিষয়-সম্পত্তি, আমি কোন দুঃখে নতুন করিয়া অন্যের সঙ্গে সংসার পাততে যাবো? এই সংসারে আমার কিসের অভাব? কোন্‌টা কম? আর, পারুলও সে স্বপ্ন ভুলেও দেখে না।

—তবে কেন এতএত বদনাম, অপবাদের বোঝা মাথায় লিয়ে ওর কাছে যাও তুমি?

—ওই যে বললাম, একটাই কারণে যাই। ওকে রক্ষা করতে। সবদিক থেকে। ওর অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, অনাথিনী অবস্থা, অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া,—সবদিক থেকে ওকে রক্ষা করাটা আমার কর্তব্য। কারণ, রসিক ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। ওর অবর্তমানে ওর বিধবাকে আমি ভাসিয়া যাইতে দিতে পারি? ওকে সবদিক থেকে রক্ষা করাটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমি তাকে সমাজের নানাবিধ ঝড়ঝাপটা, দমকা হাওয়ার থেকে রক্ষা করি। সেই কারণেই তো বলতিছি, সে আমার রক্ষিতা।

—শুধু রক্ষা কর? আর কিছু কর না?

—আর কিছু বলতে?

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে আমি বলেই ফেলি, তোমাদের মধ্যে কোনও দৈহিক সম্পর্ক নেই?

—আছে। খুব নিরাসক্ত মুখে বলেন বাণীকাকা,—কিন্তু তুই কি ভাবিস, সেটা আমার নিজের যৌন লালসা চরিতার্থ করবার জন্য?

—তবে?

—শোন্ পাগলা, বড় হয়েছু তুই, তোকে খোলাখুলি বলা যায় সব, তোর নিভা কাকিমাকে লিয়ে আমি যৌনজীবনে তিলমাত্র অসুখী নই। তবুও যে পারুলের সঙ্গে আমার যৌন-মিলন হয়, সেটা পুরোপুরি পারুলেরই প্রয়োজনে। সে আমার প্রাণের বন্ধুর স্ত্রী, তার সব রকমের ক্ষুণ্ণিবৃত্তির ব্যবস্থা করা, তাকে যৌনবিকৃতি থেকে রক্ষা করা, সেও আমার এক কর্তব্য। সাধে কি আর বলেছি, সে আমার রক্ষিতা।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম বাণীকাকার কথাগুলো। শুনতে শুনতে তাঁকে আমার বাস্তবিক দুর্জ্ঞেয় লাগছিল। এ সংসারের প্রচলিত নৈতিকতার যাবতীয় সংজ্ঞা বুঝি নতুন করে লিখতে চান বাণীকাকা!

আমার পিঠে একটা নরম করে চাপড় মেরে বাণীকাকা বলেন, অত ভাবিসনি। তোদের বাণীকাকা অনৈতিক কিছুই করেনি জীবনে, করবেওনি। যাহ্, বাড়ি যা।

সারা জীবনে বাণীকাকার মধ্যে এমন দুর্জ্ঞেয় পরস্পরবিরোধিতা আমি আরও দেখেছি।

মনে আছে, একবার পথের থেকে একটা মরণাপন্ন কুকুরকে খাটিয়ায় চড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন বাণীকাকা। মাসাধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। এমনভাবে রোজ নিজের হাতে ওর শরীরের ঘা'গুলো মুছিয়ে দিয়ে মলম লাগিয়ে দিতেন অশেষ মমতায়, মানুষ মা-বাবারও অতখানি শুশ্রূষা করে না। গাঁয়ের সবাই হেসেই খুন। আমরাও। বলি, বাণীকাকা, এবার একটা কুকুরের হাসপাতাল খোলো। জমিয়াবে।

· দিন কয়েক সকলের ঠাট্টা-মস্করা, টিটকিরি মুখ বুঁজে হজম করলেন বাণীকাকা। একদিন, বাণীকাকার চারপাশে জমিয়ে বসেছি আমি, কল্পনাথ, সুবিকাশ, গজানন,—হরেক কথার মধ্যে এক সময় এসে গেল বাণীকাকার কুকুর-চিকিৎসার প্রসঙ্গ।

বেশ চলছিল আড্ডা, আচমকা কুকুরের প্রসঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন বাণীকাকা। খুব থমথমে গলায় বললেন, কুকুরটাকে কেন অত পরিশ্রম করিয়া বাঁচালাম জানিস? শুনতে চাস? শুন্ তবে। আচ্ছা, কোন্ মুলুকের একটা কুকুর, রোগ-ব্যারামে মরণাপন্ন হয়্যা আমাদের এই লোকালয়ে আইসিয়া ঠাঁই লিলো কেন বল্ দেখি? আমরা জবাব দেবার আগেই বাণীকাকা বলে ওঠেন, আচ্ছা ধর্, আমাদের এই লোকালয়ে আইসিয়া গাছতলায় কঁকাতে কঁকাতে কুকুরটা যদি বিনা চিকিৎসায় মারা যাইত, মরবার আগে উ' আমাদের সম্পর্কে কী ভাবতে ভাবতে মরত?

—আমাদের সম্পর্কে মানে? কাদের সম্পর্কে?

—এই, মানুষ জাতটা সম্পর্কে? ভাবত, বনেবাদাড়ে পড়িয়া পড়িয়া মরবো, তার চাইতে মানুষের পাড়ায় যাই, এই ভাবিয়া আইলাম এখানে। কেন কি, মানুষ তো নিজেদের সভ্য বলিয়া দাবি করে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া বড়াই করে, নিশ্চয় আমাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিবেনি। কারণ, তারা তো আর আমাদের মতো জানোয়ার নয় যে, কেবল নিজেকে ছাড়া আর কারোর কথাই ভাবে না। তারা সব সুসভ্য জাত। তো, কুকুরটা যদি গাছতলায় পড়িয়া পড়িয়া মরত, কী ভাবিয়া ভাবিয়া মরত সে? ভাবত, ওহে মানুষ, এই তোমাদের সভ্য হওয়ার নমুনা? এই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নজির? তোমাদের বোধ-বুদ্ধি, চেতনা নাকি আমাদের মতো ইতর প্রাণীদের চেয়ে ঢেরগুণ বেশি, হরবখত মানবিকতার বড়াই করো তোমরা, অথচ একটা প্রাণী তোমাদের সক্কলের চোখের সামনে তিলতিল করিয়া যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মরলো, তোমরা গ্রাহ্যই করলেনি? কুকুরটা মরবার আগে আমাদেরকে নিজেদের চেয়েও বর্বর ভাবতে ভাবতেই মরত। নচেৎ একটা অসুস্থ কুকুরকে লিয়ে আদিখ্যেতা করবার কীই বা দরকার ছিল আমাব? স্রেফ নিজেদের মান বাঁচাবার তাগিদেই ওটা করেছি আমি, বুঝলি বোকার দল?

অথচ, কিছুদিন বাদে কোত্থেকে একটা ভিনদেশি ভিখিরি গোছের লোক যখন বটতলায় দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে থাকতে মরে গেল একদিন, বাণীকাকা ফিরেও তাকালেন না ওর দিকে।

আমরা তখন খুবই ছোট। কীইই বা করতে পারি? দল বেঁধে গেলাম বাণীকাকার কাছে। বললাম, বাণীকাকা, লোকটা বোধ করি বাঁচবেনি।

চরম তাচ্ছিল্য সহকারে বাণীকাকা বললেন, মরতে দে। তারপর কম্বুকণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করলেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?/চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন নদে...?

ক্ষেপে গিয়ে বলি, বা-রে! সেবারে রাস্তার কুকুরটাকে অমন করিয়া বাড়িতে লিয়ে গিয়ে বাঁচালে, আর এই ভিখিরিটার বেলায়...।

বাণীকাকা মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন, সেটা ছিল এক অসহায় জীব। আমি ছাড়া ওর গতি ছিলনি। আর, এ হইল একটা মানুষ।

—তাতে কি? আমাদের কচি মন ফুঁসে ওঠে,—মানুষ বুঝি কোনও জীব নয়? তার বুঝি সেবা-যত্নের প্রয়োজন নেই? তার মরাটা বুঝি কিছু নয়?

বাণীকাকার চোখমুখ অজান্তে কঠিন হয়ে ওঠে। বলেন, মানুষকে লিয়ে অত ওকালতি করিসনি। মানুষ হইল লুঠেরার জাত। সে রাজাই হোক আর ভিখারিই হোক।

কল্পনাথের ভাবনাচিন্তাতেও পরস্পরবিরোধিতা কম ছিল না।

একটা ঘটনা বলি।

কল্পনাথ তখন গাছগাছাল, পশুপাখি, কীটপতঙ্গকে নিয়ে তার স্বরচিত জগৎটিকে নিয়ে মশগুল। বলে, এই পৃথিবীতে, বুঝলি, প্রত্যেকটি প্রাণীরই দরকার রয়েছে। কেউ ফেলনা নয়, কেউ অতিরিক্ত নয়। কত ভাবনাচিন্তা করিয়া, কত হিসাবলিকাশ করিয়া, কত গবেষণা করিয়া প্রত্যেকটা পশু-পাখি,

কীটপতঙ্গ, গাছগাছালকে তৈরি করেছে ওপরওয়ালা। তাদের আকার-অবয়ব, খাদ্য, বাসস্থান, আচার-আচরণ, অভ্যাস,—হিসেব কষিয়া কষিয়া বানানো হয়েছে। এই মানুষের কথাই ধর্ না। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি হিসেব করিয়া করিয়া বানানো। গায়ের রঙ, হাত-পায়ের নখ, নাকের ফুটোর লোম, এমন কি চোখের পাতার রোম—কত আর বলবো তোকে—সবকিছুরই প্রয়োজন রয়েছে। এমন কি, শরীরের কোন্‌দিকটা কোন্‌দিকে কতখানি বাঁকানো যাবে, তাও ভাবিয়া-চিন্তিয়া তৈরি করা।

আমি অবাক হয়ে শুনতে থাকি কল্পনাথের কথাগুলো। কেন কি, আমরা দুজনেই তখন ক্লাস-থ্রি'র ছাত্র। বলি, তুই কী করিয়া জানলি এতসব? কে বলেছে তোকে এসব কথা?

কল্পনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বলেছে বটে বাণীকাকা, তবে কথাগুলো মিছে নয়। প্রয়োজন না থাকলে একটি বাড়তি প্রাণীও জন্মাত না এই পৃথিবীতে, তাদের একটা বাড়তি প্রত্যঙ্গও প্রয়োজন ছাড়া তেরি হয়নি। কাজেই, দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বুঝলি? বাণীকাকা বলে, মানুষ যখন এটা বুঝতে পারবে, তখনি বলা যাবে, সে সভ্য হয়েছে, তখনই মানা যাবে, সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এখন মানুষকে বড় জোর ভাবা চলে, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী এক জানোয়ার।

এমনভাবে কথাগুলো বলল কল্পনাথ, শুনতে শুনতে আমার মনে হল, কেবল বাণীকাকার কথাগুলো উগরে দেওয়া নয়, এর প্রত্যেকটি শব্দকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

অথচ আর একদিন, আমরা দুজনে বসে গল্প করছি রানীহাঁস দিঘির পাড়ে, আমাদের সামনে একটা ঝোপের ওপর একটা প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছিল। ভারী সুন্দর দেখতে প্রজাপতিটা। পাখায় কী বিচিত্র রঙ আর কারুকার্য! গল্প করতে করতে লক্ষ করছিলাম, একটা বুলবুল প্রজাপতিটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিশানা করছে ধরবার জন্য। বার কয়েক ছোঁ মেরেও সুবিধে করতে পারল না। তৃতীয় বার ছোঁ মারতে আসতেই আমি হাত নেড়ে তাড়াতে গেলাম বুলবুলটাকে, কেন কি, কল্পনাথের সান্নিধ্যে থেকে থেকে আমিও ততদিনে পশুপাখি, কীটপতঙ্গকে ভালোবাসতে শুরু করেছি।

কল্পনাথ কিন্তু সজোরে আমার হাতটা চেপে ধরল।

বলে, করিস কি?

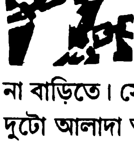
বলি, পাখিটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

কল্পনাথ অবাক হয়ে বলে, কেন?

আমি বলি, বা-রে, প্রজাপতিটাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলবে যে।

কল্পনাথ খুব নির্বিকার গলায় জবাব দেয়, খাবেই তো। প্রজাপতিটা যে ওর খাদ্য। ওর খাবার ওকে খাইতে না দিলেও তো মরিয়াবে।

বলেই কল্পনাথ আমাকে পায়রা-বাজপাখি আর রাজা শিবির গল্পটা শুনিয়ে দেয়।



পড়াশোনার চাপটা দিন দিন বাড়ছে। মাসে একবারের বেশি গাঁয়ে যেতে পারিনে। গেলেও কল্পনাথের বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তার একটা কারণ হল সময়াভাব। এক-আধদিন যা থাকি, সঙ্গে বইপত্তর নিয়ে যাই। বাড়িতেও পড়াশোনা করি।

কল্পনাথদের বাড়িতে না যেতে পারার আর একটা কারণ হল, কল্পনাথই তো থাকে না বাড়িতে। সে যে কবে বাড়ি আসে, কবে ফিরে যায়, আমি জানতেও পারিনে। একই কলেজে পড়ি। দুটো আলাদা আলাদা মেসে থাকলেও আগে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হত। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ কল্পনাথ কেন জানি একটু একটু করে আমার থেকে দূরত্বটা বাড়িয়ে নিয়েছে। তার বদলে দিবাকরের সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা খুব বেড়েছে ইদানীং। দিবাকরও আমাদের গাঁয়ের ছেলে। আমাদের গাঁয়ের গোপেশ ঘোষের ছেলে সে। আমাদের আকৈশোর সহপাঠী। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বটা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। কারণ, দিবাকর সেই ছেলেবেলা থেকেই মুখচোরা। কারোর সঙ্গে মেশে না বললেই চলে। অথচ তার সঙ্গেই এখন কল্পনাথের গলায় গলায়। ইদানীং কল্পনাথ আর দিবাকর যে কোথায় থাকে, কী করে, আমি

তা অধিকাংশ সময়ে জানতেও পারিনে। গাঁয়ে গিয়ে শুনতে পাই, বাড়িতে যাতায়াতও ওরা কমিয়ে এনেছে একেবারেই। মাঝে মাঝে কলেজের অন্য বন্ধুদের মুখে শুনতে পাই, নাকি নিয়মিতভাবে গ্রামাঞ্চলে যায়। কোন্ গাঁয়ে যায়, কেনই বা যায়, আমার আর জানা হয়ে ওঠে না। দু'একবার এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সদুত্তর পাইনি ওদের থেকে।

কল্পনাথ অবশ্য সেই ছেলেবেলা থেকেই উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে। বদ্ধ জীবন তার একেবারেই অসহ্য। কিন্তু তাই বলে পড়াশোনায় মন না দিয়ে সে যে কীসের টানে যত্রতত্র ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি তার কোনও কূলকিনারা পাইনে।

এবারে অবশ্য, বহুদিন বাদে, কল্পনাথ আর আমি একসঙ্গেই গাঁয়ে এসেছি।

পরের দিনই আমার ডাক পড়ল কল্পনাথদের বাড়িতে। বিন্দুদি ডেকে পাঠিয়েছে।

ঐবয়েসে বিন্দুদি আমার চোখে ছিল একটি স্বপ্নপ্রতিমা। তার আহ্বানকে অস্বীকার করার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু না, বিন্দুদির প্রতি কোনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না আমার। সে ছিল আমার চেয়ে বয়েসে অন্তত বারো বছরের বড়। আমি তাকে একেবারে দিদির মতোই দেখতাম। সেও, কল্পনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিবেচনায়, আমায় ছোটভাইয়ের মতো দেখত। তবুও, আজ অস্বীকার করবার ইচ্ছে নেই, বিন্দুদিকে নিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে প্রবল আকর্ষণের পাশাপাশি গাঢ় রহস্যময়তাও বাসা বেঁধেছিল।

আমাদের তখন খুবই ছেলেবেলা, বিন্দুদির বিয়ে হয়েছিল হাউর নাকি রাধামোহনপুর এলাকার এক ব্যবসায়ী পরিবারে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই বিন্দুদি বাপের বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে থাকে। কী কারণে যেন শ্বশুরবাড়িতে সে কখনোই যেত না। কল্পনাথের মায়ের শরীরটা তখন একটু একটু করে ভাঙছে। ফলে, গোটা সংসারটা পড়েছে বিন্দুদির ঘাড়ে। সেই সুবাদে তার মধ্যে এক ধরনের গিন্নি-গিন্নি ভাব। সে-ই সংসারের সর্বেসর্বা। সবারই যা-কিছু আবদার, দাবি সবই বিন্দুদির কাছে। বিন্দুদিও সব ঝক্কি একা হাতে সামলাচ্ছে হাসিমুখে।

বিন্দুদির ছিল এক আশ্চর্য রূপ। তবুও যে কেন ওকে শ্বশুরবাড়িতে নিত না, আমার কাছে আজও তা এক বিস্ময়। খুবই রক্ষণশীল পরিবার ছিল কল্পনাথদের। ওর বাবা অর্থাৎ আমাদের অঘোর জেঠু ছিলেন সাত্ত্বিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বাহ্মমুহূর্ত থেকে মধ্যরাত অবধি প্রহরে প্রহরে হরেক কিসিমের মন্ত্রপাঠ করে তাঁর দিন কাটত।

বিন্দুদির বাপের বাড়িতে থাকাটা ছিল আগাগোড়াই একটা অভিশপ্ত ব্যাপার। অগাধ রূপের কারণে তার দিকে অনেকের নজর পড়েছিল। আমার ধারণা, বিন্দুদির নিজেরও তাতে প্রশ্রয় থাকত। তাই নিয়ে অঘোর-জেঠুর উঁচু মাথা একটু একটু করে হেঁট হচ্ছিল।

তখনকার দিনে অঘোর-জেঠুদের মতো সাত্ত্বিক বামুনের বাড়ির মেয়েরা স্বামী পরিত্যক্তা হলে আবার বিয়ে করতে পারতই না। বিন্দুদির পড়াশোনা বলতে প্রাইমারি অবধি। তখন আমাদের সন্ধিপুর গ্রামটাও ছিল একেবারে শিক্ষাদীক্ষার লেশহীন অজগ্রাম। তাও বাণী-কাকা অঘোরজেঠুকে বিন্দুদির আবার বিয়ে দেবার জন্য দু'একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অঘোর-জেঠু সেই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বড় হয়ে যখন সবকিছু বোঝার ক্ষমতা জন্মাল, ততদিনে বিন্দুদির রূপের শরীরে কলঙ্ক জমেছে অগাধ। সাংসারিক জীবনে একজন স্নেহশীলা দায়িত্বশীলা মহিলা হিসেবে তার খ্যাতি থাকলেও তার যৌনজীবন নিয়ে গল্পগাথার অন্ত ছিল না। তার সঙ্গে গাঁয়ের একাধিক পুরুষের নাম জড়িয়ে ততদিনে অগুনতি কাহিনি ভেসে বেড়ায় সন্ধিপুরের বাতাসে। সেসব কাহিনি, রটনা অঘোর জেঠুকে জীবন্মৃত করে তুলত। ফলে, মাঝে মাঝে রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি অত বড় মেয়েকে মারতেও বাকি রাখেননি। কিন্তু বিন্দুদি ছিল একেবারে বেপরোয়া। নিজের শরীরের চাহিদার তুলনায় বাপ-মায়ের মানমর্যাদাটা তার কাছে নিতান্তই গৌন ছিল। ফলে, গ্রামের বেশ কিছু পুরুষের সঙ্গে তার ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে গোপন যৌনসম্পর্ক। একজন পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক চলাকালীন ধরা পড়ে গেলে পুরুষটি যদি লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে

গুটিয়ে নিত, তো কিছুদিনের মধ্যেই বিন্দুদির জীবনে এসে যেত দ্বিতীয় পুরুষ। এইভাবে...একের পর এক পুরুষ বদলাতে বদলাতে বিন্দুদি একেবারে বহুভোগ্যা হয়ে উঠেছিল।

অঘোর জেঠুর কঠোর গঞ্জনায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে একবার নাকি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল বিন্দুদি। দোতলার কোণার ঘরের কড়িকাঠে নিজের শাড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়েছিল তাতে। একেবারে শেষ মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাকে কোনওগতিকে অচৈতন্য অবস্থায় নামানো হয়।

সেযাত্রায় কোনওগতিকে বেঁচে গিয়েছিল বিন্দুদি। কিন্তু ওই ঘটনায় অঘোর জেঠু নিদারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে, তারপর থেকে বিন্দুদির ইচ্ছেয় বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়াননি। বিন্দুদির ভবিতব্যকে এক সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বরং নিজের বাড়ির গোপন চৌহদ্দির মধ্যে বিন্দু যদি তার সাধ-আহ্লাদগুলি নিতান্তই মেটাতে চায়, তো সে-পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে সাহস পাননি অঘোর জেঠু। ফলে, আমরা যখন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, তখনও অবধি বিন্দুদির পরপুরুষে গমন পর্বটি অব্যাহত ছিল।

গাঁয়ে ঢোকামাত্রই গজানন দিত মুখরোচক খবরগুলি। বিন্দুদির নবতম পুরুষটির কথা জানাত আমাদের। তার দেওয়া খবরগুলো যে একেবারেই মিথ্যে নয়, বহুভাবে তার প্রমাণ পেতাম আমিও। হঠাৎ হঠাৎ এক-একজন পুরুষ মানুষকে, অঘোর জেঠুদের পরিবারের সঙ্গে যার কস্মিনকালেও ভাব-ভালোবাসা দেখিনি, সন্ধের আঁধারে ঢুকতে দেখেছি অঘোর জেঠুদের বাখুলে। এ ব্যাপারে আমার দেখা শেষতম পুরুষটি হল বঙ্কিম ভুঁইয়া।

বঙ্কিম ভুঁইয়া। সেই ছেলেবেলায় প্রাইমারি স্কুলে আমাদের চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ত সে। তার মা ছিল জাতে মাঝি। কাজ করত মুখুজ্যাগড়ে। মাজামাজা গায়ের রঙে বেশ দেখতে ছিল ও। হিরন্ময় মুখুজ্যা ওকে মাঝেমাঝেই ভোগ করতেন। তার ফলে জন্মায় বঙ্কিম। তার গায়ের রঙ ছিল খুবই ফরসা। মাঝিদের রঙের সঙ্গে তা মেলে না। সন্ধিপুর গাঁয়ের সবাই জানত, ও মুখুজ্জ্যার জারজ সন্তান।

একটু বড় হতেই বঙ্কিমও জেনে গিয়েছিল তা।

ছেলেবেলা থেকেই খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিল সে। সারাক্ষণ কী এক গভীর ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকত। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ যেন ফুটে বেরোতে থাকল। ৬৭ থেকে সে পার্টিতে ঢুকে পড়ল। সত্তর দশক থেকে সে হল সিপিএম পার্টির একজন মাতব্বর। ততদিনে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে পুরোপুরি লাম্পট্য। ছেলেবেলা থেকেই জারজত্বের অপমান তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তার শৈশব-কৈশোরকে ভরিয়ে দিয়েছে গ্লানিতে। এখন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পেয়ে সে বুঝি তার শোধ নিতে তৎপর। আর, কোনও এক অন্তঃসলিলা প্রতিশোধস্পৃহার থেকে সে বুঝি বেছে বেছে কেবল উঁচু জাতের মেয়েদের এঁঠো করবার জন্য বদ্ধপরিকর।

একদিন তার নজর পড়ল বিন্দুদির প্রতি। এবং একটু একটু করে সে একদিন বিন্দুদিকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল।

সেই লজ্জায় অঘোরজেঠু আরও বেশি করে বুড়িয়ে গেলেন।

আমরা যখন কলেজে পড়ছি, বঙ্কিম তখন পাকাপাকি দখল নিয়ে ফেলেছে বিন্দুদির, আর সেই কথাটা সন্ধিপুরের বাচ্চা-বুড়ো সব্বাই জেনে গিয়েছে।

বিকেলের দিকে কল্পনাথদের বাড়িতে গেলাম। সারা বাড়িটা যেন থমথম করছিল। জেঠিমা তখন শয্যাশায়ী। আর, অঘোরজঠুকে চারপাশ থেকে বার্ধক্য একেবারে জাপটে ধরেছে। বিন্দুদিকেও দেখলাম খুবই রোগা হয়ে গিয়েছে।

এ-কথা সে-কথার পর বিন্দুদি আসল কথাটা পাড়ল। বলল, ডালিমের কোনও খবর জানিস?

—খবর মানে—ডালিম কেমন আছে?

বিন্দুদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। একসময় খুব মৃদু গলায় বলে, ভালো নাই সে। একেবারেই ভালো নাই।

শোনামাত্র আমার বুকের ভেতরে অচেনা মোচড়।

বিন্দুদি ধীরে ধীরে শোনায় ডালিমের করুণ জীবনের কথা। শ্বশুরবাড়িতে তার দিন কাটছে অবর্ণনীয় নিপীড়ন সয়ে। মাখন তার ওপর সীমাহীনভাবে নিষ্ঠুর আচরণ করে। তার শ্বশুর-শাশুড়িও সারাক্ষণ ওকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে। একনাগাড়ে অত্যাচার সইতে সইতে সে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বলতে বলতে একসময় বিন্দুদির চোখের কোণা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বলে, হীরালালকে দিয়া কিছু গাছপাকা আম পাঠিয়েছিলাম, সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসছে তার দুর্দশা। তাকে অরা হীরালালের সুমুখে আসতে দেয়নি। তবে তাও এক ঝলক অকে দেখতে পেয়েছে হীরালাল। পরনে মলিন কাপড়। কাঁটাসার শরীর। যেন পুড়া কাঠ একটি। একেবারে জীয়ন্তে মরিয়া রইছে সে।

—কিন্তু কেন?

বিন্দু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। একসময় বলে, সে আমি জানিনি। বাইরে থেকে কতকিছু কথা কানে আসে, তার কতটা সত্যি কতটা বানানো, ভগবানই জানেন।

বলতে বলতে বিন্দুদি সারামুখে মিনতি ফুটিয়ে তাকায় আমার দিকে। বলে, তুই আর কল্প একটিবার যা না। স্বচক্ষে দেখিয়া আয় না অভাগীটাকে। যাবি?

রাজি না হওয়ার কথা মনেও হয়নি আমার। কিন্তু ডালিমের কথা ভাবতে ভাবতে সেই রাতে, সেই প্রথম, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি আমি।

পরের দিন গজানন দিল ডালিম সম্পর্কে বিস্তৃত খবর। তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে, প্রায় গুহ্য কথা ফাঁস করবার মতো করে, সে আমায় জানাল, ডালিমের খবর কিছো রাখু?

আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ডালিমের প্রতি এক ধরনের টান ছিল গজাননের। ডালিম যখন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করত, দেখতে দেখতে ওর চোখে কতবার বিষ-ঈর্ষা ছলকে উঠতে দেখেছি আমি। যখন প্রথম থিয়েটার হল আমাদের গাঁয়ে, ডালিমকে মাইকে ডাক দিয়ে সে বিপদে পড়ে গিয়েছিল। সেযাত্রা কোনগতিকে বেঁচে গিয়েছিল গজানন। কিন্তু ডালিমের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ দিনদিন বেড়েছে। এমন কি, ডালিমের যখন নানা জায়গায় বিয়ে সম্বন্ধ চলছে, একে-ওকে দিয়ে সে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল নিজের জন্য। অঘোর জেঠুরা ওর প্রস্তাবে কর্ণপাতও করেননি।

গজানন তার বিজোড় দাঁতগুলিকে উন্মুক্ত করে হাসে। বলে, পিঠার ভিতরকার পুরটার খবর জানিসনি তাহলে?

বলতে বলতে গলাটা খাটো হয়ে আসে ওর। বলে, ডালিমের বর ছুঁচে সুতা পরাতেই পারে না।

—মানে?

—মানে, বউয়ের সাথে সহবাসে অক্ষম সে।

গাঁয়ে-ঘরে কোনও কোনও কথা কেমন করে যেন রটে যায়। সেই খবরের উৎসমুখ খোঁজা বাতুলতা। ডালিমের ক্ষেত্রেও রটে গিয়েছিল তেমনই কিছু কথা।

ওর স্বামীটা নাকি সত্যি সত্যিই সহবাসে অক্ষম ছিল। তার সেই অক্ষমতাজনিত গ্লানি ভয়ানক রোষ হয়ে নাকি সর্বদাই আছড়ে পড়ত ডালিমের ওপর।

দু'একদিন বাদে আমি আর কল্পনাথ গেলাম ডালিমের শ্বশুরবাড়িতে।

আমাদের দেখে ডালিমের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রথমে খুবই অবাক হয়ে গেল। কারণ, ডালিম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর থেকে অঘোরজেঠুরা কেউই ওদের বাড়ি যাননি। বাচ্চা হওয়ার আগে মেয়ের বাপ-মাকে মেয়ের বাড়িতে যেতে নেই, আমাদের গ্রামাঞ্চলে সাবেক রক্ষণশীল পরিবারগুলোতে এটা এক প্রাচীন নিয়ম। আর, যেহেতু কল্পনাথ এক উড়ন্ত পাখি, একটু একটু করে নিজের সংসার থেকেই তুলে নিচ্ছে মন, সেও কোনওদিন যায়নি ডালিমের শ্বশুরবাড়িতে। বাড়ির পুরোনো মজুর হীরালালদা ছাড়া এতাবৎকাল আর কেউই যায়নি। আমাদের দেখে ওদের প্রাথমিক বিস্ময়টা সেই কারণে।

আমাদের বাইরের ঘরে বসতে দেওয়া হল। প্রথমে সরবৎ, তারপরে জলখাবার। সবকিছুই কিন্তু পরিবেশন করল ডালিমের শাশুড়ি আর মাখন মিলেজুলে।

ডালিমের সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। খেতে খেতে মনের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশ।

এতদিন বাদে নিজের একমাত্র দাদা এসেছে, ডালিম সঙ্গে সঙ্গে ভেতরমহল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে না! তবে কি বেচারি এতটাই অসুস্থ যে তার উঠে আসার ক্ষমতাটুকুও অবধি নেই? নাকি তাকে এতটাই বিধিনিষেধের মধ্যে রাখা হয়েছে যে, নিজের দাদা এলেও তার সঙ্গে এসে দেখা করবার উপায় নেই?

আশঙ্কায় দুলতে দুলতে একসময় মাখনকে শুধোই, ডালিম কোথায়?

মাখন চোখেমুখে খুব অস্বস্তি ফুটিয়ে বলে, বাড়িতেই রয়েছে।

—তবে ডাকো ওকে। কতদিন দেখিনি।

সেকথায় মাখনের সারামুখে অস্বস্তির পরিমাণটা অনেকখানি বেড়ে গেল। মিনমিনে গলায় বলল, কখন থেকেই তো বলতিছি, কিনা, কতদিন বাদে তোমার দাদারা এসেছে, যাও, দেখা কর উদের সাথ।

—সে কি আসতে চাইছে না?

মাটিতে দৃষ্টি নামিয়ে মাখন মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দেয় যে ডালিম কিছুতেই আসছে না।

আমার তৎক্ষণাৎ মনে হল, দীর্ঘদিন ওর কাছে অঘোর জেঠু কিংবা আমরা কেউ আসিনি বলে বুকের মধ্যে নির্ঘাৎ গাঢ় অভিমান জমেছে ডালিমের।

মৃদু হেসে বলি, কোথায় সে?

—ওই খিড়কির উঠোনে পা ছড়িয়া বুসিয়া আছে।

—আমরা যে এসেছি, ওকে বলেছ?

—বলিনি আবার?

—কী বলতিছে?

—কিছোই বলতিছেনি। জবাবই দিচ্ছেনি। কথাগুলা ওর কানে সেঁধিয়েছে কিনা তাও তো বুঝা দুষ্কর।

বলি, আমরা কি ওর কাছটিতে যেতে পারি?

একটুক্ষণ কী যেন ভাবে মাখন। একসময় ঢুকে যায় অন্দরমহলে। একটুবাদে ফিরে এসে বলে, আসুন।

আমরা বাড়ির বাইরে দিয়ে, ওদের গোটা বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে, খিড়কির উঠোনে গিয়ে পৌঁছোই।

মাঝউঠোনে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে ডালিম। ময়লা একটা শাড়ি তার পরনে। ব্লাউজের বালাই নেই। একমাথা রুক্ষ চুল লাট খাচ্ছে পিঠের ওপর। দেখেই বোঝা যায়, বহুদিন তেল এবং চিরুনি পড়েনি তাতে।

আমরা ওর সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইস্, কত রোগা হয়ে গিয়েছে ডালিম! গায়ের রঙে কালি পড়েছে। শরীরের চামড়া বালির মতো খসখসে। বুকের কাপড় যে খসে পড়তে চাইছে কোলের ওপর, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপই নেই।

আমাদের দিকে দৃষ্টি ছিল না ডালিমের। সামনের বাতাবি লেবুর গাছটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কতকিছু বিড়বিড় করছিল সে। তার দৃষ্টিতে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল।

একসময় খুব মৃদু গলায় ডাকি ওকে, ডালিম—।

সেকথায় তিলমাত্র ভাবান্তর ঘটল না তার মধ্যে। বিড়বিড়ানিও থামল না একতিল। চিনতে পারা তো দূরের কথা, আমাদেব দিকে তাকালই না ডালিম।

পুরো ব্যাপারটা বিতাং করে বলল মাখন।

সেটা ছিল বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। একদিন ঠায় দুপুরে ডালিম সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। বাড়ির সবাই তখন দিবানিদ্রায় ডুবে রয়েছে। আচমকা কে যেন আবিষ্কার করে, সদর দরজা খোলা। আর তখনই দেখা গেল, বাড়ির মধ্যে কোথাও নেই ডালিম। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডালিমের খোঁজে। এবং দু'তিন মাইল দূরে আসন্দার কাছাকাছি একটা শ্যাওড়া গাছের তলায় ওকে খুঁজে পাওয়া গেল। স্বামীকে যমের মতো ভয় করত ডালিম। কিন্তু সেই প্রথম দেখা গেল, স্বামীকে দেখে ভয় তো পেলই না, বরং বলে উঠল, মাখন, তুই এলি, কেদার এলোনি? সে যে গয়ায়

গিয়া আমার পিণ্ডি দিবে বলছিল, কই দিলনি তো। আমি আর কতদিন এই শ্যাওড়া গাছে রইবো? কেদারের একটা আক্কেল নাই?

মাখনের মুখে সবকিছু শোনার পর আমি ডালিমের পাশটিতে উবু হয়ে বসলাম। ওর চোখের ওপর চোখ রাখবার চেষ্টা চালালাম। একসময় বললাম, কেমন আছিস, ডালিম?

সঙ্গে সঙ্গে বাতাবি লেবুর গাছটার দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল ডালিম। তারপর মাথার ঘোমটাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলে এলোচুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের শ্বশুরকে ডাকতে লাগল, ওরে কেদার, কোথা গেলি, তোর খইদ্দার এসেছে দ্যাখ্।

সে-রাতটা আমরা রইলাম ডালিমের শ্বশুরবাড়িতে। আমাদের খুবই আপ্যায়ন করল মাখন। নিজেদের পুকুর থেকে মাছ ধরে পরিপাটি করে খাওয়াল। রাতে এক বিছানায় শুয়ে একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমরা—আমি আর কল্পনাথ। ডালিমকে নিয়ে আসব সন্ধিপুরে। আনতেই হবে।

পরের দিন সকালে কথাটা পাড়তেই ডালিমের শ্বশুর যেন আকাশের চাঁদ পেল হাতে। মাখনও দেখলাম বড় একটা আপত্তি করল না। ওদের ভাবগতিক দেখে আমাদের মনে হল, একটা বিশাল বোঝা যেন নেমে গেল ওদের ঘাড় থেকে।

কিন্তু বেঁকে বসল ডালিম নিজেই। মাথার আলুথালু চুলের রাশ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বারবার বলতে লাগল, আমি যাবোনি। ঐ শ্যাওড়া গাছে আমি মরিয়া গেলেও যাবোনি। সিখ্নে গেলে আমাকে অরা গলা টিপিয়া মারিয়া দিবে।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে ডালিমকে নিয়ে আসা হল বেলদায়। মাখনও এল সঙ্গে। আমাদের বাসে তুলে দিয়ে ফিরে গেল সে।

বাসটা বেলদা থেকেই ছাড়ছে। ফলে, আমরা তিনজনেই সীট পেয়ে গেলাম। ডালিমকে মাঝখানে বসিয়ে আমরা বসলাম দু'দিকে।

বাসে উঠে কিন্তু ডালিম একেবারে গুম মেরে গেল। জানালার বাইরে চোখদুটিকে বিঁধিয়ে দিয়ে পাথরের মতো বসে রইল সে।

পাঁচিয়াড়ে নেমে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। আমি আগে, ডালিম মধ্যে কল্পনাথ পেছনে। খুব ধীরপায়ে হাঁটছিল ডালিম। তার দুর্বল শরীরটা অল্প অল্প হাঁফাচ্ছিল।

শীতের বিকেল। তখন সবে মাঠের ধান কাটা শেষ হয়েছে। চারপাশটা খাঁ-খাঁ। দূরে ফ্যাকাশে দিগন্ত। একসময় আমার মনে পড়ে গেল, বছরটাক আগে এমনি এক পড়ন্ত বিকেলে ডালিমের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটেছিলাম আমি। আর তখনই ডালিম আমাকে আচমকা বলে ফেলেছিল ওই কথাটা, কিনা, সেদিন তো কই সাহস করে মাংসটায় একমুঠো নুন ঢেলে দিতে পারলে না শঙ্করদা। সাহসেই কুলোলো না তোমার।

ডালিমের সেদিনের সেই বাক্যটি পড়ন্ত বিকেলটাকে নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ করে তুলেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ডালিম অকস্মাৎ খুব মৃদু গলায় ডাকল আমাকে, শংকরদা।

আমি চমকে পিছু ফিরে তাকালাম ডালিমের দিকে। তুই আমাকে চিনতে পেরেছু?

—চিনতে না পারার কী আছে?

—তাইলে কাল থেকে আমাদের চিনতে পারছিলুনি কেন? কল্পনাথকেও নয়।

সে কথার জবাব দেয় না ডালিম। দিগন্তের গায়ে বিঁধিয়ে দেয় দৃষ্টি। একসময় দেখি, তার চোখদুটি ভরে গিয়েছে জলে।

একটু বাদে ভেজা ভেজা গলায় ডালিম জানায়, ভূত-টুত বাজে কথা, কেবল প্রাণ বাঁচাতেই এই ভেকটি ধরতে হয়েছে তাকে।

একটু বাদেই চোখের জল মুছে ফেলে ডালিম। আমার দিকে আয়ত চোখে তাকায়। অঘোর-জেঠু, জেঠিমা, বিন্দুদি—একে একে সবাইয়ের খোঁজ নেয় পৃথক পৃথক। এমন কি আগের বারে যখন বাপের বাড়িতে এসেছিল, তখনই যে লালি-গাইটা বাচ্চা বিয়োল, সে কেমন আছে, ক'সের দুধ দেয়, সে খোঁজও

নিল।

সেদিন সারাটা পথ ডালিম একটু একটু করে খোলসা করেছিল তার ওপর ধারাবাহিক নিপীড়নের কারণ ও ধরন।

মাখন নাকি কথায় কথায় ওকে জুতো দিয়ে পেটাত। যখন পেটাত, তখন তিলমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকত না তার। সেই আঘাত যে ডালিমের শরীরের কোন্ অংশে পড়ছে, সে ব্যাপারে তিলমাত্র মাথাব্যথা ছিল না মাখনের। ডালিমের শাশুড়ি ছিল মাখনের প্রধান উপদেষ্টা। মা-অন্ত প্রাণ ছিল মাখন। ডালিমের শাশুড়ি তার সুযোগটা পুরোপুরি নিত। মাখনকে সর্বদা সে-ই উসকাত। সারাক্ষণ ওকে উত্তেজিত করে তুলত হরেক প্রকারে। মাখনও মায়ের উস্কানি পাওয়ামাত্র একেবারে হিংস্র হয়ে উঠত। একদিন নাকি মারের চোটে প্রায় পুরোদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল ডালিম। ওর শ্বশুর ডাক্তার কোবরেজ আনিয়ে ডালিমকে সুস্থ করে তোলেন।

অবিরাম মার খেতে খেতে ডালিম সন্ধিপুরে পালিয়ে আসার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু ওর গতিবিধির ওপর ওর শাশুড়ির ছিল সর্বক্ষণের কড়া নজর। ডালিমের মনে হত, একটা অদৃশ্য শেকল বুঝি সারাক্ষণ জড়িয়ে রয়েছে ওর শরীরে। বাড়ির বাইরে পা দেবার হুকুম ছিল না। এমন কি উঠোনেও নামতে পেত না সে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটুক্ষণের জন্য আকাশটাকে দেখতে থাকলেও সন্দেহে কুটিল হয়ে যেত শাশুড়ির চোখ, কিনা, বাইরের দিকে তাকিয়ে কারোর সঙ্গে কোনও গোপন শলা সেরে নিচ্ছে না তো বউ!

ডালিমের শাশুড়ি মাখনের বুকের মধ্যেও ভরে দিতে পেরেছিল সেই কুটিল সন্দেহটা, কিনা, মেয়েটার সদাই যা উড়ু উড়ু মন, কার সাথে কখন যে সে সম্পর্ক স্থাপন করে বসে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এই জাতের মেয়েদের স্বভাবটাই এমন। একজাতের হ্যাংলা গরুর মতো। সবুজ ঘাসের মাঠটিতে চরতে চরতে তার সারাক্ষণই দৃষ্টি চলে যায় সামনের দিকে, যেখানে দূরত্বের কারণে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যাওয়ায় তার সদাই মনে হয়, সামনের দিকেই ঘাসের ঠাসবুনুনিটা বেশি। ফলে, অধিকতর সবুজের আকর্ষণে সে সামনের দিকেই হেঁটে চলে ক্রমাগত। পায়ে পায়ে ফুরিয়ে ফেলে গোটা মাঠটি, তাও তার পেটের একটি কোলও ভরে না।

মায়ের এবংবিধ উপমা সম্বলিত চেতাবনির শরীরে মাখন একটি ভিন্নতর মাত্রা যোগ করে এই কারণে যে, ডালিমের ক্ষেত্রে তো বাস্তবিক পায়ের তলায় কোনও সবুজ ঘাসই নেই। জায়গাটা তো খাঁ-খাঁ মরুভূমির তুল্য। কাজেই, মায়ের সাবধানবাণীটাকে আরও ঢের অমোঘ বলে মনে হয় তার। ক্রমশ তার মনে এমন বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ডালিম সামান্যতম সুযোগেই একটি সবুজ ঘাসওয়ালা মাঠ জুটিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে রয়েছে। সেই কারণে সে ডালিমের প্রতি আরও নির্মম, আরও ক্ষমাহীন হয়ে উঠত। ফলত, মাখনের শতদৃষ্টির বেড়াজালে বাড়ির অন্দরমহলে ডালিম পুরোপুরি নজরবন্দী হয়ে বেঁচে ছিল পাক্কা একটি বছর।

ডালিম আমাকে ঠারেঠোরে জানায়, ওর বর নাকি সত্যি সত্যিই সহবাসে পুরোপুরি অক্ষম। যে ক'মাস ডালিম শ্বশুরবাড়িতে ছিল, একদিনের জন্যও ওদের সহবাস হয়নি। যৌন কামনাগুলি অতৃপ্ত থাকার সুবাদে ডালিম মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চাইত। আর, মাখন নিজের অক্ষমতাজনিত যাবতীয় লজ্জা, গ্লানি ডালিমের ওপর উৎপীড়ন করেই উশুল করত। ডালিমের হাঁটাচলা, কথা বলা, মেশামেশি, সবকিছুর ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল মাখনের।

অঘোর জেঠু তো বিয়ের পর একবারের তরেও যাননি মেয়েটাকে দেখতে। হীরালালদা যখন যেত-টেত, কড়া পাহারাদারির মধ্যে থাকতে হত ডালিমকে। ফলে, সন্ধিপুরের মানুষ কোনোকালেই জানতে পারেনি ডালিমের প্রকৃত অবস্থা। সে যাতে মাখনের কাছ থেকে তার প্রাপ্য আচরণ চাইবার কথা ভুলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে তাকে সারাক্ষণ প্রচণ্ড মানসিক চাপে রাখা হত। কাজেই, ডালিম নিজের জীবন ধারণ ও নিরাপত্তা নিয়ে এতটাই শঙ্কিত থাকত সারাক্ষণ, মাখনের কাছ থেকে স্বামীসুলভ কোনও দাম্পত্য আচরণ চাইবার কথাটা ভুলেই যাচ্ছিল দিনদিন।

তারপর তো একদিন, বৈশাখের সেই মধ্য দুপুরে বাড়ির সবাই যখন দিবানিদ্রায় অচেতন, ডালিম ফাঁক পেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। কোনদিকে গেলে সে বেলদাবাজারে পৌঁছতে পারবে সেটা একেবারেই জানা ছিল না তার। ফলে, এলোমেলো ছুটতে ছুটতে সে পৌঁছে যায় আসন্দা গাঁয়ের ওই শ্যাওড়া গাছের কাছে, এবং ওখানেই মাখনদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

ডালিম বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ধরা পড়বার পর আমি জীবনের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিছলাম। আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে, আমাকে ঘরে ফিরিয়া লিয়া গিয়া এক্কেরে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফেলবে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। নিমেষের মধ্যে ভগবান বুদ্ধিটা জোগালেন। আমি এক্কেরে পাগলের পারা ব্যাভার করতে লাগলাম। আর, তাইতেই প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

ডালিমকে ভূতে ধরেছে, এমনটা যখন ষোলআনা প্রতিপন্ন হয়ে গেল, তখন ডালিমের ওপর সর্বক্ষণের অত্যাচারটাও ধীরে ধীরে কমে এল।

ডালিমকে ভূতে ধরেছে, সে পাগলের পারা আচরণ করছে, এটা জেনে সম্ভবত মনে মনে খুশিই হয়েছিল মাখন। এক ধরনের স্বস্তি লুকিয়ে ছিল সেই খুশিতে। সম্ভবত তার মনে এমন ধারণাই হয়েছিল যে, পাগল বউ আর তার সামনে রোজ রোজ সহবাসের দাবি তুলবে না। ওই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করলে, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়' তত্ত্ব অনুসারে ডালিমের প্রতিটি কথা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। বাস্তবিক, ডালিম পাগল সাজায় মাখন যেন বেঁচে গিয়েছিল। সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছিল, এমন একটা পাগলের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে ভয় করে তার। সেই অজুহাতে সে অবলীলায় অন্য ঘরে শুতে শুরু করেছিল।

মাখন মনে মনে স্বস্তি পেয়েছিল আরও একটি কারণে। ডালিমের শরীরে তখনও অবধি যা রূপ, যে কোনও পুরুষই তাকে মনে মনে কামনা করতে পারত। আর, ডালিম যেহেতু এক চির-উপোসি রমণী, ওই জাতের যেকোনও আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়াটা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু ভূতে ধরা একটি পাগল মেয়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইবে না কেউ, এমনই এক নিশ্চিন্ততায় মাখনের বুঝি ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল।

এরপর, ওই বিকেলে, সারা পথ ধরে, আমি কিস্তিতে কিস্তিতে জেরা করে জেনে নিই তার শ্বশুরবাড়িব যাবতীয় খুঁটিনাটি কথা।

যতই শুনি অগাধ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যাই।



কল্পনাথ ধীরে ধীরে আমাদের সবাইয়ের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। কলেজে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল সে। গাঁয়েও আসত কম। আমি বাড়ি গেলেই বিন্দুদি একেবারে হামলে পড়ে আমার কাছে জানতে চাইত কল্পনাথের খবর। কিন্তু আমি নিজেই যা জানিনে, তা কেমন করেই বা জানাব বিন্দুদিকে!

তখনও অবধি কলেজ থেকে যখন বাড়ি আসত কল্পনাথ, শুনেছি, ওর সারাটা সময় কেটে যেত আদিবাসীদের পাড়ায়। সেটা ছিল কল্পনাথের পরিবারের একেবারেই অপছন্দ। কিন্তু কল্পনাথকে নিরস্ত করাটা ওর পরিবারের কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। একমাত্র বাণীকাকারই ওর ওপর ছিল সামান্য নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তিনি যেহেতু খুবই মুক্তমনের মানুষ ছিলেন, কল্পনাথের আদিবাসীপাড়ায় যাবার বিরুদ্ধে অঘোর জেঠুর আপত্তিকে তিনি এক ধরনের রক্ষণশীলতা বলেই ভাবতেন। কল্পনাথকে তাই ঐবিষয়ে কিছুই বলেননি তিনি।

তখন আমি কোলকাতায় ল' পড়ছি। আর, কল্পনাথ বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে এম-এস-সি পড়ছে, একদিন শিখাবউদি আমাকে দিল সেই সর্বনাশা খবরটা।

বলল, কল্পনাথের খবর শুনেছিস?

—কী খবর?

শিখা বৌদি গলায় গাঢ় আক্ষেপ ফুটিয়ে বলে, কল্পনাথ নকশাল হয়েছে।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি শিখাবৌদির দিকে। ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারিনে। নকশাল হওয়া তো দূরের কথা, কল্পনাথ যে কখনো কম্যুনিস্ট হতে পারে, ভাবিনি কোনওদিন। অন্তত ছেলেবেলায় তার আচরণের মধ্যে তেমন কিছু প্রকাশ পায়নি। চিরটাকালই মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেই ভালোবাসত সে। মানুষের সংস্পর্শ তার একেবারেই অসহ্য ছিল। মানুষের চেয়ে গাছগাছড়া, পশুপ্রাণীর সঙ্গেই তার ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক। বাণীকাকা তাকে আশৈশব মানুষের চেয়ে গাছগাছাল, পশুপ্রাণীকেই ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।

তবে একথাও ঠিক যে, পৃথিবীর প্রতিটি ইতর প্রাণীর পাশাপাশি মানুষের প্রতিও কখনো কখনো তাকে মমতাপ্রবণ হতে দেখেছি আমি। মানুষের জন্যও কখনও কখনও তার প্রাণ কাঁদত বলে মনে হয়েছে আমার।

উঁচু ক্লাসে পড়বার জন্য ও যখন বেলদার হাইস্কুলে গেল, লক্ষ করেছি, হোস্টেলের সব ছাত্রের থেকে সুলেখা কালির ছোট চৌকোনো শিশিগুলো সংগ্রহ করে কত মমতায় নিয়ে আসত বাড়িতে। তখন আমাদের গাঁয়ের লাগোয়া আদিবাসী-পাড়ার মানুষগুলো লম্ফের অভাবে আলো জ্বালাতে পারত না। কল্পনাথ ওই বোতলগুলো ছিপিশুদ্ধু বিলি করত ওদের মধ্যে। বোতলগুলো দিয়ে ওরা চমৎকার কুপি-লম্ফ বানিয়ে নিত। গরিব মানুষের অন্ধকার বসতিগুলোতে সেই ছেলেবেলাতেই আলো জ্বালাতে চেয়েছিল কল্পনাথ। তাছাড়া, আমাদের গাঁয়ের বটতলায় শুয়ে শুয়ে ওই ভিখিরিটা যখন মারা গেল, তখন বাণীকাকার সঙ্গে তো ও-ই তর্ক করেছিল সবচেয়ে বেশি।

ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ে গেল স্কুলজীবনের আরও দু'একটি ঘটনার কথা।

আমরা ফাইভ থেকে এইট অবধি মেট্যাল জুনিয়র হাইস্কুলে পড়েছিলাম। একটা অজ গাঁয়ের একপ্রান্তে ছিল স্কুলটা। আমরা থাকতাম হোস্টেলে। রামপ্রসাদ শীট নামে একজন পড়ত আমাদের সঙ্গে। জাতে ধোপা ছিল সে। উঁচু জাতের ছেলেরা তাকে সামান্য গা বাঁচিয়ে চলত। রামপ্রসাদও নিজেকে নিয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত থাকত সর্বদা। কল্পনাথ কিন্তু ওর সঙ্গে সাবলীলভাবে মেলামেশা করত। বরং বলা যায়, ইচ্ছে করেই কিছুটা গা-ঘসাঘসি করত ওর সঙ্গে।

জলখাবার হিসেবে দু'বেলা মুড়িই খেতাম আমরা। মুড়ি আসত যে-যার বাড়ি থেকে। উঁচু জাতের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মুড়ি চালাচালি করত হরবখত। কিন্তু রামপ্রসাদের মুড়ি তারা কিছুতেই খেত না। কল্পনাথ কিন্তু অবলীলায় খেত রামপ্রসাদের বাড়ি থেকে আসা মুড়ি।

রামপ্রসাদ ছিল অঙ্কে নিতান্তই কাঁচা, আর কল্পনাথ অঙ্কে একেবারে ওস্তাদ ছিল। একই ক্লাসে পড়লেও সে ছিল রামপ্রসাদের অঙ্কের টিউটর। ওর জন্যই রামপ্রসাদ ফি-বছর অঙ্কতে টেনেটুনে পাশ করে যেত।

আমাদের হেড-স্যার ছিলেন সেকালের মানুষ। জাত-ধর্ম মানতেন খুবই। কল্পনাথের এই নাস্তিকতা দেখে তিনি যারপরনাই ব্যথিত ও রুষ্ট হতেন। তিনি কল্পনাথের বাবার রক্ষণশীলতাকে কদর করতেন খুবই। সেই বাপের ছেলে হয়ে কল্পনাথ যে এমন ম্লেচ্ছসুলভ আচরণ করে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। কল্পনাথের বাড়ি থেকে নারকোল গিয়েছিল। স্কুলের ছুটির পর রামপ্রসাদের সঙ্গে এক থালায় নারকোল দিয়ে মুড়ি খেতে গিয়ে হেড-স্যারের কাছে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল সে। সেদিন খুব মার খেয়েছিল কল্পনাথ। কিন্তু সেজন্য তার চোখে মুখে তিলমাত্র অনুতাপ দেখিনি আমি।

কিছুদিন বাদে স্কুলে এল এক মুসলমান ছেলে। কাঁথির দিকে বাড়ি ওদের। তহিরুদ্দিন নাম। তার দাদা গফুরুদ্দিন শা ওই এলাকায় আনাগোনা করত মূলত শীতের মরসুমে। এলাকার খেজুরগাছগুলিকে ইজারা নিয়ে পুরো মরসুম ধরে রস বেচত সে। মরসুম ফুরোলে আবার নিজের মুলুকে ফিরে যেত।

তখন আমাদের স্কুলে ছাত্রের নিদারুণ অভাব। চারপাশ থেকে ছাত্র সংগ্রহ করছেন স্কুল কমিটির

লোকেরা। বিনে মাইনে, হোস্টেল-ফ্রি ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে চারপাশের স্কুলগুলোর থেকে ভাল-ভাল ছাত্র ভাঙিয়ে আনছেন ওঁরা।

দেখতে দেখতে গফুরদা একদিন হেড-স্যারের কাছে ছোট ভাইয়ের জন্য পেশ করল আর্জি। সেই সুবাদেই একদিন তহিরুদ্দিন শা আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল।

আমরা ওকে তহির বলে ডাকতাম। লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছিল তহির। আচার-ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মার্জিত। কিন্তু তবুও, তার ধর্মই তাকে বারোআনা মেরে রেখেছিল।

স্কুলের হোস্টেলে ঠাঁই হয়নি তহীরের। আমাদের ক্লাসরুমেই থাকত তার বইপত্তর, বিছানাদি। ওখানেই রাতের বেলায় ঘুমোত সে। হোস্টেলে খাবার ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে বারান্দার এক কোণে একলাটি বসে খেত। খাওয়ার পর এঁটো জায়গাটাকে গোবর দিয়ে নিকিয়ে সাফ করতে হত তাকে। এঁটো থালাও ধুতে হত হোস্টেলের সবাইয়ের থালাবাসন ধোওয়া-ধোওয়ির পর।

স্কুলের প্রায় সবাই তাকে নিতান্তই খাটো নজরে দেখত। কেবল কল্পনাথই তার সঙ্গে গা ঘসাঘসি করে মিশত। এমন কি ওর সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া অবধি করত সে।

একবার এক কাণ্ড ঘটল।

গরমের আর পুজোর ছুটির আগে হোস্টেলের অবস্থাপন্ন ছাত্ররা তাদের ভালো দু'এক সেট জামা-কাপড় রামপ্রসাদকে দিয়ে কাচিয়ে ইস্ত্রী করিয়ে ফিরিয়ে আনত। সেই বাবদ রামপ্রসাদ যা পেত, ঐদিয়ে তার হাতখরচটা চলে যেত।

একবার সবাইয়ের দেখাদেখি তহীরও একটা হাফপ্যান্ট আর একটা সার্ট দিতে চাইল রামপ্রসাদকে। রামপ্রসাদ তো রেগে কাঁই, কেন কি, হিন্দু হয়ে তাকে মুসলমানের কাপড় কাচতে বলা হয়েছে।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র গম্ভীর হয়ে গেল কল্পনাথ। এবং সেই সন্ধেয় যখন রোজকার মতো অঙ্কটা দেখিয়ে নেবার জন্য ওর কাছে গেল রামপ্রসাদ, সরাসরি ওকে অঙ্ক কষে দিতে অস্বীকার করল কল্পনাথ। রামপ্রসাদের মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়বার জোগাড়, কেন কি, কল্পনাথ অঙ্কগুলো কষে না দিলে রোজ অঙ্কের ক্লাসে ওর পিঠে বিভূতি স্যারের বেত ভাঙবে। ছলোছলো চোখে একেবারে সাধ্যসাধনা জুড়ে দিল রামপ্রসাদ। শেষ অবধি কল্পনাথ জানাল যে, সে রামপ্রসাদকে অঙ্ক কষিয়ে দিতে পারে একটাই শর্তে। সেটা হল, সবাইয়ের মতো তহীরের জামাকাপড়ও নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইস্ত্রী করে দিতে হবে ওকে। রামপ্রসাদের তখন অকূল পাথারে ডুবুডুবু অবস্থা। যেকোনও খড়কুটো পেলেই ধরে ফেলে। বাধ্য হয়ে কল্পনাথের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল সে।

তবুও কল্পনাথ, যে কখনও কম্যুনিস্ট হতে পারে, সেটা ভাবতে পারিনি এই কারণে যে, ওর ওপর বাণীকাকার ছিল অপরিসীম প্রভাব। আর, বাণীকাকা ছিলেন মার্ক্সবাদের ঘোর বিরোধী। মার্ক্সবাদকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন তিনি। কারণ, মানুষকেই মনেমনে ঘৃণা করতেন বাণীকাকা। মাঝেমাঝেই সেটা প্রকাশ হয়ে যেত তাঁর কথায়। তিনি একটা আশ্চর্য কথা বলতেন। সব মানুষের মধ্যেই নাকি একটা রাজা এবং একটা প্রজা বাস করে। একটা শোষক এবং একটা শোষিত। পরিস্থিতি অনুসারে কখনো রাজাটা বেরিয়ে পড়ে, কখনো প্রজাটা। কখনো শোষকটা, কখনো শোষিতটা। বলতেন, আমাকে শোষণ করছে আমার ওপরওয়ালা, আবার আমি শোষণ করছি আমার নিচু তলাকে। সারা দুনিয়া খুঁজলেও এর কোনও ব্যতিক্রম্ নেই। এমন কি ওই বটতলায় শুয়ে শুয়ে মরে যাওয়া ভিখিরিটাও নাকি তার ব্যতিক্রম নয়। বাণীকাকা নাকি ভেবে ভেবে বিস্মিত হন, ঠিক কার তরে সাম্যবাদ আনতে চেয়েছিলেন মার্কস সাহেব!

বাণীকাকার একনম্বর ভাবশিষ্য হয়েও কল্পনাথ যে কখনো কম্যুনিস্ট হবে, এতে সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন বোধ করি বাণীকাকা স্বয়ং। কল্পনাথের অধঃপতন দেখে তিনিই বোধ করি সবচেয়ে হতাশ হয়েছিলেন। তখন লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত জীবনে চলছে ঘোর দুঃসময়। আমি তখন আমার নিজস্ব লড়াইটাই লড়ছি। কাঁকড়া বিছেটার কামড় থেকে নিজেকে এবং মাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি।

কল্পনাথের খবরটা আমাকে চমকে দিলেও একেবারে বিস্ময় থ' হয়ে যাইনি। কারণ, সেই ছেলেবেলা থেকে কল্পনাথকে দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, ওর ভাবনাচিন্তা, কাজকর্মের তল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেকোনও মুহূর্তে যা-কিছু করে ফেলাটা তার পক্ষে খুবই সম্ভব।

কল্পনাথকে নিয়ে গুজবটা যখন ডালপালা ছড়াচ্ছে, ঠিক তখনই একদিন কোলকাতা থেকে বাড়ি এল সে।

অঘোর জেঠু, বিন্দুদি, সবাই একেবারে হামলে পড়ে ওর খোঁজ খবর নিতে থাকে। কিন্তু কল্পনাথ একেবারে মৌনীবাবার মতো মুখে কুলুপ এঁটে থাকে।

বাধ্য হয়ে বাণীকাকাকেই আসরে নামতে হয়। যেহেতু তিনি ছাড়া পরিবারের আর কারোরই কল্পনাথের ওপর সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কাজেই, কল্পনাথকে 'সুপথে' ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব বাণীকাকাকেই নিতে হয়েছিল। এবং সেই সুবাদে বাণীকাকার সঙ্গে কল্পনাথের যে কূটতর্ক বেধেছিল, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যাক্রমে আমিও উপস্থিত ছিলাম ওই আসরে।

বাণীকাকা একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন কল্পনাথকে, সত্যি করে বল্ তো কল্প, তুই আচমকা ওপথে গেলি কেন?

—আচমকা নয়।

—কিন্তু কেন গেলি?

কল্পনাথ নিরুত্তর বসে থাকে।

—তুই কি মনে করিস, ওটা সঠিক পথ?

—অবশ্যই।

—আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবি?

—নিশ্চয়ই। অবশ্য যদি তুমি বুঝতে প্রস্তুত থাকো।

—কেন প্রস্তুত থাকবো না? তুই বল।

—না, তুমি আগে প্রস্তুত হও।

—কেমন করিয়া প্রস্তুত হইতে হবে, শুনি? বাণীকাকাকে সামান্য উত্তেজিত লাগছিল,—তোর কথাই মানিয়া লিবো, এমন চুক্তিপত্রে আগাম সই করিয়া দিতে হবে?

—তার আগে তুমিই বল, মানুষের মধ্যে যাবতীয় বৈষম্য ঘোচানো, তুমি একে বেঠিক পথ বলছো কোন্ যুক্তিতে?

—যুক্তি আমার অনেক রয়েছে, তবে প্রথম যুক্তি হল, এটা পুরোপুরি মানুষের অস্তিত্বের প্রধান শর্তটির বিরোধিতা করা।

—কী রকম?

—দ্যাখ্, দুর্বলকে গ্রাস করা, এ কেবল মানুষই নয়, পুরো জীব ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্বের প্রধান শর্ত। প্রত্যেক প্রাণীরই খাদ্যাভ্যাস আর প্রবৃত্তিগুলোকে তৈরি করা হয়েছে সেইভাবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে শোষণ না করলে কোনও প্রাণীই বাঁচতে পারবে না। মানুষও নয়। তুমি কি মনে কর না যে, জীব ও উদ্ভিদজগৎকে প্রয়োজন মতো এক্সপ্রয়েট করতে করতেই মানুষ টিকিয়ে রেখেছে তার অস্তিত্ব?

—সমগ্র জীবন কিংবা উদ্ভিদজগতের কথা তো হচ্ছে না, আমরা মানুষে মানুষে শোষণ বন্ধ করবার জন্য লড়ছি।

—সেটা একটা সোনার পাথরবাটি নয় কি? যে প্রবৃত্তি থেকে মানুষ শোষণের উৎসাহ পেয়ে থাকে, সেই প্রবৃত্তিটাকে নির্মূল না করে কি শোষণ বন্ধ করা সম্ভব?

—আমরা ক্রম:গত র‍্যাশনেলাইজেশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যেকার সেই প্রবৃত্তিটাকে নির্মূল করবো।

—শোষণের প্রবৃত্তিটা পুরোপুরি নির্মূল হয়্যালে তো মানুষ জাতটা একদিনও বাঁচবেনি।

—কেন?

—বা-রে, তাহলে তো গৃহপালিত পশুদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রাণী-

পশুদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও ব্যবহার করা চলে না। পশুপ্রাণীর মাংস, দুধ, এসব খাওয়াও বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহলে আমরা বাঁচবো কী করিয়া?

—প্রয়োজনে মানুষ নিরামিষ খাবে।

—নিরামিষ মানে তো শাক-সবজি, ফল, শস্য। তাদেরও তো শুনি প্রাণ রয়েছে। তুই কী বলিস? নেই?

—সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে। আগে তো মানুষে মানুষে বৈষম্যটা দূর হোক।

—কী করিয়া হবে? শোষণ করবার প্রবণতাটাই যদি মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, মানুষ তো তবে সুযোগ পাইলে শোষণ করবেই। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেখলেই শোষণ করবে। তা সে উদ্ভিদই হোক, প্রাণীই হোক, কিংবা দুর্বল স্তরের মানুষই হোক। তাহলে, ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? শোষণের প্রবৃত্তিটা যতদিন মানুষের মধ্যে থাকবে, সুযোগ পেলেই সে শোষণ করবেই। রাষ্ট্র গা-জোয়ারি করিয়া, আইন করিয়া সেই শোষণকে দু'চার দিন বন্ধ করিয়া রাখতে পারে বটে, কিন্তু প্রবৃত্তিটা যদি মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়, তবে সামান্যতম সুযোগ পাওয়া মাত্র মানুষ শোষণ শুরু করবে। আর, মানুষের মন থেকে কোনও উপায়ে শোষণপ্রবৃত্তিটাকে পুরোপুরি নির্মূল করিয়া দিলে, সে স্রেফ খাদ্য বিহনেই মারা যাবে। অর্থাৎ অন্যকে শোষণ করাটা তার বাঁচিয়া থাকবার প্রধান শর্ত। সেটাই তার নিয়তি। আর, তোরা আজ সেটাকেই নির্মূল করতে চাইছিস!

—তোমার দ্বিতীয় যুক্তিটা কী?

—দ্বিতীয় যুক্তি হইল, একটা প্রতিযোগিতার বাতাবরণে মানুষসহ সমস্ত জীব এবং উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি। প্রতিযোগিতায় জিতলেই টিকিয়া থাকা, হারলেই নির্মূল হয়ে যাওয়া। তুই কোন্ হরিদাস পাল, মানুষের জীবন থেকে সেই প্রতিযোগিতাটাকেই কাড়িয়া লিতে চাস? শোন্, নিরন্তর প্রতিযোগিতা না থাকলে মানুষ নিষ্ক্রিয়, জড় হয়্যাবে। তোরা কি মানুষকে জড় বানাতে চাইছিস?

—তুমি কি তবে বলতে চাও, একজনের অগাধ থাকবে, বহুজনের কিছুই থাকবে না, এমন বাবস্থাই মানুষের পক্ষে আদর্শ? একজন বেঁচে থাকবে, শতজন তলিয়ে যাবে, এটাই কি কাম্য?

—এটা স্থির করবার দায়িত্ব মানুষ কবে থেকে পাইল? সে ক্ষমতাই বা তার কোথায়? সে যে নিজেই টিকিয়া রইছে এই পৃথিবীতে, এখনো অবধি জীব-জগৎ থেকে হারিয়ে যায়নি, এ কি তার নিজের ইচ্ছায়? না। প্রকৃতির ওই আইনেই সে টিকিয়া আছে। সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট। যে আইনে তুমি নিজেই বাঁচিয়া আছ, সেই আইনটাকেই বদলিয়া দিতে চাইছো হে মুর্খ কালিদাস? মনে কোর না, পৃথিবীর রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়া, কিছু শোষণ ও প্রতিযোগিতা-নিরোধক আইন চালু করিয়া তুমি প্রকৃতির আইনকে বদলিয়া দিবে। মনে রেখো, মানুষের আইনের চেয়ে প্রকৃতির আইন অনেক বেশি কঠোর।

—হতে পারে প্রকৃতির আইন অনেক শক্তিশালী, কিন্তু মানুষকে তো চুপচাপ বসে না থেকে প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতির আইনকে নিজেদের অনুকূলে আনতে হবে।

—প্রকৃতিকে জয় করবে? প্রকৃতিকে জয় করার মানে বুঝিস? প্রকৃতির আইনকে জয় করা মানে, সে আইনকে অস্বীকার করা নয়। প্রকৃতির আইনকে পুরোপুরি মান্য করিয়া নিজের অনুকূলে ব্যবহার করা। যেমন ধর, পাঁচতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলে মানুষ মরবেই। কারণ, প্রকৃতির আইনেই পৃথিবী তোমাকে ভীমবেগে টানবে। সে আইনটিকে তোমাকে জানতে হবে, মানতে হবে। তাকে অস্বীকার করতে যাওয়া মুর্খতা। আইনটাকে জানবার পর, মানিয়া লিবার পর, তুমি প্যারাসুট আবিষ্কার কর, ওটা পরিয়া লিয়া ঝাঁপ দাও। কিন্তু আমি প্রকৃতির আইন মানি না বলিয়া কেউ যদি পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেয়, সে বাঁচবে?

—তুমি একেবারে পাক্কা রিয়্যাকশনারির মতো কথা বলতিছো।

বাণীকাকা শুনে মুচকি হেসেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, রিয়্যাকশনারি বল্ আর যাই বল্, তুই কিন্তু আমার ঐসব কথার তেমন কোনও জুতসই জবাব দিতে পারলিনি।

সেই যে বাপের বাড়িতে ফিরে এল ডালিম, আর ফিরে যায়নি।

সেদিন পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি ফেরার বেলায়, স্রেফ মেয়েসুলভ লজ্জাবশত ডালিম আমাকে যেসব কথা বলে উঠতে পারেনি, পরবর্তীকালে বিন্দুদির কাছে তা বিতাং করে বলেছিল।

বিন্দুদিই নাকি প্রথম দেখেছিল ডালিমের সারা গায়ে হরেক কিসিমের ক্ষত। তাকে নিয়মিত নির্মমভাবে মারা হত, গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকাও দিত মাখন। কেবল গায়েই নয়, যৌনাঙ্গেও। বাপের বাড়িতে পালিয়ে এসে সে যেন বাঁচল।

আসল ক্ষতটা সে অনাবৃত করে দেখিয়েছিল আরও পরে। আমাদের সামনে সে তার ওই মারাত্মক ক্ষতটাকে দেখায়নি। কিছুদিন ধরে জেরা করে বিন্দুদি আর শিখা বউদিই আবিষ্কার করল তা।

মাখনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অনেক পরে শিখাবউদি আমাকে একটু একটু করে যা-যতটুকু বলেছিল, তাতে করে আমার মনে হয়েছিল, নিজের যৌন-ব্যর্থতার জন্য এক ধরনের গ্লানি ও হাহাকার ছিল তার মনের গভীরে। তার সেই নিরুপায় ব্যর্থতা তার মধ্যে এক ধরনের স্যাডিজমের জন্ম দিয়েছিল। ডালিমের ওপর বর্বর নিপীড়ন করে সে তার যৌনজ্বালা মেটাতে চাইত।

দীর্ঘদিন বল্গাহীন নিপীড়ন সইতে না পেরে ডালিম এর থেকে অব্যাহতি চাইছিল প্রাণপণে। ওই কারণেই, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পাগল সেজেছিল সে।

ডালিম স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসায় সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হয়েছিলেন অঘোর-জেঠু। শুধু রুষ্টই নয়, তিনি যেন তাঁর সংসারে আরও একবার অশনি সংকেত পাচ্ছিলেন। বিন্দুদির সুবাদে তিনি ইতিমধ্যেই ঘরপোড়া গরু। শুদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ, সাত্ত্বিক মানুষটির জীয়ন্তে নরকবাস চলছিল তখন। কেন কি, তখন প্রায় ফি-রাতে বিন্দুদির ঘরে আনাগোনা জুড়েছে বঙ্কিম ভুঁইয়া। কেবল অঘোর জেঠু আর জেঠিমা ছাড়া কাকপক্ষীতেও মালুম পাচ্ছে না তা। কিন্তু এমন কাজে বাধা দেন, সে শক্তি ও সাহস অঘোর জেঠুর তখন ছিল না। বিন্দুদির অন্ধ জেদের কাছে তিনি বস্তুতপক্ষে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এছাড়া, যতটুকু শুনতে পাই, বিন্দুদির ওই নৈশ অভিসারে জেঠিমারও নাকি প্রচ্ছন্ন মদত ছিল শেষের দিকে। সম্ভবত, মেয়ের শারীরিক প্রয়োজনটির কথা একজন নারী হয়ে তিনি মর্মে মর্মে বুঝতেন, এবং শেষ অবধি অস্বীকার করতে পারেননি তা। অবসর সময়ে স্বামীকে হরেক প্রকারে বোঝাতেন তিনি, যার মর্মার্থ ছিল অতীব আধুনিক, অর্থাৎ, সমাজ, নীতি, আইন, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, এসবের চেয়েও ঢের গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনের প্রয়োজন। জীবনের প্রবল ও দুর্দমনীয় প্রয়োজনে সমাজ, আইন, নীতি, সবকিছু গৌন হয়ে যায়। বিন্দুর জীবনের ওই প্রবল প্রয়োজনটিকে জোর করে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তার অতৃপ্ত জীবাত্মা তোমাকে আমাকে নিরন্তর অভিশম্পাৎ করবে, কেন কি, বিন্দুর আজকের অবস্থার জন্য আমরাও আংশিকভাবে দায়ী। কারণ, আমরাই পিতা-মাতা হয়ে তাকে সুপাত্রস্থ করতে পারিনি। হ্যাঁ, এমন ক্ষেত্রে বাবা-মার অবিবেচনার মাশুল হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রেই দিতে থাকে অবোলা মেয়েটি, নিঃশব্দে, আজীবনকাল, দগ্ধে দগ্ধে, গুমরে গুমরে। সমাজে, সংসারে আকছার ঘটে চলে তেমনটা। কিন্তু বিন্দু যদি সেই মাশুল ষোলআনা দিতে না চায়, সে যদি নিজের শরীরকে এবং শরীরস্থ জীবাত্মাকে সারাজীবন উপোসি রেখে বাপ-মায়ের মান-মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজি না হয়, তবে তাকে তো পুরোপুরি দোষ দেওয়া চলে না। এটাই ছিল জেঠিমার সব কথার সার কথা।

কাজেই, ডালিমকে দেখতে দেখতে অঘোর জেঠুর খাওয়া-দাওয়া, রাতের ঘুম সবই চলে গেল। দিনের প্রায় সবটুকু সময় বাড়ির সামনের উঁচু বারান্দায় বসে থাকতেন তিনি পাথরের মতো। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কুষ্ঠিঠিকুজি তৈরি করা, কিংবা কুষ্ঠিবিচারের কাজ একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সারাদিন শুধু বসেই থাকতেন। মাঝে মাঝে তাঁর গলা থেকে 'হুশ' শব্দে বেরিয়ে আসত দীর্ঘশ্বাস। আশেপাশে যারা থাকত, তারা ওই আওয়াজে চমকে উঠত।

তাঁর যন্ত্রণার আরও একটি জায়গা ছিল। কল্পনাথ। সে নাকি তখন লেখাপড়া ছেড়ে জঙ্গী রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছে। তার সম্পর্কে অনেক হাড়কাঁপানো খবর রোজ ঢুকছে গাঁয়ে। সেসব খবর যথাসময়ে

অঘোর জেঠুর কানেও আসত। শুনতে শুনতে একেবারে পাথর হয়ে যেতেন অঘোর জেঠু।

ঠিক কী জন্য বিন্দুদি শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে সারাজীবন বাপের বাড়িতে পড়ে রইল, সে বিষয়ে দু'তিন রকমের ব্যাখ্যা চালু রয়েছে গাঁয়ে।

এক পক্ষ বলে, বিন্দুদির বর ছিল একটি লম্পট। পেশায় সে ছিল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। একেবারে যাকে বলে গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তার। তবে রোগনির্ণয় আর চিকিৎসাটা নাকি ভালোই করত। সেই সুবাদে তার ডাক আসত আশেপাশের গ্রামগুলোর থেকেও। রোগী দেখবার প্রয়োজনে তাকে প্রায়ই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও করতে হত রোগীর বাড়িতে। কিন্তু বিয়ের দিনকয়েকের মধ্যেই বিন্দুদি কেমন করে যেন জেনে ফেলে, গ্রামে গ্রামে রোগী দেখতে যাওয়াটা যথার্থ, কিন্তু রাত্রিবাসের আসল কারণটা ভিন্ন। ডাক্তারির স্বার্থে আশেপাশের গ্রামগুলোর হরেক বাড়িতে আনাগোনার সুবাদে তার একাধিক রক্ষিতা জুটেছিল। তাদের সঙ্গে রাত কাটানোটা বিন্দুদির স্বামীর কাছে ছিল একেবারে অনিবার্য, কেন কি, একটিবার পরনারীর স্বাদ পেয়ে গেলে পুরুষ হল রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো, তখন তাকে নিরস্ত করা কঠিন। নিজের বউটি অপ্সরা হলেও নয়। বিন্দুদির স্বামী পেয়েছিল সেই অন্য রক্তের স্বাদ। ওই স্বাদ সে বিয়ের আগেই পেয়েছিল। কাজেই, বিয়ের পরও সে নিজেকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারেনি। এমন তথ্য বিন্দুদিকে কেউ দিয়েছিল, নাকি, বিন্দুদি নিজের থেকেই বুঝেছিল, তা আমার পক্ষে নির্ণয় করা মুশকিল। কিন্তু শিখাবৌদি বলে, দুনিয়ার তাবৎ স্ত্রীর কাছে একটি আরশি থাকে। তার তৃতীয় নয়নই হল সেই আরশি। পুরুষের মতিগতি দেখেই যেকোনো সংবেদনশীল রমণী তার তৃতীয় নয়ন দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পায় তার স্বামীর অন্তরমহলটিকে। তার চোখমুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সে নিমেষের মধ্যে নির্ভুলভাবে পড়ে নিতে পারে স্বামীদেবতাটির বুকের ভেতরকার লিখনগুলি। স্বামীর সবকিছু একেবারে স্ফটিকের মতো দৃশ্যমান হয় তার কাছে। দুনিয়ার সবাইয়ের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলেও নিজের স্ত্রীর চোখে ধুলো দেওয়া দুনিয়ার চতুরতম স্বামীটির পক্ষেও বুঝি অসম্ভব। বিন্দুদিও নাকি তার নিজস্ব আরশিটি দিয়ে প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছিল স্বামীটির অন্যত্র রাত্রিবাসের প্রকৃত কারণ।

শুধু বিন্দুদিই বা কেন, শিখা বউদিও বলেছিল, ওই একই কারণে দুনিয়ার মানুষ বুঝে ওঠার ঢের আগেই সে নিজেই তার নিজস্ব আরশি দিয়ে দেখে ফেলেছিল বল্লভদার ভাবগতিক। দুনিয়ার সব স্ত্রীই ওই তৃতীয় নয়ন নামক আজব আরশিটি দিয়ে তার জীবনের আসন্ন ঝড়ঝঞ্ঝার কথা আগাম জেনে যায়, যেমনটি নাকি জেনে গিয়েছিল শিখাবৌদিও। আমরা জেনেছিলাম অনেকদিন বাদে। সে প্রসঙ্গ পরে।

এ হল বিন্দুদির স্বামীর ঘর না করবার কারণ হিসেবে এক পক্ষের বক্তব্য। দ্বিতীয় পক্ষটির মতে, বিন্দুদি বিয়ের আগেই পচে গিয়েছিল। গ্রামের কারোর কারোর সঙ্গে তার আগে থেকেই ছিল অবৈধ সম্পর্ক। কেউ কেউ তার প্রণয়ীদের তালিকার মাথায় রাখে হিরণ্ময়ের শহুরে শ্যালক মৃদুলের নাম। ওর টানেই নাকি সন্ধিপুরে আনাগোনা করত মৃদুল। বাপের বাড়িতে ফিরে এসে পাকাপাকিভাবে থিতু হওয়ার পর তার আনাগোনা নাকি বেড়ে গিয়েছিল।

এইসব তথ্যের সত্যিমিথ্যে নির্ণয় করা আমার পক্ষে মুশকিল।

যেকোনো কারণেই হোক, বিন্দুদি সেই যে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল, আর যায়নি।

তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে, সবাই বুঝে গিয়েছিল, তার আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবার কোনো আশা নেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড, নিজের বিড়ম্বিত জীবনটা নিয়েও সে একটা স্বপ্ন রচনা করত মনে মনে। কিনা, কল্পনাথ একদিন বড় হবে। ফুটফুটে বউ আনবে ঘরে। তখন বাড়ির অলিখিত গার্জিয়ান হিসেবে সে-ই থাকবে ওদের মাথার ওপর। ভাইয়ের সংসারটাকে সে মাথায় করে রাখবে। কোনও আঁচ লাগতে দেবে না। অর্থাৎ একদিনের জন্য সংসার না করেও বিন্দুদির বুকের মধ্যে একটা সংসার থেকে গিয়েছিল আজীবনকাল।

বাপের বাড়িতে আসার পর ডালিমের মধ্যেকার ভূতটা অবশ্য ঘাড় থেকে নামল। ভালো খাবারদাবার, বিন্দুদির নিরন্তর সেবাযত্ন ও নিরাপত্তা পেয়ে তার শরীরের ক্ষয়টা রোখা গেল। কিন্তু তার

বদলে ওর মধ্যে দেখতে পেলাম অন্য এক ডালিমকে। ডাকাবুকো মেয়েটা কেমন যেন রাতারাতি চুপসে গিয়েছে। সারাক্ষণ কেমন জানি সিঁটিয়ে থাকত এক অচেনা ভয়ে। চারপাশে সবাইয়ের, সবকিছুর দিকে, বধ্যভূমিতে পশুর মতো, ভয়-ভয় চোখে তাকাত। তার আচার-আচরণে ঠিক পাগলামো নয়, তবে অন্য এক ধরনের অস্বাভাবিকতা এসে গিয়েছিল।

ওকে সন্ধিপুরে ফিরিয়ে এনে আমরা চলে গেলাম পড়াশোনার জায়গায়। মাসখানেক বাদে বাড়ি এসে আবার যখন গেলাম কল্পনাথদের বাড়িতে, ডালিম কিছুতেই আমার সামনে এল না।

তারপরও বহুদিন আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত ডালিম। আমাকে দেখলেই তার ভুরুতে ভাঁজ পড়ত। মুখের সবগুলি রেখা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠত। শিখাবউদি এবং বিন্দুদির মুখ থেকে ওর সম্পর্কে টুকরো টুকরো যা-সব শুনতাম, তার থেকে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, মেয়েটা মনের জায়গায় একেবারেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই অসুস্থতায় আমি কেন তার দু'চক্ষের বিষ হয়ে গেলাম, সেটা বুঝতে পারিনি কিছুতেই।

ধীরে ধীরে তার শরীর জুড়ে যৌবনের প্রবল ঢেউ উঠল। কিন্তু পোকায় কাটা ফুল যেমন পুরোপুরি ফুটতে পারে না, ডালিমের শরীরেও যৌবন এল তেমন করে। যেটুকু না ফুটলে নয়, ততটুকুই।

আমারই পরামর্শে অঘোর জেঠু ডালিমকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করালেন। মাখনরা সে মামলা, বলা চলে, প্রায় লড়লই না। ফলে, প্রায় এক বছরের মধ্যেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। ডালিমের সঙ্গে মাখনের ডিভোর্স হয়ে গেল।

তখন অবধি নিরঞ্জন আমাদের গ্রামের গ্রামসেবক হয়ে আসেনি।



নিরঞ্জন হল বাণীকাকার স্ত্রী নিভা কাকিমার দূর সম্পর্কের মাসির ছেলে। কিন্তু নিভা কাকিমার মা নাকি ছেলেবেলায় মারা যায়, ওই মাসিটি নাকি নিভা-কাকিমাকে মানুষ করেছে। কাজেই, দূর সম্পর্কের মাসি হলেও তিনি বলতে গেলে নিভা-কাকিমার মায়ের মতোই। সেই সুবাদে বাণীকাকাদের বাড়িতে ওদের আনাগোনা ছিলই। কিন্তু নিরঞ্জনকে আমি বড় একটা আসতে দেখিনি।

গ্রামসেবকের চাকরি করত নিরঞ্জন। যখন বদলি হয়ে এল সন্ধিপুরে, অনিবার্যভাবে তার ঠাঁই হল বাণীকাকার বাড়িতে। বাণীকাকাদের বৈঠকখানার লাগোয়া আরও একখানা ঘর ছিল। নিরঞ্জন ওই ঘরেই থাকতে লাগল।

প্রথম আলাপেই নিরঞ্জনকে খুবই ভালো লেগেছিল আমার। বেশ রূপবান মানুষ। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হলেও ওকে তরতাজা জোয়ানই লাগত। খুবই ভদ্র আচরণ। গলাটি বেশ মিষ্টি। বেশ নীতিনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ মানুষ। দু'দিনেই মিশে গেল গ্রামের প্রায় সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে। ফুটবলটা ভালোই খেলত, ভালো নাটক করত, ফলে ক্লাবের ছেলেরা ওকে লুফে নিল। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ফলে, ছোটকাকারা ওকে পছন্দ করতে লাগল। আবার পুজোআচ্চায় খুব মতি, ফলে গ্রামের রক্ষণশীল সম্প্রদায়টিও খুব খুশি হল। ততদিনে সরকারি কর্মচারিদের সম্পর্কে এক ধরনের বিরূপতা তৈরি হয়ে গিয়েছে সবাইয়ের মতো আমার মনেও। কিন্তু নিরঞ্জন বোধ করি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। খুবই সংস্কারমুক্ত যুবক ছিল সে। খুবই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অধিকারী ছিল। ফলে, আমার আর বাণীকাকার সঙ্গে খুব জমে গেল ওর। আমি অবশ্য ততদিনে বি-এ পাশ করে ল'ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। একেবারে ব্যক্তিগত কারণে গাঁয়ে আসা কমিয়ে দিয়েছি ততদিনে। নিজের বাড়িটা ততদিনে আমার কাছে কম-বেশি শত্রুপুরী। যেটুকু আসতাম, বাণীকাকা, ছোটকাকা আর শিখাবউদির টানে। আর, ইদানীং বাড়ি এলে বাণীকাকার পাশাপাশি নিরঞ্জনও আমাকে টানত।

নিরঞ্জন আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড়, আবার বাণীকাকার চেয়ে কুড়ি বছরটাকের ছোট, কিন্তু সে দুজনের সঙ্গেই সমান সাবলীলভাবে মিশতে পারত। বাণীকাকা তো সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার

খুবই প্রিয় মানুষ ছিলেন। সময় পেলেই আমি আর কল্পনাথ ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। নিরঞ্জন আসাতে বাণীকাকার বাড়িতে যাবার আকর্ষণ অনেকখানি বেড়ে গেল। নিরঞ্জনকে দেখলে কল্পনাথেরও হয়ত বা ভালোই লাগত, কিন্তু ততদিনে কল্পনাথ বাড়ি আসা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। সে কোলকাতাতেও নেই। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে এম-এস-সি পড়তে পড়তে সে একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে।

বাণীকাকার বাড়িতে থাকাকালীন নিরঞ্জন ওই পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল অল্পদিনেই। মানুষকে আপন করে নেবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা ছিল তার। ফলে, কেবল বাণীকাকার বাড়ির লোকজনই নয়, অঘোরজেঠু ও জেঠিমারও সে খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সংস্কৃতটা ভালোই জানত সে। কাব্যের ওপর একটা উপাধিও পেয়েছিল। সেই সুবাদে কখনও কখনও অঘোর জেঠুর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনাও হত তার। অঘোরজেঠু তখন হরেক প্রকারের শারীরিক ও মানসিক রোগব্যাধিতে একেবারে কোণঠাসা। বিন্দুদি তো ছিলই, তার শোকটা হয়ত বা একটু একটু করে মানিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু ডালিমের কারণে মানুষটার পাঁজর একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল।

নিরঞ্জন অঘোরজেঠুর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা এবং বাণীকাকার সঙ্গে মার্কস-গান্ধী নিয়ে আলোচনা সমান দক্ষতায় করতে পারত। অঘোরজেঠু খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে ওঁদের বাড়ির শালগ্রাম শিলাটিকে পুজো করে আসত, আবার ছুটির দিনে বাণীকাকার মার্কস-গান্ধীর ওপব যাবতীয় বইপত্তর ঝেড়েঝুড়ে, রোদ্দুরে দিয়ে পুনরায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। সে গ্রামের সিংহবাহিনীর পুজোর সময় ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটত, আবার ছোটকাকাদের বামপন্থী মিটিং-মিছিলের সময়ে পেছন থেকে নানাভাবে সহায়তা করে উত্তরে দিত প্রোগ্রামটা।

দেখতে দেখতে মানুষটা সন্ধিপুরের মানুষের চোখের মণি হয়ে গেল দুদিনেই। বাণীকাকা বললেন, একেবারে পারফেক্ট গ্রামসেবক। গ্রামসেবকের একটি জলজ্যান্ত মডেল।

প্রথমটা জানতাম না, পরে জানলাম, নিরঞ্জনই কথাপ্রসঙ্গে জানাল, সে বিবাহিত। দু' ছেলের বাপ। কাঁথির দিকে একান্নবর্তী পরিবার ওদের। বউ-বাচ্চা থাকে সেখানে। ফলে, মাসে দু'বার বাড়ি যেতে হয় ওকে। ও যে বিবাহিত, দু'ছেলের বাপ, ওকে দেখলে কিন্তু মালুম হত না তা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একজন তরতাজা যুবক বলেই মনে হত ওকে। সর্বক্ষণ সারা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াত। কিন্তু সেই দাপিয়ে বেড়ানোটা যে কোনওদিন ডালিমের জীবনটাকে উলটে-পালটে দেবে, এমনটা স্বপ্নেও ভাবিনি আমরা কেউই।

কিন্তু এখন বিন্দুদি গলায় জোর দিয়ে বলে, আমি জানতাম। সেই সেদিনই জানিয়া গেছলাম। বলেই এতদিন বাদে বিন্দুদি একটা গোয়েন্দা গল্প শোনায় আমাকে।

অঘোর জেঠু আর বাণীকাকাব বাড়ি ছিল পাশাপাশি। একই ভিটের দুটি অংশবিশেষ, মধ্যিখানে একটি মাঝারি সাইজের পুকুর। পুকুরের উত্তর আর দক্ষিণ পাড়ে দুটো শানবাঁধানো ঘাট ছিল। উত্তরের ঘাটটা বাণীকাকারা ব্যবহার করত, দক্ষিণেরটা অঘোব জেঠুরা। সেই পুকুরের পুব পাড়ে একটা স্বর্ণ চাঁপার গাছ ছিল। মরসুমে অজস্র ফুলে ভরে যেত গাছটা। গন্ধে ম-ম করত গাছের তলাটা। ডালিম ততদিনে পোকায় কাটা ফুলটি। তার গায়ের রঙ পুড়ে গিয়েছে। শরীরের যাবতীয় লাবণ্য শীতকালের পাতাঝরা গাছেদের মতো ঝরতে শুরু করেছে। তার ঢের আগেই ঝরে গিয়েছে মনের ভেতরকার যাবতীয় সুকুমার পাপড়িগুলি। তার সারা মুখে অজস্র ব্রণ। কপাল এবং দু'ভুরুর সঙ্গমস্থল অল্পেতেই আমসির মতো কুঁকড়ে যায়। মাথার চুল ঝরে যাচ্ছে দ্রুত। আর, কথাবার্তায় চাউনিতে এমন এক জাতের কর্কশতা এসেছে, যা দেখতে দেখতে, যারা ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, তাদের ওকে একেবারেই অচেনা লাগে। তার চেয়েও বড় কথা, তার বহিরঙ্গে যতটা পরিবর্তন ঘটেছে, অন্তরমহলে ঘটে গিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি। তার চোখের ভাষা একেবারেই বদলে গিয়েছে। সে চোখে এক ধরনের অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তার কথাবার্তায় সামান্য ভারসাম্যের অভাব ধরা পড়ছে ঘনিষ্ঠজনদের কাছে। সামান্য কারণে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে সে সারা পাড়া মাথায় তুলত, আবার কখনও বা এতটাই গুম মেরে থাকত, দেখলে ভয় করত বিন্দুদিরও। আর, ততদিনে সে করতে শুরু করেছে সেইসব কাজ, যা করলে

আমাদের সমাজে মেয়েদের নিন্দা হয়। প্রবল যৌন অতৃপ্তি তার মধ্যে নানাবিধ বিকৃতির জন্ম দিয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে অকারণে চটকায়। তার ঠোঁটের মধ্যে অনেকক্ষণ ঠোঁট চেপে রাখে। তার লিঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে সস্নেহে চুমু খায়।

দেখতে দেখতে বিন্দুদির কপালে ভাঁজ পড়ত

ঐসব দিনগুলিতে ডালিমকে ঘরে আটকে রাখা এক কঠিন ব্যাপার ছিল। সুযোগ পেলেই সে বেরিয়ে পড়ত গাঁয়ের রাস্তায়। ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলোতে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকত। সেই সুবাদে শুধু ক্ষীরকুলতলাতেই নয়, ডালিমকে দেখা যেতে লাগল যমুনা নদীর পাড়ে, রানীহাঁস দিঘির পাড়ে, অর্থাৎ কিনা, ছেলেবেলায় যে জায়গাগুলো আমাদের উভয়েরই ভারি প্রিয় ছিল, সেই জায়গাগুলোতেই সে গিয়ে বসে থাকত দিনের অধিকাংশ সময়।

একদিন বিন্দুদি আমাকে একান্তে জানায় সেসব কথা। তখনই আমি ওকে কোনও মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য বারবার বলেছিলাম বিন্দুদিকে। সেসব দিনে মনোচিকিৎসকদের সাধারণ মানুষ পাগলের ডাক্তার বলত। এবং পুরোপুরি পাগল নয় এমন মানুষকে মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার রেওয়াজ ছিল না সেসময়ে। কাজেই, ডালিম ওই অবস্থাতেই থেকে গেল।

বাড়ির সবাই ওকে যথাসাধ্য চোখে চোখে রাখত। কেন কি, ওকে নিয়ে একটা আশঙ্কা বাসা বেঁধেছিল সবাইয়ের মনে। যে মেয়ে স্রেফ প্রাণ বাঁচাবার জন্য একেবারে পাগলের ভেক ধরে থাকতে পারে এতগুলো দিন, কেউই সেই অভিনয় তিলমাত্র ধরতে পারে না, সে মেয়ের বুকের ভেতরে যে অন্তরালে কোন্ খেলা চলছে, এই আশঙ্কাই জমে থাকত সবাইয়ের মনে। বিশেষ করে বিন্দুদি তাকে প্রায় সারাক্ষণই চোখে চোখে আগলে রাখত।

সেই সুবাদে একদিন বিন্দুদিই আবিষ্কার করল ব্যাপারটা।

রোজ ভোরটি হলেই ডালিম নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল চাঁপা গাছটার তলায়। তখন গাছটা একেবারে ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে থাকত। ডালিম কিন্তু ফুল কুড়োতই না। সে প্রায় সারা সকালটা গাছের তলায় বসে বসেই কাটিয়ে দিত।

রোজ খুব ভোরে বিছানা ছাড়ত নিরঞ্জন। বাণীকাকাদের ঘাটে নেমে স্নান করত সাত-সকালেই। কোমর-জলে দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে সূর্যবন্দনা করত। তখন তার গৌরবর্ণ ঋজু শরীরের আধখানা জেগে থাকত জলের ওপরে। একজন সুদর্শন যুবক অনাবৃত হয়ে স্নান করছে, একজন যুবতী রমণী অল্প তফাতে বসে বসে তাই দেখছে, গোটা দৃশ্যটাই যে-কারোর পক্ষে অস্বস্তিকর।

তখনও অবধি নিরঞ্জনের সঙ্গে আলাপই হয়নি ডালিমের। আলাপ করবার কোনও চাড়ও ছিল না তার। পুরুষ মানুষের প্রতি তার মনে সৃষ্টি হয়েছিল এমন এক জাতের বিদ্বেষ, দুনিয়ার কোনও পুরুষকেই সহ্য করতে পারত না সে। বিশেষ করে অল্পবয়েসি যুবকেরা ছিল তার দু'চক্ষের বিষ। কাজেই, নিরঞ্জন যখন স্নান করছে জলে নেমে, বিন্দুদি লক্ষ করে দেখেছে, ডালিম একবারের তরেও তাকায় না সেদিকে। সে তার নিজের খেয়ালে, দু'চোখে দুনিয়ার নিরাসক্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে অন্যদিকে।

নিরঞ্জন স্নান করে চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকত ডালিম। একসময় ধীরপায়ে ফিরে আসত বাড়িতে। তখন ওর মুখের দিকে তাকালে ওকে খুব ক্লান্ত লাগত বিন্দুদির। তবে কি নিরঞ্জনের স্নান করা, এবং ডালিমের ঠিক ঐসময়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসে থাকাটা একেবারেই কাকতালীয়! বিন্দুদির মনে ওই নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল খুব। কিন্তু দু'চারদিনের মধ্যেই বিন্দুদির অভিজ্ঞ মন থেকে সঙ্কেত ভেসে আসে, ডালিমের ওই সাত-সকালে গিয়ে চাঁপাগাছের তলায় বসে থাকবার প্রধান আকর্ষণ স্নানরত নিরঞ্জন হতেও পারে। কিন্তু ওই নিয়ে ডালিমকে কোনও প্রশ্ন করবার উপায় ছিল না বিন্দুদির, কেন কি, ডালিমের ভারসাম্যহীন রুক্ষ মেজাজকে মনে মনে ভয় পেত সেও।

ভাবতে ভাবতে দিনকতক খুব দুশ্চিন্তা জমেছিল বিন্দুদির মনে। কেন কি, যদি কেবল নিরঞ্জনের স্নানের দৃশ্যটুকু দেখবার জন্যই রোজ সাতসকালে গিয়ে পুকুরপাড়ে বসে থাকে ডালিম, তো সেটাকে এক ধরনের বিকৃতিই বলা চলে।

নিরঞ্জন যেহেতু নিভা কাকিমার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই, সেই সুবাদে, বিন্দুদি ও ডালিম তার ভাগ্নীস্থানীয়। কিন্তু ওকে কোনওদিনও মামা বলে ডাকেনি ওরা। তবুও সম্পর্কটা তো মামা-ভাগ্নীর।

নিজের জীবনে বিকৃতির অন্ত নেই, তাই নিয়ে অপরাধবোধ এবং হাহাকারেরও বুঝি ইয়ত্তা নেই বিন্দুদির। সে ভালো করেই জানে, পুরুষ যখন উপোসি মেয়েদের প্রবল বেগে টানতে থাকে, তখন কী পরিমাণ মরিয়া হয়ে ওঠে মেয়েরা, মানে, মরিয়া হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। তখন সমাজ, লোকলজ্জা, লোকনিন্দা, ইহকাল, পরকাল, সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যায় তাদের কাছে। ডালিম কি তবে অন্ধবেগে নামতে চাইছে সেই অভিশপ্ত পাতালের দিকে, যেখানে বিন্দুদি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে!

ভাবতে ভাবতে বিন্দুদির ভেতরে স্নেহশীলা, শুভাকাঙ্খিনী দিদিটি বারবার কেঁদে উঠেছিল সেদিন। হায় ভগবান, আমার মতো ডালিমও যেন না ঐপথে পা বাড়ায়! যেন আমার মতো শেষ অবধি পাতালে ঠাঁই না হয় ওরও।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, বিন্দুদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে, যতই দিন যাচ্ছে, ডালিমের শরীর থেকে ক্ষয়ে যাবার লক্ষণগুলো একটু একটু করে মুছে যেতে শুরু করেছে। শরীরের রঙ একটু একটু করে ফিরে আসছে। মুখমণ্ডল মসৃণ হচ্ছে। গলায় কর্কশতা অনেক কম। অনেক সাবলীল হয়ে আসছে তার হাঁটাচলা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ। সে ইদানীং একটু একটু হাসছেও।

ডালিমের মধ্যেকার এই পরিবর্তনটা বিন্দুদিকে যারপরনাই ধন্ধে ফেলে দেয়।

শুধু রোজ সকালে চাঁপাগাছের তলায় বসে থাকা আর ওই সময়টা নিরঞ্জনের স্নান করবার সময়ের সঙ্গে মিলে যাওয়া ছাড়া আর তো বিসদৃশ কিছুই ঘটেনি ডালিমের আচরণে। তাহলে, নিজেকে সারিয়ে ফেলবার বিশল্যকরণীটি ডালিম সংগ্রহ করছে কোত্থেকে?

ইদানীং যখন কোনো কোনো দিন অঘোর জেঠুর সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে আসত নিরঞ্জন, বিন্দুদি কাজেকর্মে আটকে থাকলে ডালিমই তাকে জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করত। কিন্তু তখন, বিন্দুদি ভালোভাবে লক্ষ করেছে, ডালিমের আচার-আচরণে বেতাল কিছুই ঘটেনি। অত্যন্ত নির্বিকার, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খাবারের থালা আর জলের গেলাস দিয়ে সে ফিরে যায় অন্দরমহলে। নিরঞ্জনের দিকে তাকানো, কথা বলা তো দূরের কথা, যতক্ষণ নিরঞ্জন থাকে, সে পারতপক্ষে সদরের দিকটাতে আসেই না। সেই তুলনায় বিন্দুদির সঙ্গে বরং কথা-টথা বলে নিরঞ্জন। পরবর্তীকালে উঠোনে পা দিয়েই বরং বিন্দুদিকে দাবি পেশ করবার ভঙ্গিতে বলত, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, এক্ষুনি খেতে না দিলে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। এইভাবে বিন্দুদির সঙ্গেই বরং তার একটা সাবলীল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই ক'মাসে ডালিমের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর দিকে নিরঞ্জনকে তাকাতেও দেখা যায়নি।

এইসব ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যেকার ধন্ধটা বেড়েই চলে বিন্দুদির।

একদিন বিন্দুদিকে আচমকা শুধিয়ে বসে ডালিম, ছেলেটার খুব জ্ঞান, তাই না রে মেজদি?

—কার? বিন্দুদি ভুরু বেঁকিয়ে তাকিয়ে থাকে ডালিমের দিকে।

—ঐযে, নিভাকাকিমার মাসির ছেলে।

অকস্মাৎ ডালিমের কথা শুনে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল বিন্দুদি। ডালিমের মুখের ওপর দৃষ্টি বিঁধিয়ে তাকিয়ে ছিল কয়েক মুহূর্ত। ওর চকিতে উচ্চারিত, কোনওরূপ মানসিক প্রস্তুতিহীন, বাক্যটিকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিল অনেকক্ষণ। একসময় শুধিয়েছিল, তুই কেমন করিয়া বুঝলি তা?

—বা-রে, বাবার সঙ্গে যেভাবে সমানে সমানে কথা বলে—।

বিন্দুদির চোখের তারায় ততক্ষণে গোয়েন্দার সন্দেহ দানা বেঁধেছে। ডালিমের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে প্রশ্ন করে, তুই এসবের কী বুঝ? তুই কি শাস্ত্র-পুরাণ বুঝ নাকি?

সেকথায় ডালিম তিলমাত্র দমে না। বলে, পুরাটা না বুঝলেও একটু-আধটু তো বুঝি। তাইতেই বুঝা যায়—।

বিস্ময়ের আচমকা ধাক্কাটা ততক্ষণে বুঝি সামলে নিতে পেরেছে বিন্দুদি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি গোপন করে বলে, আর কী কী বুঝা যায়?

বিন্দুদির গলার স্বর এবং কথা বলবার চটুল ধরনটা আচমকা বুঝি সনাক্ত করতে পারে ডালিম। সহসা নিজেকে ভয় পাওয়া কাছিমের মতো একেবারেই গুটিয়ে নেয় সে। একেবারে চুপ মেরে যায় সেদিনের মতো। বিন্দুদি আর সেদিন ওর মুখ থেকে ওই ব্যাপারে একটি বাক্যও খসাতে পারেনি।

একদিন নিরঞ্জনই কথাটা পাড়ল বিন্দুদির কাছে।

—ডালিমটা তো বসে রয়েছে বাড়িতে। একটা কিছু করুক না।

বিন্দুদি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জনের দিকে। ওর কথাগুলো মগজের মধ্যে পরিপাক করতে থাকে বুঝি। বলে, একটা কিছু, মানে?

—মানে, কোনও কাজকর্ম। আজকাল তো মেয়েদের জন্য কত রকমের কাজের ব্যবস্থা করেছে সরকার।

—যেমন—? বিন্দুদি কৌতূহলবশত শুধোয়।

—যেমন ধরো, গ্রামে গ্রামে পুষ্টিকেন্দ্র চলছে। অঙ্গনাদি ওয়ার্কারের কাজ পাচ্ছে মেয়েরা। কাজ বলতে বাচ্চাদের জন্য রান্না করা খাবার তৈরি করে তাদের খাওয়ানো। ডালিমকে অবশ্য রান্নাবান্না করতে হবে না। সে পুরো ব্যাপারটা সুপারভাইজ করবে। মাস গেলে একটা রেম্যুনারেশন পাবে।

দিনকয়েক বিষয়টাকে নিয়ে ভাবল বিন্দুদি। শিখাবউদির সঙ্গেও আলোচনা করল। শিখাবউদি ততদিনে সন্ধিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান। বলল, করতে পারে কাজটা। খারাপ নয়। ডালিমের সময়টা কাটবে। তাছাড়া, তার তো নিজের পায়ে দাঁড়ানোটাও দরকার। অঘোর-জেঠু আর জেঠিমা মারা গেলে মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? কল্পর যা মতিগতি! তার ওপর ভরসা করা বৃথা। বাগদিপাড়ায় খুব শিগ্‌গির একটা পুষ্টিকেন্দ্র খোলা হবে। বল তো, ওখানে ডালিমের জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

একদিন অঘোর জেঠুর কাছে কথাটা পাড়ে বিন্দুদি।

অঘোর জেঠু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বিন্দুদির মুখের দিকে। অঘোর চক্রবর্তীর বাড়িব মেয়ে বাগদিপাড়ায় যাবে খিঁচুড়ি রাঁধতে?

—আহা, ডালিম রাঁধতে যাবে কেন? সে কেবল সবকিছু দেখাশুনা করবে।

অঘোর জেঠু আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে গুম মেরে বসে থাকেন।

শেষ অবধি অঘোর জেঠু আর আপত্তি করেননি। কোনও বিষয়ে জোরদার আপত্তি তোলার শক্তি তিনি পুরোপুরি হারিয়ে বসেছেন ততদিনে। কাজেই, নিরঞ্জন আর শিখাবউদির চেষ্টায় বাগদিপাডাব পুষ্টিকেন্দ্রে ডালিমের চাকরিটা হয়ে গেল।

সেই চাকরিটাই অবশেষে কাল হয়েছিল ডালিমের। নিরঞ্জনের সঙ্গে মাখামাখিটা সেই সুবাদেই বেড়ে গিয়েছিল খুব। তার ফল ফলল মাসকয় বাদে। ডালিম অন্তঃসত্ত্ব হল।

বিন্দুদির অভিজ্ঞ চোখেই সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল ব্যাপারটা। মাথার ওপর বুঝি আকাশ ভেঙে পড়েছিল তার।

ডালিমকে নাগাড়ে জেরা করে করে বিন্দুদি জানতে পারে, নিরঞ্জনই এর জন্য দায়ী। তখনও অবধি অঘোর জেঠু কিংবা শয্যাশায়ী জেঠিমা কিছুই জানতেন না।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল বিন্দুদির।

একদিন কথাটা সরাসরি ডালিমকে শুধিয়ে বসে বিন্দুদি, নিরঞ্জনকে কেমন লাগে তোর?

আচমকা এমন কথায় থতমত খায় ডালিম। সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে।

ওর চোখে সরাসরি চোখ রেখে বিন্দুদি। শুধোয়, ওকে তুই ভালোবাসিস?

মাটির দিকে মুখখানি নামিয়ে মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়াতে থাকে ডালিম, ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

ডালিমের কথাটা শুনে একটুখানি আশার আলো বুঝি দেখতে পেয়েছিল বিন্দুদি। কিন্তু অঘোর জেঠুর সামনে কথাটা সে তুলবে কেমন করে? অঘোর জেঠু আগের দিনের রক্ষণশীল মানুষ। বিন্দুদির

বেলায় বাণীকাকা অত ওকালতি করা সত্ত্বেও রাজি হননি দ্বিতীয়বার ওর বিয়ে দিতে। অথচ ডালিমের সর্বনাশের কথাটা তো ওঁকে জানাতেও পারছে না বিন্দুদি।

একদিন বিন্দুদি প্রায় মরিয়া হয়ে কথাটা পেড়ে বসে বাপের কাছে।

অঘোর জেঠু ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে।

—ডালিমের খুব মনে ধরেছে নিরঞ্জনকে।

অঘোর জেঠুর ঘোলাটে চোখদুটো আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এখন আর মনের মধ্যে কোনও বড়সড় চমক খেলে তা পুরোপুরি প্রকাশ করে উঠতেও পারেন না তিনি।

বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিন্দুদি আর এক কদম এগোয়, নিরঞ্জন যদি ডালিমকে বিয়ে করে?

—বিয়ে? শব্দটাকে মগজের মধ্যে পরিপাক করতে থাকেন অঘোর জেঠু। অজান্তে কেঁপে ওঠে বৃদ্ধের বুক। প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, আরে, সে যে সম্পর্কে ডালিমের মামা।

বিন্দুদি খুব সাবলীল গলায় বলে, ডালেপাতায় সম্পর্ক, ওটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। লিজের মামা হইলে না হয় কথা ছিল।

অঘোর জেঠুর মনটা আর আগের মতো শক্তপোক্ত নেই। নিজের মতামতটাকে আঁকড়ে ধরবার মতো মনের জোর আর পান না তেমন। তার ওপর ডালিমের ভবিষ্যতটা ভাবতে ভাবতে তাঁর পাগল হওয়ার জোগাড়। নিরঞ্জন এমনিতে খুবই ভালো ছেলে। কিন্তু তার একটা জলজ্যান্ত সংসার রয়েছে।

বলেন, সে বিয়ে কবতে চাইবে কেন? বাড়িতে তার বউ রয়েছে, ছেলেপিলে রয়েছে।

বিন্দুটি ফুৎকারে উড়িয়ে দেয বাবার যুক্তিটা, দুটা বিয়ে কি এ সংসারে করে না কেউ?

তাও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন অঘোর জেঠু। একসময় বলেন, কিন্তু নিরঞ্জনের কী মত, সেটাও তো জানা দরকার।

—তুমি রাজি হইলে নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

অঘোর জেঠু নির্বাক বসে থাকেন। কিন্তু তাঁর সারা মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে এমনই এক অসহায় অভিব্যক্তি, যার অর্থ হল, ডালিমের ব্যাপাবে সবকিছু তিনি বিন্দুদি আর ওপরওযালার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

বিন্দুদি একদিন একান্তে ডেকে পাঠায় নিরঞ্জনকে।

সরাসরি ওকে শুধিয়ে বসে, ডালিমের এই সর্বনাশটা তুমি করলে কেন?

প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি নিরঞ্জন, কিন্তু বিন্দুদির ক্রমাগত জেরায় অবশেষে একসময় স্বীকার করে কথাটা।

বিন্দুদি একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। একসময় সরাসরি প্রস্তাবটা দেয় নিবঞ্জনকে, কাণ্ডটা যখন ঘটিয়েই ফেলেছ, এবাব মেয়েটাকে বিয়ে করে সবদিক রক্ষা কর তবে।

নিরঞ্জন চুপ কবে বসে থাকে। একসময় বলে, তা কী করে সম্ভব? দেশের বাড়িতে আমার একটা সংসার রয়েছে। তাছাড়া, দুটো বিয়ে করাটা যে বেআইনি।

কষে ধমক লাগায় বিন্দুদি,—আর, একটি মেয়ের পেটে গর্ভসঞ্চার করাটা বুঝি খুব আইনি?

বিন্দুদির ধমকে বড় একটা হেলদোল দেখা যায় না নিরঞ্জনের মধ্যে। সে নির্বিকার মুখে বসে থাকে।

চোখেমুখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে বিন্দুদি তাকিয়ে থাকে নিরঞ্জনের দিকে। বলে, কিন্তু কথাটা ফাঁস হয্যা গেলে তোমাকে তো জেলের ঘানি পিষতে হবে।

নিরঞ্জন সেকথায় একতিলও টসকায় না। বলে, তা হয়ত হবে, কিন্তু তাতে করে দুনিয়ার কাছে চক্রবর্তী পরিবারের মুখ দেখানো যে দায় হবে।

একটুক্ষণ থামে নিরঞ্জন। তারপর বিন্দুদির চোখের ওপর চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় বলে, ডালিমকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বদলে ডালিমের অ্যাবরেশনের জন্য যাবতীয় খরচ-খরচা দিতে রাজি আছি আমি।

একটা শক্ত ফাঁসে বিন্দুদিকে আটকে দিয়ে একসময় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায় নিরঞ্জন।

বিন্দুদি বোবার মতো বসে থাকে।

একসময় তার মনে হয়, এত বড় দুর্বিপাকের কথাটা অঘোর জেঠু আর জেঠিমাকে জানানো উচিৎ। হাজার হোক, তাঁরা ওর বাপ-মা। কিন্তু ক'দিন ধরে চেষ্টা করেও শেষ অবধি পিছিয়ে যায় বিন্দুদি। কারণ, সে তো ভালো মতোই জানে, এতদিন বিন্দুদি আর কল্পনাথকে নিয়ে নরকযন্ত্রণা চলছিল ওঁদের, ডালিমের কথাটা জানতে পারলে হয়ত আত্মহত্যার পথই বেছে নেবেন ওঁরা।

বিন্দুদির সে এক সসেমিরা অবস্থা। দিনদিন ডালিমের অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, অথচ বাইরের কাউকে কথাটা জানানোও যাচ্ছে না। বাস্তবিক, এ এমন একটা কথা, যা পাঁচজনকে জানানোর মতো নয়ই। এমন কি, সাত-পাঁচ ভেবে শিখা বউদিকেও বলতে পারে না বিন্দুদি। কেবল তার রাতগুলো বিনিদ্র কেটে যায়।

ডালিমের কিন্তু কোনও হেলদোলই নেই। নিরঞ্জন তাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে। বিন্দুদি তাকেও জানাতে পারেনি নিরঞ্জনের আসল চেহারাটা।

কেবল আমার কাছে কিছুই গোপন করেনি বিন্দুদি।

আমারই পরামর্শে বিন্দুদি একদিন ডালিমকে নিয়ে আসে মেদিনীপুরে। ডাক্তার দেখাবার কথা বলে তাকে ভর্তি করা হয় আমার খুবই বিশ্বস্ত একটা নার্সিং হোমে। মালিকটি আমার মক্কেল। আমার অনুরোধে ডালিমকে কিছুই জানতে না দিয়ে তার অ্যাবরেশন হয়ে যায়। দু'তিনদিন নার্সিং হোমে কাটিয়ে বিন্দুদির সঙ্গে বাড়ি ফিরে যায় ডালিম। সে হয়ত বা জানলই না, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক যে কুঁড়িটি ধরেছিল তার ডালে, তার অজান্তেই সেই কুঁড়িটি ঝরিয়ে দেওয়া হল।

সে বুঝি তখনও অবধি নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে চলেছে।



তখন আমি মেদিনীপুর কোর্টে ওকালতি করি, একদিন আচমকা কল্পনাথ এসে হাজির আমার মেদিনীপুরের বাসায়।

তখন সারা শহরে লোডশেডিং চলছে।

সারা গায়ে একরাশ কালি মেখে সে এসে দাঁড়াল আমার দরজায়।

প্রথমে তো ওকে দেখে চিনতেই পারিনি। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একেবারে শিউরে উঠি আমি।

শরীরটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে ওর। চোখের কোল একেবারে বসে গিয়েছে। কোটরের গভীরে, কোন্ তলায় একজোড়া চোখ দূর আকাশের তারার মতো মিটিমিটি জ্বলছে।

সারা শরীরে হাজারো অত্যাচার আর অনিয়মের চিহ্ন নিয়ে হাসে কল্পনাথ।

বলে, তোর বাড়িতে একটা রাত থাকতে দিবি?

ওকে সটান দোতলার ঘরে পাচার করে দিয়ে আমি বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। জয়াকেও ডেকে আনি নিচ থেকে।

জয়া কল্পনাথকে কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু ওর সম্পর্কে কিছুই জানতে বাকি নেই ওর। সেই আলাপের পর থেকেই আমার মুখে কল্পনাথের কথা কিস্তিতে কিস্তিতে শুনে আসছে জয়া। ওর হালখবরটিও অজানা নেই তার কাছে। আমার মনে সংশয় ছিল, সাবধানী মেয়ে জয়া, হয়ত বা এই আগুনের টুকরোটিকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিতে সাহস হবে না তার। কারণ, একজন নকশালকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দেবার পরিণতিটা সে ভালোই জানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জয়া তিলমাত্র আপত্তি করল না। বরং কল্পনাথকে খুব যত্নআত্তি করল সারাক্ষণ।

দোতলার ছাদে গিয়ে বসলাম দুজনে।

এই মুহূর্তে এমন একটা জগতের বাসিন্দা কল্পনাথ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে এমনই

এক নিষিদ্ধ সেই জগৎ, এমন ভয়-আতঙ্কের মিশেল থাকে ওই জগতের বাসিন্দাদের নিয়ে, ওর সঙ্গে কথা বলতে খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। কী বলতে কী বলে ফেলব, কল্পনাথ তার কী মানে করবে, সবচেয়ে বড় কথা, অ্যাদ্দিন বাদে কেনই বা আচমকা হাজির হল সে, কেবলমাত্র পুরোনো বন্ধুত্বের টানে, নাকি নিজের দেশবাড়ি, স্বজনদের কথা জানতে এসেছে, নাকি স্রেফ বিপদে পড়ে একরাতের জন্য শেল্টার নিতেই তার আগমন, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে আরও একটা আশঙ্কা কাজ করে চলেছিল নিঃশব্দে। যদি নেহাৎ বিপদে পড়ে শেলটার নিতেই এসে থাকে কল্পনাথ, তবে তো সহজে এই নিরাপদ শেলটারটিকে ছাড়তে চাইবে না সে। আমার শেলটারে সে যে পুরোপুরি নিরাপদ, আমি যে কোনও অবস্থাতেই ওর কথা ফাঁস করব না, এই বিশ্বাসটুকু আছে বলেই না আসতে পেরেছে সে। কাজেই, যদি পুলিশের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে তো আবারও আসতে পারে ওই একই উদ্দেশ্যে। বলাই বাহুল্য, আমার পক্ষে সেটা খুবই ঝুঁকি হয়ে যাবে। সারা রাজ্য জুড়ে নকশালদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশ। তাদের ডেরাগুলোকে খুঁজে খুঁজে ভাঙছে। কারা ওদের সিমপ্যাথাইজার, কারা ওদের আশ্রয় দেয়, সেসব তথ্যও তারা জোগাড় করছে গোপনে। কাজেই, কল্পনাথ যদি পুরোনো বন্ধুত্বের সুবাদে বারবার এসে শেলটার নিতে চায় আমার বাড়িতে, তবে তো যেকোনও মুহূর্তে আমিও বিপদে পড়ে যেতে পারি।

ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে খুব ভাবনায় ফেলে দেয় আমাকে।

আমার মনের অবস্থাটা যে কল্পনাথ এমন নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলবে, সেটা আমার ধারণায় ছিল না একেবারেই। কিন্তু ছাদে বসে জয়ার হাতের মুড়িমাখা খেতে খেতে সে আচমকা বলে ফেলল. তোর নিশ্চয়ই খুব ভাবনা হচ্ছে আমাকে নিয়ে? মনে মনে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গেছিস তুই?

—কেন বল তো? আমি অবাক হওয়ার ভান করি।

—বা-রে, একজন জলজ্যান্ত নকশালপন্থী এসে ঠাঁই নিয়েছে বাড়িতে, পুলিশ জানতে পারলে তোর লাইফ হেল করে দেবে।

মনে মনে ঐকথাটাই তো ভাবছিলাম। কিন্তু কল্পনাথের সামনে সেটা স্বীকার করতে খুবই সঙ্কোচ হল।

বিড়বিড় করে বলি, পুলিশ জানবে কী করে?

—পুলিশের একশোটা চোখ, দু'শোটা কান। কীকরে, কোত্থেকে জেনে ফেলবে, তার কি কিছু ঠিক আছে?

আমার বুকের ভেতর ভয়টা দানা বাঁধছিল একটু একটু করে। তাও মৃদু হেসে বলি, আমার বিপদ আছে বুঝেছিস যখন, তবে এলি কেন?

কল্পনাথ এক ঝলক তাকায় আমার দিকে। বলে, চলে যাব?

আমি হাসিটাকে আরও ছড়িয়ে দিই, এসেই যখন পড়েছিস, এখন যদি চলেও যাস, পুলিশের কাছে তো আর গোপন থাকবে না।

আমার কথাগুলোকে বড় একটা পাত্তা না দিয়ে কল্পনাথ বলে, তার চেয়েও ভাবনার কথা, পুরোনো বন্ধুত্বের দাবিতে আমি যদি মাঝে মাঝেই আসি তোর বাড়িতে!

ওর কথা শুনে একেবারে তাজ্জব হয়ে যাই আমি। কল্পনাথের অন্তর্দৃষ্টি আর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা কতখানি, আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। কিন্তু ও কি অন্তর্যামী নাকি?

মনের ভাবটাকে প্রাণপণে লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে বলি, ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক, তুই এখন কোথায় থাকিস, কী করিস? তোর জন্য আমাদের সবাইয়েরই ভাবনা হয় খুব।

আড়চোখে আমাকে এক ঝলক দেখে নেয় কল্পনাথ। আচমকা গম্ভীর হয়ে যায়। পরমুহূর্তে হেসে ফেলে। বেশ সহজ গলায় বলে, সেটা আমিও বলতে পারব না, তোর পক্ষে শোনাও তো নিরাপদ নয়। জানিস তো, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অজ্ঞানতাও আশীর্বাদ বিশেষ। ধর্, একটা শ্মশানের ভেতর দিয়ে তুই গভীর রাতে চলেছিস। তুই জানিস নে যে জায়গাটা ঘোর শ্মশান। তুই নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলি

জায়গাটা। কিন্তু তুই যদি জানতে পারতিস যে জায়গাটা শ্মশান, তবে তোর প্রতিটি মুহূর্তে, গাছের একটি পাতা খসবার আওয়াজেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত।

আমি আর ওই প্রসঙ্গে পারতপক্ষে থাকতে চাইছিলাম না। তার বদলে ওর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে নাগাড়ে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকি।

রাতের বেলায় এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি সন্ধিপুরের সবকিছু বিতাং করে বললাম কল্পনাথকে। অঘোর জেঠু, জেঠিমা, বিন্দুদি, ডালিম, সবাইয়ের সবকিছু খুঁটিনাটি খুলে বললাম।

খুব নিরাসক্ত মুখে শুনে গেল কল্পনাথ। কেবল ডালিমের অবস্থার কথা শুনে ওর মুখের ভাষা পুরোপুরি বদলে গেল। এতক্ষণে তার চোখেমুখে দেখতে পেলাম গভীর দুঃখের ছায়া।

শেষরাতে চলে গেল কল্পনাথ।

যাবার বেলায় চাপা গলায় বলল, আমার আসার কথাটা যেন ভুলেও কাউকে বলিস নে। তাতে তোর বিপদ বেড়ে যাবে।

তারপর ম্লান হাসিতে শীর্ণ মুখখানা ভরিয়ে বলল, ভয় নেই তোর। আর আমি কোনোদিনও আসব না তোর কাছে। ধরে নে, এটাই তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ভেবে নে, তোর সঙ্গে শেষ দেখাটা করবার জন্যই আমি এসেছিলাম তোর কাছে।

একটু বাদেই অন্ধকারে শরীর ডুবিয়ে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল কল্পনাথ।

নিরঞ্জন যে-রাতে খুন হল, সে-রাতে আমি ছিলাম সন্ধিপুরের বাড়িতে।

সকাল হতেই খবরটা চাউর হয়ে গেল চতুর্দিকে। সন্ধিপুরের নিস্তরঙ্গ দিঘিতে যেন একটি বড়সড় ঢিল পড়ল। তাতে করে তরঙ্গ উঠল বৃত্তাকারে। সেই তরঙ্গের বৃত্তটি একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকায়।

ব্লক অফিস থেকে কাজকর্ম সেরে একটু রাত করে বাসায় ফিরছিল নিরঞ্জন। ইদানীং মাঝে মাঝেই বাসায় ফিরতে দেরি হত তার। কেশিয়াড়ি থেকে মাইলটাক দূরে কদমকুঁড়ির পুকুরপাড়ে আচমকা ওকে গুলি করে পালিয়ে গিয়েছে কেউ। সারারাত লাশ পড়েছিল পুকুরপাড়েই। সকাল হতেই কার যেন নজরে পড়ে যায়।

ময়নাতদন্তের পর লাশ সন্ধিপুরে ঢোকে পরের দিন সন্ধ্যায়। ততক্ষণে নিরঞ্জনের দেশের বাড়িতে খবর চলে গেছে। ওর দাদারা এসে পড়েছে সবাই। সন্ধে নাগাদ লাশ দাহ হল সন্ধিপুরেই। অস্থি নিয়ে ফিরে গেল ওর দাদারা।

খবরটা শোনার পর থেকেই ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল ডালিম। সে তখনও অবধি নিরঞ্জনকে নিয়ে ডগোমগো স্বপ্ন দেখে চলেছে। তখনও অবধি সে বিশ্বাস করে বসে রয়েছে, নিরঞ্জন তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিয়েটা হয়ে গেলেই তার পেটেরটি একেবারে আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে।

নিরঞ্জনকে কে খুন করতে পারে, তাই নিয়ে কিছুদিন ধরে গবেষণার বন্যা বয়ে গেল সন্ধিপুর গাঁয়ে।

কেউ বলল, সে নাকি ব্লক অফিসে কোনও ঘুঘুর বাসার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। ব্লক অফিসে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ। টাকা ওড়ে তার বাতাসে। একেবারে উঁচুতলার লোকজনেরাও জড়িয়ে থাকে তাতে। কোনও বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারির খবর জেনে ফেলেছিল সে। ওরাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

কেউ বলে, নিরঞ্জন নিজেই নাকি কোনও দুষ্টচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিজেদের মধ্যে বখরা বা ঐজাতীয় কিছু নিয়ে কোনও মতবিরোধের কারণেই চলে যেত হল ওকে।

কেউ বলে, স্ত্রীর সঙ্গে ওর মনোমালিন্য চলছিল অনেকদিন। তার চরিত্র নাকি ভেতরে ভেতরে খুবই খারাপ ছিল। বউ নাকি আজ দশ বছর বাপের বাড়িতেই থাকত। সেই কারণেই, ওর শালারাই লোক লাগিয়ে ওকে সরিয়ে দিয়েছে।

আমিও ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না, বাস্তবিক, কে আচমকা খুন করে বসল নিরঞ্জনকে! কেনই বা!

একদিন আমি সদর থেকে হপ্তা শেষে গাঁয়ে ফিরেছি, শিখা বউদি দিল এক হাড়-কাঁপানো খবর।

বলল, শঙ্কর, শুনেছিস তো, কল্প ধরা পড়েছে।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি শিখা বউদির দিকে।

শিখা বউদি ধীর গলায় বলে চলে, হাজারিবাগের জঙ্গল থেকে বিহার পুলিশ ধরেছে ওকে। কোলকাতায় নিয়ে এসেছে।

—তোমাকে কে বলল এসব?

—বাণীকাকা বলছিল। সে নাকি কোত্থেকে খবর পেয়েছে।

শুনে আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠি। কল্পনাথের পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠি মনে মনে। তখন নকশালদের খুব ধরপাকড় চলছিল। আর, ধরলেই তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছিল পুলিশ। সেসব খবর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে আসছিল আম-জনতার কানে। শুনতে শুনতে মনে মনে খুব আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলাম আমি। কল্পনাথের জন্যই আশঙ্কা।

আমি জানতাম, কল্পনাথও একদিন-না-একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই। কাজেই শিখা বউদির কথাগুলোকে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। শিখা বউদি অবশ্য এর বেশি কোনও খবর দিতে পারল না। ফলে, সন্ধেয় সন্ধেয় আমাকে ছুটতে হল বাণীকাকার বাড়িতে।

বাণীকাকা কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছেন কিছুদিন। তাঁর শরীরে খুব দ্রুতলয়ে বার্ধক্য নামছে। ইদানিং কেমন জানি গুম মেরে থাকেন সারাক্ষণ।

কল্পনাথের প্রসঙ্গেও বড় একটা উত্তেজিত দেখাল না তাঁকে। খুব শান্ত গলায় বললেন, ঠিকই শুনেছিস। তাকে রেখেছে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। কারোর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না।

—বাড়ির লোকজনকেও নয়?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন বাণীকাকা, সে নাকি কথা বলবার মতো অবস্থায় নেই।

—আপনি যাননি কল্পনাথের সঙ্গে দেখা করতে?

—গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গেও দেখা করতে দেয়নি। বলল, হুকুম নেই।

পরের হপ্তাতেই কোর্টের থেকে বিশেষ আদেশ বের করে আমি গেলাম দমদম সেন্ট্রাল জেলে কল্পনাথের সঙ্গে দেখা করতে। নিজে অ্যাডভোকেট হওয়ায় অর্ডারটা পেতে বেশি বেগ পেতে হল না।

কল্পনাথের শরীরের হাল দেখে কান্না পেল আমার।

কল্পনাথ কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছিল।

ধরা গলায় বলি, তুই বলেছিলি, আমাদের মধ্যে আর ইহজীবনে দেখা হবে না। কিন্তু দ্যাখ্, আবার দেখা হয়ে গেল।

খুব গম্ভীর গলায় কল্পনাথ বলল, না হলেই ভালো হত।

বলি, কতকিছুই তো না হলেই ভালো হত। আমরা কি ঠেকাতে পেরেছি?

সেকথার জবাব দিল না কল্পনাথ। অঘোর জেঠু, জেঠিমা, বাণীকাকা, কারোর সম্পর্কে একটাও কথাও জিজ্ঞেস করল না সে। শুধু আমার দিকে ভেজা ভেজা চোখে তাকিয়ে শুধোল, ডালিম এখন কেমন আছে?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন। এর জবাব কল্পনাথের বুকে শেল হয়ে বিঁধবেই।

বলি, ভালোই আছে সে। ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছে। মানুষের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

ব্যস, ডালিমের কথাটি ফুরোতেই বুঝি আচমকা কল্পনাথের সব কথা ফুরিয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, ডালিমকে একটু দেখিস। তারপর আমার চোখের ওপর চোখ রেখে খুব মৃদু গলায় বলল, তুই তো জানিসই, এই দুনিয়ায় তোকেই কেবল ভালোবাসত সে।

কল্পনাথের কথা শুনে আমি চমকে উঠি। আর একবার ওকে সাক্ষাৎ অন্তর্যামী বলে মনে হয় আমার।

আমি তো জানিই, কল্পনাথের শেষ কথাগুলোই আজ কত বছর ধরে নিঃশব্দে কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। ডালিমের এই অবস্থার জন্য আমি তো পুরোপুরি নিজেকেই দায়ী করে চলেছি কতকাল। সেই কারণেই তো জয়াকেও কখনোই দেখাতে পারলাম না বুকের মধ্যেকার সেই অপরাধী মানুষটাকে, যে-কিনা একটুখানি সাহস দেখাতে পারল না বলে ডালিমের মতো একটা মেয়ের জীবনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

কথা ঘোরাতে বলি, তোর কি উকিল-টুকিল দরকার? জামিন নেবার কী ব্যবস্থা হয়েছে?

কল্পনাথ খুব নির্বিকার গলায় বলে, ওরা আমাকে জামিন দেবে না।

—কেন?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে কল্পনাথ, জামিন দেবার জন্য তো ধরেনি।

—তবুও, চেষ্টা তো করা যাক।

চোখে মুখে রাজ্যের ঔদাসীন্য ফুটিয়ে কল্পনাথ বলে, তার কোনও প্রয়োজন নেই।

একটু বাদেই বুঝতে পারি, ওর সঙ্গে আমারও আর খুব বেশি কথা নেই। ওর সঙ্গে সব কথা বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছে আমার।

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, এবার তবে যাই আমি। কী আর বলব তোকে, ভালো থাকবাব চেষ্টা করিস।

চলে আসার মুহূর্তে শেষবারের মতো চোখ রাখি কল্পনাথের চোখে। বলি, কেবল একটা কথার জবাব দিবি?

কল্পনাথ পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

খুব চাপা গলায় বলি, নিরঞ্জনকে খুন করল কে?

নিমেষের জন্য বুঝি ধ্বক করে জ্বলে ওঠে কল্পনাথের নিভে আসা চোখদুটি। পরক্ষণে ঝিমিয়ে পড়ে সে।

খুব অস্থির গলায় বলে ওঠে, এবার তুই যা শঙ্কর। আমাব খুব ঘুম পাচ্ছে।



যমুনা খালের পুল থেকে কল্পনাথদের বাড়িটা দেখা যায় না।

কিন্তু আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম বাড়িটাকে। দেখতে পেলাম, ওদের বাড়িব সদর-আগড়ের সামনে যথারীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে ডালিম। একেবারে একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং তার দৃষ্টি রাস্তার ওপর স্থির।

ওকে দেখামাত্তরই বুঝতে পারলাম, আমার জন্যই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষণ গুণছে সে। কারণ, সে ভালোভাবেই জানে, নিজের বাড়িতে যেতে আমাকে ওদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হবে। এবং আমার মনে কোনওরূপ সংশয় নেই যে, আমি ওকে না দেখতে পেলেও ডালিম আমাকে ঠিকই দেখে ফেলেছে এতক্ষণে। কেন কি, আমি অনেকবার পরখ করে দেখেছি, কল্পনাথদের বাড়ির সদর-আগড়ে দাঁড়ালে একেবারে যমুনা নদীর পুল অবধি অস্পষ্ট হলেও দেখা যায়, অথচ যমুনা নদীর পুল থেকে কল্পনাথদের আগড়টা কখনোই দৃশ্যমান নয়। এটা আমার কাছে বহুকাল যাবৎ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

ইদানীং আর ফি-হপ্তায় দেশের বাড়িতে আসতে পারিনে। নিজের চেম্বারে মামলার কাজকর্ম থাকে, মক্কেল-টক্কেলও আসে কিছু, জয়া-মিল্টনদেরও একটুখানি সময় দিতে হয়। তাছাড়া, হপ্তা অন্তে একটাই তো ছুটির দিন, শরীরও একটু বিশ্রাম দাবি করে।

দেশের বাড়িতে ঘন ঘন না আসার অন্য কারণও রয়েছে। একে তো দেশে-গাঁয়ে এখন মামলা কমে গিয়েছে অনেক। ঝগড়াঝাঁটি বাধলে শিখাবৌদিরাই পয়লা চটকায় মিটিয়ে দিচ্ছে পঞ্চায়েত অফিসে। তাবাদে, দেশের বাড়িতে (এক) সামান্য জমিজমা আর ছোটকাকা ছাড়া কার টানেই বা আসব! এইসব কারণে, ইদানীং মাসের মধ্যে দুটো শনিবার দেশের বাড়িতে আসি। কিন্তু কোন্ শনিবারে আসব, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সেটা মূলত নির্ভর করে চেম্বারেব অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং জয়াদের প্রোগ্রামের

ওপর। কিন্তু অবাক কাণ্ড, এলোমেলো এলেও, ফি-শনিবারেই ডালিম ঠিকই মজুত থাকে ওদের চৌহদ্দির আগড়টি ধরে। প্রথম প্রথম খুবই অবাক হয়ে যেতাম, কেমন করে বোঝে ডালিম, আমি এই শনিবারে আসবই! আগের শনিবারেও তো আসতে পারতাম। কিংবা পরের শনিবারে।

একদিন, তিনটার বাসটা ফেল করায়, পরের বাস ধরে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় রাত আটটা বেজে গেল। খুবই নিশ্চিন্ত ছিলাম, আজ আর ডালিমের মুখোমুখি হতে হবে না আমাকে। কিন্তু কল্পনাথের বাড়িটা পেরিয়ে যাবার মুহূর্তেই বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, আগড়টি ধরে ডালিম একতাল কালো পুঁটলির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে, বাধ্যত আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

ডালিমের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় শুধোই, এ কি! এত রাত অবধি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

আমার কথায় ডালিমের গলা থেকে পালটা বিস্ময় ঝরে পড়ে, বা-রে, তুম্‌রা কদ্দুর থেকে আসতিছ, আর, আমি ঘরের কোণে গিয়া বুসিয়া রইবো?

গলায় সামান্য উষ্মা ফুটিয়ে বলি, কিন্তু আমার তো আসার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনও শনিবারে আসি, কোনও শনিবারে আসতে পারিনে। আজও তো আমি নাও আসতে পারতাম, এই অন্ধকারের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে তুমি?

খুব মৃদুস্বরে ডালিম বলে, আমি জানতাম, আজ তুমরা আসবেই।

—জানতে? কেমন করে জানতে? আমার গলা দিয়ে উষ্মা ঝরে ঝরে পড়ে।

হাওয়ায় পাতা নড়ার মতো ক্ষীণ গলায় ডালিম বলে, আমি জানতে পারি।

—তা, এমন ঘোর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ? সাপখোপ, পোকামাকড়,...একটা আলো নিয়ে দাঁড়াতে পার না?

সে-কথায় আরও ক্ষীণ হয়ে আসে ডালিমের গলা। বিড়বিড় করে বলে, আলো আমি কোথায় পাবো বলো? কে দিবে আমাকে আলো?

—বিন্দুদিকে বললেই দিত। বলতে বলতে মগজের মধ্যে সামান্য ধাক্কা খাই আমি, ডালিমের কথাগুলোর মধ্যে কি অন্য কোনও ইঙ্গিত রয়ে গেল! এতদ্দ্বারা ডালিম কি অন্য কোনও আলোর কথা বলতে চাইল? অন্যতর কোনও আলো?

আজও, আমি জানি, সেই শেষ-বিকেল থেকে ডালিম দু'চোখ জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকবে আগড়ের গা ঘেঁসে। আমার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকবে। কাজেই, ওই পথে বাড়ি ফিরলে ডালিমের সঙ্গে দেখা না হয়ে আমার উপায় নেই।

ডালিম আর ইদানীং সকালের কথা বিকেলে মনে রাখতে পারে না। তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতাও ধরা পড়ে পদে পদে। কাকে যে কখন কী বলে বসবে, তাই নিয়ে সিঁটিয়ে থাকে অনেকেই। কিন্তু ফি-শনিবার বিকেলটি হলে সে আমার জন্য আগড়টি ধরে অপেক্ষা করে সারা সন্ধে। আমি জানি, ওর বাড়ির সামনা-সামনি পৌঁছলে ও দু'চোখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। আমি আগড়ের পাশটিতে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেই ডালিম দু'চোখে তিরস্কারের মুদ্রা ফুটিয়ে শুধোবে, এ কি, তুমি বড় একলা আইলে যে? সে আইলনি? এবং আমাকে তার জবাবে কিছু মিথ্যে কথা বলবার জন্য অনেক আগে থেকেই তৈরি থাকতে হবে।

দূর থেকে কল্পনাথদের সদর-আগড় ধরে ডালিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা অবধি আমার বুকের মধ্যে এক ধরনের প্রদাহ শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মগজের মধ্যেকার জিলিপি তৈরির কারখানাটা চালু করে দিয়েছি আমি। মুখোমুখি হলেই গরম-গরম ভেজে ধরে দিতে হবে ডালিমের হাতে। নইলে সে সদর রাস্তা থেকে বাড়িতে ফিরে যাবেই না। হয়ত বা রাতভর দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানেই। ডালিমটা এমনই হয়েছে ইদানীং। এমনই অবুঝ, আবেগতাড়িত, হুঁশজ্ঞানহীন।

তখনও ডালিমের কাছাকাছি পৌঁছতে কিছুটা পথ বাকি রয়েছে। কাজেই আমি আকুলিবিকুলি হয়ে জিলিপি তৈরির কারখানাটা চালিয়ে যেতে থাকি।

গেল হপ্তায় যেন কী বলেছিলাম? কেন আসতে পারল না নিরঞ্জন? জ্বর হয়েছিল? এমনিতে

সাদামাটা জ্বর, ক'দিনই বা তার আয়ু! বড় জোর তিন-চার দিন। আর, আমি গাঁয়ে ফিরছি কিনা দু'হপ্তা বাদে। কাজেই, আজ আর জ্বর দিয়ে চলবে না। আজ আমার সঙ্গে নিরঞ্জনের না আসার অন্য কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আমাকে ভেবে বের করতেই হবে।

একসময় আমি কল্পনাথদের বাড়ির সদর আগড়ের কাছটিতে পৌঁছে যাই।

দু'চোখে অপরিসীম প্রত্যাশা নিয়ে ডালিম দাঁড়িয়ে ছিল আগড়ের ওপারে। আমার চোখে চোখ রাখতে রাখতে তার ভ্রূসঙ্গমে জটিল ভাঁজ পড়ে। এবং ঠিক একজন ষড়যন্ত্রকারীর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় মানুষ, ডালিম ঠিক তেমনই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

এবং আমাকে ঢোঁক গিলতে গিলতে একসময় বলতে হয়, নিরঞ্জন এ হপ্তায়ও আসতে পারলোনি।

প্রবল উৎকণ্ঠায় ভারী হয়ে আসে ডালিমের চোখের পাতা। বলে, সে ভালো আছে তো?

—ভালো থাকা মানে, আমি মনে মনে বানাতে থাকি ডালিমের মনের মতো উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বাক্যবন্ধ। বলি, তার জ্বরটা আবার রিল্যাপ্‌স করেছে। সেই জন্যই তো আসতে পারলোনি।

নিরঞ্জনের জ্বর হয়েছে শুনে ডালিমের সারা মুখে, চোখের তারায় ঘনিয়ে এল রাজ্যের দুর্ভাবনা। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, আবার কী করিয়া বাধাল জ্বর? নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। শরীরের প্রতি কোনওদিনই তো নজর থাকে না তার। এখানে যখন থাকত, তখনই তো দেখেছি অর বাউন্ডুলেপনা। ভোর না হইতেই পুকুরের ঠাণ্ডা জল্লে ডুবতে থাকত। নাওয়া-খাওয়ারও ঠিক ছিল না। এখন তো আবার আমি নাই কাছে, মনের আনন্দে যা খুশি কত্তিছে। এবার আসুক, আর যদি যাইতে দিই।

শুনতে শুনতে আমার বুকের ভেতরে বাতাস ক্রমশ ভারী হতে থাকে। ওর চোখের দিকে কিছুতেই তাকাতে পারিনে তখন।

বলি, এবার ফিরিযা গিয়া আমি ওকে বলবো এসব কথা। ভালো করিয়া বকিয়া দিবো।

—না, না। প্রায় আঁতকে ওঠে ডালিম।—তুমি বকো না। ও আবার যার-তার বকুনি একেবারেই সইতে পারে না। সামনের শনিবার আইলে আমিই যা বলার বলবো।

—ঠিক আছে।

—সামনের শনিবার সে আসবে তো?

—আসবে। ভালো থাকলে এই হপ্তাতেই আসত।

—ঠিক আসবে তো? বলেই ডালিম বিধাতার রায় শোনার মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

—ঠিক আসবে, দেখো। আমি একেবারে যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করি কথাগুলো।

—তুমিই তাকে সঙ্গে করিয়া লিয়া আইস্‌বে তো?

—আমিই লিয়া আইস্‌বো তাকে।

অল্পক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় বলি, আমি এবার চলি?

ডালিম সানন্দে মাথা দুলিয়ে সায় দেয়। তার যাবতীয় প্রশ্ন, উৎকণ্ঠা, কৌতূহলের ইতি হয়েছে ততক্ষণে। কাজেই, আমি তখন পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকি নিজের বাড়ির দিকে। ডালিমও আগড়ের শরীর থেকে নিজের শরীরটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে এগোয়।

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে তার শরীরটা একসময় হারিয়ে যায় অঘোর-জেঠুদের উঠোনে। এতক্ষণে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আবছা আঁধারে ডালিমের অপসৃয়মান শরীরটাকে দেখতে দেখতে সারা মন আত্মগ্লানিতে ভরে যায়।

তখন, সারা গায়ে কালো অন্ধকার মেখে, ক্লান্তি ও অবসাদে ভারী হয়ে আসা পা'দুটোকে টানতে টানতে, বাড়ির দিকে এগোতে থাকে এমনই একজন পরাজিত কাপুরুষ, যে-কিনা, ডালিমের মতে, সেই বহুকাল আগে মাংসের হাঁড়িতে সাহস করে একমুঠো নুন ফেলে দিতে পারেনি।

পরিচ্ছেদ তিন

পদ্মগন্ধে মজে আছি

অনিন্দ্য, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কল্পনাথের পর আর কাউকেই অতখানি ভালোবাসিনি আমি, একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, দ্যাখ্ শঙ্কর, যদি তোর বউ কিংবা সমতুল্য কোনও আপনজন তোর সঙ্গে অন্য কোনও মেয়েকে জড়িয়ে তোকে সন্দেহ করে তো রাগিস নে, বরং এনজয় করিস, কেন কী, এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি মেয়ে এমনটা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যে, তাব স্বামীর কিংবা প্রণয়ীর একজন প্রেমিকা রয়েছে নির্ঘাৎ। এমনটা ভেবে ওরা সুখ পায়। এমন একটি সুখের কাঁটা বুকের মধ্যে বিঁধিয়ে রেখে জীবন কাটাতে ওরা ভালোবাসে, এবং এমন সন্দেহটা করতে গিয়ে ওরা পরোক্ষে তোর পৌরুষের প্রতি শ্রদ্ধাই দেখায়। এমন করেই তোর মূল্যটা নিজের কাছে বাড়িয়ে রাখতে চায় মেয়েটি।

অনিন্দ্য, কল্পনাথের মতো, আমার ছেলেবেলার বন্ধু নয়। ল' কলেজেই ওর সঙ্গে আলাপ, ঘনিষ্ঠতা, নিবিড়তা। কাজেই কল্পনাথকে যেমন হৃদয় দিয়ে বোঝা যায়, অনিন্দ্যর ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। ওকে বুঝতে হয় বুদ্ধি দিয়ে।

অনিন্দ্য যখন কথাগুলো বলছিল তখন মধ্যবাত। আমরা দুজনেই তার আগে এন্তাব পান করেছি। পান করতে যখন শুরু করেছিলাম তখন আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলাম। কারণ সেই সন্ধেতেই জয়া আমাকে নিদারুণ আঘাত করেছিল। আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না সেজন্য।

ফিরতি পথে বাসায় না গিয়ে আমি অনিন্দ্যর ডেরায় পৌঁছেছিলাম স্রেফ মদ খাওয়ার জন্য।

অনিন্দ্য আমাকে খুব ভালো বোঝে। আমার চোখমুখ দেখে সে নিশ্চিতভাবে আন্দাজ করেছিল, আমি বিধ্বস্ত। আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে গেলাস সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে।

দু'পেগের আগে আমাকে কোনও প্রশ্ন করেনি অনিন্দ্য।

তারপর, যখন আমার উত্তেজিত স্নায়ু-ব্যবস্থাটি সামান্য শিথিল হয়েছে, তীক্ষ্ণ ক্ষিপ্র অনুভূতিগুলো সামান্য ভোঁতা, অনিন্দ্য যখন নিশ্চিত হয়েছে যে, প্রশ্ন করতে গিয়ে ও যদি আমাকে আচমকা আঘাত দিয়ে বসেও, তথাপি, শক্ত শানের ওপর কোদালের ঘা মারলে যেমন ঠং করে বাজে, অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে থাকবার দরুণ আঘাতটা অত নিদারুণ হয়ে ঠং শব্দে বাজবে না আমার বুকে, তখনই এক সময় শুধিয়েছিল, জয়ার সঙ্গে কিছু হয়েছে?

আমি কোনও কথা গোপন করিনি ওর কাছে।

আমার মুখে সব শুনে অনিন্দ্য ওই কথাগুলো বলেছিল।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠি, কিন্তু ওর সন্দেহের তো কোনো ভিত্তি নেই। আমি তো বিলাসীপিসির কাছে যাই। বিলাসীপিসি আমার মায়ের মতো।

অনিন্দ্য বলে, সেটা তো জয়া বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, বিলাসীপিসির নাম করে তুই ওই মহল্লার অন্য কোনও মেয়ের কাছে যাস। আসলে, ওকেও তেমন দোষ তো দেওয়া যায় না। এই যে বিলাসীপিসির মতো কারোর বাড়িতে সুযোগ পেলেই তোর চলে যাওয়া, সাধারণ একজন মেয়ে হিসেবে ওর তো খটকা লাগতেই পারে! হাজার হোক, বিলাসীপিসিদের পরিচয় তো গেরস্থ মানুষের পক্ষে স্বস্তিকর নয়। তার ওপর তুই অনেকদিন যাবৎ জয়ার কাছে গোপন রেখেছিলি সবকিছু। সন্দেহটা তো

তুইই তৈরি করেছিস্।

অনিন্দ্যর একথাটা মিথ্যে নয়। আলাপ হওয়ার পর থেকে আমি অনেকদিন যাবৎ বিলাসীপিসি সম্পর্কে কিছুই বলিনি জয়াকে। বলা যায়, বরং লুকিয়েই রেখেছি বিলাসীপিসির কথা।

একদিন জয়াই নিজের থেকে কথাটা তুলল। তুমি কি চিৎপুর এলাকায় মাঝেমধ্যে যাও-টাও?

আমি বুঝি সামান্য চমকে উঠেছিলাম, সেটা সম্ভবত নজর এড়ায়নি জয়ার।

বলি, কেন বল তো?

জয়া খুব গম্ভীর হয়ে যেতে যেতে বলে, বল না, কথাটা সত্যি কি না?

বলি, যাই। তাতে কী হয়েছে?

আমার মুখের ওপর দু'চোখ বিঁধিয়ে রেখেছিল জয়া। বলে, একটা হলুদ রঙের তিনতলা বাড়িতে?

হকচকিয়ে যেতে যেতে বলি, হ্যাঁ, তাই।

জয়া খুব বিদ্রূপ গলায় বলে, আমাকে কোনওদিন বলনি তো?

এটা ঠিক, জয়াকে আমি কোনওদিনও বলিনি সেকথা। কেন জানি, আমার খুব বাধো-বাধো ঠেকেছে কথাটা বলতে। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলি, আমি তো কত জায়গাতেই যাই, কত কারণেই, সব কি তোমাকে বলি, না বলবার দরকার আছে?

জয়া চুপ করে বসে থাকে। ধীরে ধীরে তারা সারা মুখে মেঘ জমতে থাকে। কিন্তু সেদিন আব এর বেশি এগোয়নি জয়া।

কিন্তু হপ্তাটাক বাদে পুনরায় তোলে প্রসঙ্গটা। বলে, তুমি আবার গিয়েছিলে ওই বাড়িটাতে? এবারে জয়ার চোখেমুখে জিজ্ঞাসার পাশাপাশি ভর্ৎসনাও ছিল, যা আমাকে অপমানিত বোধ করতে বাধ্য করে।

বলি, হ্যাঁ, গিয়েছিলামই তো। কিন্তু অত কথা জিজ্ঞেসই বা করছ কেন? ওই বাড়িটাতে গেলে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি আছে। জয়া খুব কাটা কাটা গলায় বলে, বাড়িটা ভালো নয়। এলাকায় বদনাম রয়েছে।

জয়ার এই কথাটা সত্যি। কিন্তু আমি একটু একটু করে অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, ওই বাড়িটা সম্পর্কে, ওখানে আমার আনাগোনা সম্পর্কে, এত তথ্য জয়া জানল কী করে।

জয়া শীতল গলায় বলে, আমার এক মাসতুতো দাদা তোমাকে মাঝেমাঝেই ওই বাড়িটাতে ঢুকতে দ্যাখে। ওই বাড়িটাতে কে থাকে?

আমি খুব সাদাসাপটা জবাব দিই আমার এক পিসি থাকে ওখানে।

—তোমার নিজের পিসি?

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিই।

তাই শুনে জয়ার মুখখানা অজান্তে ফ্যাকাসে হয়ে আসে।

দেখতে দেখতে আমার খুব অস্বস্তি হতে থাকে। ঢোঁক গিলে বলি, হ্যাঁ, আমার ছোটপিসি।

আমার কথাগুলো বুঝি কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়ার। আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ও। একসময় খুব কঠিন গলায় বলে, ওই বাড়িতে তুমি আর কোনওদিনও যাবে না।

ওর গলায় এক ধরনের হুকুম ছিল বলে মনে হল আমার। খুবই অপমানিত বোধ করলাম মনে মনে। তবে পরিস্থিতি তেতো হওয়ার ভয়ে সেদিন আর কথা বাড়াইনি।

হপ্তা দুই বাদে আবার কথাটা তুলল জয়া। এবার ওর গলা আরও কঠিন, ক্ষমাহীন। বলল, তুমি আবার গিয়েছিলে ওই বাড়িটাতে?

আমি সামান্য আহত গলায় বলি, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। হয়েছেটা কি?

জয়া বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকায়। দু'চোখ দিয়ে ক্ষোভ ঝরে পড়ে। বলে, আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি গেলে? কেন? কে আছে ওখানে? সত্যি করে বল দেখি, কার টানে যাও ওখানে?

বুঝতে পারছিলাম, আমার চোয়ালজোড়া একটু একটু করে শক্ত হয়ে আসছে। কোনও গতিকে নিজেকে সংযত করে জবাব দিই, বলেছি তো, বিলাসীপিসির টানেই যাই আমি।

—ন্যাকামো কোরো না। দপ করে জ্বলে ওঠে জয়া,—তোমার বিলাসীপিসির কথা জানতে চাইছি নে। ওই বাড়িতে আর কে আছে বল, যার টানে রোজদিন তোমাকে যেতেই হয়, অত করে বারণ করা সত্ত্বেও?

—কে আবার থাকবে? গলাটাকে স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি,—ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান...।

—তুমি বড্ড ন্যাকামো করছ আজ। জয়ার দু' চোখ জ্বলে ওঠে, ওদের কথা বলছিনে আমি।

—কী আশ্চর্য, বিলাসীপিসি ছাড়া আর কেউ তো থাকেই না ও বাড়িতে।

শুনে আমার দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে থাকে জয়া, তুমি আমাকে বোকা ঠাওরেছ? ওই অত বড় দুর্গের মতো বাড়িটাতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কেউই থাকে না, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?

—বিশ্বাস না করার কী আছে। ওই বাড়িতে বিলাসীপিসি একা থাকতে পারে না?

—না পারে না। জয়ার ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে ততক্ষণে জমে উঠেছে ঘৃণা। বলে, থাকতে পারে না, কারণ, তোমার বিলাসীপিসি যে আবার বিলাসীমাসিও।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি জয়ার দিকে।

এ জয়াকে আমি চিনিনে। এমনিতে খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে ও। কাউকে আঘাত দেওয়া সাধারণভাবে ওর ধাতে নেই। চিরকাল আঘাত পেয়ে আসা মানুষেরা সাধারণত অন্যকে আঘাত করতে ভালোবাসে। জয়াও আশৈশব আঘাত পেয়ে এসেছে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জনের কাছে। তবুও অন্যকে সচরাচর আঘাত দিতে চায় না, অন্তত আমাকে তো নয়ই, কারণ, আমাকে ও ভালোবাসে দুনিয়ার যে কোনো জনের চেয়ে। কিন্তু আমার ওই বিলাসীপিসির বাড়িতে যাওয়াটাকে কেন্দ্র করে সে যে বারবার কেন এতখানি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, বুঝতে পারিনে।

জয়ার শেষ কথাগুলো শুনতে শুনতে একেবারেই ভেঙে পড়ি। কী করব, মানে, এমন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারিনে।

অনেক কিছু করা যায় এমন মুহূর্তে। জয়ার গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে বরফের মতো জমে থাকা কান্নাটা, যা এই মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তাপ পেয়ে গলছে, ওই বরফ-গলা জল দু'চোখের গোমুখ দিয়ে নামিয়ে দেওয়া যায় গাল বরাবর। খুব বিবেচক বিচক্ষণ মানুষের মতো জয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করা যায়। বিলাসীপিসির সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলা যায়, পেঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে খুলতে খুলতে পৌঁছে যাওয়া যায় বিলাসীপিসির জীবনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে।

কিন্তু ততক্ষণে দ্বিতীয়টা প্রবল হয়ে উঠেছে, বুকের ভেতরে তুমুল আলোড়ন তুলেছে বরফগলা জল, প্রাণপণে গোমুখের পথ খুঁজছে, একসঙ্গে জোড়া গোমুখ, একজোড়া যমুনা নদীর জন্ম দিতে চায় ওই জল।

আমি দ্রুত পায়ে চলে আসি জয়ার বাড়ি থেকে। একটা নির্জন মতো পার্ক পেয়ে ওর মধ্যে বসে বসে কাঁদি অনেকক্ষণ, তারপর সটান চলে আসি অনিন্দ্যর ডেরায়।

আমার মুখ থেকে সব শুনে অনিন্দ্য একটুক্ষণ চুপ মেরে থাকে।

একসময় বলে, আসলে জয়াকেও খুব দোষ দেওয়া যায় না। সে তোকে ভালোবাসে, বলা ভালো, ভালোবাসছে। প্রক্রিয়াটা চলছে। বলতে পারিস, প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটাই চলছে।

—মানে?

—মানে, এখন কেবল তোর ভালোগুলোকেই ভালোবাসছে ও। কেবল আলোগুলোকেই। তোর রূপ, পড়াশুনো, আচার-আচরণ, স্মার্টনেস, এবং তৎসহ ভেতরের গুণগুলোকেও। তোর কিছু অন্ধকার দিকও তো রয়েছে, সকলেরই থাকে, কম কিংবা বেশি, জয়া সেগুলো দেখতে পাচ্ছে না, অথবা দেখেও দেখছে না। ক্রমশ, সেসবও তার নজরে পড়বে। ভালোবাসাটা গাঢ় হলে তোর দোষত্রুটিগুলো ইগনোর করতে থাকবে ও, কিংবা শোধরাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই প্রথম ধাপেই সে তোর এমন একটা অন্ধকার দিকের খোঁজ পেয়ে গিয়েছে, অ্যাকোমোডেটই করতে পারছে না।

আমি অসহায় চোখে তাকাই অনিন্দ্যর দিকে। বলি, কিন্তু আমি তো বারবার বলেছি, সে আমার নিজের পিসি।

—হলেই বা। অনিন্দ্য আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, তোর কাছে পিসি হলেও, জয়ার কাছে তো মাসিই সে। জয়ার কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ তুই। তার জীবনটাকেও উল্টেপাল্টে দ্যাখ। ওই বাড়িটাকে নিয়ে তার মনে তো আতঙ্ক সৃষ্টি হবেই। হাজার হোক, জয়া তো আজীবন পোড়খাওয়া এক সাধারণ মেয়ে। যা, বাড়ি যা, রাত হয়েছে।

বাড়ি ফেরার পথে একটা কথাই ভাবছিলাম। মিথ্যে বলেছি জয়াকে। বিলাসীপিসি ওই বাড়িটাতে একলাটি থাকে না। ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান ছাড়াও আরও একজন থাকে ওই বাড়িতে, যাব কথা আমি কিছুতেই বলতে পারিনি জয়াকে।

ওই দিনই গভীর রাতে, বিলাসীপিসি আসে আমার ঘরে।

আমার শিয়রের পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। আমার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়। বিড়বিড করে বলে, তোর মনে আছে শঙ্কর, সেই যে, প্রথম যেদিন তোদের বাড়িতে গেলাম, অতগুলো বাচ্চার ভেতরে থেকে কেমন ঠিক চিনে নিয়েছিলাম তোকে।

বলি, সেটা আমার কাছে আজ অবধি এক বিস্ময়। কেমন করে চিনলে গো পিসি?

বিলাসীপিসি মিষ্টি হাসে। ঘরের আলো-আঁধারিতে তার মুক্তোর মতো দাঁতগুলি ঝিকিয়ে ওঠে বুঝি।

আমি পুনরায় শুধোই, বল না, কী করে চিনলে সেদিন?

বিলাসীপিসি নিঃশব্দে হাসতে থাকে অন্ধকারে। বলে, আচ্ছা, বল্ দেখি, অনেক মেয়ের মধ্যে আমাকে দেখলে চিনতে পারতিস তুই, যে আমিই তোর বিলাসীপিসি?

আমি লজ্জা পেয়ে বলি, বা-রে, কী করে চিনবো? আমি তো তোমাকে তার আগে দেখিইনি।

—আমিও কি তোকে তার আগে দেখেছিলাম? বিলাসীপিসির গলায় কি সামান্য অভিমান? —তবুও তো ঠিক চিনে নিলাম।

বাস্তবিক, বিলাসীপিসি ঘর ছেড়েছিল আমার জন্মের আগে। যেদিন আবার ফিরে এল, তার আগে আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। কেবল নানা জনের মুখে শুনতে শুনতে তাব সম্পর্কে একটা ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে। ওই ছবিটির সাহায্যে বিলাসীপিসিকে চেনা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার।

অনেকের মুখে শুনেছিলাম, আমার দু'পিসির মধ্যে বিলাসীপিসিই নাকি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল।

সেই ছেলেবেলা থেকে বাড়ির বিভিন্ন জনের থেকে শুনতে শুনতে ওকে নিয়ে যে একটা ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বুকের মধ্যে, সেই ছবিতে বিলাসীপিসি ছিল আলো-আঁধারিতে মাখামাখি। একটা রহস্যময় অলৌকিক জগতের বাসিন্দা বলে মনে হত ওকে।

ওকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এবং পাড়াপড়শিদের মধ্যে যেসব আলোচনা চলত, তার অন্তত তিনটি সুস্পষ্ট স্তরবিন্যাস ছিল। আলোচনার প্রথমে আসত তার রূপের প্রসঙ্গ। চাষি পরিবারে এমন রূপ, পানপাতার তুল্য মুখের 'কাটিং', এমন দুধে-আলতায় ফরসা রঙ, বড় একটা নাকি দেখা যায় না। রূপের পাশাপাশি, একেবারে কথার পিঠে কথার মতো, আসত তার দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গ। একেবারে পোকায় কাটা গোলাপটি। বলত গাঁয়ের প্রবীণরা। গ্রহণ-লাগা চাঁদ। এবং সব শেষে আসত তার রুপোর প্রসঙ্গ। বিলাসীপিসির টাকাপয়সা, সোনাদানা এবং সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে নানান কিংবদন্তি চালু ছিল আমাদের গাঁয়ে। ওই নিয়ে নানা জনের মধ্যে তর্কও বেধে যেত প্রায়ই, যদিও আমাদের গাঁয়ের কেউই তার সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য চাক্ষুষ করেনি সে যাবৎ। আমরা ছোট ছিলাম, তাই, শুনেই যেতাম সবকিছু, আর বিলাসীপিসির সম্পর্কে কতই না কল্পনার জাল বুনে চলতাম সারাক্ষণ।

সংরক্ষিত বাগানের মধ্যে গোলাপ ফুলটি ফুটেছে, কিন্তু ইচ্ছে হলেই পথচারীদের তুলে নেবার উপায় নেই, বাইরে থেকে এ-তাকায়, ও-তাকায়, তুলে নিয়ে যাবার কথাটা ভাবে। ফলে, ষোল না পেরোতেই বিলাসীপিসির সম্বন্ধ আসতে থাকে নানান জায়গা থেকে। মেয়ে পছন্দ হয়ে যায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই, কিন্তু দেনাপাওনায় গিয়ে আটকে যায়, কেন কি, মেয়ে সুন্দরী হলে পাত্র তার ফায়দাটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা ভোগ করে বটে, কিন্তু পাত্রের মা-বাপের কোন হিল্লেটা হয়? পাত্রের মা-বাপের কাছে রূপের চেয়ে রুপোর কদর ঢের বেশি। আর, একটু খায়-মাখে গোছের সংসার হলে যা দাবি করে, কনে পক্ষের পিছিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না।

হেনকালে একটি পাত্রের সম্বন্ধ এল, যাদের পেছনে হামলে পড়বার অন্তত দুটো কারণ ছিল বড়দের। এক, পাত্রপক্ষ খড়্গপুর শহরের বাসিন্দা। এবং দুই, মেয়ে পছন্দ হলে পাত্রের কোনও দাবিদাওয়া নেই।

গাঁয়ের মানুষের চিরকালই শহর সম্পর্কে এক ধরনের হ্যাংলামো থাকে। গাঁ-ঘরের ধুলো-কাদার দুনিয়ার তুলনায় শহর তো প্রায় স্বর্গের সমান। পাকা বাড়ি, পিচ রাস্তা, বিজলিবাতি, দু'হাত অন্তর দোকানপসার, সিনেমার হল, বাস-রেল, রিকশা, সেজেগুজে সারাক্ষণ কেমন পটের বিবি হয়ে থাকে শহরের চকচকে মেয়েরা, কেমন আহ্লাদি ভাষায় কথা বলে। সব মিলিয়ে শহরের মানুষগুলোকে কেমন যেন অচেনা লাগে, কেমন যেন রহস্য জড়িয়ে থাকে ওদের সারা শরীরে, কল্পলোকের বাসিন্দা বলে মনে হয়।

কাজেই, রাতারাতি পাড়াময় রটে যায়, শহর থেকে সম্বন্ধ এসেছে বিলাসীর, হেঁজিপেঁজি শহর নয়, খোদ খড়্কপুর থেকে। গোলবাজারে বিরাট ব্যবসা পাত্রের বাপের।

হামলে পড়বার দ্বিতীয় কারণটিও মোটেই ফেলনা নয়। পাত্রপক্ষের কোনো দাবিদাওয়া নেই। ফলে, প্রথম কারণের সোনাটির সঙ্গে দ্বিতীয় কারণের সোহাগাটি মিশিয়ে যে অভিনব গয়নাটি গড়িয়ে পরিয়ে দেওয়া হল বিলাসীপিসির গলায়, দু'দিন না যেতেই তা ফাঁস হয়ে টেঁসে গেল।

কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর থেকেই সবাই খেপাতে শুরু করে বিলাসীকে।

বলে, কী লো বিলাসী, এখনও মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতিছু তুই? দু'দিন বাদে শহরের বাসিন্দা হবি, কুঁচি দিয়া শাড়ি পরিয়া, মুখে পাউডার-সোনো মাখিয়া, পায়ে জুতা পরিয়া মসমস করিয়া হাঁটিয়া বুলবি, তখন কি আর আমাদের কথা মনে রইবে তোর? তখন হালুম-হুলুম ভাষায় 'এলুম-গেলুম' করে কথা কইবি, শহরিয়া বরের হাত ধরিয়া সিনিমা দেখতে যাবি, চিয়ার-টেবিলে বুসিয়া ভাত খাবি...।

বিলাসী জবাব দেয় না, কেবল মিটিমিটি হাসে। কেবল বাসমতী চালের সুগন্ধি ভাতের মধ্যে একটি মাত্তর কাঁকরদানা, পাত্রটি দোজবর। তবে, শুধু নামেই দোজবর, বিয়ের পর নাকি দু'মাসও ঘর করেনি সে মেয়ে। কী এক গণ্ডগোল বাঁধল, বউ চলে গেল বাপের ঘর, আর ফিরে আসেনি।

ঠিক তখনই নাকি আমার বাবা কথাটা তুলেছিলেন।

বলেছিলেন, কী লিয়া আগের বউয়ের সাথে মন কষাকষি, সেটা খোঁজখবর লিয়া দেখা উচিত।

বড়পিসি, তার ভালো নাম সুহাসিনী, ডাক নাম সুহাসী, ততদিনে স্বামীর ঘর খুইয়ে বিধবার বেশে ফিরে এসেছে আমাদের বাড়িতে। কিছুদিনের মধ্যেই নিজ প্রতিভাবলে বাপ-ভাইয়ের সংসারটার ষোলোআনা কর্তৃত্ব নিয়ে ফেলেছে নিজের হাতে। ততদিনে সর্ববিষয়ে তার বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। অন্যদিকে, আমার বাবা, সোজাসরল মনের, কারোর সাতেপাঁচে না থাকা মানুষটির ছিঁটেফোঁটা ওজন নেই সংসারে। তার ওপর, আমার মাকে নিয়ে পুরো সংসারে সর্বক্ষণ তাঁর মাথা-হেঁট অবস্থা। কেন কী, মা সংসারে প্রবেশ করবার অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ঘটনায় পুরো সংসারের এমনকি পুরো পাড়ার মানুষের মধ্যে এটা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে সে, এ সংসারের মেজো বউটি ডাহা অপয়া। কাজেই, এমন অলুক্ষণে মেয়েমানুষের স্বামী হিসেবে বাবা সারাক্ষণ হেঁটমস্তক হয়ে থাকেন। তাঁর মনে সর্বদাই খরগোশের পারা ভয়, তাঁর বিয়ে করা বউটি কুনজর দিয়ে আবার সংসারের কোনো অপূরণীয় ক্ষতিটি করে বসে! ধীরে ধীরে তাঁর নিজস্ব কবিরাজিতে ডুবে যাচ্ছিলেন বাবা, যদিও তাই নিয়েও চারপাশের মানুষজনের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অন্ত ছিল না।

তবুও বাবা নাকি কথাটা বলেছিলেন। একবার নয়, বারবার। বলেছিলেন, পাত্রের প্রথম বউটার খোঁজখবর নেওয়া দরকার। বাবার কথা কানেও তোলেনি কেউ। উপহাস করে বাতিল করে দিয়েছে প্রস্তাবটা।

পরে, বড় হয়ে, বিভিন্ন কারণে আমার মনে হয়েছে, পাছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কোনো সাপ বেরিয়ে পড়ে, যাতে করে এমন দাবি-দাওয়াহীন, শহুরে, সোনার সম্বন্ধটা ভেস্তে যায়, এমন আশঙ্কায় দাদু গিয়েছিলেন পিছিয়ে। ততদিনে তাঁর বয়স হয়েছে ঢের, শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থা, প্রতিমুহূর্তে নাকি ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছেন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পাছে অনূঢ়া মেয়েটিকে দেখতে দেখতেই তাঁকে পাড়ি দিতে হয় ওপারের উদ্দেশে, এই আশঙ্কায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকতেন দাদু।

বড় হয়ে নানা কারণে আমার এও মনে হয়েছে, বড়পিসি বিয়েব আগেই পেয়ে গিয়েছিল বিলাসীপিসির সতীনের হালহদিশ। পরবর্তীকালে সেটা খুব নিশ্চিতভাবে জেনেছি আমি শিখাবউদির মুখে। আর যা হোক, শিখাবউদি মিথ্যে কথা বলে না। কিন্তু এমন সর্বনাশা খবরটা আগাম জানা সত্ত্বেও বড়পিসি কেন যে তা লুকিয়ে রেখেছিল, কেন যে প্রায় জবরদস্তি, বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে ওখানেই বিয়ের ব্যবস্থা করল বিলাসীপিসির, তা এখনও অবধি আমার বুদ্ধির অগম্য।

সে যাই হোক, বেশ ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল বিলাসীপিসির। শহুরে বরপক্ষের সম্মানে জমিদার বাড়ির থেকে হাতে পায়ে ধরে সামিয়ানা আনালেন দাদু, তুলনায় তিনগুণ বেশি হ্যাজাকেব ব্যবস্থা করলেন, আর, আমাদের মতো চাষিবাড়ির বিয়ের ভোজে যেখানে মোটা চালেব ভাতেব সঙ্গে মুগের ডাল, মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট, ছাঁচড়া, মাছের ঝোল এবং চাটনির পরে শেষ পাতে ঘরে পাতা সাজো দইয়ের বন্দোবস্তই থাকে চিরকাল, বিলাসীপিসির বিয়েতে, সেই প্রথম, রান্না হল সাদাভাতের পাশাপাশি, পোলাও এবং বরযাত্রীদের জন্য খাসির মাংস এবং নির্মল ধাওয়ার বিখ্যাত রসগোল্লা। কেন কী, শহরিয়া মানুষ ওরা, গাঁয়ের চিরাচরিত ভোজ খেয়ে যদি নাক সেঁটকায়? যদি পরে মেয়েটাকে ওই নিয়ে কথা শোনায়?

গোলাপ ফুল আঁকা টিনের বাক্সে নতুন শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ এবং সস্তা স্নো-পাউডার, প্রসাধন সামগ্রী ভরে নিয়ে বিলাসীপিসি চলে গেল শহুরে বরের হাত ধরে। সারা পাড়ার বউডি-ঝিউড়ি, বুড়ি-থুড়িরা হাউমাউ করে কাঁদল, এবং বর-বউ গাঁ ছাড়বার পর আমাদেব উঠোনে ছড়িয়ে বসে বরের উঁচু দাঁত, বরপক্ষের অসভ্যতা, ভোজের কালে পরিবেশনের ত্রুটি ইত্যাদি নিয়ে অনেকক্ষণ গবেষণা করল।

এমন শুভ মুহূর্তে মা তো কখনোই সর্বসমক্ষে বেরোত না, কোথায় যে কোন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ত মালুমই পেত না কেউ। কনে বিদায়ের কালে বাবাও নাকি বেরোননি তাঁর ওষুধঘরেব থেকে। পরে, বড়পিসি, বাবার এমন গা ঢাকা দেবার কারণ বিশ্লেষণ করেছিল এভাবেই যে, দাদু, বড়পিসি আর জেঠু মিলে বিলাসীপিসির এমন ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়াতে তাদের যে অত নাম হল, সেটাই নাকি বাবার ঈর্ষার কারণ। বড়পিসি স্পষ্টই উচ্চারণ করেছিল কথাটা। ঈর্ষায় জ্বলতিছে রতিকান্ত। নিজের তো একআনা মুরোদ নাই—। অন্য কেউ মুরোদ দেখালে সেটাই সহ্য হয় না।

বিলাসীপিসি সেই যে গেল, আর কোনওদিনও বাপের ভিটেতে ফিরে আসেনি।

জ্ঞান হওয়া অবধি আমরা কেবল শুনেছি, আমাদের আরও একটা পিসি ছিল, বিয়েব পর সে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। খুব ছেলেবেলায় আমরা ওই নিয়ে প্রশ্ন করা মাত্তর তৈরি জবাব পেয়েছি প্রত্যেকের কাছে, সে শ্বশুরবাড়ি গেছে বাপ। তো, সে কি আর ফিরবেনি? আমরা তাকে দেখতে পাবোনি? তো ম্রিয়মান স্বরে বড়রা বলে, ফিরবে বাপ, তার ঘর-সংসারে কত কাজ, সময় হইলেই আসবে সে।

এক সময়, বয়স যত বেড়েছে, বোধবুদ্ধি অল্প-অল্প হয়েছে, বুঝেছি, বিলাসীপিসি আর কোনওদিনও ফিরবে না। পাড়ার বয়স্ক মহিলারা, দিদ্‌মা-ঠাক্‌মারা, মস্করার ভঙ্গিতে বলেছে, ছোটপিসিকে দেখবি? চলিয়া যা, ভানু দাসের যাত্রার দলে, ওই দলে খেমটা নাচ নাচে উ। বলে, দেখবি যদি চলিয়া যা, কইলক্যাতার কালিঘাটে। তোর পিসি সিখনে শিব-শক্তি খেলে রোজ।

মস্করাটা কিছুতেই পাকতে দিত না বড়পিসি। মাঝপথেই ঝাঁঝিয়ে উঠত প্রবীণাদের ওপর, কি না, বাচ্চা ছেলেকে এসব আগডুম-বাগডুম কথা বলে কেউ?

বড়পিসিকে পাড়ার সকলেই খুব ভয়ভক্তি করত। সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঁটত কুলুপ। কিন্তু প্রতিবারেই, কয়েকটা মাত্র বাক্য দিয়ে, আমার কচি মনের মধ্যে একটা রহস্যময় ছবি এঁকে দিত ওরা। সেই রহস্যটা, পুরো বাল্যকাল জুড়ে বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল, যা একটু একটু করে ভেঙে দিয়েছিল শিখাবউদি। আমাদের পাড়ার বল্লভদার বউ সে, চোখেমুখে শহুরে মেয়ে। পাড়ার কাউকেই, এমন কি বড়পিসিকেও সেই অর্থে ভয় পেত না সে।

কিন্তু শিখাবউদি প্রথম দিন তেমন খোলসা করে কিছু বলেনি। কেবল বলেছিল, বরের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে, না বুঝে একটা মরণ-কুয়ায় পড়ে গিয়েছে তোর বিলাসীপিসি। আর উঠতে পারেনি।

—পিসে ওকে তুলল না? আমি অবাক হয়ে শুধোই।

আমার দিকে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শিখাবউদি। এক সময় গলায় খুব বিদ্বেষ ফুটিয়ে বলেছিল, তুলবে কি, ওই তো ফেলে দিয়েছিল তোর বিলাসীপিসিকে, মরণ-কুয়ায়।

শিখাবউদি কখনোই বড় একটা রহস্য মাখানো কথা বলতে পছন্দ করত না। সব সময় চাঁছোছোলা কথাগুলি মুখের ওপর বলে দিত বলে সে ছিল পাড়ার অনেকের কাছেই অপ্রিয়। কেবল বিলাসীপিসির বেলায় সে যা বলেছিল, তিলমাত্র বোধগম্য হয়নি আমার।

আসলে, আমিও তো তখন ছোট ছিলাম খুব। আট-ন বছরের বেশি বয়েস নয়। ওই বয়েসে কুয়ো অবশ্য দেখেছি আমাদের গাঁয়েই, কিন্তু মরণ-কুয়া বলতে ঠিক কোন জাতের কুয়ো, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই ছিল না আমার। অনেক পরে খড়গপুরের গিরি ময়দানে সার্কাস দেখতে গিয়ে, সার্কাসের মধ্যেই দেখেছিলাম একটা মরণ-কুয়া, তার দেওয়াল বেয়ে বেয়ে মোটর-বাইকে পাক খাচ্ছিল দু'জন যণ্ডা মতো লোক। দেখতে দেখতে ভেবেছিলাম, এমনই একটি মরণ-কুয়ায় পড়েই কি আর উঠতে পারেনি বিলাসীপিসি?

এখন ভাবলে হাসি পায়, কত ছেলেমানুষই না ছিলাম তখন!

অনিন্দ্যর বাসা থেকে মদ্যপ অবস্থায় ফিরে আসার পর ওই গভীর রাতে, আলো-আঁধারি পরিবেশে বিলাসীপিসি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে খুব নরম গলায় বলে, জয়ার ওপর রাগ করিসনে তুই। ও ছেলেমানুষ, জীবনের কতটুকুই বা চেনে?

—তুমি জয়াকে চেন?

—চিনবো না কেন? তোর হবু বউ, তাকে আমি চিনবো না? জয়াকে তুই বুঝিয়ে বলিস, নইলে আমার কাছে একটিবার নিয়ে আয়, আমিই ওকে বুঝিয়ে বলব।

সে-রাতে আর আমার শিয়রে বেশিক্ষণ থাকেনি বিলাসীপিসি। অন্ধকারেই এক সময় মিলিয়ে গেল তার মুখ। মাথার চুল থেকে হারিয়ে গেল বিলি কাটবার অনুভূতি।

পরের দিন আমি যখন বিলাসীপিসিকে বললাম, কাল রাতে তুমি গিয়েছিলে আমার কাছে? আমার চুলে অনেকক্ষণ বিলি কেটেছিলে? বিলাসীপিসি সস্নেহে হেসে বলল, দূর পাগল! তারপর খুব আত্মস্থ গলায় বলল, একদিন যাব তোর বাসাতে। সেদিন জয়াকেও ডাকিস।



খুব ছেলেবেলায় বিলাসীপিসি সম্পর্কে ওই রহস্যময় কথাটি বলেছিল শিখাবউদি। বিলাসীপিসিকে নাকি একটা মরণকুয়ায় ফেলে দিয়েছিল ওর বরই। ততদিনে আমিও ওর ক্ষুদে ভক্তদের একজন। শিখাবউদির কথার মর্মার্থ বুঝতে পারিনি সেদিন। বুঝেছিলাম অনেক পরে। কিন্তু সারা শিশুকাল জুড়ে ওই পাতাল-কুয়োটিকে দেখেছি স্বপ্নে-জাগরণে, দেখেছি তার গভীর তলদেশের আলো-আঁধারিতে একজোড়া ভয়ার্ত মিনতি মাখানো চোখ সাহায্যের আশায় ব্যাকুল। বড় হলে পর, কুয়োটা সম্পর্কে একটা বাস্তবানুগ ধারণা তৈরি হল

মনে। তারও কিছুদিন বাদে ছোটকাকার হাত ধরে গিয়ে কুয়োটাকে প্রত্যক্ষ করলাম আমি।

বিলাসী পিসির স্বামী যে মদ্যপ আর তুখোড় জুয়াড়ি ছিল বিয়ের আগে একটু-আধটু খোঁজখবর নিলেই জানতে পারা যেত সেটা। খোঁজখবর নিলে আরও জানা যেত যে, তার প্রথম পক্ষের বউটি বাপের বাড়িতে তো থাকেই না, কনের বেশে সেই যে ছেড়েছিল বাপের ঘর, আর জীবনেও সেমুখো হয়নি। এমন কি এও জানা কিছু অসম্ভব ছিল না যে, বিলাসীপিসির স্বামীদের কস্মিনকালেও কোনও দোকান ছিল না খড়গপুরের গোলবাজারে। আসলে, সৎমার সংসারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বড় হচ্ছিল বিলাসীপিসির সতীন। যখন বিয়ের বয়েস হল, সৎ মা-ই উদ্যোগ নিয়ে হীরালালের কাছে বেচে দেয় ওকে। মানুষ তো আর গরু-ছাগল নয় যে হাটে নিয়ে গিয়ে দরদাম করে নগদমূল্যে তাকে বিক্রি করা হবে?

প্রথম পক্ষের বিয়েতে হীরালাল পণ বাবদ তো একটা পয়সাও নেয়নি। বরং সৎশাশুড়ির হাতে বিয়ের খরচ-খরচা বাবদ ধরে দিয়েছিল কিছু টাকা। আপদ বিদেয়ও হবে, কিছু অর্থাগমও হবে, এমনটি ভেবেই সম্ভবত সৎমা রাতারাতি সৎমেয়েকে সাত পাকে ঘুরিয়ে দেয় হীরালালের সঙ্গে। কিন্তু কনের বেশে বাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েটি শ্বশুরের ভিটেতেও নাকি পা রাখেনি পলকের তরে। হীরালাল নাকি ওকে নিয়ে এমন কোথাও 'ঘর বাঁধতে' চলে যায়, যেখান থেকে মেয়েটি আর কখনোই ফিরে আসেনি।

হীরালাল অবশ্য হাত-পা ঝাড়া হয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল ক'দিনের মধ্যেই, এবং পরবর্তী মাসটাক তার মদ খাওয়া আর জুয়া খেলার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। আর তাতে করেই পড়শিরা নিশ্চিতভাবে বুঝে গিয়েছিল, যে-কোনো সূত্র থেকে কিছু কাঁচা পয়সার আমদানি হয়েছে হীরালালের পকেটে।

হীরালালের প্রথম পক্ষের বেলায় না হয়, সৎমা বলেই, এমন বেঘোবে বেচে দিতে পেরেছিল মেয়েটাকে। কিন্তু বিলাসীপিসির বেলায় তো সে কথা খাটে না। তাব বাবা-মা, পাঁচ-পাঁচটা ভাই, বুদ্ধিতে কৌশলে ভাইয়েরও বাড়া এক দিদি, তাও কেন এমন একটা লোকের গলায় বেঁধে দেওয়া হল বিলাসীপিসিকে, অনেকদিন যাবৎ সে প্রশ্নের জবাব পাইনি আমি। কেবলই কি শহরের পাত্র হিসেবে হীরালাল সবাইয়ের এমনই ঝলসে দিল চোখ, চারপাশেব আর কিছুই দেখতে পেল না কেউই! এমনকি বাবা যখন বারংবার খোঁজখবর নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন, সে আর্জিতে সাড়া দিতে সবুর সয়নি কারও, পাছে দেরি করলে বেহাত হয়ে যায় এমন সোনার টুকরো পাত্র, সুবর্ণ সুযোগটি মাঠে মারা যায়।

এমনটা সত্যি সত্যিই ঘটে থাকলে হয়ত বা কিছু বলার ছিল না, কিন্তু শিখাবউদির থেকে নিশ্চিতভাবেই জেনেছি আমি, সংসারের কেউ কেউ, অন্তত পক্ষে বড়পিসি আর ন'কাকা জানত সবকিছুই। এমনকি বিলাসীপিসির সতীন যে তার বাপের ঘরে নেই, সে যে বিয়ের পরপরই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে, তাও। নিজের দাদা এবং দিদি হয়েও কেন যে তারা তাদের সহোদরাকে তুলে দিল এমন একটি মানুষের হাতে, তার নিশ্চিত কোনও জবাব এখনও অবধি পাইনি আমি। তবে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য কিছু জবাব মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। সে প্রসঙ্গ পরে।

ন'কাকাকে আমি বড় একটা দোষ দিতে পারিনে, কারণ সে সময়টাতে বড়পিসিই ছিল আমাদের সংসারের সর্বেসর্বা। জেঠা-কাকাদের মধ্যে সবেচেয়ে বড় ছিল সে-ই। মাত্র তিন মাসের মধ্যে বরটি মরে যাওয়ায় সে ফিরে এসেছিল আমাদের সংসারে। তার চতুর বুদ্ধি এবং ছলা-কৌশলের কোনো ইয়ত্তা ছিল না। তার ওপর সব মেয়েরাই যা চায়, একটা সংসারকে নিজের মুঠোর মধ্যে ভরে রাখতে, বড়পিসির ওই ইচ্ছেটা ছিল বড়ই আগ্রাসী। সেই কারণেই অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের পুরো সংসারটা বড়পিসির হাতের মুঠোয় চলে যায়। আমার দাদু-দিদিমা তো তখন আকাট বৃদ্ধ, কন্যার শোকে মুহ্যমান। বড়পিসি হরেক কৌশলে একটু একটু করে বশ করে ফেলে জেঠু ও কাকাদেরও। আর, আমার বাবাকে বশ করবার কোনও প্রয়োজনই হয়নি, কারণ, সংসারের কারোর কাছেই কোনওদিনও তিনি ধর্তব্যের মধ্যে ছিলেন না। চিরকালই তিনি ছিলেন একজন সংসার-উদাসীন, আকাশবিহারী মানুষ। এখন আমি বুঝি, কেবল

বড়পিসির ইচ্ছেতেই বিলাসীপিসিকে হাড়িকাঠে মাথা দিতে হয়েছিল।

সতীনের মতোই হাল হয়েছিল বিলাসীপিসিরও। তবে, বাপের বাড়ি থেকে প্রথমে শ্বশুর বাড়িতেই উঠেছিল বিলাসীপিসি।

বরের সাজটি গা থেকে নামিয়েই পরের দিন কোথায় যেন চলে গেল হীরালাল। ফিরল একদিন বাদে। তারপর গঙ্গায় স্নান আর কালিঘাটে পুজো দেওয়ার নাম করে বিলাসীপিসিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল কলকাতায়, তখন অষ্টমঙ্গলাও পেরোয়নি।

দিন সাতেক বাদে ঝোড়ো কাকের বেশে ফিরে এসেছিল হীরালাল। মদে চুর হয়ে ফিরেছিল সে। কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে বলেছিল, কালিঘাটে মাকালীর মন্দিরের সামনে, ঠাসবুনোট ভিড়ের মধ্যে, বিলাসী যে কোথায় হারিয়ে গেল, সাতদিন নাগাড়ে খুঁজেও এবং 'ওরে বিলাসী, কোথা হারালি, ফিরে আয়, তুই বিহনে আমি জীবন বিতাবো কেমন করে' বলে চিৎকার করে কেঁদেকেটেও বিলাসীর দেখা পায়নি।

আমাদের বাড়িতে খবরটা আসা মাত্রই দাদু-ঠাকুমা পাথরের মতো জমে গিয়েছিল, আর বড়পিসি উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে চিল-কান্না জুড়েছিল এবং যে আবাগীর ব্যাটা তার বিলাসীর এহেন সর্বনাশটা করল, অপরিসীম দুর্গতি সহকারে মৃত্যু কামনা করেছিল তার।

শুধু এইটুকুই করেই বসে থাকেনি বড়পিসি। চারপাশের যত জ্যোতিষ-গণৎকার রয়েছে সবাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিল জেঠুকে। তারা কেউ বলেছিল, বিলাসীপিসি উত্তর দিকের র-অক্ষরযুক্ত একটা গাঁয়ে রয়েছে। স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে তার। অদ্দুর থেকে 'স্মৃতিবাণ' মারতে পারলে স্মৃতিটা ফিরে আসবেই। আর স্মৃতি ফিরে আসা মাত্রই নিজের পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসবে বিলাসীপিসি।

স্মৃতিবাণ মারার খরচ কম নয়, তাও বড়পিসি বাপ-ভাইকে ধমকে-চমকে, 'টাকা বড়, না মানুষ বড়'র যুক্তিতে কাৎ করে সেই খরচটা করিয়েছিল। আমাদের উঠোনে বসে পাক্কা তিনদিন নাকি অনেক তন্ত্রমন্ত্র সহযোগে স্মৃতিবাণ মেরেছিল বাছুরখোঁয়াড়ের গুণিন। কিন্তু বিলাসীপিসি আর ফিরে আসেনি। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় গুণিন নাকি বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, যে বাণ আমি মেরেছি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, স্মৃতি তার ফিরবেই। নচেৎ তন্ত্রমন্ত্র মিছা, ঠাকুর-দ্যাবতা মিছা। তবে, স্মৃতি ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও সে মেয়া যদি ছিনারি করে না ফিরিয়া আসে, তাতে গুণিনের দোষটা কুথা?

কুঁকড়াখুপির গণৎকার অনেক খড়ি পেতে বলেছিল, সে মেয়া আর ফিরবেক নাই। তার আশা ছেইড়ে দাও তুমরা। কেন কি, ম-অক্ষরধারী একজনার সাথে সে সংসার পেতেছে দক্ষিণ দিকে ক-অক্ষরওয়ালা একটা জা'গায়। বিয়ার আগে উই ছগরার সাথ ভাব ছিল উয়ার।

সন্ধিপুর এবং তার আশেপাশের সবগুলি ক'অক্ষর যুক্ত গাঁয়ের সবক'টা ম-অক্ষরধারী ছোকরার তালিকা মনে মনে বানিয়ে নিয়ে তার ভেতর থেকে অনেক গবেষণা করে একটি নাম সাব্যস্ত করেছিল বড়পিসি, কেন কী, সে ছোকরা ভারি অকারণে এবং খুব সন্দেহজনকভাবে আসা-যাওয়া করত আমাদের পাড়ায়, অথচ তাব নাকি কোনও আত্মীয়-কুটুমই ছিল না এই পাড়াতে। তবুও কেন যে সে মাঝে মাঝে ঘুরঘুর করত, এবার নাকি সেটা মালুম হচ্ছে বড়পিসির। এমনকি বিলাসীপিসির প্রতি তার কিছু কিছু আচরণ, যা তখন দেখে কিছুই মনে হয়নি 'সরলমনা' বড়পিসির, এতদিনে মালুম হচ্ছে, বড় নিরামিষ আর নির্দোষ ছিল না সেইসব আচরণ। যদি বল, এখন অত সব মনে হচ্ছে, তখন বুঝতে পারনি কেন? তার জবাবে বলতে হয়, ওই যে, কথায় বলে, চোর পালালেই বুদ্ধি বাড়ে।

এই মতে নানান জনের থেকে নানান সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর 'কত দিকে তো কত কিছুই কল্লাম, কিছোই তো বাদ রাখলামনি, তা সত্ত্বেও যদি সে ফিরিয়া না আসে তো কপালকে দোষ দিবা ছাড়া আর গতি কি মানুষের' বলে ক্ষ্যান্ত দিল বড়পিসি।

একটু একটু করে বিলাসীপিসির মুখখানা ঝাপসা হতে লাগল সকলের চোখে, এক সময় বুঝি বাড়ির সকলেরই স্মৃতি থেকে পুরোপুরিই হারিয়ে গেল বিলাসীপিসি।

কেবল জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমি মাঝে মাঝে বাবাকে দেখেছি, বিলাসীপিসির জন্য একান্তে

হা-হুতাশ করতে। বিশেষ করে বাড়িতে কোনও উৎসব বাধলে, ওই ক'টা দিন কেমন যেন মুষড়ে থাকতেন বাবা। পারলে বাড়ি ছেড়ে চলেই যেতেন কোথাও।

পরবর্তীকালে আমি দেখেছি, কালিঘাটের মন্দির চত্বর থেকে আচমকা হারিয়ে গিয়ে শেষ অবধি বিলাসীপিসির কী গতি হতে পারে, সে ব্যাপারে পাড়ার প্রবীণাদের একটা সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছিল। বিশেষ করে যারা ছিল বড়পিসির খুব কাছের মানুষ, তারা তো ষোলো আনাই বিশ্বাস করত যে, হীরালালই তার প্রথম বউটার মতো বিলাসীকেও বেচে দিয়েছে কলকাতার কোনো অন্ধকার পল্লীতে। হারিয়ে যাওয়ার গল্পটা স্রেফ বানানো। কারণ, ততদিনে হীরালাল সম্পর্কে অনেক খবর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে আমাদের গাঁয়ে।

কে কেন তখন বয়ে এনেছিল ওইসব খবর, কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল তা, কেনই বা খবরগুলো বিলাসীপিসির বিয়ের আগে জোগাড় করা গেল না, ওই বয়েসে তার অন্ধিসন্ধি বুঝিনি আমি। তা বাদে, ওই খবরগুলো চর্চা করবার কালে এমন গোপনীয়তা রক্ষা করা হত, আমাদের কান অবধি পৌঁছত না সেসব। কারণ, বড়পিসির কাছের মানুষ ছিল যারা, পাড়ার সেই প্রবীণার দল, বড়পিসিকে মনে মনে এতটাই ভয় পেত যে, এব্যাপারে অন্যের কাছে মুখ খুলতে সাহস পেত না একতিলও। কিন্তু শিখাবউদি দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে, যেমন করে কানের ভেতর থেকে অতি সাবধানে ময়লা বের করে আনে মানুষ, ঠিক তেমনই ধৈর্য আর অধ্যবসায় নিয়ে প্রবীণাদের পেট থেকে বের করেছিল যাবতীয় গুহ্য কথা, যা তারা বড়পিসির সঙ্গে হরিহর আত্মা হওয়ার সুবাদে দেখেছিল, শুনেছিল এবং বুঝেছিল। প্রতিবারেই এক কিস্তি কথা উগরে দিয়ে তারা শিখাবউদির দু'হাত চেপে অনুনয় জানাত, কাকপক্ষীকেও যেন বলিসনি মা, সুহাসী তেবে আর রক্ষা দিবেনি।

ওদের সেই গোপন বিশ্বাসটি যে কতখানি খাঁটি, সেটা বোঝা গেল বহুদিন বাদে, যেদিন আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়াল খোদ কলকাতার থেকে আমদানি ষণ্ডা মতো এক মানুষ।

দাদু ততদিনে মারা গিয়েছে। লোকটি একখানা চিঠি ধরিয়ে দিল জেঠুর হাতে। এবং চিঠিখানা পড়তে পড়তে জেঠুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল, শরতের ভোরবেলায় ঘাসের ডগায় ডগায় যেমন জমে থাকে শিশিরকণা। তাঁর রগের দু'ধার শক্ত হয়ে এল, আর কপালের মাঝ বরাবর রক্তবাহী শিরাটি ফুলে উঠতে উঠতে চিতি সাপের আকার নিল।

লোকটাকে আর এক মুহূর্তও উঠোনে থাকতে দেয়নি জেঠু।

ও চলে যাওয়ার পর বড়পিসি জেঠুর মুখে কোনও কিছু শোনার আগেই গোময়ের জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিল জায়গাটা।

আমরা তখন নিতান্তই ছোট। ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ি। আমাদের কাছে পুরোটাই ধোঁয়াশা তখনও অবধি। গোময় ছিটিয়ে উঠোন ধোয়ার কারণটা তিলমাত্র বোধগম্য হয়নি আমার। আমরা দেখেছি, ফি-শীতকালে বাঁকে করে খেজুরের রস নিয়ে আসত রহমত কাকা। বাড়ির সবাই রোদ্দুর পোহাতে পোহাতে জুত করে খেত খেজুরের খাঁটি রস। কিন্তু রহমত কাকা চলে গেলেই বড়পিসি জায়গাটা গোময়ের জল ঢেলে নিকিয়ে দিত। কাজেই, পুরনো অভিজ্ঞতার খেই ধরেই আমি বুঝে নিলাম, কলকাতা থেকে আগন্তুক লোকটা যে-কোনও কারণেই হোক, অস্পৃশ্য, বড়পিসির ভাষায়; মেলেচ্ছ।

কলকাতা থেকে ওই লোকটা আসার পর থেকেই আমাদের বাড়ির পরিবেশটা যেন আচমকা থমথমে হয়ে উঠল।

বড়রা সব ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল যখন-তখন, আর, তাদের চোখে-মুখে সারাক্ষণ ঘনিয়ে রইল শ্রাবণের জামপাকা মেঘ। মোহরদি, জেঠুর বড় মেয়ে, আমাদের সবাইয়ের মধ্যে বড় সে, যত

না বয়েসে, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিপক্কতায়। বড়দের মতো তারও মুখ হয়ে রইল থমথমে, গম্ভীর, আর, আমরা ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই সটান ধমকে দিচ্ছিল, সবসময় বড়দের কথায় থাকা কেন? ছোট, ছোটর মতই থাক। বলার ধরনেই সে নিজেকেও বড়দের তালিকাভুক্ত করে ফেলত, যদিও তখনও অবধি ফ্রক পরে সে।

কিন্তু কথাটা আর শেষ অবধি চাপা রইল না। এবং বাড়ির কারোর থেকে নয়, শিখাবউদির মুখ থেকেই একদিন কথাটা শুনলাম আমি। আমাকে দেখামাত্তর শিখাবউদি চোখ নাচিয়ে বলল, এই শঙ্কর, তোর বিলাসীপিসির খবর এসেছে যে।

শুনে আমি একেবারে হামলে পড়ি শিখাবউদির কাছে। বিলাসীপিসিকে নিয়ে আমার প্রশ্নমালা যেন আর ফুরোতে চায় না কিছুতেই। কিন্তু লক্ষ করি, অন্য সব ব্যাপারে সারাক্ষণ কলকলিয়ে কথা বললেও এব্যাপারে শিখাবউদি বড়ই সাবধানী। মুখ খুলতে চায় না কিছুতেই।

বহু সাধ্যসাধনা করে তার মুখ থেকে যেটুকু টুকরো-টাকরা খবর বের করা গেল, তাকে একত্র করলে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়ায় যে, বিলাসীপিসি বেঁচে রয়েছে, কলকাতায় বহাল তবিয়তে আছে সে, রাজরানীর মতো ঐশ্বর্য তার এবং সে একটিবার বাপের ভিটেয় আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। কিন্তু ওই সুদূর কলকাতায় কেমন করে গেল বিলাসীপিসি, কোন যাদুতেই বা বহাল তবিয়তে রয়েছে, রাজার ঐশ্বর্য পেলই বা কোত্থেকে, এতদিন আসেইনি বা কেন, যদি আসারই ইচ্ছে, তো চলেই বা আসছে না কেন, লোক পাঠিয়ে অনুমতি নেবারই বা দরকার কী—এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না শিখাবউদির থেকে।

ততদিনে বিলাসীপিসির খবরটা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছে সারা গাঁয়ে। ওকে নিয়ে সোরগোল উঠেছে সর্বত্র। আর, সেই সুবাদে গজাননের মুখ থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে পাওয়া গেল এমন কিছু তথ্য, যা শোনা অবধি বিলাসীপিসির সম্পর্কে যতখানি উৎসাহ তৈরি হয়েছিল মনে, কর্পূরের মতো উবে গেল।

গজানন একদিন দন্ত ছিরকুটি হেসে বলল, তোর বেবুশ্যা পিসি কবে আসবে রে, শঙ্কর?

আর, কথাটা শোনামাত্তর আমার বুকের কচি পাঁজরগুলো নিঃশব্দে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হতে থাকে। আচমকা গজাননের ওপরই চণ্ডাল-রাগ চড়ে যায়। সপাটে তাড়া করি ওকে। কী বললি, আমার পিসি বেবুশ্যা?

আমার রুদ্রমূর্তি দেখে গজানন ছুটে পালায়।

কিন্তু গজাননকে তাড়া করে লাভ কি? সারা গ্রাম জুড়ে তখন মুখে মুখে ঘুরছে, বিলাসীপিসিকে নিয়ে নানান মুখরোচক কথা। তার পতিতাবৃত্তি গ্রহণ, জীবনযাপন প্রণালী, সব কিছু নিয়ে হাজারো রসের কথা তৈরি হচ্ছে নিত্যিদিন। ডালপালা গজাচ্ছে সেসব কথার, পোচের পর পোচ রঙ চড়াচ্ছে রসিক জন, জোড়ায় জোড়ায় পাখনা গজাচ্ছে কাহিনীর শরীরে, উড়ে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে, ঝুপঝুপ করে বসে পড়ছে চারপাশের গাঁ-গঞ্জের গাছে-গাছে, ডিম পাড়ছে, তা দিয়ে দিয়ে বাচ্চা ফোটাচ্ছে, এক কাহিনি থেকে ডজনে ডজনে উপকাহিনি। তার ঐশ্বর্যের পরিমাণ নিয়ে গবেষণা চলছে অষ্টপ্রহর, মুখে মুখে সেই পরিমাণ বাড়ছে তো বাড়ছেই। সে নাকি গায়ে সারাক্ষণ পরে থাকে পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না। তার দু'কানের পাশা-ঝুমকোর ওজন বাড়তে বাড়তে এতখানি হয়, বাস্তবে তা কানে পরলে কান ছিঁড়ে যেতে বাধ্য। কৌতূহলী মানুষজনের দু'চোখ কপালে উঠে যায় বিস্ময়ে, বাস্তবিক, বড়ি বেচিয়া অত টাকা হয়? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকে তাদের কাছে, যারা কালেভদ্রে মামলা-মোকর্দ্দমা বা অন্য কোনও প্রয়োজনে মেদিনীপুর সদরে গিয়ে এক-আধটা রাত কাটালে, মুখ বদলাবার জন্য হাড়কাটা গলিতে যায়-টায়, ফলে এই লাইনের রেট-ফেট জানে-টানে। আড়ালে-আবডালে একেবারে নিজেদের মধ্যে সেই অবিশ্বাসটুকু প্রকাশ করে তারা, কি না, হলই বা সে কলকাতা শহর, মফস্বলের চাইতে সব চিজেরই দাম বেশি, তা বলে অত? কিন্তু প্রকাশ্যে ওই নিয়ে কোনও 'চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিতে পারে না ওরা, কেন কি, তাহলে তো হাটের মধ্যিখানে নিজেদের হাঁড়িটাই ভাঙবে।

সব মিলিয়ে বিলাসীপিসির অমন অতুল ঐশ্বর্যের উৎসটি রহস্যের আড়ালে ঢাকা থাকে বহুদিন,

অন্তত আমার কাছে তা বোধগম্য হয়েছিল অনেক পরে।

শিখাবউদিকে কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি কোনওদিনই। সে কেবল গাল পাড়ছিল হীরালাল নামক অমানুষটিকে যে কিনা ফুলের মতো মেয়েটিকে তার কচি যৌবনে বেচে দিয়েছিল কলকাতার কোন্ এঁদো গলির মাসির কাছে। হীরালালের কথা বলতে বলতে তার দু'চোখে ফুটে উঠেছিল দেবী সিংহবাহিনীর রোষ। বারংবার বলছিল, একটিবার যদি সামনে পাই ওকে, সবার সামনে জুতোপেটা করব।

আমার জেঠা-কাকাদের প্রতিও ওই নিয়ে কম রোষ ওগরায়নি শিখাবউদি। বলে, আর তোর জেঠা-কাকাগুলোও মেনিমুখো, ঘুষি মেরে শয়তানটার নাক ভেঙে দিল না কেন? ওদের জায়গায় পল্টুদা হলে হীরালালকে আজীবনকাল বগলে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হত।

শুনতে শুনতে আমার কচি বুকের মধ্যে বারংবার টংকার ওঠে। শিখাবউদির ওই বহুকথিত রহস্যময় পল্টুদাটিকে স্বচক্ষে দেখবার সাধ জাগে মনে।

আজ আর আমার কোনোই সন্দেহ নেই, বড়পিসি জেনেশুনেই বিলাসীপিসিকে তুলে দিয়েছিল হীরালালের খপ্পরে। জেঠা-কাকাদেরও নানাপ্রকারে প্রভাবিত করেছিল ও-ই। কিন্তু নিজের দিদি হয়েও বিলাসীপিসির কেন অতখানি সর্বনাশ করেছিল সে, আমার কাছে আজও পুরোপুরি স্পষ্ট নয় তা।

বড়পিসির সঙ্গে বিলাসীপিসির বয়সের ফাবাক ছিল পাক্কা দশ বছর। কিন্তু উঠতি মুলোর যেমন পত্তনেই চেনা যায়, সেই ছেলেবেলা থেকেই বিলাসীপিসির রূপ যেন ফুটে বেরোতে থাকে। সে তুলনায় বড়পিসির রূপ বলতে প্রায় একেবারেই ছিল না। তবুও মাত্র যোল বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় বড়পিসির। অতি সাধারণ ঘরেই বিয়ে হয় তাব। এবং মাত্র তিন মাস বাদে স্বামীটি আচমকা মরে যায়। সিঁথির সিঁদুর মুছে চিরকালের তরে বাপের সংসারে ফিরে আসে বড়পিসি।

এদিকে, দিনদিন যতই বয়েস বাড়ছিল, বিলাসীপিসির রূপ যেন শত পাপড়ি মেলে খুলছিল তার শরীর জুড়ে। যখন যোল বছর বয়েস হল, তাকানো যেত না ওর দিকে। তার সম্ভাব্য বর সম্পর্কে খুব উচ্চ আশা পোষণ করত কেবল জেঠা-কাকারাই নয়, পাড়ার মানুষজনও। পাড়াব প্রবীণরা প্রায়ই খেপাত বিলাসীপিসিকে, যা হচ্ছু দিনদিন, দ্যাখ, কোনওদিন এক রাজপুত্তুর আইসিয়া সটান খাড়া হবে দুয়ারে।

পড়শিদের এসব কথা শুনলেই নাকি গম্ভীর হয়ে যেত বড়পিসি। ওই থেকেই কী সে তবে তিলতিল সংগ্রহ করেছিল নিদারুণ ঈর্ষার কোনো বীজ, যা বুকের মধ্যে পুঁতে অবিরাম সার জল দেবার সুবাদে ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে উঠেছিল সংগোপনে।

যদি বুকের মধ্যে তেমন কোনও বীজ সত্যি সত্যিই পুঁতে থাকে বড়পিসি, তো তাতে সম্ভবত সার-জল দিয়েছিল বিলাসীপিসিও। যখন বিলাসীপিসি যোল বছর পেরোল, ওর বিয়ের কথা সবে ভাবতে শুরু করেছে সবাই, প্রস্তাব সবে আসতে শুরু করেছে চারদিক থেকে, আচমকা বড়পিসিকে আবার বিয়ে দেবার প্রসঙ্গটা নতুন করে উঠল। বড়পিসির তখন ছাব্বিশ।

প্রসঙ্গটা একদিন প্রথম তুলেছিলেন বাণীবিনোদ-কাকা। আমার সেজো কাকার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুরেশ্বর চক্রবর্তীর মতো রক্ষণশীল পরিবারে জন্মেও তিনি ছিলেন আশ্চর্য এক মুক্ত মনের মানুষ।

একদিন আমাদের বাড়িতে এসে বড়পিসিকে দেখতে দেখতে তিনিই তুলেছিলেন কথাটা। সতীকান্তদা, একটা কথা বলতেছি তোমাকে, সুহাসিনীর আবাব বিয়ে দাও। এইভাবে কাটিবে নাকি ওর সারাটা জীবন?

বাণীকাকার কথাটা আমাদের পুরো সংসারটাকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

জেঠু বলেছিল, তাই আবার হয় নাকি?

বাণীকাকা বলেছিল, কেন হয় না? দিনকাল বদলিয়া গেছে। এখন শহর এলাকায় মেয়েদের এর

চাইতে বেশি বয়েসেও বিয়ে হচ্ছে।

সেদিন এবং তারপরেও জেঠু-কাকাদের হরেক প্রকারে বুঝিয়েছিলেন বাণীকাকা। এবং বড়পিসিকে জিজ্ঞেস করায় সে কেবল এক কথাতেই রাজি হয়নি, এমন আশায় আশায় তাকিয়েছিল সবাইয়ের দিকে!

ফলে, নতুন করে তোড়জোড় শুরু হয়। বড়পিসির জন্য পাত্র খোঁজা চলতে থাকে জোর কদমে। আমাদের গাঁয়ের রাসবিহারী দাস, নতুন ঘরের 'বন্ধ' দেয়। কেউ নতুন বাড়ি বানাতে চাইলেই ডাক পড়ে তার। ভিটের ওপর দড়ি ফেলে মাপজোক দিয়ে 'বন্ধ' দিয়ে চলে যায় সে। বাড়ি ওঠে সেই অনুসারে। এছাড়া ঘটকালিতেও সে সিদ্ধহস্ত। আমাদের তল্লাটে ঘটক হিসেবে খুব নামডাক তার। কাজেই, তার ওপরেই বড়পিসির বর খোঁজার ভার পড়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর রাসবিহারীদাদুকে দেখেছি আমি। খুব বুঁদ হয়ে মাপজোক করছে ভিটের ওপর। বাড়ির সদর কোনদিকে হবে, কোনদিকে খিড়কি, কোথায় হবে জানালা, দরজা, কোথায় থাকবে যম দুয়ার, সব কিছু—খুঁটি পুঁতে পুঁতে নির্দিষ্ট করে দিত সে।

আমরা অবোধ শিশুর দল ঘুর ঘুর করতে থাকি আশেপাশে। সাহসে ভর করে শুধোই, যম দুয়ার ক্যানে দাদু?

রাসবিহারীদাদু মিষ্টি হাসত, বা-রে, লচেৎ যম আনাগোনা করবে কোন পথে?

—যমের আনাগোনার দরকার কি?

—বা-রে, যম আনাগোনা না করলে মৃত্যু হবেনি যে। আর মৃত্যু যদি না হয়, মানুষে মানুষে ভরিয়া যাবে দুনিয়া। সৃষ্টি তো মাইন্‌ষের চাপেই লোপ পায়াবে।

কিন্তু রাসবিহারীদাদুর ঘটকালি বুদ্ধিও ফেল মেরেছিল। হাজার চেষ্টা করেও সে পাত্র জোটাতে পারেনি বড়পিসির জন্য।

অনেকদিন বাদে, আমি তখন কলেজে পড়ি, রাসবিহারীদাদু আক্ষেপ করে বলেছিল আমায়, জুটিয়া যাইত তোর বড়পিসির বর, কিন্তু বিলাসীটাই সব মাটি করিয়া দিল। অর তরেই তোর বড়পিসিটার বিয়াঘর হইতে পারলনি কিছোতেই।

রাসবিহারীদাদুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। বড়পিসির বিয়ে না হওয়ার অন্য অনেক কারণ চালু রয়েছে আমাদের পাড়াতে। কিন্তু এই প্রথম একজন কেউ বিলাসীপিসিকে দায়ী করল এজন্য।

আমার সীমাহীন বিস্ময়ের জবাবে সেদিন রাসবিহারীদাদু খুব ধীরলয়ে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছিল ব্যাপারটা।

বড়পিসির জন্য প্রায় হাফ-ডজন পাত্র এনেছিল রাসবিহারীদাদু। তাদের মধ্যে প্রথমটি তো দেখেশুনে খুব খুশিখুশি ভাব করে ফিরে গেল। এবং যখন খেয়ে আঁচানোর কালে পাত্রের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিল বিলাসীপিসি, হবু শালিকা বিবেচনায় তার সঙ্গে হেসে হেসে সামান্য মস্করাও করল। কিন্তু হপ্তাটাক বাদে রাসবিহারীদাদু নিয়ে এল এমন এক সংবাদ, গোটা বাড়ির সবাইয়ের মুখ গেল শুকিয়ে। পাত্রের ভীষণভাবে কনে পছন্দ হয়েছে, তবে সুহাসিনীকে নয়, বিলাসিনীকে। কনেপক্ষ রাজি থাকলে বিলাসিনীকে সে বিনা পণ-যৌতুকেই বিয়ে করতে রাজি।

দ্বিতীয় পাত্রটিকে আনবার কালে রাসবিহারীদাদুই শলা দিয়েছিল, পাত্রের সুমুখে বিলাসীকে বের করা চলবে না। ওই একটা দিনের জন্য কোথাও সরিয়ে দিতে হবে ওকে। ফলে, পরবর্তী পাঁচটি পাত্রের বেলায়ই বিলাসীপিসির চলল অজ্ঞাতবাস। যেদিন পাত্রটি আসবে, সকাল থেকেই তাকে বাড়ি ছাড়তে হত, লুকিয়ে থাকতে হত পড়শিদের বাড়িতে, যতক্ষণ না পাত্রপক্ষ ফিরে যায়।

এই লুকিয়ে থাকাটাকে আগাগোড়া খুব উপভোগ করছিল বিলাসীপিসি। ব্যাপারটাতে ভারী আমোদ পাচ্ছিল মনে মনে। সমবয়েসি সইয়েরা যদি বলত, আজ যাই রে বিলাসী, কাল বিকেলে আসিস আমাদের বাড়িতে, তো, বিলাসীপিসি যারপর নাই নাচারভাব ফুটিয়ে বলত. কাল তো যাবার উপায়

নেই সই, কাল যে আমাকে দিনভর লুকিয়া রইতে হবে।

—ক্যানে? সইয়েরা অবাক হয়ে শুধোয়।

—বা-রে, কাল দিদিকে দেখতে আসবে যে। বলতে বলতে বিলাসীপিসির মুখপটে হয়ত বা ফুটে উঠত যুগপৎ নিজের রূপ নিয়ে গুমোর, এবং অন্যের উপকারার্থে নিঃশর্ত ক্লেশস্বীকারের যাবতীয় শ্লাঘা।

খুব অসহায় মুখ করে বিলাসীপিসি বলত, কী করব বল, পুড়ার-মুখাগুলা আমাকে দেখলে যে দিদিকে কিছুতেই পসন্দ কচ্ছেনি।

কিন্তু কথাগুলো বলতে গিয়ে বিলাসীপিসির মুখমণ্ডলে নাকি এমনই উজ্জ্বল আভা জমত যে, সই-গঙ্গাজলরা অবধি বলে উঠত, আ মরণ, দেমাক যেন ফাটিয়া বারাচ্ছে মেয়ার। সে কথায় বিলাসীপিসি নাকি সারা মুখে যারপর নাই নাচার ভাব ফুটিয়ে বলত, দেমাক দেখতিছু তোরা? দিনভর লুকিয়া রইতে যে কী কষ্ট, যে বুঝে, সে বুঝে।

পরবর্তী পাঁচটি পাত্রের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। এবং প্রতিবারেই বড়পিসি নির্ঘাৎ নিঃশব্দে লক্ষ করে থাকবে, ওর স্বার্থে লুকিয়ে থাকাটাকে ভেতরে ভেতরে কতখানি উপভোগ করছে বিলাসীপিসি। এ যেন তার কাছে এক মজাদার খেলা। রাসবিহারীদাদু একটি পাত্রের খোঁজ নিয়ে হাজির হলেই, বিলাসীপিসি হাই তুলে, সারা শরীরের আড় ভেঙে মন্তব্য করেছে, তার মানে, আমাকে আবার দিনভর লুকিয়া রইতে হবে। বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে।

শেষ অবধি বড়পিসিকে পছন্দ করেনি কেউই। কেউ কেউ আবার বড়পিসিকে দেখেটেখে পরমুহূর্তেই জানতে চেয়েছে, আরও একটি পাত্রী আছে নাকি এই বাড়িতে? কোথায় সে?

জেঠা-কাকারা মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে, আগাম খবরাখবর নিয়েই এসেছে ওরা।

জেঠু খুব গদগদ গলায় জবাব দিয়েছে, না, না, সে তো খুবই ছোট, বিয়ের বয়েসই হয়নি।

মুখ ভার করে ফিরে গেছে পাত্রপক্ষ।

শেষ অবধি আর দ্বিতীয়বারের জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়নি বড়পিসিকে। কিন্তু দেখাশোনার কালে তাকে যে প্রতিবারেই ছোট বোনের করুণা যাঞ্চা করতে হয়েছে, সেই কথাটা বুঝি কিছুতেই ভুলতে পারেনি সে। হয়ত ওই নিয়ে প্রতিবারেই একটা হীনভাব জেগে থাকবে বড়পিসির মনে। আর, কারও কাছে কোনও কারণে হীন হলে বা নতি স্বীকার করলে মনের মধ্যে এক ধরনের গ্লানি তো তৈরি হয়ই। গ্লানি থেকে চাপা বিদ্বেষ। সেই গ্লানিজাত বিদ্বেষ কি বড়পিসি দীর্ঘকাল পোষণ করত মনের মধ্যে? এতদিন বাদে কেমন জানি মনে হয়, সেই অপমান আর বিদ্বেষ কি এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল বড়পিসির মনে, যার ফলে বিলাসীপিসির ওপর এমনিভাবেই শোধ তুলেছিল সে? জেনেশুনেই তুলে দিয়েছিল এমন এক শয়তানের হাতে, যে কিনা বিলাসীপিসিকে নিশ্চিতভাবে ফেলে দেবে মরণকুয়ার অতলে!

সারাজীবন ধরে বড়পিসিকে তিলতিল যতটুকু চিনেছি, কারুর থেকে পাওয়া সামান্যতম অপমানেরও শোধ নিতে সে কসুর করেনি। কেবলমাত্র তার গঙ্গাজলের বোনের সঙ্গে বাবার বিয়ে না দিয়ে ঠাকুমা যে অন্য ঘর থেকে বেছে এনেছিলেন মাকে, সেই অপমানের শোধ মায়ের ওপর সারাজীবন ধরে নিয়েছে বড়পিসি। আমার মায়ের ঈর্ষণীয় রূপও তাকে পদে পদে অপমানিত করেছিল নির্ঘাৎ, যার জন্য মাকে সে একদিনের তরেও স্বস্তিতে বাঁচতে দেয়নি।

বিলাসীপিসির রহস্যে ঢাকা জীবনটা সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলাম আমি।

কিছুটা ঠারে-ঠোরে স্বয়ং বিলাসীপিসির মুখ থেকে, কিছুটা তার খাস দারোয়ান বিষেণ সিংয়ের মুখ থেকে। বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। যেকোনও কারণেই হোক আমাকে খুব পছন্দ করত সে। বিষেণ সিংয়ের একটি মন্তব্য থেকেই কারণটা অনুমান করতে পেরেছিলাম আমি! বলেছিল, খোকাবাবু, আপকো পিতাজী আচ্ছা আদমি থে। বহুৎ দিলওয়ালে ইনসান থে।

—তুমি কী করে জানলে? আমি অবাক হয়ে শুধোই।

—মালকিন্‌নে হি বোলি থি।

জানি, শুনেছি। সারা বাড়িতে কেবল বাবাই সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, যাতে বিলাসীপিসিকে ওর হাতে তুলে দেবার আগে হীরালালের তত্ত্বতালাশ ভালো মতো নেওয়া হয়। কিন্তু বাবার কথায় কান দেয়নি কেউই। বাবার কথার কোনও মূল্যই ছিল না সংসারে। কিন্তু বিলাসীপিসি যে আজীবনকাল কথাটা স্মরণে রেখেছে, কৃতজ্ঞতায় দ্রব হয়েছে, এটাই খুব ভালো লেগেছিল আমার।

বিষেণ সিং আর বিলাসীপিসির মুখ থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে স্পষ্ট-অস্পষ্ট যা-যা শুনেছিলাম, তার মর্মার্থটা হল এইরকম। বিয়ে করবার ক'দিন বাদেই হীরালাল বিলাসীপিসিকে কলকাতায় নিয়ে যায় কালিঘাটের মন্দিরে পুজো দেবার অছিলায়। সেখানেই হাতবদল হয়ে যায় বিলাসীপিসি। আগে থেকে কথাবার্তা পাকা করে রেখে গিয়েছিল হীরালাল, যাওয়া মাত্তর বিলাসীপিসিকে কিনে নেয় এক পশ্চিমা কাঠের আড়তদার। সে ওকে কিছুদিন ভোগটোগ করে বেচে দেয় এক পতিতাপল্লীর মাসির কাছে। তারপর সাত ঘাটের জল খেতে খেতে, বহু শরীরের খিদে মেটাতে মেটাতে বিলাসীপিসি পাকাপাকি এক মনিব পাকড়ায়। নাম তার কিষণলাল। রাজস্থান মুলুকের মানুষ সে। কলকাতায় একাধিক রমরমা ব্যবসা ছিল তার। দোতলা-তিনতলা বাড়ি ছিল অনেকগুলি। মুলুকে থাকত বউ-বাচ্চা। কিষণলাল একাই থাকত কলকাতায়। ব্যবসাপাতি সামলানোব বাইরে সে ছিল পুরোপুরি নিঃসঙ্গ। ভারী আজব জাতের মানুষ ছিল কিষণলাল। কোনও নিদারুণ দাগা পেয়ে সে তার মুলুককে, মুলুকেব সবাইকে, সবকিছুকে ভুলতে চেয়েছিল। বিলাসীপিসিও বোধ করি তার সবটা জানে না পুরোপুরি।

বিলাসীপিসিকে পেয়ে সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে চায় মানুষটা। বারভোগ্যা জীবন থেকে সরে এসে বিলাসীপিসি একটু একটু করে কিষণলালের সব সময়ের রক্ষিতা বনে যায়। আর, কিষণলালও, অথৈ সাগরে খড়কুটো পেলে যেমন তাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় মানুষ, বিলাসীপিসিকে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে। তার প্রেমে মজতে মজতে নিজের মুলুকের সবাইকে, সবকিছুকে ভুলে যেতে চায়। মুলুকের সঙ্গে সমস্ত রকমের যোগাযোগই ছিন্ন করে দেয় সে। বিলাসীপিসিও, তখন সে একেবারে দুরন্ত যুবতী, একটু একটু করে একেবারে বশ করে ফেলে কিষণলালকে।

কিষণলালের সঙ্গে বিলাসীপিসির বয়সের ফারাক ছিল অনেকখানি। ফলে, বিলাসীপিসি যখন যৌবনের মধ্যাহ্ন গগনে, কিষণলাল তখন অস্ত যাওয়ার মুখে। কিষাণলালের শেষ জীবনে, কেবল দেহদান করেই ক্ষান্ত থাকেনি বিলাসীপিসি, একেবারে বিয়ে করা বউয়ের মতো সেবা যত্ন করেছে কিষণলালের, কিংবা তার চেয়েও বেশি। বিষেণ সিং আমার কাছে সাতকাহণ করে বলেছে সে বৃত্তান্ত, বহুবার। বলেছে, মাইজি বিলকুল সতী-সাবিত্রীর পারা...।

শেষ জীবনে কিষণলাল তার বিপুল বৈভব উইল করে দিয়ে যায় বিলাসীপিসিকে। তার কিছুদিন বাদেই মারা যায় সে। এই দুনিয়ায় সবদিক থেকে মার খাওয়া অভাগিনী মেয়েটি তার মধ্য জীবনে পৌঁছে আচমকা বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে বসে।

বিলাসীপিসিব সম্পত্তি লাভের গল্প আমার মুখে শুনতে শুনতে শিখাবউদির চোখের কোণা চিকচিকিয়ে ওঠে।

বিড়বিড় করে বলে, সবই কপাল ভাই. তোমার আমার কিছুই করবার নেই। কেউ বা একেবারেই পর এমন মানুষের থেকে স্বামীর অধিক সোহাগ-দরদ পেল, কেউ বা বিয়ে করা স্বামীর কাছেই ঠকে ভূত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উদাহরণটা যে কাকে নিয়ে, জানতে বাকি থাকে না আমার। শিখাবউদি নিজের সম্পর্কেই বলেছে কথাগুলো। কারণ, ততদিনে শিখাবউদিকে ছেড়ে অন্যত্র সংসার পেতেছে বল্লভদা। শ্বশুর-শাশুড়ি মরে গিয়েছে ততদিনে। শিখাবউদি একমাত্র ছেলে বাবুনকে নিয়ে হাবুডুবু খেয়ে যুঝে চলেছে এই অকরুণ সংসার সমুদ্রে।

বিষেণ সিংয়ের মতোই,কেন জানি, সব শুনেটুনে আমারও মনে হয়েছে, বিলাসীপিসির ভেতরে একটা শুদ্ধ মানুষের বসবাস, কেবল ধুলোয় পড়ে, গাছপাকা আমের মতো. খোসাটাই নোংরা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু জয়া তা মানতে নারাজ।

অনিন্দ্য বলে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জয়া বিচার করছে পুরো ব্যাপারটা। যে কোনও কারণেই হোক একটা ভয় জমেছে ওর মনে। ঘৃণাও। ভালো করে বোঝাতে হবে ওকে। ভয়টা ভাঙিয়ে দিতে হবে। জয়ার ওপর অভিমান না করে, তাকে পদে পদে ভুল না বুঝে, সেই চেষ্টাটা বরং কর তুই।

জয়ার সঙ্গে এমনিতে আমার বোঝাবুঝি ভালোই। তাকে আমি আমার জীবনের প্রায় সব কথাই বলেছি। বিশেষ করে আমার মায়ের কথা। বিয়ের কনে হিসেবে ঘরে পা রাখার দিন কয়েকের মধ্যেই বড়পিসির চক্রান্তে কেমন করে 'অপয়া' আখ্যা পেল আমার মা, কেমন করে অপবাদটা ওকে তাড়িয়ে বেড়াল সারাটা জীবন, কেমন করে এ দুনিয়ার সমস্ত শুভকাজে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেল, একটা অপমানিত হীন জীবন নিয়ে সারাটা জীবন কেমন করে ইঁদুরের মতো লুকিয়ে রইল মা, এবং ধীরে ধীরে তার নিজের মধ্যেই কেমন করে এমন বিশ্বাসটা দানা বাঁধল ক্রমে ক্রমে যে, সে সত্যি সত্যিই অপয়া... ।—এ সবই আমি একটু একটু করে বলেছি জয়াকে। সে এও জানে যে, ন'কাকার শালা, অর্থাৎ বারীন মামার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল জেঠুর মেয়ে, অর্থাৎ আমাদের মোহরদি। আর, ওই 'কুকর্মের' দায়টা বারীন মামার ঘাড়ে পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়ে, স্রেফ মোহরদিসহ গুচ্ছাত বংশের মূর্তিমান কাঁটাটিকে তুলে ফেলতেই কেমন করে খাবার জলে বিষ মিশিয়ে, বারীনমামাকে খুন করে, বড়পিসি আর জেঠিমা ওই খুনের যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিল আমার মায়ের ওপর। যার ফলে যাবজ্জীবন জেল হল তার, দীর্ঘকাল একটা নিরপরাধ মানুষকে কাটাতে হল লোহার গরাদের অন্তরালে।

বি-এ পাশ করবার পর আমি যে পুনরায় আইনের ক্লাশে ভর্তি হলাম, আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করলাম, তার কারণও জয়া বিলক্ষণ জানে। মাকে যে অসহায় অবিচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি বলে আজীবনকাল আমি তুষের আগুন হয়ে পুড়ছি, সেই কারণেই আইনজীবী হিসেবে এদেশের অসহায়, নিরুপায় মেয়েদের পাশে দাঁড়াবার যে শপথ নিয়েছি, জয়া তাকে মনে মনে সম্মান করে। তবুও আমার ওই চিৎপুরের তিনতলা বাড়িতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'জনের সম্পর্কে যে ঝড় উঠল, তার জন্য হয়ত বা জয়াকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, প্রথমত, জয়াকে বিলাসীপিসি সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবৎ কিছুই বলিনি আমি। তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিলমাত্র ওয়াকিবহাল ছিল না জয়া। বলিনি, তার কারণ, আমার মনে হয়েছিল, বিলাসীপিসি সম্পর্কে সব কিছু জানার পর জয়া যদি বিলাসীপিসি সম্পর্কে মনের মধ্যেকার সম্ভাব্য ঘৃণাটুকু লুকিয়ে রাখতে না পারে, তো সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। কারণ, শুধু আমার নিজের পিসি বলেই নয়, আকৈশোর ওকে দেখতে দেখতে, বুঝতে বুঝতে, আমার বুকের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, বিলাসীপিসি নেহাতই এক চরম দুর্ভাগ্যের শিকার।

বিলাসীপিসি সম্পর্কে জয়াকে আগাগোড়া অন্ধকারে রাখবার অন্য একটা কারণও ছিল। অনিন্দ্যর মাধ্যমে জয়ার সঙ্গে আমার আলাপ। জয়ার জীবনের নাড়িনক্ষত্র সবই অনিন্দ্যর জানা, এবং সেটা কিছু সুখকর কাহিনি নয়। জয়ার বাবা ছিল মদ্যপ এবং জুয়াড়ি। বিয়ের পরে, এমন কি যখন জয়ারা বড়

হয়ে গিয়েছে, সে বেপাড়ায় যাতায়াত করত নিয়মিত। খুব ভালো একটা চাকরি করত জয়ার বাবা। কিন্তু মদ, জুয়া ও মেয়েছেলেতে মাইনের বারোআনাই খরচ করত সে। ফলে, জয়াদের বাল্যকাল কেটেছে নিতান্ত অভাবে—অনটনে। শেষের দিকে আর বাড়িই ফিরত না জয়ার বাবা। ওইসব মেয়েদের একজনকে নিয়েই থাকত কোথায় যেন। ওকেই নাকি বিয়ে করেছিল, কিংবা করেনি, কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা হয়েছিল ওদের নতুন সংসারে, আর জয়ারা তিন বোন, এক ভাই, মাকে নিয়ে পড়ে রইল ওদের পুরনো সংসারে। তখন আয় নেই, উপায় নেই, দু'বেলা খাওয়া জোটে না, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও বুঝি শিউরে ওঠে জয়া।

অনিন্দ্য সে সময়টায় দেবদূতের মতো দাঁড়িয়েছিল ওদের পাশে। সে ছিল অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। মাঝেমাঝেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত জয়াদের দিকে। ধীরে ধীরে বড়দিটার বিয়ে দিল চেষ্টা চরিত্র করে, আর মেজদিটার সঙ্গে তো অনিন্দ্যর নিজেরই বোঝাপড়া ছিল। সে-ই একদিন আমাকে নিয়ে যায় জয়াদের বাড়িতে। এবং প্রথম দিন জয়ার মাকে দেখামাত্তর চমকে উঠেছিলাম আমি। দুঃখী দুঃখী মুখ, বিধ্বস্ত চাউনি, একদা-সুন্দরী শরীরে সীমাহীন দারিদ্রের ছোপ, চোখের কোলে কালি, চোখ দুটি যেন সর্বদাই ছলোছলো, এক্কেবারে আমার মায়ের মতো। যেন হুবহু একই প্রক্রিয়ার শিকার।

ধীরে ধীরে কবে যেন ওদের সংসারে জড়িয়ে গেলাম আমি। জয়াও কবে কবে যেন কাছাকাছি চলে এল আমার।

জয়া কিন্তু খুবই ভালো মেয়ে। আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। বিশ্বাসও করে খুবই। কিন্তু ওই একটা প্রশ্নে সে যেন একেবারে আপোসহীন। তাই নিয়ে যখন প্রায় রোজদিনই আহত হচ্ছি আমি, অনিন্দ্য আমাকে বোঝাতে থাকে। বলে, জয়ার মনের অবস্থাটাকে বুঝতে হবে তোকে। নিজের বাবাকে কেন্দ্র করে ওর আজীবনকালের যে তিক্ততম অভিজ্ঞতা, তাকে তো সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। আর ঘরপোড়া গরু যেমন রাঙা মেঘ দেখলে ভয় পায়, জয়ার অবস্থা তেমনই। আসলে, তোর বিলাসীপিসি যে জগতের বাসিন্দা, ওই জগৎটা সম্পর্কে তার মনে তৈরি হয়েছে তিল তিল আতঙ্ক ও ঘৃণা।

আমি প্রতিবাদ করে উঠি। মাঝপথে থামিয়ে দিই অনিন্দ্যকে। বলি, বিলাসীপিসি ওই জগতের বাসিন্দা, এটা বিশ্বাস করি না আমি। বাইরের থেকে একইরকম লাগে বটে, কিন্তু আকারে প্রকারে বিলাসীপিসির জীবনটা তো একেবারেই অন্যরকম।

হতে পারে, এককালে নিতান্তই বাধ্য হয়ে, নিজের সাতপাকে ঘোরা স্বামীর ছলনায়, সে ঢুকে পড়েছিল একটা অন্ধকার জগতে, সে তো নিজের থেকে পড়েনি ওই মরণকুয়ায়, তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে প্রাণপণে উঠে আসতে চেয়েছে ওই মরণকুয়া থেকে, একটা সংসার পাততে চেয়েছে ব্যাকুলভাবে, যেমনই ধরন হোক সেই সংসারটার, পেতেছে তো। আর জোড়াতালি দেওয়া একটা সংসার কোনও গতিকে পেয়ে যাওয়া মাত্র সে তো তার বারবিলাসিনী জীবন থেকে সরে এসেছে অনেক দূরে। এখন তো কেবল পুজোআচ্চা নিয়েই থাকে।

অনিন্দ্য খুব দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলে, সেটাই বুঝিয়ে বল্ জয়াকে।

জয়া কিন্তু বুঝতে চায়নি। বিলাসীপিসির সম্পর্কে সব কিছু শোনার পরও তার মুখের একটি রেখাও নরম হয়নি।

বলেছে, না হয় এখন আর তোমার পিসি শতজনের কাছে শরীর বিকোয় না, মাসিগিরিটাও ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সে এখনও অবধি একজনের রক্ষিতা তো বটেই, বারবনিতা আর রক্ষিতায় তফাতটা কি? বলে, আমার বাবাও যে মেয়েটাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘর বাঁধল, বিয়ে তো আর করেনি, রক্ষিতার মতোই রেখেছে মেয়েটাকে, বেশ্যাদের সঙ্গে কোনও তফাত আছে ওর?

বিষেণ সিংয়ের মাধ্যমে পাঠানো চিঠিতে নিজের সম্পর্কে কিছুই লুকোয়নি বিলাসীপিসি। বরং সারা চিঠি জুড়ে বেশ বিতাং করে লিখেছিল তার দুর্ভাগ্যপীড়িত কলুষিত জীবনের সালতামামি।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে মাঝপথেই জেঠুর চোখ মুখ কঠিন হয়ে আসছিল। তারপর বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে সামান্য বাক্য বিনিময় করেই সে তার জ্ঞাতব্য বাকি বিষয়গুলি জেনে যায়।

বিষেণ সিংকে আর মুহূর্তকালও টিকতে দেয়নি জেঠু। সে চলে যাওয়ার পর সারাটা দিন গুম মেরে থাকে। খাওয়া-দাওয়াও করে না ভালো করে। এবং সন্ধের মধ্যেই বাড়ির বড়রা একে একে জেনে ফেলে বিষেণ সিংয়ের পরিচয় এবং আমাদের বাড়িতে তার আচমকা আসা ও চলে যাওয়ার কারণগুলি। কথাগুলো পরের দিন বিকেল অবধি চুইয়ে চুইয়ে মোহরদি অবধি নামে। কিন্তু হাজার পীড়াপীড়িতেও আমাদের কাছ অবধি নামে না আর। এমন কি ছোটকাকা, আমাদের মতো ছোটদের অগতির গতি, মুশকিল আসান, তার মাধ্যমেই আমরা চিরকাল পেয়ে এসেছি এ সংসারের যাবতীয় স্কুপ-নিউজ, পেট-পাতলা বলে সারা সংসারে যার দুর্নাম, সেও অবধি মুখে শক্ত করে কুলুপ এঁটে দেয়।

বিলাসীপিসির কিস্যাটা আমরা অবশেষে শুনতে পাই শিখাবউদির মুখ থেকে, আর, তারপরই তো গজানন উচ্চারণ করে ওই পাঁজর-গুঁড়ো-করে-দেওয়া বাক্যটা, তর ছোট পিসি বেবুশ্যা হয়্যা গেছে।

ততদিনে ঝড় উঠেছে আমাদের সংসারে। বিলাসীপিসি তার 'পোড়ামুখখানি' নিয়ে বাপের ভিটেতে আসতে চাইছে, এমন খবরে বাড়ির প্রতিটি প্রাণীই যারপরনাই আশঙ্কিত, কণ্টকিত।

বড়পিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে বারংবার বলতে থাকে, ডুবিয়া মরতে জল নাই অর? গঙ্গার জল কি শুকিয়া গেছে? পোড়া মুখখান গাঁয়ের মানুষকে না দেখালেই নয়?

জেঠিমা, কাকিমারা, তাদের প্রত্যেকেরই একাধিক করে কন্যারত্ন, শুনতে শুনতে আতঙ্কে, আশঙ্কায় ফ্যাকাসে মেরে যায় ওরা। বলে, ওই মাগী একটিবার গাঁয়ে পা রাখলে, মেয়াগুলার আর বিয়া হবে কোনওদিনও? কোন্ আক্কেলে নিজের মানুষের সাথ অতখানি শত্তুতা করতে চাচ্ছে মাগী?

সেজ কাকিমা কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে জানিয়ে দেয়, যদি সত্যিই আসে পুড়ারমুখি, তো ওই ক'টা দিন মেয়াগুলাকে লিয়া বাপের বাড়ি চলিযাবো আমি।

ন'কাকিমা আরও দু'পা এগিয়ে যায়, আসুক না বেবুশ্যা মাগী, ঝাঁটা মারিয়া বিষ ঝাড়ব।

প্রায় হপ্তাটাক ধরে আমাদের পুরো সংসারটা টানটান হয়ে একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। ঘর-গেরস্থালির চিরকেলে ছন্দটা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায়। অবশেষে জেঠু আর বড়পিসি যখন পুরোপুরি একমত হয় যে, বিলাসীপিসিকে আমাদের ভিটেতে পা রাখবার তিলমাত্র সুযোগ দেওয়া হবে না, তখন বুঝি ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে অন্যদের।

কিন্তু বিলাসীপিসিকে ভুলতে চাইলেও তার অতুল ঐশ্বর্যের কথাটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিল না বড়দের কেউই।

বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে সামান্য দু'চারটে কথা যে সেদিন বলেছিল জেঠু, তাতে সে পেয়ে গিয়েছিল বিলাসীপিসির বিপুল ঐশ্বর্যের মোটামুটি একটা ছবি। ছবিটা কিস্তিতে কিস্তিতে বড়দের সামনে তুলে ধরেছিল জেঠু। আর তাতেই জেঠিমা, বড়পিসি এবং কাকা-কাকিমাদের বুকের মধ্যে নিরন্তর কাঁটা-বিঁধে-থাকা টনটনানি ব্যথা। কাজেই, যখন-তখন প্রসঙ্গটা ওঠে আমাদের বাড়িতে। তখন জেঠু-জেঠিমা, কাকা-কাকিমা'রা যেন সামান্য উদ্দীপ্ত বোধ করে। ঐশ্বর্যের তালিকাটা আওড়াতে আওড়াতে চোখগুলো চকচক করতে থাকে। বাপ্‌রে, অত ঐশ্বর্য ভোগ করবে কেমন করে একটা মাত্তর মেয়েমানুষ। তার ওপর, জেঠুর ধারণা মতো, মেয়েমানুষ, বারো হাত কাপড়েও যে কিনা ল্যাংটা, ধরে রাখতে পারবে তো অতঅত সম্পত্তি? পাঁচ বজ্জাতে না লুটেপুটে খেয়ে নেয়!

এই একটা আশঙ্কাই বুঝি দিনরাত কুরেকুরে খায় জেঠুকে। অতবড় সম্পত্তিটা না শেষ অবধি হাতছাড়া হয়ে যায় বিলাসীর।

ততদিনে বিলাসীপিসি ডাকযোগে খান-দুই চিঠি পাঠিয়েছে জেঠুর নামে। ওই চিঠিতে নিজের

প্রস্তাবটাকে একটুখানি বদলে নিয়েছে সে। আচ্ছা, আমার যাওয়াতে না হয় আপত্তি তোমাদের, কিন্তু তোমরা তো একটিবার আসতে পার, আমার গরিবখানায়। অভাগিনী বোনটাকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে সাধ হয় না তোমাদের? আচ্ছা, না-হয় নাইবা রইলে আমার বাড়িতে, একটা মাত্তর বাড়ি নাকি আমার, একেবারে অন্য বাড়িতে উঠবে তোমরা, একেবারে নির্দোষ সেই বাড়ি। অপবিত্র হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই তাতে।

শোনা মাত্তর বাঘের ঝাপট নিয়েছে জেঠিমা, হ্যাঁ, এই বইসে বেশ্যাপাড়ায় যাও আর কি। ওইটুকুই আর বাকি রয়্যা গেছে তোমার।

কাজেই বিলাসীপিসির চিঠির জবাবই দেয়নি জেঠু। কিন্তু তাই বলে বিলাসীপিসি একেবারেই হারিয়ে যায় না আমাদের সংসার থেকে। বরং সে বড়দের বুকের মধ্যে কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধতে থাকে সারাক্ষণ। বুকের মধ্যে ফিকব্যথাটা দিনদিন বাড়তেই থাকে।

মনে আছে, সেই দিনগুলোতে একদিন ছোটকাকা আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, চল্ শঙ্কর, একদিন কারুকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাই ছোড়দির বাসায়। চিঠিতেই ঠিকানা আছে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঠিক চলিয়াবো। আর, ছোড়দির বাসায় পৌঁছানো মাত্তর কী মজাটাই যে হবে! আমি তো আর ফিরবোইনি।

—মানে? উখেনে থাকিয়া কী করবে তুমি?

—কেন? কলকাতার ক্লাবে খেলব। মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলে।

—আর আমি?

—তুই উখানকার একটা ইস্কুলে ভর্তি হয্যাবি। পড়বি সেখানে। ছোড়দির তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তোর পড়ার খরচ জোগানো তার পাশ নস্যি।

ছোটকাকার সেদিনের কথাগুলো আমার কচি বুকটাকে দুলিয়ে দিয়েছিল খুবই। ক'দিন খুব স্বপ্ন দেখলাম, ছোটকাকার সঙ্গে রেলগাড়িতে চড়ে চলেছি বিলাসীপিসির কাছে।

স্বপ্নটা অবশ্য বাস্তবে রূপ পায়নি। কারণ, ক'দিন বাদেই ছোটকাকা চলে গেল কোন্ এক স্থানীয় টুর্নামেন্টে ম্যাচ খেলতে। হপ্তা-দুই ফিরলই না। আর, এরই মধ্যে ঘটে গেল আরও একটি ঘটনা।



একদিন জেঠু কাউকে কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গেল।

আচমকা কোথায় চলে গেল জেঠু, তাই নিয়ে দিনভর গবেষণা চলার পর সন্ধে নাগাদ কানাঘুসোয় আমাদের কাছে খবর চলে এল, কলকাতা গেছে জেঠু।

কিন্তু সে যে বিলাসীপিসির কাছে গেছে, সেটা বোঝা গেল জেঠু ফিরে আসার পর। অবশ্য সারা সংসারে একমাত্র জেঠিমাই জানত সেটা, কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি কাকপক্ষীর কাছেও।

খবরটি শুনে বাড়ির প্রত্যেকটি বয়স্ক প্রাণী বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল।

জেঠুর দুর্মতি নিয়ে ফিসফাস শুরু হল কাকা-কাকিমাদের মধ্যে। বাড়ির কর্তা হয়ে খোদ বেশ্যাপল্লীতে তিন-তিনটি রাত কাটিয়ে আসার সুবাদে ওদের চোখে জেঠু রাতারাতি পতিত হয়ে গেল। এবং এই খবরটা গাঁয়ের মধ্যে পাঁচকান হলে পুরো পরিবারটি সকলের চোখে কতখানি হীন হয়ে যাবে, সেটা ভেবে সবাই বারংবার শিউরে উঠল।

অবশ্য বড়দের সেই উথলে ওঠা ক্ষোভ ঠাণ্ডা জলের এক ঝাপটায় থিতিয়ে গেল, যখন এও বোঝা গেল যে শুধু হাতে ফেরেনি জেঠু। বিলাসীপিসি ওকে দু'হাত ভরে দিয়েছে। প্রত্যেক ভাইবৌয়ের জন্য একটা করে বিছে হার। বড়পিসির জন্য গরদ। আমাদের প্রত্যেকের জন্য দামিদামি পোশাক, এমন কি রামুদাদার জন্যও ধুতি-ফতুয়া। বিদায়কালে নগদ টাকাও নাকি দিয়েছে ঢের। তার পরিমাণ নিয়ে কাকা-কাকিমাদের মধ্যে ঘোর সংশয় চলতে থাকে আড়ালে, কেন কি, তাদের স্থির বিশ্বাস, যত টাকা দিয়েছে বিলাসীপিসি, জেঠু নাকি ঢের কম বলছে।

আমরা নিতান্তই ছোট, ওসব টাকা-পয়সার পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাইনে, আচমকা অমন দামিদামি পোশাক পেয়ে আহ্লাদে আটখানা আমরা, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি পরে নিয়ে দৌড় মারি স্কুলডাঙার দিকে। বড়পিসির এক ধমকে সিঁটিয়ে যেতে হল। বড় বড় চোখ করে বড়পিসি আমাদের সাবধান করে দিল, পোশাক তো এখন পরাই চলবে না, পোশাকের কথাটাও বলা চলবে না কাউকেই। এমন কি, জেঠু কোথায় গিয়েছিল, সেটাও নয়।

ওদিকে জেঠু কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে চলেছে তাঁর কলকাতা সফরের ধারাবিবরণী, নিখুঁতভাবে এঁকে চলেছে বিলাসীপিসির ঠাটবাট, ঐশ্বর্য, আরামের ডগোমগো ছবি। সে আঁকা আর ফুরোয় না কিছুতেই। শত মুখে বলেও যেন তৃপ্তি পায় না জেঠু। আর, সেসব কথা শুনতে শুনতে রহস্যালোকের বাসিন্দা ওই রহস্যময়ীটিকে নিয়ে আমাদের বুকের মধ্যেও কৌতূহল বেড়ে যায় শতগুণ।

দু'চোখ কপালে তুলে জেঠু বলে, বিলাসী কতটা সুখে রয়েছে তা আমাদের কল্পনারও অতীত। বিশাল তিনতলা বাড়ির পুরোটাতে চাকর-বাকর লিয়া সে একলাই থাকে। বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘণ্টা দারোয়ান মোতায়েন। বাজার-সরকার, রান্নার ঠাকুর ছাড়াও সর্বক্ষণের ঝি রয়েছে তিন-চারটা। তার গা-হাত-পা টিপিয়া দিবার তরেও আলাদা লোক আছে। আর মোটরগাড়ি ছাড়া তো এক পাও হাঁটে না। এছাড়াও আরও তিন-চারতলা বাড়ি রয়েছে তার পাঁচটা। ভাড়াটে বসানো রয়েছে ওসব বাড়িতে।

শুনতে শুনতে ঈর্ষা ছলকে ওঠে জেঠিমা-কাকিমাদের চোখ থেকে। বিলাসীপিসির অপার সুখ-সম্ভোগকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ওরা। ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে ওরা যা-কিছু ঝাল ঝাড়ে যে-যার স্বামীদের ওপর। কিনা, এমন পুরুষের হাত ধরেছে, সারাজীবন খাটতে খাটতে শরীরের হাড়মাস কালি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে স্বামীদের নানা উপায়ে গঞ্জনা দিয়ে, তাদের সীমাহীন অপদার্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে, তাদের পৌরুষকে নানা প্রকারে উপহাস করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন ধরল দ্বিতীয় পথ। তখন, রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করলেও বিলাসীপিসির যে আসল জায়গাতেই খাঁ খাঁ শূন্য, আসল জায়গাতেই যে মরে রয়েছে সে, অনেক উদাহরণ ও উপমা সহযোগে সেটা প্রতিষ্ঠা করে এক ধরনের তৃপ্তি পেতে থাকে ওরা। বলে, কানই নাই যার, সে কিনেছে পাশা-ঝুমকা। পরবে কুথা? আমরা বরং মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে স্বামী-সন্তান লিয়া বেশ আছি। স্বামী সংসার না থাকলে, সে মেয়ার কীসের সুখ! বলাই বাহুল্য, এমন মন্তব্যে বড়পিসির বুকে নিদারুণ দাগা লাগে। তার স্বামীও নেই, সন্তানও নেই, নিজস্ব সংসারও নেই। ওদের কথায় তার বুকের মধ্যে বুঝি নিঃশব্দ দহন শুরু হয়। কাজেই, বাধ্য হয়ে তাকে বিলাসীপিসির পক্ষ নিতে হয়। বলে, হাঁ—মেয়াটা সুখে আছে তো, তাই জন্যেই চোখ টাটাচ্ছে তদের। বলে কিনা, সোনাদানার কুনো দাম নাই। না পেলে তখন আঙুর ফলটি বেজায় টক!

জেঠু বলে চলে। বিলাসীপিসির আদর-আপ্যায়নের লম্বা ফিরিস্তি পেশ করে। জেঠু পৌঁছনো মাত্তর কেমন দু'দিক থেকে পা ধোওয়ার জল নিয়ে ছুটে এল, বিলাসীপিসির নির্দেশে, দু'দুটো চাকর। পা ধুইয়ে নরম তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, ছোলা-নারকোল দিয়ে গাঢ় ডাল, ক্ষীরের খোয়া দিয়ে তৈরি লাড্ডু...।

—থামো। জেঠুর কথার মাঝখানে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে জেঠিমা,—তুমি সেসব খেলে?

—সবটা কি আর খেতে পারি? জেঠু বুঝি গুরুভোজনের ঢেঁকুর তুলতে থাকে,—দশজনার খাবার সেটা।

—বলতিছি, অই মুখপুড়ির হেঁসেলের খাবার খেলে তুমি? গলা দিয়া নাবল?

—না খাওয়ার কী আছে? জেঠু বুঝি অবাক,—বামুন দিয়ে রান্না। বিলাসী হাত লাগায়নি তাতে। তো, যতটা পারলাম খেলাম। তারপর আমাকে লিয়া গেল দোতলার একটা বিশাল ঘরে। মার্বেল পাথরের মেঝে, মধ্যিখানে বিশাল পালঙ্কে পুরু গদির বিছানা। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, একেবারে নৈতন সব। ফরফরিয়া পাখা ঘুরতিছে মাথার উপর। শুআ মাত্তর ঘুমিয়া পড়ছি, যখন ঘুম ভাঙল, কারেন্ট নাই, পাখা বন্ধ। দেখি বিছানার পাশে দাঁড়িয়া একটা চাকর সমানে হাত-পাখা বিছতিছে।

বেশিক্ষণ শোনা যায় না একটা মানুষের অত অত সুখের কথা, বেশিক্ষণ দেখা যায় না অত বাড়-বাড়ন্তের ছবি। কাজেই, অকথা-কুকথা বলে সবাই মিলে থামিয়ে দেয় জেঠুকে। ভাসুরের সুমুখে বলা যায় না, তাই নিজের কুঠরিতে ঢুকে পড়ে নিজের মনে গজ গজ করতে থাকে ন'কাকিমা, কিনা, বডি বেচিয়া পয়সা কল্লে অমন ঢাম দেখাতে সবাই পারে।

নিজেদের মনের মধ্যে বিলাসীপিসির সুখ-বিলাস-ঐশ্বর্যের প্রতি যপেরোনাস্তি ঘৃণা তৈরির উদ্দেশ্যে সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের প্রক্রিয়াই প্রয়োগ করে জেঠিমা-কাকিমারা, কিন্তু বিলাসীপিসির পাঠানো ভারী হারছড়াটিকে সবার চোখ এড়িয়ে একান্তে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেও, দিনে অন্তত একবার।

মাসটাক বাদে আবার একদিন আচমকা কলকাতা চলে যায় জেঠু। এবং দু'হাত ভরে সোনাদানা, টাকা-পয়সা নিয়ে ফিরে আসে।

এবার আর অতখানি শিউরে ওঠেনি বড়পিসি কিংবা কাকা-কাকিমারা। বরং বিলাসীপিসির থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রীগুলিকে নিয়ে শুরু হয় অন্য কিসিমেব গবেষণা। কার জিনিসটা কেমন হল, কারটা কার চেয়ে খাটো, তাই নিয়ে চাপা রেষারেষি শুরু হয় বড়দের মধ্যে। সেই রেষারেষির চোরাস্রোতটি ছোটদের মধ্যেও বইতে থাকে প্রকাশ্যে। মোহরদির জন্য পাঠানো পায়ের তোড়ার ডিজাইন দেখতে দেখতে ন'কাকিমার মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। ন'কাকিমার মেয়ে সবিতার ঝিলিক মারা ফ্রকটিকে দেখতে দেখতে সেজকাকার ছেলে পটল পা ছড়িয়ে কাঁদতে থাকে এবং সেজোকাকিমাকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয় যে বেল্ট বাঁধা যায় না এমন প্যান্টালুন সে কিছুতেই নেবে না। আর, তার জবাবে সেজকাকিমা তাকে এই যুক্তি দিয়ে শান্ত করতে চায় যে, তাদের ফাটা কপালে এইটুকুই যে জুটছে এই নয় কত, কেন কি, কপালের আর এক নাম গোপাল। ফলত, পাঁচ ভাই এবং বড়পিসিকে নিয়ে তৈরি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারটিতে আবহমানকাল ধরে বয়ে চলা হিংসা-ঈর্ষার চোরাস্রোতটি রাতারাতি বেগবান হয়ে ওঠে।

এরপর জেঠু দু'তিন মাস অন্তর যেতে থাকে বিলাসীপিসির কাছে, এবং তার ফলে স্রেফ চাষ করে দিন গুজরান করা পরিবারটির শরীরে সামান্য চেকনাই ফোটে, যা গাঁয়ের মানুষের নজর এড়ায় না। আড়ালে-আবডালে তাই নিয়ে শুরু হয় ফিসফাস, কিনা আঙুলটি ফুলতে ফুলতে কলাগাছ না হোক চারা তো হচ্ছে।

সেটাই যে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা দুষ্কর হে!



একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে জেঠু সকলের সামনে কথাটা পাড়ে।

বলে, বিলাসী তো একটিবার আসার জন্য বড়ই বায়না ধরছে। কী করা যায়?

ইতিমধ্যে যে-কয়েকবার জেঠু গিয়েছে বিলাসীপিসির কাছে, মুঠো মুঠো টাকা এনেছে প্রতিবারেই, সেই সঙ্গে অঢেল সোনাদানা, উপহাব সামগ্রী। সেইসব টাকায় যে গেল একবছরে দু'বিঘা ভারী পয়মন্ত জমি চড়া দামে কিনেছে জেঠুরা, গাঁয়েব মানুষ লক্ষ করে চলেছে তা। তারা তুষের আগুনের পারা নিঃশব্দে পুড়ছে, আবার অভাব-অনটনের বেলায় গোপনে হাত পাতছে জেঠুর কাছে, কেন কি, জমি-টমি কেনাকাটার পর অবশিষ্ট টাকাটা দিয়ে জেঠু শুরু করেছে চোরাগোপ্তা মহাজনী কারবার।

জেঠু বলে, বিলাসীর এই ইচ্ছাটা পূরণ না কল্লেই নয়। হাজার হোক এটা তো তারও বাপের ভিটে। বাপের ভিটেতে আসার অধিকার সবারই আছে।

ততদিনে আমাদের বাড়ির সবগুলি মাছির পা'ই আটকে গিয়েছে গুড়ে। বিলাসী নাম্নী গুড়ের কুঁদোটি যে সবদিক থেকে বিচার করলে তাদেরই প্রাপ্য, এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে জেঠা-কাকারা, জেঠিমা-কাকিমারা। অথচ সেই কুঁদো পড়ে রয়েছে সেই সুদূর কলকাতায়, অরক্ষিত প্রায়, হাজার মাছি ভনভনাচ্ছে কুঁদোর চারপাশে, এমন অবস্থাটা বেশিদিন চলতে দেওয়া চলে না। কুঁদোটাকে

একেবারে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলতে হলে, বিলাসীপিসির এ সংসারে আনাগোনাটা মেনে নিতেই হয়।

কাজেই, সেজকাকা বলে, আসতে চাইছে তো আসুক না, ক্ষতি কি?

ন'কাকা যুক্তি দেখায়, চোখের আড়ালে সে কি করেছে, কে দেখেছে তা? প্রমাণ কি সেসব কাজের? রাজার মাকেও তো আড়ালে ডাইন্ বলে অনেকেই। সেসব কথার মূল্য কি?

বড়পিসি বলে, তাবাদে, যারা অপবাদ দিচ্ছে তারা কুন সাউদ্‌টি? ঘোমটার আড়ালে কে যে কতখানি খেমটা লাচ লাচছে, জানতে বাকি নাই আমার।

শুনতে শুনতে বড়দের মনটা ওই বয়েসেই আরশির মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। বিশেষ করে কাকা-কাকিমা ও বড়পিসি-র মনোগত বাসনাটা খুবই পড়তে পারছিলাম ওই বয়েসেও। সোনার খনিটি পড়ে রয়েছে সেই কোন্ সুদূর কলকাতায়, নাগালের একেবারেই বাইরে, গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষ ওরা, একা একা ওই অতবড় কলকাতা শহরে গিয়ে বিলাসীপিসির ডেরা খুঁজে বের করবার মুরোদ নেই। আর, সঙ্গে কোনও মাতব্বরকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে পাঁচ কান করবারও ইচ্ছে নেই। এমত অবস্থায়, বিলাসীপিসিকে নাগালের মধ্যে পেতে হলে তাকে নিজেদের ভিটেতে পা দেবার অনুমতি না দিয়ে উপায় নেই, নচেৎ জেঠুই কেবল একা-একা মণ্ডকাটা নিতে থাকবে চিরকাল, আর, ফিরে এসে ছিটেফোঁটাটা যা হাত তুলে দেবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে অন্যদের, কেন কি, আমার বাবার সঙ্গে কবিরাজি ওষুধ তৈরির মালমসল্লা কিনতে যাওয়ার সুবাদে জেঠুই কেবল একা একা কলকাতা যাওয়াতে পারঙ্গম। অথচ কী আশ্চর্য, দু'কাকাতে মিলে একাধিকবার তোষামোদ করা সত্ত্বেও ওদের পথ দেখিয়ে বিলাসীপিসির বাড়ি অবধি নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজি হয়নি জেঠু।

অবশেষে একদিন, বিলাসীপিসি আসছে, এমন খবরে যেন সন্ধিপুরের নিস্তরঙ্গ দীঘিতে একটা বড়সড় ঢিল পড়ে। বৃত্তাকারে তরঙ্গ ছোটে চতুর্দিকে। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি আকারে বড় হতে থাকে ক্রমশ। দেখতে দেখতে পুরো গ্রাম প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সারাটা জীবন বেশ্যাবৃত্তি করে কেটেছে এমন একটা জলজ্যান্ত মেয়ে এসে ঢুকে পড়বে এই গাঁয়েরই একটা ঘরে! থাকবে, খাবে, হেঁটে বেড়াবে, গাঁয়ের হাওয়া-বাতাসকে কলুষিত করে তুলবে, গাঁয়ের উঠতি মেয়েগুলোর গায়ে লাগবে ওই হাওয়া, এমনটা ফের মেনে নেওয়া যায় নাকি?

ফলে, সমাজপতিরা, গাঁয়ের জমিদার বংশের শেষ প্রদীপ হিরণ্ময় মুখুজ্জ্যার নেতৃত্বে নড়েচড়ে বসে। মিটিং বসে মুখুজ্জ্যাদের নাটমণ্ডপে। সেখানে জেঠু-কাকুদের সব্বাইকে তলব করা হয়। এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই কুলত্যাগিনী নষ্ট মেয়েকে কিছুতেই ঘরে স্থান দেওয়া চলবে না।

ততদিনে অবশ্য মুখুজ্জ্যাদের জমিদারি বলতে কিছুই নেই, জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাবলে মুখুজ্জ্যাদের দাপট বড় একটা কমেনি। কেন কি, মরা হাতিরও লাখ টাকা দাম। কাজেই, হিরন্ময় মুখুজ্জ্যার ফরমানের জবাবে প্রায় নতমস্তকে ফিরে আসতে হয় জেঠুদের। বিলাসীপিসিকে এনে নিজেদের খাঁচায় বন্দী করে ফেলে যে-যার মতো স্বপ্ন-সাধ মেটাবার আশাগুলি প্রায় কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাবার উপক্রম। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা লালসার আগুনে একঘটি জল ঢেলে দেয় হিরন্ময় মুখুজ্জ্যার নেতৃত্বে সন্ধিপুরের রক্ষণশীল সমাজ, বিশেষ করে সমাজের সেই সমস্ত অবস্থাপন্ন মানুষ, বিলাসীপিসির সুবাদে আমাদের সংসারে অর্থাগম হতে থাকায় যাদের চোখ টাটাচ্ছিল এতদিন।

কেমন করে বছর বছর জমিন কিনছে গুচ্ছাতরা, মহাজনীর টাকাই বা আসছে কোত্থেকে, এসব নিয়ে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ ধন্ধ ছিল সন্ধিপুরের মানুষের মনে, কিন্তু লখীন্দরের দুর্ভেদ্য লৌহবাসরেও যদি কালনাগিনীর ঢোকা-বেরোনোর ছিদ্র থেকে যায়, তবে হাজার গোপনীয়তার লৌহ-পাঁচিল তোলা সত্ত্বেও এমন মুখরোচক খবরটি বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছিদ্রের অভাব হয় না। সবাই অবশ্য ন'কাকিমার পাড়া বেড়ানো ভাই সবজান্তা বারীন মামাকেই সন্দেহ করে, কেন কি, ততদিনে সে মোহরদির টানে কিংবা অন্য কোনো রহস্যময় কারণে আমাদের বাড়িতে আসছেও ঘনঘন, থাকছেও অনেকদিন, আর, কারণে-অকারণে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো এবং মুখরোচক কথা চালাচালি করাটা তার

প্রিয় বিনোদনের একটি।

জেঠু-কাকারা সমাজের অমন নির্মম ফরমানে যারপরনাই মনমরা হয়ে রইল। জেঠিমা-কাকিমারা তো শোকেদুঃখে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেবার জোগাড়।

ইতিমধ্যে বিলাসীপিসির কাছ থেকে ঘনঘন চিঠি আসছে। বাপের ভিটেতে একটিবারের তরে পা রাখবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে। শেষ চিঠিতে এমনও হুমকি দিয়েছে, যদি তার ওই ইচ্ছেটা পূরণ না হয়, তবে সোনাদানা, যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি 'অনাথ আতুর'দের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বরাবরের জন্য কাশীবাসী হবে সে।

বিলাসীপিসির শেষ হুমকিটা জেঠুদের একেবারে অস্থির করে তোলে। প্রথমে হপ্তাটাক সমাজপতিদের হাতে পায়ে ধরে ফরমানটা বদলাবার আর্জি জানাতে থাকে তারা, কেন কি, আজীবনকাল দুর্ভাগ্যের শিকার যে মেয়েটা, সংসার পায়নি, স্বামী-সন্তান পায়নি, তার শেষ ইচ্ছাটা স্রেফ মানবিক কারণেই মঞ্জুর করা সমাজের কর্তব্য। কিন্তু হাজার অনুনয়-বিনয়েও তিলমাত্র কাজ না হওয়ায় জেঠু একদিন সদম্ভে ঘোষণা করে যে, সমাজ যাই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, সংসার হারানো স্নেহের ছোট বোনটিকে সে তার বাপের ভিটেতে মাত্র একবাবের জন্য হলেও ফিরিয়ে আনবেই। তাতে করে সমাজ তাকে শুলি দিক, ফাঁসি দিক, পরোয়া করে না সে। আর, তাতে করেই গাঁয়ের মানুষ বুঝে ফেলে, বোনের প্রতি 'মানবিক কর্তব্য' নয়, বিলাসীপিসির সোনাদানা, টাকাকড়িই জেঠুকে অতখানি মরিয়া করে তুলেছে, নচেৎ সতীকান্ত দত্তর মতো শান্ত, নিরীহ, নির্বিরোধী, সমাজ অনুগত মানুষ আর ক'জন রয়েছে সন্ধিপুর গাঁয়ে! তা বাদে, জেঠুর ওই সদম্ভ হুঙ্কার যে আচমকা কিছু সোনাদানা আর কাঁচা পয়সা পেয়ে যাওয়ারই ফল, এবং হঠাৎই আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াতেই যে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, এতে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকে না সমাজপতিদের।

জেঠুর হুঙ্কারের জবাবে, কাজেই, দ্বিতীয়বারের জন্য মুখুজ্জ্যাদেব নাটমণ্ডপে সমাজের মিটিং বসে। সেই মিটিংয়ে জেঠুদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, যদি তারা ওই দেহপসারিনীটাকে ঘরে তোলার মতো হটকারিতা সত্যি সত্যি দেখায় তো চিরকালের মতো সমাজচ্যুত করা হবে তাদের। জল, আগুন, মুনিশ-মাইন্দার তো বন্ধ হবেই, মড়ার খাটিয়াতে কাঁধ দেবার জন্যও লোক মিলবে না ওদের বেলায়।

কিন্তু বোনের প্রতি 'মানবিক কর্তব্য' পালন করবার জন্য জেঠু ততদিনে এতটাই মরিয়া এবং দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে যে, বিচারের স্থলেই সে নিঃশঙ্ক জবাব দিয়ে বসে এ হেন হুমকির।

বলে, মড়ার খাটিয়াতে কাঁধ দিবার তরে তো চারজনার বেশি লাগেই না। আমরা চারভাই বর্তমান, ব্যাটাগুলাও বাড়তেছে, কাজেই ওসব ভয় করি না। মায়ের পেটের বোনের জন্য যেকোনো পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত, কেন কি, তা না হলে উপরওয়ালার কাছে মহাপাপ হবে আমাদের। আর, এটা তো জানা কথাই যে, পাপ তার বাপকেও অবধি ছাড়ে না। যিনি দিনকে রাত করেন, মানুষের যে-কোনও সুকর্ম ও দুষ্কমের নথি রক্ষিত থাকে যাঁর কাছে, দিন ফুরোলে ফিরে গিয়ে তার কাছে কী জবাব দেবে জেঠুরা?

বিলাসীপিসির আসার ব্যাপারে গ্রামের সবাইয়েরই যে ঘোরতর আপত্তি ছিল এমনটা নয়।

একে তো আমাদের গাঁয়ের চোদ্দ আনা মানুষই কোনওকালেই একজন জলজ্যান্ত দেহ পসারিনীকে চাক্ষুষ দেখেনি। গাঁয়েগঞ্জে কুলটা নামে খ্যাত যারা, পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বলে চিহ্নিত, তারা কোনও অর্থেই পেশাগতভাবে দেহপসারিনীর পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু একেবারে বেশ্যাপাড়ায় বসবাস করে, প্রতিরাতে ডজন-ডজন খদ্দেরের খিদে মিটিয়ে বেঁচে থাকে, এমন আকাট বারবনিতা দেখবার সুযোগ এতাবৎ হয়নি যাদের, তারা অপরিসীম কৌতূহলবশতই মনে মনে কামনা করে যে, বিলাসীপিসি অন্তত একবারের জন্য হলেও গাঁয়ে পা রাখুক, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হোক।

তাবাদে, গাঁয়ের গরিব-গুরবোরা, যারা কানা ঘুষোয় বিলাসীপিসির অতুল বৈভব এবং দান করবার দরাজ হাতের কথা শুনেছে, তারাও কিছু প্রাপ্তিযোগের আশায় মনে মনে চায় যে, বিলাসীপিসি যদি

একটিবার আসে তো তার সুমুখে নিজেদের দৈন্যদশা দেখিয়ে, পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে টাকাটা, পয়সাটা, কাপড়টা, কম্বলটা চেয়ে নেবে। এমন কি, টাকার অভাবে যে কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না দীর্ঘকাল, সেই মেয়েটিকে বিলাসীপিসির পায়ের তলায় শুইয়ে দিয়ে বিয়ের খরচ-খরচাটা আদায় করে নেবার স্বপ্নটাও দেখতে থাকে কেউ কেউ। কিন্তু এ এমনই এক নিষিদ্ধ কামনা, গাঁয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ সমাজপতিদের ইচ্ছের এতখানি বিরুদ্ধ কামনা সেটা যে, মানুষগুলো মুখ ফুটে প্রকাশ করতে সাহস পায় না।



বিলাসী পিসি যেদিন তার নিজস্ব মোটরে চড়ে পিচরাস্তা অবধি এল, এবং ছই বাঁধা গাড়িতে চড়ে গাঁয়ের দিকে রওনা দিল, সেদিন পুরো সন্ধিপুর গ্রামের প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন কারণে যারপর নাই উত্তেজনা বোধ করছিল।

সকাল থেকে কোনও কাজেই তেমন মন লাগছিল না মানুষজনের। প্রায় দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল সেই মুহূর্তটির জন্য, যখন বিলাসীপিসিকে নিয়ে গরুর গাড়িটি গাঁয়ের মধ্যে ঢুকবে। অকারণে ঘরবার করছিল অনেকেই। কেউ কেউ বাহ্যি বসবার অছিলায় চলে গিয়েছিল খালপাড়ের দিকে, যে খালের ওপ্পরকার পাকা পুলটি পেরোলেই সন্ধিপুর গ্রামের শুরু। এমন কি, যখন ছই বাঁধা গরুর গাড়িটি গাঁয়ের মধ্যে ঢুকল, রাস্তার দু'পাশের ঘরবাড়িগুলোর থেকে কৌতূহলী মানুষজন, বউড়ি-ঝিউড়ির দল লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে ভিড় জমাল কেবল বিলাসীপিসিকে একটিবার চাক্ষুষ করবার আশায়।

সাধারণত গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের বিয়ে-সাদি হলে, বর-কনেকে দেখবার জন্যই এমন পথ-জমায়েত দেখা যায়। বিশেষ করে কনের রূপ, সাজপোশাক এবং গা-ভর্তি গয়নাপাতি দেখবার জন্যই রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায় সাধারণ পরিবারের মানুষজন। হয়ত বা একটু বেশিমাত্রায় হ্যাংলামোও প্রকাশ করে ফেলে সেজন্য। কিন্তু বিলাসীপিসিকে দেখবার জন্য যত মানুষ গিজগিজ করছিল রাস্তার দু'ধারে, তা এককথায় অভিনব, কেন কী, মুখুজ্জ্যা বাড়ির শেষ উজ্জ্বল প্রদীপ হিরন্ময় মুখুজ্জ্যার বিয়েতেও বর-কনেকে দেখতে অত ভিড় হয়নি, যদিও সেক্ষেত্রে কনে ছিল খোদ মেদিনীপুর শহরের মেয়ে এবং আগমনের বহু আগেই তার রূপ-বৈভবের সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছিল সন্ধিপুরের বাতাসে।

বিলাসীপিসি যেদিন আসবে, তার আগের রাতে প্রায় ঘুমোইনি আমি। যতটুকু ঘুমিয়েছি, স্বপ্নের মধ্যে বিলাসীপিসি নামক এক রূপবতী সালঙ্কারা নারী বারবার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। আর বিকেল নাগাদ যখন অপরিসীম কৌতূহলে জ্বলতে থাকা শত শত দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে পথ করে করে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল বিলাসীপিসির ছই-বাঁধা গাড়ি, প্রবল উত্তেজনায় আমার বুঝি তখন দমবন্ধ অবস্থা।

বিলাসীপিসির সঙ্গে এসেছিল বিষেণ সিং আর একজন মাঝবয়েসি ঝি। গাড়ির পিছু পিছু হেঁটেই এল ওরা। আমাদের বাড়ির উঠোনে এসে থামল গাড়ি। রামুদাদা বলদের কাঁধ থেকে জোয়াল নামাল।

গাড়িতে বসেই মুখ বাড়িয়ে উঠোনটাকে একটুক্ষণ নিরীখ করল বিলাসীপিসি, উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তখনই আমার মনে হচ্ছিল, দেখছে না, বিলাসীপিসি দু'চোখের মণি জ্বালিয়ে কাউকে যেন খুঁজছিল। খুব নির্দিষ্ট কাউকে।

এক সময় ছইয়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিলাসীপিসি। এতক্ষণে আমি দেখতে পেলাম সম্পূর্ণ মানুষটাকে। এবং ওই বয়সেই আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হল, এক শরীরে এত রূপ এত প্রাচুর্যের লক্ষণ, এই গাঁয়ের আর কোনও মেয়েরই নেই। গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছিল বিলাসীপিসির। শরীরের কমনীয় ত্বকে এবং গা-ভর্তি গয়নার গায়ে ঝিলিক মারছিল শেষ বিকেলের আলো। কেবল মুখটাতেই কিছু বিষণ্ণতা। পথের ধকলেও হতে পারে, অন্য কোনও কারণে।

বিলাসীপিসি নেমে যাওয়ার পর বিষেণ সিং গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল দু'টি টিনের তোরঙ্গ, এবং

বড়রা তোরঙ্গগুলোর দিকে তেমনই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেমন করে, গাঁয়ে অপেরা পার্টি ঢুকলে তাদের পোশাকআশাকের ঢাউস ট্রাঙ্কগুলোর দিকে রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা, ছোটরা, আর কল্পনায় দেখতে থাকি ভেতরের মহার্ঘ সামগ্রীগুলোকে।

জেঠি-কাকির দল প্রায় পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বিলাসীপিসিকে, হাত ধরে এনে বসাল দাওয়ায় আগের থেকে পেত রাখা মোহরদির সুতোর কাজ করা বাহারি আসনে। টাটকা ডাবের জল ধরে দেওয়া হল ওর সামনে। গেলাসখানি হাতে ধরেই বিলাসীপিসি তার এতক্ষণের চোখের ভাষাকে মুখে প্রকাশ করল, মেজদা-মেজবউদিকে দেখছি নে যে বড়? নেই?

আমারও কেন জানি মনে হচ্ছিল, বাবা আর মাকেই চোখে চোখে খুঁজছিল বিলাসীপিসি। সেজ আর ন-কাকিমাদের তো চেনেই না সে, কেন কী, ওরা এ সংসারে আসার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

সেজকাকাই এগিয়ে গিয়ে গদগদ গলায় জবাব দিল, মেজবউদি বোধকরি ঘরের ভিতর... কাজকর্মে..., আর মেজদা...এই তো একটু আগেও ছিল। এবং আমি নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলাম, মিছে কথা। মা ঘরের ভেতরেই রয়েছে বটে, তবে কোনও কাজে কর্মে ব্যস্ত নেই, আসলে, লুকিয়ে পড়েছে চিলেকোঠা বা অন্য কোথাও, কেন কী, এমন শুভ মুহূর্তে তার প্রকাশ্যে চলে আসাটা এ বাড়ির সবাইয়ের কাছে বড়ই বিড়ম্বনাময়।

একটি গেরস্থ সংসারে কোনো বারবিলাসিনীর পা-রাখাটা শুভ কিনা সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু জেঠা-কাকা এবং জেঠিমা-কাকিমাদের কাছে বিলাসীপিসির আগমন যে বড়ই শুভ, সেটা ততদিনে বুঝে গিয়েছি আমরা, ছোটরা, গেল ক-দিন ধরে আয়োজন ও প্রস্তুতির ঘটা দেখে। কেন কি, আমাদের বাড়িতে পুজোআচ্চা কিংবা কোনো উৎসব-পার্বণে ঠিক এমনিভাবেই ঘরদোর ঝাড়া, মোছা, নিকোনো, কাপড়-চোপড় কাচাকাচি চলে। বাড়ির সব মেয়েরা মিলে রাতদিন খেটে সাফ-সুতরো করে ফেলে সবকিছু। আর জেঠা-কাকারা বাজারে গিয়ে কিনে আনে আটা-ময়দা-ঘি, দুর্মূল্য সবজি, ফল-ফলারি জাতীয় সেইসব সামগ্রী, যা কেবল উৎসব-পার্বণেই আসে আমাদের বাড়িতে। এইসব দেখেশুনে আমার ধারণা হয়েছিল, বিলাসীপিসির আগমনটা আমাদের বাড়ির সকলের কাছেই একটা শুভ ব্যাপার। এবং এমন শুভ অনুষ্ঠানে মায়ের মতো অপয়া রমণীর আত্মপ্রকাশ নিতান্তই অবাঞ্ছিত।

আর, বিলাসীপিসির আগমনের মুহূর্তে বাবার লুকিয়ে পড়বার অন্তর্নিহিত কারণটা ওই বয়সে বুঝতে পারিনি, বুঝেছি অনেক পরে।

ততক্ষণে বড়পিসি সামান্য তফাতে পিঁড়ির ওপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লেগেছে। এবং বিড় বিড় করে যা বলে চলেছে, তার মর্মার্থ হল, মানুষ কপাল নিয়েই জন্মায়, কপাল নিয়েই মরে, নিয়তির ওপর মানুষের কোনোই হাত নেই, নইলে সে কেন বিয়ের তিনমাসের মধ্যে বিধবা হবে, আর বিলাসীপিসিই বা কেন স্বামী বর্তমানে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন কাটাবে! এতদ্দ্বারা বড়পিসি নিজের দুর্ভাগ্যকে বিলাসীপিসির দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সমঅবস্থানে এনে একধরনের সহমর্মিতার নৈকট্য রচনা করতে চায়।

বিলাসীপিসি বড় একটা গা করে না। রোদনরতা বড়পিসির দিকে দু'একবার খুব নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব নিরাসক্ত গলায় বলে, ওসব লিয়া আর কান্নাকাটির কী আছে? যার ভাগ্যে যা।

বলতে বলতে আমার দিকে তাকায় সে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েই থাকে। একসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে আমাকে। আমি কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার চিবুক ছুঁয়ে বলে, এটা নিশ্চয়ই মেজদার ব্যাটা?

সহসা কান্না থামিয়ে বড়পিসি সারা চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময় জড়ো করে, ঠিক বলেছু তো। রতিকান্তরই ব্যাটা উ।

আমাকে দেখতে দেখতে বিলাসীপিসির সারামুখ আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল। খুব কমনীয় গলায় বলল, আয়, আমার কাছটিতে বোস।

আমি স্পষ্ট লক্ষ করলাম, বিলাসীপিসির অমন 'পক্ষপাতিত্বে' জেঠিমা-কাকিমাদের দু'ভুরুর

সঙ্গমস্থলে আলত ভাঁজ পড়ল। এবং যেমন একটু একটু করে মেঘ জমে আকাশে, মোহরদির মুখটিও তেমনই একটু একটু করে কালো হয়ে গেল।

সহসা সেজকাকিমা, তার আঁচল পাকড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাটিকে দু'হাতে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে হাজির করল বিলাসীপিসির সামনে। গদগদ গলায় বলল, এটি তোমার সেজ ভাইয়ের ব্যাটা, টুবলু। সকাল থিকে লাচতিছে ছোটপিসি কখন আসবে। টুবলু, পিসিকে নম কর।

নম করবে কী, চারপাশে এত লোকজন, আয়োজন এবং আপ্যায়নের বহর দেখে টুবলুর মতো বিচ্ছু ছেলেও ঘাবড়ে গিয়েছিল আগেই, আচমকা ওকে টেনে-হিঁচড়ে বিলাসীপিসির কাছটিতে নিয়ে যাওয়ায় এবং সেজকাকি ওকে বারবার বিলাসীপিসির গায়ের দিকে ঠেলে দেওয়ায়, ভয়ে, বিড়ম্বনায় আচমকা ভ্যাঁক করে কেঁদে দিল টুবলু।

চোখে মুখে সামান্য বিরক্তি ফুটিয়ে বিলাসীপিসি বলল, থাক্ থাক্, বাচ্চা ছেলেকে শুধু শুধু কাঁদায় না। আর, টুবলুর আচরণে যারপরনাই অপ্রস্তুত সেজকাকি এমন চোখে তাকাল ওর দিকে, মুনি-ঋষিদের যুগ হলে ভস্মই হয়ে যেত টুবলু।

বেশ কয়েকদিন বাদে, সেজকাকা-সেজকাকিতে মিলে বিলাসীপিসির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া নিয়ে একান্ত গবেষণা চলাকালীন, সেজো কাকি সেই আগুন ঝরিয়ে দেয় পুনরায়, কিন্য, কী করিয়া ঘনিষ্ঠ হবো? পেটের ছেলে, সেও যদি অমন শত্রুতা করে! সেদিন এত করিয়াও টুবলুকে নম করানো গেল?

সন্ধেপ্রদীপ দেবার পর জলখাবারের পালা চুকল।

আয়োজন বড় কম ছিল না। গাঁয়ে ঘরে চাষাভুষোর বাড়িতে মাননীয় কুটুম্ব এলে যতখানি আয়োজন করা হয়, বিলাসীপিসির ক্ষেত্রে জেঠু তার চেয়ে ঢের বেশি আয়োজন করেছিল। তবুও বিলাসীপিসি এটা চাখল, ওটা দাঁতে কাটল এবং খাওয়ার ধরনেই বুঝিয়ে দিল, অত সাধারণ দরের খাবার সে বহুদিন মুখে তোলেনি।

দেখতে দেখতে বিলাসীপিসির মনের কথাটি বোধকরি নিজমুখে উচ্চারণ করল জেঠু, এসব গাঁ-ঘরের খাইদ্য-খাবার, তোর কি গলা দিযা নামবে? তোদের কলকাতা শহরে কত ভালো ভালো খাইদ্য-খাবার।

বিলাসীপিসি খুব শীতল গলায় জবাব দিল, না, না, তাতে কী, গাঁ-ঘরের হিসেবে এই ঢের।

বিলাসীপিসির এমন বিবেচনাপূর্ণ মন্তব্যে বুঝি বুকটা কিঞ্চিৎ শীতল হল জেঠুর।

সন্ধে গড়াতেই বিলাসীপিসি বিষেণ সিংকে কাছে ডাকল। ওর হুকুমে সঙ্গে আনা বিশাল তোরঙ্গ দুটিকে বিলাসীপিসির নাগালের মধ্যে এনে নামিয়ে দিল বিষেণ সিং। আর, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবগুলি চোখ সোনার মোহরের মতো চকচকিয়ে উঠল। তোরঙ্গগুলোর মধ্যে বাস্তবিক কী থাকতে পারে, তাই নিয়ে সেই বিকেল থেকে শুরু হয়েছে বাড়িময় ফিসফিসানি গবেষণা। আমরা ছোটরাও বুকে দুরন্ত কৌতূহল জমিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, বিলাসীপিসি কখন তোরঙ্গগুলো খোলে। কাজেই, মুহূর্তের মধ্যে মোহরদিসহ আমরা ছোটরা গিয়ে ভিড় জমালাম বিলাসীপিসির চারপাশে। জেঠু আর বড়পিসি তো বসেই ছিল বিলাসীপিসির আশেপাশে, জেঠিমা এবং কাকা-কাকিমারা, এতক্ষণ যারা রান্নাঘরে রান্না করছিল, ঘরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন কাজে, একটু একটু করে বিলাসীপিসির আশপাশ দিয়ে আনাগোনা জুড়ে দেয়, যেন তাদের সবাইয়ের যাবতীয় কাজ পড়েছে ওই এলাকাতেই। এরই মধ্যে বড়পিসি আমাদের একপ্রস্থ ধমকও লাগায়, এই, তোদের এখানে কী রে? পড়াশুনা নাই? সব সময় বড়দের পাশ ঘুরঘুর না করলে চলছে নাই? কিন্তু সেই ধমকের মধ্যে অতখানি জোর ছিল না বলেই আমরা জায়গাটা ছেড়ে নড়িনে।

কোমর থেকে চাবির ছড়া বের করে ধীরেসুস্থে তোরঙ্গগুলো খুলল বিলাসীপিসি। এবং আমি দেখলাম, জেঠিমা, কাকিমা এবং বড়পিসির চোখগুলো সাপের মতো জ্বলতে লেগেছে।

প্রচুর জিনিসপত্র এনেছিল বিলাসীপিসি। জামাকাপড, রুপোর বাসনকোসন, পানের বাটা, পশমের শাল, লোক ধরে ধরে থান বিশেষে গযনা..., জনে জনে ডেকে ডেকে হাতে হাতে তুলে দিল সেসব।

এবং নেবার কালে প্রত্যেকেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল, অন্যের সঙ্গে তুল্যেমুল্যে তার জিনিসটা বেশি দামি, না কম।

জিনিসপত্র বিলিবন্দোবস্তের কালে মা-বাবা কেউই আসেনি ধারেকাছে। বিলাসীপিসি চারপাশে এক নজর চোখ চারিয়ে মা এবং বাবার জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রীগুলো সরিয়ে রাখল একপাশে। তারপর তোরঙ্গ গুলোতে পুনরায় তালা লাগিয়ে চাবি রেখে দিল নিজের কোমরে।

তারপরই ঘটল সেই ঘটনাটা।

সেদিনের মতো প্রাপ্তিযোগ মিটে গিয়েছে এমনই বিবেচনায় বিলাসীপিসির চারপাশের ভিড় পাতলা হতেই উঠে দাঁড়াল বিলাসীপিসি। মা ও বাবার জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রীগুলো তুলে নিল হাতে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল দোতলায়। বিলাসীপিসির পিছু পিছু কেউই গেল না ওপরে। সবাই তখন যে-যার উপহার সামগ্রীগুলোকে নিয়েই মশগুল।

আমি পা টিপে টিপে উঠে গেলাম দোতলায়। এবং একটু বাদে, আমাদের শোবার ঘরের সামনে পৌঁছনোমাত্র, ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল কান্নার শব্দ।

দরজার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চারিয়ে দেখলাম, মা আর বিলাসীপিসি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে।



সেই রাতেই বিলাসীপিসি জেনে গিয়েছিল, তার আগমনকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠেছে সারা গাঁয়ে। আমাদের 'বন্ধ' করেছে পুরো সমাজ।

সে রাতে আর কথা বাড়ায়নি বিলাসীপিসি। পরের দিন বিকেল নাগাদ সেজেগুজে চলল মুখুজ্জ্যাদের বাখুলে। সঙ্গে নিয়ে গেল মা-কালীর প্রসাদ হিসেবে সের-দুই পেঁড়া। তৎসহ আরও কিছু সামগ্রী। যাবার বেলায় বিলাসীপিসি আমাকে, একমাত্র আমাকেই ডেকে নিল সঙ্গে যাবার জন্য। মোহরদির মনে মনে খুবই ইচ্ছে ছিল, সঙ্গে যায়, কিন্তু বিলাসীপিসি একেবারেই উৎসাহ না দেখানোয় চুপসে গেল।

বিলাসীপিসি যে অমন হুট করে খোদ মুখুজ্জ্যা-বাখুলে ঢুকে পডতে পারে, এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা। কিন্তু বিস্মিত হবার জন্যও যথেষ্ট সময় পান না তিনি। তার আগেই একটি মোহর দিয়ে তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করে বিলাসীপিসি। আর, যেমন করে সূর্যের থেকে আলো পেয়ে চাঁদ হয়ে ওঠে রুপোলি, মোহরের শরীর থেকে আলো ছুটে গিয়ে হিরন্ময় মুখুজ্জার চোখদুটিকেও উজ্জ্বল আলোকিত করে তোলে। চকচকে মোহরটির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিলাসীপিসির প্রণাম গ্রহণ করেন হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা।

মোটা মোটা থামওয়ালা উঁচু বারান্দায় আরাম কেদারায় বসেছিলেন তিনি, বিলাসীপিসি বারান্দার কিনার ঘেঁসে বসে। এবং তার ইঙ্গিতে বিষেণ সিং বারান্দার ওপর নামিয়ে দেয় পেঁড়ার চুপড়ি।

বিলাসীপিসি খুব কুণ্ঠিত গলায় বলে, মা-কালীর প্রসাদ। প্রসাদ খেলে জাত যায় না।

চুবড়ির ভেতর থেকে উঁকি মারছিল প্রমাণ সাইজের পেঁড়াগুলো, গাঢ় চন্দনের বর্ণ শরীর। হিরন্ময় দু'চোখ দিয়ে বুঝি মেপে নিতে পারেন চুবড়ির মধ্যে অবস্থিত পেঁড়ার পরিমাণও।

হিরন্ময়ের নির্দেশে মা-কালীর প্রসাদী পেঁড়া চলে যায় অন্দরমহলে।

বিলাসীপিসি এবার বের করে একটি গরদের ধুতি এবং সার্জের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম লাগানো রয়েছে তাতে। এগিয়ে দেয় মুখজ্জ্যার পায়ের দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে সামগ্রীগুলিকে দেখতে থাকেন হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা। এমন নয় যে ওইসব সামগ্রী তিনি জীবনে দেখেননি কোনওদিনও, সম্ভবত তিনি এমনটাই ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছিলেন যে. কত সম্পদ থাকলে মানুষ এসব সামগ্রী অবলীলায় দিয়ে ফেলতে পারে তাকে, যার সঙ্গে বাস্তবিকপক্ষে তার কোনো সম্পর্কই নেই। হিরন্ময় মুখুজ্জারও তো সম্পদের পরিমাণ কম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কি অতখানি

একলপতে উপহার দিয়ে ফেলতে পারেন কোনও নিকট আত্মীয়কেও!

বিলাসীপিসিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন হিরন্ময়। তার পোশাক-আশাক, গা-ভর্তি গয়না, শরীরের কমনীয় ঔজ্জ্বল্য, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি, ...। আর, দেখতে দেখতে বুঝি ভাবছিলেন, এত সবের পর বিলাসীকে কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু কী বলা সঙ্গত হবে সেটাই বুঝি নির্ণয় করতে পারছিলেন না হিরন্ময়।

অতঃপর বিলাসীপিসি হাতের বটুয়া থেকে বের করে একটি সোনার তাবিজ। হিরন্ময়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মৃদুগলায় বলে, মা-রক্ষাকালীর মন্ত্রপুত কবচ এটা, কাশীর বিরাট তান্ত্রিকের হাতে তৈরি, সবসময় ধারণ করলে চৌষট্টি ব্যাধির নিরাময় আর নিশ্চিত শত্রুবিনাশ। তাবিজটি মাটিতে রাখবার সময় পায় না বিলাসীপিসি, তার আগেই সোজা হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে অঞ্জলি পাতেন হিরন্ময়, এবং বিলাসীপিসি তাবিজটিকে শূন্য থেকে ফেলে দেয় ওঁর হাতে।

বিড়বিড়িয়ে বলে, শনি কিংবা মঙ্গলে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে সিনান করিয়া ধারণ করতে হবে তাবিজটি, আর পূর্ণিমা-অমাবস্যায় স্ত্রীগমন নিষেধ।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্ময় জমাট বাঁধছিল হিরন্ময় মুখুজ্জ্যার চোখে। দু'চোখ বন্ধ করে তাবিজ ধারণের নিয়মগুলি মনে মধ্যে পরিপাক করতে থাকেন তিনি।

একসময় চোখ খোলেন হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা। বিলাসীপিসির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, দেশ-মহারাজকে তুই কী দিবি?

—কী দিতে হবে, বলে দেন আপনি। বিলাসীপিসি বুঝি তৈরিই ছিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব করে, আপনি যা হুকুম করবেন—।

এমন কথায় হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা বুঝি গভীর ভাবনায় ডুবে যান। বিনা বাক্যব্যয়ে কেউ ব্ল্যাঙ্ক-চেক লিখে দিলে, ওই চেকে কত অঙ্কের টাকা লেখা উচিত সেটাই বুঝি নির্ণয় করতে হিমসিম খেতে থাকেন তিনি।

একসময় খুব গাঢ়স্বরে বলেন, আজ যা তুই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া জানাব তোকে।

বিলাসীপিসি উঠে দাঁড়ায়। উঁচু বারান্দার মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে হিরন্ময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম সারে পুনরায়। তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে আসে।

ছই বাঁধা গাড়ির থেকে নামবার মুহূর্তে বিলাসীপিসির চোখে-মুখে যে ক্লান্তি আর অবসাদ দেখেছিলাম, মায়ের গলা জড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁদাকাটা করে এবং রাতভর আরও নানান ধরনের শুশ্রূষা পেয়ে পরের দিন খুবই ঝরঝরে লাগছিল ওকে। খুব ভোর-ভোর বিছানা ছেড়ে খালিপায়ে সারা চৌহদ্দি ঘুরে বেড়িয়েছিল।

ঘুম ভাঙতেই জানলা দিয়ে দেখি, বিলাসীপিসি সদর পুকুরের পুবপাড়ে কী যেন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

সদর পুকুরের মূল ঘাটটা পশ্চিম পাড়ে। আমি যখন মাকড়াপাথর বসানো পুকুরঘাটে বসে কুলকুচো করে বাসিমুখ ধুচ্ছি, বিলাসীপিসি তার ডান হাতটাকে উড়ন্ত পাখির ডানা বানিয়ে আমাকে ডাকল পুব পাড় থেকে। কাছে যেতেই বাঁ-হাতের বেড় দিয়ে আমাকে টেনে নিল কাছে। খুব ধীর গলায় বলল, আরও ভোরে উঠতে হয়।

আমি লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বিলাসীপিসি বলে, কেন বল্ দেখি?

বলি, কেন? আমি চোখের মণিদুটো ওপরের দিকে তুলে বিলাসীপিসির মুখের দিকে অপাঙ্গে তাকাই।

বিলাসীপিসি বলে, রোজ সূর্য ওঠাটা নিজের চোখে দেখতে হয়। নয়ত সূয্যিদেব বেজায় রেগে যান। শাপ দেন।

আমি সারা মুখে আশঙ্কা ফুটিয়ে শুধোই, কী শাপ?

বিলাসীপিসি বলে, সূয্যিদেব এই বলে শাপ দেন যে, যাহ্‌, তোর একদিনের আয়ু কমিয়ে দিলাম। যতদিন বাঁচতিস, তার চেয়ে একদিন কম বাঁচবি। সত্যি রে, মানুষ যে-দিনগুলোতে সূর্য ওঠা দেখে না, ওই দিনগুলো তার আয়ু থেকে কমে যায়।

এরপর বিলাসীপিসি আমাকে গাছ চেনাতে শুরু করে। সারা পুকুর পাড় জুড়ে কতই না হাবিজাবি গাছ, ঝোপ-জঙ্গল, বিলাসীপিসি তাদের এক-একটির দিকে আঙুল তুলে দেখায়, বল্‌ তো, কী গাছ?

কল্পনাথের কল্যাণে আমি গাছ চিনি ভালোই। তার রানীহাঁস দীঘির পাড়ের অভয়ারণ্যে তখন আমার নিত্যি যাতায়াত। ওখানকার গাছপালাগুলো কল্পনাথের কেবল চেনাই নয়, ওরা তার কুটুম-বাটুম, আত্মীয়। সেই সুবাদে আমিও ওদের অনেককেই চিনি। কাজেই, বিলাসীপিসির প্রশ্নের জবাবে আমি টকটক করে বলে যেতে থাকি গাছগুলোর নাম। আর ভেতরে ভেতরে কল্পনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দ্রব হতে থাকি।

শুনতে শুনতে বিলাসীপিসির দু'চোখে প্রশংসা ছলকে ওঠে, তুই তো খুব গাছ চিনিস। কে চেনাল?

তখনই আমি কল্পনাথের নাম বলি। অনেকক্ষণ ধরে শোনাতে থাকি তার গল্প। তার মিঠেনুড়ির বৃত্তান্ত, রানীহাঁস দীঘির পাড়ে তার কুটুম-বাটুম আত্মীয় পরিজনের কথা।

বিলাসীপিসি দু'চোখভর্তি বিস্ময় নিয়ে তাকায় আমার দিকে। বলে, বটে! মহেশ্বরী বৌদির ছেলে? একদিন নিয়ে আসিস তো ছেলেটাকে।

সেদিন সারা সকাল জুড়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভিটেময় ঘুবে বেড়াল বিলাসীপিসি, আর, সারাক্ষণ স্মৃতি-রোমন্থন করল। তার শৈশবের, কৈশোরের, প্রথম যৌবনেব অনেক অনেক স্মৃতি, ছড়িয়ে রয়েছে জড়িয়ে রয়েছে এই ভিটের মাটিতে, জলে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। খুব মগ্ন গলায় সেসব আমাকে একের পর এক শোনাতে লাগল বিলাসীপিসি।

যখন ফিরে এলাম দু'জনে, বিলাসীপিসির চোখমুখ অনেক ঝরঝরে লাগছিল। তার দু'চোখের কোল থেকে যাবতীয় ক্লান্তি, অবসাদ হারিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল আমার। তারপরেই তো বিকেলবেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে মুখুজ্জ্যাদের বাখুলে গেল।

কিন্তু তৃতীয় দিনের সকাল থেকে আমি পুনরায় বিলাসীপিসির চোখেব কোলে আবিষ্কার করলাম সেই ক্লান্তি আর অবসাদ।

কারণটা মালুম হল একটু বেলায়।

বিলাসীপিসি সাপ্পা মুখে গাঢ মেঘ জমিয়ে বলল, মেজদাটা কোথায় গেল? আমার মুখ দেখতে চায় না নাকি?

আমি জানি, বিলাসীপিসির মুখে মেঘ দেখতে চায় না এ বাড়ির কেউই। কাজেই, বাবাকে ঢুঁড়তে চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ে জেঠু, বামুদাদা ও কাকারা। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি বাবার সন্ধান।

শুধু ওইদিনই নয়, যে ক'দিন বিলাসীপিসি আমাদের বাড়িতে ছিল, বাবা আর ফিরে আসেননি। বিলাসীপিসি তো নয়ই, বাড়ির কেউই সেদিন বুঝতে পারেনি বাবার এমন আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ।

অনেক পবে মায়ের মুখ থেকে অবশ্য কারণটা জেনেছিলাম আমি।

দিনতিনেক বাদে মুখুজ্জ্যাদের বাখুলে আবার যায় বিলাসীপিসি। সঙ্গে নিয়ে যায় হিরন্ময় মুখুজ্জ্যার স্ত্রী রত্নহীরার জন্য একটা আকাশী রঙের বেনারসি শাড়ি।

শাড়িখানা অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিযে বেশ কিছুক্ষণ আরাম কেদারায় চোখ মুদে শুয়ে থাকেন হিরন্ময়। এক সময় চোখ খুলে তাকান। বলেন, দেশ-মহারাজকে একটা শামিয়ানা, এক জোড়া হ্যাজাক আর দু'বিঘা জমিন দিতে হবে তোকে।

—দিবো। খুব নির্বিকার গলায় জবাব দেয় বিলাসীপিসি।

—তুই নিজেই সেই ইচ্ছাটা প্রকাশ কর্‌। কিন্তু সাবধান, ভুলেও আমার নাম উচ্চারণ কববিনি।

সেই বিকেলে বিলাসীপিসিব সঙ্গে খানিক গল্পগুজবও করেছিলেন হিরন্ময় মুখুজ্জ্যা। তার জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার টাকা-পয়সা, সোনাদানা এবং অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে একটা ধারণাও পেতে চেয়েছিলেন।

নাটমণ্ডপে মিটিং বসল আরও দিনতিনেক বাদে।

সমাজের মাথারা বিলাসীপিসির দেওয়া টোপটা গিলেছে ততদিনে। তাও খানিকটা দর-কষাকষি চলল। সাধারণ মানুষজনেরাও খুব জমায়েত হয়েছিল সে মিটিংয়ে। কিন্তু গ্রামগঞ্জের বিচারে-পঞ্চাতে সাধারণ মানুষ চিরকালই হাওয়ার মোরগ। হাওয়া যেদিকে ঘোরে, তারাও সেদিকে ঘুরে যায়। সব কিছুতেই সিদ্ধান্ত যা নেবার, সমাজের মাথারাই নেন, মানুষগুলো কেবল যথাসময়ে 'ঠিক তো' 'বটে তো' বলবার জন্য উপস্থিত থাকে। তাবাদে, বিলাসীপিসির মতো একজন মেয়ে তার বাপেব ভিটেতে আসবে কী আসবে না, সে ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। যার বাড়ি সে বুঝবে, যে আসছে সে বুঝবে. সাধারণ মানুষের তাতে কী যায় আসে? বরং বিলাসীপিসির রমরমার বহর দেখে গরিব গুরবোদেব অনেকেই তাদের মেয়েগুলোকে বিলাসীপিসির তত্ত্বাবধানে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। কিনা, এক কাঁড়ি মেয়াকে বিয়ে দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়, তার চেয়ে বিলাসীর সঙ্গে গিয়ে তারই মতো রাজরানী হয়ে ফিরে আসুক, সংসারের একটা হিল্লে হয় তাতে। কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই প্রস্তাবটা পেশ করে ফেলেছে বিলাসীপিসির কাছে।

কাজেই, যেমন করে কিনা আমাদের বাড়িকে হৈ-হৈ করে 'বন্ধ' করেছিল সন্ধিপুরের সমাজ, দর কষাকষি শেষ হলে পর তেমনভাবেই হৈ-হৈ করে সেই 'বন্ধ' তুলে দেওয়া হল। মূল্য হিসেবে বিলাসীপিসিকে দিতে হল সামিয়ানা, হ্যাজাক এবং দু'বিঘা জমিন। কেবল শেষ মুহূর্তে গ্রামের বারোয়াবি শীতলা মায়ের পূজারি অঘোর চক্রবর্তী আবদার ধরে, ওই সঙ্গে শীতলা মায়ের জন্য এক ছড়া সোনাব বেলপাতাও দিতে হবে বিলাসীপিসিকে। আব প্রায়শ্চিত্তের জন্য যৎকিঞ্চিত খরচাপাতি।

বিলাসীপিসি রাজি হওয়া মাত্তব আমাদের ওপর থেকে হৈ-হৈ করে উঠে যায় 'বন্ধ' এবং বিলাসীপিসি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় গাঁয়ে।

এরপর আর নিজের গাঁয়ে বাপের ভিটেতে আনাগোনা করবার কোনও বাধা রইল না বিলাসীপিসির।

ক'দিন যাবৎ সমাজের ভয়ে আমাদের উঠোন মাড়াতে সাহস পাচ্ছিল না মানুষজন। কিন্তু 'বন্ধ'টা উঠে যাওয়ার পরের দিন থেকেই উঠোন জুড়ে গরিব-গুরবোদের ভিড়। সবাই যে-যার দুঃখের কান্না কাঁদতে থাকে বিলাসীপিসির সুমুখে। বউয়ের চিকিৎসা করাতে পারছে না, টাকার অভাবে ছেলেটো সাইকেল-সারাইয়ের দোকানটা চালু করতে পারছে না..., দিনরাত হাজার জনের হাজার বায়নাক্কা। তৎসহ মেয়ের বাপদের ওই বায়নাটা তো রয়েছেই, আমার মেয়াটাকে লিয়া যাও তুমার সাথে। তুমাব পায়েব তলায় পড়িয়া রইবে। এই অজ গাঁ'য় রইয়া কববে কি উ? ব্যা-থা তো দিতে পারবোনি।

বিলাসীপিসি কিছু কিছু মুষ্টিভিক্ষা দেয় প্রত্যেককে, কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে গম্ভীর হয়ে যায়। বেশি ঘ্যানর ঘ্যানর করলে ক্ষেপে গিয়ে দূব-দূর করে তাড়িয়ে দেয। তারপরই তার চোখেব কোলে নেমে আসে সেই পুরনো ক্লান্তি, অবসাদ।

দিনদশেক ছিল বিলাসীপিসি আমাদের বাড়িতে। তারপবই কলকাতায় ফেরার জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

জেঠুরা ওকে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়ার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করেছিল। তার জবাবে বিলাসীপিসি প্রতিবারই তুলেছে কিষণলালের প্রসঙ্গ। বলেছে, আমার কোনও কাজেই 'না' বলেন না তিনি, আমি যদি আরও একমাস থেকে যাই, তিনি মেনে নেবেন, কিন্তু আমি তো জানি, আমি না থাকলে কতখানি কষ্ট হয় ওঁর। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক থাকে না, সেবা-শুশ্রূষা পান না, চাকর-বাকর দিয়ে কি সব কাজ হয়?

শুনতে শুনতে আড়ালে-আবডালে হেসে হেসে কুটিকুটি হয় জেঠিমা-কাকিমার দল।

বড়পিসি ঠোঁটে ভাঁজ তুলে বলে, সেই বলে না।...

যেদিন কলকাতা ফিরে গেল বিলাসীপিসি, সকাল সকাল উঠোনে ছইবাঁধা গরুর গাড়ি মোতায়েন। বিলাসীপিসিকে ঘিরে একডজন ছলোছলো চোখ।

বিলাসীপিসি একে একে প্রণাম করে গুরুজনদের। তারপরেই এদিক-ওদিক চোখ চারিয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

এক সময় মুখেই প্রকাশ করে সেটা। মেজবউদি গেল কোথা? যাবার বেলায় দেখতে পাবোনি অকে?

ততক্ষণে সকলের চোখমুখে গাঢ় অস্বস্তি। কারোর শুভযাত্রার সময় আমার মায়ের যে প্রকাশ্যে চলে আসাটা অলিখিতভাবে বারণ, সে কথাটা মুখ ফুটে বলতে বুঝি বাধে সবাইয়ের।

জেঠু বলে, থাক্, কাজেকর্মে রয়েছে হয়ত।

বিলাসীপিসি ম্লানমুখে তাকাচ্ছিল চারপাশে, একসময় আমার দিকে তাকিয়ে বলে, শঙ্কর, যা-তো, তোর মাকে ডাকিয়া আন।

আমি বুঝি মনে মনে তৈরিই ছিলাম। সেই জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি, কারোর রওনা দেবার মুহূর্তে মা লুকিয়ে পড়ত কোনও গর্তে। অতে করে মায়ের বুকের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হত জানা নেই আমার, কিন্তু আমার কচি বুকখানা ফালাফালা হত নিঃশব্দে। এই প্রথম আমাদের বাড়িতে তার ব্যত্যয় ঘটতে চলেছে। এই প্রথম কারোর রওনা দেবার মুহূর্তে আমার মা উপস্থিত থাকতে চলেছে অকুস্থলে, কেন কী, আমি ততদিনে বুঝে গিয়েছি, বিলাসীপিসির ইচ্ছের বিরোধিতা করা এ বাড়ির কারোর পক্ষেই অসম্ভব।

আমি দুমদাম পা ফেলে ঢুকে যাই ঘরে এবং দ্রুত বেগে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চিলেকোঠায় পৌঁছে যাই। মায়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলি, চল, বিলাসীপিসি তোমায় ডাকতিছে। চল, চল, চল।

আমার টানাহেঁচড়ায় অতিষ্ট হয়ে মা একসময় উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

ওকে দেখামাত্তর বড়পিসি খনখন করে বেজে ওঠে, তোর কী আক্কেল লো মেজো? গিরস্থালির কাজটাই বড় হল তোর কাছে? আবার কবে আসবে মেয়েটা, তার কুনো ঠিক আছে?

মা খুব শীতল চোখে তাকায় বড়পিসির দিকে। জবাব দেয় না।

বিলাসীপিসি পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকে।

মা কিন্তু অতখানি উতলা হয় না। বিলাসীপিসির পিঠে হাত বোলাতে থাকে নিঃশব্দে। তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

ন'কাকা আর রামুদাদা গিয়েছিল পিচ রাস্তা অবধি। ফিরে এসে ন'কাকাই বলে ওঠে, বিলাসীর মোটরগাড়িটা ইস্টার্ট নিচ্ছিল না কিছুতেই।

—তা'পর? সবাই মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ন'কাকার ওপর।

ন'কাকা বলে, বহুকষ্টে ইস্টার্ট নিল অবশ্য, তবে রওনা হতে দেরি হয়্যা গেল ওদেব। কলকাতা পৌঁছতে বেলা গড়িয়া যাবে।

—ব্যাটারিটা ডাউন হয়্যা গেছে বোধ হয়। ছোটকাকা বলে ওঠে,—ক'দিন তো নাগাড়ে চলেনি গাড়িটা।

—তুই থাম্। ছোটকাকার ওপর বাঘের ঝাপট নেয় বড়পিসি,—ফুটবলে লাথ মারলেই দুনিয়ার সবকিছো জানা যায়, তাই না?

বলতে বলতে বড়পিসির কপালে দুশ্চিন্তার গাঢ় মেঘ জমে, সারাটা পথ আরও কী বিভ্রাট হয় দ্যাখো। বলতে বলতে ভেতর-ঘরের দিকে একঝলক তাকিয়ে নেয় সে, সেও ডাকল, আর উনিও সুড়সুড় করিয়া বারিয়া আইলেন। একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকবেনি মাইন্ষের?

শুনতে শুনতে আমার বুঝতে বাকি থাকে না, মায়ের উদ্দেশেই বলা এসব। বিলাসীপিসির সামনে টুঁ কথাটি বলতে পারেনি, এখন মায়ের ওপর সুদে-আসলে উশুল করবে সবাই। কিস্তিতে কিস্তিতে চলতে থাকবে গঞ্জনা।

যেদিন ছোটকাকার হাত ধরে প্রথম রওনা হলাম কলকাতায়, সারাক্ষণ দুরুদুরু করছিল বুক। কৌতূহলে, আশঙ্কায়।

বিলাসীপিসি অনেকদিন যাবৎ খুবই পীড়াপীড়ি করছিল চিঠির মাধ্যমে। শঙ্করকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, ওকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। ক'দিন থেকে যাক।

ততদিনে বিলাসীপিসির কলকাতার বাড়িতে সকলেরই আনাগোনা বেড়েছে। তখন আর লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই যায় আসে জেঠুরা।

কেবল ওরাই নয়, গাঁয়েরও কেউ কেউ, যারা ঠিকানা নিয়ে রেখেছিল বিলাসীপিসির, নিয়মিত যাতায়াত জুড়েছে।

কলকাতায় অনেকেরই অনেক কাজ থাকত এতকাল, কিন্তু 'নিজেদের' লোক না থাকায় যাওয়া এবং থাকা-খাওয়ার দিগদারিগুলি ভোগ করতে হত প্রায় সবাইকেই। এতদিনে অসুবিধেটা ঘুচেছে।

গায়ে যে ক'দিন বিলাসীপিসি ছিল, অনেক রইস আদমিই হাসতে হাসতে বলেছে, কলকাতা গেলে আর আমাদের ভাবনা কি? বিলাসী তো রয়েইছে।

বিলাসীপিসিও হেসে হেসে বলত, আমার কি অত কপাল হবে দাদা, আমার কুঁড়েতে কি পায়ের ধুলা দিবেন আপনারা?

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, পায়ের ধুলো দিতে প্রায় মুখিয়ে রয়েছে সবাই। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন গিয়ে থেকে এসেছে বিলাসীপিসির বাড়িতে। বিলাসীপিসি ওদের বেজায় খাতির-যত্ন করেছে। গাড়ি করে কলকাতা ঘুরিয়েছে। আসার সময় পেঁড়া-মেঠাই এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে সিধে বেঁধে দিয়েছে।

ফিরে এসে অবধি বিলাসীপিসিব জয়গানে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে ফেলেছে ওরা। ওহ, কী বিশাল বাড়ি বিলাসীর, কত কত লোকলস্কর, কী খাতির যত্নটাই যে কল্ল! আসতেই দিতে চায় না। বলে, আরও দুটা দিন থাকিয়া যাও। বলি, থাকতে কি আর মন চায় না রে? এমন রাজভোগ ছাড়িয়া যাইতে কার মন চায়? কিন্তু ঘর-সংসার রইছে না?

কল্পনাথের বাবা অঘোর চক্রবর্তীর একটা মামলা চলছিল হাইকোর্টে। তিন-চার মাস অন্তর দিন পড়ত। সেবারে মামলার দিন পড়তেই অঘোর জেঠু গিয়ে উঠেছিলেন বিলাসীপিসির বাড়িতে। ফিরে এসে সেই গল্প করেছিলেন সাতকাহন করে।

বিলাসীপিসিকে গাঁয়ে ঢুকতে দেবার ঘোর বিরোধী ছিল যারা, অঘোর জেঠু তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। সেই তিনিই সটান গিয়ে উঠবেন বিলাসীপিসির বাড়িতে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি তা। চিরকালই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ তিনি, ছেলেবেলাটা তার ভাটপাড়ার টোলে শাস্ত্র অধ্যায়নে কেটেছে। এক বাণীবিনোদ কাকা ছাড়া এ তল্লাটের কোনও ব্রাহ্মণই ভাটপাড়া-ফেরৎ নয়। সেই গুমোরটা চিরকালই প্রকাশ্যে পোষণ করতেন অঘোর জেঠু। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান কতটা, সে নিয়ে এলাকায় নানান মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু তাঁর আচার-নিষ্ঠা, নানাবিধ সংস্কার ও শুচিবাঈ অনেকের কাছে যুগপৎ ভয় ও সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাঁর শোবার ঘর থেকে ভেসে আসত, শয্যাত্যাগের মন্ত্র—ওঁ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী... ভানু-শশী-ভূমি সুতো, বুধশ্চ, গুরুশ্চ, শুক্রশ্চ শনি, রাহু, কেতু, কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম...। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সদর পুকুরের কোমর সমান জল থেকে ভেসে আসত সূর্যবন্দনার মন্ত্র, জবাকুসুম-সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্ন প্রণোতোস্মি দিবাকরম। দুপুরবেলায় দ্বিতীয়বারের স্নানপর্বের আগে আগে তেল মাখবার বেলায় তিনি আবৃত্তি করতেন, তেল মাখবার মন্ত্র, অশ্বত্থামা বলির্ব্যাস...। অন্নগ্রহণের প্রাক্কালে দেবতার উদ্দেশে অন্নদানের মন্ত্র—ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ কৃকয়ায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ,... এই মতে দুনিয়ার যাবতীয় দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে তবেই অন্নগ্রহণ করতেন তিনি। এমনকি, রাখী পূর্ণিমার দিনে যজমানদের হাতে রাখী পরাবার কালে, কামাখ্যা ভট্টর মতো পুরোহিতরা যখন মন্ত্র ছাড়াই রাখীটি পরিয়ে দিয়ে ডানহাতটি বাড়িয়ে দিত দক্ষিণার আশায়, বড়জোর, 'দানেবদ্ধ বলি রাজা / রাখী পরলি পইসা আন যা' বলে হেসে উঠত, অঘোর জেঠু কিন্তু কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন সম্পূর্ণ মন্ত্রটি, দানের্বদ্ধ বলিরাজা, দানবেন্দ্র মহাবল/তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল, মা চল।

মহেশ্বরী জেঠিমা, অঘোর জেঠুর স্ত্রী, শুনে আকাশ থেকে পড়েন, তুমি গিয়া রইলে বিলাসীর বাড়িতে?

অঘোর জেঠু বলেন, তার বাড়িতে মানে? তিনতলা বাড়ি। বিলাসী থাকে তিন তলায়। দোতলাটা প্রায় ফাঁকা। তারই একটা ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। গঙ্গাজল দিয়া ঘরদোর মুছিয়া দিল। রান্নাবান্নার তরে বামুন ঠাকুর। একটা বামুনের ছেলেকে বহাল কল্ল, সে আমার সন্ধ্য-আহ্নিকের ব্যবস্থা কত্ত, বাজার থিকে ফুল-বেলপাতা, পেঁড়া, নকুলদানা, ধূপ-ধুনা কিনিয়া আনত, চন্দন ঘসিয়া দিত, প্রদীপ জ্বালিয়া দিত...। তাবাদে—। অঘোর চক্কোত্তি মোলায়েম করে তাকান ধর্মপত্নীর দিকে,—তাবাদে, তুমরা দূর থিকে যা ভাব, বিলাসীর জীবনটা আদৌ তেমন নয়। প্রত্যহ সে গঙ্গাস্নানে যায়, অনেক বেলা অবধি পুজোআচ্চা করে, স্বপাকে খায়, আমি তো তাকে বেচাল হইতে দেখিনি কোনওদিন।

হিরন্ময় মুখুজ্জ্যাও গিয়েছিলেন বার কয়। তাঁর গল্প পরে শুনেছি খোদ বিলাসীপিসির মুখে।

তখন আমি কলেজ থেকে পাশ করেছি সদ্য। তখন বিলাসীপিসির সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা চলত। মানে, বিলাসীপিসিই অকপটে বলত এমন সব কথা, যা সমবয়েসি বন্ধুবান্ধবকেই সচরাচর বলে-টলে মানুষ।

বিলাসীপিসি বলত, তুই বড় হয়েছিস, ষোল পারালে বাপ-ছেলেই বন্ধু হয়ে যায়, তোর কাছে আর ঢাকঢাক গুড়গুড় করে লাভ কি?

হিরন্ময় মুখুজ্জ্যাও হাইকোর্টে মামলার দিন পড়ায় গিয়েছিলেন বারকয়। আগে থাকতেন মাঝারিগোছের হোটেলে, জনেজনে বিলাসীপিসির ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করায় একদিন খোদ গিয়ে উঠলেন বিলাসীপিসির বাড়িতে। গাঁয়ের সবচেয়ে রইস মানুষ তিনি, নাই বা রইল জমিদারি, আগের দিনের ঠাটবাট, হলেনই বা ভেতরে ভেতরে গেঁয়ো গোছের মানুষ, তবুও যতই হোক, গাঁয়ের জমিদার বংশের মানুষ তো তিনি, কাজেই বিলাসীপিসি তাঁকে দেখা মাত্তর বুঝি আকাশের চাঁদ পায় হাতে। কী করবে, কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে, তাল পায় না বুঝি। দিন তিনেকের জন্য গিয়েছিলেন হিরন্ময়, হপ্তা পার করে ফেরেন।

ওঁর গদগদ ভাব দেখে, এবং চোখ-মুখের রেখায় আরও কিছু সুস্পষ্ট ভাবান্তর দেখে মুখ ভার হয়ে আসে স্ত্রী রত্নহীরার। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন, মজাটা তাহলে খুবই জমেছিল, কী বল?

—মজা? মজা মানে? হিরন্ময় যেন আকাশ থেকে পড়েন।

সে কথায় ঝমঝমিয়ে বেজে ওঠেন রত্নহীরা, ন্যাকা। এতদিন ঘর করছি, তোমাকে আমি চিনি না? তোমার গুণের শেষ আছে? তাবাদে, সে মাগীকে আমি দেখিনি? ঠমক দেখলে গা জ্বলে যায়।

হিরন্ময় খুবই অপ্রস্তুত বোধ করেন, কী যে বল? সে আমার বোনের মতন।

সে কথায় রত্নহীরা অগ্নিমূর্তি ধরেন, আর মুখ খুলো না তুমি। আর বোন দেখিও না। তোমার পাল্লায় পড়ে কত 'বোন'কেই তো পেট ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। বলতে বলতে প্রবল রোষে অভিমানে চোখের জল সামলাতে পারেন না রত্নহীরা।

হিরন্ময় সম্পর্কে এমন ধারণা তো কেবল রত্নহীরারই নয়, এ তল্লাটের সকলেরই। এদের রক্তেই লুকিয়ে রয়েছে লাম্পট্যের বীজ। হিরন্ময়ের বাপ-ঠাকুর্দা যে সারা জীবন কত মেয়ের সর্বনাশ করেছেন, তার বুঝি কোনও ইয়ত্তা নেই। সেসব দিনে, এলাকার জমিদার তারা, পারলে হাতে মাথা কাটে, প্রজাদের ঘরের সুন্দরী বউড়ি-ঝিউড়ি দেখলে লকলকিয়ে উঠত জিভ। হিরন্ময়ও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন তা। তবে এখন তো আগের মতো দিনকাল নেই, মানুষজনও বদলে গেছে অনেক। এখন আর ইচ্ছেটি প্রকাশ করা মাত্র ভূতপূর্ব প্রজারা তাদের ঘরের মেয়েটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেবে না বাবুর বাগানবাড়িতে। তবুও চিরকেলে অভ্যেস তো সহজে যাওয়ার নয়। হিরন্ময়ও অভ্যেসটা ছাড়তে পারেননি।

তো, অনেক পরে বিলাসীপিসি খুব মজা করে বলেছিল হিরন্ময় মুখুজ্জ্যর কীর্তির কিস্যা। তখন আমি ওর ভাইপোকে ভাইপো, বন্ধুকে বন্ধু।

হিরন্ময় সম্পর্কে সাতকাহন করে বলেছিল বিলাসীপিসি চাকর-বাকর, রাঁধুনি, দারোয়ান, সব্বাইয়ের

কাছে। বিশেষ করে বিষেণ সিংয়ের ওপর স্পেশাল নির্দেশ ছিল, বাবুর যেন কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র অসুবিধে না হয়, কেন কি, তিনি আমাদের গাঁয়ের রাজাবাবু, আমাদের অন্নদাতা, এঁদের প্রজা হিসেবে আমরা কাটিয়েছি পুরুষানুক্রমে।

হিরন্ময়কে দেখতে দেখতে বিষেণ সিংয়ের দু'চোখে বিস্ময় জমাট বাঁধে, কি না, এই গেঁয়ো গোছের মানুষটি, পরনের ধুতিটা বেশ দামি হলেও নিয়মিত ধোপ-ইস্ত্রী বিহনে মহিমাটা যারপরনাই ম্লান, এই গরমকালেও নস্যিরঙের সার্জের পাঞ্জাবি পরেছে, দামি পাম্প-শু কিন্তু তার খাঁজে খাঁজে লাল ধুলোর আস্তরণ, চোখে-মুখেও সেই রাজা সুলভ গাম্ভীর্য-অহমিকা নেই, বরং এই বিশাল শহরে এসে কিঞ্চিৎ বিহ্বল, যেন জলের মাছটিকে ডাঙায় তোলা হয়েছে।

বিষেণ সিং অন্তরালে শুধোয়, মা, এ আপনাদের রাজাবাবু আছেন?

বিলাসীপিসি বুঝতে পারেন, হিরন্ময় নামক অর্থশালী গ্রাম্য মানুষটিকে 'রাজাবাবু' হিসেবে ঠিক পছন্দ হচ্ছে না বিষেণ সিংয়ের। বলেন, রাজাবাবুই তো রে। আসলে, গাঁয়ের মানুষ তো, শহরের ঝাঁ-চকচকে ব্যাপারটা নেই। খবর্দার, কোনও অসম্মান না হয়। গাঁয়ে ইনিই আমার বাপ-ভাইদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

বিষেণ সিং তিলমাত্র কসুর করেনি। যে ক'দিন হিরন্ময় থাকতেন বিলাসীপিসির বাড়িতে, বিষেণ সিং তাঁর সব হুকুম তামিল করবার জন্য একপায়ে খাড়া। হিরন্ময় তার মুখে অষ্টপ্রহর 'রাজাবাবু' ডাক শুনে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করতেন হয়ত বা, কিন্তু ধীবে ধীরে সইয়ে নিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝেই বিলাসীপিসির কাছে এসে 'রাজাবাবুর' সম্পর্কে নানাবিধ শলা চাইত বিষেণ সিং, মা, রাজাবাবু সিগারেট আনতে বলছেন।

বিলাসীপিসি হেসে বলতেন, তো, নিয়ে আয়।

বিষেণ সিং বলত, কাঞ্চি সিগারেট মাগছেন। কেপস্টেন আনিযে দিবো?

বিলাসীপিসি বোঝেন, সিগারেট হিসেবে কাঁচি মার্কা বিষেণ সিংয়ের পছন্দ নয়, অথচ গাঁযে-ঘরে কাঁচি মার্কাই অভিজাত সিগারেট। সাধারণ সিগারেট বলতে তো নাম্বার-টেন কিংবা পাশিং-শো। গাঁয়েব মানুষেরা, হোক না 'রাজা বাবু', ক্যাপস্টেন অবধি পৌঁছয়নি। বিলাসীপিসি হেসে বলে, আনিয়ে দে, ক্যাপস্টেনই।

এমনই এক দিনে বিষেণ সিং এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, মা, রাজাবাবু বলছেন...।

—কী বলছেন? হালকা গলায় শুধোয় বিলাসীপিসি।

—সেটা বলতে আমার লাজ ভি লাগছে, ডর ভি। বিষেণ সিংয়ের চোখেমুখে নিদারুণ অস্বস্তি।

সামান্য বুঝি বিরক্ত হয় বিলাসীপিসি, অত কায়দা কচ্ছিস কেন? বল্ না, কী চাইছেন?

মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে বিষেণ সিং বলে, রাজাবাবু লেড়কি খুঁজছেন।

বাস্তবিক, বেশ কয়েকবার আসার এবং থাকার সুবাদে বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল হিরন্ময়ের। আর, বিলাসীপিসির মোস্ট অনারেবল মেহমান হিসেবে তাব কাছে হিরন্ময়ের কদরও ছিল খুব। তেমনি এক মুহূর্তে হিরন্ময় সবাসরি প্রস্তাবটা রাখেন বিষেণ সিংয়ের কাছে। এটা-ওটা বলে যা বোঝাতে চান, তার মমার্থ হল, গ্রামের জিনিস তে চাখা হল খুবই, কিন্তু শহুরে 'রেন্ডি'র স্বাদ ঠিক নেওয়া হয়নি এখনও অবধি। কেমন তাদের ঠাট-ঠমক, আদব-কায়দা, নাগালের বাইরেই থেকে গেছে আজতক্। তো, এমন সুযোগটা যখন পাওয়া গিয়েছে, যেখানে বিলাসীই ওদেব আড়তদার, তো সাধটা একবার মিটিয়েই নেওয়া যাক, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হোক।

কথাটা শোনামাত্র বিলাসীপিসি বুঝি বিস্ময়ে থ হয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ মুখ তুলে তাকাতে পারে না বিষেণ সিংয়ের দিকে। লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে তার ব্রহ্মতালুতে আগুন জ্বলতে থাকে। কোনও গতিকে বলে, গিয়ে বল, এখানে ওসব পাওয়া যায় না।

কিন্তু পরেরদিনই আবার বিষেণ সিং মাথা নিচু করে দাঁড়ায় বিলাসীপিসিব সামনে, রাজাবাবু বহুত জেদ করছেন, মা।

বিলাসীপিসি লজ্জায় মরে যেতে যেতে বলে, আমি কিছু জানি না। যা ভালো বুঝিস কব। বলতে

বলতে শাড়ির আঁচলে শীতের ঘাম দ্রুত মুছে ফেলে সে।

যা বোঝার বুঝে নিয়ে বিষেণ সিং ততক্ষণে পা বাড়িয়েছে বাইরের দিকে, বিলাসীপিসি পেছন থেকে বলে ওঠে, গাড়ি নিয়ে যাবি, গাড়ি করেই ফিরিয়ে আনবি।

পরে, বিলাসীপিসির মুখে কথাটা শুনে, আমি খুব অবাক হয়ে ওকে শুধিয়েছিলাম, তুমি রাজি হলে, পিসি?

বিলাসীপিসি দু'চোখে ঘোর মাখিয়ে বলে, হলাম রে। অনেক ভেবেচিন্তেই রাজি হয়েছিলাম। পুরুষ মানুষের খিদেটাকে আমি চিনি। খিদেটা না মেটা অবধি কী পাগল-পাগল অবস্থা হয় ওদের, আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। ওই খিদে নিয়ে লোকটাকে গাঁয়ে ফেরৎ পাঠালে, স্রেফ আক্রোশবশত তোদের সবাইয়েরই ক্ষতি করে দিত। ক্ষমতাবান মানুষ, যতই না কেন দিনকাল বদলাক, ক্ষতি করতে চাইলে ঠেকানো যেত না।

শুনতে শুনতে বিলাসীপিসিকে আরও একবার দুর্জ্ঞেয় ঠেকেছিল আমার।

যখন আমি প্রথম যাই বিলাসীপিসির বাড়িতে, ছোটকাকার হাত ধরে, সেই আমার ন'দশ বছর বয়সে, হিরন্ময় মুখুজ্জ্যের ঘটনাটা ঘটেছিল তারই কিছু আগে পরে। যেহেতু কলকাতা থেকে ফিরে এসে হিরন্ময় সেসব কাহিনি কারোর কাছেই ফাঁস করেননি, সন্ধিপুরের মানুষ জানতেই পারেনি তা। কাজেই হিরন্ময়ের এসব কীর্তির কথা তিলমাত্র জানা ছিল না আমার। তখন কলকাতা শহর, সেই শহরের বুকে বিলাসীপিসির বিশাল তিনতলা বাড়ি, দু'দুটো গাড়ি, চাকর-বাকর, লোক লস্কর—এইসব দেখতে দেখতেই মুগ্ধ, হতচকিত।

পথে যেতে যেতে সারাটা পথ ছোটকাকা আমাকে শহরের আদবকায়দা সম্পর্কে বুঝিয়েছে পাখি পড়ানোর কায়দায়। বলেছে, শহরে গিয়ে ট্রেনে-বাসে কারোর পা মাড়িয়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বলবি, সোরি। কেউ যদি বলে, চা খাবে? তো, সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলতে হবে, কেন কী, যার সত্যিসত্যি চা খাওয়াবার ইচ্ছে, সে চায়ের কাপটি ধরিয়া দিয়া বলবে, নাও, চা খাও, কিন্তু চা খাবে কি না জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে হবে, সে চাইছে যে তুই তার প্রশ্নের জবাবে 'না' বলিস। আর, সর্বদা আধপেটা খাবি, কেন না, শহরে সেটাই দস্তুর। শহরের মানুষ, যতই না ধনদৌলত থাক ওদের, খায় খুব কম। গাঁয়ের মতো বিড়াল ডিঙানো ভাত খাওয়া অচল ওখানে। আর, মিষ্টি, ফল, বিস্কুট যখন-যা খেতে দেবে, সবটা খাবিনি, অর্ধেকটা খাবি, কেন কী, শহরে কেউ একেবারে রেকাবি মুছিয়া খায় না, সেটা এক ধরনের হ্যাংলামি। ভাত খাওয়ার সময়ও অন্তত দু'তিন মুঠো ভাত ফেলিয়া রাখবি পাতে। একেবারে পাত মুছিয়া খায় না শহরের মানুষ।

—নষ্ট হবে যে? নষ্ট করাটা কী ভালো? আমি অবোধ গলায় শুধোই।

তাতে বুঝি সামান্য বিরক্ত হয় ছোট কাকা, ওরে বোকা, শহরে নষ্ট করাটাও আদবের মধ্যে পড়ে। যে জায়গার যা।

ছোটকাকা যে এতকিছু কেমন করে জানল, সেটাই বুঝতে পারি না আমি। চৌকস ফুটবল খেলোয়াড় সে, আমাদের তল্লাটে তার নামডাক খুবই। চতুর্দিকে খেপ খেটে বেড়ায় ম্যাচে, টুর্নামেন্টে। বড়জোর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, কলকাতায় এসেছে বারকয়। কী করে তবে জানল সে, শহরের আদবকায়দা সম্পর্কে এত এক কথা?

সেবারেও এমনি-এমনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যায়নি ছোটকাকা। একটা স্বপ্নও ছিল তার বুকে। বিলাসীপিসিকে ধরে-কয়ে যদি কলকাতার একটা টিমে চান্স পাওয়া যায় কোনও গতিকে তো পাথরে পাঁচ কিল। পিছু ফিরে আর তাকাতে হবে না তাহলে। কলকাতার মাঠে খেলতে খেলতে মরসুমের শেষে যখন বাড়ি যাবে দিনকয়েকের জন্য, রাস্তার দু'ধারে ছেলে-ছোকরার দল ফিসফিসিয়ে বলতে থাকবে, ওই দ্যাখ, শ্রীকান্ত দত্ত যাচ্ছে। কলকাতার পিলিয়ার। ফরোয়ার্ডে ফাটিয়া দিচ্ছে।

বিলাসী পিসির বাড়িতে পৌঁছনো মাত্তর আমার কয়েকটি বিষয়ে তাৎক্ষণিক আশাভঙ্গ হয়েছিল।

আমার কল্পনার সঙ্গে বিলাসীপিসির সংসারটা মেলেনি কিছুই। কেন কী, আমি মনে মনে এমনটা ভেবেই রওনা দিয়েছিলাম যে, বিলাসীপিসির তিনতলা মহলের সামনে বিশাল লোহার গেট থাকবে। মূল বাড়িটা থাকবে অনেক পেছনে। গেটের মুখে বিশালকায় হিন্দুস্থানী দারোয়ান, ধানসেদ্ধ হাঁড়ির মতো মুখখানি তার, ভাঁটার মতো চোখদুটি, আমাদের দেখামাত্তর বাজখাঁই গলায় বলে উঠবে, কিসকো মাংতা? গঞ্জের ছাউনি দেওয়া সিনেমা হলে তখনও অবধি দু'একটি যা ছবি দেখেছি, তাতে শহরের ধনী মানুষের অট্টালিকা বলতে তো তেমনই। গাঁয়ের গরিব ভাইপোটি জেঠার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে বাপ-মাকে অকালে হারিয়ে, কিন্তু দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দিল না ওদের, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল।

ভয়ে ভয়ে ছোটকাকাকে শুধিয়েছি, কাকু, দারোয়ান যদি আমাদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়?

ছোটকাকু হেসেছে, যদি ঢুকতে না দেয় তো, কলকাতার মাঠে একটা খেলা দেখিয়া ঘর ঘুরিয়াবো পুরী প্যাসেঞ্জারে।

বলি, আজও কি খেলা হবে?

ছোটকাকু জবাব দেয়, কলক্যাতার মাঠে সম্বৎসর খেলা চলে। একদিনও বিরাম নাই তার।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খুঁজেপেতে একে-ওকে শুধিয়ে যখন পৌঁছলাম বিলাসীপিসির চিৎপুরের বাড়িতে, বিষেণ সিং, সে বুঝি তিনতলা থেকেই দেখতে পেয়েছিল আমাদের, তরতরিয়ে নেমে এসে ছোটকাকার কাঁধের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সোজা নিয়ে যায় তিনতলায়। আর, বিলাসীপিসি তো আমাদের দেখে অবাক।

বিলাসীপিসির বাড়ির সামনে ইয়াব্বড় গেট নেই, তাইতেই আমার যাবতীয় স্বপ্নে প্রাথমিকভাবে চিড় ধরেছিল। তিনতলায় গিয়ে বিলাসীপিসিকে দেখা মাত্তর তা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

অতি সাধারণ একটি গরদেরর শাড়ি বিলাসীপিসির পরনে, নিরলঙ্কার শরীর, মুখে প্রসাধনের লেশমাত্র নেই, দেখতে দেখতে ভেবে ভেবে সারা হই আমি, এই কি সেই বিলাসীপিসি যাকে নিজের গাঁয়ে দেখেছিলাম সদাসর্বদা রাজ-রাজেশ্বরীর বেশে!

বিলাসীপিসি আমাকে দেখে বুঝি আকাশের চাঁদ পেল হাতে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে একসা।

বড় বড় তিনখানা শোবার ঘর তিনতলায়, একটা বসবার ঘর, এছাড়া বিলাসীপিসির নিজস্ব ঠাকুর ঘর, বিশাল ঝুলবারান্দা, চানের ঘর এবং পায়খানা দুটো করে। বসবার ঘরে ভারিভারি মেহগনি কাঠের সোফা। শোবার ঘরগুলোতে মেহগনি কাঠের বিশাল বিশাল পালঙ্ক। চানের ঘরে ফোয়ারা। ঘরে ঘরে ফ্যান ঝুলছে। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল তিনতলারই একটি ঘরে।

দুপুর নাগাদ গদি থেকে ফিরল কিষণলাল। বিলাসীপিসি গদগদ গলায় বলল আমাদের কথা। আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ওর সামনে।

কিষণলাল মানুষটি খুব নিরীহ গোছের। বড় একটা উচ্ছ্বাস ছিল না তার মধ্যে। সারাক্ষণ মুখমণ্ডল লেপটে থাকত এক ধরনের দুঃখী-দুঃখী ভাব। মৃদু হেসে বলল, পিসির কথা তবে এতদিনে মনে পড়ল?

যে ক'দিন ছিলাম আমরা, পদে পদে দেখেছি বিলাসীপিসির অনাড়ম্বর জীবন। গেরস্থালি দেখাশোনা করার পর যেটুকু সময় পেত ঠাকুরঘরেই কাটিয়ে দিত। অথচ ওই বয়েসেও তো নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলাম, বিলাসীপিসি এক অন্য জগতের মানুষ, সে জগতটা কিছু নিষ্কলঙ্ক নয়, এক কথায় বিলাসীপিসি খারাপ মেয়েছেলে। গজাননের ভাষায়, বেবুশ্যা। তখনও অবধি শব্দটার অর্থ পুরোপুরি জানা হয়ে ওঠেনি আমার, শব্দটার গভীরে ঢোকা ওই বয়েসে সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে, তবুও প্রচলিত একটা ধারণা, যতই অস্পষ্ট হোক তা, তৈরি তো হয়েছিল বিলাসীপিসি সম্পর্কে।

কিষণলালের সঙ্গে বিলাসীপিসির সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের, সেটাও ওই বয়েসে স্পষ্ট ছিল না আমার কাছে, তবে, এটুকু বুঝেছিলাম যে, জেঠুর সঙ্গে জেঠিমার যা সম্পর্ক, কিংবা বাবার সঙ্গে মায়ের, ওদের

দু'জনের সম্পর্কটা ঠিক ওই গোত্রের ছিল না। কোথাও জানি সম্পর্কটার মধ্যে এক ধরনের অবৈধতা ছিল বলে মনে হয়েছিল আমার। অথচ যেমন করে দিনের অনেকখানি সময় পুজোআচ্চার মধ্যে কাটিয়ে দিত বিলাসীপিসি, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণে এতটাই আটপৌরে ভাব ছিল, দেখতে দেখতে আমার ভাবতে খুবই কষ্ট হত যে বিলাসীপিসি সত্যিসত্যিই কোনও নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা। তখনও অবধি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়িনি, যখন পড়লাম, রাজলক্ষ্মীর কথা পড়তে পড়তে আমার সামনে আচমকা ভাসতে লাগল বিলাসীপিসির মুখ। দু'জনেই আমার চোখে হয়ে রইল স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর সমতুল।

বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে গাড়ি চড়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ালাম ক'দিন। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ সবকিছু দেখলাম একে একে। যেদিন বিদায় নিলাম, বিলাসীপিসি সারাটা সকাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

যে ক'দিন ছিলাম, বিলাসীপিসির পাশেই শুতাম। আমাকে একেবারে কাছটিতে টেনে নিত বিলাসীপিসি। অনেক রাত অবধি ঘুমোতে দিত না। খালি গল্প করত, আর এমন সব কথা বলত, যার মাথামুণ্ডু ছিল না।

এখন বুঝতে পারি, আমার সঙ্গে সওয়াল জবাবের মাধ্যমে বিলাসীপিসি রোমন্থন করত নিজের শৈশব-কৈশোরের দিনগুলিকে। আমার ওপর ভর করে সে পৌঁছে যেত, প্রতিরাতে, সন্ধিপুর গাঁয়ে ফেলে আসা নিজের শৈশব-কৈশোরে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই না শুধোত বিলাসীপিসি! হ্যাঁরে, তোরা শ্যামাপুকুরে চান করিস না গরমের দিনে? সে কী রে! অত বড় দীঘি, কাকচক্ষু জল, আমরা তো ইস্কুল থেকে ফিরেই, গরমের দিনে তো ইস্কুল বসত সকালে, ঝাঁপ দিতাম জলে, দুপুর গড়িয়ে উঠতাম। আর দীঘির পাড়ে ওই কাঁচামিঠে আমের গাছটা? খাসনে ওই গাছের আম? সে কি রে, চুরি করেই তো খেতে হয়। আমরা তো কচি অবস্থাতেই সাবাড় করে দিতাম গাছের অর্ধেক আম। তোরা নিশ্চয়ই গড়ানো দুপুরে উবুর-ডুবুর খেলিস? খেলিস না? তবে কী খেলিস তোরা? ফুটবল? এবার গিয়ে খেলিস একদিন, কী যে মজা! কী বললি, খেলতে জানিস নে? হাসালি তুই। গাঁয়ে জন্মেছিস কেন তবে? শহরে জন্মালেই পারতি। আর উবুর-ডুবুর খেলা আবার শিখতে লাগে নাকি? সোজা তো। একটা কাবলি ছোলার আকারের নুড়ি নিবি হাতে, ওটাকে নাচাতে নাচাতে ছড়া বলতে থাকবি, উবুর-ডুবুর পানকৌড়ি/ঘ্যাঁচ কলাতে ঘ্যাঁচ রৌরি/রায় রোম, পাটের থোম/কই যাউ রে শুঁয়ার্বনি পোক/গাছে, না পালায়—? একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা মুঠো তোর কোলের ওপর, অন্যটা তোর মাথায়। একটা ডাল, অন্যটা পালা। যার সঙ্গে খেলছিস তুই, তাকে বলে দিতে হবে তোর হাতের কোন মুঠোতে নুড়িটা রয়েছে? ঠিক বললে, তখন সে পাবে ছড়া আউড়ে নুড়ি লুকোনোর সুযোগ, ভুল বললে, আবার তুই নুড়ি লুকাবি। আমার সঙ্গে উবুর-ডুবুর খেলতে এলে অন্যজন যে মুঠোতেই লুকাক নুড়ি, ঠিক বুঝে ফেলতাম আমি। অথচ আমি নুড়ি লুকোলে তা আন্দাজ করতে হিমসিম খেত ওরা। এমন কায়দা করে শেষ মুহূর্তে যে কোন্ মুঠোতে রাখতাম, মালুম পেতনি কিছুতেই।

বলতে বলতে বিলাসীপিসি বাচ্চা মেয়ের মতো খিল-খিলিয়ে হাসতে থাকে।

বুঝতে পারি, কৈশোর নামক মায়াবি দিঘিটাতে ডুবছে-ভাসছে বিলাসীপিসি, মজা পাচ্ছে খুব।

—আর, ওই খেলাটা? ওই যে, ভাতে পড়ল মা-ছি/কোদাল দিয়ে চাঁ-ছি/কোদাল হল বোঁ-চা/ভাত খাবি না তরকারি খাবি, ধরত মুচির কানটা। বলেই আধো অন্ধকারে আমার কানটাকেই পাকড়ে ফেলে বিলাসীপিসি।

—হ্যাঁরে, মিলিটারি দাদু এখনও বাঁচিয়া আছে? আচমকা প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বিলাসীপিসি। অথচ জবাবটা ভালো করেই জানে সে। যখন গাঁয়ে গিয়েছিল, সব অন্ধিসন্ধিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে এর-ওর থেকে, তাও আমাকে মাঝে মাঝে তেমন-তেমনই সব প্রশ্ন শুধোচ্ছিল।

আসলে, কৈশোরের ওই দিঘিটাতে অবিরাম সাঁতার কাটতে চাইছিল বিলাসীপিসি। জল থেকে পাড়ে উঠতে চাইছিল না কিছুতেই।

শুধু যে রাতের বেলায় তা নয়, যে ক'দিন ছিলাম আমরা, বিলাসীপিসি প্রায় সারাক্ষণ সাঁতার কাটতে চাইত তার সেই ছেলেবেলার দিঘিটাতে। আচমকা হয়ত বা বলে উঠত, বল দেখি, গগনেশ্বরের কুরুমণ্ড়োড়া,/ল্যাংড়া বাঘকে মারলাম ডাণ্ডা। বারবার বলতে থাক, তাড়াতাড়ি। নাগাড়ে দশবার বলতে পারলে একটা ক্ষীরের নাড়ু দেব।

আমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠি, কেন কি আমি তো জানিই, ছড়াটা তাড়াতাড়ি বলতে থাকলে দু'তিনবারের পরই 'বাঘ'টা 'বাপ' হয়ে যাবে। বিলাসীপিসিরাও তবে ছেলেবেলায় মজার খেলাটা খেলেছে, সমবয়েসি সই-গঙ্গাজলদের সাথে!

বিলাসীপিসির বাড়িতে থাকাকালীনই আচমকা এক রহস্যময় মানুষকে দেখেছিলাম একদিন।

লোকটা ভিখিরের মতো ছিন্ন পোশাকে, একপা ধুলো নিয়ে এল, সদর দরজার মুখে বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বিষেণ সিং নেমে গিয়ে ওকে সামান্য টাকা দিল। লোকটা কুঁজোপানা হেঁটে ধীরপায়ে হারিয়ে গেল মানুষের ভিড়ে।

কৈশোরের কৌতূহল নিয়ে বিলাসীপিসিকে শুধিয়েছি, লোকটা কে, পিসি?

সারামুখে নিদারুণ তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বিলাসীপিসি জবাব দিয়েছে, ও কেউ নয়। একটা ভিখিরি।

অনেক পরে, তখন বড় হয়েছি অনেক, বিলাসীপিসির বাড়িতে আনাগোনা বেড়েছে, এক সময় জেনেছি লোকটার আসল পরিচয়।



কিষণলাল মারা যাওয়ার পরই বিলাসীপিসিব জীবনে একটু একটু করে নেমে আসতে থাকে দুর্যোগ। তখন আমি সবে আইনের ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।

মরবার আগে কিষণলাল তার যাবতীয় সম্পত্তি ও ব্যবসাপাতি উইল করে দিয়েছিল বিলাসীপিসির নামে। সে যেন জানত, কেমন করে যেন তার মধ্যে এমন বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। এমন কি, আমার এও মনে হত যে, কিষণলাল খুব নিশ্চিতভাবে জেনে গিয়েছিল, ঠিক কোন দিনটিতে সে মরবে। আনাগোনার সময় কোনও কোনওদিন আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত, কোনওদিন যখন যেতাম বিলাসীপিসিব বাড়িতে, হয়ত বা ও বাড়িতেই থাকত। হয়ত বা শোবার ঘরের পালঙ্কে বিলাসীপিসির কোলে মাথা রেখে চোখ মুদে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে দেখতাম ওকে। কিন্তু আমার মতো জোয়ান ছেলেকে দেখেও তিলমাত্র ভাবান্তর ঘটত না ওদের মধ্যে। কিষণলাল হয়ত বা আমার পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকাত, কিন্তু সেও তড়বড়িয়ে উঠে বসত না, বিলাসীপিসিও তড়িঘড়ি তার মাথাটা নামিয়ে দিত না কোল থেকে। যেন কোনওরূপ লজ্জাসরমের অতীত এমনই এক বৈধ স্বাভাবিক ঘটনা ওটা যে, জোয়ান ভাইপোর সামনেও তিলমাত্র লজ্জা সঙ্কোচের প্রশ্নই ওঠে না।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশটিতে বসতাম আমি। গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে বিলাসীপিসির ফর্সা আঙুলগুলো নিঃশব্দে খেলে বেড়াত কিষণলালের বিরলকেশ মাথা জুড়ে।

তেমনই দিনগুলোতে, কোনও কোনও একান্ত মুহূর্তে কিষণলাল আচমকা, হয়ত বা কোনও প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেই বলে উঠত, আর তো বেশিদিন বাঁচব না খোকাবাবু, সময় হয়ে এল। আর মাত্র ক'টা দিন। এমন করে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উচ্চারণ করত কথাগুলো, যেন মরবার খবর আগাম জেনে গিয়েছে মানুষটা, বুঝি নিশ্চিতভাবে শুনে ফেলেছে যমদূতদের পায়ের শব্দ...অদূরেই। এমনকি, ঠিক কবে ওরা এসে পৌঁছবে, তাও।

ওই সময়েই, কোনও কোনও একান্ত মুহূর্তে, যখন বিলাসীপিসি ধারেপাশে থাকত না, মরবার কথাটা বলবার পরপরই আমার দিকে খুব মিনতি-মাখানো চোখে তাকাত কিষণলাল। খুব বিনীত গলায়, একেবারে প্রার্থনা জানানোর ভঙ্গিতে বলত, আমি মরে গেলে, বিলাসীকে একটু দেখো খোকাবাবু। আমার অন্তে ওর নিজের বলতে আর কেউই থাকবে না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম কিষণলালের দিকে। এমন কথাটা কোন হিসেবে বলল সে?

কেন কি, সে তো ভালো করেই জানে, তার চারটে ভাই, সহোদরা দিদি, ভাইপো-ভাইঝি নিয়ে বিলাসীপিসির আত্মীয়-পরিজনের সংখ্যা তো মোটেই কম নয়, তাদের আনাগোনা তো দিন দিন বেড়েছে বৈ কমেনি। সেসব জেনেও কেমন করে কিষণলালের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাল যে, সে ছাড়া বিলাসীপিসির নিজের বলতে আর কেউই নেই! কেমন করেই বা তার মনে হল, মায়ের পেটের ভাই-বোন, ভাইপো-ভাইঝিরা থাকা সত্ত্বেও মাত্র সে-ই এই দুনিয়ায় বিলাসীপিসির একমাত্র আপনজন? সত্যি, এ দুনিয়ায় আপন-পর নির্ণয় করবার মাপকাঠিটা কতই না বিচিত্র, কতই না রহস্যময়। এক্কেবারেই বুঝি দুর্জ্ঞেয় তা।

কিষণলাল মরে যাওয়ার পরপরই যেটা এক্কেবরেই নাস্তানাবুদ করে ফেলল বিলাসীপিসিকে, তা হল, আত্মীয়-পরিজন, এমন কী জান-পহেজানদের হামলে পড়া। বিলাসীপিসিদের যত পুরনো গোমস্তা, বাজার সরকার, ব্যবসার জায়গার লোকজন, কিষণলালের জান-পহেজান, ব্যবসার পার্টনারেরা, তার নিজস্ব উকিল,—সকলেই চারপাশ থেকে একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগল ওরা বিলাসীপিসির সংসারে।

সন্ধিপুর থেকে জেঠু-জেঠিমা, কাকা-কাকিমারা, মোহরদি এবং তার বর, এবং বড়পিসি, তাবাদে গাঁয়েরই লোভী শেয়ালেরা কেউ কেউ, যারা কিনা ততদিনে নানা ছলছুতোয় আনাগোনাটা বাড়িয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব কলাটা, মুলোটা বাগিয়ে নিয়েছে সুযোগ মতো, এতকাল, সবাই এসে ভিড় জমাল বিলাসীপিসির চারপাশে। তার এই দুঃসময়ে কেউই তাকে ছেড়ে যেতে চায় না, কেন কি, সঙ্কটকালেই তো আপন-পর নির্ধারিত হয় এই দুনিয়ায়। সঙ্কটকালেই তুমি যদি পাশটিতে না রইতে পারলে, যদি ঘর-গেরস্থালির কাজবাজই তখন বড় হল তোমার কাছে, তবে তুমি কিসের বন্ধু হে, কিসের স্বজন?

বড়পিসি তো চারপাশের ভাবগতিক দেখে থেকেই যেতে চাইল বিলাসীপিসির কাছে, কেন কী, তখন নাকি ওর কাছে এক্কেবারে নিজের মানুষ অন্তত একজন কারুর থাকা উচিত।

অথচ, আমি তো ভালো মতোই বুঝতে পারছিলাম, বিলাসীপিসি তখন একান্তে বুক ভাসিয়ে কাঁদবার তরে একটুখানি নিরিবিলি চাইছিল আকুল মনে। মানুষটা চলে যাবার পর তো গলা ছেড়ে কাঁদবারও ফুরসত দিচ্ছে না ওরা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে একদলকে বিদেয় করছে তো, আর একদল এসে হাজির। অবশেষে যখন বুঝতে পারল যে ভেতরে ভেতরে বিলাসীপিসি যারপরনাই কঠিন স্বভাবের মহিলা, এবং এই শোকপর্ব পুরোপুরি না চুকলে সম্পত্তি ঘটিত কোনও সিদ্ধান্তই নেবে না সে, তখন সাময়িকভাবে বিদেয় হল সবাই।

বিলাসীপিসি অবশেষে একান্তে একটুখানি কাঁদবার সুযোগ পেল।

একদিন সুযোগ বুঝে বিলাসীপিসিকে বললাম, তোমাকে তো সবাই মিলে ছিঁড়িয়া খাবার তাল করতিছে, পিসি। আমার তো ভয় কচ্ছে।

সে কথায় বিলাসীপিসি বুঝি সামান্য সময়ের মতো অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এক সময় তেতো গলায় বলে, হ্যাঁ—জঙ্গলে জানোয়ার মরেছে, ছুঁচা-ইঁদুর-শিয়াল-কুকুর থেকে বাঘ-সিংহ অবধি সবাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে যায়, যে-যার বখরা।

কিষণলালের ছেড়ে যাওয়া বিশাল সম্পত্তিটা না হয় মরে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ জানোয়ার, কিন্তু এতদ্বারা বিলাসীপিসি কাদের ছুঁচো-ইঁদুর, কাদেরই বা বাঘ-সিংহ আখ্যা দিল বুঝতে পারিনি সেদিন। বুঝলাম, ক'দিন বাদে। অন্তত একটা ছুঁচোকে তো সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম, সে বুঝি লাশের খবরটা দেরিতে পেয়েছিল।

একদিন বিলাসীপিসির বাড়ির দরজার মুখে গিয়ে দেখি, একটা লোক জোর রগড়-জুড়েছে বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে।

চামচিকের মতো শরীর তার। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ওপরের পাটিতে সামনের দিকে দুটো দাঁত নেই। পরনে মলিন পোশাক লোকটার। পায়ে সস্তা চপ্পল।

লোকটাকে আমি চিনি। ওই ভিখিরিটা, যে কি না মাঝেমাঝেই বিলাসীপিসির সদর দরজার মুখে

বসে বসে কাতর নয়নে তাকাত তিনতলার দিকে, যেমন করে আশীর্বাদ কামনায় ঠাকুর-দ্যাবতার উদ্দেশে আকাশের দিকে তাকায় অর্থী মানুষ, এবং অনেকক্ষণ বাদে বিষেণ সিং নেমে এসে ওর হাড়সর্বস্ব হাতের চেটোয় গুটিকয় নোট গুঁজে দিলে, দু'চোখে প্রাপ্ত অর্থের স্বল্পতাজনিত নিষ্ফল রোষ ফুটিয়ে গুটি-গুটি চলে যেত।

আজ দেখলাম, তার অন্য মূর্তি। বেশভূষায় পরিবর্তন ঘটেনি কিছুই, কেবল মুখ ফুটছে খইয়ের মতো। চোখের মণিজোড়া বনবনিয়ে ঘুরছে চতুর্দিকে। সমানে সমানে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে বিষেণ সিংয়ের সঙ্গে।

তর্কের অন্তর্নিহিত কারণটা তখনও অবধি বুঝে উঠতে পারিনি আমি। বিষেণ সিংকেই শুধোই, কী হয়েছে সিংজী?

বিষেণ সিং আমার কথার জবাব দেবার আগেই চামচিকেপানা লোকটা ঘুরে দাঁড়ায় আমার দিকে। দু'চোখে প্রবল রোষ ফুটিয়ে বলে, দেখুন না দাদা, কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না ভেতরে।

বলি, ঢুকতে চাইছেন কেন?

আমার কথা শুনে তার চোখের মণি দুটো বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে ওঠে। বলে, বা-রে, এটা আমার বউয়ের বাড়ি নয়? আমার নিজের বিয়ে করা বউয়ের বাড়ি এটা। তার এখন কত বিপদ! অথচ এই শালা, দারোয়ান বৈ নয়, আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না, দেখুন। অথচ, আমার বিয়ে করা বউয়ের কাছে যাবার তো আমার রাইট রয়েছে, না কি?

ততক্ষণে চারপাশ থেকে ছেলে-ছোকরার দল ভিড় করেছে চারপাশে। মজা দেখছে ওরা। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা যেমন চেরা গলায় তেণ্ডাই-মেণ্ডাই করছে, রগড়টা জমবে।

এই বুঝি তবে বিলাসীপিসির ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করা স্বামী? আমার পূজনীয় পিসেমশাই? ভাবতে ভাবতে কখন জানি শরীরে তাবৎ রক্ত প্রবল বেগে ছুটতে লেগেছে ব্রহ্মতালুর দিকে। আমার আকৈশোর যত ক্রোধ, ঘৃণা, আক্রোশ তিলতিল জমেছে এই মানুষটার প্রতি, সবই বুঝি শরীর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় এক লহমায়।

তাও নিজেকে অতি কষ্টে সংযত রেখে লোকটার দিকে ঘনিষ্ঠ হই।

দু'চোখ কুঁচকে বলি, তুমি হীরালাল না?

লোকটা বুঝি খুবই অবাক হয়। আমি ওকে চিনে ফেলেছি, কাজেই নিজের পরিচয়টা আর কষ্ট করে প্রমাণ-সাবুদসহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে না এমন ধারণাবশত সহসা লোভী হয়ে ওঠে ওর চোখের মণি দুটো। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, কিন্তু আপনাকে তো দাদা—।

—দাদা কি? আমি স্বাভাবিক গলায় বলি, তুমি আমার পিসেমশাই যে। আমি তোমার শ্যালকের ছেলে। সন্ধিপুরের রতিকান্ত দত্ত, তোমার মেজো শালা, তারই ছেলে যে আমি।

শুনেই হীরালাল প্রবল বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। একেবারে বাকরুদ্ধ অবস্থা তার।

তাকে বিস্মিত হওয়ার জন্য অধিক সময় মঞ্জুর করতে সায় দেয় না মন। আচমকা হীরালাল এবং বিষেণ সিং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর নাকে ধাঁ করে এক ঘুঁষি মারি আমি। তিন-চার হাত দূরে ছিটকে পড়ে হীরালাল। নাক ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে অঝোরে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলি, শোন হে, আমার পিসির সাতপাকে ঘুরে বিয়ে করা স্বামী, আর একদিন যদি এ'তল্লাটে তোমায় দেখি তো সামনের দুটো দাঁত নেই, বাকিগুলোও থাকবে না। তাছাড়া, তোমার তো কীর্তির অন্ত নেই, খড়গপুরে গোলবাজার এলাকায় এখনও অবধি হয়ত বা তোমায় খুঁজছে পুলিশ। আমিই ওদের কষ্ট লাঘব করব, একেবারে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলে দোব ওদের হাতে।

নাক চেপে ধরে পিট পিট করে আমাকে দেখছিল হীরালাল, শুনছিল আমার কথাগুলো। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে তীরবেগে দৌড় মারে সে।

মুখ তুলে দেখি, তেতলার ঝুলবারান্দা থেকে পুরো দৃশ্যটা নিঃশব্দে দেখছে বিলাসীপিসি। আমার

সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র সরে গেল বারান্দা থেকে। তেতলায় উঠে গিয়ে বিলাসীপিসির চোখে চোখ রেখে বলি, এই বুঝি তোমার ওই ছুঁচোগুলোর একটা?

সেদিন আমার কথার জবাব দেয়নি বিলাসীপিসি। বেশ কিছুদিন বাদে আমার মাথাটি কোলে নিয়ে, চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলেছিল, আমার জন্য আর কার-কার ওপর চণ্ডাল-রাগ পুষে রেখেছিস, এই পাগল?



বাঘ-সিংহের উদয় হয়েছিল আরও মাস ছয়েক বাদে।

একদিন রাজস্থান থেকে সদলবলে এল কিষণলালের বউ-ছেলেরা। হম্বিতম্বি শুরু করে দিল বিলাসীপিসির ওপর। কিষণলালের বাড়িঘর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির দখল চায় ওরা উত্তরাধিকার বলে।

সেই সময়টাতে বিষেণ সিংয়ের বিক্রম স্বচক্ষে দেখেছি আমি। কিষণলালের পুরো গুষ্টিকে বারবার লাঠির ডগায় ভাগিয়ে দিয়েছে। তার এক কথা, আইন মতো কাগজ লে আও, দখল লাও, বাধা দিবো না আমি, জবরদস্তি ঢুকতে চাইলে হয় তোমরা মরবে, নচেৎ আমি।

সেই দিনগুলোতে কেবল বিষেণ সিংয়ের বিক্রমের কাছে হার মানতে হয়েছে ওদের, হাজার জোরজুলুম করেও তিলমাত্র টলাতে পারেনি ওকে। ওই সময়ে বিষেণ সিংয়ের আরও একটা পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি।

কিষণলালের ষণ্ডা ছেলেগুলো একদিন চিৎপুর এলাকার জগু গুণ্ডাকে প্রচুর টাকার বিনিময়ে নিয়ে আসে জবরদস্তি বিলাসীপিসিকে হটিয়ে দিতে।

আগের দিনই বিষেণ সিংকে হুমকি দিয়ে গিয়েছিল ওরা, কাল ফিন্ আসবো আমরা, এমন লোককে সঙ্গে আনব, দেখামাত্তর পেচ্ছাব করে ফেলবি তুই।

সেই মোতাবেক পরের দিন দলবলসহ জগু গুণ্ডাকে নিয়ে হাজির হয় ওরা। কিন্তু বিষেণ সিংয়ের মুখোমুখি হওয়া মাত্তর জগু প্রবল বিস্ময়ে এবং ততোধিক সম্ভ্রমে শুধিয়ে বলে, গুরু তুমি এখানে?

বিষেণ সিং তখন থরথরিয়ে কাঁপতে লেগেছে। বলে, তোর কথার জবাব পরে দিচ্ছি জগা, তার আগে, দাঁড়া, এই শের-কা বাচ্চা চুহার কথাটাকে রক্ষা করি। ও বলেছিল, তোকে দেখামাত্রই নাকি পেচ্ছাব করে ফেলব আমি।

বলতে বলতে বিষেণ সিং বাঁ-হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেলে কিষণলালের বড় ছেলেটার চুলের মুঠি। ওকে সজোরে জমিনের ওপর চেপে বসিয়ে রেখে, ডান হাত দিয়ে ধুতির কানা তুলে খানিকটা পেচ্ছাব করে দেয় ওর গায়ে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, শালা, জীয়ন্তে বাপের একটা খোঁজও নিসনি, মনস্তাপে পুড়তে পুড়তে অকালেই মরে গেল মানুষটা, এখন এসেছিস ছেলে সেজে বাপের সম্পত্তির দখল নিতে?

জগু গুণ্ডাই থামিয়ে-থুমিয়ে শান্ত করে বিষেণ সিংকে।

নিজেকে সামলে নিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলে বিষেণ সিং, শুন বেটা, তুই আমার মালিকের বেটা, তোর ওপর হাত ওঠাতে ভালো লাগবে না আমার। আমাকে মজবুর করিস না তুই। সাফ কথা শুনে লে, উইল আমার মা-জননীর নামে। কোর্টে গিয়ে সেটা বাতিল করিয়ে, দুশরা রায় লিয়ে আয়, আপোসেই তামাম সম্পত্তির দখল পেয়ে যাবি তোরা। আমিও বাধা দিব না, মালকিনও না।

ক'দিন বাদে প্রবল কৌতূহলবশে আমিই শুধিয়েছিলাম বিষেণ সিংকে, তোমাকে অমন ভয় পেল কেন জগু গুণ্ডা?

—ভয় নয়, খোকাবাবু। বিষেণ সিং হাসে,—ইমান দিল আমাকে।

—কেন?

সে কথায় বিষেণ সিং বুঝি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ধীরে ধীরে খুলে বলে তার আর

এক জীবনের কথা, যা এতকাল আমার কাছে পুরোপুরি অজানা ছিল।

বিষেণ সিং এককালে পুরো কলকাতার ত্রাস ছিল। সেই সুবাদে মহানগরীর একটা প্রধান পতিতাপল্লী ছিল তারই নিয়ন্ত্রণে। চেলা-চামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে সে পতিতাপল্লীর প্রতিটি ঘরে তোলা তুলত। তার বিনিময়ে পল্লীর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে। পল্লীর ঘরে কিংবা পুরো চৌহদ্দিতে কোনও ঝুটঝামেলা হলে কড়া হাতে তার মোকাবিলা করত বিষেণ সিং। বেপাড়ার কোনও উঠকো মস্তান পল্লীর মধ্যে এসে হুজ্জোতি করলে তাকে আর জান নিয়ে ফিরতে হত না। পল্লীর যে-কোনও ঘরেই তার ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। তাকে বাধা দেবার কিংবা তার প্রস্তাবে সায় না দেবার মতো বুকের পাটা ছিল না কারোরই। হাসতে হাসতে প্রতিপক্ষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে তার জুড়ি ছিল না।

তখন জগু ছিল বিষেণ সিংয়ের চেলাদের একজন। বলা যায় ওর ডান হাতই ছিল জগু। বিষেণের কাছেই তার এই লাইনের হাতেখড়ি। তারপর, বিষেণ সিং যখন লাইনটা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে চলে এল বিলাসীপিসির সঙ্গে, খুব আপসোস করেছিল জগু। গুরুকে প্রায় পায়ে ধরে সেধেছিল।

ওই নরকে আর ফিরে যায়নি বিষেণ সিং। এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিল লাইনটা।

পরবর্তীকালে জগু বানিয়ে নিয়েছে নিজের দল। এখন সে নিজেই তার দলের ওস্তাদ।

—কিন্তু লাইনটা ছাড়লে কেন তুমি? আমি বিষেণ সিংকে শুধোই।

—সে এক লম্বা কিস্যা খোকাবাবু। বিষেণ সিং হাসে, টাইম লাগবে পুরাটা বলতে। শুধু একটা কথাই বলে রাখি, দুনিয়ার সব মানুষের ভিতরেই দুটা আদমি থাকে। একটা সাচ্চা, একটা ঝুটা। দু'আদমির মধ্যে হরবখত লড়াই চলে। যে জিতে যায়, সে-ই হয় ওই মানুষটার মালিক।

বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিষেণ সিংয়ের মুখ। খুব রহস্যময় গলায় বলে, আমার বেলায় সাচ্চা আদমিটা জিতল।

বিষেণ সিংয়ের কাছে তিলমাত্র সুবিধে করতে না পেরে অবশেষে আদালতেরই শরণাপন্ন হয়েছিল কিষণলালের বউ-ছেলেরা। শহরেব নামকরা উকিলদের লাগিয়েছিল মামলা লড়বার জন্য।

সেই সময়টাতে এক অন্য বিলাসীপিসিকে চিনেছি আমি। ঠাণ্ডা মাথা, ইস্পাতের মতো কঠিন, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সাধারণ জ্ঞান দিয়ে আইনকে বিশ্লেষণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা। সব মিলিয়ে তখন সে এক সম্পূর্ণ আলাদা বিলাসীপিসি। সেও লাগিয়েছে শহরের সেরা উকিলদের। দিনরাত ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসছে, প্রায় সমানে সমানে তর্ক লড়ছে ওদের সঙ্গে।

তখন প্রায় রোজদিনই আমি যেতাম বিলাসীপিসির বাড়িতে। প্রায় সারাক্ষণই ওকে ঠাকুরঘরে বসে থাকতে দেখেছি তখন। কেবল আমি গেলেই বেরিয়ে আসত। কিছুক্ষণ গল্পগুজব, আদর করত। অনেক সময় অবলীলায় ছেলেবেলার প্রসঙ্গে চলে যেত। ছেলেবেলায় ঘটে যাওয়া মজার ঘটনাগুলোকে তুলে আনত স্মৃতির কৌটো থেকে। একে একে বিছিয়ে দিত আমার সামনে। এটা-ওটা রেঁধে খাওয়াত। এবং প্রতিবারেই জয়ার খবরাখবর নিত। জয়াকে নিয়েও আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা চলত। এবং সবশেষে আমাকে রোজদিনের মতো একই পরামর্শ দিত, কিনা, আমি যেন জয়াকে ভুল না বুঝি।

বলত, দ্যাখ শঙ্কর, নিজে মেয়ে হয়্যা তো বুঝি, মেয়েদের অনেক কিসিমের জ্বালা। অনেক সমস্যা আমাদের। প্রধান সমস্যা হল, ভয়। চারপাশ থেকে হরেক কিসিমের ভয়। হারিয়ে যাওয়ার ভয়, ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়, হাবিয়ে ফেলার, পিছলে পড়ার, তলিয়ে যাওয়ার—একরাশ ভয় লিয়াই জন্মায় এদেশের মেয়েরা। সারাক্ষণ হাজারো আশঙ্কায় কুঁকড়িয়া রইতে হয় আমাদের। জ্ঞান হবার সাথে সাথে এদেশের মেয়াদের বুকে জমাট বাঁধতে থাকে ভয়গুলি। জমতে জমতে ভয়ের পাহাড়। স্বামী-সংসার পাবে কিনা, পেলে কেমনতরো হবে তা, যদি ভালো হয় তো টিকবে কিনা,—সব মিলিয়ে সারাক্ষণ সিঁটিয়ে থাকতে হয় মেয়েদের। জয়াও কোনও কারণে ভয় পাচ্ছে বেজায়। তার ভয়টাকে চিনবার চেষ্টা কর। ভয়টাকে তাড়াবার চেষ্টা কর মন থিকে।

জয়ার ভয়টাকে বোধ করি আমি চিনতে পেরেছি এতদিনে। নিজের বাবাকে নিয়ে তার যে তিক্ততম অভিজ্ঞতা, তার থেকে সে রেহাই পাচ্ছে না কিছুতেই। অনিন্দ্যর পরামর্শ মতো আমি ওকে একটু একটু

করে শুনিয়েছি বিলাসীপিসির জীবনের সব কথা। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কোনও প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ করেনি কোনওদিন।

যেদিন কিষণলাল মারা গেল, শ্মশানযাত্রী হবার দরুন আমি সারাদিনই ছিলাম বিলাসীপিসিদের মধ্যে। জয়ার বাড়িতে যাবার কথা ছিল সেদিন, যেতে পারিনি। গভীর রাতে যখন ডেরায় ফিরলাম, সামনের চায়ের দোকানের ছেলেটার মুখে জানলাম, জয়া নাকি বিকেলে এবং সন্ধেয় এসেছিল আমার খোঁজে।

পরেরদিন জয়ার বাড়িতে পৌঁছেই লক্ষ করলাম জয়ার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

আমি কোনরূপ ভনিতা না করে কিষণলালের আকস্মিক মৃত্যুর কথা জানালাম ওকে।

শুনেটুনে জয়া যে খুব একটা বিচলিত হল, তেমনটা মনে হল না আমার। তবে যতখানি রোষ ফোটাবে আশা করেছিলাম, ততটা ফোটাল না। বরং এক সময় খুব ব্যঙ্গ সহকারে বলল, এবার তো লোকটার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি সবই তোমার পিসির?

এমন মন্তব্যে জয়াকে বড়ই নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল সেদিন, কেন কি, বিলাসীপিসির যতখানি বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে এসেছি আমি, একেবারে সর্বস্ব হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়েছে সে, ওই মুহূর্তে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে অমন ব্যঙ্গ জয়ার কাছ থেকে একেবারেই আশা করিনি আমি।

তারপর বিলাসীপিসির জীবনে এসেছে একের পর এক সঙ্কট। বিষয়ের লোভে রথী-মহারথীদের দল চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ওকে। ওর প্রাণ অতিষ্ট করে তুলেছে দিনের পর দিন। সবশেষে এসেছে কিষণলালের বউছেলেরা। পর্যাপ্ত জোরজুলুমের পর শেষ পর্যন্ত মামলা অবধি গড়িয়েছে তা। আমি প্রতিটি ঘটনা জানাতে থেকেছি জয়াকে। সব সময় যে নিজের থেকে জানাতে চেয়েছি তা নয়, জয়াই বরং, দু'চারদিন আমি চুপচাপ থাকলে পর, নিজের থেকেই জানতে চেয়েছে, তারপর? তোমার বিলাসীপিসির কী হল? ভাগ-বাঁটোয়ারা হল?

আমি জানি, বিলাসীপিসির জন্য জয়ার বুকে তিলমাত্র সমবেদনা নেই, কেবল মেয়েলি কৌতূহল মেটাতে, কিংবা হতে পারে বিলাসীপিসির সাংসারিক অবস্থাটা উপভোগ কববার জন্যই সে জানতে চাইত সেসব। সেই কারণে, অনেক সময় এড়িয়ে যেতে চাইতাম আমি। তাই দেখে বুঝি অসহিষ্ণু হয়ে উঠত জয়া, বলত, আহা, বলই না। আমি তো আব তোমার পিসিব বিষয়সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

মামলাটা যে জোর বেধেছে, জয়া তা জানে। মামলার ফল শেষ অবধি কার পক্ষে যায়, সেই আশঙ্কায়, আমার বাড়ির লোকজনেরা ঘন ঘন এসে যতটা সম্ভব বাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যেমন করে কি না, কোথাও একদলা চিনি পড়ে গেলে চিনির মালিক ওটা মুছিয়ে তুলে নেবার আগে আশেপাশের পিঁপড়ের দল মুখে মুখে যতটা সম্ভব তুলে নিয়ে পালাতে থাকে।

জয়া শুনতে শুনতে মজা পায় বুঝি। নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

জয়ার এই ধরনের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার কথা বিলাসীপিসিকে বলিনি কোনওদিন। পাছে সে দুঃখ পায়। তার বদলে বলি, ওর কণা পরে ভাবলেও চলবে গো পিসি। উপস্থিত ঠেকাটা সামলাও তুমি। তোমার কথা ভেবে রাতের বেলায় ভালো করে ঘুমোতে পারিনে আমি।

বিলাসীপিসি শিশুর মতো হাসে, ওই মামলাটার কথা বলছিস? ওই নিয়ে অত ভাবনার কী আছে রে পাগল? আমার কপালে যা-যা লেখা ছিল, তিলমাত্র খণ্ডাতে পারেনি কেউ। এবারেও পারবে না।

সারা মুখে আশঙ্কা ফুটিয়ে বলি, কিন্তু ধর যদি হেরে যাও?

—হ্যাঁ—। বিলাসীপিসি লম্বা করে হাই তোলে, মামলায় তো দুটোমাত্র ফলই হয়, হার নয় জিত। দুটিব বেশি তিনটি হওয়া তো সম্ভব নয়, কাজেই ও লিয়া ভাবিয়া কী লাভ? তার চেয়ে বল্ দেখ্নি, কী খাবি? খিদা পায়নি তোর? গোটা কতক গরম-গরম লুচি ভাজিয়া দিই?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি বিলাসীপিসির দিকে। যা নিয়ে আমারই মনে দুশ্চিন্তার শেষ নেই, ভালো করে ঘুমোতে অবধি পারছি না রাতে, বিলাসীপিসি কেমন করে ওই বিষয়ে অতখানি নির্বিকার থাকে, ভেবে ভেবে থই পাইনে আমি।

বাস্তবিক, ওইদিনগুলোতে বিলাসীপিসিকে দেখে মালুম হয়নি যে এটা তার জীবন-মরণের প্রশ্ন। ববং

আমাকে দেখামাত্রই কলকলিয়ে উঠত বাচ্চা মেয়ের মত, এই যে, শঙ্কর, তোর কথাই ভাবছিলাম। হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ের ওই ক্ষুদিরামের মা'টা, ওই যে রে, যমদূতেরা যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ফের, বুড়িটা বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গ্যাছে?

মামলা যখন মাঝপথে, তখনও ওপক্ষ থেকে উকিলের মাধ্যমে প্রস্তাব এসেছিল বিলাসীপিসির কাছে। বিষয় সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে যাক, অর্ধেক নিক বিলাসীপিসি, কেন কি রক্ষিতা হলেও সে আমাদের স্বর্গত বাপের অনেক সেবা-যত্ন করেছে, অনেক গু-মুত ঘেঁটেছে, বাকি অর্ধেক পেলেই আমরা মামলা তুলে নেব।

বিলাসীপিসি শুধু ঘৃণা ভরেই প্রত্যাখ্যানই করেনি প্রস্তাবটা, সদম্ভে বলেছে, অর্ধেক দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, মামলায় যদি জিতি তো খরচ-খরচাও আদায় করব ওদের থেকে। আর, বিলাসীপিসির উকিলদের মধ্যে যারা ওকে রাজি হয়ে যাওয়ার শলা দিচ্ছিল এই যুক্তিতে যে, উড়ন্ত দু'টি পাখির চেয়ে খাঁচার একটি পাখিই ভালো, তাদের উদ্দেশে বিলাসীপিসি বলেছিল, ভয় নেই, ওই খরচ-খরচা আদায়ের মামলাও লড়বেন আপনারাই। ফি পাবেন তার জন্য।

খবরটা শোনার পর, আমারও কেন জানি বেজায় রাগ হয়ে যায় বিলাসীপিসির ওপর। প্রস্তাবটা তো ভালোই এসেছিল। কেনই বা রাজি হয়ে গেল না বিলাসীপিসি? অত অত সম্পত্তি নিয়ে সে করবে কি? মামলাটা কতদিন চলবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? মাঝের থেকে গাদা-গাদা টাকার শ্রাদ্ধ, সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা—এসব ভালো লাগছে বিলাসীপিসির? বিষয়সম্পত্তির প্রতি এতটাই লালসা ওর মনে? তাও তো একেবারেই পরের সম্পত্তি, যাকে বলে পড়ে পাওয়া আঠারো আনা, ওই সম্পত্তিকে কব্জায় রাখবার জন্য বছরের পর বছর মামলা লড়ে যাবে বিলাসীপিসি? সারাক্ষণ ঠাকুরঘরে বসে বসে এই প্রার্থনাই তবে জানায় সে! ঠাকুর, পুরো সম্পত্তিটাই যেন আমার থাকে!

বিলাসী পিসিকে জিজ্ঞেস করায় সে প্রথমটায় চুপ মেরে থাকে। আমার প্রশ্নটাকে ওই উপায়েই এড়িয়ে যেতে চায় বারবার।

অবশেষে, আমার অবিরাম পীড়াপীড়িতে কবুল করে, হ্যাঁ, ওদের ছিটেফোঁটাও দিতে চাইনে আমি। কেন দেব? জীবনে যা-যা পেয়েছি আমি, তার ভাগ কেউ নিতে এসেছে? তবে এটার ভাগই বা কেন দেব ওদের? যত লাঞ্ছনা পেলাম, যত অপমান, অপবাদ, কলঙ্ক, সবই একলাকেই ভোগ করতে হল, আর কেবল সম্পত্তির বেলায় ভাগীদার?

বলতে বলতে বিলাসীপিসি অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, মাথাটা দু'দিকে প্রবলভাবে নাড়াতে নাড়াতে বিড়বিড় করে কিছু বলে, যা আমার বোধগম্য হয় না।

জয়া শুনে তিক্ত হাসি হাসে। বলে, তবে যে বড় বল, তোমার পিসির মনে একতিল লোভ-লালসা নেই?

ওই মুহূর্তে জয়ার মুখে এমন এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে, যা দেখে আমার মনে হয়, একটা মানুষকে ঠিক ঠিক চিনে ফেলবার মধ্যে যে তৃপ্তি, জয়া আমসত্ত্বের মতো উপভোগ করছে তা।

অবশেষে একদিন মামলার রায় বেরোল।

বিলাসীপিসির জিত হল।

শুনেটুনে কালিঘাটে পূজা দিতে গেল পিসি। মায়ের সুমুখে লুটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদল। তারপর চোখমুখ মুছে, পাণ্ডাকে আশাতীত দক্ষিণা দিয়ে গটমটিয়ে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠল।

সারা সন্ধে জুড়ে বিলাসীপিসির বাড়িতে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল। উকিলবাবুরা সপরিবারে এলেন, অনিন্দ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম। বিলাসীপিসি একবার বলেছিল, আজ জয়াকে লিয়া আসবি আমার কাছে?

বিলাসীপিসির প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম জয়াকে। খুব কঠিনভাবে সে প্রত্যাখান করেছে প্রস্তাবটা। আসলে আমার কথার জবাবই দেয়নি সে। তার বদলে শুধিয়েছে, তার মানে, আজ সন্ধেয় তোমাকে পাচ্ছি না?

আমি একাই গিয়েছিলাম, সঙ্গে অবশ্য অনিন্দ্যও ছিল। সারা সন্ধে এন্তার লাড্ডু, ক্ষীরের সন্দেশ, কোকাকোলা, বেশি রাতে বিরিয়ানি, মুর্গির চাপ, গ্র্যান্ড হোটেল থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল বিলাসীপিসি। এবং আমি অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলাম, বহুদিন বাদে, সেই প্রথম বিলাসীপিসির সারা মুখে বিশ্ববিজয়িনীর হাসি। সে সন্ধ্যায় সুন্দর করে সেজেছিল বিলাসীপিসি। সারা গায়ের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে গয়না চড়িয়েছিল, পরেছিল সোনার জরির কাজ করা ঝলমলে বেনারসী। এবং সারাক্ষণ কথায় কথায় উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ছিল।

বিলাসীপিসির ওই আগ্রাসী মূর্তিকে মেনে নিতে বড়ই কষ্ট হয়েছিল সে রাতে। মুরগি-মটন গলা দিয়ে নাবতে চায়নি কিছুতেই। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা আমার চেনা বিলাসীপিসি একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিল ওই রাতে, তার বদলে যাকে দেখেছিলাম, সে এক প্রথম শ্রেণীর মক্ষীরানী, যে কি না আমার একেবারেই অচেনা।

ডেরায় ফিরে সারারাত একতিল ঘুমোতে পারিনি আমি। একটু বেলায় ঘুম ভেঙেছিল। বিলাসীপিসি আগের রাতেই বলে দিয়েছিল, কাল সকাল-সকাল চলে আসিস শঙ্কর, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙা মাত্রই আমার ভেতর থেকে এক ধবনের প্রতিরোধ আসতে থাকে। অবাক হয়ে লক্ষ করি, বিলাসীপিসির বাড়ি যাবার ইচ্ছেটাই কখন জানি হারিয়ে গিয়েছে।

বড়পিসিকেও কোনওদিন ঠিকটাক চিনতে পারিনি আমি, বিলাসীপিসিও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে গেল।

সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি বড়পিসিকে। কাঁচা বয়েসে সর্বস্ব হারিয়ে বাপ-ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিয়েছিল সে। তারপর থেকে নিজের সংসাব বলতে আর কিছুই জোটেনি। কিন্তু বাপ-ভাইয়ের সংসারে থাকতে থাকতে ওই সংসাবটাকে কেমন দশ মুখ দিয়ে গিলতে থেকেছে আজীবনকাল। পরের সংসারের ওপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য কায়েম করতে গিয়ে তিল তিল কত ষড়যন্ত্রেব নায়িকা হয়েছে, কত নিচেই না নেমেছে একটু একটু করে। দেখেছি, যখন তার স্বামী সন্তান বলে কেউ নেই, স্বপ্ন-সাধগুলি মেটাবার তিলমাত্র জায়গা নেই এই দুনিয়ায়, তা সত্ত্বেও বিলাসীপিসির সোনাদানা, টাকাপয়সার প্রতি তার কী দুর্নিবার লালসা ছিল! কিষণলালের মৃত্যুর পর, পাছে অন্য কেউ হাতিয়ে নেয় সেই সাতরাজার ধন, সেই ভয়ে বড়পিসি বারবার থেকে যেতে চেয়েছিল বিলাসীপিসির কাছে। বড় অবাক লাগে আমার, বিলাসীপিসির সোনাদানা, অর্থবৈভবের একটা অংশ যদি কোনও গতিকে চলে আসত বড়পিসির কাছে, ওগুলো নিয়ে বাস্তবিক কী করত সে? বিধবা মানুষ, একেবারে নিজের বলতে তো কেউই নেই দুনিয়ায়, কেমন করে ভোগ করত ওই সম্পদ?

বিলাসীপিসিরও তো একই অবস্থা। স্বামী থেকেও নেই, বিধবারই সমতুল তার জীবন, এমন নখেদাঁতে লড়াই করে যে নিজের কব্জায় ফিরে পেল এই বিশাল সম্পত্তি, এমন নখেদাঁতে লড়ল তার জন্য, কেমন করে ভোগ করবে অতঅত সম্পদ? আর ভোগই যদি না করতে পারে তো কিসের জন্য করল অতসব?

সারা সকাল দোটানার মধ্যে থেকে অবশেষে একটু বেশি বেলায় গেলাম বিলাসীপিসির বাড়িতে। দেখলাম, সেই আগের মতো নিরাভরণ আটপৌরে বিলাসীপিসি, ঠাকুর ঘরে বসে বসে চন্দন ঘসছে, আর, তার শরীরে এক দানাও গয়না নেই। সদ্য বুঝি স্নান সেরেছে বিলাসীপিসি, ভেজা চুলের রাশ এলিয়ে পড়েছে পিঠে, চুল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলে ভিজে গেছে ওর পিঠের ব্লাউজ।

খুব নরম গলায় বলল, শঙ্কর এলি? অত দেরি করলি যে? বলতে বলতে হঠাৎই খুব উচ্ছ্বসিত গলায় শুধিয়ে বসে, হ্যাঁরে, ওই যে গানটা, কোন মাসে কোন জিনিসটা খেতে ভালো, ওই যে রে, যেটা গেয়ে গেয়ে চাঙ্গল-বুড়া চাঙ্গল বাজিয়ে বাজিয়ে ভিক্ষা করত, ওই যে, মাঘেতে মকর মিঠা, আর মিঠা

সীম/ফাগুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্তাকুতে নিম/...পুরোটা মনে আছে তোর? নেই? কী যে আজকালকার ছেলে তোরা বাপু, আমাদের তো পুরোটাই মুখস্থ ছিল, গড়গড়িয়ে বলে দিতে পারতাম কেউ শুধোলে/আচ্ছা, নাই মনে থাক, ওইটা বল তো...।

আমি আমার চেনা বিলাসীপিসিকে ফিরে পেলাম বটে, কিন্তু গেল রাতের ওই অচেনা সালঙ্কারা রূপসি মহিলা আমার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে অবিরাম। বলি, ডেকেছ কেন?

সেকথায় বিলাসীপিসি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। বলে, ডেকেছি মানে? না ডাকলে তুই আসবি না নাকি?

বলি, তা নয়, গেল-রাতে বললে না? কী যেন কথা আছে।

—আছেই তো। থাকতেই পারে। পিসি-ভাইপোতে কথার কোনও অভাব আছে? কী খাবি বল? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? হরির মা, খানিকটা আতপ চাল ভিজিয়ে দাও তো। দাঁড়া, একটা নতুন খাবার বানাবো তোর জন্য। এই আমার হয়ে এল, চন্দনটা ঘষে ফেললেই, তুই বরং আমার শোবার ঘরে গিয়ে আরাম করে শুয়ে থাক। আমি এলাম বলে।

বুঝতে পারি, কোনও কারণে বেজায় অপ্রস্তুত বোধ করছে বিলাসীপিসি মনে মনে। ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হতে পারে, গেল রাতের ওই রাজেশ্বরী বেশধারণ এবং দৃষ্টিকটু হই-হুল্লোড় করে-টরে লজ্জা পেয়েছে রাত পোহাতেই। হতে পারে, কিষণলালের ওই বিশাল সম্পত্তিটা একেবারে নখ-দাঁত চালিয়ে কব্জা করবার পর অস্বস্তি বোধ করছে মনে মনে, বিশেষত আমার সামনে, কেন কি, আমি যে ওকে কী পরিমাণ অন্য চোখে দেখি, কী পরিমাণ মহিয়সী ভাবি, সেটা তো জানে বিলাসীপিসি। আর, ভেতরের ওই অস্বস্তিটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই বোধ করি বেশি মাত্রায় প্রগলভ হয়ে উঠেছে আজ।

আমি পায়ে পায়ে চলে যাই বিলাসীপিসির শোবার ঘরে। বিছানায় পা ছড়িয়ে শুই। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি এক দৃষ্টিতে। এক সময় সিলিংয়ের গায়ে বুক চিতিয়ে শুয়ে থাকা টিকটিকিটা আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

সিলিংয়র ওপর টিকটিকিটা স্থির, নিস্পন্দ। ইঞ্চি ছয়েক দূরে একটা পোকা। ওই পোকাটাকে নিশানা করেছে টিকটিকিটা। অতি সন্তর্পনে চুল-প্রমাণ এগোচ্ছে, আবার পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে এক মিনিটের মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চিটাক এগোল টিকটিকিটা। আরও প্রায় সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি মতো পথ অতিক্রম করলে তবেই মিলবে ইষ্ট।

আমি কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিলাম না ওটার থেকে। এমনকি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। যদি আমার সামান্য অমনোযোগিতার সুযোগে খানিকটা পথ এগিয়ে যায় ওটা! যদি আমি দেখতে না পাই ওই এগিয়ে যাওয়াটা! উল্টো দিকে পোকাটাও পাথরের মতো স্থির। হয়ত বা দেখতে পায়নি অদ্দুর থেকে, ওর দিকে গুঁড়ি মেরে মেরে নিশ্চিত নিশানায় এগিয়ে আসছে ওর সাক্ষাৎ যম। হয়ত বা টেরই পায়নি এখনও অবধি। কিংবা টের পাওয়া সত্ত্বেও হয়ত বা ঠিক আমার মতোই নড়তে পারছে না টিকটিকিটাও। আমার মতোই সরাতে পারছে না দৃষ্টি। হয়ত বা ঠিক আমার মতোই সম্মোহিত অবস্থা পোকাটারও।

মিনিটখানেক বাদে আরও ইঞ্চিটাক পথ এগোল টিকটিকিটা। অর্থাৎ কি না আরও সাড়ে চার ইঞ্চি পথ বাকি ওর। বুঝতে পারি, আমার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা শুরু হয়েছে। বুকের মধ্যে গুরুগুরু ভয়। টিকটিকিটা পারবে তো শেষ অবধি? আচমকা পোকাটা উড়ে যাবে না তো? টেনশনে চোখের পলক অবধি ফেলছি না। নিঃশ্বাসও নিচ্ছি অতি সাবধানে। একটু একটু করে, ওই টিকটিকিটার মতো, কিংবা পোকাটার মতোই, পাথর হয়ে যাচ্ছি আমি।

যখন আর ইঞ্চি তিনেকের পথ, দৃষ্টির একটা ক্ষুদ্র বৃত্ত বানিয়ে পোকাটাকে ওই বৃত্তের মধ্যে বন্দী রেখে নিষ্পলক পাহারা দিয়ে চলেছি আমি। পাথরের মতো জমে গিয়েছি অনেকক্ষণ। দম বন্ধ হয়ে আসছে, হৃদপিণ্ড থেমে আসছে বুঝি। টিকটিকিটার চোখদুটো পোকাটার ওপর একেবারে স্থির। আর, আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে টিকটিকিটার ওপর, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্যও ওটার থেকে

দৃষ্টি সরাতে পারছি না আমি, কেন কি, আমার ভয়, আশঙ্কা, যদি আমি একটুখানি নড়লেই, এমনকি দৃষ্টিটা ওর থেকে সরিয়ে আনতেই গেলেই টিকটিকিটার অখণ্ড মনোযোগে চিড় ধরে, আর, তাহলেই যদি তার শরীরটা সামান্য নড়েচড়ে ওঠে তো পোকাটা নিমেষের মধ্যে উড়ে পালাবে।

এক সময় মনে হল, পোকাটা নয়, টিকটিকিটার অখণ্ড নিশানার মধ্যে আটকে গিয়েছি আমিই। নড়তে-চড়তে পারছি না, পলক ফেলতে পারছি না, ভালো করে দম নিতে পারছি না। বাঁ গালটা চুলকোচ্ছে অনেকক্ষণ, সহ্য করে চলেছি অপরিসীম ধৈর্যে।

চকিতে মনে হল, আমিই কি তবে ওর নিশানা, আমাকেই কি দৃষ্টির সম্মোহনে আটকে ফেলেছে টিকটিকিটা, গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে কি আমারই দিকে? আমিই কি ওর খাদ্য? শেষ মুহূর্ত কি ঘনিয়ে এসেছে আমার? বাঁচতে হলে কি এখনই উড়ে পালানো উচিত? কিন্তু উড়তে গিয়েই অনুভব করি, তিলমাত্র পারছি না আমি, এমন কি আমার সাক্ষাৎ যমটির থেকে তিলেকের তরেও সরাতে পারছি না নজর। ওর শরীরে দুনিয়ার সবচেয়ে চড়া অ্যাডহেশিভ দিয়ে বুঝি আটকে গিয়েছে আমার মণিজোড়া।

ভীষণ ভয় করছিল, ভয়ের তানে চোখ বন্ধ করে ফেলতে গিয়ে বুঝতে পারি, শক্ত হয়ে জমে গিয়েছে চোখের পাতা, বন্ধ করব কী, নাড়াতেই পারছি না। হায় ভগবান, তবে কি টিকটিকিটা আজ সত্যি সত্যিই গিলে ফেলবে আমায়?

যখন আর মাত্র ইঞ্চি দুয়েক পথ বাকি, সহসা আমার শরীরটা শিরশির করে উঠল। নাভিমূলে আলতো সুড়সুড়ি। নিয়ম মতো আর গুঁড়ি মেরে মেরে এগোনো নয়, এবার মুখের মধ্যে ভাঁজ করে রাখা জিভটাকে এক লহমায় ছুটিয়ে দিয়ে পোকাটাকে গেঁথে ফেলা এবং পোকা শুদ্ধু জিভটাকে পুনরায় মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া। এখন যে-কোনও মুহূর্তে, এমন কি মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যেও ঘটে যেতে পারে ব্যাপারটা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি ক্ষণ গুনছি তারই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিলাসীপিসি ঢুকল ঘরে, শঙ্কর, এই যে, এ কী রে অত কুলকুলিয়ে ঘামছিস কেন? পাখাটা চালাচ্ছিস নে কেন? বলতে বলতে বিলাসীপিসি পাখার সুইচ অন করে দিয়েই ফিরে আসে আমার কাছে, আর ওইসবের মধ্যে পোকাটা যে কোথায় যায়, উড়েই পালায়, নাকি টিকটিকিটার পেটে, ঠাহর পাই না আমি।

বিলাসীপিসির চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠার পাশাপাশি কপট রোষও। বলে, ইস, অত ঘামছিস কেন? কী হয়েছে তোর? বলতে বলতে আঁচল দিয়ে আমার মাথা, মুখ, ঘাড়, গলা পরিপাটি করে মুছিয়ে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে গজগজ করতে থাকে সমানে। বলে, নিজে নিজে পাখাটাও খুলে নিতে পারিস নে তুই? এই জন্যই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি আজ। এই কথাটাই বলতে। এবার জয়াকে বিয়ে কর তুই। যে ছেলে নিজের থেকে পাখাটাও অবধি খুলতে পারে না, কুলুকলিয়ে ঘামতে থাকে শুয়ে শুয়ে, না, না, সামনের মাসেই বিয়ে কর জয়াকে। আমি কোনও কথা শুনতে চাইনে।



মামলায় হেরে ভূত হয়ে গিয়ে, অবশেষে একদিন কিষণলালের তিন ছেলে এসে হামলে পড়ে বিলাসীপিসির কাছে। একেবারে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে তিনজনে। পাদুটো জড়িয়ে ধরে আকুল গলায় কাঁদতে থাকে।

বলে, তুমি আমাদের মা। আমরা তোমার ছেলে। আমাদের দয়া কর মা। বাপের সম্পত্তি থেকে একেবারেই বঞ্চিত কোর না আমাদের। বাপের সম্পত্তির প্রতি চিরকালই আশা থাকে তার সন্তানদের, সেই আশায় তুমি ছাই ঢেলে দিও না মা। দোহাই তোমার।

কিষণলালের তিন ছেলেকে পায়ে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বিলাসীপিসি। দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলে নিঃশব্দে।

এক সময় ওদের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, কতটা চাস তোরা? কতটা পেলে মন ভরবে?

কিষণলালের ছেলেগুলো আরও শক্ত করে জাপটে ধরে বিলাসীপিসির পা; একযোগে কঁকিয়ে ওঠে,

অন্তত সিকি অংশ দাও মা, তিনভাই আর মা'তে মিলে ভাগ করে নেব। তাতেও তোমার ঢের থাকবে মা।

—তা থাকবে। বিলাসীপিসির গলায় কোনও তাপ-উত্তাপ নেই,—একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশি। সেক্ষেত্রে আধা অংশও চাইতে পারিস তোরা। তাতেও আমার ঢের থাকবে।

কিষণলালের ছেলেগুলো দু'চোখে সংশয় নিয়ে তাকায় বিলাসীপিসির দিকে, তামাশা করছে না তো বিলাসীপিসি? পরক্ষণেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলি দেওয়া চালকুমড়োর মতো। বলে, তাই দাও মা, তাও তোমার ঢের থাকবে মা, তোমার জয় হোক মা, রানী ভবানী তোমায় সুখে রাখুন মা, বাবা একলিঙ্গেশ্বর তোমার সহায় হোন মা... আমরা নিতান্তই অধম মা, অন্যের কথায় নেচে নিজের মায়ের সঙ্গে মামলা করেছি, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি।

একেবারে পাথরের মতো খাড়া থেকে কিষণলালের ছেলেদের প্রতিটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনছিল বিলাসীপিসি। ওদের দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে থেকে ওদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে বুঝি পরিপাক করছিল নিঃশব্দে। এক সময় খুব নিরাসক্ত গলায় বলে ওঠে, তোদের পুরোটাই দিয়ে দিলাম, যাহ্।

এমন কথায় কিষণলালের ছেলেদের কান্না আচমকা থেমে যায়। মুখ তুলে বিলাসীপিসির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা। দু'পায়ের গোছে ওদের দশ আঙুলের বাঁধন আলগা হয়ে আসে। পরক্ষণে, চরম অবিশ্বাসে, দ্বিগুণ জোরে বিলাসীপিসির পা দুটো আঁকড়ে ধরে ওরা, আমাদের সঙ্গে মস্করা কোর না মা, আমরা তোমার তামাশার যোগ্য নই মা। বলতে বলতে পুনরায় অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে ওরা।

ওদের থেকে পা দুটো কোনও গতিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিলাসীপিসি স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে যায় দেয়াল সিন্দুকের দিকে। আঁচলের চাবিগোছা দিয়ে একের পর এক খুলতে থাকে চাবি, এক সময় উইলখানা হাতে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।

কিষণলালের ছেলেরা উইলটাকে চিনতে পেরেছে দেখেই।

বিলাসীপিসির হাতে সাদাটে রঙের একগোছা কাগজ, উড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তের সাদা পায়রাটির মতো, অল্প অল্প ডানা ঝাপটাচ্ছিল। কিষণলালের ছেলেদের দিকে দৃষ্টি বিঁধিয়ে রেখে বিলাসীপিসি এক সময় অতি ধীরে ধীরে ছিঁড়তে থাকে উইলটাকে।

বিষেণ সিং মারফত খবর পেয়ে যখন পড়ি কী মরি পৌঁছলাম, বসবার ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে কাগজের টুকরোগুলো, সোফাতে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে কিষণলালের তিন ছেলে, আর ঠাকুর ঘরে বিগ্রহের সামনে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবার মুদ্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে বিলাসীপিসি।

অনেকদিন মামলা চলার সুবাদে কিষণলালের ছেলেগুলো আমাকে বিলক্ষণ চেনে। আমাকে দেখামাত্র একেবারে হামলে পড়ে ওরা। বলে, তোমার পিসিকে থোড়া বোঝাও তো বেটা, এমন গোঁয়ার্তুমি করাটা কি উচিত হচ্ছে ওর?

আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। বিলাসীপিসির একটা গোঁয়ার্তুমির খবর তো পেয়ে গেছি বিষেণ সিং মারফত। সেটাকে নিশ্চয়ই গোয়ার্তুমি বলছে না কিষণলালের ছেলেরা। তবে? আবার কী নতুন গোয়ার্তুমি করে বসল বিলাসীপিসি?

কিষণলালের ছেলে বলে, দ্যাখ না বেটা, এত করে বলছি, একখানা বাড়ি থাক ওর নামে, লাখ দুয়েক টাকাও, আর যে গয়না একবার ছুঁয়ে ফেলেছে ওর শরীর, ও আর ফেরৎ চাইনে আমরা। ফেরৎ নিয়ে করবই বা কি? অন্যের পরা গহনা পরিনে আমরা। কাজেই গহনাগুলোও থাক তোমার পিসির কাছে। কিন্তু কিছুতেই শুনতে চাইছে না আমাদের কথা। আচ্ছা, সব দিয়ে দিলে ও কোথায় থাকবে বল তো, কী খাবে? এসব পাগলামোর কোনও মানে হয়?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, পুজোর ঘরে তখনও অবধি নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে বিলাসীপিসির শরীর।

কিষণলালের ছেলেদের বললাম, এখন আপনারা যান। আমি ওকে বুঝিয়ে দেখি। কাল নাগাদ খবর

নেবেন।

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে যায় ওরা। আমি পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াই বিলাসীপিসির পাশটিতে। ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসি। খুব সন্তর্পনে হাত রাখি ওর পিঠে। খুব নরম গলায় ডাক পাড়ি, পিসি... পিসি... পিসি...।

এতক্ষণে বুঝি সাড় ফেরে বিলাসীপিসির। খুব ধীরলয়ে মাটি থেকে মাথা তোলেন তিনি। পাশেই আমাকে বসে থাকতে দেখে বুঝি যারপরনাই বিস্মিত হন।

বল্লেন, কী রে, তুই কতক্ষণ? বলতে বলতে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকানো মাত্র বুঝি চমকে ওঠেন বেজায়, কী হয়েছে রে তোর? মুখখানা এমন লাগছে কেন? শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি বিলাসীপিসিকে।

ভেবেছিলাম, ঠাকুরের সামনে শুয়ে শুয়ে তখন থেকে বুঝি অঝোর নয়নে কেঁদে চলেছে বিলাসীপিসি, বুঝি কেঁদে কেঁদে পাকা লিচুর শাঁসের মতো ফুলিয়ে ফেলেছে চোখ, কিন্তু বিলাসীপিসি মুখ তোলা মাত্র চমকে উঠি আমি, কেন কী, দেখতে থাকি, বিলাসীপিসির সেই নির্বিকার নিরাসক্ত মুখ, আগের মতো প্রশান্তি লেপটে রয়েছে সারা মুখে। ঠোঁটে সেই নরম হাসির রেখা। কমনীয় ললাট, সামান্যতম খাঁজ-ভাঁজের লেশমাত্র নেই সেখানে। বরং আমার চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখে এইমাত্র সামান্য দুর্ভাবনা বাসা বাঁধল তার মুখে, সেই কারণেই যা সামান্য কিছু ভাঙচুর হল ওর কমনীয় মুখমণ্ডলের রেখায় রেখায়।

ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিলাসীপিসি। আমার সারা গায়ে মুখে হাত বোলাতে থাকে অপরিসীম মমতায়। বলে, তোর কথাই ভাবছিলাম। হ্যাঁ-রে খোকা, ওই গানটা তোর মনে আছে? ওই যে রে, পদ্মগন্ধে মজে আছি... তারপর কী যেন... মনে নেই?

আমি খুব একটা গা করিনে বিলাসীপিসির কথায়।

ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো ফরফরিয়ে উড়ছিল ঘরময়, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলি, এসব কি?

—কি? বিলাসীপিসি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে।

বলি, কেন করলে এটা?

ঘরময় উড়ে বেড়ানো কাগজের টুকরোগুলোর দিকে চরম তাচ্ছিল্যে তাকাচ্ছিল বিলাসীপিসি। খুবই অন্যমনস্ক গলায় বলে, কী করলাম?

—দিয়ে দিলে ওদের? সব?

—কেন? সহসা আমার দিকে মুখ ফেরাল বিলাসীপিসি। খুব রহস্যময় হাসি খেলে গেল ঠোঁটের ডগায়, তোর খুব আফশোষ হচ্ছে নাকি রে? বলতে বলতে ভুরুজোড়া নাচায় সে, মনে মনে সম্পত্তির কিছুটা আশা করছিলি নাকি, এ্যাঁ?

ততক্ষণে চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠেছে আমার। কানের লতি গরম। বলি, আমাকে তেমনটাই মনে কর নাকি তুমি।

আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিলাসীপিসি। আমার রাগটাকে উপভোগ করতে থাকে বুঝি। ভুরু জোড়া আকাশে তুলে দিয়ে, দু'চোখের তারায় রাজ্যের কৌতুক জড়ো করে বলে, বাব্বা, রেগে একেবারে তুবড়ি! বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বিলাসীপিসি, হবির মা, একটু বেশি চাল নিস তো আজ, আমার খোকা রেগে গিয়েছে, বেশি ভাত খাবে।

উদ্গত রাগটা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমি গলায় যৎপরোনাস্তি অভিমান ফুটিয়ে বলি, ঠাট্টা নয়, কাজটা তোমার আরও ভেবেচিন্তে করা উচিত ছিল।

—ভেবেচিন্তে করিনি, এমন কথা কে বলল তোকে?

এমন নির্লিপ্ত মুখে কথাগুলো বলছিল বিলাসীপিসি, দুর্ভাবনায় অবিরাম পুড়ছে এমন যে-কারোরই অমন মুখ দেখে ক্ষেপে যাওয়ার কথা, কী না, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই!

হাল ছেড়ে দিয়ে বলি, সত্যি, তোমায় আমি একটুও বুঝতে পারিনে বিলাসীপিসি। সম্পত্তি দেবে না বলে নখে-দাঁতে লড়লে, মামলা করলে, মাত্র অর্ধেকটা সম্পত্তি পেলে মামলা তুলে নেবে বলল, দূর

দূর করে তাড়িয়ে দিলে, মামলায় জেতার পর আবার যখন পায়ে ধরে কাঁদল, পুরোটাই দিয়ে দিলে। না, তোমাকে চেনা আমার কম্মো নয়।

মিটিমিটি হাসছিল বিলাসীপিসি। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, চেনার চেষ্টা করিস কেন, এ্যাঁ? কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে চিনতে? পিসি বলে ডাকিস, ভালোবাসিস, মাঝে মাঝে এসে সোনামুখ করে দাঁড়াস সামনে, এই তো ভালো, অত চেনাচেনির মধ্যে ঢুকছিস কেন?

বিলাসীপিসির কথাগুলোতে বুঝি সামান্য আহত বোধ করছিলাম ভেতরে ভেতরে। শুধু আসা-যাওয়া, দেখা সাক্ষাৎ? ওর জীবনের আর বেশি ভেতরে ঢুকতে কি কৌশলে নিষেধ করছে বিলাসীপিসি! ভাবতে ভাবতে আমার চোখে মুখে বুঝি সামান্য অভিমান জমে। সেটা বুঝি বিলাসীপিসির দৃষ্টি এড়ায় না। মৃদু হেসে, আমার মাথার চুলগুলোকে সামান্য নাড়িয়ে দিয়ে বলে, পুরোপুরি তো দূরের কথা, মানুষকে কী সামান্যও চিনে ওঠা যায় রে পাগল? নিজেকেই কি ঠিক-ঠিক চেনা যায় সারা জীবনে!

—আচ্ছা বেশ। আমি একটু একটু করে সমে ফিরে আসি,—দিয়েছ ভালো কথা, তোমার জিনিস, তুমি দিয়েছ, কারো কিচ্ছু বলবার নেই। কিন্তু কেন দিলে সেটা বুঝিয়ে বলতে তো বাধা নেই তোমার?

—তা অবশ্য নেই, কিন্তু সেটা জেনে কী লাভ তোর? না জানলেই বা কী ক্ষতি?

—লাভ-ক্ষতির কথা নয়, একটা অস্বাভাবিক, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়ে ফেললে তুমি, কারণটা জানতে ইচ্ছে করে না? কৌতূহল জাগে না মানুষের? কেউ আত্মহত্যা করলে, জানি হাজার কবলেও আর বেঁচে উঠবে না, কিন্তু তাও কী কারণে আত্মহত্যা করল জানতে ইচ্ছে করে না মানুষের?

—আত্মহত্যা কেন? খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয় বিলাসীপিসি,—যাদের জিনিস, তাদের ফেরৎ দিয়ে দিলাম। জিনিসগুলো যে আমার নয়, এটা তো মানিস?

—তোমার নয়ই বা কেন? কিষণলাল তোমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছে সব।

—কেউ দিয়ে দিলেই অমনি জিনিসটার প্রতি অধিকার এসে যায় না মানুষের। তুই তো বি-এ পাস করেছিস, তোর বি-এ-র সার্টিফিকেটখানা যদি দিয়ে দিস আমায়, ওটা আমার হয়ে যাবে? ওটা হাতে নিয়ে বলতে পারব, আমি বি-এ পাশ?

বুঝতে পারছিলাম, আমাদের দু'জনের চিন্তাভাবনার খাত সম্পূর্ণ দু'দিকে বইছিল, হাজার তর্কেও তা একখাতে এসে মিশে যাওয়া অসম্ভব। তবুও বলি, বেশ তো, না হয় দিয়েই দিলে, কিন্তু একেবারে সবটাই?

সহসা গম্ভীর হয়ে আসে বিলাসীপিসির মুখ। খুব শীতল গলায় বলে, আমি থুথু ফেলবার বেলায় একটুখানিও মুখের মধ্যে রেখে দিতে ভালোবাসি না।

বিলাসীপিসির মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকি আমি।

সময় নিঃশব্দে বয়ে যায় তিরতিরিয়ে।

এক সময় বলি, এখন তোমার চলবে কী করে? কোথায় থাকবে তুমি? কী খাবে?

বিলাসীপিসি আমার মুখের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে তার সারা মুখে, পেকে ওঠার কালে কমলা লেবুর শরীরে রঙ ধরবার মতো, কমলা রঙের হাসি জমে।

বলে, কেন, তোর বাড়িতে থাকব, তুইই খাওয়াবি। খাওয়াবি না পিসিকে? কতবার তো বলেছিস, আমি কোনওদিন আচমকা খুব গরিব হয়ে গেলে খাওয়াবি-পরাবি আমাকে। বলিসনি?

—যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।

—ঠাট্টা? ওরে ছেলে! তখন অত বড় মুখ করে বললি, এখন দায়টা ঘাড়ে চড়তেই বলে ঠাট্টা!

বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বিলাসীপিসি।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি বিলাসীপিসির দিকে। এমন ঘোর সঙ্কটের মুহূর্তে এমন অনাবিল হাসতে পারছে সে? কী করে পারে?

ভাবতে ভাবতে সারা ঘর বুঝি একটু একটু করে পদ্মগন্ধে ভরে যেতে থাকে। যেন অজস্র, রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটেছে এই ঘরের মধ্যে কোথাও। আর, পাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো কাগজের টুকরোগুলোকে মনে হচ্ছিল, অজস্র প্রজাপতি যেন উড়ে উড়ে পদ্মের মধু খাওয়ায় মত্ত।

খবরটা আমার মুখ থেকে শুনে, বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক বসে থাকে জয়া। এক সময় শুধোয়, সত্যি বলছ তুমি? সব সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছে সে?

জয়া পুনরায় নির্বাক হয়ে যায়। পুরো বিষয়টা নিয়ে যেন খুব ঘটা করে ভাবতে বসে সে।



আমার এই ছোট্ট জীবনে সঙ্কট কোনও নতুন কথা নয়। সেই ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে ঘর করছি আমি।

প্রথম সঙ্কট ছিল লজ্জা। নিদারুণ লজ্জা, কচি বুক জুড়ে শুধুই গ্লানি, কিনা, আমার জন্মদাত্রী জননী এমন জাতের মহিলা, যার দু'চোখ জুড়ে কেবলই বিষ। কাকচক্ষু দিঘির মতো গভীর, ছলোছলো, নিরীহ একজোড়া চোখের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে আগুন, ঠিক সিগারেট ধরাবার লাইটারের মতোই যেন, পকেটের মধ্যে রাখা চলে নিশ্চিন্তে, অথচ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মালিকের বুড়োআঙুলের সামান্য নির্দেশে সে উগরে দেয় আগুন, সে আগুনে পুড়তে থাকে সামনে ধরে দেওয়া যে-কোনও দাহ্য বস্তু। কেবল তার সঙ্গে মায়ের চোখদুটোর মূল তফাৎ হল এই যে, সে মালিকের নির্দেশ ব্যতিরেকে কিছুই করে না, কিন্তু আমার মায়ের চোখ দুটো বিনা নির্দেশে, এমন কি মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও পুড়িয়ে খাক করে দেয় সামনের যাবতীয় দাহ্যবস্তুকে। এবং আমার মায়ের চোখদুটোর ওই সর্বনাশা ক্ষমতাটার কথা জানে এবং প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠতে উঠতে স্মরণে রাখে গাঁয়ের প্রতিটি আবাল-বৃদ্ধবণিতা, এমন-কী, আমার সহপাঠী ও খেলার সাথীরাও। আমার মায়ের এই ভীতিপ্রদ মারণ ক্ষমতাটির কথা আমার সামনেই তারা, শিউরে উঠতে উঠতে, আলোচনা করে। সেই লজ্জা আর বিড়ম্বনা মাথায় নিয়ে আমার গোটা শৈশব ও কৈশোর কেটেছে।

পাশাপাশি, যেহেতু আমার বাবা ছিলেন সংসারের সব বিষয়ে নির্বিকার নিরাসক্ত এবং মাকে নিয়ে আজীবনকাল এক হেঁটমস্তক মানুষ, গোটা সংসার থেকে পাওয়া আশৈশব তুচ্ছতাচ্ছিল্য হল আমার দ্বিতীয় সঙ্কট। খুড়তুতো, জেঠতুতো মিলে আমার ভাইবোনদের মধ্যে আশৈশব অপরাধীর মতো বড় হয়েছি আমি। আমার মায়ের জন্য ঘটে যাওয়া যাবতীয় দুর্বিপাকের দরুন মায়ের পাশাপাশি বাবা এবং আমিও পরোক্ষে কম লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিনি। বাবা অকালে মারা যাওয়ার পর মায়ের জীবনে আরও তীব্র হয়েছে সেই সঙ্কট, এবং তা চুঁইয়ে পড়েছে আমার ওপরও।

জেঠিমা এবং বড়পিসির চক্রান্তে মিথ্যে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল খেটে ফিরে আসার পর মা অবশ্য আর বেশিদিন বাঁচেনি।

ততদিনে জয়া এসেছে আমার জীবনে। জয়াকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে যখন বাঁচতে চাইছি আমি, ঠিক সেই মুহূর্তে বিলাসীপিসিকে ঘিরে আমার জীবনে নতুন এক সঙ্কট। সেই সঙ্কট দিনদিন তীব্র হয়েছে। জয়ার সঙ্গে আমার ব্যবধানটা দিনদিন বেড়েছে। বর্তমানে সেটা তো, আমার মতে, দুরতিক্রম্য। একদা বারবিলাসিনী, একজন অবাঙালির রক্ষিতা, এমন একজন মহিলা আমার পিসি, এবং তার সঙ্গে আমি তিলতিল জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে, এই অপরাধে জয়া আমার প্রতি নির্মমভাবে ক্ষমাহীন। দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রকারে বুঝিয়েও আমি তিলমাত্র নরম করতে পারিনি জয়াকে। শুধুমাত্র ঘৃণাই নয়, বিলাসীপিসিকে নিয়ে তার বুকের মধ্যে জমে রয়েছে ভয়। যদি তার সংস্পর্শে এলে কলুষিত হয়ে যায় আমাদের বংশধরদের জীবন, এমনই এক অচেনা আশঙ্কায় মনে মনে শিউরে ওঠে জয়া।

বলে, আমার ছেলে যখন জানবে, তোমার পিসিটি একজন রক্ষিতা, কী ভাববে সে? কোন যুক্তি দিয়ে বোঝাব তাকে? কাজেই, হয় তুমি তোমার বিলাসীপিসিকে ছাড়, নচেৎ আমাকে।

বিলাসীপিসির থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কথাটা ভাবতেই পারিনে আমি। বরং মা মারা যাওয়ার পর থেকে তার নরম কোলটি আমাকে আরও বেশি করে টানে। তার ছলো ছলো চোখদুটিকে সযত্নে মুছিয়ে দেবার জন্য আরও বেশি বেশি নিশপিশ করে আমার আঙুলগুলো। আর, বর্তমানে, যাবতীয়

সম্পত্তি কিষণলালের ছেলেদের ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তার জীবনে তৈরি হয়েছে এমনই এক অনিশ্চয়তা, আমার তো এমন মুহূর্তে তার থেকে সরে যাবার উপায় নেই। বরং আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে মন।

ইতিমধ্যেই নিজের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি কিষণলালের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছে বিলাসীপিসি। শেষ বাড়িটি ছেড়ে দেবার জন্য মাসটাক সময় চেয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে সে খুঁজে নেবে বস্তি এলাকায় কোনও কুঠরি। নিজের বলতে সামান্য যা পুঁজি রয়েছে, তাই দিয়ে দিন গুজরান করবে সে।

এমন মুহূর্তে বাপের ভিটেতে আশ্রয় নেবার একটা রীতি রয়েছে আমাদের সমাজে। নিরাশ্রয় অনাথিনী মেয়েরা তো আমাদের দেশে চিরটা কাল কাকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের পিতৃভূমিরই দিকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, বিলাসীপিসি একেবারেই চাইছে না তেমনটা। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমার জেঠা-কাকারা পরিস্থিতি বুঝে পুরোপুরি ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ।

যেদিন খবরটা প্রথম কানে গেল তাদের, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়েছিল বিলাসীপিসির কাছে। রেললাইনের কিনারে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত মানুষটিকে একেবারে শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু আত্মহত্যায় এমনই অবিচল ছিল বিলাসীপিসি, তিন-তিনটে দাদা মিলে কিছুতেই তাকে ফেরাতে পারেনি।

বিস্ময় বিমূঢ় চোখে বিলাসীপিসির আত্মহত্যাপর্বটি দেখতে দেখতে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল ওরা, এবং বিদায়কালে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, সহোদর দাদাদের অত অনুরোধ-উপরোধ কানে তোলে না যে বোন, তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। এ জীবনে আর তোর মুখ দর্শন করতে চাই না। ভাববো, আমাদের একটা বোন মরিয়া গেছে।

বিলাসীপিসি কোনও জবাবই দেয়নি সে কথার। কেবল সারাক্ষণ মিটিমিটি হেসেছে।

একদিন ওর বাড়িতে যাওয়া মাত্রই বিলাসীপিসি বলল, শঙ্কর, একটা নতুন ঘরের জোগাড় হয়েছে, চল তোকে দেখিয়ে আনি।

বস্তি এলাকায় সরু গলির মধ্যে দুটো মাত্তর কুঠরি ঘর, কোনও দিক থেকে হাওয়া ঢোকার উপায় নেই। দিনের বেলাতেও আলো-আঁধারি ভাব।

বলি, এই বাড়িতে তুমি থাকবে, পিসি? থাকতে পারবে?

বিলাসীপিসি হাসে। বলে, এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে থাকে এদেশের হাজার হাজার মানুষ, আর আমি পারব না?

আমার বুকের মধ্যে ক্রমাগত মোচড় দিচ্ছিল। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে আসি কুঠরির ভেতর থেকে।

বিলাসীপিসি বলে, আমার এখানে তুই মাঝে মাঝে আসবি তো, শঙ্কর? নাকি তোর বাপের মতো—।

আমি জানি, বিলাসীপিসি প্রথম আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে যে ক'দিন ছিল, বাবা ছিলেন পুরোপুরি ওর চোখের আড়ালে। তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিলেন, একদিনের জন্যও মুখ দেখাননি বিলাসীপিসির সামনে। ছেলেবেলায় তার কারণটা বোধগম্য হয়নি আমার কাছে, আমার খুব অভিমান হত বাবার ওপর। পরে, বড় হলে পর, মা-ই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল কারণটা। বাবা বিশ্বাস করতেন, বিলাসীপিসির এই অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। আমি ওই নিয়ে তর্ক করেছিলাম মায়ের সঙ্গে। বলেছিলাম, সে কি? সারা বাড়ির মধ্যে তিনিই তো একমাত্র মানুষ যিনি বারবার হীরালাল সম্পর্কে খোঁজখবর করতে বলেছিলেন জেঠু এবং পিসিমণিকে। তাঁর কথা তো কেউ কানেই তোলেনি। মা শুনে বলেছিলেন, তা সত্ত্বেও তোর বাবার মনে হয়েছিল, তিনিই দায়ী। কারণ, তাঁর মতে, খোঁজ খবরটা তো তিনি নিজেই করতে পারতেন। বিলাসী তো তাঁরও ছোট বোন। আর, খোঁজ করলেই তো ঝুলি থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে পড়ত। বিলাসীটা বেঁচে যেত। সেই লজ্জায়, অনুতাপে সারাটা জীবন, বিলাসীর সামনে মুখ দেখাতেই পারল না তোর বাবা।

জয়াকে বিলাসীপিসির কথাটা বলায় সে চুপ করে শোনে কেবল। জবাব দেয় না কিছুই।

বলে, কবে যাচ্ছে তোমার পিসি, নতুন বাড়িতে?

বলি, সামনের মাসে।

জয়া আর কথা বাড়ায় না।

আমি মনে মনে জয়াকে বলি, কেবল অন্যের রক্ষিতা বলেই চিনেছ যাকে, সে যেমন অবলীলায় সবকিছু আরাম, বিলাস, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিঃস্ব করে দিতে পারল, আমরা কি সাত জন্মের সাধনায় পারি তেমনটা?

একদিন বিলাসীপিসির বাড়িতে গিয়ে দেখি, বিষেণ সিং বাঁধাছাঁদা করে তৈরি।

বলি, এ কি, কোথায় চললে তুমি?

সে কথায় ওই দশাসই মানুষটার দু'চোখে টলমলিয়ে ওঠে জল। ধরা গলায় বলে, মুলুকে। আমার ছুটি হয়ে গেল।

বিলাসীপিসির মুখেই বাকিটা জানা গেল। নিজের গচ্ছিত সামান্য যা-যেটুকু রয়েছে, তার থেকে কিছু টাকা দিয়ে বিষেণ সিংকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিলাসীপিসি। কারণ, এই বয়েসে, এই অকরুণ মহানগরীতে নতুন করে কিছু শুরু করা ওর পক্ষেই বাস্তবিকই অসম্ভব।

বিষেণ সিংয়ের মুলুক যে ঠিক কোথায়, আমার ঠিকঠিক জানা ছিল না তা। সেখানে তার কে কে রয়েছে, তাও না। আমি যারপরনাই অবাক হলাম বিষেণ সিংয়ের কথায়। মুলুক সম্পর্কে ওইসব তথ্য তারও জানা নেই। সেই কবে কিশোর বয়েসে মুলুক ছেড়েছিল সে, তারপর তার শরীর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ছ'ছটি দশক। শেষের দিকে মুলুকের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না তার। অথচ বিলাসীপিসি নাকি তাকে মুলুকে ফিরে গিয়ে কিছু ক্ষেতিজমিন কিনেটিনে চাষ শুরু করতে বলেছে।

দু'চোখে টলোমলো অশ্রু জমিয়ে বিষেণ সিং আমার দরবারেই মামলা দায়ের করে, বলুন তো খোকাবাবু, মায়ের এটা কোন ধরনের জুলুম।

হুড়মুড় করে কত কথাই বলে গেল বিষেণ সিং, কিন্তু আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও বিলাসীপিসি বুঝি বধির। যেন শুনতেই পায়নি বিষেণ সিংয়েব কথাগুলো।

আমি জানি, এ নিয়ে বিলাসীপিসিকে কিছু জিজ্ঞেস কবাই বাতুলতা। তার স্বরচিত বধিরতা আমার হাজার প্রশ্নে কিংবা বিষেণ সিংয়ের কান্নাকাটিতে দূব হবে না।

বিষেণ সিংকে সান্ত্বনা দিই আমি, যাও না, না পোষালে আবার ফিরে আসবে। আমবা তো রইলামই।

আমি জানি প্রৌঢ় মানুষটির ভাঙা পাঁজরে এ কোনও সান্ত্বনাই নয়, কিন্তু এ ছাড়া কীই বা করবার ছিল আমার।



বেশ কিছুদিন পরে বিয়েব কথাটা তুলছিল জয়া। কিন্তু আমিই এড়িয়ে যাচ্ছিলাম বাববার।

জয়াকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াব কী না এমন প্রশ্ন অনেক দিন যাবৎ ঘাই মারছিল আমার মনে।

এমনিতে জয়া হয়ত বা ভালো মেয়ে, আমাকে হয়ত বা ভালোবাসে খুবই, কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে ক্রমাগত তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হতে তার মধ্যে স্থায়ীভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে এমন কিছু জটিলতা, যার জট ছাড়ানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অন্তত এতদিনে এমন কোনও আশাব্যঞ্জক সঙ্কেত আমি পাইনি যাতে করে মনের মধ্যে এমন বিশ্বাসের আলোটি ক্ষীণ হলেও জ্বলে ওঠে যে, সময় ও শুশ্রূষা জয়াকে সারিয়ে তুলবেই একদিন। বরং দিনদিন তার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার লক্ষ করছিলাম, যার থেকে এর ঠিক উল্টো বিশ্বাসটাই জমাট বাঁধছিল আমার মনে।

বিলাসীপিসির সংস্রব ত্যাগ করবার জন্য সেই প্রথম দিন থেকেই পীড়াপীড়ি করে আসছে জয়া।

আমি ওর কথা এড়িয়ে গিয়েছি বারবার। হরেক প্রকারে বুঝিয়েছি ওকে।

বলেছি, যেজন্য তোমার অত আপত্তি, বিলাসীপিসি তো সেই বারবনিতার জীবনটা ছেড়ে এসেছে চিরকালের মতো।

জয়া ফুঁসে ওঠে, নাই বা হল বারবণিতা, একজনের রক্ষিতা তো বটে। সেটাও এমন কিছু গঙ্গাজলের মতো পবিত্র ব্যাপার নয়।

জয়ার ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে আমি ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি দিনের পর দিন। কিন্তু বিলাসীপিসিকে ত্যাগ করে চলে আসার কথাটা ভাবতেই পারিনি আমি। বিশেষ করে মা মারা যাবার পর আমি আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলাম তাকে। তবুও, আগের পরিস্থিতি বহাল থাকলে হয়ত বা পুরো ব্যাপারটাকে নতুন করে ভেবে দেখা যেত, কিন্তু স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রায়-ভিখারিণীর জীবন বেছে নেওয়ার পর তাকে ছেড়ে আসাটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে।

জয়াকে সেটা বোঝাবার চেষ্টাই করিনি আমি। কিন্তু তার দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়েও আমার মধ্যে একটা প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে দিনদিন। জয়া দিনদিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। হয়ত এমন দিন আসবে, জয়াকে আমার অনিচ্ছার কথাটা খোলাখুলি জানিয়ে দিতে হবে। কারণ, আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে তার যৌবনকে ক্ষয় করতে থাকবে দিনের পর দিন, এটাও আমার কাম্য নয়।

একদিন সেই মুহূর্তটা এল!

আমি তখন সদ্য ল' পাশ করে আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। একদিন জয়া আমাকে ফোন করল কোর্টে। বলল, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা রয়েছে। আজ সন্ধের সময় হবে? বাড়িতে নয়, অন্য কোথাও।

সন্ধেবেলায় গিরীশ পার্কের বেঞ্চিতে বসেই কথাটা পাড়ে জয়া।

বলে, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে একটা পাকা সিদ্ধান্তে আসা দরকার তো। খুবই দেরি হয়ে যাচ্ছে না কি?

আমিও তো ওই কথাটাই ভেবে চলেছি কিছুদিন যাবৎ। দেরি তো হচ্ছেই। বিশেষ করে জয়ার ক্ষেত্রে। ছেলেদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এদেশে মেয়েদের বিয়ের বয়েস তো খুবই তাড়াতাড়ি চলে যায়। আমি বুঝতে পারি, সেই দেরি হয়ে যাওয়াটা নিয়ে জয়াও খুব ভাবছে ইদানীং। আমার এও মনে হল, এজন্য জয়া মনে মনে আমাকেই দায়ী করছে।

বলি, কী করতে চাইছ তুমি?

—এসো, আমরা এবার বিয়েটা সেরে ফেলি।

—এক্ষুনি? খুব দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলি আমি।

—হ্যাঁ। এখনই আমাদের বিয়ে করাটা খুবই দরকার।

জয়ার গলায় এমন কিছু ছিল, আমি সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখি। বলি, কেন? একেবারে এক্ষুনি কেন?

—বা-রে? জয়া বুঝি অবাক হয়—আমরা এক্ষুনি বিয়ে করে আলাদা ঘর না বাঁধলে বিলাসীপিসি থাকবে কোথায়?

জয়ার কথায় আমার সারা শরীর জুড়ে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ শিহরণ। ওর চোখের তারায় ঢুকে খোঁজাখুঁজি জুড়ে দিই। নিজের কানের প্রতি অবিশ্বাস জাগে। তার চেয়েও জয়াকে ঢের বেশি দুর্বোধ্য লাগে।

বলি, বিলাসীপিসিকে নিজের কাছে রাখবে তুমি? সত্যি বলছ? বলতে বলতে আমার দু'চোখ আশায় আশায় জ্বলে উঠতে চায়।

জয়া বলে, না রেখে উপায়? ওই বস্তির ঘরে গিয়ে একা একা থাকবেন নাকি উনি? তুমি সইতে পারবে তা?

—আমার কথা বাদ দাও। আমি সহসা যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠি—তোমার নিজের কথা বল। বিলাসীপিসির সঙ্গে থাকতে তোমার ঘেন্না করবে না? সে তো বারবণিতা।

—বারবণিতা নয়, রক্ষিতা। জয়া চোখমুখে কঠোরতা জমায়। তারই একদা-উক্তিকে এমনিভাবে মনে করিয়ে দেওয়াতে বুঝি অসন্তুষ্ট হয় মনে মনে।

কিন্তু আমি দমিনে। বিলাসীপিসিকে এযাবৎ অন্তত একশোবার রক্ষিতা বলায় আমার বুকের মধ্যে এযাবৎকাল জমে থাকা যাবতীয় অপমান, গ্লানি প্রাণপণে জ্বালামুখ খুঁজতে থাকে।

কাষ্ঠহাসি হেসে বলি, ওই হল। রক্ষিতার জীবনটাও এমন কিছু গঙ্গাজলের মতো পবিত্র নয়।

এইভাবে, জয়ার উচ্চারিত কথাগুলোকেই সুযোগ পেয়ে ফিরিয়ে দিই ওকে।

জয়াকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল। তার দু'চোখের তারায় এক ধরনের অসহায়তা। আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকায়, মনে হয়, আমার কাছেই বুঝি আশ্রয় চাইছে জয়া।

এক সময় খুব আত্মস্থ গলায় জয়া বলে, সে প্রসঙ্গ ছাড়। ভেতরে ভালোবাসাটা না থাকলে এই দুনিয়ার সব বিয়ে করা মেয়েই রক্ষিতা।

বলতে বলতে একেবারেই নিভে আসে জয়া। একটু একটু করে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এক সময়, যেন কোন সুদূর থেকে বলে ওঠে, সেই অর্থে, কেবল বিলাসীপিসিই নয়, আমার মাও তো আমার বাবার রক্ষিতাই ছিল।

জয়ার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকি আমি।

দেখতে দেখতে অনেকদিন বাদে, আমার চারপাশটা আবার একটু একটু করে পদ্মগন্ধে ভরে যেতে থাকে।

পরিচ্ছেদ চার

গাঁয়ের শেষপ্রান্তে একটা নদী এঁকেছিল যারা

আমাদের সন্ধিপুর গাঁয়ের দক্ষিণদিক দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির দুটো নাম ছিল।

একটা পোশাকি নাম, অন্যটি ডাকনাম।

গাঁয়ে-ঘরে অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই দুটো করে নাম থাকে। একটি পোশাকি নাম, অন্যটি ডাকনাম। বড়লোকদের ক্ষেত্রে দুটি নামের উৎস পৃথক হলেও, গরিবদের ক্ষেত্রে ডাকনামটি সাধারণত পোশাকি নামেরই অপভ্রংশ হত, যেমন পঞ্চানন থেকে পচু, দাশরথি থেকে দাশু। কেন কী, গাঁ-ঘরের গরিব-গুরবো মানুষেরা যেমন পরবার জন্য একটির বেশি জামা-কাপড়, ভাত খাওয়ার সময় একটির বেশি পদ, কিংবা এক লপতে একটির বেশি মেয়েমানুষ পুষবার বিলাসিতা দেখিয়ে উঠতে পারে না, বংশধরের নামকরণের বেলায়ও একজনার জন্য দু-দুটো নাম বরাদ্দ করাটাকে তাদের বিলাসিতা বলেই মনে হয়। কাজেই, যেমন করে তারা মিষ্টি-কুমড়ো খেতে গিয়ে কুমড়োর ঘণ্ট ছাড়াও খোসা দিয়ে বানিয়ে ফেলে ভাজাগোছের একটা বাড়তি পদ, তেমনিভাবেই, একটা পোশাকি নাম থেকেই তারা আরও একটি নাম বের করে নেয়। ওই নাম দিয়েই চালিয়ে নেয় নিত্যদিনের ডাকাডাকির কাজ। পোশাকি নামটি তোলা-পোশাকের মতো তোলাই থাকে তোরঙ্গে, জীবনে বিয়ে কিংবা ভোট গোছের খুব কম উপলক্ষ্য আসে, যখন ওই পোশাকি নামটিকে তোরঙ্গ থেকে বের করবার দরকার পড়ে।

আমাদের গাঁয়ের নদীটিও খুবই হতদরিদ্র ছিল। খুবই ব্রাত্য। সেই কারণে তার ডাকনামটিও পোশাকি নামেরই অপভ্রংশ ছিল। তার পোশাকি নাম ছিল যমুনা। পাশাপাশি তার একটি ডাকনামও ছিল। খুবই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নাম সেটা। সবাই তাকে ডাকত 'যমী খাল'।

নদীটার কোনও মর্যাদা ছিল না গাঁয়ের মানুষের কাছে। বাস্তবিক তাকে নদী বলে স্বীকারই করত না কেউ। খালের অধিক মান্য তাকে দেওয়া হত না।

নদীটার প্রতি এহেন তাচ্ছিল্যের কারণ, প্রথমত, সে নদী কারোর কোনও উপকারেই লাগত না। শীতের মরসুমে সে এমনই সরু সুতোর মতো বইত যে, ওই জলে চাষবাস করা তো দূরের কথা, গজাননের ভাষায়, 'জলশোচ অবধি করা যেত না'। দ্বিতীয়ত, সে নদীর জলধারণের ক্ষমতা তিলমাত্র ছিল না। ফলে, এক পশলা বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, গজাননের ভাষায়, 'উপরের দিকে ব্যাঙ মুতিয়া দিলেও' আমাদের নিচু এলাকা ভেসে যেত বন্যায়। তো, যার থেকে কোনওরূপ উপকার নেই, অথচ সামান্য সুযোগে ক্ষতি করে বসে, অর্থাৎ যে কিনা গজাননের ভাষায় 'ভাত দিবার ভাতার নয়, অথচ কিল মারবার গুঁসাই' মানুষ তাকে মান্য করবে কিসের তরে? মানুষ জাতটাই তো এমনি। কেবল স্বার্থের কারণেই মান্য করে অন্যকে। কাজেই, সবাইয়ের চোখে আমাদের গাঁয়ের নদীটি ছিল অধঃপতিতা, খালবিশেষ।

নদীটার প্রতি এহেন তাচ্ছিল্যের আরো কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য কারণ ছিল।

যমুনা নদীর অপর পাড়ে ছিল মান্দার গ্রাম। এদেশের অনেক গাঁয়ের মতো মান্দার গ্রামটিও একটুখানি ইতিহাসে ঠাঁই পাবার স্বপ্ন দেখত। মান্দারের মানুষ দাবি করত, ওটাই নাকি আদি অকৃত্রিম গড়-মান্দারণ,

তার থেকেই গাঁয়ের নাম মান্দার। যদিও আমাদের গ্রামটাকে দুনিয়ার মানুষ সন্ধিপুর বলেই ডাকে, কিন্তু গাঁয়ের পুরো নামটা গড়-সন্ধিপুর। এবং ঐ গাঁয়ের জমিদার মুখুজ্যারা সদাই চাইতেন, অফিস-কাচারিতে, দলিল-দস্তাবেজে, এমন কি মানুষের মুখে মুখে গড়-সন্ধিপুর নামটাই বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হোক। কেন কি, এতদ্দ্বারা, 'গড়' শব্দটির ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ের মালিক হিসেবে মুখুজ্যাদের অস্তিত্বটাও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা, মুখুজ্যাদের গড়, সেই হিসেবে গাঁয়ের নাম গড়-সন্ধিপুর। কিন্তু অফিস-কাচারির দলিল-দস্তাবেজে ইতিমধ্যে গড়-সন্ধিপুর নামটা যথা সম্ভব ব্যবহৃত হলেও, এলাকার তাবৎ মানুষ তাকে সন্ধিপুর নামেই ডাকে। কেবল, মুখুজ্যা গড়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পালাগান চলাকালীন কোনও কৃতী অভিনেতার বুকে মেডেল লটকে দেবার প্রাক্কালে পরিবেশিত প্রারম্ভিক ভাষণের সময় কিংবা গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠিত কোনও বারোয়ারি সভায়, যেখানে সভাপতি হিসেবে কোনও 'মুখুজ্জ্যা' এবং প্রধান-অতিথি হিসেবে কোনও বহিরাগত উপস্থিত থাকেন, তাকে কম্বুকণ্ঠে গড়-সন্ধিপুর নামেই ডেকে থাকেন সভার বক্তারা, এবং সেই সুবাদে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেরই মনে পড়ে যায় যে, গ্রামটার পুরো নাম গড়-সন্ধিপুরই বটে।

তবে গড় সন্ধিপুর বলে না ডাকলেও, আমাদের গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ গ্রামটাকে নিয়ে মান্দারের অধিক গর্ববোধ করত। শুধু জমিদারের গড় রয়েছে বলেই নয়, আরও কিছু কিছু বিষয়ে আমরা মান্দারের চেয়ে আমাদের গ্রামটিকে উৎকৃষ্ট বলে বিশ্বাস করতাম। যেমন কিনা, আমরা সন্ধিপুর গাঁয়ের মানুষজনও দাবি করতাম, আমাদের গাঁয়ের উপকণ্ঠে যে বিশাল ধুতমা ডাঙা, ওখানেই সন্ধি হয়েছিল পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর সঙ্গে মোঘল সেনাপতি মুনিম খাঁর। তাঁর প্রতিবাদে কেউ যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত যে, সেই সন্ধি ওই গ্রামের উপকণ্ঠে হতেই পারে না, স্রেফ ভৌগোলিক কারণেই সেটা অসম্ভব, তো আপোসপন্থী সন্ধিপুরের মানুষ এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলত, না, সন্ধি এখানে হয়নি বটে, তবে এই গাঁয়েই সন্ধির শর্তগুলো পূরণ করেছিল পাঠান সুলতান। সন্ধিপূরণ থেকে সন্ধিপুর।

আমরা এও বিশ্বাস করতাম যে, নিজেদের গ্রামটির সঙ্গে গড় মান্দারণের মহিমা জুড়ে দিয়ে মান্দারবাসীরা কেবল ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেতেই চাইছে না, স্রেফ হীনমন্যতাবশত তারাও গড় সন্ধিপুরের অনুকরণে নিজেদের গ্রামের নামের পাশে একটি গড় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে কেবল এটাই প্রমাণ করতে যে, সন্ধিপুরের মতো তাদের গ্রামও গড়ভূষিত, যদিও সন্ধিপুরের আপামর মানুষ তো বটেই, মান্দারের মানুষজনও ভালোমতোই জানে যে, তাদের গাঁয়ে কস্মিনকালেও কোনও গড় ছিল না, এবং ঐ গ্রামের সম্পন্ন জোতদার চক্রবর্তীদের যদি জমিদার আখ্যা দেওয়া হয়, তবে আরশোলাকেও বলতে হয় পাখি, আর তাদের টিনে ছাওয়া দো-মহলা কোঠাবাড়িটাকে যদি গড় বলতে হয়, তবে বেলদার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পুরুষোত্তম দাসের স্বর্গগতা পত্নী সোদামিনী দেব্যার সমাধি মন্দিরটিকেও বলতে হয় তাজমহল।

শুধু ইতিহাসে স্থান পাওয়ার লালসাজনিত প্রতিযোগিতা থেকেই নয়, আরো বহুবিধ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে সন্ধিপুরের সঙ্গে মান্দারের ছিল চিরকালই সাপে-নেউলে সম্পর্ক। দুটি মুখোমুখি গ্রাম, সুযোগ পেলেই পরস্পর পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। এ ব্যাপারে মান্দারের হাতে অস্ত্রটি ছিল জব্বর। যমুনা ওরফে যমীই ছিল সেই মোক্ষম অস্ত্র। নদীটার মালিকানা ছিল আমাদের গাঁয়ের মুখুজ্যাবাবুদের, এবং যমুনা ছিল পৌরাণিক মতে যমরাজের ভগিনী, সেই কারণেই তার আর এক নাম যমী।

তো, হিরন্ময় মুখুজ্যার পিসি হৈমবতীর সঙ্গে মান্দার গাঁয়ের চক্রবর্তীদের একমাত্র ছেলে সুমন্তর বিয়ে হয়েছিল, এবং বিয়েতে যমী খালের একটা অংশ যৌতুক হিসেবে চক্রবর্তী-পরিবারে ঢোকার পর থেকেই নাকি চক্রবর্তী-পরিবারে ঘনিয়ে আসতে থাকে একের পর এক দুর্যোগ। অকস্মাৎ পরপর জনাকয় প্রবীণ মানুষ ছ'মাসের মধ্যেই মারা যায়। ফলে, মান্দারের মানুষজন হিরন্ময় মুখুজ্যার পিসি অর্থাৎ পূর্ণনারায়ণের ভগিনী হৈমবতীর পিছুপিছু যমরাজের ভগিনী যমুনারও চক্রবর্তী-পরিবারে ঢোকার ঘটনাটিকে চক্রবর্তী-পরিবার তথা সারা মান্দার গাঁয়ের মানুষের পক্ষে চরম অশুভ ও ক্ষতিকর বলে

সাব্যস্ত করে। এবং পূর্ণনারায়ণ মুখুজ্যার ভগিনীটিকেও যমরাজের ভগিনীর সমতুল্য জ্ঞান করতে থাকে। ফলে, সারা মান্দার গাঁয়ে সেই সুবাদে পূর্ণনারায়ণ মুখুজ্যাকেই খোদ যমরাজ বলে ডাকবার প্রক্রিয়াটি চালু হয়ে যায়। আর, যমরাজের রাজ্যের বাসিন্দা মানেই তো যত রাজ্যের পাপীতাপীর দল, যমরাজের কঠোর শাসনে যাদের প্রজন্ম ধরে 'নরকভোগ' চলছে। অর্থাৎ স্রেফ নদীটার নাম এবং যমরাজের সঙ্গে তার সম্পর্ককে খেলিয়ে খেলিয়ে সন্ধিপুরের জমিদারকে যমরাজ এবং ওই গাঁয়ের বাসিন্দাদের পাপীতাপী, নরকভোগী বলে ডাকবার জো পেয়ে গিয়েছিল মান্দার গাঁয়ের মানুষ। অন্যদিকে মান্দারের মানুষের এই ব্যঙ্গ-পরিহাসের জবাবে জুতসই করে বলবার মতো কোনও যুক্তিই ছিল না সন্ধিপুরের মানুষের হাতে। কেবল বিদ্বেষটিকে চাগিয়ে রেখে সুযোগ মতো খুচরো ক্ষতি-অপকার করা ছাড়া সন্ধিপুরের মানুষের আর কোনও গতি ছিল না। কাজেই, অপমানিত মানুষগুলির যাবতীয় অক্ষম রোষ গিয়ে পড়েছিল অবোধ নদীটির ওপর। নদীটার এমন একটি নামের জন্যই যে সন্ধিপুর গাঁয়ের অতখানি অখ্যাতি, এই কারণেই বুঝি নদীটা তার যাবতীয় মানমর্যাদা হারিয়ে বসেছিল সন্ধিপুরের মানুষের কাছে।

সব মিলিয়ে, আমাদের সেই ছবির মতো নদীটিকে সবাই ভারী তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চিরকাল। এবং পরবর্তীকালে, যখন নদীটার ওপর পাকার পুল তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হল ব্লক-অফিসে, সর্বসম্মতিক্রমে এটাই সাব্যস্ত হল যে, নদীটাকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ডাকা হোক না কেন, ভদ্র পঞ্চজনার সামনে তাকে পেশ করবার বেলায় তার পোশাকি নামটাই ব্যবহার করা সঙ্গত। কেন কি, গাঁয়ে ঘরে পুঁটি বলে ডাকলেও আমরা কি পাত্রপক্ষের সামনে তাকেই পুণ্যলতা নামে হাজির করি না? আসলে, এমন একটা পৌরাণিক নামের নদী, ব্লক-অফিসের বাবুদের কাছে গাঁয়ের ইজ্জতটা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে, এমন ধারণাবশত দরখাস্তের পাতায় তাকে যমুনা নামেই ভূষিত করা হল। তারও অনেক পরে, ওই পুলের প্ল্যান-এস্টিমেট তৈরি করবার জন্য নদীটাকে মাপজোক করতে এসে ব্লকের ওভারসিয়ারবাবু যখন 'কী যেন নাম খালটাব' বলে গ্রামবাসীর দিকে তাকালেন, তখনো কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে ওকে 'যমুনা' বলে পরিচয় দিল। এবং তৎসহ মধুর হেসে ওভারসিয়াববাবুর ভুলটাও এই বলে শুধরে দিল যে, খাল লয়, লদী উটা। যমুনী লদী। আর, ওই মুহূর্তেই গজাননের বাবা, আমাদেব গাঁয়ের ইস্কুলের হেড পণ্ডিত কামাখ্যা ভট্ট, পাশ থেকে, খানিকটা স্বগতোক্তির ঢঙে, অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন, নদী, তবে বড়োই দ্বিচারিণী নদী।

ওভারসিয়ার-বাবুটি হয়ত-বা তাঁর চাকরির কাঠিন্যের অন্তবালে একজন রসিক মানুষ ছিলেন, কেন কি, কামাখ্যা-পণ্ডিতের এ-হেন মন্তব্যে তাঁর ঠোটের কষে প্রায় উপচে পড়েছিল, পাক্কা পানখোর মানুষের পিক সামলে নেবার ঢঙে, আচমকা বেরিয়ে আসা হাসি। খুব নির্বিকার গলায়, ভাবটা এমনই, যেন ওই তথ্যটাও তার প্রয়োজন হবে পুলের প্ল্যান এস্টিমেট বানাবার কাজে, শুধিয়েছিলেন, দ্বিচারিণী কেন? বাইরের মানুষের সুমুখে নিজেদের গাঁয়ের নদীর চরিত্র নিয়ে কুৎসা কবাটাকে গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষই মনে মনে যে অপছন্দ করেছিল সেটা বোঝা গেল, যখন নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার সুযোগ পেয়ে কামাখ্যা ভট্ট কথাটাকে ব্যাখ্যা করবাব জো করতেই গাঁয়ের মাতব্বররবা তাকে একযোগে থামিয়ে দিল এই বলে যে, ওভাস্‌সিয়ারবাবু কাজেব মানুষ, আমাদের মতো বেকার তো নন, এই পুলের মাপজোক শেষ করিয়া তাঁকে আরো কত জাগায় যাইতে হবে, গল্পগাছায় তাঁর সময় ক্ষয় করিয়া দিলে চলে? এইভাবে, মনের মধ্যে হাজার অসূয়া থাকা সত্ত্বেও, সেদিন নদীটাকে বাইরের মানুষের সামনে বেইজ্জত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সন্ধিপুরের মানুষ। এই বাঁচিয়ে দেবার পেছনে উদারতা যত না ছিল, স্বার্থ ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি। গ্রামের পোড় খাওয়া মানুষেরা বুঝেছিল, মজে মজে এমনই বদন হয়েছে যমুনার, প্রথম দর্শনেই হয়ত বা ওভারসিয়ারবাবুর ঠোঁট অজান্তে বেঁকে গিয়ে থাকবে তাচ্ছিল্যে। ফিরে গিয়ে হয়ত বা বিডিও সাহেবকে বলবেন, নদী কোথায়, নালারও অধম ওটা। ওব ওপর পুল বানিয়ে লাভ কী? তার ওপর, ওর চালচরিত্র নিয়ে গ্রামবাসীরাই কোনও কটু মন্তব্য করলে যদি তাচ্ছিল্যে ঠোটজোড়া আরো বেঁকে যায় ওভারসিয়ারবাবুর! তার ফলে পুল নির্মাণের বিষয়টি যদি একেবারেই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কিনা, এলাকার নদীগুলোতেই এখনও অবধি পুল বানানো গেল না,

আর, এ তো নেহাতই খাল, কিংবা নালা, তারও আবার অর্ধেকটা মতো মজে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

নদীটা উপলক্ষ্য। আসলে, আমাদের মধ্যে জোর তর্ক বেধেছিল শিখাবউদিকে নিয়ে।

তর্কটা স্রেফ আমার আর গজাননের মধ্যে। গজাননের মতে, কোনও বিবাহিতা মেয়ে যদি সংসার-জীবনে সারা অঙ্গে জড়িয়ে রাখে স্বামী নামক একজন পুরুষকে, আর, বুকের মধ্যে বাঁধিয়ে রাখে অন্য একজনের ছবি, তবে তাকে দ্বিচারিণী ছাড়া আর কীই বা বলা যায়! তর্কটা যখন বেধেছিল, গজানন আমাদের এলাকায় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নন্দ গুচ্ছাতকে সরিয়ে দিয়ে ততদিনে পার্টির এক নম্বর নেতা। তার মিহি মেয়েলি গলা ততদিনে চেরা বাঁশের মতো কর্কশ হয়েছে। তার চোখেমুখে, সর্বাঙ্গে প্রভুত্বের মুদ্রাগুলি স্থায়ী হয়েছে। তার মুখের ওপর তর্ক করবার সাহস দেখায় না অনেকেই। তবুও আমার সঙ্গে তার নানা বিষয়ে তর্ক বেধে যেত প্রায়ই। আমাকে ততটা প্রশ্রয় দিত সে। একদা সহপাঠী, ছেলেবেলার খেলাধুলোর বন্ধু বলেই হয়ত-বা। তৎসহ, ততদিনে আমি মেদিনীপুর সদরে ওকালতি করি, সেই সুবাদে পার্টিরও দু-একটা কেস করে দিই প্রায় নামমাত্র পারিশ্রমিকে, হয়ত-বা ওইসব কারণেও আমার ওইরকম মুখে মুখে তর্ক করবার ঔদ্ধত্যকে সহ্য করত গজানন।

তখন শিখাবউদির চরিত্র নিয়ে টি-টি পড়ে গিয়েছে সারা গাঁয়ে। বিশেষ করে তার জীবন জুড়ে থাকা পল্টুদা নামক রহস্যময় পুরুষটিকে নিয়েই সবার মনে সেই কতকাল ধরে সীমাহীন ধন্ধ। যদিও মানুষটিকে একবারের তরেও চাক্ষুষ দেখেনি সন্ধিপুরের মানুষ, কিন্তু শিখাবউদির মুখে তার কথা যাবতীয় উপমা-অলঙ্কার সহযোগে এতবার এত উপলক্ষ্যে শুনেছে যে, সকলের মনের মধ্যে মানুষটির একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাকাপাকিভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছে। তবুও কেবল আমিই কিছুতেই মানতে চাইতাম না যে, শিখাবউদি বাস্তবিক এমন কিছু করেছে, যাতে করে তার চরিত্রে কোনওরূপ কলঙ্ক আরোপ করা চলে, যদিও তার কথাবার্তা, আচার-আচরণগুলো আমার মধ্যেও তৈরি করেছিল নিদারুণ ধন্ধ।

গজানন তিড়িং করে রেগে যেত। বলত, আ-হা, বুকের ভিতর লাভার লিয়া যে মেয়া বুসিয়া আছে বিয়ে করা মরদের কোলে, তাকে চরিত্রহীন দ্বিচারিণী ছাড়া কী-ই বা বলা যায় হে?

আমি জানি, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মেয়েদের প্রতি আজীবনকাল এক ধরনের বিদ্বেষ জমেছে গজাননের মনে। সম্ভবত ডালিমই তার কারণ। জানি না।

কল্পনাথের ছোটোবোন ডালিম, গজানন তাকে আকৈশোর কামনা করত, এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একটা সময় অবধি ডালিমও ওকে কামনা করত মনেমনে। কিন্তু তারপর, কৈশোর এবং যৌবনের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়কালে সে গজাননের জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে ফেলে। সেই অন্যজনটি যে বাস্তবিক কে, গজানন সে ব্যাপারে কোনওদিন কিছু খোলসা করে বলেনি আমাকে, কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার জাতক্রোধের ব্যাপারটা সে গোপন করবার চেষ্টা করত না কখনোই। সুযোগ পেলেই মেয়ে-জাতটা সম্পর্কে সে হরেক উপায়ে পরিহাস করত প্রায়ই। মেয়েরা যেহেতু দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে পারে না, গজানন তাদের সেই মজবুরিটাকে প্রায়ই কটাক্ষ করে বলত, যারা দাঁড়িয়া পিসাব করতে পারে না, তাদের দ্বারা কিছু হবে?

শুধু অপদার্থতাই নয়, মেয়েদের দ্বিচারিতা নিয়েও পরিহাসের অন্ত ছিল না গজাননের। নানান উপমার মাধ্যমে সেই পরিহাসকে প্রকাশ করত সে। বলত, জল নাই, তো সে নদীই নয়, আর, সতীত্ব নাই, তো সে মেয়াই নয়। এই ধর্ না, যমী খাল, বছরের দশ মাস খটখটে শুকনা, পাখিপাখালও ঠোঁট ডোবাতে পায় না, সেচের জল জোগানো তো দূরের কথা, জলশৌচের জলও জোগাতে অক্ষম, আবার সামান্য বর্ষায়, এমনকি ব্যাঙ মুতলেও চারপাশ ডুবিয়া বন্যা করিয়া দিল, এমন ছিনাল নদীকে দ্বিচারিণী ছাড়া আর কীই বা বলবি তুই?

নদীটাকে নিয়ে গজাননের এসব মন্তব্য ছিল নেহাতই উপলক্ষ্য। লক্ষ্য ছিল অন্য কেউ বা কারা। কখনও ডালিম, কখনও শিখাবউদি। ডালিমের বেলায় বলত, একসাথে দুজন পুরুষকে মন দিয়া বুসল যে মেয়া, তাকে সতী বলবি তুই? আবার শিখাবউদির বেলায় বলত, বুকের মধ্যে লাভার লিয়া স্বামীর

সাথ ঘর-সংসার কচ্ছে, কেমন মেয়া সে, ভাব তাইলে।

এইভাবে, দ্বিচারিণী যমী খালের সঙ্গে কখনও ডালিমকে, কখনও বা শিখাবউদিকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়ে গজানন মূলত ওই দুই রমণীর সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্তই টানতে চাইত যে, ওই ধরনের মেয়েদেরই শাস্ত্রে-পুরাণে অসতী কিংবা দ্বিচারিণী বলা হয়। এবং বাহ্যত তাদের যতই অনুরাগ কিংবা স্নেহমমতা জাতীয় ছলাকলাভিত্তিক আচার-আচরণ হোক না কেন, তাদের সম্পর্কে সমাজের কঠোর মনোভাবই দেখানো উচিত। কারণ, ওই জাতের মেয়েরা, আসলে, মানুষপদবাচ্যই নয়।

বলত, অসতীরা ফের মানুষ, যমী খাল ফের নদী!

শিখাবউদির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বারংবার আমাদের গাঁয়ের যমুনা নদীর প্রসঙ্গ এসে যাবেই। তার একটি সঙ্গত কারণ রয়েছে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হয়েছে শিখাবউদির সঙ্গে যমুনার খুবই মিল রয়েছে। কোনওকোনো ক্ষেত্রে তো যমুনা আর শিখাবউদি হুবহু এক। দুজনেই তাদের জীবনের কিছুটা সময় হারিয়ে ফেলেছিল কিংবা চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য শিখাবউদিই চুরি যাওয়া নদীটাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে সন্ধিপুরের মানুষকে। সেই সঙ্গে খুঁজে পেয়েছে নিজেকেও।

অবশ্য শিখাবউদিকে সে কথা বললে সে জোর গলায় আপত্তি জানায়। বলে, আমি নয়, হারিয়ে যাওয়া নদীটাকে খুঁজে আনার ব্যাপারে যাবতীয় কৃতিত্বটা পল্টুদার। যা করবার সেই-করেছে।

বলে, পল্টুদা না থাকলে আমার কী সাধ্যি ছিল একেবারে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাওয়া নদীটিকে আবার জলজ্যান্তভাবে ফিরিয়ে আনি!



শিখাবউদি যখন আমাদের সন্ধিপুর গাঁয়ে বউ হয়ে আসে, আমার বয়েস তখন আট কি নয়।

সন্ধিপুর গাঁয়ে শিখাবউদির আগমন আমাদের স্মৃতিকালের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেন কি, ও-ই আমাদের গাঁয়ে শহর থেকে আসা দ্বিতীয় মেয়ে। প্রথম এসেছিলেন রত্নহীরা, আমাদের গ্রামের জমিদার বংশের শেষ কুলপ্রদীপ হিরন্ময় মুখুজ্যার বউ হয়ে। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর শহরের মেয়ে। মেদিনীপুর শহরে দোতলা বাড়ি ছিল তাঁদের। তাঁর বাবা ছিলেন মেদিনীপুর কালেক্টরেটের হেডক্লার্ক। পাকা রাস্তা, বিজলি বাতি, আর ট্যাপের জলে কৈশোর আর যৌবনের অনেকখানি কেটেছে রত্নহীরার। ওইসব নিয়ে তাঁর অহংকারের অন্ত ছিল না।

তাঁর অহংকারের আরও কারণ ছিল। এত ফর্সা আর সুন্দরী মেয়ে এ-গাঁয়ে, একমাত্র আমার মা ছাড়া, আর নাকি কেউই আসেনি।

রত্নহীরা আসার অন্তত চার-পাঁচ বছর বাদে ওই একই শহর থেকে শিখাবউদি এল এ গাঁয়ের বউ হয়ে। আমাদের পাড়ার বল্লভদার বউ সে।

যখন প্রথম আসে, ওকে দেখতে নাকি সারা পাড়া আদেখলার মতো ভেঙে পড়েছিল। আর, একটা মানুষকে দেখতে সারা পাড়াকে অমন হামলে পড়তে দেখে শিখাবউদি হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে। অথচ তখনও অবধি নতুন বউয়ের পোশাক ঘোচেনি তার শরীর থেকে।

দেখতে দেখতে আমাদের পাড়ার সেকেলে রক্ষণশীল মানুষজনের মুখগুলো গম্ভীর থমথমে হয়ে যায়, কেন কি, নতুন বউয়ের এহেন ব্যাভার, এ তো বেহায়ার হদ্দ হে!

শিখাবউদি দেখতে যে দারুণ কিছু সুন্দরী ছিল তা কিন্তু নয়। তবে উজ্জ্বল শ্যামলা রঙের পাশাপাশি তার মুখমণ্ডলে এমন এক ধরনের আলগা শ্রী ছিল, প্রথম দর্শনেই খুব চোখ টানে। তার চোখমুখ ছিল কাটাকাটা, ধারাল চোখের তারায় কারণে-অকারণে বিদ্যুৎ খেলাতে পারত, আর, হাঁটার মধ্যে এক ধরনের অভিনব ছন্দ ছিল, যা দেখতে দেখতে কালেভদ্রে বেলদার সিনেমা-হলে সিনেমা দেখে আসা গাঁয়ের বউ-ঝিদের মনে হত, ঠিক এভাবেই হাঁটাচলা করে রুপোলি পর্দার নায়িকারা। ঠিক ওইভাবে, ঘাড় একদিকে আলতো কাত করে, নিতম্বে মৃদু ঝাঁকুনি তুলে, ডিম দিতে থাকা মাদি হাঁসের মতো

আলসেপনা মন্থর গমন। গাঁয়ের মেয়েরা এমন হাঁটন-চলন রপ্ত করবার কথা সেযুগে ভাবতেই পারত না। আর, এমন আধো-আধো উচ্চারণে কথা বলত শিখাবউদি, এমন একটা সুরের ছোঁয়া মাখিয়ে দিত কথাগুলোর গায়ে, চির পরিচিত শব্দগুলোও কেমন মায়াবি লাগত। সব মিলিয়ে শিখাবউদিকে খুব অভিনব, খুব আকর্ষণীয় লেগেছিল গাঁয়ের মানুষের।

সারা পাড়ার মানুষ অমন আদেখলার মতো হামলে পড়ে ওকে দেখতে আসার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। সারা গাঁয়ের মধ্যে দ্বিতীয় হলেও শিখাবউদি ছিল, তখনও অবধি, আমাদের পাড়ায় বউ হয়ে আসা প্রথম শহরের মেয়ে। রত্নহীরাও বউ হয়ে এসেছিলেন এগাঁয়ে, তবে আমজনতার কাছে তিনি তো অতখানি সহজপশ্যা ছিলেন না। যতই হোক, জমিদারের বউ ছিলেন তিনি। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই দেখতে হত তাঁকে। কিন্তু শিখাবউদির মতো একেবারে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলবার দূরত্ব থেকে কোনও শহরের মেয়েকে সে-যাবৎ দেখেনি সন্ধিপুরের আমজনতামানুষ।

শিখাবউদি গাঁয়ে ঢোকার ঢের আগেই সে ভীষণভাবে এসে গিয়েছিল পাড়া-পড়শির আলোচনায়। বিশেষ করে তাকে নিয়ে পাড়ার মেয়েমহলে আগাম গবেষণার অন্ত ছিল না। সে মেয়ের মাথার চুল নাকি ঘাড় অবধি ছাঁটা। সে নাকি সারাক্ষণ পায়ে জুতো পরে থাকে। কুঁচি না দিয়ে নাকি শাড়ি পরেই না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাকি মুখে স্নো-পাউডার মাখতে বসে যায়। আর, তার কোমরে নাকি সারাক্ষণ গোঁজা থাকে ফুল-আঁকা রুমাল, কেন কী, সে মেয়ে নাকি কাশবার সময়, হাঁচবার সময়, সর্বদা রুমাল দিয়ে মুখ চাপা দেয়। কাজেই, অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে শিখাবউদির জন্য।

শিখাবউদিকে দেখা মাত্তর সকলের চোখে ঘনিয়ে আসে গাঢ় বিস্ময়। তার ছাঁটা চুল, পায়ে জুতো, উঠতে বসতে প্রসাধন ইত্যাদি জল্পনা-কল্পনাগুলোর অনেকটাই বাস্তবের সঙ্গে মেলে না বটে, তবে দুদিন না যেতেই পুরো পাড়াই আড়ালে একমত হয় যে, মেয়েটির চোখে-মুখে, চলনে-বলনে এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে, যা গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত। মাধব-জেঠুর মতো রক্ষণশীল মানুষজনের মতে, মেয়েটি একটু বেশি মাত্রায় বেহায়া, তবে, বল্লভের মতো পাটোয়ার ছোকরার সঙ্গে পটবে ভালো। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা। বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুল।

বল্লভদার বাবা, যাদব ঘোষ—আমার নিজের জেঠুর সমবয়সী সে, বন্ধুস্থানীয়, এমনিতে খুব সরল চাষাভুষো মানুষ। একটু ভিতু প্রকৃতির। আর বল্লভদার মা—আমাদের রাধা-জেঠিমা, বোকাসোকা ধর্মভীরু মহিলা, জীবনে কোনওদিন পয়সা গুনতে শেখেনি। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে সবাই আড়ালে বলাবলি করতে থাকে, এই শহুরে মেয়ের পাল্লায় পড়ে কতই না দুর্দশা হয় বেচারিদের!

ছেলেবেলায় বল্লভদাকে আমরা বাচ্চারা খুবই সমীহ করতাম। ফুড ডিপার্টমেন্টের কাকে যেন টাকাফাকা খাইয়ে খিড়কির পথে একটা কেরানির চাকরি বাগিয়ে নিয়ে ধরাকে বুঝি একেবারে সরা জ্ঞান করত। তার ওপর শহুরে আধুনিকা বউ এনে যেন দেমাকে আর পা পড়ত না মাটিতে। চাকরিটা পাওয়ার পর কিছুদিন মেদিনীপুর শহরে পোস্টিং হয়েছিল তার। তখনই তার কোন এক সহকর্মীর দূর সম্পর্কের বোন হিসেবে আলাপ হয় শিখাবউদির সঙ্গে। আলাপ থেকে ক্রমে ক্রমে প্রেম। প্রেম থেকে বিয়ে।

শিখাবউদির পুরো নাম ছিল বহ্নিশিখা। বল্লভদা ওকে কখনও বহ্নি, কখনো শিখা বলে ডাকতে ডাকতে নামের দুটো অংশকেই সমান মহিমা দান করেছিল। 'শিখা এটা পছন্দ করে না', কিংবা 'বহ্নি কাল বলছিল,' শুনতে শুনতে পাড়ার লোকেদের দু'চোখ কপালে উঠে যেত। ঘোর কলিকালে আরো যে কত রঙ্গ দেখতে হবে তাদের, ওপরওয়ালা যে কেন এইবেলা ওপরে ডেকে নিচ্ছে না, সেই আক্ষেপে ভরে যেত সন্ধিপুরের প্রবীণ আকাশ। কিন্তু সারা পাড়ার মানুষ শিখাবউদির যেসব আচার-আচরণকে বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না, বল্লভদা ওগুলোকেই বলত স্মার্টনেস। বিয়ের আগে শিখাবউদির স্মার্টনেস দেখে কোন এক এস-ডি-ও নাকি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, এবং সেই মহামূল্য নিধিটিকে যে ছিনিয়ে আনতে পারল বল্লভদা, তার সেই এলেমটাকে গাঁয়ের যারা চিনতে পারল না, তাদের করুণা করা ছাড়া বল্লভদার আর কীই বা করবার রয়েছে! বলে, মুক্তার মালার মর্ম বাঁদরে বুঝবে

কি!

বল্লদার কথাগুলো কানে গেলে পর শিখাবউদি মুখ টিপে হাসতে থাকে নিঃশব্দে। পাড়ার সমবয়েসিদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, শুধুই কি এস-ডি-ও? পল্টুদার কথা শুনলে তো এরা ভিরমি খাবে। আমার মুখ থেকে একটিবার 'হ্যাঁ' শোনার জন্য কী না করেছে সে!

তখন থেকেই পল্টুদার সম্পর্কে আমাদের সবাইয়ের মনে কৌতূহলের শুরু।

বল্লভদার বিয়ের তখন হপ্তাটাক বাকি, একদিন গজানন চোখ মটকে বলে, চল, বল্লভদার বাড়িতে জোর তামাশা বাধিয়া গেছে, দেখিয়া আসি।

শুনেই হুড়মুড়িয়ে দেখতে যাই। গিয়ে দেখি, সত্যি সে এক নিদারুণ তামাশা। বল্লভদাদের খিড়কি-পুকুরের ঈশেন কোণে হাত তিন-চার গর্ত খুঁড়েছে ওদের মাইন্দার গোপ্‌লা। বেজায় গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওকে। আমাদের কোনও কথার জবাব না দিয়ে সে এক মনে গর্ত খুঁড়তে থাকে, তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়, যে কাজটা করছে সে, একেবারেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে করছে।

বল্লভদা বাড়িতে ছিল না। অন্যদের মুখও বেজায় গম্ভীর। আমার কেমন জানি মনে হয়, ওই গর্তটাই যত অনাসৃষ্টির মূলে। সারা বাড়ি জুড়ে এমন থমথমে ভাব দেখে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না আমার। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসি আগড় ঠেলে।

রাস্তায় পা দিয়েই গজাননকে শুধোই, গত্তো খুঁড়তিছে কেন রে?

গজানন ফিক্ করে হাসে। তারপর আচমকা গম্ভীর হয়ে গিয়ে জবাব দেয়, পায়খানা তৈরি হচ্ছে। বল্লভদার বউয়ের তরে।

তখনও অবধি আমাদের গ্রাম-এলাকায় মাঠে-ঘাটে ঝোপঝাড়ের আড়ালেই বাহ্যি বসত চোদ্দআনা মানুষ। কেউ কেউ চলে যেত যমুনার পাড়ে। সেখানে ঝোপঝাড়ের অন্ত নেই। বিশ-পঁচিশজন লোক একসঙ্গে বাহ্যি বসতে পারত অনায়াসে। তখন কেবল সন্ধিপুরের মুখুজ্যা-বাড়িতেই ছিল খাটা-পায়খানার ব্যবস্থা। শিখাবউদির অনারেই, সেই প্রথম, সন্ধিপুরেব একটি মধ্যবিত্ত বাড়িতে পায়খানার ঘর তৈরি হতে যাচ্ছে। শুনেই কেমন উত্তেজিত বোধ করি আমি। সারাদিন ধরে জনে জনে ডেকে ডেকে শোনাতে থাকি সেই মহার্ঘ সংবাদ।

পরের দিন পুনরায় ছুটে যাই বল্লভদাদের বাড়িতে।

দেখি, গর্ত খোঁড়ার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। গজাননও ছিল সঙ্গে। আমরা ঘাড় ঝুঁকিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকি গহ্বরটিকে। একেবারে আলো-আঁধারি তলাটিকে দু-চোখ দিয়ে ছুঁয়ে ফেলি।

তারপর..., গর্তের ওপর নতুন চেরাই করা পাটাতন সেট করে বসবার জায়গা তৈরি হল..., ছিটেবেড়ার দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে বানানো হল ঝুপড়ি...ঘর..., বাঁশ চিরে ফালাফালা করে দরজা বানানো হল..., দরজার ভেতরে-বাইরে লাগানো হল লোহার শেকল...। ওই ক'দিন আমরা প্রায় সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অপার কৌতূহলে প্রত্যক্ষ করলাম সেই নির্মাণপর্ব। এতসব আয়োজন যার জন্য, আয়োজন দেখতে দেখতেই তাকে নিয়ে সেই থেকে আমাদের কচি বুকের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের সূচনা।

তারপর তো একদিন শিখাবউদি সশরীরে উদয় হল। যমুনার গোড়ালি-ডোবা জল কেটে কেটে যখন শিখাবউদির পালকি ধীরে ধীরে পেরিয়ে এল এপারে, বল্লভদা নাকি নদীটার সঙ্গে শিখাবউদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ঘটা করে, কিনা, আমাদের গাঁয়ের নদী এটা। যমুনা নদী। আর, তাই শুনে শিখাবউদি নাকি খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল, এ মা! এটা আবার নদী নাকি? এত নালারও অধম!

শিখাবউদি এবং গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ যদিও সারাক্ষণ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত, আমরা কিন্তু নদীটাকে খুব ভালোবাসতাম।

আমরা বলতে, মূলত আমি আর কল্পনাথ।

আসলে, হয়ত বা সত্যিসত্যি খালই ছিল ওটা, আমরাই ভালোবাসতে-বাসতে ওটাকে নদী বলে ভেবেছি। কখনও কখনও এমনও মনে হত, নদীটাকে আমি আর কল্পনাথ, আমরা দুজনে মিলে, সন্ধিপুরের দক্ষিণ দিক বরাবর এঁকেছি।

ক্লাস ফোরে উঠে নতুন বই কেনা হল, আমি আর কল্পনাথ রানিহাঁস দিঘির নির্জনতায় বসে 'কিশলয়'-এর নতুন ঝকঝকে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আচমকা আমাদের নদীটাকে পেয়ে গেলাম বইয়ের পাতায়। 'কিশলয়' বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় কালো-কালির মোটা আঁচড়ে আঁকাবাঁকা নদীটি শুয়েছিল ধ্যাবড়ানো কালি দিয়ে আঁকা গাছ-গাছালির গা ঘেঁসে। আমরা বইয়ের পাতায় আচমকা আমাদের নদীটাকে আবিষ্কার করে ফেললাম, এবং সেটা যে আমাদেরই ওই নদীটা, সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলাম নদীটার তলায় লেখা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকেবাঁকে/বৈশাখ মাসে তায় হাঁটু জল থাকে/পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি/দুইধারে উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি/চিকচিক করে বালি কত নাও ধায়/একধারে কাশবন ফুলেফুলে সাদা/... আমাদের নদী নয়ত কী? সবই তো মিলে যাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই, আমাদের নদীটাকে নিয়েই লেখা হয়েছিল ওই কবিতা।

আসলে, তার আগে নদীটাকে নিয়ে তো তেমন কিছুই ভাবিনি কোনওদিন। আছে, আছে। বহুদিন যাবৎ আমাদের মনোযোগের বাইরেই ছিল নদীটা। বরং নানান কারণে নদী-এলাকাটাকে মনেমনে ভয় পেতাম আমি। তার দু'পাড়ে ছিল বেনা গাছের ঘন সারবন্দী জঙ্গল, পুরো এলাকাটা ছিল খুব নির্জন, রাতের বেলায় দলে দলে শেয়াল ডাকত রোজ। একা একা ওই এলাকায় কখনোই যেতাম না আমি। আচমকা 'কিশলয়' বইয়ের পাতায় ছবিসহ ওই কবিতাটা পড়বার পর পরই নদীটাকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তার শুরু।

বলা চলে, রানিহাস দিঘির নির্জন পাড়ে বসে একত্রে সুর করে পড়তে পড়তে সেই প্রথম আমাদের গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে নদীটাকে আঁকতে শুরু করি আমরা দু-জনে। একসময় আমাদের মনে নদীটাকে নিয়ে যাবতীয় ভয় এবং বিদ্বেষ কেটে যেতে থাকে। কবিতাটা আমরা বারবার পড়তে থাকি, সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যেয়,...এবং বারবার নদীটাকে আঁকতে গিয়ে মুছেমুছে নতুন করে আঁকি। এইভাবে প্রায় সারা বছর ধরে আঁকবার পর নদীটি আমাদের ছবিতে সম্পূর্ণভাবে রূপ পায়। আমরা নদীটাকে ক্রমশ ভালোবাসতে শুরু করি। প্রায় রোজ বিকেলের দিকে আমি আর কল্পনাথ ওর পাড়ে গিয়ে বসি। বারবার সমবেতভাবে আউড়ে নদীটাকে কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে নিই। এবং বারবার নিঃসন্দেহ হই যে, কবি আমাদের এই যমুনা নদীটাকে নিয়েই কবিতাটি লিখে থাকবেন। আমাদের মনে এমন বিশ্বাসও দৃঢ় হতে থাকে যে, কবি কোনওকালে নদীটাকে দেখেছেন নির্ঘাৎ। কেন কি, স্বচক্ষে না দেখলে কারোর পক্ষেই এমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কেবল একটা কথা কিছুতেই বোধগম্য হয়নি আমাদের, কী করে দেখলেন তিনি আমাদের নদীটাকে, কবে এলেন তিনি আমাদের গাঁয়ে?

কল্পনাথের একটা ভারি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, সে মনুষ্যেতর প্রাণী-পশু, গাছ-গাছাল, এমনকি, আকাশ, মাটি, জল, বাতাস, সকলের সঙ্গে কথা কইতে পারত। দু-দিনেই সবাই বন্ধু হয়ে যেত ওর। কাজেই, যমুনার সঙ্গেও অল্প সময়ের মধ্যেই খুব ভাব হয়ে গেল কল্পনাথের। পাড়ে বসে বসে সে নদীটার সঙ্গে কথা কইত নিবিষ্ট মনে। মাঝ নদীতে ছুঁড়ে মারত নুড়ি, 'কুব্'...করে আওয়াজ উঠত। আওয়াজ তো নয়, ওটাই তো, কল্পনাথের কাছে, নদীর জবাব। সে নিজে একটা কথা শুধোতো, পর মুহূর্তে আবার ছুঁড়ে মারত নুড়ি, আবার 'কুব্' আওয়াজের মধ্যে দিয়ে জবাব চলে আসত কল্পনাথের কাছে। নুড়ির আকার অনুযায়ী 'কুব্' আওয়াজের হেরফের হত। কল্পনাথ সেই অনুসারে নদীর কথাবার্তার অর্থ উদ্ধার করত। কখনও বা একটা নুড়ি, কখনও একসঙ্গে দুটো, তিনটে, চারটে , তার ফলে জলের বুকে ধ্বনির

যেটুকু তারতম্য ঘটত, সেই অনুসারে নদীর কথাবার্তার ভাষাও বদলে যেত কল্পনাথের কাছে। এইভাবে, সারা বিকেল সে নদীটার সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে থাকত। আমরাও পাশটিতে বসে শুনতাম সেই কথোপকথন। শুনতাম মানে, কল্পনাথই রিলে করে শোনাত।

—নদী, তুই কোথা থিকে আসতিছু?

—কুব্...কুব্...। মানে, পারিজাতপুরের জঙ্গল থিকে। কুব্...কুব্...কুব্...। মানে, জঙ্গল-ধোয়া জল দিয়ে তৈরি হয় আমার শরীর।

—তোর বুকের মধ্যে কী কী আছে?

—কুব্... কুব্ কুব্...। মানে, অনেক কিছু। মাছ, ব্যাঙ, গেঁড়ি-গুগলি, শামুক, মাটিয়ালি সাপ...।

শুনতে শুনতে ওই বয়েসে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম, কল্পনাথ সামান্য কুব্ আওয়াজ থেকে কী করে বুঝে নিতে পারে নদীর ভাষা!

পরবর্তীকালে কেউ নদীটাকে যমী খাল বলে তাচ্ছিল্য করলে আমার আর কল্পনাথের বুকে বড়ো বাজত। আর, শিখাবউদি কিনা আমাদের গাঁয়ে বউ হয়ে আসার পর বলেই ফেলল, নদী কোথায়? ওটা তো একটা নালা। বলত, এটাকে তোরা নদী বলিস? নদী হচ্ছে আমাদের কাঁসাই। এপার-ওপার দেখা যায় না। পল্টুদা বলে, সে নাকি কাঁসাইয়ের চেয়েও ঢের বড়ো নদী দেখেছে।

শিখাবউদি আমাদের গাঁয়ে বউ হয়ে আসার পর অল্প দিনের মধ্যেই, আমাদের মতো ছোটোদেব সঙ্গে যখন তার ভাব জমে ওঠে কানায় কানায়, যখন জ্যোৎস্নারাতে বল্লভদাদেব খোলা উঠোনে মাদুর পেতে আমরা ঘিরে বসতাম শিখাবউদিকে, এবং জুড়ে দিতাম, কার 'কী ভালো লাগে', ওই নিয়ে ভারী মজাদার এক খেলা। তখন 'তোমার বড়ো নদী ভালো লাগে, না ছোটো নদী?'ব জবাবে যখন তার স্মৃতিতে থেকে যাওয়া কাঁসাই নদীর কথা ভেবেই শিখাবউদি বলে ওঠে, 'বড়ো নদী', তখন আমি এবং কল্পনাথ শিখাবউদির দু-কানের পাশে মুখ নিয়ে গিয়ে একত্রে বলে উঠি, ছোটো নদী।

পরে পরে অবশ্য শিখাবউদিও নদীটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল খুবই। নদীটা ওকেও খুব টানত। প্রায়ই বিকেলের দিকে বলত, চল না রে, নদীর দিকটাতে যাই। কত হাওয়া! পাখি! কাশফুলের ঝোপ।

শিখাবউদিকে নিয়ে আমরা মাঝে মাঝেই নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। হ্যাঁ, ততদিনে যমুনাকে 'নদী' বলতে শিখেছে সে। শিখাবউদির কথায়, নদীর তীর। আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে বসবাব প্রস্তাব দেওয়ায় শিখাবউদি তো হেসেই খুন। বলে, নদীর পাড় হয় রে বোকা? নদীর তীর। পুকুরের পাড়। গেঁয়ো হাবা কোথাকার!

এইভাবে, কত শব্দের যে ব্যবহার-বিধি নতুন করে শিখেছি শিখাবউদির থেকে! যদিও এখন বুঝতে পারি, তার সবগুলোই ঠিকঠাক ছিল না। অনেক ভুল শব্দেব বোঝা শিখাবউদি তার ভুল ধারণাবশত চাপিয়ে দিয়েছিল আমাদের ওপর।

শিখাবউদি আমাদের সবাইয়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল পল্টুদা নামক আরও একটি মারাত্মক বোঝা। সেই বোঝা বইতে বইতে সন্ধিপুরের মানুষ শিখাবউদিকে বিষচোখে দেখে গেছে বহুকাল। আমি যখন তা বুঝতে পারলাম, তখন শিখাবউদির যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। বাস্তবিক, শিখাবউদি হারিয়ে গিয়েছে তদ্দিনে।

কিন্তু শিখাবউদি তা মানতে চায়নি কোনওদিনও। একদিনের জন্যও সে তিলমাত্র স্বীকার করেনি যে, আমাদের ওপর সত্যি সত্যি কোনও নিদারুণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সে। সর্বস্ব হারিয়েও মানতে চায়নি কথাটা। বলেছে, বোঝা চাপানোব কী আছে? যা সত্যি, তাই বলেছি।

সন্ধিপুর গাঁয়ে শিখাবউদির দিনগুলি প্রথমের দিকে বিভিন্ন কারণে মোটেই সুখকর হয়নি।

প্রথম যখন এল সে, বল্লভদার সে কী বিড়ম্বনা! প্রথমদিকে তো দিনে-রাতে গ্রামের মধ্যেকার হরেক জাতের শব্দ শুনতে শুনতেই তাজ্জব হয়ে যেত শিখাবউদি। ভয়ে আশঙ্কায় চমকে চমকে উঠত। এর চোদ্দআনা শব্দ তো সে জীবনে শোনেনি।

গ্রামের শব্দ আর শহরের শব্দে বহুৎ ফারাক। গ্রাম এবং শহর দু'জায়গার মানুষই ফারাকটা বুঝতে পারে। আমিও বুঝেছি, যখন শহরে গেলাম। শিখাবউদিও বুঝেছিল, যখন গ্রামে এল।

গ্রামে দিনের বেলায় গোরু-ছাগল, পাখ-পাখালের ডাক, ভরদুপুরে ঘুঘুদের কান্না, শহরে বাস-ট্রামের মুহুর্মুহু গর্জন, রিকশার পুকপুক হর্ন, ভরদুপুরে ফেরিওয়ালার ডাক্। গ্রামে-ঘরে সূর্য্যি ডোবার পর পরই রাত্তির নেমে আসে, শহরে দিনটাই গড়াতে গড়াতে রাতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পড়ে। শহরে নিশুত রাতে বেশি রাতের রিক্সার পুঁকপুঁক হর্ন, চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ, নাইট-শো সিনেমা-ফেরৎ মানুষের হল্লা, ঘর-ফিরতি মাতালের আস্ফালন, তাই দেখে পাড়ায় পাড়ায় খেঁকি কুকুরগুলোর চিৎকার, ব্যস। সেই তুলনায় গ্রামে, রাতের বেলায়, ঘরের ভেতরে ও বাইরে, শব্দের বুঝি কোনও ইয়ত্তা নেই। ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে টিকটিকিরা পোকা ধরে বেড়ায়, ঘরের চালে হেঁটে চলে বেড়ায় ইঁদুর, চামচিকে, বেড়াল, কখনও বা ভাম..., রান্নাঘরের নর্দমার মুখে চুঁক্...চুঁক শব্দ তুলে খাবার খোঁজে ছুঁচোর দল..., বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় নিশাচর প্রাণীরা..., মুহুর্মুহু কুকুর ডেকে ওঠে..., নিরাপদ দূরত্বে ডাকতে থাকে শেয়ালের পাল..., গাছগাছালির ডালে ডালে ডেকে ওঠে রাতচরা পাখি, মাঝপুকুরে পিঠ ওলটায় দশাসই মাছেরা..., পাখনা ঝাপটে সাঁইসাঁই আওয়াজ তুলে উড়ে যায় বাদুড়ের দল...।

শিখাবউদি তো সর্বদা শঙ্কিত শশব্যস্ত হয়ে থাকত। বিশেষ করে রাতের বেলায়। শব্দগুলো শুনতে শুনতে শিউরে শিউরে উঠত সে। তার প্রথম হ্যাপাটা পোহাতে হত বল্লভদাকেই।

সন্ধেটি নামল তো ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল শিখাবউদির চোখমুখ। তার চোখেমুখে নেমে এল আশঙ্কা, ভয়। আর, তার ফলে বল্লভদাকে, যার রোজ সন্ধেবেলায় আড্ডা না মারলেই নয়, ফি-সন্ধেয় আটকে থাকতে হল বাড়িতে, স্রেফ শিখাবউদিকে সাহস জোগানো এবং প্রতিটি গ্রামীণ নৈশ শব্দের মানে বোঝাবার জন্য।

সন্ধেপ্রহরে দুটিতে পাশাপাশি বসে রয়েছে খাটিয়ায়, গল্প করছে দু-জনাতে, আচমকা চমকে সিঁটিয়ে গেল শিখাবউদি, এটা কিসের আওয়াজ গো?

গল্পে মশগুল বল্লভদা হয়ত বা খেয়ালই করেনি, তাই শুনে শিখাবউদি রেগে কাঁই। কেন কী, যে শব্দে সে অমন করে চমকে উঠতে পারল, সে শব্দটা পাশেরজনটি শুনতেই পেল না! অন্যের শোনাটাকে এবং শোনাজনিত আশঙ্কাকে এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে রাগ তো হবেই।

কাজেই রুদ্রমূর্তি ধরে শিখাবউদি, ইয়ার্কি হচ্ছে? শুন্‌তে পাওনি? নির্ঘাৎ কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছে। কী বললে, ইঁদুর? ইঁদুর ওর'ম শব্দ করে বুঝি? কী বললে? তোরঙ্গের পেছনে ইঁদুর এসেছে? এক জোড়া? প্রেম কচ্ছে? নাকি লড়াই কচ্ছে? প্রেম করলে এমন বেয়াড়া আওয়াজ হয় বুঝি? আমরা বুঝি প্রেম করিনি? আবার কিসের শব্দ? কালপেঁচা? পেঁচা ওই রকম ডাকে বুঝি?...এইভাবে, পুকুরে মাছের ঘাই মারা থেকে পেয়ারা গাছে ঝুপঝুপ করে বাদুড়দের বসে পড়া..., দূরে ধানের খেতে শেয়ালের সমবেত চিৎকার..., তাল গাছের চুড়োয় শকুনের বাচ্চাদেব কান্না..., সারা সন্ধে, কখনও বা রাত কাবার করে সব আওয়াজের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতে হত বল্লভদাকে।

ফলত, প্রথম প্রথম বেশ ক-টা রাত শিখাবউদি নিজেও ঘুমোয়নি, বল্লভদাকেও দু-চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। সন্ধে প্রহর থেকে রাতভর বেচারিকে চারপাশের যাবতীয় শব্দের বুৎপত্তি ও অর্থ বোঝাতে হয়েছে শিখাবউদিকে। আমরা পরবর্তীকালে শিখাবউদির মুখ থেকেই পেয়েছি সেই তথ্য। মুখ কালো করে শিখাবউদি বলেছে, উহ্, কী সব আজব-আজব আওয়াজ রে তোদের গাঁয়ে! পিলে চমকে যায়।

জীবনের প্রথম পর্বে বল্লভদা শিখাবউদির এবংবিধ যাবতীয় জুলুম হাসিমুখে সইত।

কিন্তু শিখাবউদি ধীরে ধীরে তার ঘাড়েও চাপিয়ে দিল ওই নিদারুণ বোঝাটি। বোঝাটাকে বইতে বইতে বল্লভদা একদিন পুরোপুরি বদলে গেল। তার দু-চোখে নীলাভ বিষ জমল, কুমড়ো পাতার গায়ের নরম রোমের মতো সূক্ষ্ম সন্দেহ জন্ম নিল তার বুকের গভীরে...।

সেই ছেলেবেলা থেকে শিখাবউদির প্রতি আমার ছিল অপ্রতিরোধ্য চোরা টান। আমার চোখে তার সবকিছুই ছিল অভিনব, অনুকরণযোগ্য, অথবা অনুকরণের অতীত। তার মুখনিঃসৃত সব কথাই আমার কাছে বেদবাক্যের মতো ছিল। মনে আছে, যখন আমাদের গাঁয়ে প্রথম আসে, গ্রামের ব্যাপারে কত কিছুই অজানা ছিল তার। শিখাবউদি জানত না যে চিনেবাদাম মাটির তলায় ফলে। বলে, ফ্যাট, চিনেবাদাম চেনাচ্ছিস আমায়? হরি সিনেমার সামনে থেকে রোজ চিনে বাদাম কিনে না খেলে চলতই না আমার! চিনেবাদাম মাটির তলায় ফলে? বুদ্ধু পেয়েছিস আমায়? ওরে বোকা, অড়হর গাছ দেখেছিস? চিনেবাদামও অড়হরের মতোই গাছের ডালে থোকায় থোকায় ফলে। গাঁইয়া কোথাকার! বলে কিনা...।

শুনতে শুনতে এমন অসহায়বোধ করেছিলাম আমি! বলি, বিশ্বাস হচ্ছেনি তো? বেশ, কবে যাবে বলো? একেবারে খেতে লিয়ে গিয়েই দেখিয়ে আনি তোমায়। তাহলে তো বিশ্বাস হবে?

শিখাবউদির দু-চোখে কপট রোষ... চিনেবাদামের খেত দেখাবি আমায়? এদেশে চিনেবাদাম হয় রে বোকা? চিনেবাদাম হয় চীনে। সেইজন্যই তার নাম চিনেবাদাম। বুঝলি বুদ্ধু?

আমি মজা পাব, নাকি কপাল চাপড়াব, ভেবে পাইনে। শিখাবউদির ডান হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলি, চল এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায়। এই তো একটু দূরেই খেত।

তক্ষুণি অবশ্য যাইনি, তবে দিন কয় বাদে শিখাবউদিকে নিয়ে গেলাম চিনেবাদামের খেত দেখাতে। আমি, রতন, গজানন আর কল্পনাথ।

গ্রামের লাগোয়া উঁচু জমিগুলোতেই মুগ-বিউলি-সরষে এবং নানান জাতের সবজির চাষ হত। ধানের চাষ হত নিচু জমিতে। গ্রাম থেকে সামান্য দূরে সেগুলো।

চিনেবাদামের খেত দেখে তো শিখাবউদির বিশ্বাসই হয় না যে ওই সবুজ.. সবুজ ঝোপাল গাছগুলোই চিনেবাদামের গাছ।

শিখাবউদির সামনেই একটা গাছ উপড়ে ফেলি এবং শিখাবউদি সবিস্ময়ে দেখে...ঝোপাল গাছটির শেকড়ের সঙ্গে আটকে রয়েছে থোকা-থোকা চিনেবাদাম।

মাটির থেকে টাটকা তোলা চিনেবাদামের খোসাগুলো নরমই থাকে। হাত দিয়ে ভেঙে ভেতর থেকে নরম বীজ বের করে শিখাবউদির হাতে দিই। চোখেমুখে চাপা সন্দেহ নিয়ে একটা বীজ মুখে দেয় শিখাবউদি। চিবোতে থাকে নিঃশব্দে। চিবোতে চিবোতে তার সারা মুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে থাকে। বলে, খুব মিষ্টি তো রে! একেবারে জমানো দুধের মতো।

সারা পথ কাঁচা চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে আমরা ঘরে ফিরি।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধে নামতে না নামতেই পুব আকাশ জুড়ে ঢাউস চাঁদ।

নিজেদের উঠোনে বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চাঁদটাকে দেখছিল শিখাবউদি।

একসময় খুব গাঢ় স্বরে বলে, তোদের দেশের চাঁদটা কিন্তু খুবই ঝকঝকে। মানতেই হচ্ছে সেটা। এমন চাঁদ আমাদের শহরে নেই।

তখন শিখাবউদির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব।

মাঝেমাঝে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শিখাবউদিদের উঠোনে সজনে গাছের তলায় মাদুর পেতে আসর বসাত শিখাবউদি। আমরা চারপাঁচটি কিশোর-কিশোরী ঘিরে বসতাম ওকে। মেয়েদের মধ্যে থাকত কল্পনাথের বোন ডালিম, অনিলদার বোন জবা..., শিখাবউদি গুনগুনিয়ে গান ধরত, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো...।' কিংবা, 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়...।' ধাঁধাঁ বলত মুড়ি—মুড়কির মতো। 'এক থালা সুপারি, গুনতে নারে ব্যাপারি।' বল দেখি, কী? আর, গল্প, গান, ধাঁধাঁর মধ্যেও ওই বয়েসে আমার কিশোর শরীরটার ভেতরে এমনই এক উথালপাথাল মাদকতা তৈরি হত, মনে হত

আরও বহুক্ষণ বসে থাকি ওই মাদকতাময় সুগন্ধবৃত্তের ঘেরাটোপে। ইচ্ছে করত, ওইখানে চির-কালের তরে বসতি করি।

না, এই বয়সে পৌঁছে ওই বয়েসের মুগ্ধতাকে যতখানি পরিণত মনে বিশ্লেষণ করছি, যত সচেতনভাবে চিনতে পারছি ওই মুগ্ধতার ধরনটিকে, কৈশোরে অবশ্যই তেমন করে ভাবিনি। তখন ছিল কেবলই ভালোলাগা, অন্ধ অবুঝ ভালোলাগা।

গরমকালে রোজ সন্ধেয় বল্লভদাদের সদর পুকুরে গা ধুত শিখাবউদি। কতদিন বল্লভদাদের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উঠোনে বসে থাকতে থাকতে আমরা দেখেছি, পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে শিখাবউদি..., ভেজা কাপড়ে ধীরপায়ে হেঁটে আসছে...। একটু একটু করে অস্পষ্ট ছায়াছায়া মূর্তিখানি স্পষ্ট হচ্ছে আমাদের চোখের সুমুখে...। ধীরে ধীরে উঠোন দিয়ে হেঁটে যেত সে...। যেন জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে পেরিয়ে যেত উঠোনটা।... আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে হেঁটে চলেছে এক রহস্যময়ী নারী... তার সিক্ত বসনের পাড় চুইয়ে মুক্তোর বিন্দুর মতো ঝরে ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা...তার শরীর থেকে ভেসে আসছে গন্ধ সাবানের সুগন্ধ, আমরা উঠোনে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে...। সত্যি বলতে কি, তখন শিখাবউদিকে রক্তমাংসের মানবী বলে মনেই হত না, সেই সময়টায় ওকে মনে হত এক মায়াজগতের বাসিন্দা।



থইথই সবুজ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কতকাল আমার সেই প্রিয় নদীটিকে খুঁজে চলেছি আমি।

এমনিতেই কতকাল ধরে মজতে..মজতে...মজতে...এক্কেবারে সরু হয়ে এসেছিল খালটি, তাও বইছিল সরু সুতোর মতো, কিন্তু সত্তরের দশক থেকে একটু একটু করে চুরি যেতে লাগল নদীটা। আশির দশকে এসে একেবারেই হারিয়ে গেল তা।

অনেকদিন নদীর দিকটাতে যাওয়া হয়নি। এর-ওর মুখ থেকে শুনি, নদীটা নাকি নেই।

জীবনের খাঁজে-ভাঁজে ঢুকে পড়েছে ব্যস্ততা, যাবতীয় খণ্ড খণ্ড অবসরগুলিকে ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। ইচ্ছে থাকলেও স্বচক্ষে গিয়ে পরখ করে আসা হয়নি।

একদিন সদর থেকে বাড়ি এসে, কল্পনাথকে তো সঙ্গী হিসেবে পাবার উপায় ছিল না, কারণ সে ততদিনে দূর আকাশের পাখি, একা একাই গেলাম নদীটার কাছে, এবং অবাক চোখে দেখলাম, ধান খেতের মাঝ বরাবর আমাদের 'কিশলয়' বইয়ের সেই ছোট্ট নদীটা দিগন্ত জুড়ে পেতে রাখা বইয়ের সবুজ পাতা থেকে বেমালুম উধাও। আমার চারপাশে তখন থইথই সবুজ সমুদ্র। কচি ধানের চারাগুলি মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, যেন সবুজ সমুদ্রের বুকে সারবন্দী সবুজ ঢেউ। ওই সবুজ সমুদ্রের মধ্যিখানে কোথাও নদীটা আঁকা ছিল, অথচ সারা বিকেল নদীটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারলাম না, কোথায় ছিল নদীটা।

মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, এককালে আমাদের নদীটি সন্ধিপুরের একেবারে গা ঘেঁসে বইতো। খুব চওড়া ছিল সে নদী, আর তাতে থইথই করত জল। সে জলে স্রোতও ছিল খুব। শুনেছি, নাকি নৌকোও চলত। সেসব যারা দেখেছে তাদের কেউই তেমন বেঁচে নেই। সেসব হয়ত বা দু-তিন পুরুষ আগের কথা। কেবল আমাদেব গাঁয়ের শেষ জমিদার হিরন্ময় মুখুজ্যার একশো পেরোনো মা, আমাদের মন্দাকিনী দিদা নদীটার প্রসঙ্গে একেবারে গদগদ হয়ে বলত, তোরা তো দেখিসনি, নদীটা ভারী রূপবতী ছিল এককালে। সোনালি বালির উপব কী যে তার কারুকার্য আঁকা! তোরা তো দেখতে পেলি না। যখন প্রথম বউ হইয়া আসি তোদের গাঁয়ে...। এইভাবে, নদীর বন্দনায় ডুবে যেতে যেতেও মন্দাকিনী-দিদা জানিয়ে দিত যে, কম-বেশি আশি-পঁচাশি বছর ঘর-গেরস্থালি করলেও সন্ধিপুর গাঁটা তার গ্রাম নয়। কিনা, 'তোদের গাঁয়ে!'

মন্দাকিনী-দিদার সেই রূপবতী নদীটিকে আমরা দেখিনি বটে, কিন্তু ছেলেবেলাতেও দেখেছি যে

নদীটাকে, সে তো আমাদের চাক্ষুষ দেখা এক নদী, মিথ্যে কিংবা অলীক তো নয়, অথচ ছোটকাকার ছেলেমেয়েরা আমার কথা শুনে অবিশ্বাসী চোখে তাকায়। কথাটা বুঝি কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তাদের। তারা সব এ সময়ের ছেলে মেয়ে। তাদের মধ্যে আবেগ কম। কল্পনা, রূপকথা নেই বললেই চলে। তারা সব যুক্তির কারবারি। বলে, ছিল তো গেল কোথায়? নদী কি পাখিপাখাল নাকি যে পাখনা মেলিয়া ফুরুৎ করিয়া উড়িয়াবে।

আমি বলি, ছিল রে, বিশ্বাস কর, ছিল। আমরা যে এই সেদিন অবধি দেখেছি নদীটাকে। আমি, তোদের কল্পদা, গজাননদা, রতনদা, আমরা সব্বাই দেখেছি। শুধু দেখেছি নয়, নৌকোও ভাসিয়েছি ওর জলে, বিশ্বাস কর্।

মুখ ফুটে আর ওই বাচ্চাগুলোকে বলতে পারিনি যে, ওই নদীর পাড়েই কাশবনের মধ্যে জীবনে প্রথম সাপের শঙ্খ লাগা দেখতে দেখতে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম আমি আর কল্পনাথ। নদীটা খুবই শীর্ণ হয়ে এসেছে তখনই, কিন্তু ছিল। ওর দু'পাড়ে ছিল বেনা আর কাশগাছের ঘন ঝোপ, তার মধ্যে থাকত শেয়াল আর অসংখ্য গুঁড়ুর পাখি।

বাচ্চাগুলো বিরক্ত হয়, ছিল তো গেল কোথায়, সেটা বলবে তো?

বলি, নদীটাকে এক বিকেলে একটা কুমীর গিলে ফেলেছে। বিশ্বাস কর, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বাচ্চাগুলো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, হ্যাঁ, রূপকথাতেই ঘটে বটে তেমনটা। আর রূপকথা মানেই তো গাঁজাখুরি। মানুষ গাধা হয়্যা গেল, পাখি মানুষের ভাষার কথা বলল, একটা জলজ্যান্ত নদীকে কুমীর খায়্যা ফেলল...।

শুনতে শুনতে ক্ষেপে উঠি আমি,...গাঁজাখুরি? তাহলে ওই পাকাব পুলটা কী জন্যে? ভাঙাচোরা হলেও পুল তো ওটা, নাকি সেটাও গাঁজাখুরি?

পুলের প্রসঙ্গে বাচ্চারা সামান্য ধন্ধে পড়ে যায়। আগুন না থাকলে ধোঁয়া থাকে না, নদী না থাকলে পুলও থাকবার কথা নয়, এ হল যুক্তির কথা। বাচ্চারা এ প্রশ্নেব মীমাংসা করতে পারে না। তাদের ঐটুকু দুর্বল অবস্থায় পাওয়া মাত্র আমি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বোঝাতে শুরু করি। ছিল রে, বিশ্বাস কর, নদীটা ছিল।

বাচ্চাগুলোর চোখেমুখে দিনের পর দিন চাপচাপ অবিশ্বাস দেখতে দেখতে শিখাবউদির চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। একসময় সে খুব দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, ঠিক আছে, একদিন ওই নদীটাকে জগৎ ঢুঁড়ে খুঁজে আনব তোদের জন্য। বসিয়ে দেব ঠিক যেখানটাতে ছিল ওটা। একদিন সকালবেলায় ঘুম ভেঙে দেখবি, ওই বিশাল সবুজ খেতের মাঝ ববাবর নদীটা শুয়ে রয়েছে, তার শরীর বেয়ে বয়ে চলেছে নিটোল জলের স্রোত, ওই স্রোতে তোরা নৌকো ভাসাতে পারবি। আব, শিখাবউদির কথা শুনতে শুনতে বাচ্চাগুলোর মনে আর তিলমাত্র সংশয় থাকে না যে, এই আগেকার দিনের মানুষগুলো খুব স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখে চলে ওরা। সব কিছুকে নিয়ে অলীক কল্পনা করে সুখ পায়।

আমি শিখাবউদিকে বলি, খুব তো কড়ার করলে বাচ্চাগুলোব সামনে, কাজটা কিন্তু একেবারেই সোজা নয়।

—জানি।

—কিচ্ছু জান না। নদীটা এখন কোথায়, জান তুমি?

—কোথায়?

—নদীটা একটা কুমীরের পেটে ঢুকে গিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি সেই দৃশ্য।

শিখাবউদি আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বলি, বিশ্বাস কর, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। সে এক বিশাল কুমীর, আমার চোখের সামনে ঠিক ভেলকিবাজ বেদে বৈরাগীর সুতো খাওয়ার মতো একটু একটু করে গিলে ফেলল পুরো নদীটাকে

আমাকে দেখতে দেখতে শিখাবউদির ভুরু জোড়াতে গভীর ভাঁজ পড়েছিল সেদিন।

জয়া যখন বিয়ের পর প্রথম আসে আমাদের গাঁয়ে, তখন তো নদীটার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। দিগন্ত অবধি ছড়িয়ে থাকা খেত-মাঠের দিকে তাকিয়ে সেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে শুধিয়েছিল, সত্যি বলছ? একটা নদী ছিল এখানে?

আমি আহত গলায় জবাব দিই, ছিল মানে? সাতষট্টি-আটষট্টি অবধি তো ভালোভাবেই ছিল। সত্তরের পর থেকেই একটু একটু করে চুরি যেতে থাকে। আশি-একাশি সাল অবধিও ছিল, মানে, খুঁটিয়ে দেখলে নদীর চিহ্নগুলিকে চেনা যেত। তারপরই ধীরে ধীরে...।

আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে জয়া, মাত্র এই ক-বছরে বেমালুম উধাও হয়ে গেল একটা জলজ্যান্ত নদী! আশ্চর্য!

জয়ার গলার স্বরে এমন একটা সর্বস্ব হারানোর হুতাশ ছিল, আমাকে পলকের মধ্যে বিষণ্ন করে তোলে।

মৃদ গলায় বলি, ছিল, তাকে নিয়ে কত গল্পগাথা চালু ছিল। আজও যারা মুরুব্বি, তাদেব কেউ কেউ স্মৃতি থেকে তুলে আনতে পারে ওইসব গল্পগাথার এক-আধটা।

শিখাবউদিকে নিয়ে অপরিসীম কৌতূহলজনিত হ্যাংলোমোটা যখন দিন-কতকের মধ্যেই থিতিয়ে এল পাড়ার মানুষ-জনের মধ্যে, সদ্য-দোয়া দুধের ফেনা যখন একটু একটু করে মরে এল, পাড়ার চোদ্দ আনা মানুষই চোখ রগড়ে দ্বিতীয় প্রস্থ দেখল ওকে, আর তখনই তারা ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করতে লাগল চাঁদের অন্তর্গত কলঙ্করেখাগুলিকে।

এমনিতে শহর এবং তার মানুষগুলোর প্রতি লোভ ও কৌতূহলের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পুষে রাখে গ্রামের মানুষ। কিনা, আমরা জলে-কাদায়, সাপে-খোপে, আদুল গায়ে, উদোম পায়ে হতচ্ছিরি জীবন কাটাই গেরামে, আর বাবুরা কিনা পীচ রাস্তায়, পাকা বাড়িতে, বিজলিবাতি, ট্যাপের জল, ফ্যানের হাওয়া, দোকান-পশার, সিনিমা-থেটার, টেরেন-বাস-টেক্সি লিয়ে মজাসে রয়েছেন! যেন বিধাতার বরপুত্র সব!

শহরের প্রতি সন্দিগ্ধপুর গ্রামের প্রজন্মবাহিত সেই অসূয়া শিখাবউদির ওপরও বর্তেছিল। শিখাবউদিকেই শহরের প্রতিনিধি বানিয়ে পাড়ার মানুষ ওর ওপরই তাদের গায়ের যাবতীয় কষকষানি মেটাতে চাইছিল। তার পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, হাঁটন-চলন, আচার-ব্যবহার, সবকিছুর মধ্যে ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁজে পাচ্ছিল রোজদিন।

বল্লভদা চাকরি করতে বেলদার অফিসে চলে যায় সকাল সকাল, ফেরে সন্ধে গড়িয়ে। দিনভর সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে শিখাবউদি নিজের মতো করে একেবারে নিজস্ব তরিকায় দিন কাটায়। ওর চাষাভুষো শ্বশুব এবং মুড়ি-ভাজতে থাকা শাশুড়ি,—বকাঝকা করা, নিদেন বিরক্তি প্রকাশ করা তো দূরের কথা, এমন সম্ভ্রম মাখানো চোখে দেখতে থাকে রোজগেরে ছেলের শহুরে বউয়ের কীর্তিকলাপ, দেখতে দেখতে পাড়াপড়শির পিত্তি জ্বলে যায়। আড়ালে বুড়ো-বুড়িকে সেজন্য গঞ্জনাও শুনতে হয় ঢের। কিনা, ঢের ঢের শ্বশুর-শাশুড়ি দেখেছি, এমন মেনিমুখো শ্বশুর-শাশুড়ি বাপের জন্মেও দেখিনি, বাবা! বলি, তুমরা উই মেয়ার শ্বশুর-শাশুড়ি, নাকি বল্লভের ঘরের মুনিশ-কামিন? উ তুমাদের ছেলের বউ, নাকি মালকিন? সারাক্ষণ যে অমন দুমদাম হাঁটে, গলা চড়িয়া কথা কয়, চেঁচিয়া চেঁচিয়া গান গায়, মাথার ঘোমটা ঘাড় অবধি নামিয়া রাখে, কিছু বলতে পার না?

যাদব-জেঠা, সাদাসিধে সরল মানুষ, সারাক্ষণ তার মুখে লেগে থাকত শিশুর হাসি, নিঃশব্দে হজম করে পাড়াপড়শির এবংবিধ যাবতীয় গঞ্জনা। আত্মপক্ষ সমর্থনের তিলমাত্র চেষ্টা করে না, পড়শিদের গঞ্জনার সারবত্তা স্বীকারও করে না। আসলে, মনে মনে ভারি ভয় ছিল যাদব-জেঠা ও রাধা-জেঠিমার। শিখাবউদিকে দেখতে দেখতে সেটা আবও বেড়ে যাচ্ছিল দিনদিন। কেবল একটা আশঙ্কাই সারাক্ষণ

কুরেকুরে খেত ওদের, এ মেয়ার যা কুহকিনী আকর্ষণ, অপ্সরাদের মতো ছলাকলা, বল্লভের মতো ছোকরাকেও এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বিকিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে, তো, বুড়ো-বুড়ি সামান্য ট্যা-ফোঁ করলে কোনওদিন না রোজগেরে ছেলেটিকে আঁচলে বাঁধিয়া লিয়া বেলদাবাজারে গিয়ে বাসা বাঁধে! বকাঝকা করবে কী, সহবত শেখাবে কী, সারাক্ষণ কেবল এমনতরো আশঙ্কাতেই কাঁটা হয়ে থাকত ওরা।

শিখাবউদিকে কিন্তু আমরা কোনওদিনও শ্বশুর-শাশুড়িকে হেনস্থা করতে দেখিনি। বরং গাঁয়ের আর পাঁচটা বউ শ্বশুর-শাশুড়িদের যেমনটি সেবাযত্ন করে, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশিই করত শিখাবউদি। তাতে করে বুড়ো-বুড়ির আশঙ্কা তো তিলমাত্র কমত না, বরং ভেতরে ভেতরে বেড়ে যেত, কেন কি, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। অত ভালো, ভালো নয়।

এটা সত্যি যে, দিনভর শিখাবউদি নিজের খেয়ালে থাকতেই ভালোবাসত। গোমড়া-মুখো হয়ে থাকাটা তার ধাতেই ছিল না। সারাক্ষণ কলকলিয়ে কথা বলত, আর কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসত। পাড়ার আর পাঁচটা বউয়ের মতো সারাক্ষণের সঙ্কুচিত ভাবটাই ওর মধ্যে ছিল না। রাঁধছে, বাড়ছে, বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে, সেই ফাঁকে হয়ত বা গুনগুনিয়ে গেয়ে চলেছে ফিল্মি গান, 'তুমি আজ কত দূরে, তুমি আজ কত দূরে...।' হয়ত বা শ্বশুর-শাশুড়ির সামনেই, হাসির কথায় খিলখিলিয়ে হেসে উঠল এমনভাবে, যেমন করে বাড়ির বউয়ের হাসতে নেই। এবং ওই নিয়ে কেউ সামান্য অনুযোগ করলেই ঠোঁটের ডগায় জবাব তৈরি, তো কী হয়েছে? শ্বশুর-শাশুড়ি তো বাপ-মায়েরই মতো। বাপ-মায়ের সামনে মেয়ে গান গায় না? হাসে না?

মানুষজন যে এমন কথার কী জবাব দেবে, ভেবেই পায় না। তারা এই ভেবে নিজেদের প্রবোধ দেয় যে, আদা খেয়েছে যারা, ঝাল বুঝবে তারা। আমাদের কি? লাই দিয়ে যারা মাথায় তুলছে, সারা জীবন বইতে তো হবে তাদেরকেই। আমরা তো আর বইবোনি। কাজেই, আমাদের কি দরকার অন্যের কাছে খারাপ হবার? যাদের হ্যাপা তারা পোহাক।

শিখাবউদিব মধ্যে যেটা সবচেয়ে আপত্তিজনক লাগত পাড়াপড়শিদের কাছে, তা হল, সন্ধিপুর গ্রামের কোনওকিছুই তার মনঃপুত হত না। কথায় কথায় গ্রামটিকে ঠেস্ দিয়ে কথা বলত এবং সারাক্ষণ তার নিজের শহরের ঢাক বাজাত। গ্রামাঞ্চলের খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, ভাষা, সবকিছুই তার পরিহাসের বিষয় ছিল। এমন করে আমরা চুল বাঁধি না, এমন করে শাড়ি পরি না, মোরলা মাছ এমন করে রাঁধি না,...। এই শঙ্কর, কী বললি? চলিয়ালো? কী ভাষা! বলতে হবে, চলে গেল। আর, খালি গাদা গাদা মুড়ি খাস কেন? রুটি খাবি, রুটি। আমরা তো শহরে রুটি ছাড়া কিছু খাই-ই না। হ্যাঁ রে, তোদের ইতিহাসের বইতে সুলতানা রিজিয়ার গল্প আছে? সে কী রে! তোদের ইস্কুলে সুলতানা রিজিয়া পড়ায় না? আমাদের শহরের ইস্কুলে তো নিচু ক্লাসেই পড়িয়ে দেয় ওটা।

এইমতে সারাক্ষণ শহরকে যষ্টিমধুর মতো চুষত শিখাবউদি। যখন-তখন, দিনের যে-কোনো প্রহরে, শহরের স্মৃতি উথলে উঠত তার মনে। এবং দিনের ঠিক সেই মুহূর্তে, শহর হলে, কী মধুরতম ব্যাপারটি ঘটত, শিখাবউদি এমন পোয়াতির আচার খাওয়ার মতো তৃপ্ত মুখে বলত, শুনতে শুনতে আমাদেরও লোভ হত খুব। ওই স্বর্গপুরীটিকে রূপকথার কোনও আজব নগরী বলে মনে হত, শিখাবউদিকে মনে হত ওই রূপনগরের রাজকন্যেটি, যে কিনা ওই আজব নগর থেকে নেমে এসে নিতান্তই করুণাবশে মালা দিয়েছে আমাদের এই অজ-গাঁয়ের বল্লভদার গলায়।

শহর-বন্দনার শেস পর্বে শিখাবউদির ডগোমগো মুখটি একটু একটু করে তেতো হয়ে আসত, যেন পলতে পাতা চিবোচ্ছে সে। বলত, সব্বাই মানা করেছিল, সব্বাই। শিখা, অমন ভুল করিসনি, পস্তাবি। অমন অজ গাঁয়ে সাধ করে যায় কেউ? ধুলো, কাদা, রাতের বেলায় শেয়াল ডাকবে। শিখা রে, এমন ভুল করিসনি। আর, পল্টুদা? সে তো...। বলতে বলতে শিখাবউদির চোখদুটি হাওয়ার টানে ভেসে যাওয়া শুকনো বাঁশপাতার মতো পলকা হয়ে উঠত।

বল্লভদার আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। জমি-জিরেত, পুকুর-বাগান, ভালোই ছিল। পুকুরে মাছ

ছিল অগাধ। বাগানে বারোমাস ফল-ফুলারি ফলত। সে তুলনায় বরং যতটুকু জেনেছি, শিখাবউদিদের ছিল অনেক খারাপ অবস্থা। মেদিনীপুর শহরের বল্লভপুর এলাকায় ছোট্ট একখানা বাড়ি ছিল ওদের। তার নাকি ছাল-চামড়া উঠে গিয়েছিল কবেই। শিখাবউদির বাবা দর্জি না কিসের যেন কাজ করত। দু-বেলা চাল কিনলে তবে হাঁড়ি চড়ত ওদের। তবুও শিখাবউদি পদে পদে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বল্লভদাদের সংসারসহ পুরো গ্রামের ব্যবস্থাদিকে খাটো চোখে দেখত। বলত, তোমাদের এদিকে ঢেঁকিশাক হয় না? আশ্চর্য! কোন্ তেপান্তরে এলাম রে বাবা! আমাদের বল্লভপুর বাজারে কত্তো ঢেঁকিশাক। একবার খেলে জিভে লেগে থাকে! মাঝেমাঝে নিজেদের পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরত বল্লভদা। টাটকা মাছগুলো দেখতে দেখতে শিখাবউদি নাক সিঁটকে বলত, খালি মাগুর, কই, মোরলা আর চারাপোনা! আমাদের বল্লভপুর বাজারে গেলে দেখতে পেতে, কত্তো রকমের মাছ। রুপোপাটি মাছ তো চোখেই দ্যাখোনি তোমরা। কিংবা, ভোলা-ভেটকি। সরষে-ধনেপাতা দিয়ে রাঁধলে যা লাগে না! শিখাবউদিকে তখন কে বোঝাবে, মিষ্টি জলের মাছই নয় ওগুলো, এই অঞ্চলের পুকুরে দিঘিতে জন্মায় না ওই জাতের মাছ। কে বোঝাবে ওকে যে, সমুদ্রের মাছ ওগুলো, বরফ দেওয়া চালানি সব, এইসব টাটকা মাছের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না!

গাঁয়ের পুকুরে, শুশনি, কলমি, পুকুরের পাড়েপাড়ে রাশি রাশি গিমে, থানকুনি, কুলেখাড়া অযত্নে হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে শিখাবউদি শিহরিত, এ মা! এগুলো পুকুর-পাড়ে এরকম হয়ে থাকে নাকি? কে খাবে বাবা, এমন নোংরা জায়গার শাক-পাতা! আমাদের বল্লভপুর বাজারে যে গিমে-থানকুনি, কলমি-শুশনি বিক্রি হয়, তা যদি তোরা দেখতিস।

বল্লভদা মুখ টিপে হাসত, তোমাদের ওগুলো কোথায় জন্মায় জানো? ধাঙড়পাড়ার খাটা-নর্দমার মধ্যে। সেখানে থিকথিক করে গু। বিশ্বাস না হয় এবার বাপের বাড়ি গেলে একবার ঘুরে এসো ওইসব এলাকায়।

শীতকালে মোমিনপুর থেকে খেজুর-রস নিয়ে আসত রহমত চাচা।

শিখাবউদি আসার পর যেদিন প্রথম রস দিয়ে গেল রহমত-চাচা, মুখে দিয়ে ওযাক্-থু বলে, মুখ বিকৃত করে শিখাবউদি বলেছিল, ইস্, এই তোমাদেব খেজুর রস! বিচ্ছিবি! উৎকট গন্ধ! কেমন যেন স্বাদ।

সবাই যখন যারপরনাই বিস্মিত, হঠাৎ বল্লভদা শিখাবউদির থেকে গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল ভেতরে। একটু বাদে খাঁটি রসে খানিকটে জল মিশিয়ে নিয়ে ফিরে এসে ওটা এগিয়ে দিল শিখাবউদির দিকে। শিখাবউদি চুমুক মেরে বলে, এই তো। রস হবে এমনই।

বল্লভদা হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, শহর এলাকায় তো অর্ধেক রস, অর্ধেক জল, খাঁটি রস ওর মুখে লাগবে কেন?

গ্রামেগঞ্জে তখন ভিখিরি ছিল খুব। সকাল থেকে পালাক্রমে ঘুরত ওরা গেরস্থের দোরে দোরে। বিশেষ করে ভাদ্র থেকে কার্তিক অর্থাৎ অনটনের দিনগুলোতে ভিখিরিব যেন ঢল নামত গাঁয়ে-ঘরে।

দেখতে দেখতে শিখাবউদি মুখ বেঁকিয়ে বলত, ইস, তোদের গাঁয়ে কত ভিখিরি রে! আমাদের শহরে অত ভিখিরি নেই।

পরে জেনেছিলাম, ভিখিরি ভিক্ষে পাওয়ার আশায় যেসব সম্পন্ন পাড়ায় যাতায়াত করে, শিখাবউদিরা তেমন পাড়ার বাসিন্দাই ছিল না।

এইমতে, প্রতিটি ব্যাপারে, মেদিনীপুরের সঙ্গে তুলনায় শিখাবউদির চোখে পদে পদে গোহারান হেরে যেত আমাদের সন্ধিপুর গ্রাম। এমন কি, যখন সন্ধেটি হলে উদ্দাম হাওয়া বইত, জুড়িয়ে যেত শরীর, শিখাবউদি সারা অঙ্গে আরামটুকু নিতে নিতেও খোঁটা দিত এই বলে যে, উহ্, তোদের এদিকে কী দামাল হাওয়া রে! গা ব্যথা হয়ে যায়।

শুনে রাগ হয়ে যেত আমাদের। মেদিনীপুর শহরের ঘুপচি গলিতে তো হাওয়া ঢোকেই না। এমন প্রাণ-জুড়োনো হাওয়া শিখাবউদি শহরে থাকতে পেয়েছে নাকি! তবুও যদি স্বীকার করে কথাটা।

সেই শিখাবউদি, যখন বিকেলের দিকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত কিস্তিতে কিস্তিতে পাখির ঝাঁক, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। তখন আমাদের গাঁয়ে, গাছেগাছে, আকাশ জুড়ে, কত পাখি! তখন আবহাওয়া অতখানি বিষাক্ত হয়নি। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অমন ব্যাপক ব্যবহার হয়নি। তখন আমাদের চারপাশে কত কত পাখি! শিখাবউদি দেখতে দেখতে বলে উঠত, উহ্, খালি পাখি আর পাখি! ঝাঁক বেঁধে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা হয়ে যায়।

ইলচি করে বলি, চোখ ব্যথা করবে বৈকি। তোমাদের তো অইভ্যাস নাই। তোমাদের শহর এলাকায় অত পাখি কোথা?

আমাদের ইলচিতে শিখাবউদি তিলমাত্র দমে না। বলে, তোদের এখানে তো সব বুনো পাখি, আমাদের শহরে ঘরে ঘরে পাখি পোষে। তোদের এদেশে কেউ পাখি পোষে না! সে কি রে? আমাদের ওখানে তো প্রতিটি ঘরে পাখির খাঁচা।

পরে অবশ্য শিখাবউদি তার কথাটাকে সংশোধন করেছিল। বলেছিল, কে বলে খাঁচা নেই? এখানেও তো ঘরে ঘরে খাঁচা। আমি তো এ গাঁয়ে বউ হয়ে আসার পরের দিনই দেখে ফেলেছি খাঁচাগুলোকে। দেখেছি, খাঁচা খাঁচায় কিলবিল করছে মানুষ। মেয়েমানুষ।

এখন, এই বয়েসে বুঝি, সেদিন, ওই অল্প বয়েসে, অল্প লেখাপড়া জানা একটি মফস্বল শহরের মেয়ে খুব হালকা চালে কত ভারী কথাটি উচ্চারণ করেছিল। তখনও বুঝিনি, কবেকবে খাঁচাগুলোর দরজা নিঃশব্দে খুলে দিতে শুরু করেছে শিখাবউদি।

বকদিঘির পাড়ে বসে আমাদের যমুনা নদীর গল্প শোনাতেন মন্দাকিনী-দিদা।

হিরন্ময় মুখুজ্যার মা হলেও তিনি তখন আমজনতার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন, মানে, আসতে বাধ্য হয়েছেন, কিছুটা তাঁর কপালের ফেরে, কিছুটা শিখাবউদির কৃতিত্বে। বকদিঘির পাড়ে তার টালিতে ছাওয়া বাড়ির সামনের উঠোনে বসে আমাদের মতো অর্বাচীনদের সে শোনাতেন শাস্ত্র-পুরাণের কত কত গল্পগাথা। বলতেন, যমুনা নদীর জন্মবৃত্তান্ত। যমুনা ছিল যমরাজের বোন। সেই কারণে তার আর এক নাম, যমী। যমের বোন যমী। এ নদী সূর্যের ঔরসে এবং সংজ্ঞার গর্ভে যমের সঙ্গে যমজরূপে জন্মায়। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা নদী তার ভাই যমকে নিজের বাড়িতে ডেকে রেঁধে বেড়ে পরিতৃপ্তি করে খাওয়াত। সেই রীতি অনুসারে আজও বোনেরা ওইদিনে ভাইদের ডেকে এনে আদর করে খাওয়ায়। ওইদিন বোনের হাতে খেলে সব রকমের মঙ্গল হয়।

একবার, মত্ত অবস্থায়, বলরামের যমুনাতে স্নান করবার ইচ্ছে জাগে। তিনি যমুনাকে কাছটিতে ডাকেন। কিন্তু বলরামের মনের ভাব বুঝতে পেরে যমুনা কাছে আসতে অস্বীকার করে। বলরাম খুব রেগে যান। এবং লাঙ্গল দিয়ে যমুনাকে তাঁর কাছে টেনে আনেন। এবং তাঁর ইচ্ছেমতো যমুনাকে তাঁর পিছুপিছু যত্রতত্র যেতে বাধ্য করেন। বলরামের ইচ্ছায় চালিত হতে হতে এক সময় খুবই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে যমুনা। শেষ অবধি নারীমূর্তি ধারণ করে বলরামের কাছে ক্ষমা চায়। অনেক অনুনয়ের পর বলরাম যমুনাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু তার শরীর থেকে যৌবন চলে যায়। বলরামের লাঙ্গলের অবিরাম আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তার শরীর।

গল্পটা শেষ করে মন্দাকিনী-দিদা গলায় হা-হুতাশ ফুটিয়ে বলেন, দেখিসনি তো তোরা, এককালে কী রূপবতী ছিল সে নদী! আজ তার কী হাল! একেবারে সূতার মতন সরু হইয়া বয়।

কল্পনাথের মা মহেশ্বরী শুনে বলেন, এটা সে যমুনা কেন হবে? সে যমুনা তো দেখিয়া আইলাম বৃন্দাবনে।

গাঁয়ের মানুষের তাতে তিলমাত্র দোলাচল ঘটে না। তারা দাবি করে, এটাই আসল যমুনা। যমের যমজ ভগিনী, বলরামের দ্বারা নিগ্রহিতা সেই পুরাণের যমুনা, সন্ধিপুরের গা ঘেঁসেই বইছে সেই

আদ্যিকাল থেকে। তিলমাত্র সন্দেহ নাই তাতে।

আমাদের মুখে গল্পটা শুনে বাণীবিনোদ-কাকা হেসেছিলেন।

মৃদু গলায় বলেছিলেন, অন্তত তোরা তো অন্যভাবে ভাববি। আসলে, চাষিদের হালের ডগায় একটু একটু করে নদীগুলোর একটা বড়োসড়ো অংশ পরিণত হচ্ছিল চাষের জমিতে। কৃষি-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বব্যাপী এমন ঘটনা ঘটেছে ঢের। নদীর দু'পাড়ে চাষবাস করতে গিয়ে নদীকে একটু একটু করে গিলে ফেলেছে কৃষিজীবীর দল। এখনো গিলছে। তবে গজাননরা যেভাবে বেমালুম হজম করে ফেলল আস্ত একটা নদীকে, এর বুঝি দ্বিতীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দায়।

পরের দিন কিংবা তার পরের দিন, আমি যমুনা নদীর তীরে বসে রয়েছি উঁচু পাড়ের ওপর, আমার সামনে কুলকুলিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা, আচমকা দেখলাম, নদীর হাঁটুপ্রমাণ জল তোলপাড় করে লেজ ঝাপটাচ্ছে একটা বিশাল আকারের কুমীর। যমুনা, যাকে গাঁয়ের পনেরো আনা মানুষ যমী খালের বেশি মান্য দেয় না, তার জলে কুমীর! আমি নড়েচড়ে বসি।

কুমীরটা ধীরপায়ে জল থেকে উঠে আসে শক্ত মাটির ডাঙায়। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নদীটার দিকে।

পলকহীন চোখে কুমীরটাকে দেখছিলাম আমি, আর কুমীরটা দেখছিল যমুনাকে। আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেল আমারই চোখের সামনে। যমুনা তার সরুপানা জলের স্রোতটির মুখ ঘুরিয়ে দিল কুমীরটার দিকে, কুমীরটা বিশাল হাঁ করল, যমুনার স্রোতটা ক্রমশ আরো সরু হতে হতে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়তে লাগল কুমীরটার মুখে। আর কুমীরটা, আমাদের সেই ছেলেবেলায় বেদে-বৈরাগী যেমন ভেলকির খেলা দেখাবার কালে সুতোয় বাঁধা ব্লেড খেয়ে চলত নাগাড়ে, ঠিক তেমনি করেই কুমীরটা সাপের মতো আঁকাবাঁকা যমুনা নদীটাকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, এবং এক সময় আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, আমার সামনে এতকাল ধরে শুয়ে থাকা নদীটা পুরোপুরি উধাও, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বামে, যেদিকেই তাকাই, কোনও চিহ্নই নেই তার।

আমি কুমীরটার দিকে তাকালাম। একনাগাড়ে একটা আস্ত নদীকে গিলে ফেলে সামান্য ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। ওই অবস্থায় ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র বিশাল হাঁ করে ভেতরটা দেখাল। এবং আমি দেখলাম, ওর মুখের মধ্যে কিছুই নেই, অর্থাৎ পুরো নদীটাকে গিলে নিয়ে চালান করে দিয়েছে পেটে। এবার সে সামনের পা দুটো তুলে সাপের ফণা তোলার ভঙ্গিতে শরীরটা মাটির থেকে ওপরে টেনে তুলে পেটটা দেখাল আমায়। এবং আমি দেখলাম, একটা আস্ত নদীকে গিলে ফেললে পেটটা যেমন জয়ঢাকের মতো হওয়া উচিৎ, কুমীরটার পেট তাব চেয়ে অনেক চুপসানো। অর্থাৎ কিনা, আমি অবাক হয়ে ভাবি, একটা আস্ত নদীকে গিলে একেবারে হজম করে বসে আছে কুমীরটা।

তারও অনেকদিন বাদে, শিখাবউদি যখন চুরি যাওয়া নদীটাকে খুঁজে আনবে বলে প্রতিজ্ঞা করল বাচ্চাদের কাছে, আমি ওকে শুনিয়েছিলাম, কেমন করে আমার চোখের সুমুখে নদীটাকে গিলে ফেলেছিল একটা কুমীর।

নদীটাকে নিয়ে বাস্তবিক সেই ছেলেবেলা থেকেই রহস্যের অন্ত ছিল না আমার মনে।

সাত-আট বছর বয়েসে, যখন রামুদাদা আমাদের নদী-পাড়ের জমিগুলোতে হাল চষত, ছোটোকাকার সঙ্গে মজুরদের জলখাবার নিয়ে দু-চারবার গিয়েছি নদীটার কাছে। রামুদাদারা যখন জলখাবার খেত, ছোটোকাকা পাশটিতে বসে গল্পগুজব করত, আমি নদীটার পাশে গিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকতাম জলের দিকে তাকিয়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনও অবধি, খুবই ক্ষীণ হলেও, স্রোত ছিল নদীটাতে। আমি বসে বসে সেই বহতা স্রোতটিকে দেখতাম। শুকনো ঘাস-পাতা, কাঠি-ডাল, এটা-সেটা, যাকিছু দু-পাশ থেকে পড়তে পেরেছে জলে, যাকিছু ভাসমান এবং ওই স্রোতের বহনক্ষমতার তুলনায় যথেষ্ট হালকা, ভেসে যাচ্ছিল আমার চোখের সামনে দিয়ে ধীরপায়ে। একদল ভেসে যায়, তারা অদৃশ্য হয়ে যেতে না যেতেই আর একদল ভেসে আসে। একমুহূর্ত থামে না, দম নেয় না, একটা

অন্তহীন মিছিল যেন, চলেছে তো চলেছেই, দিনরাত, অবিরাম। ওরা যখন গল্পগুজব করত, আমি বসে বসে নিবিষ্ট মনে দেখতাম ওই মিছিল। আসছে... ওই আসছে .. এল... চলে গেল , পরেরটা আসছে.. চলে গেল .. পরেরটা. . পরেরটা.. । দেখতে দেখতে কেমন নেশা ধরে যায়, এক ধরনের মগ্নতা এসে নিজের অজান্তেই চেতন মনটিকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। এক পলকের জন্যও ওই স্রোতের শরীর থেকে চোখ সরাতে ইচ্ছে করে না। এবং আশ্চর্য, একনাগাড়ে দেখতে দেখতে, একসময় স্রোতসহ পুরো নদীটাকে, ভাসমান যাবতীয় বস্তুসহ লম্বা দড়ির মতো ওর পাকানো শরীরটাকে আমার জীবন্ত বলে মনে হয়, যেমনটি লাগছিল সেই সেবার রথের সময় পুরীতে, চারতলা বাড়ির থেকে তলার রাস্তাটিকে, একটি চলমান মানুষের নদী। পুরো নদীটাকে তার আঁকবাঁকসহ একটি সাপের মতো লাগছিল। যেন একটি মেটে রঙের বিশাল সাপ এক বিশাল খেতের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। বাস্তবিক, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা চলমান সাপের শরীর ভেসে উঠত আমার চোখে। এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে সাপটা, শুকনো পাতা খড়কুটো যাকিছু ভেসে যাচ্ছে, সাপের শরীরের কারুকার্য বলে ভ্রম হয়। আর, ভ্রম একনাগাড়ে হতে থাকলে তাকে সত্যি বলে মনে হয়। বাস্তবিক তখন স্পষ্ট মনে হয়, চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি অবিরাম, অন্তহীন সাপ .. চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে . . যাচ্ছে তো যাচ্ছেই. . । সাপটা কি কখনোই আমার চোখের সামনে একটি বারের জন্য থেমে যাবে না? সাপটাকে নিয়ে রহস্য বেড়ে যায়, এবং আমি কথাটা আমার প্রাণের বন্ধু কল্পনাথকে খুলে বলি।

কল্পনাথ যে তার আগেই অনেকবার গিয়েছে নদীটার কাছে, কারোর সঙ্গে কিংবা একা একা, আমার কথা শুনে তার মনে তিলমাত্র কৌতূহলের উদ্রেক না হওয়াতে সেটা বোঝা গেল। কেবল খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, জানি তো, নদীরা তো এমনই হয়। অথচ আমি তো জানি, কল্পনাথের সব বিষয়ে, এমন কি খুব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও কী পরিমাণ কৌতূহল।

এরপর আমি আর কল্পনাথ দু-জনে গেলাম নদীটার কাছে। এবং সেইদিন কল্পনাথ আমাকে শেখাল নদীটার সঙ্গে কিংবা সাপটার সঙ্গে কেমন করে খেলতে হয়। কেমন করে বন্ধুত্ব করতে হয়। সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার প্রশ্নে আমি তিলমাত্র অবাক হইনি, কারণ আমি তো ওই বয়েসেই জানতাম, কল্পনাথ দুনিয়ার সব জাতের প্রাণীর, এমন কি জড়বস্তুর সঙ্গেও ভাব জমাতে পারে অবলীলায়, অনায়াসে খেলতে পারে তাদের সঙ্গে, তার প্রমাণ পেয়েছি বহুবার।

কল্পনাথ আমাকে খেলাটা শেখাল। চারপাশ থেকে হালকা এটা ওটা নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল জলে। আমাদের চোখের সামনেই ভেসে যেতে লাগল তা, ভেসে ভেসে চলে চলে গেল, বাঁক পেরিয়ে একেবারে আমাদের চোখের নাগালের বাইরে। সে এক দারুণ মজার খেলা। সময় যে কী করে কেটে যায়।

বাণীবিনোদ কাকা আমার কথা শুনে হাসেন। তারপর মহাকাল জাতীয় কী যেন একটা কথা বলেছিলেন, ওই বয়েসে বুঝতে পারিনি। আরও পরে যখন ছোটোকাকার সঙ্গে কলকাতা গেলাম বিলাসীপিসির বাড়িতে, দুর্গাপুজোর সময়, দেখেছিলাম বিজলিবাতি দিয়ে পুজোমণ্ডপে নদী বানিয়েছে। নদীটা বয়ে চলেছে। একটা ছোট্ট জায়গা জুড়ে নদীটা বারবার একই ভাবে বইছে।

ভীম একাদশীর মেলাতে এল বল্লভদার ভাগ্নী, ছবি। আমাদেরই বয়েসি সে।

গল্প করতে করতে শুধোই, তাদের গাঁয়ে নদী আছে?

ছবি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

শুধোই, কী নাম সে নদীর?

খুব দেমাকী গলায় ছবি বলে, যমুনা।

আমি অবাক হয়ে বলি সে কী! আমাদেরও তো যমুনা নদী!

পরে জানলাম, আমাদের নদীটাই ওখান অবধি চলে গিয়েছে। তখন আমি নদীটার সঙ্গে ওই খেলাটা খেলছি খুব।

বললাম, আমি একটা কাগজের নৌকো ভাসাব, অমুক দিন অমুক সময়ে, তুলিনা লিস:

যেদিন ও ফিরে গেল, একেবারে শেষ মুহূর্তে তার কানে কানে ফের বলে দিলাম কথাটা।

ঠিক দিনে নৌকোটাকে ভাসিয়েও দিলাম। তারপর সারাদিন... সারারাত... সে কী উদ্বেগ আমার মনে! নৌকোটা পৌঁছোল কিনা, ছবি ওটা পেল কিনা, দিনরাত উচাটন হয়ে রইল মন।

দিন সাতেক বাদে বল্লভদা যাচ্ছে বোনের বাড়ি, আমার বারবার মনে হল ওকে বলি, ছবির থেকে জেনে এসো তো, ওইদিন নৌকাটা ঠিকঠাক পেয়েছিল কিনা। কিন্তু শেষ অবধি কথাটা আর মুখ ফুটে বলতে পারিনি কিছুতেই।

পরের বছর ভীম মেলায় ছবি এল, এবং জানাল, নৌকোটা পায়নি।

আজ, অ্যাদ্দিন বাদে, সেই নদীটাকে নিয়ে আমার যাবতীয় আবেগের কথা ছোটোদের খোলসা করে বলতে পারিনে। সেই হুতাশে তিলতিল পুড়তে থাকি আমি।



ধীরে ধীরে শিখাবউদি আমাদের গ্রামকে, গ্রামের সবকিছুকে ভালোবাসতে লাগল।

আমরা বুঝতে পারতাম, গ্রামটিকে তলেতলে ভালোবাসতে শুরু করেছে সে। গ্রামের গাছগাছাল, খাল-বিল, দিঘি-পুষ্করিনী, পশুপ্রাণী, আলো-হাওয়া, ধুলোকাদা, মানুষজন, এমন কি গাঁয়ের মেয়েলি খেলাধুলোগুলোকেও কবে করে একটু একটু করে ভালোবেসে ফেলেছে শিখাবউদি। এমন কি, আমাদের গাঁয়ের প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া দুঃখিনী নদীটিকেও খুব মনে ধরেছে তার। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে যেতে চায় নদীটির কাছে। পাড়ে বসে গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে ফিল্‌মি গান, যমুনাবতী সরস্বতী/কাল যমুনা লীলাবতী/যমুনার কতই খেলা...। আর শুনতে শুনতে আমি আর কল্পনাথ অবাক হয়ে যাই, কিনা, আমাদের এই, সবাইয়ের-চোখের বালি, নদীটাকে নিয়েও গান রয়েছে তবে!

তারপর গাঁয়ের শিশু-কিশোরগুলিকে সে মধুব স্বরে ডাকতে শুরু করল। গাঁয়েব পাখিপাখালগুলির সামনে আদর করে ছড়িয়ে দিল চাল-খুদের দানা। গ্রামের আচার, আচরণ, সংস্কাবগুলিকেও আত্মস্থ করতে লাগল। শুধু ভালোবাসলই নয়, শিখাবউদি ক্রমশ আমাদের গ্রামদেশটাকে চিনতে চাইল, গ্রাম-প্রকৃতির বহস্যের গভীরে সেঁধাতে লাগল, একটু একটু করে। আজ এটা দেখতে চায় তো, কাল সেটা বুঝতে চায়। তার বায়না আর আবদাবের চোটে আমি আর কল্পনাথ তো জেরবার হয়ে গেলাম।

নানা কারণে বল্লভদা শিখাবউদির প্রতি একটু বেশিমাত্রায় উদারতা দেখাত। সম্ভবত গ্রামজীবনে এসে শিখাটার কতই না কষ্ট হচ্ছে, 'আচমকা শহর-জীবন থেকে একেবারে এক গলা জলে পড়িয়া গ্যাছে' জাতীয় সমবেদনার থেকে এবং শহরজীবনের আরামবঞ্চিত শিখাবউদির মুহুর্মুহু হা-হুতাশ শুনতে শুনতে নিজেকেই মেয়েটার যাবতীয় দিগদারিব কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করে ফেলেছিল বল্লভদা। এবং তাই নিয়ে শিখাবউদির অবিরাম টিকা-টিপ্পনি, গঞ্জনা শুনতে শুনতে হয়ত বা বল্লভদার মনে এক ধরনেব হীনমন্যতাব সৃষ্টি হয়ে থাকবে, নচেৎ, গ্রামদেশের বউ হয়ে, তাও কিনা গায়ের থেকে তখনও অবধি বিয়ের গন্ধ যায়নি, সেই মেয়ে যখন তখন পাড়া-বেড়াচ্ছে, অসম্ভব সব জায়গায় দিনভর, ভরসন্ধেয়, ঘুরে বেড়িয়ে রাতের বেলায় স্বামীকে যখন সাতকাহন করে সেই গল্প শোনাচ্ছে, সন্ধিপুর গাঁয়ের কোনও স্বামীই কি সহ্য করবে তেমনটা? কিন্তু বল্লভদা তো সহ্য করতই, বরং আত্মপ্রসাদে ডুবে যেতে যেতে বলত, হুঁ-হুঁ, এ আর কতটুকু? আরও কত-কত অবাক জায়গা যে রয়েছে আমাদের সন্ধিপুর গাঁয়ে, দেখলে তোমার চোখ ট্যারা হয়্যাবে। এ তোমার মেদিনীপুর শহরের বল্লভপুব-জেলেপাড়া পাওনি যে, গুটি-পঞ্চাশেক বাড়ি, একটা পচা ডোবা, একটা খাটাল, আব একটু এগোলে কাঁসাই নদীর বন্যা ঠেকাবার জন্য একটা ভাঙাচোরা বাঁধ! এ হল আমাদের সন্ধিপুর গাঁ, এর খাঁজেভাঁজে কত যে বিস্ময়, রহস্য!

সব মিলিয়ে শিখাবউদিকে একটু বেশি মাত্রায় লাই দিয়েছিল বল্লভদা। পাড়ার প্রবীণদের ভাষায় যা কিনা কুকুর এবং সমজাতের প্রাণীদের দিলে তারা তখন কেবল লাইদাতারই নয়, তার চোদ্দপুরুষেব মাথায় চড়ে নেত্য করতে থাকে। কিন্তু মুখে বললে কী হবে, স্বয়ং বল্লভদাব সায় থাকায় শিখাবউদির

গতিবিধিতে আপত্তি করবার কেউ ছিল না। বরং সারাদিনে আমাদের সঙ্গে যা যা দেখে আসত, সন্ধেবেলায় বল্লভদা অফিস থেকে ফিরে এলে সাতকাহন করে সেসব বলতে বসত। আর শিখাবউদির গ্রাম-বন্দনা শুনতে শুনতে বল্লভদার সারা মন আত্মশ্লাঘায় ভরে যেত।

তোমাদের গ্রামটা কী ভালো গো...!

এইভাবে শুরু করত শিখাবউদি, আর তাতেই বল্লভদা এতটাই আত্মপ্রসাদ পেত যে, শিখাবউদির দুনিয়াশুদ্ধ চরে বেড়ানোটাকে তো মঞ্জুর করে দিতই, নিজের থেকেই নতুন নতুন জায়গা দেখে আসার প্রস্তাব দিত, কিনা, ওলদাচণ্ডীর জঙ্গলের ভেতরে মা-চণ্ডীর থানটা তো দেখনি এখনও অবধি, দিন-দুপুরেও অসমসাহসী মানুষের বুক দুরদুর করে। কিংবা একদিন ঘোর নিশুত রাতে বাসনা-দিঘির পাড় থেকে আহারমুণ্ডার জঙ্গলটা দেখিয়ে আনব তোমায়। দেখবে, কেমন লকলকিয়ে আগুন জ্বলছে..., শঙ্কর আর কল্পর সাহসে কুলাবেনি, আমাকেই নিয়ে যেতে হবে।

বল্লভদা গাঁয়ের সবাইয়ের সঙ্গে গাঁওলি ভাষায় কথা বলে, বড়ো জোর মাঝেমধ্যে দু-চারটে শহুরে শব্দের ফোড়ন দেয়, কিন্তু শিখাবউদির সঙ্গে কথা বলবার বেলায় পুরোপুরি শহুরে ভাষাতেই কথা বলে। গ্রামদেশের এত এত বিচিত্র ব্যাপার-স্যাপার দেখতে দেখতে শিখাবউদি যখন মুগ্ধ, আচ্ছন্ন, ওর সেই প্রগাঢ় বিস্ময়টা উপভোগ করতে করতে বল্লভদা যদি ভুরু নাচিয়ে বলে, 'হুঁ-হুঁ, এ তো আর সরু সরু রাস্তার দু-পাশে কেবল সার সার ইটের বাড়ি নয়, উরে ব্যস, গাছগাছাল নাই, হাওয়া বাতাস নাই, দম আটকে আসে, কিনা এর নাম শহর', তো, শিখাবউদি, শহরের নিন্দা শুনে যার ততক্ষণে সাপিনীর মতো ফোঁস করে ওঠার কথা, ফণা নামিয়ে নিয়ে শরীরের দু'পাশে আহ্লাদি দোল খেতে খেতে বলবে, একরাতে আহারমুণ্ডার জঙ্গলের আলোটা দেখাবে তো, নাকি শুধুই মুখে...।

বাসনা-দিঘির উত্তরপাড়ে কিছুতেই শিখাবউদিকে নিয়ে যাই না আমরা, অথচ দিঘির ওই পাড়ে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে, আর তাই দেখে শিখাবউদি উতলা।

বলি, ওই পাড়ে মেয়াদের যেতে নাই।

কেন? শিখাবউদি ভুরু কুঁচকে তাকায়।

জবাবে আমরা শিখাবউদিকে বাসনা দিঘির উত্তরপাড় নিয়ে একটা মিথ শুনিয়ে দিই, কিনা, ওই পাড়ে মেয়েরা গেলে কেমন করে যেন ডাইন হয়ে যায়।

শুনে শিখাবউদি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ওই পাড়ে ফুটে থাকা ফুলগুলো ওকে টানে।

আমরা বলি, ওইগুলোই তো যত নষ্টের গোড়া। ওরাই তো বোকা-সোকা সুন্দরী মেয়াদেরকে লোভ দেখিয়ে ওই পাড়ে লিয়া যায়।

—ওগুলো কী ফুল? শিখাবউদির দু-চোখে কৌতূহল।

আমরা বলি, সেটাও বইল্‌তে মানা, কেন কী, ফুলের নামটা জানলেই, সে মেয়াকে আর ঠেকানো যাবেনি কুনোমতেই। সে তখন উই পাড়ে যাবেই যাবে।

অবিশ্বাসে দুলতে দুলতে ঘরে ফিরে আসে শিখাবউদি। সেই সন্ধেতেই কথাটা পাড়ে বল্লভদার কাছে। বলে, তাও আবার হয়? নামটা শুনলেই আর মেয়েটাকে ঠেকানো যাবে না?

—যাবে-না-ই তো। নামের কি কম মোহিনী শক্তি? তোমার নামটা শোনা মাত্রই তো তোমার সঙ্গে অর্ধেক প্রেম হয়ে গিয়েছিল আমার।

শিখাবউদি আধো অন্ধকারে চিমটি কাটে বল্লভদার উরুতে।

বাস্তবিক, বাসনা দিঘি সম্পর্কে কতই না রটনা! তার উত্তর পাড়ে গভীর রাতে উলঙ্গ মেয়েদের আকাশের পানে পা তুলে হেঁটে বেড়াতে দেখেছে কত প্রত্যক্ষদর্শী। পায়ে জ্বলন্ত চিরাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওরা।

আমরা দশ মুখে সেসবের বর্ণনা দিতে থাকি শিখাবউদির সুমুখে।

একদিন অমাবশ্যার ভর সন্ধ্যেয় খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে দূরে আহারমুণ্ডার জঙ্গলে অশরীরী আলোর নাচ দেখালাম শিখাবউদিকে। আর একদিন আমি আর কল্পনাথ শিখাবউদিকে নিয়ে গেলাম রানিহাঁস

দিঘির পাড়ে।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অশরীরী রূপ নিয়েছে রানিহাঁস দিঘির চার পাড়ের গাছগাছাল। মিটিমিটি জোনাকি জ্বলছে পাতায় পাতায়।

অন্ধকারে দু-চোখ জ্বেলে চারপাশটা অবাক চোখে দেখতে থাকে শিখাবউদি।

ফিসফিসিয়ে বলি, দাঁড়াও, তোমাকে আজ আলেয়া দেখাব।

শনশন করে হাওয়া বয়, চারপাশে ফিসফিস করে কথা বলে যেন কারা। একটু বাদে চাঁদ ওঠে। থৈথৈ জ্যোৎস্নায় উথালপাথাল হয় দশদিক। শিখাবউদি আবেগে আপ্লুত হয়ে সেই অগাধ জ্যোৎস্নার মধ্যে নির্বাক হয়ে যায়।



শিখাবউদির ছোটো ভাই, তার পোশাকি নাম মৃন্ময়, ডাক নাম ভণ্ডুল, তাকে শিখাবউদি নিজের কাছে এনে রেখেছিল। কিনা, বাপের বাড়িতে ওকে শাসন করবার কেউ না থাকায় দিনদিন গোল্লায় যাচ্ছে ছেলেটা, এখানে থাকলে তাও খানিকটা নজরদারিতে থাকবে। বল্লভদা কোনও আপত্তি করেনি তাতে। সে সময়টাতে বল্লভদা শিখাবউদির কোনও কথাতেই তিলমাত্র আপত্তি করত না।

গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ভণ্ডুলকে ভর্তি করে দিয়েছিল শিখাবউদি। আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত সে। আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সে এটাই প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, আমাদের মতো গেঁয়ো ছেলেদের চেয়ে সে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে ঢের বেশি চৌকস। মনে আছে, আলাপ হওয়ার দিনই ভণ্ডুল একটা ধাঁধা চাপিয়ে দিয়েছিল আমাদের ওপর। বেশ কঠিন ধাঁধা। আমরা কেউই তার জবাব দিতে পারিনি।

বেশ ভারিক্কি গলায় ধাঁধার জবাবটা দিয়েই চোখেমুখে হেসেছিল ভণ্ডুল—এ ধাঁধার জবাব এই স্কুলের মাস্টাররাও জানে না।

এইভাবে, গাঁয়ের স্কুল, তার ছাত্র ও শিক্ষককুল, সবাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে প্রথম দিনই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল ভণ্ডুল। তারপর থেকে তার অহমিকার রথটি, যাতে সে-ই যুগপৎ বাহক ও আরোহী, গড়গড়িয়ে চলতে লাগল বিনা বাধায়, কেন কি, আমরা গেঁয়ো ছাত্রকুল সেই প্রথম দিনেই ওর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলাম। তাতে করে বুঝি ভণ্ডুলের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। আমাদের বুদ্ধু প্রমাণ করবার জন্য যেন উঠেপড়ে লেগেছিল সে। আর, তার বুদ্ধির ঠেলায় আমাদের একেবারে জেরবার হওয়ার জোগাড়।

ভণ্ডুলের দুষ্টুমির কোনও সীমাপরিসীমা ছিল না। এমন কি পরে পরে ভণ্ডুলের অনেক 'গুণের' পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা। প্রথমত, প্রচণ্ড মিথ্যেবাদী ছিল সে। মুড়ি-মুড়কির মতো বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারত। কথাকে এতটাই ফেনাতে পারত যে, ওই ফেনার আড়ালে আসল কথাটাই হারিয়ে যেত।

এই সবকিছুর ফলে ভণ্ডুল আমাদের গাঁয়ে আসার অল্পদিনের মধ্যেই রুস্তম বনে যায়, এবং গজাননসহ স্কুলের বদ্ ছেলেরা একেএকে ওর চামচে হয়ে ওঠে। স্কুলের পর তাদের নিয়ে খেলার মাঠের এক কোণে বসে বসে গুলতানি মারত ভণ্ডুলের দল। ওই আড্ডায় অন্য সবকিছুর পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও সেরে রাখত ওরা। স্কুলের পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে কে কাকে বিয়ে করবে, ভণ্ডুলের নেতৃত্বে তার খসড়াটুকু বানিয়ে ফেলত রোজ। রোজকার খসড়া পরের দিনই বদলে যেত। গত দিনের পছন্দ করা মেয়েটি পরের দিন বাতিল হয়ে যেত। তার বদলে যে মেয়েটি পছন্দের তালিকায় এল, তাকে হয়ত বা তার পূর্বতন দাবিদার ছাড়তে চায় না, তাই নিয়ে বন্ধুতে বন্ধুতে প্রবল মন কষাকষি, শেষ অবধি ভণ্ডুলের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে এর সঙ্গে ওর, এবং ওর সঙ্গে তার বদলবদল ঘটিয়ে কোনও গতিকে একটা রফায় আসা সম্ভব হত।

শহরের কতই না স্কুপ-নিউজ মজুত ছিল তার কাছে। নেতাজী যে শোলমারি নামক জায়গায় সাধু সেজে রয়েছেন, ফিল্মের নায়ক উত্তমকুমার যে একশো টাকার নোট পুড়িয়ে ওই আগুনে চা বানিয়ে খায় রোজ, এমন সব লাখ টাকা মূল্যের খবর ভণ্ডুলই ওই বয়েসে শুনিয়েছিল আমাদের। কলকাতায় যে বউবাজার নামে একটা বউ-কেনাবেচার বাজার রয়েছে, সে খবরও আমরা জেনেছিলাম ভণ্ডুলের থেকেই। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে গজানন আর ভণ্ডুল বাড়ি থেকে পালিয়ে বউবাজারে বউ কিনতে যাওয়ার প্ল্যান ছকেছিল। দু-জনের জন্য দুটো বউ কেনার সামর্থ নেই, তাই শেয়ারে একটা বউ কেনাই মনস্থ করেছিল ওরা। এমন তো হামেশাই করতে হয় ওদের। দিনের পর দিন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে এক-আধ দিন সিগারেট খাওয়ার শখ হলে ওরা তো দু-জনের জন্য একটা সিগারেটই কেনে। পাল্টাপাল্টি করে টান দেয়। এক্ষেত্রেও তেমন করেই না হয় চালিয়ে নেবে কোনও গতিকে। তাছাড়া, তারা তো ছোটো, দু-জনে দুটো বউ নিয়ে করবে কি? বউ নিয়ে কী করবে, রাখবে কোথায়, খাওয়াবে কোত্থেকে, এসব নিয়ে পাকা কথা হয়ে যায় দু-জনের মধ্যে। বউকে নিয়ে কী করাবে এমন প্রশ্নে গজানন যখন কাপড় কাচানো, বিছানা পেতে দেওয়া, রান্নাবান্না করা, খেতে দেওয়া, গা-হাত-পা টিপে দেওয়া ইত্যাদির কথা বলে, ভণ্ডুল তখন চোখ টিপে, ফিসফিসিয়ে বলে, বউকে নিয়ে আরও একটা কাজ করা চলে। তাকে বলে, অসভ্য করা। ওই কর্মোটির অনুপুঙ্খ বর্ণনা করতে সে পারে না বটে, তবে যা-যেটুকু বলে, তাতেই গজাননের সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে ওঠে উত্তেজনায়।

এসব কথা শিখারউদির কানে যেত কিনা আমাদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। একদিন আমি আর কল্পনাথ স্থির করি, শিখাবউদিকে সবকিছু খুলে বলব।



কিছুদিনের মধ্যেই শিখাবউদিকে নিয়ে আমাদের পাড়ার মেয়ে মহল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। প্রবীণাদের মধ্যে শুধুই বিদ্বেষ, আর অল্পবয়সী বউদি ঝিউড়িদের মধ্যে শিখাবউদির প্রতি চাপা আকর্ষণ।

তবে শিখাবউদি ওসবের তোয়াক্কা করেনি কখনোই। শরীর থেকে নতুন বউয়ের গন্ধটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে পাড়ার প্রায় সকলের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কেবল পাড়ার বউদি-ঝিউড়িরা নয়, শিখাবউদির মেশামেশির কোনও বাছবিচারই ছিল না। বয়স্ক-বয়স্কাদের কিংবা আমাদের মতো বাচ্চাদের সঙ্গে তো বটেই, বল্লভদার বন্ধু কিংবা বন্ধুস্থানীয়দের সঙ্গেও, এমন কি পাড়ার দেওর তুল্য সমস্ত ছোকরার সঙ্গেও সে সচ্ছন্দে কথাবার্তা বলে, হাসি-ঠাট্টাও করে। অন্যদের কথা বলতে পারিনে, কিন্তু শিখাবউদিকে দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে প্রবীণেরা।

শিখাবউদি যে শুধু সবাইয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করত আর কলকলিয়ে কথা বলত, তা নয়। সবাইকে আপন করে নেওয়ায় ওর বুঝি জুড়ি ছিল না। সকলের সব সমস্যায়, অসুবিধায়, মুশকিল আসান হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করত সে।

শিখাবউদির কাছে এসেছে নন্দদুলাল মেয়েটি, দেখা মাত্রর শিখাবউদি বলে উঠবে, মুখটা অত শুকনো লাগছে কেন রে সুবাসী? দেখি, আয় তো কাছে। বলতে বলতে নিজের গোলাপ ফুল আঁকা তোরঙ্গতে যত্নে রাখা হিমানি-স্নোর কৌটোটি খুলে নিজের হাতে মাখিয়ে দিল সুবাসীর গালে, ভালো করে ঘসে নে, ভালো লাগবে। আর, পরের দিনই শিখাবউদির উঠোনে লোভে লোভে এসে ভিড় করবে জবা, পঞ্চমী, বুধির দল। শিখাবউদি কাউকেই নিরাশ করবে না। দেখতে দেখতে তার স্নোর কৌটো আধাআধি হয়ে গেলেও না। তাই নিয়ে কেউ মৃদু অনুযোগ কিংবা আক্ষেপ করলে শিখাবউদি বলে উঠবে, তাতে কী? পল্টুদাকে যদি কারুর মুখে খবর পাঠাই, তো আধ ডজন স্নোর কৌটো তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবে।

একটা সস্তা দরের ব্লাউজ কিনে এনেছে পড়শিদের কোনও বাড়ির সমবয়েসী বউটির স্বামী, লজ্জায় সঙ্কোচে সেটি বের করে দেখান মাত্রর শিখাবউদি সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে আসবে বাড়িতে। তারপর,

ওটার সারা গায়ে সুতোর কাজ করে ফেরত দিয়ে আসবে পরের দিন। আর, শিখাবউদির হাতের গুণে অতি সাধারণ ব্লাউজটি এমন অসামান্য হয়ে ওঠায় বউটি এমন অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকবে শিখাবউদির দিকে, এমন কৃতজ্ঞতায় টলোমলো হয়ে উঠবে ওর চোখদুটি, তাই দেখে শিখাবউদি ফিক করে হেসে বলবে, এটা তোর বরের সামনে পরে ঘুরে বেড়াস, চোখ ফেরাতে পারবে না বেচারা।

আমাদের গাঁয়ের সধবা মেয়েরা চিরকালই সিঁথিতে গাঢ় করে সিঁদুর পরে। কপালেও সিঁদুরের ঢাউস টিপ বানায়। শিখাবউদিই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। সে সিঁথিতে এমন সরু এবং সূক্ষ্ম রেখা টানত, দূর থেকে মালুম করাই দায় হত, কিন্তু দেখাত খুব স্মার্ট। আর, শিখাবউদিকে ওই ব্যাপারে নকল করতে গিয়ে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেল সুনীলদার বউ কাকলি বউদি। সুনীলদার কানে কথাটা লাগিয়ে দিয়েছিল ওর শাশুড়ি দয়াময়ী। বুড়ি এমনিতে দেখতে পেত না, পুরু ছানি পড়েছিল দু-চোখে, কী করে যে মালুম পেল কাকলি বউদির সিঁথির সিঁদুর যথেষ্ট গাঢ় নয়! আর, এটা তো সবাই জানে যে, স্বামীর অকল্যাণ অনেকখানি কমে-বাড়ে সতীসাধ্বী বউয়ের সিঁথির সিঁদুরের আর কপালের টিপের আকার আর গাঢ়ত্বের ওপর। আমার দৃঢ় ধারণা, সুনীলদার মা দয়াময়ীকে কথাটা সাতকাহন করে লাগিয়েছিল, আর কেউ নয়, আমারই বড়পিসি।

শিখাবউদিকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না বড়পিসি। শুধু শিখাবউদিই নয়, আনন্দ-স্ফূর্তি করে সুখে-সচ্ছন্দে রয়েছে এমন সব মেয়েই ছিল তার দু-চোখের বালি। তার পেছনে ছিল বড়পিসির নিজস্ব কিছু জ্বালাযন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি...। সুন্দরী ও সুখী মেয়েদের প্রতি বড়পিসির এই অসূয়ার আরো একাধিক কারণ ছিল। সে অন্য প্রসঙ্গ।

তো, দয়াময়ী মারফৎ কথাটা সুনীলদার কানে যাওয়া মাত্র মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার, কেন কি, দয়াময়ী কথাটা পরিবেশন করবার কালে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল, বুঝিবা কাকলি বউদি এতদ্বারা সুনীলদার স্বামীত্বকেই অস্বীকার করতে চাইছে, নিদেন তাচ্ছিল্য তো করছেই। আর, এমন কথায় সুনীলদার ক্ষেপে ওঠার সঙ্গত কারণ ছিল। সাত বছর আগে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কাকলি বউদির কোনও বাচ্চা হয়নি। এবং কে জানে কেমন করে যেন গাঁয়ের মধ্যে এমন রটনাটা ছিলই যে, দোষটা সুনীলদারই। এমন রটনার মূলে একটা ভিত্তি অবশ্য ছিল। সুনীলদাকে দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে বলায় সে বেঁকে বসেছিল বারংবার। অথচ ওই যুগে প্রথম স্ত্রীর বাচ্চা না হলে দ্বিতীয় বার বিয়ে করাটা খুবই চালু ছিল সমাজে। তথাপি কেন সুনীলদা সুযোগটা গ্রহণ করছে না, কেনই বা বারেবারে এড়িয়ে যাচ্ছে প্রস্তাবটা, এখানেই সন্দেহটা দানা বাঁধছিল মানুষজনের মনে।

সে যা হোক, সুনীলদার হাতে বেধড়ক গুমসানি খেয়ে কাকলি বউদি ক-দিন খুব কাঁদল। যত না প্রকাশ্যে, তার চেয়ে ঢের বেশি লুকিয়ে। আর, শিখাবউদির কানে যখন গেল কথাটা, খুব দার্শনিকসুলভ মুখ করে বলল, এখানেই পল্টুদার সঙ্গে অন্যদের তফাৎ। মেয়েদের সাজপোশাক, প্রসাধন ইত্যাদি নিয়ে সে যে কতখানি আধুনিক, তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। সুনীলদার চেয়ে দু-যুগ এগিয়ে রয়েছে পল্টুদা।

মার খেল বটে কাকলি বউদি, কিন্তু পাড়ার প্রবীণারা সেজন্য সুনীলদাকে যত না দোষ দিল, তার চেয়ে ঢের বেশি দোষারোপ করল শিখাবউদিকে। কেন কি, কাকলি মেয়েটা তো ভালোই, এতাবৎকাল তার মধ্যে তো কোনও বেচাল দেখেনি কেউ, কেবল শহর থেকে ওই সর্বনাশী এসেই ঘুরিয়ে দিচ্ছে অল্প বয়েসী মেয়েগুলোর মাথা। বলে, ওই তো পথটা দেখাল। নচেৎ এ গাঁয়ের কে কবে অমন ঢঙ করিয়া সিঁদুর পরে মাথায়?

ফলত, দিন-কতক শিখাবউদির পিণ্ডি চটকানো চলল দিনরাত। শিখাবউদি মুখে কুলুপ এঁটে শুনে গেল, তিলমাত্র প্রতিবাদ করল না কারোর কথায়, ম্লান মুখে হজম করে গেল সবকিছু। কিন্তু দু-দিন না যেতেই আবার যেই-কে-সেই। আবার আগের মতোই হাসিখুশি শিখাবউদি, কলকলিয়ে কথা বলছে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে। আর মানুষগুলো এমনই বেহায়া, দু-দিন আগে যাকে বিনা দোষে গালমন্দ করেছে, ঠেকায় পড়া মাত্তর সেই শিখাবউদির কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিনা, ও বউমা, মেয়েটাকে

দেখতে আসতিছে, তুমি না হলে কেই বা সামাল দিবে মা? আর, শিখাবউদি মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বেমালুম ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ননদতুল্য মেয়েটিকে পার করবার জন্যে।

শিখাবউদি এসব কাজ পারত। জান লড়িয়ে দিয়ে কাজটা ঠিক তুলে দিত।

পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে কোনও গরিব বাড়ির মেয়েটিকে, হবু বরের সামনে পরে বেরোনোর মতো তোলা শাড়ি বলতে যেটি রয়েছে, তার অবস্থা সঙ্গীন, শিখাবউদি দৌড়ে গিয়ে তার গোলাপফুল আঁকা তোরঙ্গ থেকে একখানা রঙচঙে শাড়ি এনে এমন কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিল, দেখেই বর বাবাজীর চক্ষু ছানাবড়া। আর, মেয়েটি তো শিখাবউদির প্রতি তার কৃতজ্ঞতা একমুখে প্রকাশ করে উঠতে পারে না।

দেখে-শুনে শিখাবউদির চোখেমুখে খেলা করত আলোছায়া হাসি। বলত, কী জান মাসি, পল্টুদা একটা কথা বলে। বলে, কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে, কামড় দিয়েছে পায়/তাবলে কুকুরে কামড়ানো কি রে মানুষের শোভা পায়? পল্টুদা বলে, তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

বলা বাহুল্য, শিখাবউদির এবংবিধ উচ্চমার্গের কথাবার্তার অন্ধিসন্ধি পেত না গাঁয়ের মুখুসুখ্যু মানুষজন। তাও তারা অনুযোগের মাত্রা কমায় না। বলে, দেখতে দেখতে অবাক হয়্যা যাই মা! উপকারও লিচ্ছে, আবার পিণ্ডিও চটকাচ্ছে!

শুনে শিখাবউদি আলোআঁধারি হাসে। বলে, কি জান জেঠাইমা, পল্টুদা বলে, মানুষ হল মশার জাত। যার রক্তে প্রাণ বাঁচায়, তাকেই হুলের জ্বালায় অস্থির করে তোলে।

এতদ্‌সত্ত্বেও শিখাবউদি যে সকলেরই চোখের বালি ছিল, তা কিন্তু নয়। অনেকেই তাকে ভালোবাসত। আবার নিন্দে করবারও লোকের অভাব ছিল না। অন্যের জন্য এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকে তারা শিখাবউদির নাম কেনার শহুরে কায়দা বলেই মনে করত। কারণ, শহরের মেয়া হইল কুহকিনীর জাত। অনেক কিসিমের মায়া জানে অরা।

সেসব মন্তব্যের ছিটেফোঁটা হলেও শিখাবউদির কানে গিয়ে পৌঁছোতই। শুনে নিমেষে ম্লান হয়ে যেত শিখাবউদির মুখখানি। টাটকা ফুলটি প্রখর রোদ্দুরে ঝামরে যেত। কিন্তু সেই ভাবান্তর কয়েক পলকের মধ্যেই অপরিসীম দক্ষতায় সামলে নিতে পারত শিখাবউদি। বলত, কী আর করা যাবে! পল্টুদা বলে, দুনিয়ার সব মানুষের পূজা পাওয়া দ্যাবতাদের কপালেও জোটে না। তা ঠিকই বলে সে, যেখানে করবি ঘর, অর্ধেক আপন অর্ধেক পর।

পেছনে যে-যাই বলুক, প্রবীণ-প্রবীণাদের মুখে যতই না কেন মেঘ জমুক, অল্পবয়েসি কিংবা সমবয়েসি বউদি-ঝিউড়িরা কিন্তু মজে যায় দু-দিনেই। শিখাবউদির আড়ষ্টতাহীন, স্বতস্ফূর্ত আচরণ, শহুরে মেয়ে হয়েও এমন ঠাট-দেমাকহীন মেশামেশি, সক্কাইকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নেবার চেষ্টা, সবকিছুই খুব ভালো লেগে যায় ওদের। ফলে, খুব দ্রুতই ওরা শিখাবউদিতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, তার মতো শাড়ি পরা, প্রসাধন করা, চুল বাঁধা—সব কিছুতেই শিখাবউদিকেই অনুকরণ করতে চায়। বিশেষ করে উঠতি বয়েসের মেয়েরা ওর এমনই ন্যাওটা হয়ে ওঠে, একটা দিন ওর কলকলানি শুনতে না পেলে মনে হয় বুঝি কতদিন দেখা হয়নি শিখাবউদির সঙ্গে।

গেরস্থর কাজেকর্মে শিখাবউদি না হলে চলে না কারোরই।

কোনও মেয়েকে দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ, শিখাবউদি সাজিয়ে না দিলে, কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরিয়ে না দিলে, বরের সুমুখে হাজিরই হবে না। প্রবীণারা যতই না কেন ঠোঁট বেঁকাক আড়ালে, দরকারের সময়ে পরামর্শের জন্য ওর কাছেই হেদিয়ে পড়ে। কিনা, শিখা, ও মা, পাত্রপক্ষকে জলখাবারে কী দেওয়া যায়? কিংবা, কী কী রান্না হবে দুপুরে? কেবল পরামর্শই নয়, শিখাবউদিকে একেবারে সক্রিয়ভাবে কামনা করে সবাই, ও মা শিখা, তুই না হাত লাগালে কী করিয়া হবে সব? ফলে, শিখাবউদির নিজের বাড়ির গেরস্থালির কাজকর্ম মাথায় উঠল। দিনভর সে পড়ে রইল ওই বাড়িতে। জলখাবার বানাল, দুপুরের ভালো পদগুলো রাঁধল, পরিবেশন করল, শহুরে আদব কায়দা দিয়ে একেবারে মজিয়ে দিল পাত্রপক্ষকে। আর, সমস্ত কাজ ভালোয় ভালোয় চুকে যাবার পর, সবাই যখন দশমুখে শিখাবউদির জয়গান গাইছে, শিখাবউদি সামান্য লাজুক মুখে বলে উঠল, পল্টুদা কী সাধে বলে, একটা বিয়েবাড়ির

যজ্ঞি একাই সামলাবার ক্ষমতা রাখে শিখা। আর, তাই শুনে প্রবীণাদের দল এ-ওর দিকে কুটিল সন্দেহে তাকিয়ে কপালের সারবন্দী বলিরেখায় প্রকট ভাঁজ তুলে ফিসফিস করে পাশের জনটিকে শুধোয়, হ্যাঁ দিদি, এই পল্টুটি কে বটে? ও ঠাকুর-ঝি, বল না গো?



শিখাবউদির পল্টুদা আমাদের চোখে চিরকালই এক রহস্যময় মানুষ।

শিখাবউদিই একটু করে ওই রহস্যময় মূর্তিটা গড়ে তুলেছে সন্ধিপুরের মানুষের কাছে। মাঝেমাঝে তার সম্পর্কে টুকরো-টাকরা মন্তব্য শুনতে শুনতে গাঁয়ের সকলের মনে এমনই ধারণা একটু একটু করে বদ্ধমূল হয়েছে যে, সে এমনই এক রূপবান, গুণবান, তেজবান মানুষ, যার সঙ্গে এই ভূ-ভারতে আর কারোরই তুলনা চলে না।

বল্লভদার সংসারে বউ হয়ে আসার দিন কতক পর থেকেই শিখাবউদি প্রসঙ্গটা তুলতে থাকে পাড়ার কোনও সদাপরিচিতা সমবয়েসীর কাছে। মেয়েটি সেকথা একান্তে বলে তার কোনও বিশ্বাসী জনের কাছে। এবং দিন-কতকের মধ্যেই কথাটা পাড়ার মেয়েমহলে বাতাসে মিশে থাকা গন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর যতই দিন যায়, সাবলীল হতে থাকে শিখাবউদি, ততই তার কথাবার্তায়, উপমায়, উদাহরণে, পল্টুদা এসে যেতে থাকে মুহুর্মুহু। আড্ডা-মজলিশে কোনও একজনার রূপ, গুণ, শক্তি, সাহস নিয়ে যখন শতমুখে প্রশংসা চলেছে, পাশটিতে বসে শুনতে শুনতে শিখাবউদি একান্ত আপনজনটিকে ফিসফিসিয়ে বলে উঠবে, হুঁহ, পল্টুদাকে তো এরা দেখেনি, একটিবার দেখলে আর এমন কথা বলতে পারত না। এবং বলাই বাহুল্য, প্রিয় সখীটি দু-দিন না যেতেই সেকথা মেয়েমহলে চাউর করে দিয়েছে।

কিন্তু তাতে কবে শিখা বউদি তিলমাত্র অপ্রস্তুত হয় না। বরং খুব শীতল গলায় জবাব দেয়, যা সত্যি, তাই বলেছি। একটিবার ওকে দেখলেই টের পেতে তোমরা।

কনকপুরের সঙ্গে ম্যাচ চলছে সন্ধিপুরের, ছোটোকাকার মতো তুখোড় খেলোয়াড় টিমে থাকা সত্ত্বেও তিন গোলে হেরে গেল সন্ধিপুর। শিখাবউদি সারা মুখে গুমোর ফুটিয়ে বলল, এমন ম্যাচে টিমে থাকত পল্টুদা, বাছাধনদে প্রত্যেকের গলায় গোলের মালা পরিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিত। সত্যম্বর অপেরার নায়কটি, কী যেন এক 'কুমার', সেবারে জমিদার-বাড়িতে পালাগান গাইতে এসে যুবতী মেয়েগুলোর চোখের মণি বনে গেল। কেন কি, এমন রূপবান নায়ক আর এ যাবৎ সন্ধিপুরে আসেনি কোনও অপেরা দলের হয়ে গাইতে।

শুনে শিখাবউদির ঠোঁটজোড়া তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায়, হুঁহ, রূপ কাকে বলে এরা তার বুঝবে কী? পল্টুদাকে তো আর দেখেনি। দেখলে বুঝত, রূপ কাকে বলে! এই বাঁশবনের দেশে গোবরারই সব গোবর্ধন।

বাগাম্বর দণ্ডপাটের মেয়ে সুবাসীর যে-রাতে বিয়ে হতে হতেও হল না, পণের পুরো টাকা মেটাতে না পারায় বর তুলে নিয়ে গেল বরের বাপ, এক গ্রাম লোকের মধ্যে মেয়েটা লগ্নভ্রষ্টা হল, পরের দিন শিখাবউদি প্রাণের সখীদের একান্তে বলেছিল, এমন অবস্থায় পল্টুদা থাকলে সুবাসীটার কি এমন হাল হত? মাঝপথে পরিবেশনের বালতিটা নামিয়ে রেখে কোমরের টেসে বাঁধা গামছাটা খুলে ফেলে সটান ছাঁদনাতলায় গিয়ে বিয়ে করত না সুবাসীকে?

সেসব কথা শুনতে শুনতে চোখ কপালে উঠে যায় সকলের। ঠাকুমা সম্পর্কের প্রবীণরা বল্লভদাকে ঠেস দিয়ে বলে, এ কী শুনি নাতি? নাতবউয়ের নাকি লাভার আছে শহরে?

বল্লভদার কানেও তো ততদিনে পৌঁছেছে শিখাবউদির লাগাতার পল্টুদা-বন্দনা। কাজেই, একেবারে আকাশ থেকে পড়ে না সে। বরং ঠাকুমা-দিদিমাদের ক্রমাগত খোঁচায় অতিষ্ঠ হলেও, তিলমাত্র বিব্রত না হওয়ার ভান করে। বেশ স্মার্টলি জবাব দেয়, থাকতেই পারে। এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে গো দিদা? দু-চারটা লাভারই যদি না রইল, তবে শহরের মেয়া হইয়া জন্মিয়া লাভ কী? এ-তো আর তুমাদের মতো নয় যে, ন-বচ্ছর বইসে বিয়ে দিল বাপ, নব্বই বচ্ছর অবধি ওই একটা লোকের সাথ

সংসার কল্লে। অবা সব শহরের মেয়া। গো-ডিম না ভাঙতেই লাভাব জুটিয়া যায়।

ওই বয়েসে ঠিক বুঝতে পারিনি, বল্লভদা হয়ত বা ইলচি করেই বলত ওসব কথা, কিংবা এমনও হতে পারে, শহুরে মেয়ের কাছে নিজের উদারতা দেখানোর জন্যই বলত। অর্থাৎ অজ গাঁয়ে বাস করেও সে যে কত আধুনিক মনের অধিকারী, কত মডার্ন, সেটাই দেখাতে চাইত শিখাবউদিকে। শিখাবউদি শুনত আর মিটিমিটি হাসত। অথচ ওই বয়েসেই আমার মনে হত, বল্লভদা অমন শিখাবউদির চরিত্র তুলে কটাক্ষ করাতে শিখাবউদির রেগে ওঠার কথা ছিল।

শিখাবউদির গোলাপ ফুল আঁকা টিনের তোরঙ্গের মধ্যে যে মূল্যবান সামগ্রীগুলি ছিল, তার মধ্যে ছিল একখানা চিঠি। মহামূল্যবান চিঠি সেটা। এমন আশ্চর্য চিঠি সন্ধিপুরের কোনও মেয়ে কোনও কালে পেয়েছে কিনা সন্দেহ। চিঠিখানা কারোর হাতে তুলে দেওয়া তো দূরের কথা, কাউকে ছুঁতে অবধি দিত না শিখাবউদি। তোরঙ্গ থেকে পারতপক্ষে বেরই করত না। ওটা ছিল তার একান্ত গোপনীয় এক সম্পদবিশেষ। কেবল, একেবারে একান্ত কোনও মুহূর্তে, কোনও প্রাণের সখীকে হয়ত বা অতি সন্তর্পণে বলেছে, আমি তোকে একখানা চিঠি পড়ে শোনাতে পারি, যা শুনতে শুনতে তোর মনটা যে কোথায় উধাও হয়ে যাবে তুই টেরই পাবি না তা। এমন কথার পর প্রাণের সখীটি একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে শুনতে চাইলে পর শিখাবউদি হয়ত বা অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গ থেকে চিঠিখানা বের করে চারপাশের সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে, কান এড়িয়ে, ফিসফিস করে পড়ে শুনিয়েছে তা। তখন, প্রাণের সখীটি লক্ষ করেছে, শিখাবউদির সারা মুখ জুড়ে লেপটে রয়েছে এক অপার্থিব আলো।

বলাই বাহুল্য, পল্টুদারই চিঠি ওটা। তৎকালীন চালু সিনেমার নামগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে লেখা হয়েছিল পুরো চিঠিটা। শিখাবউদি গলায় যাবতীয় আবেগ জড়ো করে পড়ত, 'বহ্নিশিখা', তুমি আমার 'সূর্যশিখা'। তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে 'পথে হল দেরি'। এতদিন 'সাথীহারা' ছিলাম। এবার ফিরে পেলাম আমার 'হারানো সুর' । জীবনে যত মেয়ে দেখেছি, তুমিই আমার চোখে 'সবার উপরে'। এখন আমাদের প্রেমের 'অগ্নিপরীক্ষা' চলছে, যেদিন 'সাতপাকে বাঁধা' পড়ব, সেদিনই সমস্ত 'চাওয়া পাওয়া'র অবসান হবে।

শিখাবউদি আবেগভরা গলায় পড়ে যেত, আর, সিনেমা সম্পর্কে অবহিত সখির দল শুনতে শুনতে এমনই মজে যেত, যেন তাদের উদ্দেশেই চিঠিখানা লিখেছে তাদেরই একান্ত প্রণয়ীটি।

প্রতিবারেই, চিঠিখানা পড়া শেষ হলে পর, শিখাবউদির সারা মুখে ফুটে উঠত এমনই তৃপ্তির হাসি, এমনই অলৌকিক জ্যোতি ফুটে থাকত ওর মুখমণ্ডলে, যেন সাত রাজার ধন একটি মাণিক চিঠির রূপ ধরে গচ্ছিত রয়েছে তারই তোরঙ্গে।

জীবনে কতবার যে প্রাণের সখিদের একান্ত অনুনয়ে ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা চিঠিখানি তোরঙ্গের অন্ধকার খোপ থেকে বের করে এনে পড়ে শুনিয়েছে শিখাবউদি, তার বুঝি কোনও ইয়ত্তা নেই। চিঠিটা ছিল, বাস্তবিক, তার একটা অবশেসন। প্যাশন।



আমাদের সেই কৈশোরের ভালোবাসার নদীটি দীর্ঘদিন পরে একটু একটু করে রোগা হয়ে যাচ্ছিল। দিনদিন জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল নদীটা। অল্পস্বল্প চুরিও যাচ্ছিল।

তখন আমরা কলেজে পড়ি, আমি আর কল্পনাথ। গজানন, ভণ্ডুল আর রতন ততদিনে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে।

জেলা সদরের কলেজ মেস থেকে হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি আসতাম, আর তখনই দেখতাম, নদীটা ক্রমশ ক্ষীণকায়া হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তার দু পাড়ের প্রশস্ত বালুচর দু টিও ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে।

আসলে, যতদিন জমিদারি প্রথা চালু ছিল, খাল বিল, নদী নালা, সব ছিল জমিদারের। নদী, মানুষের জন্য প্রকৃতির দেওয়া অসামান্য এক উপহার, কিন্তু সে ছিল গুনাকয় মানুষের কুক্ষিগত। যেমন, আমাদের গাঁয়ের যমুনাও ছিল বহুকাল ধরে মুখুজ্যাদের সম্পত্তি। পরে তার চার আনা অংশ মান্দারের চক্রবর্তীদের

কাছে যায়। সন্ধিপুরের মুখুজ্যাদের সঙ্গে মান্দারের চক্রবর্তীদের ছিল পুরুষাণুক্রমে জমিদারি ঝগড়া। দুটি পরিবারের মধ্যে চিরন্তন বৈরিতার একাধিক কারণ ছিল। যমুনা নদীটাও ছিল সেই কারণসমূহের একটা। তখন বৈতরণীতে মাছ ধরা এবং নদীটার হরেক কিসিমের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রায় রক্তক্ষয়ী লড়াই বাধত দুটি পরিবারের মধ্যে। দুটি গাঁয়ের অনেক মানুষই ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় জড়িয়ে পড়ত ওই লড়াইতে।

শিখাবউদি শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেত। নদী সম্পর্কে তো তার যাবতীয় ধারণা সবই কংসাবতীপ্রসূত। বলত, বলিস কী তোরা, নদী আবার একজনার সম্পত্তি হয় নাকি? বিয়ে-সাদি উৎসবে তা উপহার দেওয়া যায় নাকি কারুকে? তাহলে তো এই আকাশটাও কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে। বলতে বলতে সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিখাবউদির চোখমুখ। বলে, মাথার ওপরের এই আকাশটা তবে আমার সম্পত্তি। আমি ওটা দান করে দিলাম গজাননকে। গজানন, আজ থেকে এই গাঁয়ের মাথার ওপর ঝুলে থাকা পুরো আকাশটাই তোর। বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠত শিখাবউদি।

তো, যমুনা থেকে মুখুজ্যাদের বড়ো বেশি আয়-উপায় হত না। কেবল ফি-চৈত্রে খালের জল শুকিয়ে এলে পর, তা থেকে মাছ ধরা হত। সেই সুবাদে যমুনাতে ফি-বছর জমে উঠত মৎসশিকার উৎসব। সেই উৎসবের মরসুমে তো দুটি গ্রাম প্রায় হপ্তাটাক আগে থেকেই উত্তেজনায় টানটান হয়ে থাকত। উৎসবটি ভারি আকর্ষণীয় ছিল দু'গাঁয়ের মানুষের কাছে। সব মানুষের নয়, কিছু ভাগ্যবান মানুষের কাছে, যারা ছিল বিভিন্ন কারণে জমিদারবাবুদের পেয়ারের লোক। বাকিরা দু-পাড়ে দাঁড়িয়ে লোলুপ নয়নে দেখত সেই উৎসব। কেউ কেউ রাগে-অভিমানে যেতই না উৎসবটা দেখতে। তাদের পক্ষে হৃদয়বিদারক ছিল দৃশ্যটা। উৎসবটাকে তাই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলত ওরা।

এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া নদীটির কোনও কোনও জায়গায় একটু বেশি গভীর ছিল। মানুষজন বিভিন্ন কারণে প্রখর গ্রীষ্মের মরসুমে মাটি কেটে বয়ে নিয়ে যেত খালের বুক থেকে। মুখুজ্যারা সানন্দে অনুমতি দিতেন তাতে, কেন কী, তাতে করে মুফতে কাটানো হয়ে যাচ্ছে খালটা। তো, যেসব জায়গার মাটি কেটে নেওয়া হত, সেখানে পরের মরসুমে জল জমে থাকত বেশি। ওই জলে থাকত কই, ল্যাঠা, শোল, মাগুর গোছের জিয়োল মাছ এবং পুঁটি, মোরলা গোছের কুচো মাছ। নদীর মধ্যেকার ওই গভীর জায়গাগুলোতে মাছ ধরবার তরিকা ছিল স্বতন্ত্র। বিশ-পঁচিশ জন মানুষ নেমে পড়ত জলে। পা দিয়ে পুরো জায়গার জল অনেকক্ষণ ধরে গুলিয়ে দিত। পা দিয়ে পাঁক-কাদা তুলে তুলে অল্পক্ষণের মধ্যে পুরো জলটাকে ঘোলের মতো গাঢ় করে ফেলত। আর, তাতে করেই মাছগুলো জলের এবং পাঁকের তলা থেকে মুখ দেখাত এক-এক করে। তখন সারা ডোবা জুড়ে হাত দিয়ে এবং ছাঁকনি জাল, চাবিজাল দিয়ে মাছ ধরবার হিড়িক পড়ে যেত।

আমরা স্বচক্ষে দেখেছি সেসব লড়াইয়ের দৃশ্য। তখন আমরা ছোটো, কিন্তু মনে আছে ভাসাভাসা। সকাল থেকে নামত সবাই, দুপুর গড়িয়ে যেত, কিন্তু তাও ওই ডোবাগুলো থেকে উঠতে চাইত না কেউ। মাছে-মাছে ভরে যেত টিনের বালতি, মাটির হাঁড়ি, যে-যা নিয়ে যেত সঙ্গে। তারপরে সব নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার উপায় ছিল না কারোরই। জমিদারের গোমস্তা শশাঙ্ক বেরা সকাল থেকে হাজির থাকত অকুস্থলে। প্রত্যেকে তার কাছে জমিদারের প্রাপ্য ভাগ মিটিয়ে দিয়ে বাকি মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারত। জমিদারের প্রাপ্য ভাগ বলতে সরেস মাছগুলি। পাকা শোল, কই, মাগুর, ডাগর মৌরালা, পুঁটি...। চুনো...প্যাঁকাল, ছোটো সাইজের জিয়োল মাছ,. এইসব জুটত মাছ-ধরিয়েদের কপালে। তাই নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরত সবাই, কেন কি ভিক্ষার চাল, তার আবার কাঁড়া-আঁকাড়া '

আমাদের থেকে ভণ্ডুলের কীর্তিকাহিনীর কথা শুনে একদিন ওকে বেধড়ক পেটাল শিখারবউদি। তাতে করে তার দুষ্টুমি তো কমলই না, মাঝের থেকে আমাদের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হল। তখন গজাননই তার জিগরি দোস্ত। আমরা, অর্থাৎ আমি আর কল্পনাথ, কার্যত তার শত্রুপক্ষ।

দুষ্টুমিতে ভণ্ডুলের জুড়ি মেলা ভার ছিল বটে, কিন্তু ভূত-প্রেত, আরশোলা আর হরেক কিসিমের ঠাকুর-দ্যাবতাকে যমের মতো ভয় পেত সে। কোন্ ঠাকুর মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে, তার একটা তালিকা কণ্ঠস্থ ছিল তার। ওই সময়টায় ভণ্ডুলের মুখে মাঝেমাঝেই পেতাম বিড়ির গন্ধ। ও আর গজানন, দু-জনে মিলে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কী করে, আমরা কিছুই জানতে পারি নে। কেবল মাঝে মাঝে ওদের অপকীর্তির খবর হাওয়ায় ভেসে আসে। শিখারবউদির কানেও যায় সেসব। সে যথাসাধ্য শাসন করে ওকে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাধা পায় বল্লভদার থেকে। ভণ্ডুলকে শিখারবউদি শাসন করতে গেলেই মাঝখানে এসে দাঁড়ায় বল্লভদা। বলে, খবরদার, কুটুমের ছেলে সে, এখানে তাকে শাসন করা চলবেনি। শাসন করতে চাও তো বাড়ি পাঠিয়া দাও, ওখানে গিয়া যত খুশি শাসন কর।

জামাইদার প্রত্যক্ষ আস্কারা পেয়ে ভণ্ডুলের সাহস এমনই বেড়ে যায় যে, নিজের দিদিকে অবধি সরাসরি অগ্রাহ্য করবার সাহস জুটিয়ে ফেলে সে। এবং তার ফলে শিখারবউদি ধীরেধীরে তার দু-চক্ষের বিষ এবং বল্লভদা হয়ে ওঠে চোখের মণি। এক সময় জামাইদা-শ্যালকের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি হয়, এবং দু-জনে ধীরেধীরে হরিহর আত্মা হয়ে ওঠে।

সারা ছেলেবেলা জুড়ে পল্টুদাকে নিয়ে আমাদের সবাইয়ের মনে নিদারুণ কৌতূহল, কিন্তু সে কৌতূহল মেটাবার কোনও উপায় ছিল না। ভণ্ডুল আসার পর সবাইয়ের মনে হয়, ওই দিতে পারে গূহ্য খবর। কিন্তু ভণ্ডুল কেবল পিছলে পিছলে বেড়ায়, ভাসা-ভাসা ভাষায় জবাব দেয়, রহস্যময় হাসে। আমরা কেউই তার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারি নে, খালি আলো-আঁধারি কথা আর দুর্জ্ঞেয় হাসির ফাঁদে পড়ে হাঁকুপাকু করি।

তখন বল্লভদা ঘরের বাইরে থাকাটা সবেমাত্র শুরু করেছে, তেমনই এক সময়ে ভণ্ডুল, সেই প্রথম, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করল কথাটা। প্রথমে আমাদের মতো কমবয়েসিদের কাছে, ধীরেধীরে সবাইয়ের কাছে। আর, এ হল এমন এক জাতের কথা, যার টানে মড়াও উঠে বসতে চায় কিনা, দাঁড়াও হে, টুকচার সবুর ধর, শিখার পল্টুদার কিস্যাটা শুনিয়া যাই।

এরপর কিস্তিতে কিস্তিতে ভণ্ডুল যা জানায়, তা হল, পল্টুদা নামে একজন সত্যিসত্যি রয়েছে ওদের এলাকায়, তার রূপগুণে মুগ্ধ এলাকার মানুষ, তার শৌর্য, সাহস, নিষ্ঠা ও নৈতিকতা, নিরন্তর পরোপকারের আগ্রহ, নানান উপমা ও উদাহরণ সহযোগে বিতাং করে বলত ও। পাশাপাশি এ-ও জানায় যে, শিখারবউদির প্রতি তার নিদারুণ দুর্বলতা ছিল। সেটা মাঝেমাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ত।

এরপর থেকে ভণ্ডুল, শিখারবউদির প্রতি পল্টুদার দুর্বলতা নিয়ে, মাঝেমাঝেই এক-আধটা গল্প শুনিয়ে দিতে থাকে। পুরো পাড়ার মানুষ বিশেষ করে মহিলামহল, কান খাড়া করে, চোখ জোড়াকে মার্বেলের গুলি বানিয়ে শুনতে থাকে তা।

ভণ্ডুল যে কেন হয়ে দাঁড়াল বল্লভদার নয়নের মণি, সে ব্যাপারে আমি আর কল্পনাথ অনেক গবেষণা করেছি। আমাদের মনে হয়েছে, তার পেছনেও ছিল ওই পল্টুদা। আসলে, যতই না কেন উদারতার ভান করুক বল্লভদা, পুরুষ-মানুষ তো, শিখারবউদির মুখে পল্টুদার নামটি শোনা ইস্তক তার বুকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কাঁটা বিঁধে গিয়েছিলই। সেই কাঁটা ভেতরে ভেতরে টাটিয়ে দিচ্ছিল পুরো বুক, কাউকে বুঝতে দেয়নি বল্লভদা। বুঝতে দেওয়াটাই হত তার কাছে নিদারুণ লজ্জার, কিনা প্রেম করে, জয় করে, ছিনিয়ে আনল যাকে, লাট-বেলাট মানুষজনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে দু পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যে মেয়ে কিনা মালা দিল মরদের বাচ্চা মরদ বল্লভ ঘোষকে, সেই মেয়ে কিনা বিয়ের কাজলপাতি হাতে ধরে থাকা অবস্থাতেই শুরু করেছে কে এক অন্য পুরুষের বন্দনা-গান, যে নাকি মনে মনে মালাটালা গেঁথে শিখারবউদির মুখ থেকে একটিবারের তরে 'হ্যাঁ' শোনার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব কথা

নিয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না বল্লভদার পক্ষে। তাতে করে তার মনের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে যেত। সবাই ওকে ঠেস দিয়ে বলত, এতদিনে তবে বুঝলে যে চকচক করিলেই সোনা হয় না। আর, শিখাবউদিকে তো এসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারবেই না বল্লভদা। তিলমাত্র কৌতূহল দেখাতেও পারবে না। তাহলেই শিখাবউদি রাগে, দুঃখে, অপমানে, সারা মুখে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বলে উঠবে, এই তো, গাঁয়ের কুচুটে, সন্দেহবাতিক, ঈর্ষাতুর মানুষটি বেরিয়ে এসেছে! তবে যে বড়ো মডার্ন-মডার্ন ভাব দেখাতে? এই তো, ঠাকুর্দাদের মতো, নিজের বউয়ের মুখে একটা অন্য মানুষের নাম কেবল উচ্চারিত হওয়া মাত্র কেমন সন্দেহ থিক্‌থিক করছে সারা মুখে। হুঁহ্‌, মডার্ন হতে চাইলেই মডার্ন হওয়া যায় না। পারেও না সবাই। পল্টুদা বলে,পোশাক-আশাকে, সেন্ট-ক্রিমে, কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে মডার্ন হওয়া যায় না, মডার্ন হতে হয় মনে। সত্যিকারের মডার্ন হতে গেলে দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক উদার করতে হয়। সেটাই অনেকে পারে না। বাইরে ভান করে দু-চারদিন চালায়, তারপর সামান্য দমকা হাওয়ায় ভেঙে পড়ে দালানটি।

কাজেই বল্লভদাকে মুখ বুঁজেই থাকতে হয়। ছিলও বেশ কিছুদিন। কিন্তু মুখ দিয়ে প্রকাশ না করলে কী হবে, বুকের সূক্ষ্ম কাঁটাটি তো নিঃশব্দে তার ক্রিয়া করতে ছাড়েনি। ফলে, সারা বুক টাটিযে থেকেছে দিনের পর দিন, পুঁজ জমেছে, টনটন করেছে সারাক্ষণ, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। নিজের বুকের আগুনে দিনের পর দিন নিঃশব্দে পুড়তে থেকেছে নিজেই। বাইরে বেরোতে না পারা সেই আগুন তার যাবতীয় কালো ধোঁয়া বুকের মধ্যে জমতে জমতে একেবারে কুলো কুচ্ছিৎ হয়ে গিয়েছে ভেতরটা।

তারপর একদিন ভণ্ডুল এসেছে। সে আর ডগোমগো করে এঁকেছে, বল্লভদার সুমুখে, পল্টুদার ছবি। আগুনে ঘি ঢেলেছে, হয়ত বা নিজেরই অজান্তে। বল্লভদা বুঝি তক্কেতক্কে ছিল, একেবারে শূন্য থেকে লুফে নিয়েছে ভণ্ডুলকে। খাবার-দাবার, লজেন্স-চকোলেট, রং পেনসিল, পোশাক-আশাক,—এক কথায় যা নয় তাই দিয়ে হাত করে ফেলেছে ভণ্ডুলকে, এবং এই সবকিছুর ফাঁকে যথাসম্ভব নিস্পৃহতার ভান করে ছুঁড়ে দিয়েছে পল্টুদা সম্পর্কিত এমন-সব সর্বনাশা প্রশ্ন, যার তেমন-তেমন জবাবে পাঁজর ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে ইস্পাতের মতো শক্ত মনের মানুষেরও। ততদিনে না চাইতে জল এতএত উপহার পেয়ে ভণ্ডুল তো একেবারেই কাৎ, দু-বার আর সাধতে হয় না, বিতং করে বলতে থাকে পল্টুদা আর শিখাবউদির গোপন কিস্যার অজ্ঞাত কাহিনিগুলি, কিস্তিতে কিস্তিতে, ধারাবাহিকভাবে। আর, বল্লভদা কেবল টেপ-রেকর্ডারের মতো নিঃশব্দে শুষে নিয়েছে কথাগুলো। চোখেমুখে তিলমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ করেনি সে, কেন কি, বল্লভদার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখলে ভয় পেয়ে গিয়ে ভণ্ডুল যদি আচমকা গুটিয়ে নেয় নিজেকে! যদি মাঝপথে বন্ধ করে দেয় তার ঝাঁপি!



আমাদের পুরো দলটাকেই খুব ভালোবাসত শিখাবউদি।

আমি আর কল্পনাথ একসঙ্গে সব সময় ঘুরতাম বলে আমাদের ডাকত মাণিকজোড়। তবে ওই বয়েসে আমাদের কেমন জানি মনে হত, গজাননকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত শিখাবউদি। আসলে, মানুষের ওই বয়েসটাই বড় ভালোবাসার কাঙাল। ভালোবাসার পরিমাণ নিয়েও ওই বয়েসে বড্ড অভিমানের মেঘ জমে আকাশে, ওই বয়েসে ভালোবাসার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও বড়োই মাথা ঘামায় মানুষ। ভালোবাসার পরিমাণ মাপার দাঁড়িপাল্লাটাও খুব মজার হয় ওই বয়েসে। সবদিক থেকে বিচার করে আমাদের মনে হত, গজাননের প্রতি ভালোবাসাটা একটা অন্য রকমের ছিল শিখাবউদির। আমাকে আর কল্পনাথকে একরকম, গজাননকে অন্যরকম।

গজাননটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু আর ফাজিল ছিল। কিন্তু ওর দুষ্টুমির বহর দেখতে দেখতে, রেগে যাওয়া তো দূরের কথা, শিখাবউদি মজা পেত খুব। গজাননের আড়ালে বলত, বাচ্চারা একটু দুষ্টু হলে ভালোই লাগে, বুঝলি। এই বয়েসে বড়োদের মতো ম্যাদা মেরে থাকা কী? পল্টুদা বলে,

দুনিয়ার যত বড়োসড়ো ব্যক্তি, সবাই নাকি ছেলেবেলায় খুবই ডানপিটে ছিল। যে সাহেবটা আমাদের দেশে এসে নবাবদের গোহারান হারিয়ে রাজ্যপাট পেতেছিল, সে নাকি ছেলেবেলায় এতটাই দুষ্টু ছিল যে, তার দৌরাত্ম্যে পাড়াপড়শি অতিষ্ঠ হয়ে থাকত।

গজানন শিখাবউদির ওপর জুলুমও করত সবচেয়ে বেশি। শিখাবউদি কিন্তু খুব উপভোগ করত তা। চার জনাতে লুডু খেলতে বসলে গজাননই হত শিখাবউদির পার্টনার। শিখাবউদি বাড়িতে কোনও খাবার বানালে আমরা যদি পেতাম একবার তো গজানন দু-বার। ওই নিয়ে অনুযোগ করলে, শিখাবউদি নিঃসঙ্কোচে জবাব দিত, ওর কথা বাদ দে। ও একটা দস্যি। গুণ্ডা একটা। তোদের সঙ্গে একবার খেল, তার আগে একলা এসে গুণ্ডামো করে খেয়ে গেছে একবার। কারও দেবার অপেক্ষায় থাকে নাকি ও? আসে, জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে পালায়। বলতে বলতে ফিক করে হাসে শিখাবউদি। তোরা তো আর ওর মতো গুণ্ডা নোস। তোরা সব শান্তশিষ্ট, লেজ-বিশিষ্ট। পল্টুদা কী বলে জানিস? বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

কামাখ্যা ভট্ট শুধু আমাদের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের হেড-পণ্ডিতই ছিলেন না, ঐ সঙ্গে গাঁয়ের বারোয়ারি শিব-মন্দিরের পূজারিও। তাঁর ছেলে গজানন, যদিও আমাদের সহপাঠী ছিল সে, একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি বিস্তর, কিন্তু তার সঙ্গে আমার সেই অর্থে বন্ধুত্বটা তেমন দানা বাঁধেনি কখনোই, যেমনটা বেঁধেছিল কল্পনাথের সঙ্গে। আসলে, এক ক্লাসে পড়লেও গজানন ছিল আমাদের চেয়ে দু তিন বছরের বড়ো। চিরকালই একটু ছ্যাবলা গোছের ছিল সে। কথায় কথায় রাজা-বাদশা মারতে ওস্তাদ। প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালীনই লুকিয়ে বিড়ি টানত। হরেক কিসিমের বজ্জাতি বুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। আর, একের কথা রঙ চড়িয়ে অন্যের কানে তোলায় ওস্তাদ ছিল সে। ভযডরের লেশ ছিল না ওর অন্তরে। কেবল স্কুলের ব্রতচারীর মাস্টার কেশববাবুকেই স্রেফ বেতের ভয়েই সমীহ করত।

আমাদের সঙ্গেই ঘুরত বটে গজানন, কিন্তু আমরা ওকে বড়ো একটা আমল দিইনি কোনওদিনই। কেবল গাছের মগডাল থেকে ফল পেড়ে আনা, রানিহাঁস দিঘির মাঝ বরাবর সাঁতরে গিয়ে পদ্মচাকি তুলে আনা, খালপাড়ে আখ খেতে ঢুকে আখ চুরি করে আনা গোছের দুরূহ কাজগুলির বেলায় ওকে সামান্য গুরুত্ব দিতাম। এবং আমাদের থেকে বাহবা আদায় করবার জন্য সে দুরূহ কাজটিকে দুরূহতম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করত।

স্কুপ-নিউজ সংগ্রহ করা তার একটা প্রিয় নেশা ছিল। গ্রামের ভেতরের তো বটেই, দূর-দরাজের নানান জাতের গোপন ও মুখরোচক খবর কেমন করে যেন ভাসতে ভাসতে চলে আসত তার কাছে এবং গজানন তা যথেষ্ট গুমোর সহকারে, ভুরুজোড়া নাচিয়ে, পরিবেশন করত আমাদের সামনে। কার বাড়িতে গতকাল কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, কোন বাড়ির পোয়াতি গাইটি কী বাছুর প্রসব করেছে, কোন বাড়ির কোন্ মেয়েটি ভেতরে ভেতরে কার প্রতি আসক্ত, থেকে শুরু করে কোন গাঁয়ের কোন মেয়েটি দুটো মাথাওয়ালা বাচ্চা প্রসব করেছে, কোন্ গাঁয়ে ডাকাতি করতে এসে ডাকাতরা একটা ইয়াব্বড় সাইজের রামদা ফেলে গেছে,... এসব গুহ্য খবর সে যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে পরিবেশন করে যেত। শুনতে শুনতে আমরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলে উঠতাম, আকাশবাণী—সংক্ষিপ্ত, এখন খবর পড়ছেন গজানন ভট্ট..। দৈবাৎ সে-কথা ওর কানে গেলে আর রক্ষে থাকত না, যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ খবর পড়া থামিয়ে দিত গজানন। বলত, যাহ, তোদের পাশ আর কুনো কথা কইবোনি। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়া লাভ?

প্রাইমারি স্কুলে পাশ করবার পর গজাননও আমাদের সঙ্গে ভর্তি হল মেট্রোপল জুনিয়র স্কুলে। পড়াশোনায় তিলমাত্র মন ছিল না তার। সারাক্ষণ আড্ডা মারত চুটিয়ে, আর এর ওর পেছনে লাগত স্রেফ মজা করতে।

ক্লাস এইটে যখন পড়ছে, বাপ কামাখ্যা ভট্ট গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পড়াশোনা বন্ধ করে গজানন ফিরে আসে বাড়িতে। কিন্তু সংসারের কোনও কাজেই লাগত না সে। পাড়াময় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার একমাত্র কাজ। মাঝেমাঝে বেলদাবাজারে গিয়ে সিনেমা দেখে

আসত, আর ফিরে এসে সাঙ্গোপাঙ্গোদের কাছে রসিয়ে গল্প করত, কেমন করে নায়িকার শরীরটাকে নিয়ে যা খুশি করেছে হিরো। বলত, শালা দেখিয়া আয়, জীবন সার্থক হয়্যাবে।

সংসারের কেউ বেশি কিছু আশাও করত না ওর থেকে, তাকে মনেমনে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল সবাই। অবশ্য একটা কাজ তার নামে বরাদ্দ হয়েছিল। বাড়ির সবাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে গাঁয়ের বারোয়ারি শিব-ঠাকুরের পূজাটা করে আসত রোজ। সে পূজাটা না করলে যে ওটা গাঁয়ের অন্য কোনও ব্রাহ্মণ-পরিবার হাতিয়ে নেবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে, সেটা ওকে বোঝাতে পেরেছিল বাড়ির লোকজন। কিন্তু সংসারের হিতার্থে ওই কাজটা করে দিত বলে মনের মধ্যে গুমোরের অন্ত ছিল না তার। কথায় কথায় বাড়ির সবাইকে এই বলে শাসাত যে, ওর প্রতি কেউ কোনও বেগড়বাই করলে পুজো করা ছেড়েই দেবে সে। কোনও বিষয়ে তার সঙ্গে বাড়ির লোকের সামান্যতম মতান্তর হলেই সে শাসানির সুরে বলত, ঠিক আছে, পূজাটা এবার কে করে দেখি! আমি আর কাল থেকে পূজা কত্তে পারবোনি। ওই ভয়ে সংসারের কেউই ওকে বড়ো একটা ঘাঁটাত না, কেন কি, ওই পূজাটাতে লাভ ছিল খুব। সিধেপাতি দক্ষিণা মিলত আশাতীত। হয়ত-বা ওই কাজটুকু ওকে করাতে পারত না কেউই, যদি না প্রাণের বন্ধু ভণ্ডুল ওকে শলা দিত, বারোয়ারি পুজোটা ছাড়িস না, বরং নগদ দক্ষিণার থেকে কিছু কিছু সরাতে থাক।



আমার ওপর শিখাবউদির অখণ্ড প্রভাবের কথা বলছিলাম।

তার কারণটাও ব্যাখ্যা করেছি।

আসলে, আমাদের গাঁয়ের বউ হয়ে আসার দিন থেকেই এমন একটা আপোসহীন তেজ দেখেছি ওর মধ্যে, এমন সাবলীল স্পষ্ট ভাষণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন তাৎক্ষণিক জ্বলে ওঠা, দেখতে দেখতে ওর সম্পর্কে এমন একখানি ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছে মনের মধ্যে, এমন পাকা রঙ ধরে গিয়েছে সেই ছবিতে, বোধ করি সারা জীবনেও ঘসে ঘসে তুলে ফেলা যাবে না সে ছবি। শুধু প্রভাবই নয়, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতারও বুঝি অন্ত নেই। তখন মায়ের কারণে আমি সারাক্ষণ খুবই বিষণ্ণ থাকতাম। মাকে সবাই মিলে অপয়া বানিয়ে ফেলেছে চারপাশে। ওই সময়ে যে দু-চারজন আমাকে সান্ত্বনা দিত অহরহ, আর, মায়ের সম্পর্কে যা-সব রটনা তার তিলমাত্র বিশ্বাস করত না, শিখাবউদি তাদের মধ্যে একজন।

কথায় কথায় বলত আমাকে, আজকের দিনেও এসব বিশ্বাস করে মানুষে? আশ্চর্য! পল্টুদাকে একদিন ডেকে এনে হাতেনাতে দেখাতে হবে, নচেৎ সে বিশ্বাসই করবে না। তার তো ধারণা, এই বিজ্ঞানের যুগে এসব কুসংস্কার আর গাঁয়েগঞ্জেও নেই।

শুধু যে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে, ঠেস দিয়ে দিয়ে এইসব কথা বলত শিখাবউদি, তাই নয়, বেলদায় সিনেমা দেখতে বেরোবার সময়, কিংবা বাপের বাড়ি রওনা দেবার কালে, যেহেতু রাস্তাটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই গিয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়ত আমাদের উঠোনে। গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ত আমার মাকে, কই গো, মেজো-কাকী, কোথা গেলে? একটিবার মুখটা দেখাও, অপয়া মানুষের মুখটা দেখে রওনা দিই, পথের মধ্যে মরণ হোক আমার...।

গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল আমার বড়পিসির, তাও মুখে কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে শুধোয়, ক্যানে? মরবার অত সাধ ক্যানে?

জবাব দেবে কি, ততক্ষণে শিখাবউদি আমার মাকে খুঁজে বের করে ঢুপ করে গড় করে, উঠে দাঁড়িয়ে, ভালো করে দেখতে লেগেছে তার মুখ। বলে, মুখখানা ভালো করে দেখে বেরোলাম, পথে যদি না মরি, তাহলে ফিরে এসে তোমার কী করি, দ্যাখো।

এইভাবে বড়পিসিসহ পাড়ার তাবৎ অপয়া তত্ত্বের প্রবক্তাদের চরম অপ্রস্তুতে ফেলে এক ধরনের আনন্দ পেত শিখাবউদি। তাতে অন্যের কতটা লাভ-ক্ষতি হত জানিনা, কিন্তু মায়ের বুকের মধ্যেকার

জ্বলনটা কিঞ্চিৎ জুড়োত। আর, তার ফলেই শিখাবউদির প্রতি সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

শুধু আমার মায়ের বেলায় নয়, আমাদের গাঁয়ের প্রতিটি মেয়ের বেলায় শিখাবউদি এগিয়ে যেত সবার আগে। অনেক সময় নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়েও মোকাবিলা করত সমস্যার। অবশ্য এইসব ব্যাপারে বল্লভদার অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল ওর পেছনে। বল্লভদা বড়াই করে বলত, না করার কী আছে? এ-দেশেই তো মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বহ্নিকন্যারা জন্মেছিলেন। এইমতে বল্লভদা মাতঙ্গিনীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিত শিখাবউদিকে। শিখা বউদির পুরো নাম তো বহ্নিশিখা, তাই, তার ও ঐ মহীয়সীদের মধ্যে সাদৃশ্যটা বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশে মাতঙ্গিনীদের 'অগ্নিকন্যা' না বলে 'বহ্নিকন্যা' আখ্যায় ভূষিত করত, যাতে করে অন্যসব বহ্নিকন্যাদের সঙ্গে বহ্নিশিখাও সমান মহিমা পেয়ে যায়।

তখনো অবধি পল্টুদার সঙ্গে বল্লভদার ঘোরতর ইগোর লড়াইটা শুরু হয়নি।

আমাদের গাঁয়ের মেয়েদের জীবনটা ছিল সব অর্থেই এক-একটি বদ্ধ জলাশয়। শিখাবউদিই প্রথম সেই জলাশয়গুলিতে স্রোতের উন্মাদনা তৈরি করে। অন্তত্পক্ষে আমাদের পাড়ার উঠতি মেয়েদের মধ্যে ওকে ঘিরেই এক ধরনের চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শিখাবউদির দেখাদেখি তারা যে কেবল কুঁচি দিয়ে কাপড় পরে, মাথায় মন্দির-চুড়ো খোঁপা বাঁধে, কিংবা মুখে স্নো-পাউডার ঘসা শুরু করে, এমনকি, তাদের মধ্যে যে মাসে-দু-মাসে এক-আধবার বেলদা-বাজারে সিনেমা দেখতে যাওয়ার তাগিদ তৈরি হয় তাই নয়, তাদের হাঁটাচলা, কথা বলা, আচার-আচরণের মধ্যেও এমন একটা স্বচ্ছভাব আসে, দুনিয়াটাকে দেখবার চোখটাই এমন বদলে যেতে থাকে, যা দেখতে দেখতে প্রবীণ-প্রবীণাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। আর, তারপর তো ভীম-একাদশীর মেলা উপলক্ষ্যে শিখাবউদি ঘটিয়ে ফেলে এমন একটি কাণ্ড, যা দেখে সন্ধিপুরের মানুষ একেবারে থ হয়ে যায়।

প্রতি বছর ভীম-একাদশীতে মেলা বসত আমাদের গাঁয়ে। মাহিষ্যপাড়ার বিপিন ডাঙায় মেলাটা বসিয়েছিল বানেশ্বর বাগের ঠাকুর্দা বিপিন বাগ।

ভীম-ঠাকুর গরিবদের অনেক কাছাকাছির ঠাকুর। কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমই সবচেয়ে মাটির কাছাকাছি, সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল। রাজবংশে জন্মেও পাহাড়ি ট্রাইবালদের মেয়ে হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন। গদা, গাছ, এইসব লৌকিক অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতেন। এইসব কারণে তাঁর তেমন কোনও ইজ্জতও ছিল না রাজা রাজড়াদের, এমন কি ভাইদের কাছেও। কিন্তু আমাদের এলাকার গরিব গুরবোরা সবাই তাঁকে ভালোবাসত।

বিপিন বাগ মারা গেলেও ভীম-একাদশীর মেলাটা চলতে থাকে এবং ডাঙাটার নাম হয় বিপিনডাঙা। তবে সেই মেলার তেমন কোনও ইজ্জৎ ছিল না চারপাশের সম্পন্ন মানুষজনের কাছে। মুখুজ্যেরা টিটকিরি করে বলত, ভীম আবার ঠাকুর, চামচিকা ফের পাখি! ফলে, বহুদিন যাবৎ মুখুজ্যেদের নিজস্ব দুর্গাপূজাই ছিল এলাকার প্রধান খানদানি উৎসব।

সাতষট্টির পর ধীরেধীরে চাকাটা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে। গরিবদের সরকার কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরিবের ঠাকুর এবং সর্বসাধারণের মেলা হিসেবে ভীম একাদশীর মেলাকে তুলে ধরবার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় কমরেডদের মধ্যে।

মুখুজ্যেদের দুর্গাপূজার সঙ্গে বিপিনডাঙার ভীম-মেলার একটা গুণগত পার্থক্য ছিল। মুখুজ্যেদের দুর্গোৎসব ছিল একেবারেই ওদের পারিবারিক উৎসব। আনন্দ স্ফূর্তির অঢেল বন্দোবস্ত ছিল ওই উৎসবে, কিন্তু গরিব মানুষজনের বড়ো একটা প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। গেলেও খুব সসঙ্কোচে যেতে হত। সাতষট্টির পর ভীম একাদশীর মেলাটাকে কেন্দ্র করে নিজেদের একটা উৎসব পেল সন্ধিপুরের মানুষ। এবং মেলাটাকে কেন্দ্র করে হপ্তাকাল ধরে মেতে উঠত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, যে আনন্দের ছিটেফোঁটাও পায়নি ওরা 'বাবুর' বাড়িতে পূজা দেখতে গিয়ে।

প্রতি বছর ভীম-মেলাকে কেন্দ্র করে এলাকার সবশ্রেণীর ব্রাত্য মানুষ একেবারে লাগামহীন স্ফূর্তির

জোয়ারে ভেসে যেত। মেলাটা তা বলে গাঁয়ের সবাইয়ের কাছে সমান আনন্দের ছিল না। বরং কিছুকিছু বাড়ির বউদের কাছে ছিল নিদারুণ দুর্দশার উৎসব। কেন কি, ওই ক-দিন মেলার আশেপাশে বসে যেত একাধিক ভাটিখানা। ভাটিখানাগুলো খুব রমরমিয়ে চলত। পাড়ার অনেক লোকই সারা সন্ধে মদ গিলত সেখানে। মদে চুর হয়ে বাড়ি এসে নানা অজুহাতে বউগুলোকে পেটাত। কাজেই, ভীম একাদশীর মেলার ক-দিন হয়ে দাঁড়াত পাড়ার বহু বাড়ির বউদের মার খাওয়ার মরসুম।

দেখতে দেখতে শিখাবউদিই প্রথম সবাইকে নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। মেলার মধ্যেই একদিন মাতাল স্বামীদের হাতে মার-খাওয়া মেয়েগুলোকে জুটিয়ে নিয়ে চড়াও হয় ভাটিখানাগুলিতে। চিৎকার চেঁচামেচি করে ভাটিখানা ভেঙে, লোক জড়ো করে, হুলস্থূল বাধিয়ে ফেলে। একসঙ্গে এতগুলি মেয়ের একটা সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা সন্ধিপুর গাঁয়ে সেই প্রথম।

ওই নিয়ে মাতাল স্বামীরা যখন এককাট্টা হওয়ার তোড়জোড় করছে, তখনই শিখাবউদিকে সার্টিফিকেট দিয়ে বসল নন্দ-জেঠা, কিনা, একটা কাজের কাজ করেছে বল্লভের বউ, সামনের মরসুম থেকে মেলার আশেপাশে ভাটিখানা বসান বন্ধ করিয়া দিবা হউক।

মজার ব্যাপার হল যেসব বাড়ির বউয়েরা মার খাচ্ছিল মাতাল স্বামীদের হাতে, তাদের শাশুড়ি-ননদেরা কিন্তু বাঁকা চোখে দেখতে লাগল ব্যাপারটাকে, কিনা, এলেন আমাদিগের গুরুমা। সকলের চরিত্র সংশোধনের ঠিকা নিয়েছেন তিনি। বলে মেলা-পার্বণে মানুষ টুকচার ফূর্তি করবেনি?

তরণী সেনের মেয়ে গোপালি, পানিপারুলে বিয়ে হয়েছে তার, মেলা উপলক্ষ্যে বরকে নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে সে। তো, জামাই-বাবাজী শ্বশুরের গাঁয়ের মেলায় অমন জমজমাট ভাটিখানা পেয়ে আকণ্ঠ গিলেছিল ছোটো শালার পয়সায়, ফিরে এসে গোপালিকে বেধড়ক পিটিয়েছিল। তখনও অবধি গালের ফোলা দাগ মেলায়নি গোপালির, এর মধ্যেই শিখাবউদির নেতৃত্বে ভাটিখানা ভাঙবার কালে জামাই বাবাজীও অন্যদের সঙ্গে খেয়েছে উত্তম মধ্যম, আর, পরের দিন সকাল না হতেই তাই নিয়ে চিল চিৎকার জুড়েছে গোপালি, কিনা, কারও বাপের পয়সায় তো নয়, নিজের শালার পয়সায় খেয়েছে মদ, পিটিয়েছে নিজেরই বউকে, অন্যের গায়ে এত ফোস্কা পড়তিছে ক্যানে? সেই বলে না, আমার নিজের চরকা নাই, আমি ওই অন্যের চরকায় তেল দিই।

শিখাবউদি শুনে মুখ টিপে হাসে। পল্টুদা কি সাধে বলে, মানুষ হল মশার জাত। যার থেকে উপকার পায়, তাকেই হুলের জ্বালায় অস্থির করে তোলে।

কিন্তু যে যতই চেঁচাক না কেন, পরের বছর থেকে সত্যি সত্যি ভাটিখানা বসা বন্ধ হয়ে গেল ভীম মেলার আশেপাশে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা বুঝি শিখাবউদির মজ্জার সঙ্গে মিশে ছিল। আর, সব কিসিমের প্রতিবাদের মধ্যেই মিশে থাকত তার পল্টুদার কোনও-না-কোনও ফতোয়া। কিনা, পল্টুদা এটা বলেছে, তাই ওই কাজটা করা। এর জন্য শিখাবউদির সুনাম যত বেড়েছে, অপযশ হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি। কেন কি, প্রতিবাদের ফলটা হজম করে ফেলেই মানুষ নিন্দা জুড়ত আড়ালে, কিনা, চারপাশে এতএত পুরুষ মানুষ থাকতে শিখাবউদির এমন ঝাঁপিয়ে পড়াটা এক ধরনের শহুরে পাকামো।

শিখাবউদির সবচেয়ে নিন্দা-সমালোচনা হয়েছিল জবার বেলায়।

উনিশশো তিপান্ন সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ হলেও, আরও অনেকদিন অবধি নদীটা মুখুজ্যা আর চক্রবর্তীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত।

মানুষজন তেমন করে জানতেই পারেনি যে, নদীটা কবে কবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। শুধু নদীটাই নয়, জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পরও সরকারে খাস হওয়ার যোগ্য প্রায় সব সম্পত্তিই জমিদারদের খাস-দখলে ছিল আরও অনেক কাল। বাস্তবিক পক্ষে, সাতষট্টির আগে অবধি আইনটার ছিল আঁতুড় ঘরের অবস্থা। শোনা যায়, বিধান রায়

নাকি তাঁর ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী জমিদার বিমল মুখুজ্যাকে ডেকে একান্তে বলে দিয়েছিলেন,—বিমল, থোড়া সামাল্‌কে। এতদিনের জমিদারদের একদিনে ফতুর করে দিলে ওরা সামলে উঠতে পারবে না। একটু সইয়ে সইয়ে চালু কর আইনটা। এখন বছর-কতক পাগ-পেটি বাঁধা চলুক, বিটার্ন-ফিটার্ন জমা পড়ুক, তদ্দিনে ওরাও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠুক।

ষাটের মাঝামাঝি থেকে বিধান রায়ের নামে কথাটা খুব চালু ছিল গাঁয়েগঞ্জে। বামপন্থীদের সভাগুলোতে প্রায়ই মাইক হাঁকড়ে বলা হত কথাটা। পাবলিক খুব খেত। কিনা, সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়। চোরকে বল চুরি করতে, গেরস্থকে বল সজাগ থাকতে। এ হইল সেই বিত্তান্ত। জমিদারি-উচ্ছেদ আইনটা পাশ করিয়া খুব বাহবা নিলে দুনিয়ার কাছে, আবার দপ্তরকে টিপিয়া দিলে। কিনা, আইনটা এক্ষুনি প্রয়োগ করবার দরকার নাই, ধীরে চল। ড্যামনামিটা দ্যাখ তাইলে!

ফলে, যমুনা নদীর দখল মুখুজ্যাদেরই ছিল। সাতষট্টিতেই হরেকৃষ্ণ কোঙারের হুঙ্কারে যখন সিলিং বহির্ভূত বেনামী জমির দখল একটু একটু করে ছাড়তে লাগল জমিদার জোতদারের দল, তখনই দেশের অন্যসব বেনামী জমির সঙ্গে যমুনা নদীও সরকারে খাস হয়ে গেল। আর, খবরটা পাওয়া মাত্রই নন্দ মিস্ত্রি ঘটা করে ঢোল-সহরত করে জানিয়ে দিল মাছধরা-উৎসবের দিনক্ষণ। বাস্তবিক, কয়েক শতাব্দী বাদে সেই প্রথম যমুনা নদী, ওলদাচণ্ডী-পারিজাতপুরের জঙ্গল এবং রাংটিয়ার পাথরখাদান জাতীয় প্রকৃতিদত্ত সম্পদগুলিকে নিজেদের সার্বজনীন সম্পত্তি বলে ভাবতে পারল সন্ধিপুর, মান্দার, মোমিনপুর, বেলমার মানুষ। সেই প্রথম কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই নদীতে মাটি নিতে কিংবা মাছ ধরতে নামল, কাঠকুটো, শালের পাতা, ফল-পাকুড়ের জন্য বিনা শঙ্কায় জঙ্গলে সেঁধাল এলাকার মানুষজন। আর, তারপরই তো একদিন নন্দ মিস্ত্রী সারা এলাকায় ঢোল-সহরত করে জানিয়ে দিল এমন এক খবর, যা শুনে সারা এলাকা একেবারে রোমাঞ্চিত, কিনা, 'এবারের চৈত্রে যমী খাল গুলিয়ে মাছ ধরবার উৎসবে আপামর জনসাধারণ সবাই অংশগ্রহণ করিতে পারিবেক। যেহেতু যমী খাল সরকারি সম্পত্তি, সেহেতু তাহার ওপর জনগণের সমান অধিকার বর্তাইবেক।'

এমন প্রাণমন পাগল করা সংবাদ কি আর চাপা থাকে? দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, পাখির মতো হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে। কিনা, চলতি বছরে চারপাশের গাঁয়ের আপামর মানুষ খালের জলে নাববার অধিকার পেতে চলেছে, আর তাই নিয়ে হপ্তাকাল আগে থেকে গরিব গুরবোদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! সে কী রোমাঞ্চ আবাল-বৃদ্ধ বণিতার শরীরে! ফলে, নির্দিষ্ট দিনে কতদূর থেকে যে মানুষজন কাকের মুখে খবর পেয়ে মাছ-ধরা উৎসবে যোগ দিতে চলে আসে, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। তাই নিয়ে কিঞ্চিৎ তিক্ততাও হয়েছিল। কেন কি, নদীটা হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের, আর মাছ ধরতে লোক এসেছে বিলাত থিকে! এমন করলে তো প্রত্যেকের ভাগে একটা করিয়া মোরলা জুটবে কিনা সন্দেহ।

সে যাই হোক, ওই বছর গ্রীষ্মের মরসুমে নন্দ মিস্ত্রীর নেতৃত্বে মৎসশিকার উৎসবের মাধ্যমে নদীটার দখল পেল সর্বসাধারণ। সন্ধিপুর এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলির ইতিহাসে সেটা ছিল এক উল্লেখযোগ্য দিন। কেন কী, ওই ঘটনার পর থেকেই যমুনা সমস্ত মানুষের জন্য বইতে লাগল।



—একদিন নাইট-শো সিনেমা দেখে ফিরছি—।

পল্টুদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটা একান্ত-সখীদের কাছে বলতে গিয়ে এইভাবেই শুরু করেছিল শিখারউদি।

—রাত তখন আন্দাজ বারোটা, গলিগুলো শুনশান, গা-ছমছম করছে আমার, পা চালিয়ে হাঁটছি, এমনি সময়ে দেখি, চারু দাসের দেশি মদের ঠেকের সামনে চটের বস্তা বিছিয়ে তিনপাত্তি খেলছে চার-পাঁচটা ছোকরা। আচমকা আমাকে দেখে সবগুলো চোখ চকচক করে উঠল একসাথে! আমার তখন সসেমিরা অবস্থা। পিছিয়ে যাওয়ারও উপায় নাই। এগিয়ে যেতেও পা সরে না। ওদের

মধ্যে সবচেয়ে ষণ্ডা লোকটা ফিক করে হেসে বলল, দাঁড়িয়ে কেন খুকুমণি, এগিয়ে এসো, আমরা লোক খারাপ নই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। দেখাদেখি অন্যগুলোও। তখন আমি ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লেগেছি। লোকগুলো ধীরপায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

—সে কী! ছুটিয়া পালালেনি কেন? ওই জায়গায় আর দাঁড়িয়া থাকে কেউ! একান্ত-সখীর দল শিহরিত।

—ছুটে পালাবো কী-রে, তখন বলে আমার পা-দুটো আটকে গিয়েছে মাটির সঙ্গে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

—তারপর? সখীর দল নড়েচড়ে বসে।

—লোকগুলো আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়াল। ওদের মুখ থেকে বেরোচ্ছিল ভকভকিয়ে মদের গন্ধ। ওই অবস্থায় কেউ আমার গালে আঙুল ছোঁয়ায়, কেউ বা বিনুনিতে আলতো টান মারে, বিড়বিড়িয়ে জানতে চায় আমার পরিচয়, এবং এত রাতে এমন আবছা গলিপথে হাঁটবার সঙ্গত কারণ। বলে, এত রাতে কোথায় চলেছ ধনী, কার কুঞ্জে নিশি উজাগরের পোগ্‌গ্রাম আজ? ততক্ষণে বাকিগুলোর একটা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে আমায়। জড়ানো গলায় বলেছে, আমাদের কুঞ্জে চল না ধনী, আমরা ভালো লোক গো। বলতে বলতে লোকটা আমাকে ক্রমশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে লাগল।

—চ্যাঁচালে না কেন? কী বোকা!

—চ্যাঁচাবো কি রে, আমার গলায় তখন আওয়াজই বেরোচ্ছে না। ছেড়ে দিন, কথাটা অবধি উচ্চারণ করতে পারছিনে।

—বুঝেছি, তারপর কী হল?

—তারপর কী হল জানিস, লোকটা যখন আমাকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে তার জোঁকের মতো ঠোঁটদুটোকে আমার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে, তখনই আমার শরীরে তার হাতের বাঁধন একটু একটু করে আলগা হয়ে এল, এবং একসময় আমাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে লোকটা ধপ করে সটান চিত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। আর, তখনই আমি তার পেছনের মানুসটাকে পুরোপুরি দেখতে পেলাম।

সঙ্গীকে এমন পড়ে থাকতে দেখে বাকিগুলো মোষের মতো খেপে উঠল। সবাই একসঙ্গে চারপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার ওপর। পরমুহূর্তে চারজনাই ছিটকে গেল চারদিকে। এবার শুরু হল পিটুনির পালা,। উহ, কী পিটুনি, ঢিসুম ঢিসুম..., তোরা যদি দেখতিস্!

—তারপর?

—গুণ্ডাগুলো তো পালিয়ে বাঁচল, মানুষটা আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকাল। তারপর মৃদু গলায় প্রায় আদেশের সুরে বলল, এত রাতে যেন আর কোনওদিন পথ হাঁটতে না দেখি। যেখানেই যাও, রাত ন'টার মধ্যে ঘরে ফিরে আসা চাই। চল, একটুখানি এগিয়ে দিই তোমায়।

বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিখাবউদির সারামুখ। দু-চোখে ঝিলিক তুলে বলে, মানুষটা কে ছিল, বলতে পারিস?

সখীর দল বোকার মতো দু'পাশে মাথা নাড়ায়।

—পল্টুদা। শিখাবউদি অনির্বচনীয় হাসে,—সেই প্রথম আলাপ পল্টুদার সঙ্গে। সেই প্রথম দেখলাম। অথচ ভালো করে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর আবিষ্কার করলাম, পল্টুদা আমাকে অনেক দিন থেকেই চেনে। শুধু চেনেই না, আমাকে আড়াল থেকে নজরে রেখেছে সে, পাহারা দিয়ে চলেছে। কেন কি, সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিনেই বলে উঠল, সোমত্ত মেয়েদের নাইট শো-তে সিনেমা যাওয়া কেন? হরি সিনেমা নাইট-শোতে নরক হয়ে থাকে। আর যেন কখ্খনো না দেখি।

এসব কথা পাঁচকান হতে সময় লাগে না। ফলে, নানা পথ ধরে আমরা ছোটোর দলও জেনে ফেলি এক সময়।

পরবর্তীকালেও দেখেছি, নাইট-শোতে সিনেমা দেখতে যেতে কিছুতেই রাজি হয় না শিখাবউদি।

এমন কি বলরভদার সঙ্গেও নয়। গ্রামের মেলা দেখতে গেলেও রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবেই, কেন কি, পল্টুদার বারণ রয়েছে। যে বয়েসে যে পরিস্থিতিতে বারণ করুক না কেন, বারণ বারণই।

সুনীলদার বোন, আমরা তাকে জবাদি বলে ডাকি, তাকে দেখতে এল পাত্রপক্ষ।

খুব বড়ো ঘর থেকে এসেছিল প্রস্তাবটা। সুনীলদাদের তুলনায় আকাশের চাঁদ বলা চলে। তবে ঘটক স্বয়ং রাসবিহারী জেঠা, সুনীলদাদের মনে তাই ভরসা ছিল খুব। কেন কি, রাসবিহারী জেঠার মতো ঘটক তখন আমাদের এলাকায় দুর্লভ ছিল। একেবারে অসম্ভব কেসগুলোকেও অবিশ্বাস্য দক্ষতায়, কেবল মুখের কথা আর সূক্ষ্ম বুদ্ধির কারসাজিতে পাকিয়ে ফেলত। এক্ষেত্রেও যেহেতু সে-ই নেমেছে আসরে, সুনীলদারা প্রায় পনের আনা নিশ্চিত ছিল। রাসবিহারী জেঠা বলেছে, ভালো করিয়া খাতির-যতনটা কর দেখি তুমরা, বাকি কাজ আমার।

তো, সুনীলদা আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি কিছুই। এবং কনে সাজাতে, শহরিয়া চালে রান্নাবান্না করবার জন্য এবং শহরিয়া ঠাটবাট দিয়ে পাত্রপক্ষের ওপর মোহজাল বিস্তার করবার জন্য খুবই স্বাভাবিকভাবেই ডাক পড়েছিল শিখাবউদির।

সেদিন সব পরীক্ষায় অবলীলায় পাশ করে গিয়েছিল শিখাবউদি। কিন্তু বাদ সাধল কনে দেখানোর বেলায়। প্রবীণাদের ভাষায়, এক ঘটি দুধে এক ফোঁটা গোচনা।

সাজিয়ে গুজিয়ে জবাদিকে পাত্রপক্ষের সামনে পেশ করেছিল শিখাবউদি। তার হাতের গুণে পাত্র বাবাজী জবাদির থেকে চোখ সরাতে পারেনি বহুক্ষণ। পাত্রপক্ষের চোখ মুখের ভাষা পড়তে পড়তে রাসবিহারী-জেঠার অভিজ্ঞ চোখ বলে দিয়েছিল, জবাদিকে খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের।

কনে দেখা শেষ হলে পর চিরকালের গ্রামীণ রীতি অনুসারে পাত্রের বাবা জবাদির দিকে এগিয়ে দিল মুখ-দেখানি বাবদ কিছু টাকা। কিন্তু সে টাকা জবাদির হাত অবধি পৌঁছবার আগেই আচমকা শিখাবউদি বলে উঠল, এ কী! টাকা দিচ্ছেন কেন? কী ভেবেছেন আমাদের মেয়েকে? আমাদের মেয়ে শরীর দেখানোর জন্য টাকা নেয় না। আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন।

আচমকা এমন কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। হকচকিয়ে যায় জবাদির বাবা। অপমানে লাল হয়ে ওঠে পাত্রের বাপের মুখ। কিন্তু উপস্থিত কথা না বাড়িয়ে বিদায় নেয় ওরা। এবং পরের দিনই রাসবিহারী জেঠা মারফৎ জানিয়ে দেয়, এমন অভদ্র পরিবারে ছেলের বিয়ে দেবে না ওরা।

রাসবিহারী জেঠার হা—হুতাশ আর ফুরোতে চায় না কিছুতেই। কিনা, একেবারে তীরে আইসিয়া তরীখান ডুবিয়ালো হে! এমন পাত্র লাখে একটা মেলে।

এমন লাখ টাকা মূল্যের পাত্রটি বেমক্কা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সবাইয়ের সব রাগ গিয়ে পড়ে শিখাবউদির ওপর। সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় চারপাশে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত থাকে না। প্রবীণারা সবাই একবাক্যে রায় দেয়, স্রেফ বজ্জাতি করেই বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে শিখাবউদি। কী দরকার ছিল পাকামো করে ওইসব বলবার? যারা টাকা দিচ্ছে, যাদের মেয়েকে দিচ্ছে, তারা বুঝবে। তোর কি? আদার ব্যাপারি তুই, জাহাজের খোঁজে তোর দরকারটা কি! রাঁধতে ডেকেছে, রাঁধবি, পরিবেশন করবি, মেয়েকে একটুখানি সাজিয়ে গুজিয়ে দিবি, ফুরিয়া গেল কথা। প্রথমে জবাদির বাবা-মা বলল, তারপর ভাই-বোনেরা, তারপর জ্ঞাতি-গুষ্টি, আত্মীয়-কুটুম, তারপর পাড়া-পড়শিরা, সবশেষে স্বয়ং জবাদি যখন মুখ হাঁড়ি করে, দু-চোখে রোষ নিয়ে তাকাল, এমন সোনার পাত্রটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার যাবতীয় দোষ চাপাল শিখাবউদির ওপর, আর কান্না সামলাতে পারল না শিখাবউদি কিছুতেই। তাও সে জবাব দিল না কারোর কোনও কথার। মুখে কুলুপ এঁটে রইল ঠায়। কিন্তু আমরা সবাই লক্ষ করলাম, মুখখানি তার শুকনো লতার মতো ঝিমিয়ে রইল সারাক্ষণ।

হপ্তাটাক বাদে, প্রবল ঝড়বৃষ্টিটা সামান্য থামলে পর, শিখাবউদি আবার আগের মতো যেই-কে-সেই। কলকলাতে থাকে সারাক্ষণ। কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। আর, সক্কাইকে শুনিয়ে

শুনিয়ে বলতে থাকে, হুহ্, নিয়মের কী ছিরি! পল্টুদার কানে গেলে হেসে কুটিপাটি হত। বলত, এরা এখনও একশো বছর পিছিয়ে আছে।

আমরা, যারা শিখাবউদিকে ভালোবাসি, মৃদু গলায় তাকে ভর্ৎসনা করি। বলি, পল্টুদা একদম ঠিক, কিন্তু তুমার কী দরকার ছিল কথাটা অমন করিয়া বলবার?

শোনামাত্র ফুঁসে উঠত শিখাবউদি, কেন বলব না শুনি? পষ্ট কথার কষ্ট কী? মেয়েরা কী এমনই ফেলনা যে, শরীর দেখিয়ে পয়সা নেবে! মান-মর্যাদা বলে কি কিছুই থাকতে নেই তাদের! পল্টুদা বলে—।



একটু বড়ো হলে পর আমরা শিখাবউদির মুখ থেকে পল্টুদা সম্পর্কে আরও অনেক গল্প শুনেছি।

শিখাবউদির ওই ব্যাপারে কোনও আড়ষ্টতা ছিল না। একবার বায়না ধরলেই, শুনবি? বলেই অবলীলাক্রমে শুরু করে দিত পল্টুদাকে নিয়ে এক জমজমাট কাহিনি। তার সাহস নিয়ে, রূপ নিয়ে, উদারতা নিয়ে, কোনওদিন বা শিখাবউদির প্রতি তার সীমাহীন দুর্বলতা নিয়ে। সেসব গল্প বলতে বলতে শিখাবউদি যেন একটু একটু করে দূর আকাশে চলে যেত। দূর আকাশের পাখি হয়ে যেত সে।

সব মিলিয়ে শিখাবউদির পল্টুদা আমাদের কাছে চিরকাল এক অচিনপুরীর মানুষ।

কিশোর বয়েসে শিখাবউদির ওই প্রেমিকটিকে নিয়ে আমাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এবং তাকে নিয়ে দীর্ঘকাল এমনই ঢাক পিটিয়েছে শিখাবউদি, বল্লভদা কেন, যেকোনো স্বামীই তিতিবিরক্ত হবে মনে মনে।

যখন হাইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি, নাকের তলায় পাতলা গোঁফের রেখা সবেমাত্র মুখ দেখাচ্ছে, ততদিনে শিখাবউদির সঙ্গে অনেক সচ্ছন্দ আমরা, মাঝেমাঝেই শিখাবউদিকে একান্তে ধমক দিতাম, কী দরকার তোমার, পল্টুদাকে নিয়ে এমন সাতকাহন বলে বেড়ানোর?

—কেন? তাতে কী হয়েছে? শিখাবউদি প্রায় পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে তাকায় আমার দিকে।

এমন সাবলীল সেই দৃষ্টি, আমি কেমন জানি গুটিয়ে নিই নিজেকে। আমতা আমতা করে বলি, না, মানে, সব মানুষের মন তো একরকম নয়, কে কী ভাবতিছে! তাছাড়া, এ তো তোমাদের শহর এলাকা নয়, গ্রামের মানুষের এমন কথা শোনার অভ্যেস নেই।

—কেমন কথা শোনার অভ্যেস নেই? শিখাবউদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বলি, এই যে, একজনের বিয়ে করা বউ হইয়াও তুমি দিনরাত অন্য এক পুরুষের কথা সাতকাহন করিয়া বলতিছ, এমন করিয়া বল, যেন তার প্রতি একেবারে মজিয়া আছ তুমি। এসব শুনতে শুনতে সব্বাই তোমাকে ভুল বুঝে।

বলতে বলতে আমি গলায় সামান্য আপোস ফোটাই। বলি, দ্যাখো, বিয়ের আগে তুমি কার প্রতি আসক্ত ছিলে, কিংবা কে তোমার প্রতি কতখানি আসক্ত ছিল, তার তত্ত্বতালাস নিতে কেউ যাচ্ছেনি, সেসব তোমার নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু তার সঙ্গে যখন তোমার বিয়েটা হয়ইনি, তখন কী দরকার সারাক্ষণ সেসব কথা উত্থাপন করার? শুধুমুদু চুলকিয়া ঘা করিয়া লাভ কি? বল্লভদা কিন্তু তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুবই ভুল বুঝতিছে।

আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শিখাবউদি। বিস্ময় ঝরে পড়ছিল তার দৃষ্টিতে। এক সময় চোখ কপালে তুলে বলে, বাহ, তুই তো আমার জ্যেঠামশাই রে! কেমন মুরুব্বির মতো উপদেশ দিচ্ছিস! শোন, যার যা গুণ তা আমাকে বলতেই হবে। তার জন্য কে কী মনে করল, তা নিয়ে আমি ভাবি না। পল্টুদা বলে—।

শিখাবউদিকে আমি কোনওমতেই নিরস্ত করতে পারিনি। ওই বয়েসে এর চেয়ে বেশি জোর খাটানো

আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তখনও সমাজ-সংসার সম্পর্কে তেমন কোনও বাস্তব ধারণা আমার হয়নি বটে, তবে এটা ঠিকই বুঝেছিলাম, ওই পল্টুদাকে নিয়ে একদিন বল্লভদা আর শিখাবউদির সংসারে তুমুল ঝড় উঠবে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, শিখাবউদির পল্টুদাটিকে একটিবার সামনে পেলে খুব ভালো হত। তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেওয়া যেত, কিশোরী একটি মনে এমন ঘোরতর তুফান তুলে শেষ অবধি এভাবে কেটে পড়াটা তার একেবারেই উচিৎ হয়নি। তাকে জানিয়ে দেওয়া যেত, কেবল তার ছবিটিকে বুকের মধ্যে বাঁধিয়ে রাখতে গিয়ে শিখাবউদির তিলতিল গড়ে তোলা সংসারের ছবিটাই একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

শিখাবউদির রহস্যময়তা নিয়ে আমার মনের যাবতীয় মুগ্ধতা, তা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল শিখাবউদি স্বয়ং।

নিজের চারপাশে পল্টুদা নামক এক আরো রহস্যময় চরিত্রকে সদা-সর্বদা জড়িয়ে রাখত সে, যাকে বস্তুতপক্ষে ধরা যায় না, ছোঁয়া চলে না, কিন্তু ধরতে, ছুঁতে খুব সাধ জাগে মনে।

ওর সেই পল্টুদাকে কেন্দ্র করেই যে শিখাবউদির জীবনে নেমে আসবে এমন ঘোর বিপর্যয়, শিখাবউদি কি তা আগাম আন্দাজ করতে পারেনি? পারেনি নিশ্চয়ই, নইলে কি আর নিজের প্রেমিকের কথা এমন সাত-কাহন করে, ঢাকঢোল পিটিয়ে শোনাত সবাইকে! তাই, সত্যিসত্যি একদিন ওই পল্টুদাকে কেন্দ্র করে যখন ঝড় উঠল শিখাবউদির সংসারে, সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল বোধ করি শিখাবউদিই।

বল্লভদাকে তাবলে সেজন্য তো দোষ দেওয়া চলে না। পাড়াপড়শি, বিশেষ করে বউদি সম্পর্কের মেয়েরা তো সারাক্ষণ ওকে ওই নিয়ে বিঁধতো, কিনা, খুব তো বউকে নিয়ে গদগদ, ওর ওই পল্টুদাটির খোঁজ খবর নাও। কে সে, কোথা থাকে, কী করে, অন্ধিসন্ধি নাও সেসবের। নচেৎ কোনোদিন দেখবে, পুরো সংসারটি (তুমার) হাতিতে খাওয়া কোৎ বেলের পারা। বাইরের দিকে সবকিছো ঠিকঠাক আছে, ভিতরটি একেরে ফোঁপরা। এমন কি বউটিও চোখের সুমুখে আছে, কিন্তু ভিতরে নাই।

পাড়াপড়শি, কিংবা সমবয়সিদের কথা বাদ দিলেও, বল্লভদার নিজের মনের মধ্যেও হয়ত বা ওদ্দিনে তুমুল তোলপাড় উঠেছে। প্রশ্নগুলো তাকেও হয়ত বা ভেতরে ভেতরে চারলাতে শুরু করেছে। আমরা কেবল বাইরের থেকে লক্ষ করছিলাম, বেশ কিছুদিন ধরে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল বল্লভদা। সেই চিরকেলে হই-হুল্লোড়বাজ মানুষটি হারিয়ে যাচ্ছিল তিলতিল। মাঝেমধ্যেই শিখাবউদির সঙ্গে ঝগড়া বাধছিল তার। কারণে অকারণে শিখাবউদিকে হেনস্থা করছিল সে।

একদিন সরাসরি শুধিয়ে বসল, ঠিকঠিক বল দেখি, পল্টুটি কে? তোমার সঙ্গে তার বাস্তবিক কী সম্পর্ক?

প্রথমে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল শিখাবউদি। পরক্ষণেই গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, পল্টুদা কে, তা জেনে তোমার কী হবে?

—বলই না, আমার জানা দরকার।

—কেন? দু'চোখ ছোটো হয়ে আসে শিখাবউদির, কী হবে জেনে?

—আশ্চর্য! আমার বিয়ে করা স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আমার জানার কোনও অধিকার নেই?

একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল শিখাবউদি। সাপিনীর গলায় বলেছিল, পল্টুদা যেই হোক, একটা কথা শুনে রাখো, তুমি তার নখের যুগ্যি নও।

কথাগুলো নাকি এমন অবলীলায় বলেছিল শিখাবউদি, শুনতে শুনতে থ' হয়ে গিয়েছিল বল্লভদা।

তারপর থেকে বল্লভদা যেন গুম মেরে গেল।

তারপর , আমরা একটু একটু করে লক্ষ করলাম, ' প্রমোশন হওয়ায় কাজের চাপ বেড়েছে, সঙ্গে

হয়ে যায় ফাইল গোটাতে, সন্ধের পরেও ডাকাডাকি করেন সাহেব, পথঘাট এতখানি নিরপদ নয় যে প্রতিদিন রাতের বেলায় সাইকেল চালিয়ে ফেরা যায় ঘরে, কবে কী ঘটে যায়',...এইসব যুক্তি দেখিয়ে বল্লভদা একটা ঘর ভাড়া নিল বেলদাবাজারে। সপ্তাহে দু-এক দিন থেকে যাচ্ছিল ঐ ভাড়া ঘরে। সেটাই ক্রমশ দু-দিন থেকে চার-দিন হল, অবশেষে পুরো সপ্তাহটাই বেলদাবাজারে থেকে যেতে লাগল সে। কেবল সপ্তাহান্তে বাড়ি আসত। সেই বাড়ি আসাটাও কমতে লাগল ক্রমশ।

আমরা তখন বেশ বড়ো হয়েছি। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি। হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরলেই শিখাবউদির সঙ্গে দেখা হত। তখনই লক্ষ করতাম, শিখাবউদির দু-চোখে কালি জমছে নিঃশব্দে। তার শরীর থেকে সেই সারাক্ষণের উচ্ছলতাটুকু বুঝি নিঃশব্দে শুয়ে নিচ্ছিল কেউ।

একদিন, সেটা ছিল রোববার, বল্লভদা প্রায় দু'হপ্তা বাদে বাড়ি ফিরেছিল, আমরাও ফিরেছিলাম হোস্টেল থেকে, বিকেল নাগাদ আমি আর কল্পনাথ গেলাম শিখাবউদির সঙ্গে দেখা করতে।

উঠোনে পা দিয়েই বুঝলাম, সারা বাড়িটা কেমন জানি থমথম করছে। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কান্নাভেজা শিখাবউদির গলার আওয়াজ, এবং তৎসহ বল্লভদার চাপা গলার হুঙ্কার। কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু বারবার পল্টুদার নামটা উচ্চারণ করছিল বল্লভদা।

এক সময় ঘরের ভেতর থেকে হনহনিয়ে বেরিয়ে এল বল্লভদা। জোরে জোরে পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

সাত-পাঁচ ভেবে আমরা আর দাঁড়ালাম না। স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, পল্টুদাকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠেছে বল্লভদার সংসারে। শিখাবউদির সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলাম।

ওই ঘটনার পর দিনকয় একেবারে গুম মেরে রইল শিখাবউদি।

তারপর, ধীরেধীরে শিখাবউদি যখন স্বাভাবিক হয়ে এল আবার, একান্ত সহচরীরা যখন ঝগড়ার মর্মার্থ জানতে চাইল, শিখাবউদি খুব স্বাভাবিক, নির্বিকার গলায় জবাব দেয়, বাদ দে তো, পুরুষমানুষ চিরকালই মেয়েদের কাচের খেলনা ভাবে, কিনা, এই বুঝি ভেঙে গেল!

শুনে আমার বড়োপিসি ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য করে, বোঝা গেছে, ভারী ভাবী কথা বলিয়া আর সাধু সাজতে হবেনি। সেই বলে না, চোর-ছিনার মুখে ডাঁট/কথা কয় আঁটআঁট।

বড়োপিসির মতো অতটা না হলেও ওই বয়েসে আমারও একটু একটু ক্ষোভ জমছিল শিখাবউদির প্রতি, কেন কি, পল্টুদা নামক লোকটির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তো ছিলই তার, তবে কেন ওকেই বিয়ে করল না শিখাবউদি? কেনই বা সে তবে বল্লভদার ঘরনি হয়ে এল! পুরুষ-মানুষ হয়ে বল্লভদাই বা এটা মেনে নেয় কেমন করে? তারও তো রক্তমাংসের শরীর।

কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এত কথা বলা, সেই শিখাবউদি তো এ ব্যাপারে পুরোপুরি নির্বিকার, এবং বল্লভদাও একটু একটু করে শিখাবউদিব নাগালের পুরোপুবি বাইরে।

ততদিনে বাবুন এসে গেছে শিখাবউদির কোলে।

তখন আমি ল'কলেজে পড়ি। পাশাপাশি জয়াকে টুইশনি পড়াই। পড়াতে পড়াতে তাব সঙ্গে প্রেমও করছি চুটিয়ে।

শিখাবউদি মাঝেমাঝেই আমাকে শুধোয়, হ্যাঁ রে, শহরে থাকিস, কলেজে পড়িস, কারোর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করছিস না?

তখন প্রেম করাটা এতখানি ডাল-ভাত ছিল না, খুবই সঙ্গোপনে করতে হত তা, কাক-পক্ষীর নজর এড়িয়ে। শিখাবউদির কথায় আমি লজ্জায় লাল, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করি।

শিখাবউদি তাই দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, সে কি রে! ষোল বছর পেরিয়ে গিয়েছিস, বউদি বলে ডাকিস, প্রেম করিস কিনা বলতে এত লজ্জা? এসব কথা তো বউদিদের কাছেই বলতে হয়।

একদিন জেরার মুখে বললাম জযাব কথা। শুনে কী খুশি শিখাবউদি! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথাই না শুধোল আমাদের প্রেম নিয়ে।

এক সময় খুব ফিসফাস করে শুধোল, চুমু খাস জয়াকে?

আমি তো লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই প্রায়।

তাই দেখে শিখাবউদি বুঝি ঈষৎ বিরক্ত। বলে, ছেলেদের অত লজ্জা আমার ভাল্লাগে না। পল্টুদা বলত, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এ-তিন থাকতে প্রেম নয়। পল্টুদার অত ঢাকঢাক, গুড়গুড় ছিল না তোর মতো।

আচমকা খুব সাহসী হয়ে উঠি আমি। শিখাবউদিকে শুধিয়ে বসি, পল্টুদা তোমাকে চুমু খেত?

—এই তো মুখে কথা ফুটেছে! শিখাবউদির চোখের তারায় কৌতুক। একটুখানি ঘন হয়ে আসে আমার দিকে। বলে, তার চুমুর স্বাদ, এই দ্যাখ, আমার এইখানে এখনো অবধি লেগে রয়েছে।

বলতে বলতে শিখাবউদি তার ঠোঁটের ওপর আলতো তর্জনী ছোঁয়ায়।



আমাদের গণ্ডগ্রামে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর নতুন চেতনা-প্রবাহ সে-ই আমদানি করেছে বলে চিরকালই দাবি করত গজানন। কেন কি, সে-ই আমাদের গাঁয়ে প্রথম কাঁধে-ঝুলিয়ে-ঘোরা ট্রানজিস্টার এনেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে ও-ই আমদানি করেছিল হাতে বাঁধা ঘড়ি, বিড়ি ধরাতে আগুন জ্বালাবার টেপা কল, সস্তা-মার্কা সিগারেট, টর্চ-লাইট এবং সাইকেল। সাইকেল আর ঘড়ি পেয়েছিল বিয়েতে। গ্রামে নতুন নতুন ভাবনারও আমদানি নাকি সে-ই করেছে। গান্ধীজী, নেতাজী, জহরলাল কিংবা দেশবন্ধুর মাপের নেতাদের প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে ছিল। তাঁদের সম্পর্কে এমন সব গুহ্য খবর তার জানা ছিল, যা ওইসব নেতারাও স্বয়ং জানতেন কিনা সন্দেহ। শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরের জেলে মেরে ফেলা হল, কেন কী, তিনি বেঁচে থাকলে জহরলালকে আর প্রধানমন্ত্রী থাকতে হত না। ওকে হটিয়ে খোদ শ্যামাপ্রসাদই বসতেন গদিতে। তো, একজন বাঙালিকে তো আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া যায় না। বাঙালিদের প্রতি তো ওদের কম রাগ ছিল না। নইলে নেতাজী দস্তুরমতো ভোটে জিতে আসার পর স্বয়ং গান্ধীজী বলতে পারতেন এমন কথাটা, কিনা, সীতারামইয়ার পরাজয়, আমারই পরাজয়! নইলে, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি গেলেন জাপানে, আচমকা তিনি মারা গেলেন কীভাবে? মাংসের হাড় গলায় আটকে গিয়ে মরে গেলেন, এটা বিশ্বাস কর তুমরা? অত সোজা? মাংস আমরা খাই না? আসলে, ওই যে, সুব্রত ছিলেন বাঙালি। ভাব দেখি একবার, দেশের সব জাতের লোকের তরে পৃথক রেজিমেন্ট আছে মিলিটারিতে, বেঙ্গল-রেজিমেন্ট নাই কেন?

এছাড়াও কত গুহ্য কথাই যে বলত গজানন। জহরলালের সঙ্গে লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রেমের ছবি এমন ডগোমগো করে আঁকত, শুনলে মনে হবে, ও বোধ করি ওই প্রেমপর্বের কালে পাশের ঘরেই ছিল।

শুধু অতীতকে নিয়েই নয়, বর্তমান দুনিয়া সম্পর্কে সে এমন সব গুহ্য খবর দিত মাঝেমাঝে, শুনে, ওই ছেলেবেলাতেই আমাদের পিলে চমকে যেত। কিন্তু সেইসব খবরের উৎস কী, তা সে ঘৃণাক্ষরেও ফাঁস করত না আমাদের কাছে।

দুনিয়ার প্রতিটি ইস্যুতে গজাননের একটা নিজস্ব বক্তব্য ছিল। নিজের বক্তব্যগুলোকেই অভ্রান্ত বলে মনে করত সে। তাই নিয়ে কেউ তর্ক করলে, পাল্টা যুক্তি পেশ করত নিজের মতো করে। সে যুক্তি যে সদা-সর্বদা খুব জোরাল হত তা নয়, কিন্তু গজানন কিছুতেই তার মতামত থেকে একচুল নড়ত না। এমন কি, যখন তার পেশকরা যুক্তিগুলোকে তার নিজের কাছেই খুব খোঁড়া বলে মনে হত, তখন সে 'আমার কাছে খবর আছে'র স্মরণ নিত। কিন্তু সেসব খবরের উৎস তো আর যার-তার কাছে ফাঁস করা চলে না।

কোথাও কোনওকিছু ঘটনা ঘটলে গজানন সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর কিছু ভবিষ্যতবাণী করে ফেলত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ভবিষ্যতবাণী মিলত না। কিন্তু তার জন্য সে মোটেই ঘাবড়াত না। বরং, যা ঘটেছে, সেটা যে তারই ভবিষ্যতবাণীরই রকমফের, সেটাই প্রমাণ করে ছাড়ত শব্দ, বাক্য ও কথার

যাদুকরী প্রয়োগে। পূর্বে উচ্চারিত দু-একটি শব্দ যোগ-বিয়োগ করে বাক্যটির এমন অর্থ দাঁড় করিয়ে দিত, যা তার ভবিষ্যতবাণীর কাছাকাছি পৌঁছে যেত। বাকিটুকু 'দুনিয়ার কারো ভবিষ্যতবাণী একেবারে কমা-ফুলস্টপ ধরিয়া মেলে না, শ্রোতাকেও কিছোটা মানে করিয়া লিতে হয়,' জাতীয় যুক্তি দিয়ে পুষিয়ে দিত।

সংসারের কুটোটিও নাড়ত না গজানন। নেহাৎ দয়া পরবশ হয়ে কেবল বারোয়ারি শিবের পূজাটা করে দিয়ে যেন সংসারের সবাইকে কৃতার্থ করত। সারা সকাল আড্ডাফাড্ডা মেরে বেলা বারোটা নাগাদ কাকচান সেরে শিব-মন্দিরে ঢুকত সে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তারস্বরে মন্ত্র পড়ত, আর জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাত। যতক্ষণ মন্ত্র পড়ত সারাক্ষণই ঘণ্টা বাজাত সে।

একদিন শিব পুজোর সময় মন্ত্রপাঠের আদলে সুর করে 'শোন বন্ধু শোন...প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা/ইটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্মব্যথা—/এখানে আকাশ নেই, এখানে বাতাস নেই—।' গোছের ফিল্মিগান গাইতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে কথাটা।

শুনে শিউরে ওঠে মুরুব্বির দল। মন্ত্রের বদলে ফিল্মি গান গাওয়ায় বাবা মহাদেবের কতখানি গোঁসা হয়েছে, এবং তার ফলে গ্রামবাসীকে বাবার কতখানি কোপানলে পড়তে হবে, ভেবে বুঝি কূলকিনারা পায় না গাঁয়ের মানুষ।

সেই সন্ধেতেই বিচার বসে গজাননের।

গজানন তো প্রথমে স্বীকারই করতে চায় না কিছুই। অবশেষে তাকে যখন মন্ত্র পড়বার পরীক্ষা দিতে বলা হয়, এবং পরীক্ষক হিসেবে স্বয়ং অঘোর চক্রবর্তী এবং বাণীবিনোদ চক্রবর্তীকে নিয়োগ করা হয়, তখন একেবারেই মুষড়ে পড়ে বেচারা। তাও শেষ চেষ্টা হিসেবে, মন্ত্র না পড়বার পক্ষে সে এই যুক্তি খাড়া করে যে, এই পাঁচমেশালি জমায়েতের সামনে, যেখানে অব্রাহ্মণেরই ভিড় বেশি, তার পক্ষে মন্ত্র পড়া অনুচিত। তার জবাবে গ্রামবাসী যখন দুজন পরীক্ষকের সঙ্গে আড়ালে গিয়ে মন্ত্র পড়বার অনুমতি দেয়, গজানন প্রবল অনিচ্ছা সহকারে যায় বটে, কিন্তু জমায়েতের চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই অঘোর চক্রবর্তীর পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে।

বাণীবিনোদের হস্তক্ষেপে সেযাত্রা কোনওগতিকে বেঁচে গিয়েছিল গজানন। শিব মন্দিরের পূজারির পদটা আর ফিরে পায়নি বটে, কিন্তু মোটা জরিমানার হাত থেকে পুরো ভট্ট পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন বাণীবিনোদ। কেবলমাত্র শিব ঠাকুরের সামনে গুনেগুনে দশবার নাকে খৎ দিইয়েই রেহাই দেওয়া হয়েছিল গজাননকে।

সাক্ষাৎ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর কিছুদিন খুবই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায় গজানন। তারপর ধীরেধীরে মুখ খোলে বিশ্বাসভাজন মানুষজনের কাছে। মন্ত্রতন্ত্র জানে না এমন অপবাদ দিয়ে সেদিন যে ওকে বিচারের আসরে দশচক্রে ভগবান ভূত বানাবার চেষ্টা করা হল, সেটা যে স্বার্থান্বেষী মহলের একটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, এ বিষয়ে তার নাকি কোনও সন্দেহ নেই। তাদের পরিবার থেকে বারোয়ারি পুজোটা কেড়ে নিয়ে করালী ভটচাজের পরিবারকে দেবার জন্যই যে চক্রান্তটা করা হয়েছিল, এবং সেই বাবদ অঘোর ও বাণীবিনোদ, দুই পরীক্ষকই যে করালীর থেকে মোটা টাকা আগাম খেয়েছে, তার অকাট্য প্রমাণ নাকি তার হাতে মজুত রয়েছে। এবং যথাসময়ে সে হাটে হাঁড়িটি ভেঙে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। শুধু তাই নয়, সে যে তার বাপ কামাখ্যা ভটুর কাছে দীর্ঘকাল পূজাআচ্চার কাজ মন দিয়ে শিখেছে, এবং অঘোর-বাণীবিনোদদের যে ওসব বিষয়ে জ্ঞানের বহর কতখানি, সেটাও তার অজানা নেই। কেন কী, কেবল ভাটপাড়ায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলেই যে সবকিছু জানা যায় না, সেটা একদিন সে প্রমাণ করেই ছাড়বে। নচেৎ সে বাপের ব্যাটা নয়।

এরপর গজানন এমন সব কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে, যাকে বলে 'সাত ঘাটের জল খাওয়া'। গাঁয়ের বখাটে ছোকরাদের নিয়ে সে একটা ক্লাব গড়ে, ফুটবলের টুর্নামেন্টের আয়োজন করে, ক্লাবের ছোকরাদের নিয়ে গেরস্থর বাড়ির হাঁস-মুরগি চুরি করে ফিস্টি করতে থাকে, ক্লাবের

নেতৃত্বে হরেক কিসিমের 'সামাজিক' কাজের খরচ-খরচা বাবদ বাড়ি-বাড়ি চাঁদা তুলে বেড়াতে থাকে, এবং কেউ চাঁদা দিতে না চাইলে কিংবা চাঁদার পরিমাণ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে, রাতের অন্ধকারে ওদের সবজি-খেতের ফলন্ত সবজির গাছগুলোকে শেকড়শুদ্ধু উপড়ে দিয়ে 'কত ধানে কত চাল' সেটা বুঝিয়ে দেয় বেয়াড়া গেরস্থকে। ফলে, গেরস্থরা খুব ভয় পেতে থাকে গজাননকে। ওকে ঘাঁটানোর ফল যে কী মারাত্মক হতে পারে, সেটা আন্দাজ করে ভয়ে উৎকণ্ঠায় সিঁটিয়ে থাকে সবাই। আর, আম-জনতার ভয়, সেটা এমনই এক উপভোগ্য ব্যাপার, তারিয়ে তারিয়ে সেই মজাটা নিতে নিতেই গজাননের জোস আরও বেড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে তার মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেন কি, তার মনোমত নয় এমন কাজ কেউ করতে গেলেই গজানন তার বাহিনী নিয়ে ওকে এমন নাস্তানাবুদ করে যে, বেচারার নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। আর, এই ধরনের পরিস্থিতিতেই সন্ধিপুরের মানুষগুলোকে নতুন করে চেনা যায়। এমনিতে বিচার-পঞ্চায়েতে কথায় কথায় বুক বাজিয়ে তড়পানি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একতা রক্ষার আহ্বান, কিন্তু কোনও ব্যাপারে সামান্য বেগতিক দেখলেই, ভয়ে বুক দুরু দুরু, তখন চাচা আপন পরাণ বাঁচা। কাজেই, গজানন নামক গ্রহটিকে গিলতে খুব কষ্ট হলেও, ওগরানোটা আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে গ্রামবাসীদের পক্ষে। ফলে, সন্ধিপুর গ্রাম সেই প্রথম একজন মস্তান এবং তোলাবাজকে প্রত্যক্ষ করে।

ঠিক তেমনই মুহূর্তে হিরন্ময় মুখুজ্যার খুবই দরকার হয়ে পড়ে গজাননকে, আর তার ফলেই গজানন সন্ধিপুর গাঁয়ে সেই প্রথম একজন স্বীকৃত মস্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এবং সাতাত্তরের পর সি পি এম পার্টিতে ঢুকে পড়বার আগে অবধি সে হিরন্ময়ের এক বিশ্বস্ত ইচ্ছেযন্ত্র হিসেবে কাজ করতে থাকে। ততদিনে ভণ্ডুলের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব হয়েছে। আর, বল্লভদা তো কংগ্রেসের দয়ায় চাকরিটাই পেয়েছে। সাতষট্টির ভোটে কংগ্রেসের হয়ে তিন জনাতে মিলে এমন খাটাখাটি খেটেছিল, দেখে হাইকমান্ড একেবারে ধন্য ধন্য করেছিল ওদের নামে। তবুও কিছুতেই কিছু হয়নি। সেযাত্রা কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছিল।

সাতষট্টির পর পুরো এক বছর লাগাতার চেষ্টা করেও সি পি এমে ঢুকতে পারেনি গজানন। 'প্রকাশ্যে বিপদের দিনে পার্টি ছাড়িয়া যারা চলিয়া যায়, তারা তাইলে বুড়া হইলে নিজের বাপকেও ছাড়িয়া দিবে' গোছের বাণী দিলেও, ভেতরে ভেতরে সব রকমভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিল কংগ্রেস ছেড়ে সি পি এমে ঢুকতে, কিন্তু নন্দ গুচ্ছাতকে গলাতে পারেনি কিছুতেই। তখনও নন্দ গুচ্ছাত ছিল এতদঞ্চলে পার্টির মাথা। তার কথার ওপর কথা চলত না। তার অমতে কাউকে পার্টিতে ঢোকাবার ক্ষমতা খোদ থানা-কমিটিরও ছিল না। দেখেশুনে বড়ই হতাশ হয়ে উঠেছিল গজানন। আমরা, অর্থাৎ আমি, দিবাকর আর কল্পনাথ তখন মেদিনীপুর কলেজে পড়ি। মাঝে মাঝে বাড়ি আসি ছুটিছাটায়। ম্রিয়মান গজানন আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসে বটে, কিন্তু বুঝতে পারি, তার মনে তিলমাত্র সুখ নেই।

ততদিনে বল্লভদা দ্বিতীয় বার সংসার গড়বার প্রক্রিয়াটি শুরু করে দিয়েছে পুরোদমে। তার নিজেরই অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে তখন তার চলছে ডাগোমাগো প্রেমপর্ব। সেসব খবর পল্লবিত হয়ে ঢুকছে গাঁয়ে। শিখারউদির কানেও যাচ্ছে তা।

তখন শহর থেকে নিত্যিদিন হরেক খবর এসে গ্রামে ঢুকছিল। শহর কখনও গ্রামের খবর পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে না, কিন্তু গ্রাম সারাক্ষণ শহরের খবরের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, কেন কি, শহর হল গ্রামের উত্তমর্ণ, গ্রামের ভাগ্য শহরই স্থির করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই, গ্রাম সদা-সর্বদাই শহরের দিকে কান পেতে থাকে। শহরের মানুষ গ্রামে আসে কদাচিৎ, কেন কি, তাদের গ্রামে আসার দরকার হয় না, কিন্তু গ্রামের মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন থাকে শহরে, সেই কারণেই সন্ধিপুর থেকে রোজ রোজ অনেক মানুষই হরেক কারণে বেলদাবাজারে যায়। ফেরার সময় মালপত্রের সঙ্গে কিছু কিছু খবরও বয়ে আনে।

তারাই একদিন বয়ে আনল খবরটা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে বল্লভদা। আনুষ্ঠানিক বিয়ে নয়, 'রেস্টি-ম্যারেজ'।

ততদিনে আমরা বড়ো হয়ে গেছি। কলেজে পড়ছি আমি, দিবাকর আর কল্পনাথ। গজানন চুটিয়ে রাজনীতি করছে। ভণ্ডুল তখন তার এক নম্বরের চামচে। শিখাবউদির কাছে আর থাকে না সে। বল্লভদা এবং গজাননের বাসায় ভাগাভাগি করে থাকে। সে তখন গজাননের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

যাদব-জেঠা আর রাধা জেঠিমা তো কবেই মারা গিয়েছেন। শিখাবউদি বাবুনকে নিয়ে একা একা বাস করছিল বল্লভদাদের সাবেক বাড়িতে। সে এক নিঃসঙ্গ অপমানকর দুঃখের জীবন। একদিন এক এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, যাতে করে ছোট্ট বাবুনকে নিয়ে শিখাবউদির একেবারে তলিয়ে যাবার উপক্রম।

পরবর্তীকালে, শিখাবউদি নিজের মুখেই কবুল করেছে তা। বলেছে, পল্টুদা না থাকলে সত্যিসত্যি তলিয়ে যেতাম রে। নদীর যে পাড়ে ভাঙন, সেই পাড়ের একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল আমায়। ভাগ্যিস পল্টুদা এসে একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল, নইলে প্রবল স্রোতে তলিয়েই যেতাম।

শুনতে শুনতে, বাস্তবিক, আমার রাগ হচ্ছিল খুব। আর কত হঠকারী হবে শিখাবউদি! কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা বলে নিজের কবর আর কত খুঁড়বে!

বাস্তবিক, যখন ছোটো ছিলাম, শিখাবউদির মুখে তার পল্টুদার অহরহ গুণগান শুনতে শুনতে খুব মজা পেতাম। কিন্তু যতই বড়ো হতে লাগলাম, ব্যাপারটা নিয়ে শিখাবউদির প্রতি এক ধরনের বিরূপতা তৈরি হতে লাগল মনের মধ্যে। একজন বিবাহিতা মহিলা সারাক্ষণ তার ভূতপূর্ব প্রেমিকের ঢাক বাজাতে থাকবে প্রকাশ্যে, নিজের স্বামীর কাছেও সারাক্ষণ নিজের প্রেমিককে নিয়ে গদগদ হবে, এটা শুধু দৃষ্টিকটু কিংবা নিন্দনীয়ই নয়, অসহ্যও বটে। বিশেষ করে বল্লভদার পক্ষে সেটা হজম করা তো অসম্ভব। বিয়ে করবার পর ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। জয়া, আমার স্ত্রী, আমার সঙ্গে তার দীর্ঘ এগারো বছর প্রেম চলার পর বিয়ে। তাও জয়া যখন আমার কোনও বন্ধু কিংবা সহকর্মীর দারুণ প্রশংসা করে, বুকের মধ্যে এক ধরনের চাপা ঈর্ষা যে বোধ করি, তা তো আর অস্বীকার করতে পারিনে। যদিও জানি, জয়ার ওই প্রশংসার মধ্যে কোনও অবৈধ দুর্বলতা থাকে না, তাও মনের মধ্যে কীরকম যেন হতে থাকে। আর, শিখাবউদি তো ওর পল্টুদার কথা বলতে গিয়ে একেবারে দিওয়ানা হয়ে যায়। মাঝেমাঝে তো পল্টুদার সঙ্গে বল্লভদার তুলনা টানতে গিয়ে পল্টুদাকে আকাশে তুলে দেয়, বল্লভদাকে একেবারে পাতালে নামিয়ে আনে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি, শুধু বল্লভদা কেন, দুনিয়ার কোনও পুরুষ মানুষের পক্ষেই এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব।

কেবল মুখ ফুটে পল্টুদার প্রশস্তি গায়, এটাতেই আমার আপত্তি, তা কিন্তু নয়। আমার আপত্তি তৈরি হচ্ছিল আরও গভীরে। কথাটা মুখে যদি নাও বলত শিখাবউদি, এটা তো ঠিক যে, সে সারাক্ষণ পল্টুদা নামক এক পরপুরুষে মজে রয়েছে। সেটাও যে সঙ্গত নয় একজন বিবাহিত মহিলার পক্ষে। স্বামীকে নিয়ে সংসার পাতবে, আর সারাক্ষণ মনের মধ্যে ছবি করে বাঁধিয়ে রাখবে অন্য এক পুরুষের ছবি, এত অত্যন্ত গর্হিত মানসিকতা। শিখাবউদিকে তো অনায়াসে দ্বিচারিণী আখ্যা দেওয়া চলে।

এই একটা বিষয়ে গজাননের যুক্তি তো আমি উড়িয়ে দিতে পারিনে।

এইসব নিয়ে শিখাবউদির প্রতি আমার মনে চাপা বিদ্বেষ জমছিল দীর্ঘকাল ধরে। তবুও কেন জানি শিখাবউদিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। কে জানে, দুনিয়ার কত নারী এবং পুরুষ মনের মধ্যে অনুরূপ দ্বিচারিতা পোষণ করেও সংসার ধর্ম পালন করে চলেছে! তারা তো কেউ মুখ ফুটে প্রকাশ করে না তাদের দ্বিচারিতার কথা। আমি নিজেই তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। জয়ার সঙ্গে দীর্ঘ এগারো বছর প্রেম করেছি, তারপর আমাদের বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরও কতগুলো বছর একসাথে কাটিয়ে দিলাম, আমাদের মধ্যে এমনিতে বোঝাপড়াও ভালোই, কিন্তু তাও ওকে এখনও অবধি ডালিমের কথা বলতে তো পারিনি। বলতে তো পারিনি যে, সেই কৈশোর থেকে সে আমার মনের মধ্যে এমনই একখানা

ছবি হয়ে ঝুলছে, যা এই এত বছরেও খুলে ফেলতে পারলাম না।

তখন মেদিনীপুর কলেজে পড়ি। মেসে থাকি। একদিন বাড়ি এসে শিখাবউদির কাছে জানতে চাইলাম পল্টুদার ভালো নাম, পুরো ঠিকানা।

শিখাবউদি আমার দিকে চমকে তাকায়, খুব গাঢ় সংশয় থিকথিক করতে থাকে তার মুখমণ্ডলে। বারবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। একসময় বলে, পল্টুদার ঠিকানা নিয়ে কী করবি তুই?

—কী আবার করব, সে কেমন আছে, কী করছে, খোঁজ-খবর নেব। তোমার খবরও দেব ওকে।

—কী লাভ আমার খবর দিয়ে? বলতে বলতে নিভে আসে শিখাবউদি,—বরং শুনে দুঃখ পাবে।

—কেন? দুঃখ পাবে কেন?

—পাবে না? সে কি কখনও ভেবেছে, এই গণ্ডগ্রামে এসে ধান সেদ্ধ করব আর কাপড় কাচব আমি। আমাকে নিয়ে কত ভাবনা ছিল তার, কত স্বপ্ন!

আমি কিন্তু হাল ছাড়িনে। বারবার অনুনয় করি, দাও না ওর ঠিকানাটা। আসলে, বুঝলে, সেই ছেলেবেলা থেকে তোমার মুখে শুনতে শুনতে ওঁর সম্পর্কে এক ধবনেব কৌতূহল তৈবি হয়েছে। ওঁকে চাক্ষুষ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।

শিখাবউদি গুম মেরে থাকে। অন্য কথা পাড়ে। অবশেষে আমার ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে উত্যক্ত হয়ে এক সময় খুব আলগোছে বলে, আচ্ছা, দেব যা। এখন নয়, পরে একসময় এসে নিয়ে যাস।

কিন্তু সেই সময়টা আর আসে না কখনোই। সকালে বললে শিখাবউদি বলে, বিকেলে নিস, বিকেলে বললে, সন্ধ্যায় নিস, সন্ধেয় বললে, পরের দিন সকালে . । এইভাবে আমার শনি ও রবিবার একটু একটু করে কাবার হয়ে যায়, শিখাবউদি কিছুতেই দেয় না পল্টুদার ঠিকানা। আমি কিন্তু সমানে লেগে থাকি ওর পেছনে। পল্টুদার ঠিকানাটা আমার চাই—ই।

নাগাড়ে বহুদিন বহুৎ পীড়াপীড়ির পর শিখাবউদি একসময় খুব চটে যায়। বলে, ছাড় দেখি। বারবার এক বায়না ধরিস কেন? আমি আর ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতে চাইনে।

—কেন? রাগ করেছ ওর ওপর?

ততক্ষণে বুঝি নিজেকে একটুখানি সামলে নিয়েছে শিখাবউদি। আমাকে কটু কথা বলার জন্য হয়ত সামান্য অনুতাপ হয়ে থাকবে ওর মনে। নরম গলায় বলে, আমি রাগ করব কেন? ওই বরং আমার ওপর রাগ করে রইল সারাটা জীবন।

—কেন?

—বললাম তো, আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল ওর। আমি ওর স্বপ্নে ছাই ঢেলেছি। ও হয়ত জানে না, আমি কী অবস্থায় কেমন আছি। আমিও চাই নে নিজের কোনও খবর জানাতে, কেন কি, শুনে আরো দুঃখু পাবে ও।

—আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার কোনও খবরই জানাব না ওঁকে। কেবল একটুখানি আলাপ করব।

—একটুখানি আলাপ করবি? বুদ্ধু! শিখাবউদি চোখ পাকিয়ে বলে, কোন্ সূত্রে আলাপ করবি শুনি? আমার নামটা তোকে উচ্চারণ করতে হবেই। আর, তাহলেই তো সে আমার খবর জানবার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে।

—তোমার নাম আমি বলব না ওকে। কথা দিলাম। আমি কেবল বলব, আমার বাড়ি সন্ধিপুর।

—সন্ধিপুর? সন্ধিপুর বললে তো সে কিছুই বুঝবে না।

—কেন? আমাদের গ্রামের নামটা সে জানে না বুঝি? বলোনি ওকে?

শিখাবউদি সহসা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চোখের তারা উদাস হয়ে আসে। এক সময় বিড়বিড় করে বলে, বিয়ের খবরটা পেয়ে অবধি ঝাঁ করে খেপে গিয়েছিল সে। অনেক বুঝিয়েছিল আমাকে। প্রথমে খুব তর্জন-গর্জন, তারপর অনুরোধ-উপরোধ, অবশেষে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বিয়ের কদিন আগে থেকে একেবারেই লুকিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। এমন কি বিয়েতেও আসেনি।

বলতে বলতে গলাটা ধরে আসে শিখাবউদির। ভেজা গলায় বলে, আমি তার দেখা পেলে তো

ঠিকানা দোব।

—কী আশ্চর্য! আমি বলে উঠি,—রাগ কমলে পর তোমার বাড়ি থেকে কি আর ঠিকানা জোগাড় করেনি সে?

শিখাবউদি কটমট করে তাকায় আমার দিকে। গলায় ঝাঁঝ এনে বলে, ঠিকানা জোগাড় করবে? এতদিনে এই বুঝলি তুই পল্টুদাকে? অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের, তার ঠিকানা জোগাড় করবে যোগাযোগ রাখবার জন্য? আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে শিখাবউদি বলে, তার যে কতখানি সংযম, তোরা তো জানিস না!

শিখাবউদি তার সেই পল্টুদার ঠিকানা কিছুতেই দেয়নি আমাকে। তাই বলে তার সম্পর্কে আমার কৌতূহল তিলমাত্র কমেনি। বরং ভেতরে ভেতরে তা আরও গাঢ় হয়েছে।

পল্টুদার খোঁজ অবশ্য আমি পেয়েছিলাম অনেক পরে। ততদিনে সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।



বল্লভদা আর শিখাবউদির জীবনে যখন একটু একটু করে মেঘ জমছিল, বিজলিও চমকাচ্ছিল ঘনঘন, তখনও পাকাপাকিভাবে বেলদাবাজারে গিয়ে ডেরা পাতেনি বল্লভদা। তখনও হপ্তা অন্তে বাড়ি আসত। কিন্তু যতক্ষণ থাকত, সামান্য কারণে শিখাবউদির প্রতি দুর্ব্যবহার করছিল। মারধরও। এবং কথায় কথায় যে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলত, সে খবর পাচ্ছিলাম নানান জনের মুখে। কিন্তু সে যে শিখাবউদিকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে চলে যাবে, এতটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

বাবা-মা-র অবর্তমানে তখন বল্লভদা-ই যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জমি বলতে সাকুল্যে বিঘে দশেক, আর ওই ভিটেটি। ভিটের ওপর একখানা মাটির বাড়ি।

কিছুদিন ধরে জমি-জিরেতগুলোকে কিস্তিতে কিস্তিতে বেচে দিচ্ছিল বল্লভদা। ওই টাকায় বেলদা বাজারে একচিলতে জমি কিনেছিল। বাড়িও বানিয়েছিল ওর ওপর।

আমরা তো তখন অতটা ভাবিনি, তাই শিখাবউদিকে মজা করে বলতাম, বনবাসিনী সীতা এবার নগরে ফিরবে। এই বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড়, ধুলো-কাদার থেকে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি ঘটবে তোমার।

শিখাবউদি সে মজায় সামিল হত না। থমথমে গলায় বলত, যে যাবার যাক শহরে, আমি এই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ছি না।

এতদিনে মনে হয়, শহরের বাড়িটা যে তার জন্য বানানো হচ্ছে না, এবং পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা অন্য ছক উঁকিঝুঁকি মারছে, শিখাবউদি ততদিনে সেটা নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলেছিল। শুধু বুঝতে পারিনে, সবই যদি জানতে পারছিল, তবে কেন সময় থাকতে নিজেকে ফেরাল না শিখাবউদি? কেন ওই সর্বনাশা ভাঙন রোধ করতে কোনও ব্যবস্থা নিল না। না, শিখাবউদিকে কোনওদিনও বুঝে উঠতে পারলাম না আমি।

একদিন, তখন আমি বি-এ পাশ করে কলকাতায় ল পড়ছি, বাড়ি এসে শুনলাম সেই মর্মান্তিক খবরটা। বল্লভদা আবার বিয়ে করেছে। ওর অফিসেরই সেই সহকর্মীকে বিয়ে করে বেলদা বাজারে নতুন তৈরি বাড়িটাতেই সংসার পেতেছে সে। তার চেয়ে মর্মান্তিক খবর হল, ততদিনে যাবতীয় জমি-জিরেত নিঃশেষে বেচে দেবার দরুন শিখাবউদির অন্ন সংস্থানের সব পথই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর দীর্ঘদিন না সারানোর দরুন বসত-বাড়িটির অবস্থাও নিতান্তই শোচনীয়। বল্লভদা নাকি ভেতরে ভেতরে বাড়িসহ ভিটেটুকুও বেচে দেবার জন্য খদ্দের খুঁজছে।

তখন শিখাবউদির একমাত্র ছেলে বাবুনের বয়স দশ-এগারো। সংসারের দুটি প্রাণীর অন্ন জোগাতে একেবারে হিমসিম খাচ্ছে শিখাবউদি।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি শিখাবউদিকে। খুবই রোগা হয়ে গিয়েছে। চোখের কোলে কালি জমেছে। চোয়াল সামান্য প্রকট হয়েছে। এই ক-বছরে বয়েস অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে শিখাবউদির।

দু-চোখের সেই ঝিলিকমারা উজ্জ্বলতা একেবারেই নিভে এসেছে। সেই সুবেলা গলা একেবারেই ভেঙে গিয়েছে। তখন সে এক বিধ্বস্ত বিষাদপ্রতিমা। বুঝি ঝড়ের সঙ্গে নিরন্তর ডানা ঝাপটে যুদ্ধ করে চলেছে ক্লান্ত এক পাখি। যৌবনের সেই চপলা, কূজনমুখরা পাখিটা কবে যেন নিঃশব্দে উড়ে গিয়েছে শিখাবউদির শরীর থেকে। এখন যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা কেবল খাঁচাটুকু।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। শিখাবউদির একমাত্র ছেলে বাবুনের (তাকে গজাননরা আড়ালে ডাকত বেবুন) তখন প্রচণ্ড জ্বর। কিছুতেই নামছে না জ্বর, অথচ বেশ বুঝতে পারছি, শিখাবউদির হাতে একটাও পয়সা নেই। শিখাবউদি সেটা স্বীকারও করবে না পাছে তাকে টাকা দিতে চাই।

একসময় মরিয়া হয়ে বলি, শিখাবউদি একটা কথা বলব?

শিখাবউদি খুব বিপন্ন মুখে তাকায় আমার দিকে, কি কথা?

—পল্টুদাকে একটিবার খবর দিলে হয় না?

পল্টুদার কথায় শিখাবউদি কেন জানি চমকে ওঠে। ধীরে ধীরে নামিয়ে নেয় মুখ। ঘনঘন মাথা নাড়াতে থাকে।

বলি, তুমি ডেকে পাঠালে সে আসবে না?

শিখাবউদি আকাশের দিকে তাকায়। ভাবে। এক সময় বিড়বিড় করে বলে, একবার কাকের মুখে খবরটা দিলেই তো ঝড়ের বেগে ছুটে আসবে সে...কিন্তু তাকে খবর দেওয়া সম্ভব নয়।

—কেন নয়?

শিখাবউদি চুপ করে থাকে। তার চোখেমুখে ঘনিয়ে আসে অচেনা ঘোর। খুব আচ্ছন্ন গলায় বলে, তার কোনও ইচ্ছেই আমি পূরণ করিনি রে, তার কোনও মিনতিই আমি রাখিনি। আজ নিজের স্বার্থে তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলের দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া চলে? আর কত আমি ছোটো হব মানুষটার কাছে? আর কত ছোটো হতে বলিস তোরা?

বলতে বলতে শিখাবউদির চোখদুটি একটু একটু করে ভিজে যেতে থাকে।

শিখাবউদির সেই ঘোর বিপর্যয়ের দিনগুলোতে, গ্রামের প্রায় কেউই তেমন করে দাঁড়াতে পারেনি ওর পাশে।

তখন কংগ্রেসের শাসন, দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা, নন্দ জেঠাদের পার্টির ঘোর বিপদের দিন। পুলিশ কথায় কথায় হেনস্থা করছে নেতাদের। ইতিমধ্যে একবার জেল খেটে ফিরে এসেছে ছোটকাকা। গজানন আর হিরণ্ময় মুখুজ্যা তাকে দ্বিতীয়বারের জন্য জেলে পাঠাবার ফন্দি আঁটছে। তবুও তারাই যা একটুখানি দাঁড়িয়েছিল শিখাবউদির পেছনে। কিন্তু তাদের নিজেদেরই নিরাপত্তার এতটাই অভাব ছিল যে, শিখাবউদিকে তিলমাত্র সাহারা দিতে পারেনি। সে এক সময় গ্যাছে, যখন শিখাবউদি দিনের পর দিন সকলের চোখের আড়ালে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরিয়েছে। একে তো নিদারুণ অনটন, তার ওপর এক নিদারুণ লজ্জা, তাকে বুঝি দিনের পর দিন কুরে কুরে খেয়েছে ঘুণপোকার মতো। কারোর কাছেই প্রকাশ করতে পারেনি সেই লজ্জা, গ্লানি, পরাজয়ের কথা।

তখন আমি কল্পনাথ নিয়মিতভাবে গ্রামে নেই। মাঝেমাঝে বাড়ি এলে যেতাম শিখাবউদির বাড়িতে। এক জরাজীর্ণ বাড়িতে কোনওগতিকে মাথা গুঁজে দিন গুজরান করছে তখন শিখাবউদি। তখন শিখাবউদির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে এমনই দমে যেতাম, 'কেমন আছ' গোছের মামুলি কুশল প্রশ্ন করতেও বাধত। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, শিখাবউদিদের নিয়মিত অন্ন অবধি জুটছে না। ততদিনে খোঁজখবর নিয়ে যেটুকু জানতে পেরেছি, শিখাবউদির বাপের বাড়ির অবস্থাও নিতান্তই শোচনীয়। বাপটা তো বুড়ো অথর্ব, নড়তে চড়তেই পারে না। বোনগুলো কোথায় কোন অপাত্রে পড়ে নিরন্তর জ্বলছে। শিখাবউদির সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগই নেই দীর্ঘকাল। থাকবার মধ্যে একটিমাত্র ভাই ভণ্ডুল, কিন্তু সে তো বল্লভদার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিব্যি বসেছে বেলদা-বাজারে, তার নতুন দিদি'র কাছে। তার সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয়েছে ভণ্ডুলের। যেখানেই যতদূরেই থাক, ভাই-ফোঁটার দিনে নতুন দিদির হাতে ভাইফোঁটা না নিলে তার নাকি চলেই না।

শিখাবউদির যা-হোক তা হোক, বাবুনের শরীর-স্বাস্থ্য, পোশাক-আশাক দেখে এমনই খারাপ লাগত, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করবার প্রস্তাবটা কিছুতেই দিয়ে উঠতে পারতাম না মুখ ফুটে। কে জানে, শিখাবউদি কেমনভাবে নেয় প্রস্তাবটা। কারণ আমি তো জানিই, কারোর দয়া ভিক্ষা করাটাকে মনেমনে ঘেন্না করত সে চিরকাল। বলা যায় না, আমাদের সাহায্যের প্রস্তাবে তার সযত্নে লুকিয়ে রাখা লজ্জাগুলি প্রকাশ পেয়ে গেলে শিখাবউদি ভেতরে ভেতরে আরও মরমে মরে যাবে কিনা। তবুও মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে চাইতাম নানান কৌশলে, কিন্তু তার ফলে শিখাবউদির চোখমুখ আরও থমথমে, আরও কঠিন হয়ে উঠত।

একদিন মরিয়া হয়ে বলেই বসলাম কথাটা। তুমি গাঁয়ে বিচার দিচ্ছনি কেন শিখাবউদি?

—বিচার? কিসের বিচার?

—বা-রে! তোমার ওপর এতখানি অবিচার করতে পারে বল্লভদা? বিয়ে করা বউ হিসাবে তোমার প্রতি তার একটা দায়দায়িত্ব আছে বৈকি। তোমার খাওয়া-পবার খরচ দিতে সে বাধ্য। তুমি বিচার দাও।

তীব্র ব্যঙ্গে শিখাবউদির সারা মুখে ভাঙচুর হয়, তুই তো এখনও অবধি আইন পাশ করিস নি রে। তাও আইনে তোর কত জ্ঞান বেড়েছে!

আমি একেবারে থতমত খেয়ে চুপসে গেলাম দেখে শিখাবউদির বুঝি খারাপ লাগে। চোখমুখ থেকে যাবতীয় কাঠিন্য মিলিয়ে যেতে থাকে। একসময় খুব ম্লান গলায় বলে, বুঝিস না কেন, সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের সাথে ঘর বাঁধতে পারল, আর তার থেকে খাই-খরচার দাম আদায় করতে বিচার-পঞ্চাৎ করব আমি! দুনিয়ার সামনে আর কত হীন হতে বলিস আমাকে?



আমার ছোটো কাকা ছিল একেবারেই অন্য জাতের মানুষ। বাইরে থেকে চিরকালই খুব গোঁয়ার, একবগা গোছের মানুষ বলে মনে হত ওকে। ফবোয়ার্ডের তুখোড় খেলোয়াড় ছিল এককালে। মাঠে নামলে বিপক্ষের গোলকিপারের বুক দুরুদুরু করত সারাক্ষণ। ভালো ফরোয়ার্ডদের যা হয় আর কি, তিনকাঠি দিয়ে ঘেরা গোল অর্থাৎ লক্ষ্যটা সারাক্ষণ দৃষ্টির ফ্রেমে থাকতই। ফলে, গ্রামে, পাড়ায়, কিংবা বাড়িতে কোনও বিষয়ে কোনও বিতর্ক সৃষ্টি হলে, ওই নিয়ে চারপাশের তাবৎ মানুষজন যখন চরম বিভ্রান্ত, যখন বিষয়টি নিয়ে নানা মুনির নানা মত, ছোটকাকা ততক্ষণে তাড়াতাড়ি খুব সুস্পষ্ট একটা মতামত তৈরি করে ফেলেছে। এবং ছোটকাকা একবার কোনও একটা মত খাড়া করে ফেললে তাকে তা থেকে সরানো প্রায় অসম্ভব। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ব্যাপারটা।

তখন আমি সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি, একদিন গাঁয়ে ফিরে শুনলাম, ছোটকাকা নন্দ জেঠার দলে নাম লিখিয়েছে। নন্দ জেঠার প্রতি যে তার ছেলেবেলা থেকেই এক ধরনের দুর্বলতা ছিল, সেটা আমি জানতাম, কিন্তু তাই বলে সে যে একেবারে তার দলে নাম লিখিয়ে বসবে সেটা আমি আশা করিনি। কারণ, আমাদের পুরো পরিবারটাই ছিল আজীবন-কাল কংগ্রেসী।

একা পেয়ে ছোটকাকাকে শুধোলাম, শেষমেশ তুমি নন্দ জেঠার দলে নাম লেখালে?

ছোটকাকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। জবাব দিল না আমার কথার। কিন্তু পরের বারে বাড়ি ফিরে দেখলাম, ছোটোকাকা পার্টির কাজে একেবারে মজে গিয়েছে।

আমি সেই ছেলেবেলা থেকে ছোটোকাকাকে চিনি। যে কাজে নামে, একেবারে মনপ্রাণ দিয়ে করে। কিছুদিন বাদেই সে নন্দ জেঠার একেবারে ডানহাত হয়ে গেল।

সাতষট্টির ভোটে দিন নেই রাত নেই করে খাটল ছোটোকাকা। গজাননও খেটেছিল কংগ্রেসের হয়ে। কিন্তু তাদের প্রার্থীর একেবারে জামানত জব্দ হয়েছিল সেবার।

ভোটের পর কিছুদিন মনমরা হয়ে রইল গজানন। তারপর একসময় নিঃশব্দে সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করে, নন্দ জেঠার মন ভিজিয়ে সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়তে চায় পার্টিতে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও

সে-যাত্রা পার্টিতে কিছুতেই ঢুকতে পারেনি গজানন। আর, বাহাত্তরের পর সে তো বুঝি নিজের কপালকে বারেবারে তারিফ করেছে এটাই ভেবে যে, ভাগ্যিস নন্দ গুচ্ছাতের পার্টিতে ঢুকে পড়েনি ওই সময়! একটা ঘোর মুর্খামি হয়ে যেত তাহলে।

বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর, সন্ধিপুর এলাকায় শাসক দলের ক্ষমতার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যায় গজানন।

ততদিনে হিরন্ময় মুখুজ্যাকে টেক্কা মেরে গজাননই স্থানীয় পার্টিতে শেষ কথা। ভণ্ডুল ছাড়াও তার ব্যক্তিগত চেলাচামুণ্ডাও ঢের। রতন আর সুবিকাশ তার অনুগামী ছায়া মাত্র। তখন গজাননের সঙ্গে সমানে সমানে তর্ক করবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। ওর হাজারো বজ্জাতি বুদ্ধির কথা ভেবে সবাই একেবারে সিঁটিয়ে থাকত।

ওই সময়কালের মধ্যেই গজানন এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা একটু একটু করে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল নদীটাকে। মজে মজে তার তখন মুমূর্ষু অবস্থা। গজানন তখন ব্লক-অফিসের খাস-জমি বিলি করবার কমিটির সদস্য। সেই সুবাদে, পুরো নদীটাকে, মোমিনপুর থেকে বেলমা অবধি টুকরো টুকরো করে দখল দিয়ে দিল অনুগত বশংবদদের। সেই মোতাবেক পাট্টা দেবার সুপারিশ পেশ করল ব্লক-অফিসে, কিনা, নামেই নদী উটা, এক আঁজলাও জল নাই। চাষবাসই ভালো হবে ওতে।

ততদিনে দখলদারেরা হালচাষ দিয়ে ধান বুনে দিয়েছে যে-যার টুকরোতে। মাস-দুই পরে যখন জেলারো অফিস থেকে সরেজমিনে তদন্ত করতে এল, পুরো নদীটার বুক জুড়ে সবুজ ধানখেত, হাওয়ায় সবুজ ঢেউ খেলছে সবুজ নদীর জলে।

তবুও আইন অনুসারে পাট্টা পাবার কথা নয়, কিন্তু তখন দেশ জুড়ে চলেছে জরুরি অবস্থা। মিসার প্রয়োগ চলছে ইচ্ছেমতো। ওপরতলা কথায়-কথায় মিসার ভয় দেখাচ্ছে নিচুতলাকে। তার ওপর দলের থানা-কমিটিতে তখন গজাননের দাপট খুবই। ফলে, দু'দিনেই বেরিয়ে গেল পাট্টা। একদিন সন্ধিপুর মাডোতলায় ঘটা করে পাট্টা-বিলি উৎসবের আয়োজন করল গজানন। বিডিও সাহেব এলেন, এম এল এ সাহেব এলেন। মাইক এল কেশিয়াড়ি থেকে। খানাপিনা, বক্তৃতা, হল। সারা এলাকার মানুষ নির্বাক হয়ে দেখল, তাদের কতকালের পুরোনো নদীটা উধাও হয়ে গেল, ওই জায়গায় বেশ ঢাকঢোল বাজিয়ে, উৎসব-অনুষ্ঠান করে বসিয়ে দেওয়া হল একটা বিশাল ফিতের মতো লম্বাটে চাষের জমি। কিন্তু গজাননের কোনও কাজের প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, সামান্য প্রতিবাদ করবার মতোও বুকের পাটা দেখাবার উপায় ছিল না তখন।

কেবল একমাত্র আমার ছোটোকাকাই গজাননের মুখের সামনে কথা বলবার হিম্মত রাখত।

শিখাবউদির দুর্দশা দেখতে দেখতে ছোটোকাকাই একদিন বলতে পেরেছিল, শিখার প্রতি তোরা খুব অন্যায় করতিছু কিন্তু। এককালে আমার সহপাঠী ছিল, একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি, যাত্রা-নাটক দেখতে গেছি, কিন্তু বল্লভটা যে ভিতরে ভিতরে এতখানি চামার...। তোদের আস্কারায় এমনটা করবার সাহস পাচ্ছে উ।

যত বড়ো নেতাই সে হোক, গজানন কিন্তু ছোটোকাকাকে মুখের সামনে ঘাঁটাতে সাহস পেত না। মিনমিন করে বলে, আমরা কী করব বল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া...।

—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া! ছোটোকাকা অকস্মাৎ খেপে যায়,—তোরা অফ হইয়া যা, বল্লভকে আমরা দু-দিনেই সিধা করিয়া দিই কিনা দ্যাখ। খোরপোষের টাকা যদি না আদায় করতে পারি তো...।

সে কথায় গজানন বিজোড় দাঁতে হাসে। এতক্ষণে সামান্য বিষ ওগরায় সে। মুচকি হেসে বলে, টুকচার সবুর ধর, তোমাদের জমানা আবার আসুক। তখন উকে টাইট দিও। এখন সে আমাদের পার্টির মেম্বর। তার গায়ে কাঁটার আঁচড়টি পড়লে,... বলতে বলতে কঠিন হয়ে আসে গজাননের মুখ।



জরুরি অবস্থার সময়ে বল্লভদার গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারেনি ছোটোকাকারা, সাতাত্তরের পরও পারল না।

সাতাত্তরে নন্দ জেঠারা পাকাপাকিভাবে এল বটে, আটাত্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও রমরমা ফল, তাও বল্লভদার বিচার করা গেল না, কেন কি, বল্লভদা আর গাঁয়ের পথ মাড়ালই না। তখন বেলদার পাকাপাকি বাসিন্দা সে। এবং হরেক কৌশলে বেলদার নেতাদের একটা অংশকে পটিয়ে ফেলতে পেরেছে। আর, নতুন বউয়ের কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বুঝি জোনাল কমিটির মেম্বার। সে নাকি কৌশলে বর্ম পেতে আড়াল করে রেখেছে বল্লভদাকে।

আটাত্তরে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ততদিনে পার্টির সংগঠনের চরিত্রে একটা আমূল রূপান্তর ঘটে চলেছে নিঃশব্দে। ওই নির্বাচনে দলীয়-সদস্যদের ভেতর থেকে সব প্রার্থী জোটাতে পারেনি নন্দ জেঠাদের পার্টি। ফলে, প্রার্থীর বেশে তখনই সুবল মণ্ডলের মতো কিছু বহিরাগত বেনোজল ঢুকে পড়ে পার্টিতে। তারা অতিশয় দ্রুতগতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির দিক ধাওয়া করতে থাকে। তাদের রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত করবার সময়ই পায়নি পার্টি। তাদের একটা বড়সড় অংশ মধ্যবিত্ত-জোতদারদের বাড়ির ছেলেপুলে ছিল। আশির দশকে পৌঁছে তারাই মোটামুটিভাবে গাঁয়েগঞ্জে পার্টি-সংগঠনের রাশটি ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার না থাকায় এবং মধ্যবিত্তদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি থাকবার দরুন এলাকায়-এলাকায় পার্টি সংগঠনের সিদ্ধান্তগুলিও অনেকক্ষেত্রে মধ্যবিত্তসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হতে থাকে। বল্লভদার ব্যাপারে কিছুতেই কঠোর মনোভাব না নেওয়াই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে পার্টিতে ঢুকে পড়া মধ্যবিত্ত অংশটি যে কেবল এলাকায় প্রকল্পগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিংবা বিচার সালিশির আসরে রায় দেবার ক্ষেত্রেই পদে পদে তাদের শ্রেণি-মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছিল তাই নয়, তারা একটু একটু করে আরও অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবককে ঢুকিয়ে নিতে থাকে পার্টিতে। তখন পার্টি সরকারি কর্মযজ্ঞে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলেছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, তার জন্য অনেক-অনেক শিক্ষিত মানুষ চাই সর্বত্র, নচেৎ ইংরেজিতে লেখা সরকারি নির্দেশনামাগুলিকেই বা পড়বে, মানে করবে, জবাব দেবে কে! কেই বা কোটি-কোটি টাকার স্কীম বানাবে, কাজ করাবে, খাতাপত্র-হিসেবনিকেশ ঠিকঠাক রাখবে, বৎসরান্তে অডিট করাবে! কেই বা নিত্যদিন গাদাগাদা মিটিং পরিচালনা করবে, রেজোলিউশন লিখবে, বিডিও-এসডিও এলে তাঁদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলবে! ইলেকশানের সময় কেই বা ভোটার লিস্ট তৈরি করা থেকে ইলেকশন ক্যাম্পেন, পোলিং এজেন্ট হিসেবে বুথ ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে ভোটের ফলাফলের হিসেব রাখা, সবকিছু ঠিকঠাক সামাল দেবে! খালি ইমোশনাল হইলে চলে! পার্লামেন্টের মাধ্যমে বিপ্লব কত্তে হইলে প্রচুর শিক্ষিত উদ্যোমী ছোকরা আমাদের চাই কমরেড। আর, পনেরো আনা শিক্ষিত ছোকরা যদি মধ্যবিত্ত পরিবারের হয় তো কী আর করা যাবে? দিনমজুর খেতমজুর পরিবার থিকে রাতারাতি অত শিক্ষিত ছোকরা তুমি পাচ্ছ কুথা? কিন্তু তার জন্য কি এলাকার যাবতীয় কাজকর্ম উন্নয়ন বন্ধ থাকবে? মনে রাখবেন কমরেড, আপনি বাঘের পিঠে চড়েছেন। নামবার কোনও উপায় নেই। নামতে গেলেই বাঘ আপনাকে খাবে। পার্টির মধ্যে এই তত্ত্বটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং ওই তত্ত্বের ফুটো দিয়ে সন্ধিপুর গাঁয়ে প্রথমে গজানন, তার লেজ ধরে রতন দাসের মতো অল্প শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোকরারা, এবং সবশেষে সুবিকাশের মতো একদা জোতদারদের পুত্রকন্যারা ঢুকে পড়ে পার্টিতে। এবং ওইসব শিক্ষিত ছোকরারা অন্যদের চেয়ে অধিক চালাক চতুর, বাকপটু এবং ট্যাক্টফুল হওয়ার সুবাদে খুব দ্রুত পার্টির ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি দখল করে ফেলে।

ততদিনে নন্দ জেঠা প্রায় অথর্ব। ছোটোকাকার মধ্যে প্রবল নীতিবোধজনিত এক ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল, সেই সুযোগে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, এ তিন থাকতে নয়' নীতিতে বিশ্বাসী গজানন খুব অল্প সময়ের মধ্যে সন্ধিপুরের পার্টি-সংগঠনটিকে কব্জা করে ফেলে, এবং একটা সময় আসে, যখন

সে-ই লোকাল সংগঠনে শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু ভোটভিত্তিক রাজনীতিতে সমর্থকের সংখ্যা একটা বড়োসড়ো ফ্যাক্টর, একটা সময় আসে, যখন যার পকেটে বেশি লোক, সে চোর, ছ্যাঁচোড়, লম্পট যাই হোক না কেন, পার্টিতে তারই কদর বেড়ে যায় রাতারাতি। আর, গজানন যেহেতু চিরকালই মানুষ ক্ষেপানোয় ওস্তাদ, নানাজনকে নানান বৈধ-অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ম্যানেজ করে রাখবার শিল্পটি তার করায়ত্ত। একসময় পার্টির ওপরমহলও তাকে সহ্য করতে বাধ্য হয়।

গজাননের এইসব গুণের খবর আগে থেকেই জানা ছিল পার্টির ওপর মহলের নেতাদের। ফলে, তার পার্টিতে ঢোকার প্রবল বিরোধিতা করে নন্দ জেঠারা যখন সোচ্চার হন এই যুক্তিতে যে, গজানন একজন পাক্কা কংগ্রেসি, তখন ওপরতলার নেতারা খুব নরম গলায় এদের বুঝিয়ে দেন যে, এই দুনিয়ায় কেউই কম্যুনিস্ট হয়ে জন্মায় না, আমাদের পার্টিতে এমন অনেক শীর্ষ-স্থানীয় নেতা রয়েছেন যাঁরা কংগ্রেসি হিসেবেই তাঁদের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। তাতে কিছু যায় আসে না।

ফলে, পার্টির ওপর মহলে নন্দ জেঠা এবং ছোটোকাকাদের কদর দিনদিন কমছিল, গজাননের কদর বাড়ছিল।

এমনি একটা সময়ে আমার এবং ছোটোকাকার পরামর্শে পার্টির বিচার চেয়ে দরখাস্ত পেশ করে শিখাবউদি।

একদিন বিচারও বসে। সেই বিচারের আসরে প্রচুর লোক সমাগমও হয়। বল্লভদার সঙ্গে তার শহুরে বউয়ের রগড়টা কতখানি জমে ওঠে, সেটাই প্রত্যক্ষ করবার বাসনায় ভিড় জমায় সবাই।

কিন্তু বিচার শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরা আসরের দখল নিয়ে নেয় গজানন।

মূলত একটা পয়েন্টের ওপরই জোর দিতে থাকে সে প্রথম থেকেই, কি-না, পুরুষমানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে সহ্য করা তার পক্ষে মুশকিল। একটা বিবাহিত মেয়ে যদি মাথা থেকে টোপর খোলার আগে থেকেই নিজের লাভারকে লিয়া সাতকাহন বলতে থাকে, কথায় কথায় লাভারকে লিয়া গদগদ হয়, তবে তাকে কী বলা যায়? বিয়ে করা স্বামী রইল কোথা, বউ দিনরাত পল্টুদা-পল্টুদা করিয়া পাগল! কথায় কথায় পল্টুদা বলতে অজ্ঞান! উঠতে পল্টুদা, বসতে পল্টুদা, শয়নে-স্বপনে-নিশিজাগরণে, একটাই নাম জপ করতিছে একটা বিবাহিত মেয়া! বল্লভদাও তো রক্ত মাংসের মানুষ, না-কি? তার শরীরেও তো রাগরোষ আছে। লাগাতার নিজের বউয়ের মুখে পরপুরুষের নামজপ চলতে দেখলে তার মনটাও তো ভাঙিয়া যাইতে পারে। তাকে আমরা দোষ দিই কুন যুক্তিতে? তাও তো তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তার ধৈর্যের প্রশংসা কত্তে হয়, কেন কি, এতদসত্ত্বেও সে শিখাবউদিকে লিয়া এতগুলা বচ্ছর কাটাল। কিন্তু মানুষের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। তার হয়্যা বলবার কেউ নাই বলিয়া তাকে বিনা দোষে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া দিতে হবে, আর কারও পক্ষে ওকালতি করবার লোক আছে বলিয়া তার সাত খুন মাফ, এই যদি তুমাদের বিচার হয় তো আমার কিছু বলবার নাই। তবে বিচারের আসনে বুসিয়া স্পষ্ট কথাটা আমাকে কইতেই হবে।

বাস্তবিক, শিখাবউদি চিরকালই তার ওই পল্টুদা নামক রহস্যময় চরিত্রটিকে নিয়ে এতটাই সোচ্চার, সারা এলাকার মানুষ এত উপলক্ষ্যে এতবার শুনেছে ওই লোকটাকে নিয়ে শিখাবউদির আদিখ্যেতা মেশানো কথাবার্তা, কারুর এমনটা মনে না হয়ে যায় না যে, পল্টুদা নামক রূপবান মানুষটার প্রতি শিখাবউদির নিদারুণ দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই সাদা চোখে গজাননের যুক্তিটাকে অকাট্য বলে মনে হতেই পারে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষজনের কাছে।

ফলে, বিচারের প্রথম পর্ব থেকেই শিখাবউদির চরিত্র সম্পর্কে একটা অস্বস্তিকর ধারণা তৈরি করে ফেলতে পারে গজানন। তাতেই তার চোদ্দআনা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়।

তাও সেদিন লড়াইয়ের ময়দান থেকে সহজে পিছু হটতে চায়নি ছোটোকাকা। শিখাবউদির হয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ লড়াই চালিয়েছিল সে। কিন্তু তার যুক্তিগুলো খুব গ্রহণযোগ্য হয় না মানুষজনের কাছে, কেন কি, ঘর কচ্ছে একজনের সঙ্গে, মন দিয়ে বসে আছে অন্যকে, এ কেমনধারা কথা? তা বাদে, স্বামীই বোঝে তার স্ত্রীর চরিত্রের খাঁটি খবরটি। বল্লভ হয়ত বা ভেতরে ভেতরে তেমন কোনও প্রমাণ পেয়েছে,

নচেৎ বিয়ের এত বছর বাদে, ছেলেপুলে হয়ে যাবার পর, সে আবার নতুন করে সংসার বাঁধতে চাইবে কেন?

এরপর গজানন অস্ত্র তাক করে শিখাবউদির দিকে। বলে, শিখাবউদির সেই নাগরটির সম্পর্কে আরও খবর জানতে চাইলে তাও দেওয়া যাবে, কেন কি, ওর ভাই ভণ্ডুল এই এলাকাতেই রয়েছে, এবং সে ওই পল্টুর সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে আমাদের। এখানে উপস্থিত অনেকেই সে-কথা শুনেছে। নিজের ভাই হয়্যা দিদির নামে শুধুমুদু অপবাদ দিবে কেন ভণ্ডুল? মিছা বলিয়া তার লাভ?

—লাভ? লাভ কি হে, বরং তার সমূহ ক্ষতি, কেন কি, এতদ্বারা তার সহোদরা দিদির ঘরটি ভাঙতে বসেছে।

গজানন এবার পুরো প্রসঙ্গটায় এই বলে ইতি টানতে চায় যে, কথায় বলে, হাঁড়ি ভাঙলে খপ্‌রা, মন ভাঙলে ফোঁপরা। কাজেই, এত কথার পরও তুমরা জোর করিয়া দুজনকে এক শিকলে বাঁধিয়া দিতে পারো, কিন্তু তাতে সমস্যার তিলমাত্র সমাধান হবেনি। মাঝের থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তি, লোকহাসানি আরো বাড়বে। মনেরই যেখানে মিল নাই, সেখানে একসাথে থাকা না থাকা সমান, এই সহজ কথাটা যে তুমরা কেন বুঝতে পারছোনি...!

—কিন্তু বল্লভ উকে ছাড়িয়া দিলে, খোরপোষ না দিলে, বাচ্চাটাকে লিয়া উ যাবে কোথা? খাবে কি?

—ক্যানে? চলিয়া যাউ অর পল্টুদার পাশ। সে নাকি হাত ধুইয়া বুসিয়া আছে। শিখাবউদি নিজেই তো বহুবার আমাদের পাশ বলেছে তেমন কথা। কি রে শঙ্কর, বলেনি?

যে শিখাবউদি চিরটাকাল এর-ওর জন্য কলকল করে ঝগড়া করেছে, সেদিন বিচারের স্থলে সারা সময়টা একটি কথাও বলেনি সে। নিজের সম্পর্কে এতএত আপত্তিকর কথা শুনতে শুনতেও তার মুখমণ্ডলে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখিনি সেদিন। সে কেবল মাঝেমাঝে করুণ চোখে তাকাচ্ছিল নন্দ জেঠার দিকে। কিন্তু নন্দ জেঠাকে সেদিন দেখে আমার মনে হয়েছিল, চাকাটাকে ঠিক দিকে ঘোরাবার তিলমাত্র শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। সেই আগের দিনের মানুষটির আর কোনও কিছুই অবশিষ্ট নেই আজ। একেবারে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো অবস্থা তার।



সাতষট্টিতে যমুনা নদী সর্বসাধারণের সম্পত্তি হল বটে, কিন্তু এ দেশে সরকারের জিনিস হলে যা হয়, দশ ভূতে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে সর্বদাই। আমাদের কলেজ-জীবনে ওই নিয়ে একটা চালু রসিকতা খুব ঘুরত মুখেমুখে। ট্রেনের কামরায় দেয়াল জুড়ে লিখে রেখেছে রেল-কোম্পানি, 'এই রেল ভারতের জাতীয় সম্পত্তি। যথেচ্ছ ব্যবহারের হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা আপনার পবিত্র কর্তব্য।' কোন এক রসিক প্যাসেঞ্জার নাকি ওই লেখার পাশেই 'জাতীয় সম্পত্তি হইতে নিজের অংশ কাটিয়া লইলাম' লিখে দিয়ে কামরার একটি পাখা খুলে নিয়ে গেছে। এমনটা হয়ত সত্যিই ঘটেনি, কিন্তু আমাদের দেশে সর্বসাধারণের সম্পত্তিকে মানুষ চিরকালই বিধবার বেগুন-খেত গোছের ভাবে, অর্থাৎ কি-না, ওই খেত থেকে যে-কেউই তুলে নিতে পারে বেগুন, পাহারাও নেই, প্রতিবাদও হবে না।

যমুনা নদীর ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। যেই না বোঝা গেল যে, নদীটার নির্দিষ্ট কোনও শক্তপোক্ত অভিভাবক নেই, অমনি বারভোগ্যা হয়ে যেতে লাগল সে নদী। দু-পাশের চাষিরাই একটু একটু করে হাতিয়ে নিতে লাগল নদীটাকে। ওরা প্রত্যেকেই ফি-বছর একটু একটু করে নদীর জমি কোদাল দিয়ে কেটে কেটে মিশিয়ে নিচ্ছিল নিজেদের চাষজমির সঙ্গে। ফলে, আমাদের প্রিয় নদীটা একটু একটু করে চুরি হয়ে যেতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই নদীর দু-পাড়ের অনেকখানি জমিই কিছু চতুর চাষির ব্যক্তিগত চাষের জমির মধ্যে ঢুকে গেল।

যেটুকু তাও পড়ে রইল, সরু, ক্ষীণকায়া, মজতে মজতে অগভীর, সেটুকুও ভাল করে সংস্কার করে,

গভীর ও শেচযোগ্য করে তোলার চাড় তো কেউ দেখালই না, বরং যেটুকুও বা নদীপদবাচ্য হয়ে টিকে ছিল, সত্তরের দশকে এসে সেটুকুও গজাননের নেতৃত্বে একেবারে লুট হয়ে গেল। আমরা কেউই সে লুণ্ঠন ঠেকাতে পারিনি।

গজানন যখন হিরন্ময়দের পার্টিতে ঢোকে, তখন নদীটার বুকে আর জল বলে কিছুই নেই। খাতটুকুও মজতে মজতে একেবারেই চারপাশের ধানী জমির বরাবর হয়ে গিয়েছে। তার বুক জুড়ে বেনাগাছের ঝোপ আর বনকলমির জঙ্গল।

সাতাত্তরে যখন পুনরায় পার্টি ক্ষমতায় ফিরল, তখন নন্দজেঠার নড়াচড়ার ক্ষমতাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। তখন সংখ্যাতত্ত্বে খুব বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে পার্টির, এবং গজানন ছলে বলে কৌশলে ততদিনে কিছু মানুষ পোকাকে পকেটস্থ করে ফেলতে পেরেছে। পুরো নদীটাকে চাষের অযোগ্য অভিধায় ভূষিত করে, প্লটে প্লটে ভাগ করে বেঁটে দিয়েছে সেইসব স্নেহধন্যদের। কথাটা যে সত্যি, তা মালুম হল পরের মরসুমে। যারা নদীটার বিভিন্ন টুকরোর দখল পেয়েছে, তারা যে-যার জায়গার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে হালচাষ দিয়ে ফসল বুনে দিল প্রথম বর্ষায়। তখন গাঁয়ে গজাননই শেষ কথা। সামান্য আপত্তি জানিয়েছিল আমার ছোটোকাকা, কিন্তু তার আপত্তি ধোপে টেঁকেনি।

চুরি যাওয়া নদীটার জন্য আমার মাঝেমাঝেই মন খারাপ করত খুব। কারণ, সেই ছেলেবেলা থেকেই নদীটি আমাকে মাঝেমাঝেই স্বপ্ন দেখাত। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য সব স্বপ্ন। পরের দিন সকালে উঠে যাকে বলতাম, সবাই অবিশ্বাসী চোখে তাকাত। এমন কি কল্পনাথও। বলত, যাহ্, তাই কখনো হয়?

শুধু যে স্বপ্ন দেখাত তাই নয়, নদীটা প্রায়ই আমার সামনে স্বপ্নের মতো অবাস্তব, অশরীরী, বায়বীয় হয়ে উঠত।

গ্রাম পেরোলেই উঁচালি-নিচালি ধানের জমি, দিগন্তবিস্তৃত, তারই মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গিয়েছে নদীটি, জমির উঁচুউঁচু আলের আড়ালে মাঝেমাঝেই অক্ষিপট থেকে হারিয়ে যেত সে। মাঝেমাঝে খুবই ভ্রম হত, মনে হত, ওইখানে বুঝি নদীটা। কিন্তু সেই জায়গাটাতে পৌঁছোনো মাত্র বোঝা যেত, ওখানে নয়, নদীটা আরও খানিক সামনে। কিন্তু যেহেতু তেমন অনুভূতির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে মনে হত যে, ওইখানেই নদীটা লম্বালম্বা ঘাস এবং সারবন্দী বেনাঝোপের মধ্যে শুয়ে রয়েছে, নদীটাকে ওই জায়গায় দেখতে না পেয়ে নিদারুণ ধন্ধ জাগত মনে, এবং হঠাৎই মনে হত, নদীটা ওইখানেই ছিল। মানুষের উপস্থিতি টের পেলে সাপেরা যেমন অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার ওপর থেকে নিঃশব্দে সরে যায়, ঠিক তেমনই, আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ভীত, শঙ্কিত নদীটি নিঃশব্দে সরে গিয়েছে নিরাপদ তফাতে। কারণ, মানুষকে মনে মনে ভয় করে, ঘৃণা করে দুনিয়ার সমস্ত জীব, উদ্ভিদ, এবং নদী, হাওয়া, আকাশ, মাটিজাতীয় প্রকৃতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, এমন কি, তেমন তেমন মানুষকে দেখলে ভীত, শঙ্কিত হয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়, কোনওগতিকে লুকিয়ে ফেলে নিজেকে।

বাস্তবিক, নদীটাকে মাঝেমাঝে হারিয়ে ফেলতাম আমি। কতদিন এমন হয়েছে, নদীর পাড়ে বসে কিছুটা সময় কাটাব কিংবা কিছুটা দুঃখের কথা বলে হালকা হব ভেবে সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে চুপিচুপি পা টিপেটিপে নদীটার কাছে গিয়ে নদীটাকে কিছুতেই খুঁজে না পেয়ে মনের মধ্যে বিষম ধন্ধ নিয়ে ফিরে এসেছি, আর সেই রাতেই নদীটা আমার কাছে চলে এসেছে স্বপ্নে।

আমি ক্ষেপে উঠে শুধিয়েছি, কোথা থাকো তুমি? কোথা ছিলে? আমি গেলাম আর ফিরিয়া এলাম।

মুচকি হেসে নদী বলে, আমি তো কাছে পিঠেই ছিলাম। দেখতে পাসনি তুই।

—বাজে কথা। আমি গোটা এলাকা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজছি।

—ছিলাম ছিলাম। আসলে, তুই ভারি অন্যমনস্ক, ভারাক্রান্ত ছিলি তখন, বড়োই অস্থির, উচাটন ছিল মন, তোর চোখটাই কাজ করেনি ঠিকঠাক। থাকলে ঠিকই দেখতে পেতিস, পাশের বেনাঝোপের সারিটার আড়ালেই শুয়্যা ছিলাম আমি।

পুরো ছেলেবেলাটা আমি নদীটার সঙ্গে খেলেছি কত কিসিমের খেলা। শিখাবউদিকেও শিখিয়েছি নদীর সঙ্গে খেলবার কতই না নতুন নতুন তরিকা। ঘোর যৌবনে আর এক কিসিমের খেলা খেলতে

থাকি ওর সঙ্গে। ছেলেবেলায় খেলতাম নদীটার সঙ্গে, আর যৌবনে খেলতে থাকি একটা না-নদীর সঙ্গে।

অবশেষে অনেক দিন বাদে শিখাবউদিই নদীটার পরিত্রাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এবং অনেক ঝড় ঝাপটা সয়ে চুরি যাওয়া নদীটাকে খুঁজে বের করে সে পুনরায় উপহার দেয় সন্ধিপুরের মানুষকে।

এমন একটা দিনের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, যেদিন দেখব, শিখাবউদি তার যাবতীয় অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আবার আগের মতো সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। একেবারে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ কিংবা তার স্বপ্নের সুলতানা রিজিয়ার মতো নিজের ভাগ্যের ঘোড়াটির পিঠে চড়ে বসে শক্ত করে টেনে ধরেছে তার লাগাম। কারোর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে।

একদিন তেমন আভাস পেয়ে গেলাম। হপ্তা অন্তে গ্রামে ফিরে শিখাবউদির বাড়িতে গিয়ে দেখি, মোমিনপুরের রহমত চাচা বসে রয়েছে দাওয়ায়। গভীর মনোযোগ সহকারে কী যেন বোঝাচ্ছে।

সন্ধিপুর থেকে অল্পদূরে মোমিনপুর। খুবই গরিব গ্রাম। জমিন জিরেত বলতে তেমন কিছুই ছিল না কারোর। তাল-খেজুরের রস নামানো, গোরু-ছাগলের বিকিকিনি, লুঙ্গি চাদরের ফেরিওয়ালাদের মুটেগিরি, এইসব সাত-সতেরো কাজকর্ম করে দিন গুজরান হত না বললেই চলে।

রহমত চাচা হেসে বলে, সে হাল এখন নাই গো বউদিমণি, বেল আর কুরচি মালার কল্যাণে বাঁচিয়া যাচ্ছে মোমিনপুরের লোকগুলা।

বলতে বলতে শিখাবউদিদের দাওয়ায় বসে এমন একখানা ডগোমগো ছবি আঁকে সে, যা শুনে যে-কারোর মনে হবে, বেল আর কুরুচি কাঠের মালা বানানোর তুল্য লাভজনক কাজ বুঝি দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

রহমত চাচা অনেকক্ষণ ধরে বোঝায় প্রক্রিয়াটা।

পাকা বেল, খুব ভালো জাতের হওয়ার দরকার নেই, ভেতরের শাঁসটা ফেলে দিয়ে খোলাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তারপর রোদ্দুরে খোলাগুলো শুকিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে কেটেকেটে গোলাকার পুঁতির মতো বানাতে হয়। কুরচি কাঠের মালার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি।

শিখাবউদি মন দিয়ে শুনছিল। একসময় তাকায় আমার দিকে। ম্লান হেসে বলে, খুব অবাক কাণ্ড, তাই না? মুসলমানেরা মালা বানাচ্ছে, সেই মালা পরে ধর্ম করছে সাত্ত্বিক হিন্দুর দল। এ দুনিয়ার নিয়ম কানুন, রীতিনীতি কী বিচিত্র!

বেল আর কুরচির মালাই শেষমেশ বাঁচিয়ে দিল শিখাবউদি আর বাবুনকে। শুধু বাঁচিয়ে দিলই নয়, ফিরিয়ে দিল শিখাবউদির অনেককিছু, যা সে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেছিল বলে মনে হচ্ছিল আমার। তাদের মধ্যে প্রধান জিনিসটা হল, শিখাবউদির অনমনীয় তেজ, যা দেখে আমরা এককালে আমাদের অ্যামেচার নাটকের দলে 'ঝাঁসির রানি' পালায় ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের ভূমিকায় নামাতে চেয়েছিলাম ওকে।

মোমিনপুর গ্রামটার অবস্থানই এমন, শিখাবউদিদের পাড়ার দিকটাতেই প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে সন্ধিপুরকে। গাঁয়ের ধর্মভীরু এবং রক্ষণশীল মানুষজনের আশংকা, জনসংখ্যা আর খানিক বাড়লেই নাকি শিখাবউদিদের এলাকায় এসে সন্ধিপুর আর মোমিনপুর গ্রামদুটো মিশে যাবে।

—বেশ হবে। ইলচি করে বলে আশংকিত হিন্দুরা, অর্ধেক দামে গরুমাংস পায়াবি।

আর, আশান্বিত মুসলমানেরা, বিশেষ করে ঠাকুমা-দিদিমার বয়েসী মহিলারা উঠতি ছোকরাদের ইলচি করে বলে, ভালোই তো হবে। কাছাকাছি ঘরবাড়ি হইলে দিব্যি প্রেম করিয়া হিঁদুর মেয়াগুলাকে টপাটপ বিয়া করতে পারবি তোরা। হিঁদুর মেয়াদের গায়ে কী সোন্দর সুবাস! আমাদের মতো প্যাঁজ-

রসুনের গন্ধ নাই।

যেদিন বাবুনকে নিয়ে সত্যিসত্যি মোমিনপুরে চলে গেল শিখাবউদি, ওকে দেখে মোমিনপুরের মেয়েগুলো ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকে, এবং অতি আড়ষ্ট গলায় জানায় যে, শিখাবউদির নাম তারা হরেক সূত্রে বহুবার শুনেছে, বিশেষ করে ভীমমেলার ভাটিখানা ভাঙা তো এতদঞ্চলের একটি স্মরণীয় ঘটনা। মোমিনপুরের মেয়েরা তো কতবার নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে করতে এমন সিদ্ধান্তও নিয়েছে যে, বছর বছর ঈদ উৎসবে যে মেলা বসে মোমিনপুরের ডাঙায়, ওই মেলায় শিখাবউদিকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। সে এসে মেলার এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে গজিয়ে ওঠা হাফ-ডজন ভাটিখানাকে ভাঙিয়া দিয়া যাউ। সে ছাড়া আর কেউই এটা পারবেনি। মোমিনপুরের মেয়েরা ফিসফিসিয়ে এ-ও জানায় যে, জমিদারের শালাকে যে একবার জব্দ করেছিল শিখাবউদি, সে খবরও কাগের মুখে পৌঁছে গেছে তাদের কাছে। কিন্তু সেই বীরাঙ্গনা মেয়েটি যে কোনওদিন পায়েপায়ে হেঁটে চলে যাবে ওদের গাঁয়ে, মোমিনপুরের মেয়েরা বুঝি কল্পনাও করেনি তা।

পরবর্তীকালে, যখন শিখাবউদি ওদের প্রত্যেকেরই একান্ত আপনজন, ওরা দুচোখ কপালে তুলে মাঝেমাঝেই বলত, কত কথাই যে তুমাকে লিয়া শুনতাম আমরা, হায় দিদি গো. । মানুষের সাথে না মিশলে তাকে বুঝা যায় না।

এক সময় শিখাবউদি বেল আর কুরচির মালা তৈরির কাজে নেমে গেল পুরোদমে। আর, ওই কাজটাই ওকে বাঁচিয়ে দেয়। শুধু বাঁচিয়ে দেয় না, আবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার আগের স্বভাবে। সেটা বোঝা গেল মাস কয়েক বাদে।

একদিন, সেটা বোধ করি ফাগুন মাস, গ্রামে ফিরে শিখাবউদির বাড়িতে গিয়ে দেখি, শিখাবউদি বাড়ি নেই।

বাবুন বলল, মোমিনপুর গেছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

দেখি, শিখাবউদিদের উঠোনে ডাঁই করা রয়েছে শুকনো বেলের খোলা।

মোমিনপুর গায়ে-লাগোয়া পাড়া, পায়ে পায়ে চলে গেলাম।

দেখি, রহমত চাচার উঠোনে মেয়েদের মিটিং বসেছে। বক্তৃতা দিচ্ছে শিখাবউদি।

অল্পক্ষণ শুনেই বুঝে নিতে পারি ব্যাপারটা। অনেক দিন ধরে পাইকারদের কাছে মালার দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিল শিখাবউদিরা। পাইকাররা কানেই তুলছিল না। বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শিখাবউদি। এবং সেই সুবাদে আজ তিনদিন মোমিনপুর গাঁয়ে মালা তৈরির কাজ বন্ধ।

রহমত চাচা বসেছিল দাওয়ায়। মিটিমিটি হাসছিল। ইঙ্গিতে আমাকে ডাকে পাশটিতে। বসতেই ফিসফিস করে বলে, শুনলে তো? ধর্মঘট।

বলি, শুনলাম। কিন্তু ভয় করছে খুব।

—কেন?

—যদি পাইকাররা আর মালা-ই না নেয়? এতগুলো মেয়ের রুজি-রোজগারের প্রশ্ন।

রহমত চাচা চোখ নাচায়, লিবেনি মানে? অদের বাপ লিবে। সামনে চৈত-বোশেখ মাস। নাম-সংকীর্তনের ধুম ছুটবে চতুর্দিকে। হু হু করিয়া বিক্রি হবে মালা। পাইকারদের রমরমে ব্যবসার সময় এটা। সারা গাঁয়ে কত কত দাদন দিয়া রাখছে অরা, কেবল এই মরসুমটার কথা ভাবিয়া। জলদি জলদি মালা সাপ্লাই করতে না পারলে অদের কত লোকসান হবে জানিস? শিখা বউমা বড়ো ভালো টাইম বাছিয়া লিছে। বড়ো পাকা মাথা মেয়াটার!

কাছে গিয়ে বলি, একেবারে ট্রেড-ইউনিয়ন লিডার হয়ে উঠেছ যে! ধান্দাটা কি?

—ঠিক বলেছিস। আমার দিকে কটমট করে তাকায় শিখাবউদি, আমাদের দেশে মানুষ তো সবকিছুই করে কোনও না কোনও ধান্দার জন্য। ধান্দা না থাকলে ছেলেও মাকে মা বলে ডাকে না।

—তোমার ধান্দাটা কি?

—দেখি—। শিখাবউদি ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দে হাসে। বলে, আপাতত মজুরিটা বাড়লে বাবুনের

জন্য খানকতক বই কিনি।

রহমত চাচার কথাই সত্যি হয়। হপ্তা না যেতেই মাথা নোয়ায় পাইকারের দল। মালার দাম বাড়ে।

তিরাশির পঞ্চায়েত-ভোটের প্রাক্কালে একদিন শিখাবউদি যখন তার সিদ্ধান্তটা একান্তে আমাকে জানাল, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, সত্যিই ভোটে দাঁড়াবে তুমি?

আমার ওই প্রবল বিস্ময় শিখাবউদিকে সামান্য বিরক্ত করেছিল বুঝি। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে খুব স্পষ্ট গলায় বলেছিল, কেন? আমার পক্ষে ভোটে দাঁড়ানো কী এমন অসম্ভব প্রস্তাব শুনি? নাকি, তুইও গজাননের মতোই বিশ্বাস করিস যে—। শিখাবউদির গলা থেকে এমন এক অচেনা স্বর ভেসে আসে, আমি গুটিয়ে নিই নিজেকে।

বলি, না, মানে, আমি ভাবছিলাম—।

শিখাবউদির মধ্যে এই তেজটা তো নতুন কিছু নয়। সেই ছেলেবেলা থেকে আমরা তার সাহস আর তেজ দেখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু তাই বলে সে একেবারে ভোটে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। কারণ, যে সময়ের কথা বলছি, তখন শিখাবউদির জীবনে দুর্যোগের ইয়ত্তা নেই। দুর্ভাগ্য বুঝি তখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে। বাবুনকে নিয়ে তখন সে প্রাণপণে লড়ে চলেছে চারপাশের সবাইয়ের. সবকিছুর সঙ্গে। আমি প্রতিমুহূর্তে আশংকা করছি, এই না শিখাবউদি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল! ওর অবসাদক্লিষ্ট মুখখানি দেখতে দেখতে আমার তো মাঝেমাঝেই মনে হত, আমাদের সেই চিরপরিচিত, সেই লড়াকু শিখাবউদিটি বোধ করি হারিয়েই গেল তবে।

তখন সবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। পার্টির লোকাল নেতা হিসেবে গজানন তখন দিনরাত তিন ঠ্যাংয়ে নাচছে। প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা বানিয়ে জোনাল অফিসে পাঠাবার দায়িত্ব তারই ওপর ন্যস্ত করেছে পার্টি। গজাননের তাই দিনরাত নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। সি.পি. এমের প্রার্থী হিসেবে অন্যদের সঙ্গে বল্লভদার নামটাও খুব ভাসছে হাওয়ায়। দিন কয়েকের মধ্যেই ফাইনাল হয়ে যাবে সবকিছু।

ঠিক তেমনই মুহূর্তে শিখাবউদি আচমকা আমায় একান্তে জানিয়ে দেয় তার সিদ্ধান্তের কথা।

প্রাথমিক বিস্ময় আর হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমি ওকে শুধোই, কোন্ পার্টির থেকে দাঁড়াতে চাইছ?

শিখাবউদি অল্পক্ষণ ভাবে। একসময় বলে, গজাননের দল তো আমাকে টিকিট দেবে না। নন্দ জেঠা ক্ষমতায় থাকলে তবুও একটা কথা ছিল। আমি নির্দল হিসাবেই দাঁড়াব।

আমি জানি, এক তীব্র আক্রোশের বশে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে শিখাবউদি। কারণ, আমাদের এলাকায় সি পি এমের এমন নিরঙ্কুশ প্রভাব, নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে কারোর পক্ষেই জেতা তো সম্ভব নয়ই, জামানত জব্দ হওয়ারও ষোল আনা সম্ভাবনা। মাঝের থেকে শিখাবউদির ওপর গজাননদের আক্রোশ আরও বেড়ে যাবে। এখনো অবধি ভিটেছাড়া হয়নি, এরপর তাও হবে।

তবুও শিখাবউদির গনগনে চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে নিরস্ত করতে সাহস হয়নি আমার। বলি, যা করবে ভালো করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কর।

—ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু তোকে কথাটা বলছি অন্য কারণে। যদি দাঁড়াই, তুই আমার ইলেকশন এজেন্ট হবি?

—আমি? হকচকিয়ে গিয়ে বলি আমি।

আমাকে এভাবে আঁতকে উঠতে দেখে বিস্ময়ে ছোটো হয়ে আসে শিখাবউদির চোখ। বহু কষ্টে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সে। বলে, থাক তাহলে। ইলেকশন এজেন্ট ছাড়াই লড়ব আমি।

শিখাবউদির দু-চোখে, চাপা আগুন।

'যারা দাঁড়িয়া পিসাব কত্তে পারে না, তারা আবার ভোটে দাঁড়িয়া মানুষের কাজকাম করবে!'

শিখাবউদি পঞ্চাৎ ভোটে দাঁড়াচ্ছে, কথাটা চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রাম জুড়ে একটা উত্তেজনার তরঙ্গ বয়ে গেল। সন্ধিপুরের নিস্তরঙ্গ দিঘিতে একটা বড়োসড়ো ঢিল। তরঙ্গ ছুটল চতুর্দিকে। আর তখনই গজানন বলেছিল ঐ কথাটা।

শিখাবউদির ভোটে দাঁড়াবার কথা শুনে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরও একটা কথা বলেছিল গজানন। বলেছিল, ছাগল দিয়ে হালচাষ নাই হয় হে, তা হলে লোকে বলদ কিনত?

সন্ধিপুর আর মোমিনপুর মিলে দুটো বুথ, অর্থাৎ গ্রাম-পঞ্চায়েত ভোটের ক্ষেত্রে দুটি নির্বাচনকেন্দ্র। মোমিনপুরের গোটা আর সন্ধিপুরের কায়েতপাড়া, মাঝিপাড়া আর কুমোরপাড়া নিয়ে একটা কেন্দ্র, সন্ধিপুরের বাকিটা নিয়ে আর একটা। শিখাবউদি প্রথম বুথটাতেই দাঁড়িয়েছে। গজাননের দল ওই বুথে একরাম চাচাকে দাঁড় করিয়েছে।

একরাম চাচা বেশ ভালোমানুষ এবং পুরো মোমিনপুর গাঁয়ে খুব জনপ্রিয়। সে জিতবেই এবং খুবই অঘটন না ঘটলে প্রধানও হবে। এইসব কারণে অনেক মানা করেছিলাম তাও ওই বুথেই দাঁড়ায় শিখাবউদি। তখনই বুঝেছিলাম, শিখাবউদি লোক হাসাতে চলেছে। ওই বুথে গোহারান হারবে সে।

শিখাবউদি আকাশের বুকে দু-চোখ ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, আমি তো জীবনভর হারিয়াই আছি ভাই। জিতলাম আর কবে? এ আর আমার কাছে নতুন কি!

সন্ধিপুরের অপর প্রান্ত থেকে সেবার গজানন নিজেই দাঁড়িয়েছে। রতন দাস তার ইলেকশন এজেন্ট। আমাদেরই সহপাঠী ছিল সে, আমার আর কল্পনাথের একান্ত অনুচর ছিল। সেই ছেলেবেলা থেকেই এক ধরনের দাস্যভাব দেখেছি তার মধ্যে। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার বেলায়ও চাকর-চাকর ভাব করত। সারা জীবনেও সেই দাস্যভাগ গেল না। বর্তমানে সে গজাননের দাস। যমুনা নদীর এক টুকরো তাকেও দিয়েছে গজানন।

গজাননের বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছে হিরন্ময় মুখুজ্যার ছেলে সুবিকাশ। সেও আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু।

প্রচারের লড়াইটা চলছে মূলত কংগ্রেস-সিপিএমে। শিখাবউদির মতো নির্দল প্রার্থীদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না।

শিখাবউদির প্রথম জনসভাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমি। শুধু প্রত্যক্ষদর্শী কেন, আমিই অধিকাংশ সভার সভাপতিত্ব করেছিলাম। লোকজন বড়ো একটা হত না। রহমত-চাচার মতো দু-চারজন। শিখাবউদি ওদের সামনে খুব সহজবোধ্য ঘরোয়া ভাষায় দু-একটি কথা বলতে বলতে একসময় একটি অলীক প্রস্তাব দিয়ে বসত জমায়েতের সামনে। কণ্ঠস্বরে খুব আবেগের ফেনা মিশিয়ে আমাদের হারিয়ে যাওয়া নদীটার প্রসঙ্গ তুলত।

বলত, আমাকে যদি জেতান আপনারা, তবে আপনাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় নদীটিকে খুঁজে এনে বসিয়ে দেব, যেখানে এককালে বইত ও।

গোটা মোমিনপুরের মানুষ বুঝি থরথরিয়ে কেঁপে উঠত কথাটা শুনে। অনেকদিন বাদে তাদের হারিয়ে যাওয়া নদীটি বুঝি চকিতের তরে দৃশ্যমান হত কল্পনায়।

মিটিং ভেঙে যাবার পর সবাই ফিরে যেত যে-যার ঘরে, সারা সন্ধে হয়ত বা ওই নদীটার স্বপ্নেই বুঁদ থাকত। ওই কদিন হয়ত বা প্রত্যেকের ঘুমের মধ্যে আনাগোনা করত নদীটা। হয়ত স্বপ্নটা স্থায়ী হতে চাইছিল প্রত্যেকের বুকের মধ্যে। নইলে, নির্দিষ্ট দিনে অমন বিপুল ভোটে ওরা জেতাবে কেন শিখাবউদিকে!

বাস্তবিক, সন্ধিপুর কেন্দ্রে খুব প্রত্যাশিতভাবেই হেরে গেল সুবিকাশ, গজাননই জিতল বিপুল ভোটে, কিন্তু মোমিনপুর কেন্দ্রে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে শিখাবউদির কাছে গোহারান হারল একরাম চাচা। একেবারে জামানত জব্দ হল তার।

দেখেশুনে গজাননের মুখ দিয়ে কথা সরেনি দিনকয়।

বহুদিন যাবৎ আমি দু-জনকে পাগলের মতো খুঁজছিলাম। একজন হল ওই রহস্যময়ী, যাকে আমাদের সেই ছেলেবেলায় আমি আর কল্পনাথ দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের মধ্যে দিনের পর দিন পরিপাটি করে এঁকেছিলাম। আর, অন্যজনটি হল সেই রহস্যময় মানুষটি, যে কিনা অলক্ষ্যে বসবাস করেও ভেঙে দিল শিখাবউদির মতো এক রমণীর সংসার। অথচ তাকে রক্তমাংসের শরীরে এযাবৎ কোনওদিনও দেখেনি সন্ধিপুরের মানুষ।

হাবিয়ে যাওয়া নদীটাকে খুঁজে এনে ফিরিয়ে দেবার শপথ নিয়েছে শিখাবউদি। আমি জানি, কথার খেলাপ করবে না সে। বাকি রইল পল্টুদা। তাকে খুঁজে বের করতে না পারলে মরেও বুঝি শান্তি পাব না আমি।

তখন আমি ওকালতি করি। মেদিনীপুর শহরে বাসা ভাড়া করে জয়াকে নিয়ে থাকি। আমাদের সঙ্গে বিলাসীপিসিও থাকে।

একদিন এক মক্কেল এলেন আমার চেম্বারে। শহরের বল্লভপুর এলাকায় তার বাড়ি। শুনেই ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে। কাজের কথা চুকলে পব এক সময় ওকে শুধোই, আপনাদের পাড়ায় পল্টুবাবু বলে কেউ থাকেন?

—পল্টুবাবু? তাঁর চোখেমুখে পাল্টা প্রশ্ন জেগে ওঠে,—কোন্ পল্টুবাবু বলুন তো? পদবি কী?

—তা ঠিক বলতে পাবব না। তবে যা-যতটুকু শুনেছি, পল্টুবাবু নামে তাকে নাকি পুবো এলাকা চেনে।

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবেন মানুষটি। একসময় বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখব।

হপ্তা-দুয়েকের মধ্যে একজন নয় তিনজন পল্টুব খোঁজ আনলেন আমার মক্কেলটি। একজন তো নতুন বাজারে কুচো মাছ বেচে। মাথা জুড়ে বিশাল টাক তার। আব এক পল্টু রয়েছে, ট্রাকের হেল্পার। মদে চুর হয়ে থাকে সাবাক্ষণ। ট্রাকের সঙ্গে দূর দূরান্তে চলে যায়, যেদিন ফিরে আসে, পাড়াব কোন্ এক ছোকরার সঙ্গে আসনাইয়ের অভিযোগে বউটাকে বেধড়ক পেটায়। আর একজন পল্টুর খোঁজ পাওয়া গেছে, গোবেচারা মানুষ সে, মৃগীর ধাত রয়েছে, যখন তখন রাস্তায়-ঘাটে ঠ্যাং উল্টে পড়ে থাকে।

শুনে আমি বিযম ধন্ধে পড়ে যাই। বলি, এখনকার কথা তো নয়, আমি যাব কথা বলছি, সে যৌবনে খুব ফর্সা, রূপবান, ভীষণ পরোপকাবী, সাহসী, আব খুব ভালো খেলোয়াড় ছিল। আব, তার কপালে একটা কাটা দাগ রয়েছে। প্রথম যৌবনে দুর্ধর্ষ ডাকাত-দলকে একাই তাড়া কবেছিল, ধবেও ফেলেছিল পালের গোদাটিকে। ধস্তাধস্তির সময ডাকাতরা পল্টুবাবুর কপালে ছোরা মেবেছিল। ফিনকি দিয়ে বক্ত ঝরেছিল। তবুও সে ছাড়েনি ডাকাতটাকে।

শুনতে শুনতে আমাব মক্কেলের দু-চোখে ঘনিযে আসে রাজ্যের ধন্ধ। বিড়বিড়িয়ে বলেন, তেমন কাউকে তো—, আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখি। হদিশ পেলে জানাব।

আমি এটা আমাব মক্কেলকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে, সেই পল্টুদাব সঙ্গে শিখা নামে একজন সুন্দরী কিশোরীর গাঢ় প্রেম ছিল ওদেব ছেলেবেলায।

সন্ধিপুরকে বলা যায় আমাদের এলাকার বাজধানী। গড় সন্ধিপুর।

এলাকাব একশো বছবের পুরোনো জমিদার বংশটি এই গ্রাম থেকেই শাসন করে এসেছে চারপাশের এলাকা। পরবর্তীকালে সন্ধিপুবের নামেই ইউনিয়ন-বোর্ডের নামকবণ, কিনা, সন্ধিপুর ইউনিয়ন-বোর্ড। তারও পবে সন্ধিপুর অঞ্চল-পঞ্চাযেত, সন্ধিপুর গ্রাম-পঞ্চাযেত .। রাজধানীসুলভ গাম্ভীর্য এবং অনা যাবতীয় গুণাবলী,—হাইস্কুল, পোস্ট অফিস, কো-অপাবেটিভ সোসাইটি, গ্রামীণ পাঠাগার, সবই রযেছে সন্ধিপুরে। এমন কি নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে তাবিয়ে তারিযে খাওয়াব মতো কেচ্ছা, তাও অন্তত এক ডজন মিলে যাবে সারা গাঁয়ে। তা বাদেও বয়েছে জমিদার, ইউনিযন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং পঞ্চায়েতের প্রধান মিলিয়ে প্রায় শতাধিক বছরের দেশ শাসনের ঐতিহ্য।

তিন পুরুষ জমিদারি করবার পর, চৌষট্টি অবধি সন্ধিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং চৌষট্টি থেকে আটাত্তর অবধি প্রধান ছিলেন হিরন্ময় মুখুজ্যা। তারপর এক টার্ম গজানন ভট্ট। এরা সবাই সন্ধিপুরের মানুষ। সব মিলিয়ে প্রধান হওয়ার প্রশ্নে সন্ধিপুরের দাবি চিরদিনই সর্বাগ্রে। যদিও এই টার্মে মোমিনপুরের একরাম চাচাকে প্রধান করবার একটা প্রস্তাব রেখেছিল কেউ কেউ। গজানন জানত, ভোটের ফল বেরোনোর পর সব জল্পনা কল্পনা উল্টে দেওয়া যাবে। কেন কি, পার্টির মাতব্বরদের মধ্যে যারা সন্ধিপুরের মানুষ, অন্য একশোটা ক্ষেত্রে তারা গজাননের বিরোধিতা করলেও সন্ধিপুর থেকে প্রধান হওয়ার প্রশ্নে নেতাদের অন্ধ সমর্থন গজানন পাবেই।

ভোটের পর আর সেসবের প্রয়োজনই হল না, কেন কি, একরাম চাচা গোহারান হেরে যাওয়ায়, প্রধান হওয়ার প্রশ্নে গজাননের জন্য তখন একেবারেই খোলা মাঠ। কাজেই, যে ক-টা দিন প্রধান নির্বাচন না হচ্ছে, গজানন এমন নির্বিকার মুখ করে রইল, যেন, বেড়াল বলে মাছ খাব না, আঁশ ছোঁব না, কাশী যাব। এবং তৎসহ, নিজের পার্টির লোকজনদের সঙ্গে রাস্তায়-ঘাটে দেখা হয়ে গেলে, একথা সেকথার পর কৌশলে প্রধান হওয়ার প্রসঙ্গটা তুলে আকাশের পানে উদাস নয়নে তাকিয়ে বলতে লাগল, দ্যাখ কমরেড, পাওয়ারের লোভে গজানন ভট্ট পার্টিতে ঢোকেনি। আমাদের পার্টিতে পাওয়ারটা কুনো বেপারই নয়। পাওয়ারে থাকা কিংবা না থাকা, কমুনিসদের কাছে একোই বেপার। কাজেই, পার্টি যদি বলে, থাকো, তো থাকব, পার্টি যদি বলে, থেকোনি, থাকবনি। তবে পার্টি যদি আমার মতটা জানতে চায় তো বলব, অনেক দিন তো পড্ধানগিরি করলাম, আর ভালো লাগতিছেনি। এবারে বরং অন্য কেউ দায়িত্ব লউ, আমি বাইরে থাকিয়া সংগঠনটাকে মজপুত করি। আরে, আমাদের পার্টিতে সংগঠনটাই তো আসল। মন্ত্রীত্ব বল, পড়ধানগিরি বল, বাইরের খোলস। কমুনিসরা এই খোলসটাকে যখন তখন খুলিযা ফেলতে পারে অবলীলায়।

প্রধান নির্বাচনের আগের দিন রহমত চাচার ছেলে ইকবালকে দিয়ে মেদিনীপুরের বাসায় খবর পাঠিয়েছিল শিখারউদি। শঙ্কর, যত কাজই থাক, কাল আসা চাই। কারণ, আগামীকাল আমি তোকে আর প্রস্থ অবাক করব বলে মনস্থ করেছি।

গ্রামে পৌঁছে দেখি, অবাক হওয়ার মতো ঘটনাই ঘটাতে চলেছে শিখারউদি। প্রধান নির্বাচনে সে প্রার্থী হতে চলেছে।

আড়ালে ডেকে বলি, এ কী করছ তুমি? এভাবে লোক হাসানোর মানে কী?

শিখারউদি ফিক করে হেসে বলে, ভোটে যখন দাঁড়াই, ওই একই কথাই বলেছিলি।

শিখারউদির কথার মধ্যে খোঁচা ছিল। তাও বলি, এটা আর সেটা এক নয়। মোমিনপুরের মানুষ তোমাকে বেজায় ভালোবাসত, তুমি ওদের মালা তৈরির ব্যাপার-স্যাপারে জড়িয়ে আছ, তোমাকে না হয় ওইসব কারণেই পাইকারি হারে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, কিন্তু প্রধান নির্বাচনে তো আর বুথের ভোটাররা ভোট দিয়ে জেতাতে পারবে না তোমাকে। সারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আঠারো জন মেম্বারের থেকে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রধান ঠিক হবে। এখানে, নির্দল তুমি, কে তোমাকে ভোট দেবে শুনি?

বেশ ফুরফুরে লাগছিল শিখারউদিকে। বলে, কে বলেছে আমাকে ভোট দিয়ে প্রধান করবে এরা?

—তবে? জানোই যখন জিতবে না, একটা ভোটও পাবে না, তবে কী জন্যে লোক হাসাতে প্রার্থী হতে চাচ্ছ?

শিখারউদি মিষ্টি করে হাসে, জেতার জন্য দাঁড়াচ্ছি না রে। আমি শুধু অংশগ্রহণ করতে চাইছি। পল্টুদা চিরকালই বলে, হারা-জেতাটা কোনও ব্যাপার নয়, অংশগ্রহণটাই বড়ো কথা। তাছাড়া, ওই যে গজানন বলেছিল, যারা দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে পারে না...। আসলে, পল্টুদা বলে, জেতা তো অনেক পরের ব্যাপার, অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে তা, কিন্তু যেই না তুমি প্রার্থীপদে নাম লেখালে, অমনি তুমি অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে বরাবর হয়ে গেলে।

বলতে বলতে আমার দিকে তাকায় শিখারউদি। সারামুখ শুকনো কাঠের মতো শক্ত হয়ে আসে।

খুব চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বলে, স্বামী খেদানো মেয়ে আমি, বেল আর কুরচির মালা বানিয়ে পেট চালাই, প্রধান হওয়া কি আর আমার পক্ষে সম্ভব? কেবল একই প্রার্থী-তালিকাভুক্ত হয়ে গজাননদের মতো কুলীনদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে বরাবর হওয়া, ব্যস, ওইটুকুই চাইছি আমি, বাধা দিবি আমায়?

শিখাবউদির কথাগুলো মাঝেমাঝেই ঠিকঠিক বোধগম্য হয় না আমার। খামোখা প্রার্থী হয়ে গোহারা হেরে কী যে বরাবর হতে চাইছে ও, বুঝতে পারিনে।

নিমরাজি হয়ে বলি, দাঁড়াতে চাইছ, দাঁড়াও, কিন্তু আমাকে এমন জরুরি তলব দিয়ে ডেকে আনলে কেন?

—বা-রে! শিখাবউদির চোখের কোলে চাপা অভিমান দেখতে পাই আমি,—আমার সব লড়াইতে, হেরো-লড়াই, জেতা লড়াই, সবতাতেই তুই থেকেছিস, আর এই লড়াইটাতেই বা বাদ থাকবি কেন?

ক্রমশ বড়োই রহস্যময় লাগছিল শিখাবউদিকে। তাও মুখে প্রাণপণে হাসি ফুটিয়ে বলি, বেশ আমি উপস্থিত থাকলে যদি খুশি হও তুমি, তবে থাকছি আমি। প্রধান নির্বাচনের পরে গজাননের টিটকিরিটা না হয় হজম করলামই। কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না শিখাবউদি।

সেকথায় শিখাবউদি আবারো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, বেশ তো, বেশ তো, এখনও তো অনেক সময় রয়েছে হাতে। ততক্ষণ গা'না, ওই গানটা, ওই যে, গাইতিস মাঝেমাঝে, ওই—যে—তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি—। বলতে বলতে শিখাবউদি গানটার দু-কলি নিজেই গেয়ে ফেলে।

যেদিন শিখাবউদি আঠারোর মধ্যে এগারোটি ভোট পেয়ে প্রধান হল, আমি তো বটেই, সারা সন্ধিপুর, মোমিনপুর, মান্দার—বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কেবল, ভোটের ফলাফল বেরোবার পর, শিখাবউদির ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, এমন অলৌকিক ফলাফলে সে কিছুমাত্র অবাক হয়নি। যেন এটাই প্রত্যাশিত ছিল তার কাছে। যেন অন্য রকম ফল হলে সেটাই হত অস্বাভাবিক। এটাই আমার সীমাহীন বিস্ময়ের সঙ্গে একটি মাত্রা যোগ করে। তাহলে কি শিখাবউদি কোনও কারণে বিশ্বাস করত যে, সে জিতবে! খুব নিশ্চিতভাবে তেমন কোনও সঙ্কেত কি পেয়েছিল কোনওদিকে থেকে? শিখাবউদিকে তেমন আশ্বাস কি আগাম দেওয়া হয়েছিল কোনও তরফ থেকে! যদি তাই হয়, শিখাবউদি সেটা এতদিন আমার কাছে চেপে রেখেছিল?

আমি যেন একটু একটু করে একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়ে ক্রমাগত পাক খেতে থাকি।



শিখাবউদি প্রধান হল, তারপরই সত্যি সত্যি সে সন্ধিপুরের মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের চুরি যাওয়া নদীটি।

প্রধান পদে হেরে গিয়ে হপ্তাটাক খুব চেঁচামেচি করল গজানন। পার্টির মধ্যে যারা 'ঘরভেদী' বিভীষণ, তাদের উচিত শিক্ষা দেবার শপথ নিল বারবার। তারপর একদিন সবাইকে ডেকেডেকে বলতে লাগল, আমাদের পার্টিতে পদটা কুনো বেপার নয়। একটা শুকনা কাঠের গুঁড়িকে চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারে পার্টি, কেন কী, চেয়ারে যাকে বসানো হইল, সে তো আসলে কেউ লয়, কিছু লয়। কেন কি, তার পিছনে তো রয়েছে পার্টি। পার্টি যেমনটি চালাবে তেমনটি চলবে। সেই হিসাবে এবারে আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল। যদি বল, কেন? তো বলি, যদি শিখাবউদি কুনো গতিকে ফেল মারে তো দুনিয়ার লোক আমাকে দুষবে, কিনা, গজানন ভট্ট নিজে যেমন পাঁচ বচ্ছর তুখোড়ভাবে চালিয়েছিল প্রধানের কাজ, গোটা ব্লকের মধ্যে সেরাটি, শিখাকে তেমনটি চালাইতে পারেনি। বলবে, ইচ্ছা করিয়া শিখা ঘোষকে কাজটা শিখায়নি গজানন।

শিখাবউদির কানে যায় গজাননের এবংবিধ কথাবার্তার নির্যাস। চুপটি করে শুনে যায় সে। জবাব

দেয় না।

তারপর..., ভেতরে ভেতরে কবে কবে নদী সংস্কারের স্কিমটা পাঠাল শিখাবউদি, কবে কবে মঞ্জুর করিয়ে আনল তা, তেমন করে জানতেই পারেনি কেউ। একদিন যখন পঞ্চাৎ অফিসে নোটিশ টাঙিয়ে দিল শিখাবউদি, কিনা, আগামী হপ্তা থেকে যমুনা নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হবে, গজাননসহ জনাকতক মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও খবরটা অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সন্ধিপুরের আনাচে কানাচে, আর তারপরই সারা সন্ধিপুরের আকাশ, বাতাস এক অভিনব সুগন্ধে ভবে গেল।

গ্রামের ক্লাবঘরের সামনে পর্দা টাঙিয়ে থিয়েটার করে গাঁয়ের ছোকরারা। থিয়েটার শুরুর মুহূর্তে ঝুলিয়ে রাখা পর্দার সামনে বসে দর্শকরা যেমন করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে পর্দার আড়ালের জগতটিকে বারবার কল্পনায় দেখে নিতে থাকে, ঠিক তেমন করেই সন্ধিপুরের নদী-হারানো মানুষগুলি বুঝি কল্পনায় আগাম দেখতে পাচ্ছিল নদীটাকে। বিশাল ধান খেতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে তারা রোজদিন হরেক তর্ক জুড়ে দিচ্ছিল নদীটার গতিপথ, বাঁকট্যাক, ইত্যাদি নিয়ে। তাদের সকলের মত কিছুতেই এক জায়গায় মিলছিল না। একদল যদি বলে যে, প্রথম বাঁকটা শুরু হয়েছে বাঁকা অশ্বত্থের পাশ থেকে, তো অন্যদল তৎক্ষণাৎ বাঁক নেবার জায়গাটাকে পঞ্চাশ হাত পিছিয়ে দেয়। ওইসব নিয়ে শুরু হয়ে যায় তুমুল তর্কাতর্কি। সেই গবেষণা আর থামতে চায় না কিছুতেই। আর, বাচ্চারা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সেই দিনটির জন্য, যেদিন, তাদের শিখা-জেঠিমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ওরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে দিগন্ত অবধি ছড়ানো ধান খেতের মাঝ বরাবর একটি নিটোল জলের নদী! তারা তাদের খেলনা ঘরকন্নার সংসারে, ঘরবাড়ি উঠোনের থেকে সামান্য তফাতে ঘাসের টুকরো দিয়ে বানানো ধানের খেতের মাঝ বরাবর তাদের নরম আঙুল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে আগাম বানিয়ে ফেলে একটি নদীর খাত এবং সদর পুকুর থেকে মাটির গাড়ুতে জল বয়ে এনে ঢেলে দেয় ওই খাতে।

এতদিন যাবৎ চুরির মাল ভোগদখল করছিল যারা, চারপাশে একটা টইটম্বুর নদীর কলতান শুনতে শুনতে নিজেদের সর্বনাশের দিনটিকেও আগাম প্রত্যক্ষ করতে পারে বুঝি। রাতারাতি বাজ নেবে আসে ওদের মাথায়। আগলবাগল হয়ে ছুটে যায় তাদের নেতার কাছে। একসাথে হামলে পড়ে। কী হবে গজাননদা?

নিজের বাড়ির দাওয়ায় গুম মেরে বসে ছিল গজানন। খবরটা তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। বাস্তবিক, সন্ধিপুর আর মোমিনপুর মিলে গোটা তিরিশেক পরিবার যারা পেয়েছিল যমুনা নদীর এক একটি করে টুকরো, একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়ে গেছে। এমন ঘোর বিপদে একমাত্র গজাননই তাদের ভরসা। আর এমন মুহূর্তে সেই ভরসাটুকু না জোগাতে পারলে গজাননেরও তো ভরাডুবি। একজনাও থাকবে নাকি ওর শিবিরে! মানুষ হল পোকার জাত, আলোর পানে উন্মাদের মতো ধেয়ে যায়। নদীটাকে ঠেকাতে না পাবলে ওই আলোটুকুই যে উবে যাবে গজাননের শরীর থেকে। পোকার দল আর আসবে তাহলে?

কাজেই, বশংবদদের নিয়ে গজানন ছুটল কেশিয়াড়ি, বেলদা, মেদিনীপুর...। আছড়ে পড়ল তাদের নেতার কাছে, কিনা, সন্ধিপুর এলাকা থেকে পার্টিটাকে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে নন্দ গুচ্ছাতরা জনাকয়। এক যুগের ওপর ভোগ-দখল করবার পর আচমকা যদি সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ হইয়া যায় শয়ে-শয়ে মানুষ, সামনের ভোটে তবে নির্ঘাৎ তিনোমূল-বিজেপি আসতিছে।

কিছুদিন যাবৎ এই জুজুটা খুব কাজ করছিল বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে। কেন কী তৃণমূল আর বিজেপি মিলে খুব দানা বাঁধছে কিছু কিছু পকেটে। সাবেক জোতদারদের ক্ষিপ্ত অংশটি জমাট বাঁধছে কিছু কিছু এলাকায়। তারা কিছু রুষ্ট গরিবকে পাশেও পেয়ে যাচ্ছে। গরিব মানুষ তুষ্ট হয় অল্পে, রুষ্টও হয় অল্পে। জি-আরের চার কেজি গম না পেলেই তারা চটিতং হয়ে চলে যায় সেই শিবিরে, যে শিবিরের নিদারুণ জুলুমে তারা আধমরা হয়ে ছিল যুগযুগ ধরে। আর ইদানীং তো একটা দারুণ ছো পেয়ে গেছে

ওরা। পান থেকে চুনটি খসল তো পরের মিটিংয়ে শত্রুদের ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে পথ ভাঙতে লাগল, নিদেন হুমকিটা তো দিলই যে, এমন হলে তিনোমূলে চলিয়া যাবো।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, এক্ষেত্রে গজাননের তৃণমূল-বিজেপি জুজুতেও তেমন করে বাজেন না ওপরের নেতারা। বলেন, সরকারি সম্পত্তি হলেও নদী তো কারোর ব্যক্তিগত দখলে থাকবার নয়, কমরেড। মানুষকে সেইমতো বোঝান আপনি। বোঝালেই বুঝবে তারা।

সব ঠাকুরের থানে পূজা চড়াবার পরও কোথাও থেকে কোনও বর না পেয়ে একেবারে দমে যায় গজানন। দিনকয় গুম মেরে বসে থাকে। গভীর ভাবনায় ডুবে থাকে।

একদিন বিপন্ন চেলাচামুণ্ডাদের সামনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, লড়াই করতে পারবি? সে মনের জোর আছে তোদের?

মানুষগুলো পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এ-কী ঘোর পরীক্ষা লিতে চায় ওদের গজা ঠাকুর! একসময় বলে, তুমি সাহস দিলে লড়াই করব।

গজানন বলে, তাইলে যা-যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। এখন বাড়ি যা। সময় মতো নির্দেশ পাবি।

দিনকয় বাদে তিরিশটি পরিবারের ডাক পড়ে গজাননের উঠোনে।

প্রথমে, উপস্থিত মানুষগুলির ঘোরতর সঙ্কটের একটা ডগোমগো ছবি আঁকে গজানন। ওই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘবদ্ধতার উপকারিতা বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। তারপর গজাননের নির্দেশে ঘরের ভেতর থেকে দু'বস্তা তিলের বীজ নিয়ে এসে উঠোনে রাখে বিপিন দাস।

গজানন বলে, এই তিলের বীজ ভাগাভাগি করিয়া লিয়া যাও সবাই। কালই যে-যার জমিনে বুনিয়া দিবে বীজ। দেখি, ফসল তছনছ করিয়া কেমন করিয়া খাল কাটে অরা।

শুধু বীজ বুনেই ক্ষান্ত থাকে না গজাননরা। পরের দিনই ঝুলি থেকে আরও একটি বেড়াল বের করে সে। বেলদা বাজার থেকে আমদানি করে যোগেন ইন্দুকে। যোগেনরা বামপন্থী দল বলে পরিচয় দেয় নিজেদের, কিন্তু বহুকাল বামফ্রন্ট সরকারের বৈরী। অনেকদিন যাবৎ সঙ্কিপুর এলাকায় ঢোকার তাল করছিল যোগেন, সুযোগ পাওয়া মাত্র লম্ফ মেরে ধরে নিয়েছে প্রস্তাবটা।

মাড়োতলায় মিটিং ডেকেছে গজানন। প্রধান বক্তা যোগেন ইন্দু। সারা বিকেল গরিব পাট্টাদারের ওপর শাসকদলের 'নিল্লজ্জ' আক্রমণের নিন্দা করে শাসকদলকে হরেক প্রকার হুশিয়ারি দিয়ে এবং খাল কাটলে যে তাদের বুকের ওপর কোদাল চালাতে হবে, এমন চেতাবনি দিয়ে সন্ধেয় সন্ধেয় যখন বেলদাতে ফিরে গেল যোগেন ইন্দু, শিখারউদি তখন নিজের বাড়িতে বসে একমনে গেঁথে চলেছে বেলকাঠের মালা।

এমনি সময়ে একদিন আসল পল্টুদার দেখা পেয়ে গেলাম আমি।

ততদিনে এমন কথাটা খুব রটনা পেয়ে গিয়েছে যে, কোনও এক বিশেষ কারণে আমি পল্টু নামে একজনকে খুব খুঁজছি।

একদিন কমলেশ, আমার এক উকিল বন্ধু, ওর সেরেস্তায় স্রেফ আড্ডা মারতে গিয়েছি, কথাবার্তার মাঝখানে আচমকা শুধিয়ে বসে, হ্যাঁ, ভালো কথা, কে এক পল্টু নামের মক্কেল নাকি তোমার টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে গ্যাছে?

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়ি, কে বলল?

—সবাই বলছে। নতুন বাজারের দিকে নাকি বাড়ি লোকটার? তুমি নাকি জনেজনে খুঁজে বেড়াচ্ছ? কত টাকা? কিসের কেস?

আমি মুহূর্তকাল স্থাণুর মতো বসে থাকি। একসময় হো-হো করে হেসে উঠি।

আমার কানফাটা অট্টহাসিতে দমে যায় বন্ধুটি। বলে, মাইরি, সারা কোর্ট চত্বর জুড়ে সবাই জানে,

তুমি একজন পল্টুকে পাগলের মতো খুঁজছ।

—তা খুঁজছি। আমি হাসতে হাসতে বলি, কিন্তু সেটা ওই কারণে নয়। সে আমার মক্কেলও নয়, টাকা মেরে পালায়ওনি।

—তবে?

—অন্য এক খুব নিজস্ব কারণে খুঁজছি ওকে। কিন্তু আড্ডার মাঝখানে হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?

—এই কারণে যে, আমার সেরেস্তায়ও একটি পল্টু রয়েছে।

এতক্ষণ আমি সামান্য মনোযোগী হই,—তাই নাকি? বয়স কত।

—বয়েস? এই ধর, পঁয়তাল্লিশ, বড়ো জোর পঞ্চাশ।

শুনে আমি নড়েচড়ে বসি, বাড়ি কোথায়?

—ওই নতুন বাজারের ওদিকটায়।

আমার ভুরুজোড়া অজান্তে কুঁচকে যায়, লোকটা কেমন?

—একেবারেই গবেট। মাথামোটা। বকিয়ে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আমি কয়েক মুহূর্ত ভাবি,—একবার ডাকবে লোকটাকে?

কমলেশ হাঁক পাড়ে, পল্টুবাবু, একটু শুনে যান তো।

একটু বাদেই আসে সে।

সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি ওঁকে একপ্রস্থ ভালো করে দেখি।

বছর-পঞ্চাশের একজন রোগাগোছের লোক, সারা শরীরে দারিদ্র আর অপুষ্টির ছাপ, মাথার বারোআনা চুল উঠে গিয়ে সেখানে নিটোল টাকের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেছে। চোখদুটি কোটরে ঢুকে গিয়েছে, চোয়াল ঠেলে ওঠায় চোখের কোটরদুটোকে আরো গভীর লাগে।

আমার দিকে শশকের চোখে তাকিয়ে থাকে লোকটি।

আমি তার নাম-ধাম বিতাং করে শুধোই। সে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে চলে একেবারে যান্ত্রিক গলায়।

একসময় গলাটা সামান্য খাটো করে শুধোই, আচ্ছা, আপনি শিখা বলে কাউকে চেনেন?

—শি-খা, শি-খা, —কোন্ শিখা বলুন তো স্যার? লম্বা করে মাথা নাড়ায় পল্টু, বুঝতে পারছি না তো।

কিন্তু ততক্ষণে তার চোখের তারায় আমি যেন দেখে ফেলেছি মুহূর্তের সেই আলো, এবং পরমুহূর্তে তা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা। আর, তাই দেখে ততক্ষণে রহস্য দানা বেঁধেছে আমার মনে।

বুঝতে পারি, এই কোর্ট চত্বরের সেরেস্তায় বসে লোকটার ভেতর থেকে আমার সেই পল্টুদাকে বের করে আনা যাবে না।

বলি, একবার আমার বাড়িতে আসবেন? কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

লোকটার দু-চোখে সামান্য আশঙ্কার ছায়া দেখি যেন। মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে ধীরপায়ে চলে যায় সে।

কমলেশ চোখ নাচিয়ে বলে, কী ব্যাপার বল দেখি? ভাগিয়ে নেবার মতলব নাকি?

মুচকি হেসে বলি, ভাগিয়ে নিলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে তোমার?

—না, না। নট অ্যাট অল। লম্বা করে মাথা নাড়ায় কমলেশ—ওর মতো মুহুরি আজ খুঁজলে কালই এক ডজন পেয়ে যাব। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এনি প্রবলেম?

আমি আলতো মাথা নাড়ি, একটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে লোকটাকে খুঁজছি।

কমলেশ ভুরু কুঁচকে তাকায় আমার দিকে।—খুব রহস্য রহস্য লাগছে। কী ব্যাপার বল তো?

—বলব এক সময়। বলতে বলতে আমি উঠে পড়ি।



নদীটাকে যেদিন আঁকা হবে ধান খেতের মাঝ বরাবর, তার হপ্তাটাক আগে এসেছিল সার্ভে পার্টি। তারা জরিপ করে নদীটার দু-পাড়ের সীমানা এঁকে দিল মাপজোক করে।

সার্ভে পার্টিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল গজানন। জনাবিশেক লোক নিয়ে খুব হম্বিতম্বি শুরু করেছিল কিছুক্ষণ। তাদের মোকাবিলা শিখাবউদিকে করতে হয়নি। মোমিনপুরের মহিলা বাহিনীকে বঁটি-ঝাঁটা সহকারে ছুটে আসতে দেখে গজাননের দলের অর্ধেক লোক তৎক্ষণাৎ আলপথ ধরে দৌড় মেরেছিল, বাকিদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া বাকি সবাই বেগতিক দেখে কবুল করেছিল, কে কইলো বাধা দিতে আইছি? মাপজোকের কাজ দেখতে আইছি আমরা। বাকিরা গজাননের আশেপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর মোমিনপুরের মেয়েদের থেকে অকথ্য গালিগালাজ হজম করছিল। জবাবে মুখ থেকে একটি কথাও সরেনি তাদের। একটু বাদেই গজাননের পিছুপিছু তারাও ফিরে গিয়েছিল যে-যার ঘরে।

ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি, শিখাবউদির ভোটে জেতার পেছনের কারণগুলি। ছোটোকাকাই আমাকে একান্তে বলেছে সবকিছু।

ভোটের অন্তত দু-হপ্তা আগেই নন্দ জেঠা আর একরাম চাচা রাতের অন্ধকারে শিখাবউদির বাড়িতে গিয়ে ওকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে এসেছে।

এবং পার্টির থানা লেভেল নেতাদের নির্দেশ মতোই তারা এসেছিল শিখাবউদির কাছে।

ফিরে যাবার আগে নন্দ জেঠা নাকি ফিসফিস করে শিখাবউদিকে বলেছিল, জিতলে তোকেই পড়ধান বানাবো আমরা। অনেক কাজ করাবো তোকে দিয়ে। বিশেষ করিয়া, আমাদের সর্বসাধারণের নদীটাকে মুক্ত করিস তুই। এই শুধু তোর কাছে অন্তিম প্রার্থনা মোর।

আমাকে যারপরনাই বিস্মিত হতে দেখে ছোটোকাকা বলে, অবাক হবার কী আছে? গজাননকে পার্টি নিজেদের লোক বলিয়া মনে করে নাকি? বাচ্চা বইস থেকে ওকে দেখতিছে এলাকার মানুষ, তার চাবুক-চোদ্দ কথা শুনতিছে। লিহাৎ আচমকা কিছু লোক জমিয়া গেছে অর চারপাশে, তাই ভোটের আগের মুহূর্তে অকে খেদিয়া দিবাও যাচ্ছিলনি।

ওইদিনই আমার মনে বিশ্বাসটা গাঢ় হয়েছিল যে, কেবল শিখাবউদিই নয়, নন্দ জেঠাও সংগোপনে বহুদিন ধরে দেখে চলেছিল, নদীকে নিয়ে ওই স্বপ্নটা। দেখে চলেছিল ছোটোকাকার মতো আরও বহু মানুষ। কেবল ওই বৃদ্ধ বয়েসে গজাননদের সঙ্গে লড়াইটা শুরু করবার সাহসটা পাচ্ছিল না নন্দ জেঠা। শিখাবউদি এগিয়ে আসাতে বুকের মধ্যে নতুন করে বল পেয়েছে সে।

তারপর এল সেই সকাল। সন্ধিপুর, মোমিনপুর, মান্দার এবং আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে কয়েক হাজার মানুষ মাদল, ধামসা, ঝুড়ি-কোদাল এবং লালঝাণ্ডা সহকারে মিছিল করে এগিয়ে চলল ধানখেতের দিকে। মিছিলের সামনে সামনে হাঁটল শিখাবউদি, নন্দ জেঠা, আর আমার ছোটোকাকা। হাজার মানুষের সমবেত চিৎকারে আকাশ-বাতাস ফালাফালা করে সে মিছিল গিয়ে থেমেছিল লুকিয়ে থাকা নদীটার পাড়ে।

তারপর..., চারপাশের অসংখ্য গ্রামের মানুষ, দিনের পর দিন, অপরিসীম মমতায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নদীটাকে বের করে আনল মাটির তলা থেকে, বহুকাল বাদে তাকে সূর্যের মুখ দেখাল...।

সাধারণত যে গাঁয়ের স্কিম, কাজ পায় সেই গাঁয়ের মানুষ। কিন্তু নদী খোঁজার ওই অভিনব স্কিমে শিখাবউদি সকলের জন্য খুলে দিয়েছিল দরজা।

চারপাশের গাঁয়ের বয়স্করা, যারা সেই ছেলেবেলা থেকে বহুকাল যাবৎ নদীটাকে দেখেছে, এতদিন বাদে ফিরে পেয়ে হারিয়ে ফেলা মূল্যবান সামগ্রীর মতো নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেস্থাকে। আর বাচ্চারা, যারা কস্মিনকালেও দেখেনি নদীটাকে, তাদের অবস্থা তেমনটি হল, সেই তিনযুগ আগে হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসা বিলাসীপিসিকে দেখে যেমনটি হয়েছিল আমার সেই ছেলেবেলায়। তার আগে কোনওদিন চোখে দেখিনি বিলাসীপিসিকে, কেবল এর-ওর মুখে তার বর্ণনা শুনতে শুনতে একটা ছবি এঁকে রেখেছিলাম বুকের মধ্যে, বিলাসীপিসি বাস্তব মূর্তি হয়ে ফিরে আসার পর অবাক বিস্ময়ে তাকে

দেখতে দেখতে বুকের মধ্যেকার ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে থাকি, যেখানে মেলে না সেখানেই প্রশ্ন তুলি, ও বড়োপিসি, তোমরা যে বলতে একটা তিল ছিল চিবুকের বাঁ-দিক ঘেঁসে, কই, কোথায় সেই তিল? ও ছোটোকাকা, তোমরা তবে কেন বলতে বিলাসীপিসির গায়ের রং মাগুরে ফরসা, এ-তো ফটফটে ফরসা।

এইমতে বাচ্চারা সারাক্ষণ ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মতো লেপটে থাকে অকুস্থলে, তাদের চোখের সুমুখে একটু একটু করে ছবির মতো আঁকা হতে থাকে নদীটা। তারা দিনভর অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে, আর চারপাশের বড়োদের হরেক প্রশ্ন করে করে অস্থির করে তোলে, বল না, ও শংকরজেঠু, শ্রীকান্তদাদু, বল না গো, আগেরটির মতো হচ্ছে? ও রামুদাদু, তবে যে তুমি বলতে, আশথ গাছটার কাছে আইসিয়া বাঁক লিয়েছিল নদীটা, কিন্তু কুথা, এ তো অনেক পরে বাঁক।

চারপাশের গাঁয়ের বুড়ো-বুড়িরা, যারা চোখে দেখে কম, কানে শোনে কম, যাদের একটুখানি হাঁটলেই হাঁফ ধরে যায়, তারাও লাঠি ঠুকেঠুকে হাজির হয় সদ্য মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বের করা নদীটার কাছে। কিন্তু নদীটাকে দেখামাত্রই হতাশ হয় তারা, কেন কি, তারা জোরগলায় দাবি তোলে, এ তাদের হারিয়ে যাওয়া নদীই নয়, এ-তো এক অন্য নদী। তাদের চির-পরিচিত নদীটার সঙ্গে এই নদীর কিছুই মেলে না যে। এমন গভীর আর ধারাল খাতই ছিল না সে নদীর, দু-পাড় এত সাফসুতবা, নতুন চুল ছাঁটলে ঘাড়ের দু'পাশটিতে যেমনটি লাগে, ছিলই না।

শিখাবউদি ওদের মায়ের মমতায় প্রবোধ দেয়, যেমন করে গরম পায়েস একটুখানি মুখে দিয়েই বাচ্চারা মিষ্টি হয়নি বলে চেঁচিয়ে উঠলেই মায়েরা ওদের প্রবোধ দেয়, মিষ্টি লাগবে রে, ঠাণ্ডা হউ, সবুর ধর। ঠিক একই উপায়ে ওদের বোঝাতে থাকে শিখাবউদি, আগেরটির মতো হয়্যাবে গো দাদু, ক-বছর সবুর ধর, বরষার জল জমতে দাও, দু-চার মরসুম জলে ধুয়ে-ক্ষয়ে দু-পাড়ের জমিন অল্পস্বল্প ভাঙুক, দু'পাড়ে ঘাসপাতা, ঝোপঝাড় আগাছা জন্মাক, বেজি শেয়াল, পাখিপাখাল বাসা বাঁধুক সেইসব ঝোপেঝাড়ে...। নদীটার দু-পাড় ভালো করে বাঁধিয়ে দেবো, গাছ-গাছাল পুঁতে দেব, তোমাদেব সেই আগের দিনের গাছের চারা, যেখানটিতে যা ছিল। নতুন মাটি পেয়ে তাবা দু'চাব বছরেই লকলকিয়ে বেড়ে উঠবে, তখন দেখো, ঠিক আগের নদীটাকেই ফিরে পাবে তোমরা।

শুনে হাসবে কি, বুড়োবুড়ির দল প্রবল আক্রোশে তেড়ে মারতে চায় বুঝি শিখাবউদিকে। বেদনায় ছলোছলো হয়ে ওঠে তাদের মুখমণ্ডল। বিড়বিড় করে বলে, দু-চার বচ্ছর' মেয়্যাটা কয় কী! বলে এই মরশুমটাই টিকিয়া থাকি কিনা তার ঠিক নাই, আর এ ছিনার মেয়া আমাকে দু-চার মরশুম বাঁচিয়া রইতে কয়!

গাল খেয়েও রাগে না শিখাবউদি। মিষ্টি হেসে বলে, বাঁচবে গো দাদু, ঠিক বাঁচিয়া রইবে। তদ্দিন তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবই, দেখো।

শুনে বুড়োবুড়ির দল তেড়ে মারতে যায় শিখাবউদিকে, বাঁচিয়ে রাখবি! কী করে বাঁচিয়ে রাখবি রে মাগী? তুই কি বিধাতা নাকি যে, কপালের লেখা আয়ুটাকে কাটিয়া দিয়া সিখেনে আরো দশ বচ্ছর লিখিয়া দিবি?

শিখাবউদি আবার হাসে। বিধাতার দরকার কী গো দিদিমা? স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ব যে গাঁয়ে। তার আগে এক্ষুনি একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। সেখানে হপ্তায় হপ্তায় পরীক্ষা করাব তোমাদের, দরকার মতো ওষুধপত্র ভিটামিন-টনিক খাওয়াব। দেখি, কী করে মর!

শুনতে শুনতে দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে বুড়োবুড়িদের, দু-চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে তারা তাকিয়ে থাকে শিখাবউদির দিকে। এই শহুরিয়া মেয়্যাটা বাস্তবিক কী ভাবে নিজেকে! বিধাতার চাইতেও শক্তিমান, না কী!

দেখতে দেখতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শিখাবউদি। বলে, আর একটু পাড় ঘেঁসে দাঁড়াও দাদু, চোখের জলগুলো নদীর শুকনো খাতে পড়ুক। দিন দশ-বারো যদি রোজরোজ এসে খানিক কাঁদ তোমরা, এই ঘোর গ্রীষ্মেই নদীটা ভরে যাবে জলে।

শুনে বর্ষণমুখর আকাশে রোদ্দুর ফোটার মতো করে হেসে ফেলে বুড়ো-বুড়ির দল। শিখাবউদির দিকে তাকিয়ে কপট রোষে বলে ওঠে, মর, মর ছুঁড়ি।

তখন সন্ধে আটটা পেরিয়ে গিয়েছে, দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ।

দরজা খুলে দেখি, পল্টুবাবু।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বোকাবোকা হাসে।

চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসাই ওকে। জয়াকে বলি, চা পাঠাও।

লোকটা আমার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছিল না। এক ধরনের অপরাধবোধ জমে ছিল ওর সারা মুখে। ততক্ষণে আমি টের পেয়েছি, সামান্য মদ খেয়েছে ও। নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘাম, বাঁহাত দিয়ে আলতো করে মুছে নিচ্ছে।

ওকে দেখামাত্র স্থির করে ফেলেছিলাম, প্রথম থেকেই কঠিন হব। বলি, তখন সেরেস্তায় মিছে কথা বললেন কেন?

পল্টুবাবু অবাক চোখে তাকায় আমার দিকে। শঙ্কা ফুটে ওঠে ওর দু-চোখে। বলে, মিছে কথা?

ওর চোখে সরাসরি চোখ রেখে শুধোই, আপনি শিখা বলে কাউকে সত্যিসত্যিই চেনেন না?

একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে পল্টুবাবু।—আসলে, ঠিক কার কথা বলছেন...।

—নতুন বাজার এলাকায় থাকত। শিখা দাস। চেনেন না ওকে? ওর বাবা সম্ভবত দর্জির কাজ করত।

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছে। দু'বার বলতে হল না। হাত দিয়ে ইঙ্গিত করা মাত্র প্রায় ছোঁ মেরে নিল একখানা কাপ। পরপর দু-চুমুক দিয়ে পুনরায় আমার দিকে ভয়-ভয় চোখে তাকাল পল্টুবাবু।

—স্যার, ওই কার যেন নাম বললেন, আমি তো এ-নামের কাউকেই চিনি নে স্যার। আপনার কাছে কেউ উল্টোপাল্টা লাগিয়েছে।

যাচ্ছলে! এ-যে কেবল ভয়েই ম'ল! আমি মনে মনে সামান্য বিরক্ত হই। তাবলে ধৈর্য হারাইনে, কেন কি, আমার কেন জানি বারবার মনে হচ্ছিল, শিখাবউদির সেই লাখ টাকার ধন এক মাণিককে এতদিন বাদে খুঁজে পেয়েছি।

—আরে, না, না। আমি একখানা ফুরফুরে হাসি উপহার দিই পল্টুকে,—ওসব কিছু নয়, খামোখা ভয় পাচ্ছেন কেন?

—মেয়েমানুষের কেস তো স্যার, ভয় করে। মেয়েদের নিয়ে আইন-কানুন যে কত কড়া আমি তো জানি। পান থেকে চুন খসলেই সেকশন ফোর নাইনটি এইট-এ।

—তাই নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কী আছে? আপনি তো কোনও অন্যায় করেননি।

—ন্যায় অন্যায়ের কথা হচ্ছে না, স্যার। দুনিয়ায় শত্রুর তো অভাব নেই। সেই বলে না, যেখানে করবি ঘর, অর্ধেক আপন, অর্ধেক পর। কে কোথায় কোন কথার গায়ে কতখানি গুড় মাখিয়ে খাইয়ে দেবে কাকে, তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে, স্যার? কথা শেষ করেই কোমরের দিকটা একটুখানি আলগোছে চুলকে নেয় পল্টু।

বলি, সে কি! আমি তো শুনেছি, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোনও শত্রু নেই আপনার। আপনি নাকি অজাতশত্রু।

ততক্ষণে পুনরায় মেঘ জমেছে পল্টুর মুখ জুড়ে। হালকা ভয় জমেছে দু-চোখে। বলে, এমন কথা আপনাকে কে বলেছে স্যার?

—ওই যে শিখা বলে মেয়েটার কথা বললাম, ওইতো কতবার বলেছে আমায়।

শুনেই ভয়টা আরো গাঢ় হয় পল্টুর মুখে, মেয়েটা কে স্যার?

—যাব্বাবা! আমি অল্প বিরক্ত হই এবার, আপনার কাছেই তো জানতে চাইছি সেটা।

—কেন স্যার? পল্টুর দু-চোখে কুতকুত করে ভয়,—আমার কাছে কেন? আমি তো কারো সাতেপাঁচে

থাকিনে।

আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি, লোকটা ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ভিতু। ওর মন থেকে অহেতুক ভয়টা কাটাতে না পারলে কিছুতেই মন খুলে কথা বলবে না।

ততক্ষণে চা শেষ করে উশখুশ করছে পল্টু। একবার পকেট থেকে একটা কৌটোমতো বের করেই পুনরায় ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে।

বলি, কী আছে কৌটোয়?

খুবই সঙ্কোচ সহকারে পল্টু বলে, খইনি স্যার।

—তো খান। সঙ্কোচ করছেন কেন?

খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে খইনি ডলতে শুরু করে পল্টু। একসময় বাম হাত দিয়ে নিচের ঠোঁট টেনে ধরে খইনিটুকু ভরে নেয়।

বলি, মেয়েদের নিয়ে অত ভয় কেন আপনার?

—ভয় পাবো না, স্যার? মেয়েমানুষ বলে কথা, কী থেকে কী হয়ে যায়, তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? এই তো, স্যার, সেদিন একটা কেস এল আমাদের সেরেস্তায়, একটা আইবুড়ো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, কে-না-কে করেছে সেটা, দায় চাপিয়ে দিয়েছে একটা নিরীহ ছোকরার ওপর। এখনও অবধি জামিন পায়নি বেচারা।

—আরে, না, না। ডান হাত দিয়ে মাছি তাড়াই আমি,—শুধু শুধু ভয় পাবেন না। ওসব কিচ্ছু নয়। আসলে, আমাদের একজন খুব পরিচিত মেয়ে আপনার কথা খুব বলে। খুবই প্রশংসা করে আপনার।

আমার কথায় খুশি তো হয়ই না পল্টু, বরং তার সারা মুখে গাঢ় দুর্ভাবনা জমে। ভুরু কুঁচকে বলে, কী যেন নাম বললেন, স্যার, মেয়েটার?

—তার পুরো নাম বহ্নিশিখা। বহ্নিশিখা দাস। সবাই ওকে শিখা বলেই ডাকে। আপনিও ডাকতেন।

—আমি! পল্টু খুবই আশংকা নিয়ে তাকায় আমার দিকে।

—হ্যাঁ। ডাকবেন না কেন? এক পাড়াতেই তো থাকতেন। একদিন রাতে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ওকে। আপনার তো খুব সাহস ছিল ওই বয়েসে।

আমার কথাগুলো বুঝি হেঁয়ালির মতো লাগছিল পল্টুর কাছে, তাও একসময় কবুল করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে এবার। সতু দর্জির মেয়ে। শিখাই নাম বটে, একটা ভাইও ছিল ওর, ভণ্ডুল না কী যেন নাম।

বলতে বলতে খুব লাজুকপানা হয়ে আসে পল্টুর মুখ। অনেক দিনের কথা তো ধরতে পারিনি। খুব সুন্দরী ছিল মেয়েটা, তাই নয়, স্যার?

—খুবই সুন্দরী। আমি নির্দ্বিধায় সায় দিই,—নইলে আপনার মতো মানুষ কি আর এমনি এমনি প্রেম নিবেদন করে বিয়ে করতে চায়?

সে-কথায় বুঝি যারপরনাই লজ্জা পায় পল্টু। বিড়বিড়িয়ে বলে, আসলে স্যার, ওই বয়েসে, মানে—তখন তো মনটা...।

একটা সময়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম, এই ব্যক্তিই হল শিখাবউদির সেই পল্টুদা।

বিস্ময়ের অতল খাদে পড়ে সেই তখন থেকেই ভাবতে থাকি, কেন শিখাবউদি এই মানুষটাকে নিয়ে সাতকাহন করে বলে আসছে সারা জীবন ধরে? কেন জীবনভর এমন একটা মানুষের গায়ে অতঅত আল্পনা আঁকল! কেন তেমনটা করতে গিয়ে নিজের সংসারটিকে এমন অবহেলায় ভেঙে দিল!

বাস্তবিক, পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে, পল্টুদার ব্যাপারে কিছুই জানত না ভণ্ডুল। কী করেই বা জানবে সে? শিখাবউদির যখন বিয়ে হয়, তখন সে দু-বছরের শিশু মাত্র। তাছাড়া, বাস্তবে তো পল্টুদার সঙ্গে শিখাবউদির কোনও একান্ত সম্পর্ক ছিলই না। থাকলেও তা ভণ্ডুলের পক্ষে কোনওমতেই জানা সম্ভব ছিল না। তবুও ভণ্ডুল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সবাইকে পল্টুদার সম্পর্কে সাতকাহন করে এই কারণেই বলেছিল যে, সারা গ্রামের মানুষ অতদূরে থেকেও যে-কথা অত বিতাং করে শুনেছে,

শিখাবউদির সহোদর হয়েও সেই কথাটা তিলমাত্র না জানাটা তার পক্ষে নিতান্তই লজ্জার। স্রেফ বাহাদুরি ফলানোর তাগিদে, কিনা, শিখাবউদির জীবনের কোনও কিছুই তার অজানা নেই এটা প্রমাণ করতেই সে একটু একটু করে, ঠিক ঘুড়ি ওড়াবার উত্তেজনায়, সুতোর গুলিটা খুলতে শুরু করেছিল। আর অসীম শূন্যে ঘুড়ি ওড়ানো, সেই এমনই এক পাগলামো নেশা, সুতো ছাড়তে ছাড়তে খেয়ালই থাকে না যে কোনও এক সময়ে থামা দরকার। ফলে, পল্টুদার গল্প বলতে বলতে সে শিখাবউদিকে জড়িয়ে এমন-সব ঘটনার অবতারণা করেছে, যা হয়ত বা শিখাবউদিও বলবার কথা ভাবেনি কোনওদিন।

পরের হপ্তায় গাঁয়ে পৌঁছেই চলে যাই শিখাবউদির বাড়িতে।

ইদানীং শিখা বউদি প্রায় সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। পঞ্চায়েতের কাজেকর্মে আকণ্ঠ ডুবে থাকে সে। হরেক কিসিমের মানুষজন তাকে ঘিরে থাকে অষ্টপ্রহর। তাদের সঙ্গে কথা বলতে শিখাবউদির বুঝি ক্লান্তি নেই একতিল।

কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই দেখি, শিখাবউদির বাড়ি জুড়ে বিরাজ করছে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

সামান্য হকচকিয়ে যাই। কোনও বিপদ হয়নি তো শিখাবউদির, কিংবা অন্য কারোর!

আমি উঠোন থেকে শিখাবউদিকে নাম ধরে ডাকি। পরপর দু-বার।

একসময় ভেতর থেকে সাড়া দেয় শিখাবউদি, কে, শঙ্কর? ভিতরে আয়।

ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি বিছানায় শুয়ে রয়েছে শিখাবউদি। বাঁ-হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে কপালসহ চোখদুটি।

—কী হয়েছে তোমার? খুব শঙ্কা নিয়ে আমি শুধোই।

কপালের থেকে হাত নামিয়ে নেয় শিখাবউদি। বলে, কিছু না, একটু জ্বর হয়েছে। বোস। ওই মোড়াটা টেনে নে। বলতে বলতে শিখাবউদি উঠে বসে বিছানায়। বালিসে ঠেস দিয়ে বসে।

খুব শুকনো লাগছিল শিখাবউদিকে। বুঝতে পারি, প্রধান হওয়ার পর খুবই ধকল যাচ্ছে ওর। একটুখানি রেস্ট নেবার কথা বারংবার বলে বলে থকে গিয়েছি। শিখাবউদি কানেও তোলেনি।

শিখাবউদির কপালে আলতো হাত রাখি আমি। গলায় সামান্য শ্লেষ জমিয়ে বলি,—তোমার দেশের সেবা কেমন চলছে?

—ভালোই চলছে। কেন?

—লোকজন, অর্থী-প্রার্থী কেউ নেই কিনা দুয়োর জুড়ে, তাই।

—এই তো এতক্ষণ ছিল সবাই। এইমাত্র গেল।

—বাবুন কোথায়?

—টিউশনি পডতে গেছে। তুই বোস, আমি তোকে চা করে দিই।

—না, না। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি, চা করতে হবে না। আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি। দরকার হলে পরে খাব।

কথাবার্তা এলোমেলো চলতে থাকে। দেশ-গাঁয়ের খবরাখবর দিতে থাকে শিখাবউদি। শহরের খবরাখবরও নিতে থাকে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে উশখুশ করছিলাম, যে কথাটা শুধোবার জন্য হাঁসফাঁস করেছি·সারা হপ্তা, সেটা বলবার জন্য তৈরি হই মনে মনে।

একসময় শিখাবউদির দিকে তাকিয়ে আলটপকা বলে উঠি, তোমার পল্টুদার সঙ্গে দেখা হল।

শিখাবউদি ঝাঁ করে এক ঝলক তাকায় আমার দিকে, পরমুহূর্তে এমনভাব করে, যেন আমার কথাটা শুনতেই পায়নি।

আমি আবার বলি কথাটা।

শিখাবউদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। একসময় গলায় যাবতীয় তারল্য ফুটিয়ে বলে ওঠে, যাহ, মজা করিস নে তো। তুই তার দেখা পাবি কী করে?

—না পেলাম তো মিছে বলছি আমি? বিশ্বাস না হলে এক্ষুনি তার নাড়ি-নক্ষত্র বলে দিতে পারি তোমায়। বলব?

সহসা খুবই অন্যমনস্ক হয়ে যায় শিখাবউদি। ছাদের সিলিংয়ের ওপর দু-চোখ বিঁধিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

—কী হল? একেবারে গুম মেরে গেলে যে! আমার কথাটা ঢুকল তোমার মাথায়?

কয়েক মুহূর্ত গুম মেরে বসে থাকে শিখাবউদি। এক সময় বলে, ঢুকেছে, কী বলতে চাস, বল্।

শিখাবউদি এবার সরাসরি চোখ রাখে আমার চোখে

বলি, কী আর বলব তোমায়, ওর সম্পর্কে সবই তো জান তুমি। কেবল একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব চাই। দেবে?

শিখাবউদির সারা মুখে একটু একটু করে গাঢ় হচ্ছিল অস্বস্তি। এক সময় ঢোক গিলে বলে, কী কথা?

—না, আগে তুমি কথা দাও, তোমার একান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলছি বলে রাগ করবে না তুমি। এবং যা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে।

খুবই বিপন্ন লাগছিল শিখাবউদিকে। সারা মুখে ঘাম জমছিল নিঃশব্দে। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বুঝি মনে মনে কিছু কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে থাকে।

এক সময় আমার দিকে মুখ ফেরায় শিখাবউদি। বিড়বিড় করে বলে, অ্যাদ্দিন বাদে কী দরকার ওসব কথায়? যেতে দে না। পল্টুদা-তে আর এ দুনিয়ার কীই বা এসে যায়!

—তুমি যখন চাইছ না, তবে থাক্।

আমার গলায় বুঝি সামান্য উষ্মা ছিল। শিখাবউদির বুঝি নজর এড়ায় না তা। আমাকে কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকে সে। একসময় আমার একটা হাত নিঃশব্দে টেনে নেয় নিজের হাতে। খুব মিনতি মাখানো গলায় বলে, কিছু মনে করিসনে ভাই। ভুল বুঝিসনে আমাকে।

—সেই জন্যই তো এত করে জানতে চাইছি। আমি অস্থির গলায় বলে উঠি।

—কিসের জন্যে? শিখাবউদি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

বলি, ওই ভুল বোঝার প্রশ্নে। তোমাকে যাতে ভুল না বুঝি, সেই কারণেই এত করে জানতে চাইছি।

শিখাবউদি একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে যায়। এক সময় বলে, বেশ, কী জানতে চাস, বল্?

বলি, কেন তুমি এতকাল পল্টুদাকে নিয়ে এমন একটা আজগুবি ছবি আঁকলে সবাইয়ের কাছে?

—আজগুবি মানে? শিখাবউদির চোখমুখ নিমেষের মধ্যে কঠিন হয়ে ওঠে।

বলি, আজগুবি নয়? যাকে নিয়ে অত কথা চাউর করে এলে এতকাল, তুমি তো ভালো করেই জানো, তেমন কোনও লোকই নেই বাস্তবে।

—নেই? শিখাবউদির ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি,—তবে যে বললি, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর?

—ঠিকই বলেছি। যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার নাম পল্টুই বটে। তোমাদের এলাকায় থাকেও সে। যতদূর বুঝেছি, একসময় তোমার প্রতি তার অল্পস্বল্প দুর্বলতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু ওই লোকটার মধ্যে সত্যিসত্যি তোমার পল্টুদার ছিটেফোঁটাও নেই। না রূপে, না গুণে, না শিক্ষায়-দীক্ষায়, আদর্শে। এ লোকটা তো একটা মর্কট বিশেষ।

শিখাবউদি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার ওপর দৃষ্টি নেই ওর। সে একেবারে শামুকের মতো ঢুকে পড়েছে নিজের মধ্যে। আঁতিপাঁতি কিছু খোঁজাখুঁজি জুড়েছে সেখানে।

আমি ক্রমেক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠি, কেন এমনটা করলে বউদি?

—কেন করলাম বল্ তো? শিখাবউদি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। নিজের ভেতরে খোঁজাখুঁজিটা চলতেই থাকে...। চলতেই থাকে...।

খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে থাকে শিখাবউদি। দু-চোখ দিয়ে সিলিংয়ের গায়ে আঁচড়

কাটতে থাকে নিঃশব্দে।

আমি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠি। গলায় যথাসম্ভব ভর্ৎসনা ফুটিয়ে বলি, ওই একজন অলীক মানুষের জন্য নিজের সংসারটাকে অবধি এমন নির্মম হাতে ভেঙে দিলে?

বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক বসে থাকে শিখাবউদি। একসময় খুব মৃদু গলায় বলে, এছাড়া আমি কিই বা করতে পারতাম, বল্? এছাড়া আমার কী করা উচিৎ ছিল বলে মনে হচ্ছে তোর?

—সেটা তুমি নিজে বোঝ না? যখন ওইসব নিয়ে ক্রমশ জটিল হচ্ছিল পরিস্থিতি, যখন বল্লভদা তোমাকে ভুল বুঝে একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল দূরে, কেন তুমি সব খুলে বললে না বল্লভদাকে?

শিখাবউদি আমার চোখে সরাসরি চোখ রাখে এতক্ষণে। ভাঙাভাঙা গলায় বলে, বললে কী হত?

—সব কথা ওকে খুলে বললে তোমার সংসারটা এমন করে ভেঙে যেত?

শিখাবউদি আমার দিকে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। এক সময় আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলে, হ্যাঁ রে শঙ্কর, তুই কি সত্যিসত্যি বিশ্বাস করিস, পল্টুদা না থাকলে আমার সংসারটা ভাঙত না?

এবার আমি পড়ে যাই দোটানায়। কেন কি, এ বিষয়ে আমার নিজের মনেও ঘোরতর ধন্ধ রয়েছে। বল্লভদার ভাবগতিক দেখতে দেখতে আমার কেন জানি সেই তখন থেকেই মনে হত, বল্লভদা একদিন শিখাবউদিকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতই। বল্লভদার মধ্যে একজন বারভোগী মানুষ লুকিয়ে ছিল আজীবনকাল। যে-কোনও অজুহাতে সে একদিন না একদিন অন্য নারীতে চলে যেতই। পল্টুদার উপস্থিতিটা তার কাছে নেহাতই একটা বাহানা মাত্র।

তবুও প্রকাশ্যে কথাটা স্বীকার করতে চাইনে আমি। বলি, তুমি বারবার পল্টুদার কথা না তুললে বল্লভদা কখনোই এমন করে ভেঙে দিত না সংসারটা।

শিখাবউদি বুঝি ভারি দোটানায় পড়ে যায়। একসময় খুব দ্বিধাজড়িত গলায় বিড়বিড় করে বলতে থাকে, কে জানে, হয়ত ভেঙে যেত, হয়ত ভাঙত না, কে জানে..., কে জানে...। কিন্তু পল্টুদা যে হারিয়ে যেত।

—কী বলছ তুমি বউদি! আমি বুঝি শিখাবউদির মনের তল খুঁজে পাইনে,...স্বামী-সন্তান নিয়ে গড়া এমন একটি সুখের সংসার, স্রেফ ওই একটা মানুষের জন্য এমন নিঃশেষে ভেঙে ফেলা চলে?

আমার কথা শেষ না হতেই শিখাবউদি ঝাঁ করে তাকায়। আমার মুখের ওপর নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় তার চোখের মণি। ওর চোখের তারায় জমাট বাঁধে বিস্ময়, বেদনা...। কথা বলতে গলা ধরে আসে তার। ঠোঁটজোড়া কাঁপতে থাকে। ফিসফিস করে, একেবারে নিজের সঙ্গে কথা বলবার মতো করে বলে, এমন কথাটা তুই বলতে পারলি, শঙ্কর?

শিখাবউদির উচ্চারণে এমন এক হাহাকার ছিল, আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করি। চুপ করে তাকিয়ে থাকি শিখাবউদির দিকে।

—ওরে, বুঝিস না কেন, মনের মধ্যেকার মানুষটাই তো আসল। তার বাইরে সবকিছুই তো নেহাৎই ঠুনকো। এই আছে তো এই নেই। মনে রাখিস, স্রেফ ওই পল্টুদার সাহসেই একা একা এই এতদিন ধরে এত বড়ো লড়াইটা চালাতে পারলাম আমি।

বলতে বলতে শিখাবউদি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,... মনে রাখিস, ওই মানুষটার জন্যই তোদের হারিয়ে যাওয়া নদীটাকে.আবার ফিরে পেলি তোরা।

পরিচ্ছেদ পাঁচ

এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর

গোবর দিয়ে নিকোনো দাওয়ায় বসে নিজের ভিজে পায়ের টাটকা ছাপগুলোকে দেখতে দেখতে চমকে উঠছিলেন মন্দাকিনী। নিজের পায়ের ছাপ, কিন্তু এমন অপার বিস্ময়ে পলকহীন চোখে দেখছিলেন, যেন কতই অচেনা এক বিস্ময়কর বস্তু।

গরমকালের বিকেলে গাঁয়ে-ঘরে প্রায় লোকই পুকুরে নেমে একেবারে ডুবে চান করে। একটু আগেই পুকুরঘাট থেকে চান সেরে ফিরেছেন মন্দাকিনী। ভেজা কাপড়ে, ভেজা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরেছেন। তাইতেই উঠোনে, দাওয়ায় সারবন্দী পায়ের ছাপ পড়েছে। মন্দাকিনী খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ছাপগুলোকে। প্রায় আবিষ্কার করবার মতো করে নিরিখ করছিলেন আপন পায়ের ছাপের মধ্যে ফুটে ওঠা প্রতিটি রেখাকে। ফলে, আমি যখন আগড় ঠেলে ঢুকলাম, এমনই বুঁদ হয়েছিলেন তিনি, পয়লা চটকায় আমার আগমনটা একেবারেই টের পেলেন না।

একসময় আমার দিকে তাকালেন তিনি। দুচোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, এত বিচিত্র জাতের রেখাও রয়েছে মাইন্‌সের পায়ের পাতায়! তেমন করে কোনওদিন তো নজরেই পড়েনি রে!

পড়বার কথাও নয়। কুন্দমাসি বলে, ছেলেবেলা থেকে নিজের পায়ের পাতাদুটিকে চাক্ষুস করবার সুযোগ আর পেয়েছেন কবে মন্দাকিনী! কস্মিনকালেও তো নিজের পা নিজের হাতে ঘষেননি। পুকুরঘাটে পা ছড়িয়ে বসেছেন, পাদুটি তুলে দিয়েছেন ঘাটের জল ঘেঁসে বসিয়ে রাখা পাথরটার ওপর, কুন্দ কিংবা অন্য কোনও দাসী ঝামাপাথর দিয়ে আলতো হাতে ঘষে দিয়েছে পায়ের পাতা। পায়ে আলতাও পরিয়ে দিয়েছে নাপিত-বউটি।

যখন বউ হয়ে এলেন মুখুজ্যাগড়ে, তখন ওদের রমরমা ছিল দেখবার মতো। একে তো তিনি স্বয়ং এক জমিদারের আদরের কন্যা, তার ওপর তাঁর গায়ের রঙ আর শরীরের রূপলাবণ্য দেখে চারপাশের মানুষজনের চোখ ঝলসে যেত। মুখুজ্যাগড়ে এসে অবধিও তাই পেয়ে এসেছেন অগাধ সম্ভ্রম। জমিদারির ঠাটবাটের সঙ্গে মিলিয়েই তাই কেটেছে তাঁর যৌবনের দিনগুলি। এমন কি প্রৌঢ় বয়েসেও তেমন দৃশ্য নাকি অনেকেই নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করেছে, মন্দাকিনী খিড়কির দিঘিতে চান করছেন, দুদিক থেকে দুটো শাড়ি টানটান করে মেলে ধরেছে দুজন দাসী, যাতে করে ওই স্নানদৃশ্যটি কেউ দেখতে না পায়। তিনি চান করে ফিরছেন, পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন অন্দরমহলের দিকে, পিছু পিছু একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে পায়ের ছাপগুলো মুছতে মুছতে চলেছে কুন্দ-দাসী। পাছে তাঁর পায়ের ছাপের ওপর পা পড়ে যায় প্রজা কিংবা দাসদাসীজাতীয় কোনও ব্রাত্য মানুষের, সেই কারণেই এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। নাকি অন্য কোনও নিগূঢ় কারণে এমন ব্যবস্থা, বুঝতে পারত না অবোধ দাসদাসীর দল। জিজ্ঞেস করে, তেমন সাহসও ছিল না কারও। নিজের পায়ের ছাপগুলিকে এইসব কারণেই বুঝি তেমন করে চিনতেন না কোনওদিনও।

তাই, অ্যাদ্দিন বাদে, এই পড়ন্ত বেলায় নিজের পায়ের ছাপগুলিকে আবিষ্কারতুল্য খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে বুঝি অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন মন্দাকিনী। হয়ত বা ভাবছিলেন, তাঁর পায়ের ছাপের আকার-আকৃতি তবে এমনতরো! তাতে এত প্রকারের বিচিত্র-সব রেখা, উপরেখা!

এসব রেখার মানে কি? মন্দাকিনী জানেন, মানুষের হাতের রেখাগুলি যেমন তার ভাগ্যের সূচক, পায়ের রেখাগুলিও তাই। এমন কি কপালের রেখার থেকেও নাকি মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নিরূপণ করা যায়। মানুষের শরীরের তিলগুলিও নাকি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। কুন্দকে এসব কথা মাঝে মাঝেই বলতেন মন্দাকিনী। তবে কি এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের পায়ের রেখাগুলিকে নিজের মতো করে পড়বার চেষ্টা করছিলেন তিনি! কোন্ রেখাটি তাঁর জীবনে কোন্ সৌভাগ্য এনে দিয়েছে, কিংবা কোন্ দুর্ভাগ্য, বুঝতে চাইছিলেন বুঝি এই অবেলায়।

এখন, এই পরিণত বয়েসে, যমুনার জল উল্টোপানে অনেকখানি বয়ে যাবার পরে, এতসব ভাবতে পারছি বটে, কিন্তু ওই কিশোর বয়েসে, যেদিন আমাকে প্রথম নাম ধরে ডেকেছিলেন মন্দাকিনী, আমার এতকিছু ভাববার মতো বোধবুদ্ধি হয়নি। তখন আমি নেহাতই স্কুলের নিচু ক্লাসের পড়ুয়া। তখন মন্দাকিনীর সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে কেবলই ভয়ের অনুভূতি। যেন, এক বাঘিনীর সামনে এসে পড়েছি আমি, স্বেচ্ছায় নয়, বাঘিনীই দূর থেকে হুঙ্কার দিয়ে ডেকেছে আমায়।

বাস্তবিক, আমাদের পুরো পাড়ার মানুষ তখন মন্দাকিনীকে আড়ালে বাঘিনী বলেই ডাকত। তাঁর সম্পর্কে এত রকমের ভয়-পাওয়ানো কাহিনী চালু ছিল পাড়ার লোকজনের মধ্যে, সেই কারণে আমরাও বেজায় ভয় পেতাম ওঁকে।

কেবল পায়ের ছাপের অন্তর্গত রেখাগুলিই নয়, ইদানীং বুঝি মন্দাকিনীর মনে হয়, কতকিছুই আবিষ্কারযোগ্য, উপভোগ্য বস্তু, প্রাণী, মানুষ, কিংবা দৃশ্য রয়েছে এই দুনিয়ায়, যা এতদিন নাকি তাঁর নজরেই পড়েনি। বাধোবাধো ভাবটা কাটবার পর কুন্দকে সেসব কথা স্বয়ং বলেছেন কথার ছলে—কিনা, চিরকালটাই তো গড়ের মধ্যেকার খাঁচায় পোষা চন্দনাটিকে দেখিয়া আস্‌সি রে কুন্দ, এর বাইরে যে এত-এত পাখি রয়েছে দুনিয়ায়, পাটকোকিল, চালধোয়া পাখি, গুয়ে-শালিখ, কালিবক, এত-এত চড়াই, তুলাফুটকি, তাই কি ছাই জানতাম!

সেটা অবশ্য ঠিক। কুন্দকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়। ইঁট-কাঠ-পাথরে গড়া মুখুজ্যাগড়ের অন্দরমহলটি এতটাই অসূর্যস্পশ্যা, দুনিয়ার তাবৎ অন্দরমহলের মতো এতটাই ঘেরাটোপের মধ্যে তার অবস্থান, মন্দাকিনীর পক্ষে ওইখান থেকে ওইসব জাতের পাখিপাখালের খেলে বেড়াবার জায়গা অবধি নজরটা না পৌঁছনোই স্বাভাবিক। মন্দাকিনী এখন কবুল করেন কুন্দর কাছে, দেখব কী করিয়া? ওই পাষাণপুরীতে থাকতে থাকতে নজর বাড়িয়ে দেখবার ইচ্ছাটাই মরিয়া যায়।

বাস্তবিক, নামহীন, গোত্রহীন আভিজাত্যহীন, অভিভাবকহীন সেইসব পাখিপাখালগুলি তো মুখুজ্যাগড়ের অন্দরমহল অবধি প্রবেশের অধিকার থেকে চিরকালই বঞ্চিত।

মন্দাকিনী কুন্দকে বলেন, অথচ দ্যাখ, এরা কেমন অনায়াসে ঘুরিয়া বুলে, খেলিয়া বেড়ায় আমার নতুন বসতবাটির চারপাশে! দ্যাখ্ দ্যাখ্ কুন্দ, কেমন খেলিয়া বেড়াচ্ছে উঠানময়!

কুন্দও স্বীকার করে তা। বাস্তবিক, এপাড়ার পাখিগুলোর আচার-আচরণ বড়ই বিচিত্র। দেখতে দেখতে প্রথম ক'মাসের মধ্যেই, শুধু মন্দাকিনীরই নয়, কুন্দরও খুব ভালো লেগে গিয়েছিল পাখিগুলোকে। শুধু ভালো লাগাই নয়, মন্দাকিনীর সঙ্গে ওদের খুবই ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতেও নাকি কোনওই অসুবিধে হত না তাঁর। দিনভর মন্দাকিনীর নতুন বাড়ির চারপাশে, উঠোনে অবিরাম কলকল করতে থাকে পাখিগুলো। উড়ে উড়ে নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন জায়গা বদলায়। কথায় কথায় খুনসুটি, ঝগড়া-কলহ বুঝি লেগেই রয়েছে সারাক্ষণ। আর, গলার আওয়াজ কি! কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

মিষ্টি হেসে মন্দাকিনী কুন্দকেই সাক্ষী মানতেন, আচ্ছা বল্ দেখি কুন্দ, নিয়মিত ছোলা-বাদাম, কাঁচা লঙ্কা, দুধের সর কিছুই পায় না এরা, কেবল গাছগাছালির ফল-পাকুড় খাইয়া বাঁচিয়া আছে, তাও গলায় এত আওয়াজ ওরা পায় কুথিকে!

শিখাবউদির কাছে সেসব কথা বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ত কুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে মন্দাকিনীর বক্তব্যের সারবত্তা স্বীকারও করে নিত। বাস্তবিক, মুখুজ্যাগড়ের খাঁচার চন্দনাটি তো অ্যাতো অ্যাতো

ভালোমন্দ খায়, কিন্তু কেমন মিনমিনে গলা তার। আওয়াজ যেন বেরোতেই চায় না। আসলে, কুন্দ জানায়, খুব বেশি আওয়াজ মুখুজ্যাগড়ের বাসিন্দাদেরও চিরকালই ভারী অপছন্দ। বাড়িতে গাদা গাদা দাসী-চাকর, কিন্তু তাদের তো গলা তুলে কথা বলাই বারণ। বাড়ির খোদ বাসিন্দা যারা, মালিকপক্ষ, তাদের ক্ষেত্রেও চেঁচিয়ে ফাটিয়ে কথা বলবার দস্তুর নেই কোনওকালেই।

খাঁচার চন্দনাটি, যখন প্রথম আসে, সারাদিন খুব চেঁচাত আর অস্থিরভাবে দাপাদাপি করত। খুবই দজ্জালপনা ছিল তার মধ্যে। সব্বাই তাকে ধমকাত সেজন্য। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিল সেও। সমস্ত বেয়াদবি বিসর্জন দিয়ে সে হয়ে উঠেছিল, মুখুজ্যাগড়ের বাসিন্দাদের ভাষায়, এক লক্ষ্মী পাখি। চেঁচাত না, দাপাদাপি করত না। মুখুজ্যাগড়ে আসার কিছুদিন বাদে থেকেই তার গলা দিয়ে তো স্বরই বেরোত না। আসলে, কুন্দ তো বোঝে, খাঁচার মধ্যে একনাগাড়ে বন্দী থাকতে থাকতে জীবনীশক্তি একেবারে কমে গিয়েছে পাখিটার। এখন সে একটি নির্জীব বস্তুর সামিল। হবেই তো। তার চারপাশে গোলাকার লোহার দেয়াল, তার পায়ে রুপোর সরু বাহারি শেকল। তার চোখে শেকল, মুখে শেকল, সব রকমের ইচ্ছের গায়ে শেকল পরানো, তার জীবনীশক্তি থাকবে কী করে!

ইদানীং, একেবারে সাম্প্রতিকালে, অকস্মাৎ মন্দাকিনী সারা মুখে একজাতের রহস্যের আভা ফুটিয়ে কুন্দকে বলেন, জানিস কুন্দ, ওই পাখিটাকে দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে নিজেকে ওই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কতবার যে পরখ করেছি আমি! এবং, বিশ্বাস কর্, খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়বার কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারতাম, কেমন যেন ক্লান্ত, বিবশ লাগতিছে। খাঁচার মহিমা এমনই।

বলেন, তুই তো ভালোই জানিস কুন্দ, যেদিন আমার প্রথম পুত্রটি মাত্র ন'মাসেরটি হয়ে মারা গেল, গড়ের মধ্যে ক'দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুবই কেঁদেছিলাম। তোরা দু'চারজনা কাছেপিঠের মানুষ ছাড়া সে কান্না আর দেখতে পায়নি কেউই, অথচ এই তো সেদিন, শশী বাগের কচি বাচ্চাটি মারা গেলে পর তার বউটি কেমন চিল-চিৎকার করিয়া, গলা ফাটিয়া আলুথালু কাঁদল। শশী বাগের বউ তার তিন নাকি চার নম্বর বাচ্চার জন্য যেভাবে গলা ফাটিয়ে কাঁদল, নিজের প্রথম পুত্রটিকে হারিয়েও তো তেমনটি কাঁদতে পারিনি আমি। বল্ কুন্দ, পেরেছি কি? কিন্তু কেন পারিনি? পারিনি, কারণ, অত বড় ঘরের বউদের শ্বশুর-ভাসুর, ম্যানেজার-গোমস্তা, চাকর-বাকরদের সুমুখে অমন দৃষ্টিকটুভাবে কাঁদতে নাই। সবার সামনে আলুথালু হইয়া কপাল চাপড়িয়া কাঁদা, দেয়ালে, মেঝেতে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া কপাল ফুলিয়া ফেলা, মুখুজ্যাগড়ের মানুষদের পক্ষে সে এক অতিশয় দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

মন্দাকিনীর কথাগুলো মনে মনে স্বীকার করে নেয় কুন্দ। বাস্তবিক, প্রথম সন্তানের প্রতি দুনিয়ার সব মায়ের এক ধরনের গভীর দুর্বলতা থাকে। মন্দাকিনীরও অবশ্যই ছিল। তাইতো তিনি আজও ভুলতে পারেননি সেই সন্তানের অকাল মৃত্যুর স্মৃতি। তাইতো সেই ছেলের জন্য আজ অ্যাদ্দিন বাদেও বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে। নিজের থেকে প্রসঙ্গটা তুলে মনের ভাঁপ উগরে দিতে চান দাসীবাঁদিগোছের কুন্দর কাছে। খুব একান্তে বুক হাট করে কথা বলতে গিয়ে মন্দাকিনী কোনওরূপ রাখঢাক না করেই কুন্দর কাছে স্বীকার করেন, আজ অ্যাদ্দিন বাদে পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়ে তাঁর মনে বড়ই সাধ জাগে, আধশতাব্দী আগের সেই জমে থাকা কান্নাটা নিঃশেষে উগরে দেন। ঠিক যেমন করে কাঁদা উচিত প্রথম সন্তানের জন্য তার মায়ের, সেই রকম বুকফাটা কান্নাটি এবার একেবারে নিঃসঙ্কোচে কেঁদে নেন। কেন কি, এখন তো আর কোনও সামাজিক আভিজাত্যজনিত বাধা নেই তাঁর। এখন তো তিনি ইচ্ছে করলেই যে-কোনও উপলক্ষ্যে হা-হা করে হেসে ওঠার মতো স্বাধীন, স্বাবলম্বী হয়েছেন। কিংবা পাগলিনীর মতো কেঁদে ভাসালেও এখন তো তাঁকে গঞ্জনা দেবার মতো কেউ নেই।

কুন্দর মুখে এসব কথা শুনতে শুনতে শিখাবউদি বলে ওঠে, যদি এসব কথা বলতে বলতে কাঁদিয়া উঠেন বড়-মা, তো বাধা দিস্‌নি কুন্দ। বুকের ভিতর জমিয়া থাকা পাষাণভার নামিয়া গেলে তিনি শান্তি পাবেন।

কুন্দ শিখাবউদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় তৎক্ষণাৎ, বলি তো, হামেশাই বলি। এখন তো বড়-মাকে সব কথাই, সব রকমের কথাই বলতে পারি আমি। বলি, সত্যি বড়মা, তুমাকে কক্ষনো

তেমন করিয়া কাঁদতে দেখিনি আমি। বোধ করি গড়ের কেউই দেখেনি। এমনকি, যেদিন গড় ছাড়িয়া চলিয়া আইলে, সেদিনও একফোঁটা জল দেখিনি তুমার চোখে। এমনটা ভালো নয় বাপু। জানো তো, কাঁদলে মাইন্সের ভালো হয়, বড়মা, উপ্কার হয়। আমরা তুমাদের দাসীচাকরেরা অত লাথিঝাঁটা খাইয়াও বাঁচিয়া রইতে পারি কেন জানো? দুঃখ হইলে আলুথালু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই দুঃখ ভুলিয়া যাই আমরা। এবার কাঁদার উপলক্ষ্য এলে তুমি কাঁদবে, হ্যাঁ? এক্কেবারে হু-হু করিয়া বুক ভাসিয়া কাঁদবে। দেখ কাঁদলে কত ভালো লাগে।

কিন্তু কুন্দর পরামর্শগুলো শিরোধার্য করে নিতে গিয়েই কেমন জানি নিভে যান মন্দাকিনী। সারা মুখে প্রায়-সর্বস্বান্ত মানুষের হাহাকার ফুটিয়ে বলেন, কিন্তু এখন যে আর পাগলিনীর মতো আলুথালু কাঁদিয়া বুক ভাসাবার কোনও উপলক্ষ্যই নেই আমার। ঘা-ই নাই, তার আঁচড়াব-চুলকাব কি!

বাস্তবিক, মন্দাকিনীর মধ্যে বর্তমানে দৃশ্যত কোনও দগদগে ক্ষত নেই।

কুন্দকে বলেন, জানিস তো কুন্দ, পুরানো ঘা থাকে চামড়ার তলায়, বাইরের থিকে তা দেখা যায় না। এখন আমারও হইল গিয়া সেই অবস্থা।

কুন্দও বোঝে, পুরোন কোনও কষ্টকে উপলক্ষ্য করে অ্যাদ্দিন বাদে আর মন্দাকিনীর পক্ষে নতুন করে গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠা, কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসানো সম্ভব নয়। কেন কি, দাউদাউ আগুন সব সময়ই স্বল্পস্থায়ী হয়, কিন্তু দীর্ঘকালের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। মন্দাকিনীর বুকের মধ্যেও হয়তো বা পুত্রশোক ধিকিধিকি জ্বলছিল তখনও। কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে, তাকে কাঠকুটো দিয়ে গনগনে করবার কোনও মানে হয় না। সে চেষ্টা করেনও নি মন্দাকিনী। বরং কেন জানি, বকদিঘির পাড়ে নতুন সংসারটি পাতবার কিছুদিন পর থেকেই আমরা তাঁকে কথায় কথায় হেসে উঠতে দেখেছি।

ততদিনে আমাদের মতো সম্পন্ন চাষীদের বাড়িতে তো বটেই, একেবারে গরিব-গুরবোদের বাড়িতেও তাঁর নিত্য যাতায়াত। তখন দেখেছি, আড্ডা-মজলিসে চাষাভুষোদের বাড়ির বউ-ঝিগুলোর দেখাদেখি আচমকা খুব জোরে, খুবই বেমানান, বেয়াড়া ভঙ্গিতে হেসে উঠতে গিয়ে প্রায়ই বিষম খেতেন মন্দাকিনী। হেঁচে কেশে একসা করতেন। জলটল খেয়ে ধাতস্থ হয়ে বলতেন, 'আসলে, এমন করিয়া তো কোনওকালেই হাসিনি। গড়ভর্তি শ্বশুর-ভাসুরতুল্য মানুষ, নায়েব-গোমস্তা, কাতারে কাতারে প্রজার দল, দাসদাসী, মুনিশ-মাইন্দার, তাদের সুমুখে জোরে জোরে হাসার জো ছিল তখন? যাই বল্, কলিজা ফাটিয়া হাসতে গিয়া বেশ টের পাচ্ছি এখন। বাস্তবিক, কলিজায় বেশ জোর লাগে ওর'ম হাসতে। শরীরে বেশ শক্তি লাগে রে। অত সোজা নয় ওর'ম হাসাটা।

কথাগুলো শুনতে শুনতে কুন্দ এবং কুন্দতুল্য পড়শিরা ফিকফিক করে হাসতে থাকে। এক ধরনের দেমাক ফুটে ওঠে ওদের সারা মুখে, কিনা, ওর'ম শক্ত কম্মোটি তাদের, কেবল তাদেরই করায়ত্ত। ওরম কলিজা ফাটিয়া হাসুক তো দেখি বড় ঘরের দুধ-ঘি, মাছ-মাংস খাওয়া মাইন্সেরা!

কুন্দপিসির মুখে এসব কথা শুনতে শুনতে খুব হাসি পেয়ে যায় আমার।

কিন্তু এখন বুঝি, মন্দাকিনীর কথাগুলোতে তিলমাত্র খাদ ছিল না। বাস্তবিক, অমন করে হাসতে গেলে শুধু কলিজায় জোরই লাগে না, নিজেকে একেবারে বদলে ফেলতেও হয়।

ততদিনে কুন্দ আর মন্দাকিনীর দাসী নয়, বরং বলা যায়, সর্বদিক থেকে তাঁর অভিভাবক। ততদিনে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাপারে শলা-পরামর্শ দেওয়া তো বটেই, প্রয়োজনে মালকিনকে সামান্য ধমক-টমকও দেয় কুন্দ, দিতে পারে।

তো, দু'একবার মন্দাকিনীকে ওরকম বেয়াড়াভাবে হেসে উঠতে দেখে কুন্দ তাঁকে সাবধান করে দিয়েছে, ওর'ম হেসোনি বড়মা, বুকে খিঁচ লাগিয়াবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন হাসি থামাতেন না মন্দাকিনী, কুন্দ মৃদু ধমক অবধি দিয়েছে, বলতিছি না, খিঁচ লাগিয়াবে। কথাটা কানে যাচ্ছেনি?

অবাক চোখে কুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন মন্দাকিনী। বোধ করি মজাও পেয়েছেন মনে মনে। কুন্দর ওই অভিভাবকতুল্য ধমকটাকে বেশ উপভোগও করেছেন। কেন—কি, মুখুজ্যাগড়ে এই কুন্দই তো তাঁর সামনে কেঁচো হয়ে থাকত সারাক্ষণ। তিনি খিড়কির দিঘিতে চান সেরে ভিজে কাপড়ে

হেঁটে আসতেন গড়ের লম্বা বারান্দা দিয়ে, কুন্দই তো পেছন পেছন তাঁর ভেজা পায়ের ছাপগুলি মুছতে মুছতে আসত। কীভাবে মুছছে সে, কতখানি মোছা হল, এসব পরখ করবার জন্য তো বারেকের তরেও পেছন ফিরে তাকাননি মন্দাকিনী। সেই কুন্দ কিনা আজ তাঁকে একেবারে গার্জিয়ানের মতো ধমকাচ্ছে!

তবে ধমকটা বোধ করি বড় একটা মন্দ লাগছিল না মন্দাকিনীর। কুন্দর থেকে মুখটা আড়াল করে তিনি মিটিমিটি হেসেছিলেন। কিন্তু অন্যদের নজর এড়ায়নি সেটা।

আমার পায়ের শব্দে হুঁশে ফেরেন মন্দাকিনী, আর, পরমুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিপুল বিস্ময়ে. উচ্চারণ করেন ওই কথাগুলি, অ্যাতো বিচিত্র জাতের রেখাও রয়েছে মাইন্‌সের পায়ের পাতায়!

আমাকে দেখেই গোয়াল-ঘরের দিক থেকে দৌড়ে এসে মাদুর পেতে দেয় কুন্দ।

বিস্ময়ের রেশটা কাটিয়ে উঠেই মন্দাকিনী উঠে দাঁড়ান। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বোস্ শঙ্কর, কাপড়টা ছাড়িয়া আসতিছি। বলেই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় ঘরের ভেতরে ঢুকে যান তিনি। সরুপাড় পাতলা শাড়ির একদিকটা পরেছেন, অন্যদিকটা জড়িয়ে নিয়েছেন উর্দ্ধাঙ্গে। চান সেরে উঠে আসার দরুন শাড়িটা ভেজা। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তাঁর শরীর থেকে। মন্দাকিনীর শরীরে আর কোনও অন্তর্বাস নেই। ফলে, ভেজা শাড়ির স্বচ্ছতা ভেদ করে তাঁর কাঁচা সোনার মতো শরীরটা একটুখানি নজর চালালেই দেখে ফেলা সম্ভব। হ্যাঁ, ষাট পেরিয়েও তাঁর অঙ্গের বর্ণ এখনও কাঁচা সোনার মতো। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম, ওই অবস্থায় সামনে দিয়ে চলে যেতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে, তাঁর মধ্যে তিলমাত্র লজ্জা, সঙ্কোচ কিংবা আড়ষ্টতা নেই। অথচ যখন মুখুজ্যাগড়ের বাসিন্দা ছিলেন তিনি, ভেজা কাপড়ে তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর সুসজ্জিত শরীরটির দর্শন পাওয়াও ছিল এক বিরল ব্যাপার।

একটু বাদেই গা-হাত মুছে-টুছে, শুকনো কাপড় পরে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মন্দাকিনী। খুব অপরাধীর ভঙ্গিতে তাকান আমার দিকে। মৃদু হেসে বলেন, তোকে অনেকক্ষণ বুস করিয়া রাখলাম।

বলি, কী যে বল দিদা! তাবাদে লোকজন তো এখনও অবধি কেউ আইসিয়া পৌঁছায়নি। খেত খামারের কাজবাজ সারিয়া তাদের আসতে একঘড়ি রাত। মিটিং শুরু হবে তারপর। আমাকে তো বুসিয়াই রইতে হইত। আমি আগেভাগে আস্‌সি, তুমার সাথ টুকচাব গল্পস্বল্প করবার তরে।

তাও সঙ্কোচটা বুঝি যায় না মন্দাকিনীর। বলেন, না রে, তুই এখন কত বড় হয়েছু, এখন মেদিনীপুর কোর্টের বড় উকিল, তোর সময়ের এখন কত দাম!

বলতে বলতে মন্দাকিনীর নজর পড়ে গোবর দিয়ে নিকোনো মাটির মেঝের ওপর শুয়ে থাকা নিজের ভিজে পায়ের ছাপগুলোর ওপর। ততক্ষণে একটুখানি শুকিয়ে এসেছে ছাপগুলো। তাও আমার থেকে নজর সরিয়ে ওই ছাপগুলোকেই পলকহীন দেখতে থাকেন তিনি।

বলি, কী দেখছ দিদা, অমন করে?

সেকথায় বুঝি মন্দাকিনীর হুঁশ ফেরে। ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ে সারা ঠোঁটে। বলেন, মাইন্‌সের পায়ের ছাপেও তার ভাইগ্য লেখা থাকে জানিস তো?

—থাকে বুঝি?

—থাকে বৈকি। তোরা আইজকার পড়ালিখা ছগরা, সবকিছোতেই তদের অবিশ্বাস। জানিস, আইজ সকালে হিরণ্ময় এসেছিল।

—আবা—র!

—হ্যাঁ, আজ খুব সকালে এসেছিল। গত একমাসে এই নিয়ে তার তৃতীয় বার আসা। এমন প্রস্তাব লিয়ে আসবে, ভাবিনি। বলিয়া গেছে, আবার আসবে কাল সন্ধ্যাবেলায়। সঙ্গে বৌমাকেও লিয়ে আসবে। সে নাকি নিজের থেকে আমার কাছে আসতে চেয়েছে। সে নাকি একেবারে বদলিয়া গ্যাছে। হিরণ্ময়ের মুখে কথাটা শুনিয়া আমি তো হাসিয়া বাঁচি না। তাই দেখিয়া হিরণ্ময়ের খোব গোঁসা। বলে, অত হাসবার কী আছে? মানুষ বদলায় না? তুমি বদলাও নি?

বলতে বলতে সহসা বুঝি উদাস হয়ে যান মন্দাকিনী। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, সেটাও ঠিক। হিরণ্ময়ের কথাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনি। সত্যিই তো, আমি নিজেই যদি এমন করিয়া বদলিয়া যাইতে পারি, তবে বৌমাই বা ওইটুকু বদলাবেনি কেন? বাস্তবিক, এই ক'বছরে আমি যে পরিমাণ বদলিয়া গেছি, তাতে করিয়া আমার চারপাশের মানুষজনেরা কেন, আমি নিজেই তো বিস্ময়ে থ। মনে হয়, অতীত জীবনটা বোধ হয় আমার আগের জন্মের। এ জন্মের কথা নয় তা।

নিজেকে দেখতে দেখতে মন্দাকিনী যতটা বিস্মিত, ওঁকে দেখে আমার মনেও ততোধিক বিপুল বিস্ময়। এই ক'বছরে নিজেকে সত্যি সত্যি কতখানি বদলে ফেলেছেন মন্দাকিনী-দিদা! বলা যায় না, হয়ত বা হাত-পায়ের রেখাগুলোও সেই অনুযায়ী বদলে গিয়েছে। মানুষের হাত-পায়ের রেখাও তো নাকি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

—তো, কী বলছেন তিনি? আমি শুধোই।

—ওই এক কথা। আমাকে গড়ে লিয়া যাইতে চায়।

—তোমার মনোগত ইচ্ছাটা কী?

আমার এমন প্রশ্নে বুঝি সামান্য দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান মন্দাকিনী। দুচোখের দৃষ্টি দূর আকাশে বিঁধিয়ে দিয়ে বোবার মতো বসে থাকেন। একসময় বলেন, আইজকার মিটিংয়ে সেটাই বলবো সবাইয়ের সাইক্ষাতে।

মন্দাকিনীর কথায় যতটা নয়, তাঁর গলার স্বরে এবং চোখের তারায় তার চেয়ে ঢের বেশি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা। আমি একটু একটু করে সেই রহস্যময়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

একটুবাদেই মন্দাকিনীর উঠোনে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে। সারা গাঁয়ের গরিব-গুরবো মানুষ হাজির হবে সেই মিটিংয়ে। শিখাবউদিই ডেকেছে মিটিংটা। যমুনা খালের জবরদখলি জমির পুনরুদ্ধার এবং খালটার সংস্কার, এই হল আজকের অ্যাজেন্ডা। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই পার্টির মধ্যে দুটো দল হয়ে গিয়েছে। খাল সংস্কারের পক্ষে রয়েছে শিখাবৌদি, আমার ছোটকাকা, আর নন্দ গুচ্ছাত। বিরুদ্ধে রয়েছে গজানন ভট্ট ও তার সাগরেদরা।

মন্দাকিনী বললেন, তিনি ওই মিটিংয়েই জানিয়ে দেবেন, মুখুজ্যাগড়ে ফিরে যাবার ব্যাপারে তাঁর পাকাপাকি সিদ্ধান্ত। আপাতত ওই সময় অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই আমার। কারণ, অ্যাদ্দিনে মন্দাকিনীকে যেটুকু চিনেছি, একবার যখন বলেই দিয়েছেন, ওই ব্যাপারে আগাম আর একটা শব্দও ওঁর মুখ থেকে বের করা অসম্ভব।



ছেলেবেলায় মন্দাকিনী-দিদাকে বড় একটা দেখতে পাইনি আমরা। আমরা অর্থে সন্ধিপুরের প্রজাতুল্য মানুষেরা। বড়রা যদিও বা কালেভদ্রে দেখেটেখে, আমরা ছোটরা তাঁকে কদাচিৎ-ই দেখতে পেতাম। কখনও হয়তো বা তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন কল্পনাথদের বাড়িতে মা-চণ্ডীর থানে পুজো দিতে। কখনও বা খুব সম্পন্ন প্রজাদের বাড়ির উৎসব-পার্বণে নাছোড়বান্দা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। পাশের গ্রামে কিংবা সন্ধিপুরের শেষপ্রান্তে গেলে পালকি চড়েই যেতেন। কিন্তু পায়ে হাঁটা দূরত্ব হলে, কিংবা পুজো-টুজো দেবার থাকলে পায়ে হেঁটেই যেতেন ওইটুকুন পথ। ওই অবস্থায় তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দু'একবার ঘটেছিল আমার জীবনে। মুখুজ্যাগড়ের বড়মা পথ হেঁটে চলেছেন, পাশে পাশে চলেছেন অঘোর চক্রবর্তীর বউ মহেশ্বরী, ব্রজেন দত্তর মা কৌশল্যা, যাঁরা মোটামুটি সমতুল্য পরিবারের এবং মন্দাকিনীর সইতুল্য দু'একজনা, কেবলমাত্র অতি মুষ্টিমেয় এঁদের সঙ্গেই মন্দাকিনীর ছিল মেলামেশা, ভাবসাব। এঁদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন তিনি মুখুজ্যাগড়ে থাকাকালীন। ওদের পেছন-পেছন চকচকে পেতলের বারকোষে আতপ চাল, নারকোল, বাতাসা, কাঁচা দুধ, ফুল-বেলপাতা-দূব্বো, ধূপ-ধুনো ইত্যাদি নিয়ে হেঁটে চলেছে বামুনমাসি। তার পিছু পিছু খুব সন্ত্রস্ত মুখে জবুথবু হাঁটছে জনা-তিনচার দাসী কিংবা দাসীতুল্য মেয়ে।

আর সবাইয়ের পেছনে চলেছে মুখুজ্যাগড়ের পুরোন চাকর-কাম-লগদি জটেশ্বর, যাকে দুনিয়ার মানুষ 'জটিয়া' বলে ডাকত। খুব দামি গরদের থান পরেছেন মন্দাকিনী। ওই প্রৌঢ় বয়সেও গায়ের রঙ যেন ফেটে বেরোচ্ছে। তার চেয়েও ঢের বেশি ফেটে বেরোচ্ছে, কেবল মুখমণ্ডল থেকেই নয়, সারা শরীর থেকে, আভিজাত্যের অহমিকা। সেই অহমিকায়, ওই কচি বয়েসে দেখতে পেতাম, মন্দাকিনীর শরীরের চারপাশে এক অচেনা জ্যোতির্বলয়। খুব মাপা পায়ে হেঁটে চলেছেন মন্দাকিনী। পথের দু'পাশের বাড়িঘর থেকে বউড়ি-ঝিউড়িরা যে-যার বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এসে অবাক নয়নে দেখছে সেই গমন। কেউ কেউ বা অভ্যেসবশে, হয়তো বা নিজেদের অজান্তেই দু'হাত বুকের কাছটিতে জড়ো করে প্রণাম করে নিচ্ছে দুর্লভ পথগামিনীর উদ্দেশে।

খুব ধুমধাম করে মা-সিংহবাহিনীর পুজো হত মুখুজ্যাগড়ে।

নিজেদের গড়ে একেবারে পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল দেবীর মন্দির, নাটমণ্ডপ। সাধারণের বড় একটা সুযোগ ছিল না ভেতরে ঢুকে দেবীদর্শন করবার। কেবল সন্ধিপুর গাঁয়ের গুটিকয় সম্পন্ন প্রজা-পরিবারই প্রসাদ খাওয়ার নেমন্তন্ন পেত। আমার সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে আমার আর কল্পনাথের পরিবার ছিল ওই তালিকায়। সেই সূত্রে আমরা পুজোর ক'টা দিন গড়ের মধ্যে ঢুকতে পেতাম।

পাঁচিলের মধ্যে বিশাল উঠোন জুড়ে পংক্তিভোজন চলত। নাটমণ্ডপে যাত্রাগানের আসর বসত। উঠোনের পংক্তিভোজনেই সবাইয়ের সঙ্গে বসতে হত আমাকে। কল্পনাথ অবশ্য জাতে বামুন এবং খুবই সাত্ত্বিক পরিবার বলে মাঝের মহলের বারান্দায় পাত পড়ত ওদের। অন্দরমহল আর সদরমহলের মধ্যিখানে ছিল ওটা। পালাগানের আসরেও আমাকে আসরের থেকে একটুখানি দূরে আমজনতার মধ্যে গিয়েই বসতে হত। আমজনতা মানে সর্বসাধারণ নয়, পুজো উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত প্রজা কিংবা প্রজাতুল্য মানুষজন। কল্পনাথ অবশ্য আসরের একেবারে সামনেটিতে মুখুজ্যাদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গেই বসতে পেত। ওই বাড়ির সুবিকাশের সঙ্গে ছিল আমাদের বন্ধুত্ব। তার ডাক-নাম ঝংকার। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম আমরা। প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গে মিশতেই চাইত না ঝংকার। কেবলমাত্র কল্পনাথের সঙ্গেই ছিল তার যা-কিছু মেশামেশি, গা-ঘষাঘষি। একটু একটু করে আমাদের মতো সম্পন্ন প্রজাদের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গেও, এমন কি গরিব-গুরবোদের সঙ্গেও মিশত সে। এর পেছনে অবশ্য কল্পনাথের ভূমিকা ছিল খুবই। কল্পনাথ তার ব্রাত্যগোত্রের সহপাঠীদের সঙ্গে এমন গলায় গলায় মিশত, ওর সংস্রবে থাকতে থাকতে, তার আচার-আচরণ দেখতে দেখতে, ঝংকারের মধ্যেও এল এক ধরনের পরিবর্তন। তার জন্য অবশ্য তাকে বাড়ির থেকে বড়ই গঞ্জনা সইতে হত, সে খবরও পৌঁছে যেত আমাদের কানে। ঝংকারকে সেই কারণেই ওই বয়েসে খুব উদার, খুব মহান বলে মনে হত আমার। কিন্তু সম্বৎসর যতই না কেন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই আমরা, পুজোর দিনগুলোতে কিন্তু ঝংকার আমাদের সযত্নে এড়িয়ে চলত। ওইদিনগুলোতে মেশামেশির ক্ষেত্রে কৌলিন্যের সব মাত্রাই বজায় রাখত সে। কাজেই, ওই কদিন উঠোনের একপ্রান্তে সমগোত্রীয়দের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম আমি সারা সন্ধে, মাঝ-উঠোনে বসে অন্নপ্রসাদ খেতাম, আসরের মাঝামাঝি বসে পালাগান শুনতাম, আর, ওই সময়গুলোতে কখনও-কদাচিৎ এক-আধ ঝলক দেখতে পেতাম মন্দাকিনীকে। হয়তো বা তিনি মন্দিরে এসেছেন দেবীকে প্রণাম করে শান্তিজল নিতে। কিংবা মন্দিরের সামনের উঁচু চাতালে সমগোত্রীয়াদের সঙ্গে বসে পালাগান শুনছেন। ওই সময়গুলোতে তাঁকে একেবারে নাগালের বাইরের মানুষ বলে মনে হত আমার। একেবারে যেন ভিন গ্রহের বাসিন্দা।

আজ অ্যাদ্দিন বাদে, মন্দাকিনীর সঙ্গে আমার সেই দুরতিক্রম্য আড়ালটা একেবারেই সরে গিয়েছে। এখন আমি যখন খুশি চলে যেতে পারি তাঁর বকদিঘির কোঠাবাড়িতে। এখন তাঁকে অবলীলায় দিদা বলে সম্বোধন করতে পারি। তিনিও খুব সাবলীল ভঙ্গিতে বলতে পাবেন তাঁর ওইসব দিনের কথা। এখন আমার সামনে সেইসব দিনের স্মৃতির ঝাঁপিটিকে নিঃসঙ্কোচে মেলে ধরতে পারেন তিনি।

নিজের গর্ভজাত সন্তান যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল নির্বাসন দণ্ডের রায়, সেদিনের কথা বলতে গিয়ে আমার সামনে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠেছিল মন্দাকিনীর শরীর। বলেন, বাস্তবিক, আমার

জীবনে সে এক হাড়-কাঁপানো অনুভূতি। নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করে উঠতে পাচ্ছিনি। আর, কেমন মিহি ছুরি দিয়ে মোলায়েম কলিজাটিকে কাটবার ভঙ্গিতে রায়টি উচ্চারণ করেছিল হিরণ্ময়! মা, তুমি যখন এত করেই চাইছ...। এতেই যদি তুমি শান্তি পাও...। জানো তো, জীবনে শান্তিটাই আসল।

সেদিনের ওই ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন মন্দাকিনী। বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে রা বেরোয়নি। অবাক হয়ে গিয়েছিল গড়ের অন্য বাসিন্দারাও, সন্ধিপুর গ্রামের মানুষজনও। নিমেষের মধ্যেই কথাটা মুখে মুখে খুব প্রচার পেয়েছিল, কিনা, হিরণ্ময় মুখুজ্যা তার বুড়ি-মাকে আলাদা করিয়া দিচ্ছে। গড়ের বাইরে বকদিঘির পাড়ে একখান মাটির ঘরে এখন থিকে বাস করবে বুড়ি। আর, যে মন্দাকিনী কিনা হাঁকডাক, ধমক-ধামকে সারাক্ষণ মাথায় তুলে রাখতেন মুখুজ্যাগড়, একেবারে গুম মেরে গেলেন। সেই থেকে তাঁর বুকের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছিল একটা আগুনের কুণ্ড। সেই থেকে আগুনটা জ্বলছে।

সেসব দিনে, বকদিঘির পাড়ে নির্বাসিতা মন্দাকিনী সুযোগ পেলেই উগরে দিচ্ছিলেন, বুকের মধ্যেকার ওই আগুনের কুণ্ড থেকে, ঝলকে ঝলকে আগুন। সে আগুনে চারপাশের প্রজাতুল্য মানুষগুলোর ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। আমরাও ওই বয়েসে পেতাম ওই আগুনের আঁচ। তখন মন্দাকিনী ছিলেন আমাদের চোখে এক মূর্তিমান ভয়। আসলে, তখন তো বুঝিনি, উগরে দেবার ছলে আসলে তিনি বের করে দিতে চাইছেন বুকের মধ্যেকার ওই বিধ্বংসী আগুনকে। নচেৎ ওই আগুনে কবেই তিনি নিজেই পুড়ে খাক হয়ে যেতেন।

কিছুদিন বাদেই অবশ্য থিতিয়ে এল ওই গনগনে আগুন। পুরু করে ছাই জমল তার গায়ে। তখন বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া দায়। একেবারে ছাইচাপা আগুন।

আসলে, তখন শরীরের অন্তর্গত আগুনটাকে একটু একটু লুকিয়ে ফেলতে চাইছিলেন মন্দাকিনী। আগের জীবনটাকে ভুলতে চাইছিলেন তিনি। ভুলতে চাইছিলেন যে, তিনি জমিদার পূর্ণনারায়ণ মুখুজ্যার স্ত্রী এবং ওই জমিদারবংশেব শেষ কুলপ্রদীপ হিরণ্ময় মুখুজ্যার মা।

পূর্ণনারায়ণ গত হয়েছেন অনেকদিন। আমরা তখন জন্মাইনি। মন্দাকিনীর বয়েস তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে। অসম্ভব ফরসা ছিল গায়ের বঙ, শরীরে রক্তের অভাব হেতু ইদানীং ফবসা রঙটি আরও প্রকট, সাদাটে লাগে। শরীবে রক্তের অভাব তো হবেই, তখন যে খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছাডতে বসেছেন তিনি। কিছুই যে রুচছিল না মুখে। কুন্দ সাধাসাধি করতে গিয়ে ধমক খাচ্ছিল রোজদিন। মন্দাকিনী খরখরে গলায় ধমকে উঠছিলেন, যাহ্ দূর হ। বলতেছি না, সারা শরীর জুড়ে আমার অষ্টপ্রহর বমি-বমি ভাব। খেলেই তৎক্ষণাৎ হিক্কা উঠবে, সব বেরিয়ে আসবে বমি হয়ে।

পরবর্তীকালে কুন্দ আমাকে বলেছে, তখন নাকি দিনে-রাতে তিলেকের তরে ঘুমোতেন না মন্দাকিনী। চোখ থেকে নিদ্রাদেবী একেবারে উধাও। সব মিলিয়ে ওই সময়টাতে ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। যারা দেখেছে তারা আজও গল্প করে। আর, অত্যধিক ফরসা হওয়ার কারণে রোগা হয়ে যাওয়া শরীরের নীলচে শিরাগুলি এমনই প্রকট যে, খুব কাছ থেকে যারা দেখেছে, ওই সময়ে, আজও তার বর্ণনা দেয়, বাপ রে! বড়মার গায়ের নীল শিরাগুলা তখন একটা-একটা করিয়া চিনা যাইত। আর, চোখের কোলে জমে থাকা কালির রঙকে তখন আরও গাঢ় লাগত।

বিষাদপ্রতিমাটি হয়ে তখন তিনি রোজ বিকেলে মোরাম বিছানো দিঘির পাড়ে সবুজ ঘাসের চিলতে জাজিমের ওপর পা ছড়িয়ে বসে থাকতেন। বকদিঘির টলটলে কালো জলের ওপর বিঁধিয়ে রাখতেন চোখ। তাতেই যা কিছু শান্তি। পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর তেরচা হয়ে পড়ত তাঁর মুখের ডানদিকে। শনের মতো কয়েক গাছি সাদা চুল এলোমেলো লুটোত ফরসা পিঠের ওপর। হয়তো বা বেলা গড়িয়ে চান সেরেছেন বকদিঘির জলে, পড়ন্ত রোদ্দুরে পিঠ পেতে ভেজা চুল শুকোচ্ছেন, তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দিনশেষের বিষাদ।

সর্বগ্রাসী গনগনে আগুনের বদলে এই বিষাদকালিমাটুকু তাঁর মুখে অনেকদিন ধরেই জমছিল। যখন রত্নহীরা এল মুখুজ্যাগড়ের বউ হয়ে, সেই তখন থেকেই। তারপর, যতই দিন গেছে, সেই বিষাদ গাঢ়

হয়েছে একটু একটু করে। মধ্যিখানে কিছুদিন তাঁর চোখদুটো ছিল একজোড়া গনগনে আগুনের গহ্বর, তারপরই চোখজুড়ে আবার বিষাদ। সেই থেকে তাঁর চোখদুটি যেন একজোড়া বিষাদের পুঁটলি।

রত্নহীরা। যখন সিল্কের ঝালর দেওয়া পালকিতে চড়ে সন্ধিপুরে আসে, এ গাঁয়ের প্রবীণারা বলে, তার ছিল কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ। গায়ে টুসকি মারলে ছলকে উঠত রক্ত। তার শরীর থেকে নাকি সারাক্ষণ বেরোত কাঁচা মৌরির গন্ধ। নিজের ছেলে হলে কী হবে, হিরণ্ময়ের ছিল বাপের মতো শরীর। মোষের মতো কালো বিশাল বপু। তার সঙ্গে একেবারেই মানায়নি রত্নহীরাকে।

রত্নহীরা কোনও বড় বংশের মেয়ে নয়। ধনদৌলতেও ওরা মুখুজ্যা পরিবারের নখের যুগ্যিও ছিল না। ওর বাবা ছিল মেদিনীপুর কালেক্টরেটের একজন কেরানি মাত্র। থাকবার মধ্যে মেদিনীপুর শহরে একখানা দোতলা বাড়ি, আর মেয়ের ওই ভুবনভোলানো রূপ। ওই শেষের কারণেই রত্নহীরাকে প্রায় বিনা পণে ঘরে তুলেছিলেন মন্দাকিনীর স্বামী, পূর্ণনারায়ণ। এমনিতেই তো জমিদারি মানেই পদে পদে বিষয়ের বিষপান, সম্বৎসর মামলা-মোকর্দমা লেগেই থাকত। আর মোকর্দমা মানেই ঘন ঘন সদরে যাওয়া, থাকা। পূর্ণনারায়ণ অনেকদিন ধরে ভাবছিলেন, সদরে একটা থাকবার আস্তানা দরকার। সদরে ছেলের বিয়ে দেবার এটাও একটা কারণ। আর, রূপবতী বৌমা আনবার কারণটা অন্যত্র। জমিদারবংশের চিরকেলে ধাত অনুসারে বাপ-ঠাকুর্দার মতো পূর্ণনারায়ণও আজীবনকাল ছিলেন যারপরনাই উচ্ছৃঙ্খল, নিজের ধর্মপত্নীর চেয়ে পরনারীগমনেই অধিক আনন্দ পেতেন তিনি। এবং তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শেষ জীবনে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল দুরারোগ্য যৌনব্যাধি। রোগের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, জীবনের একেবারে শেষ পর্বে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পরনারীগমনের কুফল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলেছিলেন, নিজের বংশধরটিকে ওই কালব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করবাব চেষ্টা করবেন। সম্ভবত সেই কারণেই একটি রূপবতী মেয়েকে নিজের ছেলের বউ করে ঘরে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে নিজেব ধর্মপত্নীতেই তৃপ্ত থাকে তার মন। নচেৎ মুখুজ্যা বাড়ির বউ করে পাঠাবার মতো আর্থিক কৌলিন্য কিংবা আভিজাত্য, কিছুই ছিল না রত্নহীরার বাপেব।

তাবলে মুখুজ্যা বাড়িতে এসে কিছুমাত্র হীনমন্যতা বোধ করছিল না রত্নহীরা। বরং স্বামীর ভিটেয় পা দেবার কয়েক দিনের মধ্যেই সে এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন ওই বাড়িব বউ হয়ে এসে ধন্য করে দিয়েছে সবাইকে। আর, জমিদারিব ঠাটবাটের প্রসঙ্গ উঠলে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগল, উঁহ্ ভারী তো জমিদারি! বাঁশবনে শেয়াল রাজা!

এমন পুরুষ্টু ডালিমের মতো ফাটো-ফাটো রূপ তার। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের রাশ পুরোপুরি চলে গেল রত্নহীবার হাতে। মন্দাকিনী ধীরে ধীরে একবারে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন মুখুজ্যাগড়ে।

এই পৃথিবীতে শাশুড়ি আর পুত্রবধূর মধ্যেকাব সম্পর্কটাই বোধ করি সবচেয়ে জটিল। একজনের ছেলে এবং অন্যজনের স্বামী, এই দুই রূপে একটিমাত্র মানুষ তখন দুই রমণীর রশি টানাটানির কেন্দ্রবিন্দুতে। সেই রশি টানাটানিতে রত্নহীরারই জয় হয়েছিল। কেন কি, হিরণ্ময় ততদিনে রত্নহীরা বলতে অজ্ঞান। তবে মন্দাকিনীও জমিদার-কন্যা। জমিদার-গৃহিণী। তাঁর তেজও কিছু কম নয়। কেরানির মেয়ের কাছে সহজে হার স্বীকার করার পাত্রী তিনি নন। তার ওপর, তাঁর মনের মধ্যে এমনতরো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পেটের ছেলে হিরণ্ময়, মায়ের সম্মানটুকু অন্তত অত সহজে নষ্ট হতে দেবে না।

বুকের মধ্যেকার সেই মায়ের দাবি থেকে একদিন ছেলের কাছে কেঁদে বলেছিলেন, আমি বাবা ওই খাণ্ডার মেয়ের সঙ্গে আর থাকতে পারতিছিনি। তুই বরং আমার আলাদা থাকবার বন্দোবস্ত করিয়া দে। যে কটা দিন বাঁচব, শান্তিতে বাঁচতে দে আমাকে।

পেটের ছেলে যে তাঁর শেষের কথাগুলোকেই আয়ুধ করবে, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলেন মন্দাকিনী। ফলে, নতুন বউয়ের সঙ্গে মানাতে না পারার অপবাধে তাঁকে নির্বাসিতা হতে হল মুখুজ্যাগড় থেকে, কিন্তু ব্যাপারটাকে এমন কৌশলে ঘটিয়ে ফেলতে পারলেন হিরণ্ময়, যেন মায়ের ইচ্ছে অনুসারেই নিতে হয়েছে এহেন সিদ্ধান্ত, কিনা, মন্দাকিনী চাইলেন বলেই না.. ।

মুখুজ্যাগড় থেকে বেশ খানিক তফাতে, একেবারে দলাই ও গুচ্ছাতপাড়ার লাগোয়া বকদিঘি। তার পাড়ে কাঠা দশেকের একটা ভিটে। হিরণ্ময়ের নির্দেশে ওখানেই বানিয়ে দেওয়া হল একখানা মাটির একতলা কোঠাবাড়ি। মন্দাকিনীকে একদিন চলে যেতে হল ওই বাড়িতে। অপমানে পুড়তে পুড়তে অত্যন্ত লজ্জাজনক সেই নির্বাসন। স্বামী বেঁচে থাকাকালীন বিঘে দশ-বারো জমি মন্দাকিনীর নামে কেনা ছিল। মন্দাকিনীকে নির্বাসনে পাঠানোর কালে হিরণ্ময় খুব উদার গলায় বলেন, তুমার নিজস্ব জমিন তো রয়েছেই, খাবা-পরার অভাব হবেনি। বর্গাদারদের বলিয়া দুবো, সামনের মরসুমে তুমার খামারেই ধান তুলবে অরা।

হিরণ্ময়ের সিদ্ধান্তটা শোনার পর থেকেই কিছুদিন যাবৎ মাথার মধ্যে নিরন্তর আগুন জ্বলছিল। একেবারে উন্মাদিনীর পারা আচার-আচরণ মন্দাকিনীর। বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন। একসময় তাঁর মুখমণ্ডলের কঠিন রেখাগুলি নরম হয়ে আসে। একসময় ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকেন।

একবার ভেবেছিলেন, বাপের ভিটেতেই ফিরে যাবেন। মন্দাকিনীর বাবা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। বড়ভাই বিশ্বপতি আর ছোটভাই সীতাপতি, দুজনেই বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। বাপেব বাড়িতে তখন বাপ বিহনে ভাই-ভাউজদের জমজমাট সংসার। মন্দাকিনীর মা ওই সংসারে গলগ্রহবৎ আশ্রিতা। ওদের সংসারে থাকতে চাইলে ঠাঁই দিত কিনা বলা মুশকিল, যদি দেয়ও, মন্দাকিনী বুঝেছিলেন, বাপ বিহনে ভাইদের সংসারে তাঁর জন্য কোনও অধিক সম্মান অপেক্ষা করে নেই। তাবাদে, এই ষাট ছুঁই ছুঁই বয়েসে স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভাইয়ের সংসারে ফিরে যায় না কোনও নারী। সে আর এক কিসিমের দুরপনেয় অপমান। সেখানে প্রতি মুহূর্তে গ্রামের মানুষজনের হাজারো কৌতূহলের সম্মুখীন হওয়া, এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছিলেন মন্দাকিনী। ভাইয়ের সংসারে তো যানই নি, ভাইয়েরাও যাতে খোঁজখবর নিতে, কিংবা সহানুভূতি জানাতে না আসে, সে নির্দেশও তাদের কাছে আগাম পাঠিয়েছিলেন আকারে ইঙ্গিতে।

সে সময়টা মন্দাকিনী সাময়িকভাবে হয়ে উঠেছিলেন এক মানসিক রোগী। অষ্টপ্রহর আত্মহত্যারও সাধ জাগত তাঁর মনে। বিষ দিতে ইচ্ছে করত রত্নহীরার খাবারে। তখন সারাদিন অষ্টপ্রহর মগজের মধ্যে এক দাউ দাউ অগ্নিকুণ্ড। তার লেলিহান শিখা বুঝি সম্ভব হলে জগত-সংসারটাকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়।

মুখুজ্যাগড় থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন প্রথম বকদিঘির নতুন বাড়িটাতে থিতু হলেন মন্দাকিনী, সেদিনটার অনুভূতি বুঝি আজও ভুলতে পারেননি তিনি। আমাকে একান্তে বলেন, ভুলব কী রে, জীবনের শেষদিন অবধি বুকের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকবে সেই স্মৃতি।

যেদিন পাকাপাকিভাবে মুখুজ্যাগড় ছাড়বেন, তার দিন-দুতিন আগে থেকে নিঃশব্দে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিচ্ছিলেন সবকিছু ব্যবহার্য সামগ্রী। পোশাক-আশাক, গয়না-পত্তর, পানের বাটা, নিজস্ব গাড়ুবদনা...। বিছানা-পত্তর, কাঁসাবাসন, তৈজসসামগ্রী, খাটপালঙ্ক খোলাখুলি, বাঁধাছাঁদা চলছিল রত্নহীরার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে। সেসব আয়োজন দূর থেকে দেখছিলেন মন্দাকিনী।

বিসর্জনের দিন সকাল থেকে হিরণ্ময় প্রায় সারাক্ষণই বাইরে কাটিয়েছেন। মন্দাকিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। মন্দাকিনীর মনেও একবারের তরেও পুত্রমুখ দর্শনের সাধ জাগেনি।

একটু একটু করে বইতে থেকেছে সময়। রোদ্দুরের তেজ বেড়েছে। একসময়, থমথমে মুখে চান সেরেছেন মন্দাকিনী। বামুনমাসি মন্দাকিনীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আসন পেতে ভাত-তরকারি নামিয়ে দিয়েছে রোজকার মতো। থমথমে মুখে খেতে বসেছেন মন্দাকিনী। কিন্তু পাতের খাবারগুলো একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করেই একসময় উঠে পড়েছেন। রান্নাঘরের দরজার গায়ে কাঠ-হেলান দিয়ে তটস্থ

দাঁড়িয়ে থাকা বামুনমাসি হাঁ-হাঁ করে ওঠা তো দূরের কথা সামান্য অনুযোগ করতেও সাহস পায়নি। আর মন্দাকিনীর থমথমে মুখ দেখতে দেখতে সেই সকাল থেকেই তো কুন্দর শরীরে তিরতিরানি ভয়। ওই ভয় নিয়েই সে রোজকার মতো বদনাভর্তি জল ঢেলে দিয়েছে মন্দাকিনীর হাতে। মন্দাকিনী নিঃশব্দে হাত ধুয়েছেন, আঁচিয়েছেন, আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছেন নিজের ঘরে।

অন্য দিন খেয়ে দেয়ে নিজের হাতে একটা পান সাজেন মন্দাকিনী, পানটা চিবোতে চিবোতে বিছানায় একটুক্ষণ গড়িয়ে নেন। পায়ের কাছটিতে বসে কুন্দ ওঁর পা'দুটি নরম হাতে টিপে দেয়। আরামটুকু নিতে নিতে চোখ দুটো জুড়িয়ে আসে। এক সময় ঘুমের অতলে তলিয়ে যান। সেদিন আর পান সাজলেন না মন্দাকিনী। খাট-বিছানা বাঁধাছাঁদা সারা। কাজেই পাকা মেঝেতে কুন্দর পেতে রাখা মাদুরের ওপর বসে বসে জানলা দিয়ে থমথমে দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দেন বাইরে। জানলার গরাদ টপকানো মাত্তর, খাঁচাখোলা পাখির মতো সে দৃষ্টি ডানা মেলে উধাও হয়ে যায় কোথায়! পা টেপা তো দূরের কথা, ওই দুপুরে, বিকেলে, ঘরে ঢোকারই সাহস হয়নি কুন্দর। তা বলে মন্দাকিনীর থেকে বেশি তফাতে থাকতেও ভরসা হয়নি তার। সে সারাক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে-বসে ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলেছে।

এক সময় বিকেল গড়িয়ে এসেছে। রোদ্দুরে লালচে রঙ ধরেছে। একটু একটু করে ম্লান হয়ে এসেছে চারপাশের দুনিয়া। এক সময়, ঠিক পোষা পাখিরা যা করে, মন্দাকিনীর দৃষ্টিটাও জানলার গরাদ গলে ফিরে এসেছে স্বস্থানে। একটু একটু করে হুঁশে ফিরেছেন তিনি। দু'চোখ দিয়ে ধারে-পাশে বুঝি খুঁজতে লেগেছেন কুন্দকে।

একসময় মৃদু ডাক পেড়েছেন, ও কুন্দ, কোথা গেলি?

তড়িঘড়ি হাজিরা দিয়েছে কুন্দ।

মন্দাকিনী ওর দিকে অকারণে তাকিয়ে থেকেছেন অল্পক্ষণ। এক সময় শুধিয়েছেন, মালপত্তর গাড়িতে বোঝাই হইল?

—হচ্ছে। লগনা আর জটিয়া মালগুলা তুলছে গাড়িতে। দেখিয়া আইসব?

—যা, দ্যাখ।

কুন্দ তড়িঘড়ি পা চালায়। বোধ করি এমন কঠিন থমথমে মুখের সামনে থেকে ক্ষণিকের তরে পালিয়ে বাঁচতে চায়। অথচ সে তো জানেই, আজ বড-মার সঙ্গে তারও বিসর্জন ঘটবে মুখুজ্যাগড় থেকে। কাল থেকে তাকে দিনরাত, চব্বিশ ঘণ্টা বসবাস করতে হবে মন্দাকিনীর নির্দয় সান্নিধ্যে।

খানিকবাদে ফিরে এসে কুন্দ জানায়, মালপত্তর সব তোলা হয়েছে গাড়িতে। হুকুম পেলেই জোয়ালে বলদ বাঁধে লগনারা।

মন্দাকিনী পাথরের মতো বসে থাকেন। দৃষ্টিটাকে জানলা গলিয়ে পুনবায় উড়িয়ে দেন বাইরে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়, সামান্যক্ষণ বাদে হুঁশে ফেরেন মন্দাকিনী। কুন্দর দিকে তাকিয়ে বলেন, ওদের গাড়ি লিয়া চলিয়া যাইতে বল। আমি খানিকবাদে যাব।

মন্দাকিনীর কথায় বুঝি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত বোধ করে কুন্দ। ততক্ষণে ডালে-পালায় বেলা। সুয্যিদেব পাটে বসতে চলেছেন। এরপর তো একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসবে।

কিন্তু কথাগুলো মন্দাকিনীকে বলে এমন সাহস নেই কুন্দর। সে পায়ে পায়ে সদর-উঠোনের দিকে চলে যায়, হুকুমটা লগনাদের জানিয়ে দিতে।

ততক্ষণে মন্দাকিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসেন ঘরের বাইরে। খিড়কির দরজা খুলে পিসাব সেরে আসেন। আর তখনই দেখতে পান, হিরণ্ময় পায়ে পায়ে তাঁর দিকেই আসছেন।

হিরণ্ময়কে দেখে আর নিজের ঘরে ঢোকেন না মন্দাকিনী। চৌকাঠের বাইরেই অপেক্ষা করতে থাকেন। হিরণ্ময় এক সময় পাশটিতে এসে দাঁড়ান। বলেন, মা, আর তো দেরি করা সমীচীন নয়, বেলা যায়। এরপর...।

মন্দাকিনী সেকথার জবাব দেন না। পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাদুরের ওপর বসেন।

হিরণ্ময়ের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চারান। মায়ের

মূর্তিটিকে আধো-অন্ধকারে জরিপ করেন।

একসময় খুব অনিশ্চিত গলায় বলেন, তুমি কি আজ রাতটা থাকিয়া কাল ভোরে যাইতে চাচ্ছ?

—কেন? ছেলের দিকে খুব চেরা দৃষ্টিতে তাকান মন্দাকিনী। পরমুহূর্তে কাঠ-কাঠ গলায় বলেন, আমি আজই যাব।

শুনেই কেমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠেন হিরণ্ময়, তবে তো আর দেরি করা সঙ্গত হবেনি।

ছেলের দিকে একটুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনী। এক সময় থমথমে গলায় বলেন, আমি, ঠিক সময়েই যাব। তুই অকারণে ভাবিসনি।

হিরণ্ময় আর কথা বাড়াতে সাহস পান না বুঝি। পায়ে পায়ে রওনা দেন সদর-মহলের দিকে।

মালপত্তর নিয়ে গরুর গাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে বেলা থাকতে। মন্দাকিনী একেবারে সন্ধে গড়িয়ে মুখুজ্যাগড় ছাড়লেন।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পাখিপাখাল ফিরে গিয়েছে যে-যার বাসায়। চারপাশে গাছগাছাল, বাড়িঘর সারা গায়ে আঁধার মেখেছে গাঢ় করে। মন্দাকিনী এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলেন একেবারে শেষপ্রান্তে।

পাখির খাঁচাটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

সন্ধের আলো-আঁধারিতে পাখিটা বিবশ হয়ে বসে ছিল খাঁচার মধ্যে। চোখ দুটি বন্ধ ছিল। অথচ একটু আগে অবধি দিনের শেষ আলো দেখতে দেখতে বাইরে বেরোবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারপর, যেই না সন্ধের আঁধারটি নামল, পাখিটা নেতিয়ে পড়েছে একটু একটু করে। এখন আর মানুষজন পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ালেও চোখ খুলবে না সে।

মন্দাকিনী খাঁচাটার একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। পাখিটাকে একটুক্ষণ দেখলেন। এক সময় খুব অস্ফুট গলায় বললেন, চললাম রে। ভালো থাকিস।

পায়ে পায়ে পিছু ফিরলেন মন্দাকিনী। আঁধারে শরীরটিকে ডুবিয়ে দিয়ে পায়ে পায়ে মুখুজ্যাগড়ের শেষ চৌকাঠটিতে পা রাখলেন।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হিরণ্ময় আর রত্নহীরা। মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল নাতি-নাতনিদুটো।

হিরণ্ময়ের একটি ছেলে, একটি মেয়ে। রত্নহীরা শশুরে কায়দায় ছেলের নাম রেখেছে সুবিকাশ, ডাক নাম রেখেছে ঝংকার। মেয়ের নাম রেখেছে উমা।

হিরণ্ময় আর রত্নহীরা, খুব যান্ত্রিক মুদ্রায় মন্দাকিনীকে একে একে প্রণাম সেরেছিলেন দুজনেই। বারণ করেননি মন্দাকিনী। খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় গ্রহণ করেছিলেন প্রণাম। ডানহাতটি যান্ত্রিকভাবে উঠে গিয়েছিল দুজনেরই মাথার কাছটিতে। দেখাদেখি অন্দরমহলের চাকর-বাকরদের মধ্যেও বড় মাকে প্রণাম করবার ধুম পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথমজনটিকেই তিনি এমনই কঠোর গলায় নিরস্ত করেছিলেন যে, অন্যরা আর পাশ ঘেঁসতে সাহস পায়নি। মন্দাকিনী বাচ্চাদুটোর মাথায় একপ্রস্থ হাত বুলিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করেন।

অনেকদিন বাদে বুঝেছিল কুন্দ। সেদিন নিজের পরিচ্ছদের ওপর আরও একটা কালো বোরখাগোছের কিছু চড়াতে চাইছিলেন বড়-মা। অন্ধকারটা সেদিন তাঁর সারা শরীরে বোরখার কাজ করেছিল। ওই দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন শরীর। নইলে মুখুজ্যাগড় থেকে বকদিঘির পাড় অবধি পথের দু'ধারে কৌতূহলী দর্শকে ভরে যেত, কেন কি, এমন দৃশ্য সন্ধিপুরের মানুষ কস্মিনকালেও দেখেনি।

দু'হাতে অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে সে সন্ধেয় মন্দাকিনী পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন সংসারে। গোবর দিয়ে নিকোনো উঠোন পেরিয়ে মাটির তৈরি কোঠাবাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোরলাগা মানুষের মতো নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন বাড়িটার দিকে। কী এক প্রবল বিস্ময়ে চোখ দিয়ে জরিপ করেছিলেন বাড়িটাকে, অনেকক্ষণ।

জীবনে কোনওদিনও মাটির বাড়িতে থাকেননি। ক্বচিৎ-কদাচিত কোনও প্রজার মাটির বাড়িতে

নিমন্ত্রিত হয়ে কয়েক দণ্ডের জন্য থেকেছেন হয়তো বা। সে সময়টা সারাক্ষণ নাকে ঘা মারত এক ধরনের মেটে সোঁদা গন্ধ। কত জলদি পালিয়ে আসা যায় তার ফিকির আঁটতেন মনে মনে।

সেই রকম একটা ঘরে আজ পাকাপাকিভাবে ঢুকতে গিয়ে অনেকদিন বাদে ওই আধচেনা সোঁদা গন্ধটা ধাক্কা মারতে থাকে নাকে। শুধু ওই বিজাতীয় গন্ধটাই নয়, মন্দাকিনী চারপাশে সর্বক্ষণ পেতে থাকেন এক ধরনের গরিব-গরিব গন্ধ।

যখন নতুন বাড়িতে এলেন, সঙ্গে তো একমাত্র কুন্দই এসেছিল। বলির পাঁঠার মতো মন্দাকিনীর পিছু পিছু হাঁটছিল সে। কেন কি, গড়ের মধ্যে তাও অনেক দাসদাসীর একজন হয়ে ছিল সে, বাবুদের রাগরোষের সামনে পালা করে পড়তে হত সবাইকে। গালাগাল খেলে সান্ত্বনার মলম লাগাবার জন্য ছিল অন্যরা। এখানে তো সে বাঘিনীর খাঁচার মধ্যে একলাটি। ওর চোখে মন্দাকিনী তো চিরকালই একটি বাঘিনীই। তার ওপর, নির্বাসন দণ্ডের পর থেকে সেই বাঘিনীর মুখটা হয়ে গিয়েছিল শুকনো কাঁঠাল কাঠের মতো শক্ত। ইদানীং গৌরবর্ণ মুখখানিতে রক্ত জমাট বেঁধে লাল হয়ে থাকে সারাক্ষণ। খুবই আতঙ্ক নিয়ে মুখুজ্যাগড় ছেড়েছিল কুন্দ।

প্রথম দিন, লণ্ঠন-জ্বলা সন্ধেয়, বকদিঘির পাড়ের সেই মাটির বাড়িটি এক বিষাদপুরী। গাড়ি থেকে মালগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে মুখুজ্যাগড়ের লোকজন।

যাবার আগে ভদ্রতা করে জানতে চেয়েছিল, আমরা কি আর রইব, বড়-মা?

মন্দাকিনী দু'হাত নেড়ে তাদের তৎক্ষণাৎ চলে যেতে বলেছেন। বাস্তবিক বেশি মানুষজন তখন একেবারেই সইছিল না তাঁর। তখন একেবারে একা হয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি।

চারপাশে, একটা সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী, সারা ঘরময় ছড়ানো-ছেটানো, ডাঁই করা, সারা বাড়ি জুড়ে সে এক যারপরনাই বিশৃঙ্খল অবস্থা। সাজিয়ে গুছিয়ে সুশৃঙ্খল করে নেওয়া তো দূরের কথা, ওগুলোর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছিল না মন্দাকিনীর।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই কুন্দ সাত তাড়াতাড়ি একটা মাদুর পেতে দিয়েছিল। মন্দাকিনী ধুলোপায়ে বসে পড়লেন ওর ওপর। বসেই রইলেন।

কুন্দ যে কী করবে, কী বলবে, বুঝে পায় না। সে সাধারণ ঘরকন্নার জিনিসপত্তরগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল কেবলমাত্র মন্দাকিনীর থেকে সামান্য দূরে দূরে থাকবার এবং মনের মধ্যেকার সিঁটিয়ে যাওয়া ভয়টাকে কাটিয়ে উঠবার উদ্দেশ্যে।

সারা সন্ধে মন্দাকিনী কাঠ মেরে রইলেন।

কথা ছিল, রাতের রান্না করতে আসবে সরলা। বামুনের মেয়ে সে। স্বামী পরিত্যক্তা। তার মা বামুনমাসি গড়ের রাঁধুনি। সরলাও এসে মায়ের সঙ্গে রেঁধে টেঁধে দেয়। সেই সুবাদে গড়ে খেতে-টেতে পায় সে, পুরোন কাপড়-চোপড়ও পেয়ে-টেয়ে যায়। বকদিঘির নতুন বাড়িতে চলে আসার বেলায় এটাই স্থির হয়েছিল যে সরলাই দু'বেলা এসে রেঁধে দিয়ে যাবে। কিন্তু যতই সন্ধে গড়াতে লাগল, কুন্দ মনে মনে একবারে অস্থির হয়ে ঘর-বার করতে লাগল।

সরলা এল সন্ধে গড়িয়ে, দু-তিন ঘড়ি রাত করে।

মনে মনে বুঝি ফুঁসছিলেন মন্দাকিনী, সরলাকে দেখামাত্তর তার ওপর বাঘের ঝাপট নেন। এই তোর আসবার সময় হইল রে মাগী? তুই জানিস নি, রাতের বেলায় আমি জলদি জলদি খাই?

সরলা ভয়ে কুঁকড়ে যেতে যেতে যা জবাব দেয়, তার মর্মার্থ হল, বড়বহীরাই তাকে এটা-ওটা ফরমায়েশ করে আটকে রেখেছিল এতক্ষণ।

আগেকার দিন হলে চড়-চাপড় খেত সরলা। সেদিন কিন্তু সরলার জবাব শুনে একেবারে গুম মেরে গেলেন মন্দাকিনী। দু'চোখের মণিতে সাপিনীর ক্রোধ। একসময় খুব কঠোর গলায় বলে দিলেন, কাল থেকে সময়মতো আসতে পারলে আসবি, নচেৎ আসার দরকার নাই।

প্রথম রাতে নতুন বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়ে সে এক চূড়ান্ত অসোয়াস্তি। একেবারে নির্জন লাগছিল। শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ। মুখুজ্যাগড়ে বিকেল-সন্ধেগুলি জুড়ে কত লোকজন, কলরব, রেডিওতে নাটক

কিংবা অনুরোধের আসর শোনা। বৈঠকখানা থেকে ভেসে আসে পুরুষদের মজলিশের আওয়াজ। প্রজাদের উদ্দেশে ধমক-ধামক। বাস্তবিক, বকদিঘির নতুন বাড়িটাকে সে তুলনায় শ্মশানপুরীর মতোই খাঁ-খাঁ লাগে। গভীর রাতে সারা বাড়ির আনাচকানাচ জুড়ে কত জাতের শব্দ। বাড়ির কাঠামোতে লাগানো আধপাকা বাঁশগুলির থেকে ভেসে আসে অবিরাম ক্যাঁচোরম্যাচোর আওয়াজ। ইঁদুর-ছুঁচোরা হাঁটাচলা করতে থাকে। তাদের পায়ের নখের আওয়াজ নিশুত রাতের নিস্তব্ধতায় ভারী বিজাতীয় ঠেকছিল কানে। বকদিঘির ঈশেন কোণের আমগাছটা থেকে ভেসে আসে অবিরাম পেঁচার কান্না-কান্না ডাক। এমন নতুন জায়গায়, নতুন বাড়িতে এত এত বিজাতীয় শব্দের মাঝখানে একা একা থাকা যায়? একা একাই তো। সঙ্গে অবশ্য কুন্দ রয়েছে। কাছেপিঠেই রয়েছে সে সারাক্ষণ। কিন্তু বিকেল থেকে এখন দু'পহর রাত অবধি মন্দাকিনীর প্রশ্নের গুটিকয় সংক্ষিপ্ততম জবাব দেওয়া ছাড়া আর কোনও কথাই বলেনি সে। মোট কথা, এই চার-পাঁচ ঘণ্টায় কুন্দ নিজের থেকে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। কেন কি, মুখুজ্যাগড়ের দাসীচাকরদের ক্ষেত্রে সেটা দস্তুরও নয়, বরং বলা যায়, ঘোর বেয়াদবি। বিশেষ করে মন্দাকিনীর সামনে।

রাতের বেলায় সরলা এসে রান্নাবান্না করে দিল বটে, কিন্তু গলা দিয়ে খাবার নামেনি সে রাতে।

শুতে গিয়ে সে এক বিভ্রাট। একটা ঘরে যাবতীয় বিছানাপত্তর ডাঁই করে রেখে গেছে লগনারা। বাইরের বারান্দায় পড়ে রয়েছে চৌকিটা। কথা ছিল, ওরাই চৌকিটা শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, বিছানাপত্তরও পেতে টেতে দিয়ে যাবে। ওরা সেসব করে দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু মন্দাকিনীই অত্যন্ত রূঢ় গলায় তাদের বিদেয় করে দিয়েছেন, কেন কি, তাঁর তখন মানুষের মুখ দেখতে তিলমাত্র ইচ্ছে করছিল না। বিশেষ করে মুখুজ্যাগড়ের কাউকেই যেন তিলমাত্র সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি।

অবশেষে ভেতরের বড় ঘরটাতেই শুলেন মন্দাকিনী।

কুন্দই শেষ অবধি বিছানার ডাঁই থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে এল তোষক-বালিশ-মশারি। মেঝের ওপর পেতে দিল কোনও গতিকে।

মন্দাকিনী খানিকক্ষণ বিছানাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন পলকহীন, এক সময় তার ওপরেই পেতে দিলেন শরীর।

জীবনে কখনও মেঝেতে শোননি মন্দাকিনী। এই প্রথম তেমন অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে। টালি ছাওয়া বাড়ি, মাটির দেয়াল, বাঁশের ফ্রেম, খড়ের চাল। নতুন বাঁশের ফ্রেম, তাতে প্রথম প্রথম কতই না ক্যাঁচোর-ম্যাচোর আওয়াজ। নির্জন রাতে ওইসব আওয়াজ শুনতে শুনতে অস্বস্তিতে ভরে যায় বুক।

মুখুজ্যাগড়ের নিয়ম মোতাবেক মন্দাকিনী বিছানায় গিয়ে শোওয়ামাত্রই কুন্দ পেছন-পেছন পুতুলের পায়ে হেঁটে এসে বসল পায়ের কাছে, পা দুটো টিপতে লাগল নিঃশব্দে। তখনও তো ঘরের মধ্যে মন্দাকিনী একলাটি, কেন কি, কুন্দ তো ওই মুহূর্তে একটি কলের পুতুল, একটি বোবা যন্ত্রেরও বাড়া সে। তার থাকা না-থাকা সমানই। সে তো মন্দাকিনীর ভয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস অবধি নিচ্ছে না, যাতে করে মন্দাকিনী চোখ বোঁজা অবস্থায় ঘরের মধ্যে অন্তত দুটো মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উপভোগ করতে পারেন।

শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে মন্দাকিনী বুঝতে পারেন, আজ রাতে আর ঘুম আসবে না চোখে।

বাস্তবিক, সে-রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি মন্দাকিনী। সারা রাত, মগজ জুড়ে কিলবিল করছিল বিষাক্ত পোকার দল।

শেষ রাতে বোধ করি একটুখানি ঘুমোতে পেরেছিলেন মন্দাকিনী, ঘুম ভাঙতেই কানে আসে অজস্র কলরব।

জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে বিছানার ওপর পড়েছে।

পাশ ফিরতে গিয়ে অনুভব করেন সারা শরীর জুড়ে চাপ চাপ ব্যথা। শরীরটা ভারী ভারী লাগছিল। একটু একটু করে স্মৃতিতে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে তাঁর গেল-জন্মের যাবতীয় কথা। কুন্দকে ডাক পাড়তে গিয়ে গলা দিয়ে সহসা আওয়াজ বেরোতে চায় না। কপালটা দপ দপ করতে থাকে।

একসময় কুন্দই চৌকাঠের বাইরে থেকে উঁকি মারে ঘরের মধ্যে। বাইরের থেকে ভয়ে ভয়ে দেখতে থাকে মন্দাকিনীকে।

বিছানার ওপর উঠে বসেন মন্দাকিনী। কুন্দর দিকে তাকিয়ে শুধোন, বাইরে এমন কলরব জুড়েছে কারা রে কুন্দ?

—পাখিপাখালের ডাক!

মন্দাকিনী বিস্ময়ে থ হয়ে যান। এত-এত পাখি থাকে নাকি এই তল্লাটে! এমন কলরব বাধিয়ে ডাকে ওরা!

আসলে, কুন্দ বোঝে, মুখুজ্যাগড়ের আশেপাশেও পাখিপাখালি কম নেই, কিন্তু পাকা অট্টালিকাব দশ দেয়ালের ঘেরাটোপ পেরিয়ে তাঁদের ডাক মন্দাকিনী অবধি বড় একটা পৌঁছতে পারত না।

পায়ে পায়ে বাইরে আসেন মন্দাকিনী। রোদ্দুরে ভরে গিয়েছে দশ দিক।

মূল বাড়ির থেকে সামান্য তফাতে মুল্লিবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একচিলতে জায়গা। মন্দাকিনীর চানের ঘর। তার পাশেই তার চেয়েও ছোট আরও একখানা কুঠরির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তার ওপর পাটাতন ফেলে খাটা-পায়খানা মতো বানানো হয়েছে।

মন্দাকিনী পায়ে পায়ে গিয়ে ঢোকেন। আগে থেকেই কুন্দ সেখানে রেখে দিয়েছে এক বালতি জল আর একটা নারকোল তেলের কৌটো।

দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে চাপ চাপ কান্না জমতে থাকে নিঃশব্দে।

বাহ্যি সেরে চানের ঘরে ঢুকতে গিয়েই মন্দাকিনী দেখতে পান, কুন্দ আগেভাগেই বাঁশের দরজার ওপর রেখে দিয়েছে মন্দাকিনীর কাপড়চোপড়।

একটু একটু করে কখন জানি কুন্দর প্রতি নরম হয়ে আসে মন। নিজের মানুষ বলে যাদের ভেবে এসেছেন এতকাল, তারা যখন ওঁকে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল এই অবেলায়, তখন এই ঘরছাড়া, স্বামী-ছাড়া অভাগী মেয়েটি, দাসী বৈ তো নয়, অথচ কাল সন্ধে থেকে তার কত নজর তাঁর প্রতি। তাঁর একটুখানি আরামের জন্য কাল থেকে কতই না করছে মেয়েটা, অথচ হাতি কাদায় পড়েছে ভেবে মুখুজ্যাগড়ের অন্যরা যেমন অবলীলাক্রমে ফিরিয়ে নিতে পারল মুখ, এই মেয়েটাও পারত তেমনই অবহেলা দেখাতে। কিন্তু কাল থেকে বার বার কেন জানি মন্দাকিনীর মনে হচ্ছে, গতকাল সন্ধে থেকে কুন্দ যেন আরও মনোযোগী হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতি।

গতকাল নতুন সংসারে আসার পর মন্দাকিনীর শরীর মন দুটোই তো একেবারেই অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিছুই ভালো লাগছিল না তাঁর। তখন কুন্দই তো সারা সন্ধে জুড়ে কত খুঁটিনাটি দেখভাল করল! গরিবের মেয়ে সে, দুমুঠো ভাতের জন্য মুখুজ্যাগড়ে পড়ে রয়েছে আজ কতদিন, সামান্য কারণে লাথিঝাঁটা তার বরাদ্দ, অথচ মনের মধ্যে মন্দাকিনীর জন্য তার কতই না মমতা!

এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় চান সেরে ধোওয়া কাপড় পরে বেরিয়ে এলেন মন্দাকিনী। এসেই দেখলেন, কুন্দ বাইরের দাওয়ায় মাদুর পেতে রেখেছে।

কাল থেকে কাঠের চৌকিটা পড়ে রয়েছে বাইরের দাওয়ায়। ওটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পাতা দরকার। মুখুজ্যাগড়ের লোকগুলো সেটা করে যেতে পারত। করতে চেয়েও ছিল হয়তো বা। মন্দাকিনীই লোকগুলোকে ভাগিয়ে দেন। তখন লোকজনের সংস্পর্শ একেবারেই ভালো লাগছিল না মন্দাকিনীর।

এখন তিনি বুঝতে পারছেন, কুন্দর পক্ষে চৌকিটাকে ঘরের মধ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অন্তত জনাচারেক লোক চাই। মুখুজ্যাগড়ে খবর পাঠিয়ে লগনা-জটিয়াদের ডাকিয়ে আনার কথাটা বারেকের তরে মনের মধ্যে ঘাই মেরেই মিলিয়ে গেল। ওই বাড়ির একটা কাকপক্ষীকেও ডাকতে ইচ্ছে করছে না। অথচ চৌকিটাকে তো এভাবে বাইরে ফেলেও রাখা যায় না। এক রাত মেঝেতে শুয়েই সারা গায়ে ব্যথা ধরে নিয়েছে। বুকের মধ্যেও কফ জমেছে বুঝি ওই কারণেই। মন্দাকিনী মনের মধ্যে উপায় খুঁজে বেড়ান।

একটু বাদেই মন্দাকিনী অবাক হয়ে দেখেন, কুন্দ পথচলতি জনা-তিনেক চাষাভুষো লোককে ডেকে এনেছে। মাঝিপাড়ার লোক ওরা। কাজেকামে যাচ্ছিল। কুন্দর অনুরোধে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মন্দাকিনীর উঠোনে। খুবই সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

কুন্দ মিনমিনে গলায় বলে, চৌকিটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া লিই বড়-মা? এদের বলামাত্রই রাজি হয়েছে।

মন্দাকিনী লোকগুলোর দিকে প্রভুর দৃষ্টি নিয়ে তাকান। মুখুজ্যাগড়ের কত নুনই না খেয়েছে এরা। চৌকিটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার প্রস্তাবে ওদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনীর মনে হয়, ওরা কাজটা করে দিয়ে যেন কৃতার্থ করতে চাইছে মন্দাকিনীকেই। কারোর কোনও উপকার করলে পর, যেমন কিনা এক ধরনের উদারতা ফুটে ওঠে মানুষের চোখে মুখে, মন্দাকিনী তেমনটাই দেখতে পেলেন মাঝিপাড়ার লোকগুলোর মুখে।

মুখুজ্যাগড় থেকে নির্বাসিতা হলেও, দাসীচাকর, লোকলস্কর বিহনে পুরোপুরি বেকায়দায় পড়ে গেলেও, জমিদারি মেজাজটা তখনও অবধি যোলআনা অটুট। তাব ওপব মগজের মধ্যে আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছিলই। কাজেই, আগ বাড়িয়ে উপকার করতে আসা মানুষগুলোর প্রতি তিলমাত্র সদয় হয় না মন, বরং লোকগুলোর দিকে প্রজাজ্ঞানে হেয় চোখে তাকান। ওদের ওপর কথায় কথায় হম্বিতম্বি চালাতে থাকেন আগের মতো। অ্যাই, তুই পরমেশিয়ার ভাই নয়? তোর বাপকেই তো গেল-সালে কাচারি ঘরে ধরিয়া আনিযা টাঙ্গিয়া পিটছিল হিরণ্ময়। আব তুই কেটা? অ—, ন্যাটা গুণাধরিযার ব্যাটা? তুই তো চামচিকাটির পারা রে। ভারি চৌকি বইয়া লিয়া যাইতে পাববি? মাঝপথে ফেলিয়া দিস্ যদি, আমার চৌকির যদি কিছু হয়, তোর পিঠে দুটা লাঠি ভাঙা হবে।

মানুষগুলো জবাব দেয় না। সন্ত্রস্ত হাতে চৌকিটাকে বয়ে নিযে এগোতে থাকে শোবাব ঘরের দিকে। কুন্দ পাশ থেকে নানা ধরনের বুদ্ধি জোগায়, কী উপায়ে নিযে গেলে সবচেয়ে সহজে এবং কোথাও ঠোক্কর না লাগিয়ে শোবার ঘর অবধি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে চৌকিটাকে, সে ব্যাপারে হরেক জাতেব পরামর্শ দিতে থাকে। কিন্তু তাও ওদেব কাজকর্মের ধরনটা কিছুতেই পছন্দ হয় না মন্দাকিনীর। নিচু জাতের মানুষগুলোর থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কেবলই তাদের উদ্দেশে কটুকাটব্য কবতে থাকেন, কিনা, মাথায় তিলমাত্র বুদ্ধি থাকলে কেউ এইভাবে চৌকিটাকে নিয়ে যেত না, কুন্দ কোত্থেকে গুটিকয় আকাট গাধাকে ধরে এনেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষগুলো মন্দাকিনীর এমনতরো কথার কোনও জবাব তো দেয়ই না, রেগে যাবার কথাটাও তাদেব মনে ঘাই মারে না তিলেকের তরে। ববং নিজেদের মূর্খামির জন্য লজ্জায় বুঝি মরমে মরে যেতে থাকে। অথচ ঠিক কি মূর্খামিটা করল, সেটাও বুঝে উঠতে পারে না ঠিক ঠিক।

কাজ শেষ হলে এক সময় নিরাপদ দূবত্ব বজায় রেখে মন্দাকিনীকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করে ওরা বিদায় নেয়। মন্দাকিনী আরও কিছুক্ষণ লোকগুলোর বোকামোকে ধিক্কার জানিয়ে তবে থামেন।

খাটটা ঘরের মধ্যে ঠিকঠাক সেট করে লোকগুলো যখন চোরের মতো পালিয়ে বাঁচে, কুন্দ পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলে পর মন্দাকিনী খানিকটা গড়িয়ে নেন।

শরীরটাতে জুত ছিল না। গেল-রাতে ঘুম প্রায় হয়নি বললেই চলে। মাথার মধ্যে কিলবিল করছিল একরাশ হরেক জাতের পোকা। দুপুরের রান্নাটাও সরলারই করবার কথা। কিন্তু সে যে কখন আসবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অবশ্য সরলা এসে রান্না না করলেই বা কি! কাল থেকে তো কিছুই

মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না মন্দাকিনীর। সারা শরীর জুড়ে কেবলই বমি-বমি ভাব। মনে হয় একটুখানি হিক্কা তুললেই শরীরস্থ সবকিছু হড়হড়িয়ে উঠে আসবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতেও ভালো লাগল না। বিছানা থেকে উঠে বাইরে এলেন মন্দাকিনী। দুয়োরে পাতা মাদুরটাতে এসে বসলেন।

সামনের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে উদোম শরীরে গরিব-গুরবো মানুষজন। মন্দাকিনীর নতুন বাড়িটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

লোকগুলোকে দেখতে দেখতে কত কথাই না মনে হয় মন্দাকিনীর। মাত্র একদিন আগেই তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত মুখুজ্যাগড়ের শক্তির অংশবিশেষ। তখন তিনি প্রজাগোছের যে কাউকেই যা খুশি হুকুম করতে পারতেন। মুখুজ্যাগড়ের বড় কর্তামার মুখ থেকে কথাটি খসে পড়া মাত্রই তা তামিল করে বুঝি ধন্য হয়ে যেত সবাই। তখন মন্দাকিনীর একটুখানি কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য লালায়িত থাকত ওরা। মাত্র একদিনের মধ্যেই তিনি ওই ক্ষমতাবৃত্ত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। মুখুজ্যাগড়ের যা-কিছু মহিমা হয়তো বা ইতিমধ্যেই খসে পড়েছে তাঁর শরীর থেকে। হয়তো বা চারপাশের মানুষজন ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছে, মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামার আর কোনও ক্ষমতাই নেই। তাঁর কথা অমান্য করলে কিছুই হবে না তাদের। বরং তাঁকে পাকে-প্রকারে অমানিা করলে মুখুজ্যাগড়ের ছোট কর্তামা মনে মনে খুশিই হবেন। কারণ, মূলত তাঁর ইচ্ছেতেই তো মন্দাকিনীর এই নির্বাসন দণ্ড।

সত্যি সত্যি তেমনটা ভাবতে শুরু করেছে নাকি মানুষগুলো?

সহসা সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনীর মনে হয়, হাঁটনে চলনে সেই সম্ভ্রম আর বশংবদ ভাবটা যেন আর ততখানি নেই। পদক্ষেপে যেন কিঞ্চিৎ বেপরোয়া ভাব। সামান্য তফাতে মুখুজ্যাগড়ের বড় কর্তামা যে বসে রয়েছেন, সে ব্যাপারে কোনও হুঁশ নেই যেন। আলসেপানা পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলে চলেছে।

কী অত কথা চলছে নিজেদের মধ্যে? অতদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন না কথাগুলো, কিন্তু কথাবার্তার ধরন দেখে কেন জানি মন্দাকিনীর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মে, তাঁকে নিয়েই আলোচনা চলছে, কিনা, হাই দ্যাখ, জমিদার গিন্নি, জমিদারের মা, ব্যাটার বউ আসা মাত্তর তাকে খেদিয়া দিছে গড় থিকো। এমন দাপুটে মেয়ার কী হাল করেছে শহরের মেয়া! কথাগুলো বলতে বলতে হয়তো মনে মনে একচোট হেসে নিচ্ছে ওরা।

সত্যি সত্যি তেমনটা বলাবলি করছে কিনা, বাস্তবিক ওই নিয়ে হাসাহাসি করছে কিনা ভগবানকে মালুম, কিন্তু তেমনটা বিচিত্র কিছু নয়, কেন কি, হাতি কাদায় পড়লে চামচিকারাও চারপাশ থেকে দুয়ো দেয়। এ তো দুনিয়ার নিয়ম। মানুষগুলো হয়তো বা বুঝেই ফেলেছে, মন্দাকিনীকে আর তিলমাত্র রেয়াত করার দরকার নেই।

ভাবতে ভাবতে মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে একধরনের নিঃস্ব, সব হারানোর অনুভূতি। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। নিজের সবকিছুকে একেবারে অরক্ষিত বলে মনে হয়। বুকের ভেতর গুরগুর করে ওঠে এক জাতের ভয়, আশঙ্কা, কিনা, এযাবৎ যাদের ওপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, যারা ওঁর রোষে পড়ে কোনও-না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা যদি আজ শোধ নিতে উদ্যোগী হয়?

সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল দুজন মজুর শ্রেণির লোক। ওদের দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর সহসা মনে হয়, লোকদুটোকে একটুখানি নেড়েচেড়ে দেখেন।

দাওয়া থেকেই চেরাগলায় ডাক পাড়েন কুন্দকে, কুন্দ, রাস্তা দিয়ে কারা যাচ্ছে, ডাক তো ওদের।

লোকদুটো আচমকা থমকে দাঁড়ায়। নিজেদের মধ্যে অতি দ্রুত চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে নেয়। ততক্ষণে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অচেনা ভয়, আশঙ্কা।

লোকদুটো মন্দাকিনীর দিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকায়। কুন্দকে আর ডাক পাড়তে হয় না, তার আগেই ওরা পায়ে পায়ে উঠোন পেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়ায়।

মন্দাকিনী দেখতে পান, খরগোশের মতো ভয় তাদের চোখে। এতক্ষণে বুঝি মনে মনে কিঞ্চিৎ

আশ্বস্ত হন তিনি। আত্মবিশ্বাসটা বুঝি একটু একটু করে ফিরে আসছিল। মন্দাকিনী তেরচা চোখে দেখেন লোকদুটোকে। এক সময় বেঁটেটার দিকে আঙুল তাক করে শুধোন, তোর নাম কি?

দুজনের মধ্যে ওর দিকেই বড়মার নজরটা প্রথমে পড়ল কেন, এই ভাবনায় বুঝি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বেঁটে লোকটি। মিনমিনে গলায় বলে, আইজ্ঞা, ক্ষুদিরাম।

—ক্ষুদি—রা—ম! আর তোর? মন্দাকিনী এবার লম্বাটে লোকটাকে দৃষ্টি দিয়ে বেঁধেন।

—আইজ্ঞা, পরমেশ্বর।

লোকদুটোকে নিজের সামনে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে ওদের নানা ধরনের জেরা করতে থাকেন মন্দাকিনী। ওদের বাপের নাম, পাড়ার নাম, কী করে, কাদের বাড়িতে খাটাবাটা করে, মুখুজ্যাগড়ের জমিদারিতে খাটে কিনা, মুখুজ্যাগড়ের থেকে ঋণ-দাদন নিয়েছে কিনা, শোধ করেছে কিনা, এমনিতরো হাজারো প্রশ্নে-জেরায় একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলেন। তাতে করে লোকগুলোর মধ্যে তিলমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না কিংবা গদগদ বিনয়ের তিলমাত্র কমতি হয় না দেখে মনে বুঝি স্বস্তি পান মন্দাকিনী। মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামাকে অন্‌গেরাহ্যি করবার সাহস এখনও অবধি তবে হয়নি ছোটলোকগুলোর।

ভাবতে ভাবতে আর এক কদম এগোলেন মন্দাকিনী। ক্ষুদিরামের দিকে তাকিয়ে হুকুম করলেন, ক্ষুদিয়া, শুন, এই জ্বালানি কাঠগুলো দু'টুকরা করিয়া কাটিয়া দিয়া যা তো। আর পরমেশিয়া ইদ্দি আয়, উঠানটা ভালো করিয়া ঝাঁট দিয়া দে তো। কুন্দ, এদের কুড়াল আর ঝাঁটা দে।

কথাগুলো বলেই মন্দাকিনী কুটিল চোখে তাকিয়ে রইলেন লোকদুটোর দিকে। ততক্ষণে তিনি বুঝতে পেরেছেন, লোকগুলো তাঁর হুকুম অমান্য করবে না, তখনও অবধি তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কিন্তু কতটা গদগদ চিত্তে কাজগুলো করে দিচ্ছে ওরা, সেটাও একটা পর্যবেক্ষণের বিষয় মন্দাকিনীর কাছে। কেন কি, তাঁর এমনটা মনে হয়েছে যে, দুদিন আগেও কোনও প্রজাতুল্য লোককে কিছু হুকুম করলে সে যে নিজেকে ধন্য, কৃতার্থ বলে মনে করত, এই লোকদুটোর মধ্যে সেই ভাবটা এখনও অবধি রয়েছে কিনা, থাকলে পরে তার পরিমাণ কতখানি, সেটাও দেখা দরকার।

আসলে, কাজের ফরমায়েশটা উপলক্ষ্য, এই মুহূর্তে ওই লোকগুলোর আনুগত্য ও বশংবদতার চরিত্রটাকেই বুঝতে চাইছিলেন তিনি।

লোকদুটোর দিকে একটুখানি তাকিয়েই মন্দাকিনী বুঝে ফেলেন, ওদের মুখমণ্ডলে জমে ওঠা মেঘের আবরণটুকু সরে যাচ্ছে দ্রুত। এতক্ষণ বড় ভয়ে ভয়ে ছিল লোকদুটো, কিনা, কী কারণে আচমকা তলব করলেন বড়-কর্তামা! কী কারণেই বা নাম-ধাম চোদ্দ গুষ্টির তত্ত্বতালাশ নিচ্ছেন! এমন কটমট করে তাকিয়েই বা রয়েছেন কেন ওদের দিকে! ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে বারেবারেই গুরগুরিয়ে উঠছিল ভয়, কিনা, অজান্তে মা-জননীর ছিচরণে কোনও অপরাধ ঘটিয়ে ফেলেছে কিনা ওরা দুটিতে! এতক্ষণে কাজের হুকুমটা পাওয়ামাত্রই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। যেন এতক্ষণ বাদে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। হুকুমটা শুনে নেবার পর এখন যারপরনাই আশ্বস্ত দেখাচ্ছে ওদের। বুকের ওপর থেকে একটা পাষাণভার যেন নেমে গিয়েছে নিঃশেষে' সহসা যেন খুশি খুশি দেখাল ওদের।

দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর বুকের মধ্যেটাও কিঞ্চিৎ শীতল হয় এতক্ষণে। ফুরফুরিয়ে হাওয়া বইতে থাকে আশেপাশে।

কুন্দর থেকে কুড়ুল আর ঝাঁটা নিয়ে মহা উদ্যমে লেগে যায় ক্ষুদিরাম আর পরমেশ্বর।

মনের মধ্যে ততক্ষণে যুক্তির জাল বুনতে শুরু করেছেন মন্দাকিনী। কিনা, তাই আবার হয় নাকি? মুখুজ্যাগড় থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। তার জন্য এই প্রজাতুল্য মানুষগুলো তাঁকে খাটো চোখে দেখবে, তাই কখনও হয়? তুলসী গাছ, তা সে শ্মশানে বেড়ে উঠলেও তার মহিমা খাটো হয় নাকি? মিছিমিছি উল্টোপাল্টা ভেবে মন খারাপ করছিলেন তখন থেকে।

সেদিন সারা সকাল, বিকেল, চিরকালের মতো হা-পিত্যেশ করে বসে রইলেন মন্দাকিনী।

অঘোর চক্রবর্তীর বউ মহেশ্বরী, ব্রজেন দত্তের মা কৌশল্যা, গত দশ বছরে এমন একটা বিকেল তো যায়নি, যেদিন এরা মন্দাকিনীর সঙ্গে গল্প করতে আসেনি পড়ন্ত বিকেলে। এসেছে, গল্প করেছে,

মন্দাকিনীকে পান সেজে দিয়েছে। বিনিময়ে দুহাত ভরে নিয়ে গিয়েছে কত কিসিমের আনুকূল্য। কথায় কথায় বলে উঠেছে, তুমার সাথে গল্প করতে না আসিয়া রইতে পারবনি কত্তামা। তুমার পাশ একটা বিকাল না আসতে পারলে পেটের মধ্যে গজগজ করে ভাত। মন্দাকিনীর ভারি বিশ্বাস ছিল মনে, অত জলদি তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। একটু দেরি হলেও তারা ঠিকই আসবে।

কিন্তু সারা সকাল, দুপুর, বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামল, মন্দাকিনীর কাছে এল না কেউই। পথের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল মরে আসে মন্দাকিনীর। বুকের মধ্যে তাল তাল অভিমান জমে।

একসময় ঝংকারের কথা মনে পড়ে তাঁর। নাতিটাকে খুবই ভালোবাসতেন মন্দাকিনী, মুখুজ্যাগড়ের রুক্ষ মরুভূমিতে মন্দাকিনীর জন্য ওই এক চিলতে মরুদ্যান ছিল। ঝংকারও খুবই ভালোবাসত ঠাকুমাকে। যখন তখন আচমকা এসে জড়িয়ে ধরত মন্দাকিনীর গলা। আধো-আধো উচ্চারণে আদর করত ঠাকুমাকে। বাস্তবিক, মুখুজ্যাগড় ছেড়ে আসার বেলায় ওই নাতিটার জন্যই বুকের মধ্যেটা টনটন করছিল মন্দাকিনীর।

উমাটা একেবারে মায়ের আদল পেয়েছে, তার থেকে কিছুই প্রত্যাশা নেই মন্দাকিনীর। কিন্তু ঝংকারের জন্য সারা বিকেল মনটা উদগ্রীব হয়ে রইল মন্দাকিনীর। কিন্তু তিনি জানেন, ওইটুকু বাচ্চা ছেলে তার খাণ্ডার মায়ের অমতে কিছুতেই আসতে পারবে না মন্দাকিনীর কাছে।

মনে পড়ে, যেদিন মন্দাকিনী নির্বাসনে চলে গেলেন বকদিঘির পাড়ে, তার পরের দিন ইস্কুলে যায়নি ঝংকার। দ্বিতীয় দিনে যখন স্কুলে গেল, তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমরা। একেবারে বদলে গিয়েছে ঝংকার। ওর চোখ মুখ এবং শরীরের যাবতীয় অভিব্যক্তিতে এসেছে এক ধরনের আমূল পরিবর্তন। মনে হল, মাত্র দুটি রাতের মধ্যেই যেন একটা বড়োসড়ো ঝড় বয়ে গিয়েছে ওর ওপর দিয়ে। অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগছিল ওকে। আমাদের মতো প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, ফিরেও তাকাচ্ছিল না আমাদের দিকে। সেদিন সারাটা সময় পড়াশোনায় একটুও মন ছিল না তার। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক লাগছিল।

আমি প্রায় হেদিয়ে পড়ে বারংবার শুধোই ওকে, কী হইল রে ঝংকার? তোকে এমনটা লাগতিছে কেন।

আমার কথার কোনও জবাবই দেয় না ঝংকার। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যায়।

এক সময় কল্পনাথ আমায় একান্তে বলে, থাক্, ওকে আর কিছুই না জিগানোই শ্রেয়। নিজের মতন থাকতে দে ওকে।

কল্পনাথের মা, মহেশ্বরী জেঠিমা ছিলেন মন্দাকিনীব প্রাণের বন্ধু। পুবো চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে মুখুজ্যাগড়ের ছিল খুবই মাখামাখি। সেই সুবাদে মুখুজ্যাগড়ের হাঁড়ির খোঁজ পেত কল্পনাথ। মন্দাকিনীর নির্বাসনের পর কল্পনাথদের বাড়িতে ওই নিয়ে যেসব আলোচনা চলত তার কিছু কিছু কানে আসত তার।

অবশ্য, খবরের বড় কারবারীটি তো আমার ঘরেই মজুত ছিল। আমার বড়পিসির মতো খবর-সংগ্রহে পটু আর কে ছিল সারা সন্ধিপুর গাঁয়ে! কেমন করে যেন চারপাশের তাবৎ গূঢ় খবরাখবর চলে আসত বড়পিসির কাছে। তিনি বাড়ির বড়দের কাছে নুন-ঝাল-মসলা মাখিয়ে পরিবেশন করতেন সেইসব স্কুপ-নিউজ, আমরা ছোটরা হাওয়ায় কান পেতে তার থেকে যৎকিঞ্চিৎ ছেঁকে নিতে পারতাম।

বড়পিসিই একদিন জানালেন ঝংকারের কথা। লুকিয়ে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ধরা পড়ে নাকি বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়েছে রত্নহীরার কাছে!

যেদিন কথাটা শুনলাম, তার পরের দিন ইস্কুলে গিয়ে ঝংকারের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিলাম। আগের মতো দুঃখী-দুঃখী ভাবটা ছিলই ওর সারামুখে, কিন্তু ওইসঙ্গে সেই প্রথম দেখলাম, ওর দুচোখের তারায় চাপা আগুনের ফুলকি।

আগুনের সেই জোড়া-ফুলকি স্থায়ী হয়েছিল ওর দুচোখে। তারপরই তো রত্নহীরার ইচ্ছেয় সে

মেদিনীপুরে চলে গেল। পড়তে লাগল, মামার বাড়িতে থেকে, শহরের স্কুলে। ওর থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ হিরণ্ময়ই জোগাতেন। একান্তমহলে রত্নহীরার বয়ান অনুযায়ী, ওরা নাকি ওই বাবদ একটা পয়সাও নিতে প্রবল আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু হিরণ্ময় যারপরনাই নাছোড়বান্দা। কিনা, বিনা খরচে চিকিৎসা আর বিদ্যালাভ হয় না। তাছাড়া, নিখরচায় থাকতে থাকতে, পড়াশোনা করতে করতে ঝংকারের মনে হীনমন্যতা জন্মাবে, কিনা, সে পরের দয়ায় ও অনুদানে পড়াশোনা করছে। নানাজনে নানা কথা ছড়াবে, নিন্দে মন্দ করবে।

বড়পিসি একান্তমহলে যা-সব বলত, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, ঝংকারের খরচ বাবদ প্রকাশ্যে ও গোপনে যা পাঠাত একদিকে হিরণ্ময় এবং অন্যদিকে রত্নহীরা, তার থেকে রত্নহীরার বাপের বাড়ির পুরো সংসারটাই চলে যেত।

কুন্দর মুখেই পরবর্তীকালে শুনেছি, সে সময়টা মন্দাকিনীর মধ্যে হাঁকডাকটা যেন ঢের বেশি বেড়ে গিয়েছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে কারোর পক্ষে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। দেখামাত্রই কুন্দকে হুকুম করতেন, কুন্দ, অকে ডাক্ তো।

কুন্দর ডাকে পিছু ফিরে লোকগুলো পায়ে পায়ে চলে আসে মন্দাকিনীর উঠোনে। মন্দাকিনী ওদের কথায় কথায় ধমকাতেন। এটা ওটা ফরমায়েশ করতেন। দু'চার দিন বাদে নিজেই ডাকাডাকি জুড়লেন। এই ক্ষুদিয়া, এই গগনা, কোথা চল্লি? এদিকে আয়।

প্রজাতুল্য গরিব মানুষগুলি ভয়ে ভয়ে আসে, হুকুম মতো ফাইফরমায়েশ খেটে দেয়।

দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে ফুরফুরে হাওয়া বয় বুঝি। খুব তৃপ্তিসহকারে দেখতে থাকেন হুকুম তামিল করা মানুষগুলোকে। দেখতে দেখতে ওদের নানা বিষয়ে জেরা করতে থাকেন তিনি। মানুষগুলো কাজ করতে করতে মন্দাকিনীর সব প্রশ্নের যথাসম্ভব জবাব দিয়ে চলে। তাই দেখে কুন্দ বুঝতে পারে, কাজ করানোর মধ্য দিয়ে আনুগত্য যাচাইয়ের পাশাপাশি মন্দাকিনী কথা বলবার প্রয়োজনটাও মিটিয়ে নিচ্ছেন কৌশলে। কেন কি, মুখুজ্যাগড় থেকে বেবিয়ে আসার পর থেকে এটাও তো তাঁর একটা বড়সড় সমস্যা।

মুখুজ্যাগড়ে লোকজন পরিবৃত হয়ে থাকবার সুবাদে সারাক্ষণ কথাবার্তার অন্ত থাকত না তাঁর চারপাশে। হাজার লোকের কলকলানি শুনতে শুনতে মাথা ধরে যেত তাঁর। বেশি কথা বলবার জন্য দাসী-বাঁদিগুলোকে আকছার ধমক খেতে হত। কিন্তু বকদিঘির পাড়ে আসা অবধি, কথা বলবার মানুষের বড়ই বাড়ন্ত হয়েছে। ওঁর চারপাশে মানুষ বলতে তো ওই এক কুন্দ। সে তো প্রায় বোবার সামিল।

মুখুজ্যাগড়ে থাকাকালীন যেসব সম্পন্ন ঘরেব বউ-ঝি, প্রৌঢ়ারা নিয়মিত আসত মন্দাকিনীকে গল্পগুজবে সঙ্গ দিতে, খোসামোদ করতে, এবং সেই বাবদ নিজেদের আখের গোছাতে, তারা তে' ্একটিবারের জন্যও মুখ দেখায়নি এখানে। পাছে ওঁর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে মুখুজ্যাগড়ের ছোট কর্তামার গোঁসা হয়, সেই আশঙ্কায় মন্দাকিনীকে একেবারেই পরিত্যাগ করেছে ওরা। ছোটলোকদের বউ-ঝিরা তো গল্প করতে আসা কোন্ দূরের কথা, বকদিঘির উল্টো পাড়ের ঘাটে যারা অ্যাদ্দিন কাপড় কাচত, বাসন মাজত, কোনও এক অদৃশ্য হুকুমে তারাও অন্য পুকুরে কাজবাজ সেরে নেয়।

ফলে, ইদানীং সারাটা দিন মন্দাকিনীর কী এক নিশ্চিদ্র একাকীত্বের মধ্যে কেটে যায়। কুন্দ কোনও প্রসঙ্গে দুটো কথা বললে যেন কৃতার্থ হয়ে যান তিনি। একটা জলজ্যান্ত মানুষ, সারাদিন, সারারাত, দিনের পরে দিন, মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে, এর চেয়ে বড় শাস্তি যে আর কিছু হয় না, এই চরম সত্যটাকে অ্যাদ্দিন বাদে বুঝি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন মন্দাকিনী। ফলে, ডেকে এনে কাজ করানোর ফাঁকে ফাঁকে, যে শ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে কখনও সামান্যতম বাক্যালাপের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি মন্দাকিনী, সেই তাদের সঙ্গেই, জেরা-প্রশ্নের ছলে খানিকটা কথা বলবার সাধ মিটিয়ে নেন তিনি। লোকগুলো কাজবাজ সেরে চলে যাবার পর আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যান।

এইভাবে দিন কাটাবার পর একটু একটু করে যে কতদিন বাদে একটুখানি স্বাভাবিক হতে পেরেছিলেন মন্দাকিনী, একমাত্র কুন্দর পক্ষেই তা ঠিকঠাক বলা সম্ভব। আমরা তখন বেশ ছোট। কাজকামের ফাঁকে কুন্দ আমাদের বাড়িতে আসত মাঝে মাঝে। মায়ের সঙ্গে একান্তে গল্পগুজব করে আবার ফিরে যেত।

কুন্দ বলে, একদিন বড়-মা আমাকে দেন জোর ধমক। বলেন, সারাক্ষণ মুখে কুলুপ আঁটিয়া থাকু ক্যানে রে মেয়া? তুই কি বোবা নাকি? কথা বলতে পারিস না?

শুনে তো কুন্দ ভয়ের তানে বাক্যিহারা। মনিবের সামনে দাসী-চাকরদের প্রগল্‌ভতা কোনওকালেই পছন্দ করেন না মন্দাকিনী। প্রয়োজনের বেশি একটি কথা উত্থাপন করলেই ধমক খেয়েছে তারা চিরকাল। সেই মন্দাকিনী আজ কথা বলতে বলছেন কুন্দকে! কী কথা বলবে সে! কাজের বাইরে বলবার মতো কী কথা রয়েছে তার! বড়-মার সামনে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার সাহস তো কবেই উবে গিয়েছে।

তাও ভয়ে ভয়ে কুন্দ শুধোয়, কী বলব বড়-মা? কী শুনতে চাচ্ছেন, বলুন?

তাতে করে মন্দাকিনী একেবারে তেলেবেগুনে হয়ে ওঠেন, আ মর্, দুনিয়ায় কথার অভাব? মুখে কুলুপ লাগিয়া রাখবার তরে তোকে কণ্ঠায় স্বর দিয়েছে ভগবান? তারপর নিজেই কুন্দকে এটা ওটা শুধোতে থাকেন সারাক্ষণ। হরেক প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তার একটা পরিবেশ গড়ে তোলেন তিল তিল করে। অপ্রাসঙ্গিক কথা সেসব, হয়ত বা কোনও মাথামুণ্ডু নেই তার।

তখন মন্দাকিনী এক অপমানিতা নারী। একজন লাথি খাওয়া মানুষ। এক ধরনের পরাজয়বোধ সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তাঁকে। এক রূপসি যৌবনের কাছে পরাজয় ঘটেছে তাঁর।

যখন ঢুকেছিলেন মুখুজ্যাগড়ে, পনেরো বছর বয়েসে, সে কী রূপ তাঁর তখন! স্বামীকে এভাবেই বেঁধে ফেলেছিলেন, যেমন করে বেঁধে ফেলেছে রত্নহীরা, হিরণ্ময়কে দিয়ে যা খুশি তাই করাচ্ছে। তখন, ওই প্রথম জীবনে, মন্দাকিনীও কি পারতেন না শাশুড়িকে তাড়াতে, যদি রত্নহীরার মতো অগাধ রূপ নিয়ে আবদার ধরতেন স্বামীর কাছে? বোধ হয় পারতেন। রূপ তাঁরও কিছু কম ছিল না। কিন্তু তেমন আবদার তিনি ধরেননি। এতদ্দ্বারা কি তাঁকে রত্নহীরার চেয়ে উদার এবং মহৎ ভাবা যেতে পারে?

তাঁর সেই একাকীত্বের দিনগুলিতে বকদিঘির পাড়ে সারাদিন বলতে গেলে এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই একলাটি কেটে যেতে মন্দাকিনীর। বোবার মতো কেটে যেত দিন, রাত। তখন দিনভর আকাশপাতাল ভেবে চলে মন। বকদিঘির জলে দৃষ্টি বিঁধিয়ে কেটে যায় বিকেলগুলি। একটা জীবনকালেই তাঁর বুকের মধ্যে দুটো জীবনের স্বাদ।

এখন অবশ্য আগের জীবনটাকে একটা জলজ্যান্ত পরিহাস বলে মনে হয়। কিন্তু নির্বাসনের সেই প্রথম পর্বের দিনগুলিতে আগের দিনের স্মৃতিগুলো ছিল সাপের মতো বিষধর। সমানে ছোবল মারত তাঁকে।

সামনের পথ দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যায় দলাইপাড়া কিংবা গুচ্ছাতপাড়ার মানুষজন। মন্দাকিনী ডাক পাড়লে ভয়ে ভয়ে আসে, হুকুম মতো কাজকর্ম করে দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। মন্দাকিনী না ডাকলে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে তারা সন্তর্পণে পার হয়ে যায় বকদিঘির নতুন বাড়িটাকে। কথাবার্তা বলে বটে নিজেদের মধ্যে, কিন্তু মন্দাকিনীর সামনেটিতে পড়লে একেবারে কেঁচোটি। তখন মুখ দিয়ে আর বাক্যি সরে না। কখন চোখের আড়ালে যেতে পারবে, সেই ভাবনা সারাক্ষণ। তারা অবশ্য যে-যার বাড়িতে ফিরে গিয়ে চার দেয়ালের ঘেরাটোপে নিজেদের পরিবারের মধ্যে ফিসফিস করে উপহার দেয় মুখুজ্যাগড়ের কর্তা-মায়ের জীবনযাপন প্রণালীর কণিকাগুলি।

বলে, অত বড় ঘরের গিন্নি, আধ-ময়লা কাপড় পরিয়া, মাটিতে ধেবড়িয়া বসিয়া আছে! কিংবা দুয়ার ঝাঁট দিচ্ছে নিজের হাতে! কিংবা নিজের হাতে চিরুনি দিয়া মাথার চুলের জট ছাড়াচ্ছে!

ততদিনে মন্দাকিনী গেরস্থালি কাজের কিছু কিছু নিজের হাতে করতে শুরু করেছেন। কিছুটা গেরস্থালির প্রয়োজনে, কিছুটা সময় কাটাতে। সারাদিনভর কিছুটা সময় কাজকর্মের মধ্যে কাটাতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে করে কি আর পাহাড়প্রমাণ নিঃসঙ্গতার বোঝাটি তিলমাত্র হালকা হয়।

কাজেই, বকদিঘির পাড়ে মন্দাকিনীর দিন কাটে, রাত কাটে একেবারে বোবার মতো। শত পীড়াপীড়িতে কুন্দই যা একটু-আধটু কথা-টথা কয় তখন। বাকি সময়টা একেবারে শ্মশানের স্তব্ধতা সারা বাড়ি জুড়ে।

কথা ছিল, অন্য ভিটেতে বসবাস করলেও মুখুজ্যাগড়ের মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে থাকবেন মন্দাকিনী। ধোপা-নাপিত মুখুজ্যাগড়ের পাশাপাশি ওঁর কাছেও নিয়মিত আসবে। ওঁর নামে যে সমস্ত জমি, তার ধানভাগ দেবে বর্গাদাররা। মুড়ি-ভাজনি এসে মুড়ি ভেজে দিয়ে যাবে, চিঁড়াকুটনি চিঁড়ে দিয়ে যাবে, সরলা এসে রোজ দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে...। কিন্তু বাস্তবে ততটা ঘটল না। দু-চার দিন বাদেই ওরা কেমন করে যেন বুঝে ফেলল, এ এক বিষহীন সর্প। এর কেবল কুলোপানা চক্করই সার। অতএব মন্দাকিনীর কাছে একেবারে দিনক্ষণ ধরে না গেলেও চলে। বেশি চালাকরা আরও বুঝে ফেলল, বরং মন্দাকিনীকে একটুখানি অগ্রাহ্য করলে মুখুজ্যাগড়ের আসল তরফটি মনে মনে খুশিই হবেন। ফলে, ধোপা, নাপিত, মুড়িভাজনি-চিঁড়াকুটনি, খিদমদ্গারের দল খুবই হেয় করতে লাগল মন্দাকিনীকে। যারা এতকাল কারণে অকারণে খোসামোদ করে এসেছে ওঁকে, তারাই ধীরে ধীরে আনাগোনা কমিয়ে আনল। গড়ের জন্য নিযুক্ত ধোপা, নাপিতেরা এখানেও আসত। কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও বুঝে ফেলেছে অন্য কিছু। মুখুজ্যা-গড়ে যদি মাসে চারবার যায়, মন্দাকিনীর কাছে আসে তিনবার, দুবার, কোনও কোনও মাসে একবার।

মন্দাকিনীর ধারণা, হিরণ্ময়ের কাছে এতসব খবর পৌঁছয় না। পৌঁছলেও রত্নহীরার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস হয় না তার। সে রূপসি যে তার সর্বনেশে রূপ দিয়ে কতখানি বেঁধে ফেলেছে হিরণ্ময়কে, গড়ে থাকাকালীন তা তো স্বচক্ষে দেখে এসেছেন মন্দাকিনী।

কাজেই, কাজের লোকগুলো ইচ্ছেমতো কামাই দিলেও, নানাভাবে তাঁকে হেয় করলেও ওই নিয়ে আর হম্বিতম্বি করতে ইচ্ছে করে না মন্দাকিনীর। যেখানে তাঁর জোর খাটবার কথা ছিল, সেই জায়গাটাই যখন নড়বড়ে হয়ে গেল, পেটের ছেলেই যখন এই বুড়ো বয়েসে নির্বাসনে পাঠাল ওঁকে, তখন আর পরের ওপর হম্বিতম্বি করে কী হবে! তাছাড়া, এখন আর শরীরের চাকচিক্য, বেশভূষার পারিপাট্য নিয়ে অতখানি মাথাও ঘামান না তিনি।

দেখে শুনে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে ওদের একে একে পরিত্যাগ করতে লাগলেন মন্দাকিনী। একে একে বিদেয় করতে লাগলেন সবাইকে। যা, দূর হ, আসার দরকার নাই আমার কাছে। তোরা মুখুজ্যাগড়েই যা। যাকে সেবা করলে আখেরে লাভ, তারই সেবা কর্ গা। আমি তোদের মুখ দর্শন করতে চাই না।

এখন বুঝতে পারি, ঠিক ওই মুহূর্ত থেকেই এক অন্য প্রক্রিয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিলেন মন্দাকিনী।

সরলাটাও ইদানীং মাঝে মাঝেই কামাই দিচ্ছিল।

যেদিন সে আসত না, বাধ্য হয়ে রান্নাটা হাত পুড়িয়ে করতে হত মন্দাকিনীকেই।

সরলা আরও একটা কাজ করে দিত। মুখুজ্যাগড়ের কুয়ো থেকে খাবার জলটা এনে দিত সে। দিনে দু'কলসি জলই বেশি হয়ে যেত মন্দাকিনীর। কিন্তু সরলা কামাই করলে ভারি বিপদে পড়ে যেতেন তিনি। তখন কুন্দকে পাঠাতেন বামুনপাড়ার কোনও গরিব বাড়িতে। কোনও আইবুড়ো বামুন মেয়েকে পাকড়ে আনত সে, খাবার জলটা সে-ই এনে দিত।

একদিন কুন্দ আর কিছুতেই তেমন কাউকে ধরে আনতে পারল না। মন্দাকিনীর দৃঢ় বিশ্বাস, চারপাশের সবাইয়ের এমনতরো অসহযোগিতার পেছনে রত্নহীরার উস্কানি ছিল।

সেদিন সারা বিকেল জল খেতে পেলেন না মন্দাকিনী। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল সেই বিকেল থেকে। আশায় আশায় ছিলেন, সরলা হয়ত বা দেরি হলেও আসবে। কিন্তু সন্ধে গড়িয়ে গেল, সরলা

এল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল মরে আসে। দরজার মুখে পায়ের শব্দ শোনার আশায় খাড়া হয়ে থাকে কান, কিন্তু সরলা এল না। রাগে, রোষে, অভিমানে, পিপাসায় একেবারে বিবশ হয়ে আসে শরীর, মন।

সেই সন্ধেটার কথা আমি পরবর্তীকালে কুন্দর মুখে বিতাং করে শুনেছি।

প্রবল পিপাসায় ছটফট করতে করতে এক সময় লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মন্দাকিনী প্রস্তাব করেন, চল কুন্দ, আমরা নিজেরাই গিয়ে কুয়ো থেকে এক কলসি জল লিয়ে আসি।

শুনে ছ্যাঁৎ করে চমকে ওঠে কুন্দর বুক, আপনি যাবেন অই ভরসন্ধ্যায় জল আনতে?

সে কথায় আচমকা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মন্দাকিনী, আ মলো যা। মাগীর কথা শোন না। জল না আনলে সারা রাত তিষ্ঠায় থাকব নাকি?

এক সময় কুন্দও বুঝি মনে মনে স্বীকার করে নেয় মন্দাকিনীর বক্তব্যের বাস্তবতা। সারারাত জল বিহনে দু'দুটো প্রাণী বাঁচবে কেমন করে! আর, বামুনের মেয়ে মন্দাকিনী তো কুন্দর তুলে আনা জল খাবেন না কিছুতেই। নিচু জাতের মেয়ে সে। জল-চল্ তো নয়। কাজেই, কুন্দই এক সময় তাড়া লাগায় মন্দাকিনীকে, যাইতে হইলে এই বেলায় বারিয়া পড়ুন বড় কত্তামা। রাত করিয়া লাভ কি।

মন্দাকিনী শোনেন কুন্দর যুক্তি, কিন্তু তাও চুপচাপ বসে থাকেন। কুন্দ বারবার তাগাদা দিতে থাকলে এক সময় দপ করে জ্বলে ওঠেন, আ মলো যা, এখন রাস্তায়-ঘাটে লোকজন হাঁটাচলা কচ্ছে। কাঁখে কলসি লিয়ে অদের সামনে দিয়ে হাঁটব আমি! সবুর ধর্। রাতটা বাড়ুক।

রাতটা কিঞ্চিৎ গাঢ় হলে পর কলসি আর দড়ি-বালতি নিয়ে রওনা দিল দুটি প্রাণী।

কুন্দর কাঁখে খালি কলসি, ডান হাতে দড়ি-বালতি।

মন্দাকিনী সদর দরজায় তালা লাগিয়ে উঠোনে নামলেন অন্ধকারে শরীর মিশিয়ে। এমন অভিজ্ঞতা সারা জীবনে এই প্রথম।

রাতের বেলায় গাঁয়ের পথে যে হাঁটেননি এমন নয়, গাঁয়েরই কোনও সম্পন্ন বাড়িতে পুজোআচ্চায় নেমন্তন্ন রক্ষা করে সন্ধে গড়িয়ে ফিরেছেন হয়ত বা। পাশের কিংবা দূরের গাঁয়ে হলে গরুর গাড়িতে, নিজের গাঁয়ে হলে পদব্রজেও। কিন্তু তখন সঙ্গে থাকত কুন্দ এবং আরও দু'একজন দাসীগোছের মেয়ে। পেছন পেছন হাতে মোটা লাঠিগাছা নিয়ে জটেশ্বর বাগদি। কিন্তু আজকের মতো কোনওমতেই নয় তা। এভাবে নিরুপায় হয়ে, চোরের মতো গা লুকিয়ে পথে নামেননি মন্দাকিনী।

পথে নামামাত্তর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার যেন চারপাশ থেকে গিলে ফেলল মন্দাকিনীকে।

চারপাশ কেমন শুনশান করছে! পথের দুপাশে, ঝোপঝাড়ে, রাতচরা প্রাণীদের হাঁটাচলার শব্দ ভেসে আসে কানে। গাছের ডালে বসে বসে পাখিপাখালেরা হয়ত রাত-ঘুম দিচ্ছিল, মন্দাকিনীরা গাছের তলা দিয়ে পেরিয়ে যেতেই ওঁদের পায়ের আওয়াজে ভয় পেয়ে কুঁচ-কুঁচ করে ডেকে ওঠে। তাদের কাঁচা ঘুম ভেঙে যায় বুঝি।

মন্দাকিনী হাঁটছিলেন আগেভাগে। কলসি কাঁখে পেছনে পেছনে কুন্দ।

হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকালেন মন্দাকিনী। আদিগন্ত খোলামেলা আকাশ। আকাশ তো নয়, মাথার ওপর একটা কুচকুচে কালো সামিয়ানা বুঝি। তার গায়ে হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে হিরে বসানো। হিরেগুলো জ্বলছে।

রাতের এমন ভয়াল সুন্দর রূপ এর আগে বুঝি কোনওদিনও দেখেননি মন্দাকিনী। মুখুজ্যেগড়, সে এমনই এক দালানে, থামে, দেয়ালে-পাঁচিলে ঘেরা সুরক্ষিত ঘেরাটোপ, আকাশ, সে দিনেরই হোক কিংবা রাতের, সবসময়ই খণ্ডাংশ দৃশ্যমান। ওই ঘেরাটোপের মধ্যে, চারপাশে এত-এত মানুষজনের উপস্থিতিতে রাতের আকাশ কোনওদিনই এমন অগাধ রহস্যময়তা নিয়ে হাজির হয়নি মন্দাকিনীর সামনে।

মন্দাকিনী রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আকাশটাকে দেখতে দেখতে পথ হাঁটেন। হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন, এই অগাধ রহস্যময় আকাশটার ওপারে থাকেন স্বর্গের দ্যাবতারা। তাঁরা নিশ্চয়ই ওপর থেকে আজ

দেখে ফেললেন মন্দাকিনী নামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার-গৃহিণীর পথে নামার দৃশ্যটা। একঢোক জলের জন্য নিজের সাতপুরুষের কৌলিন্য, আভিজাত্যকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে গাঁয়ের কুয়ো থেকে জল আনতে চলেছেন তিনি, এমন দৃশ্য, স্বচক্ষে দেখা তো দূরের কথা, কল্পনা করতে গেলেও ভিরমি খাবে সন্ধিপুরের মানুষ। একথা কেবল কুন্দ জানল, আর জানল চারপাশের অবোধ পশুপ্রাণী, কীটপতঙ্গ, গাছগাছাল, আর মাথার ওপর বসে বসে দেখলেন দেবদেবীরা।

বাঁকাত্যাড়া নিমগাছটার তলায় এসে পথটা দু'ভাগ হয়েছে। ডাইনের পথটা চলে গিয়েছে মুখুজ্যাগড়ের দিকে।

কিন্তু নিমগাছের তলায় পৌঁছে মন্দাকিনী আচমকা বাঁয়ের পথ ধরলেন।

কারণটা বুঝতে পারে না কুন্দ। কত্তামা কি রাতের বেলায় পথ ভুললেন? এমন ঘোর রাতের বেলায় পথে হাঁটবার অভ্যেস নেই তো তাঁর, গুলিয়ে যেতেই পারে পথ।

দ্রুত পায়ে মন্দাকিনীর কাছটিতে এসে কুন্দ ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, বাঁয়ে লয় কত্তামা, ডাইনে।

সেকথায় অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলে ওঠে মন্দাকিনীর চোখ দুটো, আ মর্ মাগী। এই ভর রাতে আমি যাব মুখুজ্যাগড়ের কুয়া থেকে জল তুলতে? শেষে কিনা লিজের কুয়া থেকে জল চুরি করব? ডুবে মরতে জল নাই আমার? দেশ-কুয়া থিকে জল আনব।

বলতে বলতে হাঁটার গতিটা আচমকা বাড়িয়ে দেন তিনি।

সাঁ-সাঁ করছে রাত। শন শন হাওয়া বইছে। কত জাতের শব্দ ভেসে বেড়ায় তাতে। কত কত শব্দ, চেনা, আধচেনা, অচেনা...। মিনমিনে গলায় কথা বলছে কেউ, মিহি সুরে কাঁদছে...। হু-হু শব্দে চিতার আগুন জ্বলছে কোথাও। কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে কামিনী ফুলের তীব্র সুবাস...। সাউদের বাঁশঝাড়ে আচমকা ডেকে ওঠে পেঁচা। কুমোর পাড়ার দিক থেকে ভেসে আসছে অবিশ্রান্ত কুকুরের ডাক। এত এত অন্ধকার শব্দ ও গন্ধের মাঝখান দিয়ে পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলে দুটি নারী।

বিশাইদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আচমকা গুনগুনানি কথা!

চমকে থেমে যান মন্দাকিনী। অন্ধকারের গায়ে কান পাতেন। ঠিক। কথাবার্তা বলতে বলতে ওঁদেব দিকেই এগিয়ে আসছে দুতিনজন লোক।

শুনতে শুনতে প্রমাদ গুনলেন মন্দাকিনী। তিরতিরিয়ে ঘামতে থাকেন।

লোকগুলো সামনের পথ ধরে এগিয়ে আসছে মন্দাকিনীর দিকে। একটু বাদেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাবে মন্দাকিনীর। অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকবে অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া ছায়ামূর্তিকে। চিনতে চাইবে। নির্ঘাৎ শুধিয়ে বসবে, রাতের বেলায় কে যায়? মন্দাকিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ওদের সন্দেহ আর কৌতূহল আরও বেড়ে যাবে। একলাটি হলে ভূতপ্রেত ভেবে দৌড় মারতেও পারত, কিন্তু একসঙ্গে তিন-তিনটে মানুষ মন্দাকিনীদের পরিচয় না জেনে সন্তুষ্ট হবে না কিছুতেই। নিদেন চোর-ডাকাতগোছের কিছু ভেবে বসলেও দোষ দেওয়া যাবে না ওদেব।

আচমকা স্যাঁৎ করে সরে এলেন মন্দাকিনী। পাশের বাঁশঝাড়টার আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন শরীর। দেখাদেখি কুন্দও। বড়-কত্তামার উপস্থিত বুদ্ধিতে মনে মনে চমৎকৃত হয় সে।

দেশ-কুয়ার আশপাশটা আরও নির্জন। কবে কোন্‌কালে, সেই ব্রিটিশ যুগে, সারা গাঁয়ের জন্য একটি কুয়া কাটিয়ে দিয়েছিল সরকাব বাহাদুর। জমি দিয়েছিল মুখুজ্যারা। দানের জমি তো, তাই লোকালয় থেকে সামান্য দূরে, একেবারে খোঁয়াড়ের কাছাকাছি সে জমি। এমনই তার অবস্থান যাতে করে সন্ধিপুরের সব পাড়ার মানুষজনই সমদূরত্বে থেকে নিতে পারে জল। ইংরেজ আমলের কাজ তো, বেশ গভীর করে, তিন প্রস্থ বালি বের করে কাটা হয়েছিল সেই কুয়ো। কাকের চোখের মতো জল তাঁর। সে জল খেলে নাকি পেটের মধ্যে পাথরও হজম হয়ে যায়। চতুর্দিকে বড় খ্যাতি হয়েছিল কুয়োটার। এখন অবশ্য সন্ধিপুরের পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি কুয়ো। সম্পন্ন মানুষেরা কেউ কেউ নিজের ভিটের মধ্যেই কাটিয়ে নিয়েছে ব্যক্তিগত কুয়ো। তাও দেশ-কুয়োর মতো এমন টলটলে হজমি জল আর হল কই!

কুয়োটার পাশটিতে পৌঁছনো মাত্তর পাশের আমগাছটার মগডাল থেকে কুঁক-কুঁক করে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল একটা পাখি।

মন্দাকিনী ভয় পেয়ে যান। অন্ধকারে কুন্দর দিকে তাকান।

ফিসফিসিয়ে শুধোন, কী ডাকল র‍্যা?

কুন্দ নিচু গলায় জবাব দেয়, পেঁচা। এই গাছে অনেকদিন ধরিয়া আছে উ। মা-লক্ষ্মীর বাহন।

কলসিটা শান বাঁধানো চাতালের ওপর নামিয়ে দেয় কুন্দ। দড়ি-বালতিটা মন্দাকিনীর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে কেঁপে ওঠে হাত।

মুখুজ্যাগড়ের কুয়োটাতে কপিকল লাগানো রয়েছে। কপিকল দিয়ে জল তোলার ঘর্ঘর আওয়াজ সারাদিনে যে কতবার শুনতে পেতেন মন্দাকিনী! দেশ-কুয়োয় কপিকল নেই। কাজেই, মন্দাকিনী বালতিটা কুয়োর গহ্বরে নামিয়ে দিয়ে সাবধানে ছাড়তে থাকেন দড়ি।

এক সময় জলের শরীর ছুঁয়ে ফেলে বালতিটা।

কুয়ো থেকে বালতি দিয়ে জল তোলার অভিজ্ঞতা কস্মিনকালেও নেই মন্দাকিনীর। তবুও স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে বার-দুই আলত ঝাঁকুনি মারেন দড়িতে, আর তাইতেই বালতিটা ডুবে যায়। পরমুহূর্তে যখন টান মারেন, তাতেই বুঝতে পারেন, জলভর্তি বালতিটার ওজন বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। সাবধানে, দু'হাতের শক্তি প্রয়োগ করে, দড়িতে টান মারতে থাকেন মন্দাকিনী। জলভর্তি বালতিটা একটু একটু করে ওপরে উঠে আসে। একটা অচেনা প্রক্রিয়া আচমকা শেখা হয়ে যায় মন্দাকিনীর। এটাও তাঁর কাছে এক আবিষ্কারের তুল্য।

কলসিটা ভরে গেলে পর আসল সমস্যাটার মুখোমুখি হন মন্দাকিনী। একটা জলভর্তি কলসি কাঁখে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যেস তাঁর কোনওকালেই নেই। কলসিটা বার-দুই তুলে ধরে পরখ করেন। বেশ ভারি। কোনওকালেই অভ্যেস নেই এমন একজন ষাটোর্ধ মহিলার পক্ষে কলসিটা কাঁখে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। স্রেফ পরখ করবার জন্য কলসিটাকে বার-দুই তুলে ধরবার দরুনই হাঁফ ধরল মন্দাকিনীর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

ততক্ষণে আরও এক বালতি জল তুলে নিয়েছে কুন্দ। মন্দাকিনীর কলসিটাকে তুলে ধরবার ধরন দেখে সে বুঝে ফেলে, ওই ভারি কলসি কাঁখে করে অত দূর বয়ে নিয়ে যাওয়া মন্দাকিনীর পক্ষে অসম্ভব। কোমরে চোটটোটও লাগতে পারে।

বলে, অর্ধেক জল ফেলিয়া দিন বড় কর্তামা। একজনার পক্ষে একটা গোটা দিন চলিয়াবে। আমি তো আমার তরে বালতি ভরিয়া লিছি। কাল সরলা আইলে বরং আর এক কলসি.. ।

সম্ভবত সরলার প্রসঙ্গ তোলায় কিংবা অন্য কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে আচমকা জ্বলে ওঠেন মন্দাকিনী। বলেন, চুপ কর্ মাগী। সরলার আশায় আমি তোলা জল ফেলিয়া দুবো? বলতে বলতে এক হ্যাঁচকায় কলসিটা তুলে নেন কাঁখে।

কুন্দ পাশটিতে দাঁড়িয়ে আধো-অন্ধকারে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মরমে মরে যায় বুঝি। বাস্তবিক, এমন দৃশ্য সন্ধিপুরের কোনও মানুষই এযাবৎকাল চর্মচক্ষে দেখেনি।

সহসা চোখ ফেটে জল এসে যায় তার।

কলসিটা কাঁখে নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন মন্দাকিনী।

শরীর থেকে অন্ধকারে খসে খসে পড়ছিল আভিজাত্য জাতীয় মহার্ঘ অলঙ্কারগুলি। হাঁটতে হাঁটতে সামান্য টলছিলেন বুঝি। একদিকে একটা ভারি জিনিস চেপে থাকায় সামান্য ঢাল খেয়ে যাচ্ছিল শরীর। কুন্দর বারেকের তরে মনে হয়, মন্দাকিনীকে আর একবার সাবধান করে দেয়, কিনা, এই বয়সে অনভ্যস্ত শরীরে অতখানি ভারি জিনিস অতটা পথ বয়ে নিয়ে যাওয়ার বিপদ রয়েছে। যেকোনও মুহূর্তে একটা অনর্থ ঘটতে পারে। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে ইতিমধ্যে যা ধমক খেয়েছে, তাতে করে আর দ্বিতীয়বার কথাগুলো বলতে সাহস পায় না সে। মন্দাকিনীর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে নিঃশব্দে। সতর্ক দৃষ্টি রাখে মন্দাকিনীর ওপর, যাতে করে, মন্দাকিনী যদি সামলাতে না পেরে আচমকা কোনও দিকে টাল খান,

তো শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে জাপটে ধরে ফেলতে পারে ওঁকে।

কাঁখে জলের কলসি নিয়ে বাড়ির দাওয়ায় পা দেওয়া মাত্তর কুন্দ উঠোনের একপাশে জলভর্তি বালতিটা নামিয়ে রেখে সাত-তাড়াতাড়ি গিয়ে সদর-দরজার তালা খুলল। গাঢ় কালির পুঁটলিটি হয়ে দুজনে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ঘরে।

ঘরের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় যখন কলসিটা নামিয়ে রাখলেন মন্দাকিনী। হ্যারিকেনের আলোয় কুন্দ দেখল, তিনি রীতিমতো দরদরিয়ে ঘামছেন। সাঁই...সাঁই আওয়াজ তুলে হাঁফাচ্ছেন। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কুন্দ চটজলদি ওঁকে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে। মন্দাকিনী বাধা দেন না। বরং পাখার বাতাসটুকু নিতে নিতে এক সময় কুন্দর দিকে তাকালেন তিনি। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় চারচক্ষু এক হল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সারাটা পথ একটিও কথা বলেননি। বাড়িতে ঢুকেও মুখ দিয়ে এতক্ষণ রা'টি কাড়েননি। এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন অনেকক্ষণ বাদে। ছলোছলো চোখে ফিসফিসিয়ে বললেন, একথা কারোকে যেন বলিসনি কুন্দ। বেজায় নিন্দে হবে তাহলে। লোকের সুমুখে মুখ দেখানো দায় হবে।

কুন্দ বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে মন্দাকিনীর দিকে। মন্দাকিনীর মুখের প্রতিটি রেখাকে পড়ে ফেলতে পারে সে। বুঝতে পারে, মুখে শুধু এই কথা ক'টি উচ্চারণ করলেও এই মুহূর্তে হাহাকারে ফেটে যেতে চাইছে মন্দাকিনীর বুক।

দেখতে দেখতে পুঁজ জমে যাওয়া ফোঁড়ার মতো টনটনিয়ে কান্না জমে কুন্দর বুকের মধ্যে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ায় সে।

সে-রাতে আর রান্নাবান্নার ঝামেলায় গেলেন না মন্দাকিনী। চিঁড়ে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে মেখে ক' দলা মুখে দিয়েই শুয়ে পড়লেন।

পায়ের কাছে বসে মন্দাকিনীর পা'দুটো আলত হাতে টিপে দিচ্ছিল কুন্দ। চোখ বুঁজে মড়ার মতো শুয়ে ছিলেন মন্দাকিনী। এক সময় চোখ খুললেন তিনি। কুন্দর দিকে তাকালেন।

বিড়বিড় করে বললেন, অন্ধকার রাতের কী রূপ রে, কুন্দ!

বাস্তবিক, রাজনন্দিনী হয়েও কাঁখে করে জলের কলসি বয়ে আনার দুর্গতি ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়, কিন্তু তার মধ্যেও মন্দাকিনী আবিষ্কার করেছিলেন রাতের এক নতুন রূপ। বড় ভয়াল সে রূপ, কিন্তু মন্দাকিনীর সে এক অনুপম অভিজ্ঞতা।

শেষ রাতে তেড়ে জ্বর এল মন্দাকিনীর।

গোঙানি শুনে কুন্দ এসে হাত দেয় ওঁর কপালে। দেখে, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। খাটের তলায় রাখা ট্রাঙ্ক থেকে একটা কাঁথা বের করে ভালো করে ঢেকে দেয় মন্দাকিনীর শরীর।

বিড়বিড় করে বলে, এই বইসে অত ধকল সয়?

মন্দাকিনী জবাব দেন না। পাশ ফিরে শোন।

সারাটা দিন বিছানায় পড়ে রইলেন মন্দাকিনী। মাঝে একবার উঠে বাহ্যি-পিসাব সেরে এসেছিলেন। তারপর আর বিছানা থেকে ওঠেনই নি।

দেখতে দেখতে সন্ধে নামল। সরলাও এল না। এদিকে গতকালের এক কলসি জল বিকেল নাগাদ ফুরিয়ে গিয়েছে। অথচ, কুন্দ গায়ে হাত ঠেকিয়ে দেখল, মন্দাকিনীর জ্বর তিলমাত্র কমেনি।

মনে মনে প্রমাদ গোনে কুন্দ। সে না হয় নিজের জন্য এক বালতি জল তুলে আনতে পারে। বকদিঘির জলও গামছায় ছেঁকে খেয়ে নিতে পারে সে। কিন্তু জল বিহনে সারাটা রাত মন্দাকিনীর চলবে কী করে? কুন্দ ভেবে পায় না।

মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে যে এক অন্য কিসিমের প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সন্ধেতেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারল কুন্দ।

সন্ধে নামলে পর কুন্দকে কাছে ডাকেন মন্দাকিনী। চিঁ-চিঁ গলায় হুকুম করেন, যা, কুয়া থিকে এক

কলসি জল ভরিয়া আন।

কুন্দ তো ভয়ে-ভাবনায় কাঠ। নিচু জাতের মেয়ে সে। তার আনা জল বামুনের বিধবা হয়ে কেমন করে খাবেন মন্দাকিনী!

মিনমিনে গলায় বলে, আমি জল আনিয়া দিলে আপনি খাবেন!

—মর্ মাগী? তবে কি জল বিহনে ছাতি ফাটিয়া মরতে বলতেছু আমায়?

কুন্দ তাও কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে ভয়ে বলে, আমার মহাপাপ হবে বড় কত্তামা। লরকে ঠাঁই হবে আমার।

—আ মলো যা, এ মাগী কয় কী! খাব তো আমি। খাইলে আমার পাপ হবেনি, আর আনলে কিনা তোর পাপ হবে?

এরপর আর ওই নিয়ে কথা চালাচালি করতে সাহস হয় না কুন্দর। মন্দাকিনীর ধমকে তার যাবতীয় দ্বিধা খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। রাতের আঁধারে সে জল আনতে ছোটে দেশ-কুঁয়া থেকে।

পরের দিন সরলা আসামাত্র তাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দেন মন্দাকিনী।

ওই সন্ধের পর থেকে নিয়মিত দেশ-কুয়া থেকে জল ভরে নিয়ে আসে কুন্দই। প্রথম প্রথম দিন-দুই সন্ধের আঁধারটি নামলে চারপাশের মানুষজনের নজর এড়িয়ে কলসি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সে। কিন্তু তৃতীয় দিনে বাদ সাধলেন স্বয়ং মন্দাকিনীই। বলেন, লুকিয়া লুকিয়া কদ্দিন জল আনবি তুই? বিকাল-বিকাল জলটা তুলিয়া আনিস।

কুন্দ শিউরে উঠে বলে, পাঁচজনাতে পাঁচ কথা বলবে কত্তামা। বড় নিন্দা হবে।

—কার নিন্দা হবে রে মুখপুড়ি? তোর না আমার? বলতে বলতে ঠোঁটজোড়া শ্লেষ-বিদ্রূপে বেঁকে যায় মন্দাকিনীর। বলেন, লজ্জায় যার মাথা কাটা যাবার কথা, দ্যাখ্ গে যা, সদরমহলে দোলনায় বসে পান চিব্বাচ্ছে আর মোজ কচ্ছে সে।

মন্দাকিনীর রুদ্রমূর্তির কাছে নিজেকে গুটিয়ে নেয় কুন্দ। তারপর থেকে দিনমানেই দেশ-কুঁয়া থেকে জল ভরতে যায় সে। ওই জল অবলীলায় পান করেন মন্দাকিনী। সন্ধিপুর গাঁয়ে সে খবর বড় তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে যায়, কিনা, জেলের মেয়েটার তুলে আনা জল অবলীলায় খাচ্ছেন মুখুজ্যাগড়ের বড় কর্তামা।

নিন্দায় নিন্দায় ভরে যায় সন্ধিপুরের আকাশ বাতাস।

একদিন কুন্দ খুব ভয়ে ভয়ে বলে, জল আনা লিয়ে বড় কথা উঠতিছে কত্তামা।

খুব শীতল চোখে কুন্দর দিকে তাকান মন্দাকিনী। ততোধিক শীতল গলায় বলেন, যারা কথা তুলতিছে, তারা তবে কুঁয়া থিকে রোজ আমার খাবার জলটা তুলিয়া দিয়া যাউ।

কুন্দ আর কথা বাড়ায়নি।

সরলাকে তাড়িয়ে দেবার পর দু'বেলার রান্নাটা নিজের হাতেই করছিলেন মন্দাকিনী। মুড়িভাজনি মেয়েটাও কতদিন আসছিল না। মন্দাকিনী বাধ্য হয়ে জল-দেওয়া ভাতই খাচ্ছিলেন জলখাবারের সময়।

এসময়টা চিরটাকাল মুড়ি খেতেন তিনি। দুধ, আখের গুড় আর মর্তমান কলা দিয়ে মেখে খেতেন। কোনওদিন বা শশা আর কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে সরষের তেল দিয়ে মেখে নিতেন মুড়িতে। জল-দেওয়া পান্তাভাত মুখুজ্যাগড়ে দাসী-চাকরদেরই খাদ্য ছিল।

একদিন কুন্দকে ডেকে মন্দাকিনী বললেন, কুন্দ রে, চাট্টি মুড়ি ভাজ্ তো, খাই।

কুন্দ আকাশ থেকে পড়ে। সারা মুখ জুড়ে শ্রাবণের মেঘ ঘনায়। বলে, আমি মুড়ি ভাজব, আর ওই মুড়ি আপনি খাবেন?

—কেন? খাইলে দোষটা কি? তুই মুড়ি ভাজলে ওই মুড়িতে কি তোর জাত লেপটিয়া রইবে?

—কী যে বলেন আপনি বড়-কত্তামা! বামুন-ঘরের বিধবা আপনি। বোঝেন না কেন?

—খুব বুঝি। ধমকে ওঠেন মন্দাকিনী,—তোকে আর বক্তিতা দিতে হবেনি। মুড়ি ভাজবার খোলা

লিয়ে বাইরের উনুনটাতেই বস্ তুই।

সেদিন কুন্দর হাতে ভাজা মুড়ি বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন মন্দাকিনী।

কিন্তু একটা সংসারে রান্নাবান্না আর মুড়ি ভাজা ছাড়াও তো নানাবিধ কাজকর্ম থাকেই। সেসব করবার জন্য যারা নিযুক্ত হয়েছিল, তারাও যখন আনাগোনা বন্ধ করে দিল, এক ধরনের অসহায়তা ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল মন্দাকিনীকে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, একটা সংসারে ছোট-বড় মিলিয়ে সারা দিনে ক-ত কাজ! দিনে দশবার ঘরদোর ঝাঁটপাট, উঠোন নিকোনো, কুটনো কোটা, মসলা বাটা, রান্নাবান্না করা, কাপড়চোপড় কাচা, মুড়ি ভাজা, বিছানাপত্তর নিয়মিত রোদে দেওয়া, ঘরদোর-আলনাপাতি গুছিয়ে রাখা, হ্যারিকেন-লম্ফ মোছামুছি করে রাখা, মরসুমে বড়ি দেওয়া, আচার-আমসি-আমসত্ব বানানো, কাঠকুটো কাটা, বাজার-হাট করা, ভিটের মধ্যে আনাজের চাষবাস করা—যেসব কাজ করতে এককালে পাঁচ-সাতটা দাসী-চাকরেও হিমসিম খেত, তা কেমন করেই বা করবে এক বেচারি কুন্দ, চিরটাকাল এত এত দাসীচাকরের মধ্যে থেকে তারও তো একলাটি অত অত কাজ করবার অভ্যেস নেই। তাবাদে, কাঠকুটো কাটা, বাজার-হাট করা, ক্ষেতে আনাজ-সবজির চাষ করা গোছের কাজগুলো তো আর ওকে দিয়ে হয় না।

সেই সময়টা আমি ছিলাম খুবই ছোট। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন। ওই বয়েসেই দূর থেকে দেখেছি, ঠেকায় পড়ে কেমন করে একটু একটু বদলে যাচ্ছিলেন মুখুজ্যাগড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত বড়-কর্তামা। তখন রোজ সকালটি হলেই মন্দাকিনী একে ডাকেন, ওকে ধরেন, এবং এইভাবে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মগুলির জন্য ক্রমশ নির্ভর করতে থাকেন সেইসব নিচু জাতের গরিব মানুষগুলির ওপর, যাদের ছায়া অবধি মাড়াবার কথা এককালে ভাবতেই পারতেন না তিনি। তখন আর হম্বিতম্বি নয়, গলার স্বরের মীড়ে মীড়ে এক ধরনের মোলায়েম ভাব এল তাঁর। পাশের পাড়ার একে ওকে ডাকতেন, মোলায়েম গলায় অনুরোধ জানাতেন এটা-ওটা করে দেবার জন্য। পূর্বতন সংস্কারবশত, কিংবা স্রেফ করুণাবশতই তারা নীরবে মেনে নিত তাঁর এবংবিধ জুলুম।

মন্দাকিনীও বুঝি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর মধ্যেও ভেতরে ভেতরে, পুরোনো সরষের তেলের মতো, ঝাঁঝাল তেজটা মরে আসছিল। চোখমুখের ধারাল ভাবটা কমে আসছিল। ধীরে ধীরে কেমন ভোঁতা হয়ে আসছিল মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিগুলো। বেশ বুঝতে পারছিলেন, একটু একটু করে বদলে যাচ্ছেন তিনি। কেন কি, মন্দাকিনী ততদিনে বুঝে ফেলেছেন, ওঁর ওই দুর্ভাগ্যের জন্য চারপাশের গরিবগুরবো মানুষগুলি তাঁকে নিতান্তই করুণার চোখে দেখতে শুরু করেছে, কিনা, কী মানুষের কী হাল! আগেকার দিনের জুলুমের কথা ভুলে তারা মন্দাকিনীর জন্য আড়ালে হা-হুতাশ করতে শুরু করেছে, চাপা গলায় গালমন্দ জুড়েছে রত্নহীরার উদ্দেশে।

তাবলে, সবাই যে ডাকামাত্তর আগলবাগল হয়ে ছুটে আসত, তা কিন্তু নয়। যথেষ্ট চালাক যারা, বড়ই বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, তারা বুঝত, মন্দাকিনীর জন্য অত মাথাব্যথা দেখালে নিজের অজান্তেই রত্নহীরার কোপদৃষ্টিতে পড়তে হবে। যাদের মাথা অত চটজলদি খেলে না, তারা অবশ্য ডাকলেই দৌড়ে এসে কাজকর্মগুলি করে দিত, কিন্তু তাবলে মন্দাকিনীর সঙ্গে মেলামেশা, গা-ঘষাঘষি, এসব করতে তাদেরও বুক কাঁপত। কেন কি, মন্দাকিনী না হয় দৈনন্দিন কাজকর্মগুলি করিয়ে নিতে কিংবা সময় কাটাতে, অথবা স্রেফ একাকীত্ব ঘোচাতে একে ওকে ডাকাডাকি জুড়েছেন, ঠেকায় পড়ে না হয় সৎমার পায়েও গড় করতে রাজি তিনি, কিন্তু তাঁর কথায় ভুলে গা-ঘষাঘষি করতে গেলে হিরণ্ময় মুখুজ্যা তো খেপে টং হবেনই। নীল রক্ত বইছে তাঁর শিরায়। কাজেই, যতই না কেন ভিন্ন থাকুন, জমিদারের মা তিনি, তাঁর সাথে এসে গা ঘষাঘষি করা, ছোটলোকদের এহেন বেয়াদবি তিনি কদাচ সইবেন না। ফলে, মন্দাকিনীর ডাকে মানুষগুলো সসঙ্কোচে আসে, কাজটুকু করে দিয়ে সসঙ্কোচে চলে যায়। যদি মন্দাকিনী কখনও বা মানুষটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাব জমাতে চান, তো ভয়ে-ভক্তিতে কৌশলে এড়িয়ে যায়।

সব মিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল, এই জনবহুল দুনিয়ায় একেবারে নিঃসঙ্গ, একঘরে হয়ে দিন কাটাতে

লাগলেন মন্দাকিনী। দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, একেবারেই নিঃসঙ্গ। একমাত্র কুন্দ ছাড়া আর কথা বলবার লোকই পান না তিনি। একটু একটু করে অপ্রকৃতিস্থ হতে থাকেন মন্দাকিনী। বুড়িয়ে যেতে থাকেন দ্রুত।

মুখুজ্যাগড় থেকে চলে আসার পর এক সীমাহীন নিঃসঙ্গতা যখন চারপাশ থেকে তিলতিল গ্রাস করে ফেলছিল মন্দাকিনীকে, যখন সারাদিন, সারারাত, মুখ বুঁজে একেবারে বোবার মতো কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে, যেকোনও উপলক্ষ্যে যে-কারোর সাথে একটা-দুটো কথা বলবার জন্য যখন হেদিয়ে পড়তেন তিনি, তেমন উপলব্ধিটা তখনই পলির মতো একটু একটু করে জমছিল মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে, কিনা, মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পাশটিতে মানুষ চাই, সদাসর্বদা সঙ্গ দেবার, সুখদুঃখের ভাগ নেবার, নিদেন একটুখানি বুকের কথা খোলসা করবার জন্য, চাই-ই। যখন চারপাশে স্রেফ কথা বলবার মতো একটা-দুটো মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি, তখনই শিখাবউদি যেন আচমকা এক বিকেলে স্বর্গের দেবী হয়ে নেমে এল মন্দাকিনীর বিড়ম্বিত জীবনে।

বাস্তবিক, এমন এক অসহনীয় অবস্থা থেকে মন্দাকিনীকে টেনে তুলেছিল শিখাবউদিই।

কেবল তার জন্যেই বুঝি বেঁচে গেলেন মন্দাকিনী।

একদিন পড়ন্ত দুপুরে মন্দাকিনী বকদিঘির পাড়ে বসে রয়েছেন একা-একা, কুন্দ বাড়ির মধ্যে কী সব কাজবাজ করছে, এমনি সময়ে শিখাবউদি এল।

মন্দাকিনী তো চেনেনই না, তলবও করেননি ওকে, কিন্তু শিখাবউদি এসে এমনভাবে বসে পড়ল পাশটিতে, যেন কত দিনের চেনা আপনজনটি।

বলল, একা একা থাকেন, আপনার সাথে তাই গল্প করতে এলাম দিদিমা।

কথাটা ঠক করে কানে বাজে মন্দাকিনীর। কেবল কানেই নয়, বুকেও।

দিদিমা! ওঁকে সারাজীবনেও এই নামে ডেকেছে কেউ? বিশেষ করে এমন চাষিবাসি পরিবারের লোকজন! কী আস্পর্ধা মেয়েটার! আলাপ নেই, পরিচয় নেই, পাশটিতে বসে পড়েই বলে কিনা, দিদিমা!

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনী। দু'চোখ দিয়ে জরিপ চালান। এক সময় খটখটে গলায় বলেন, কে তুই?

শিখাবউদি খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয়, আপনি আমাকে চিনবেননি। আমি ঘোষবাড়ির বউ। আমার বরের নাম বল্লভ ঘোষ। শ্বশুরের নাম যাদব ঘোষ।

শ্বশুরের নাম বলায় ততক্ষণে মন্দাকিনী বুঝতে পেরেছেন। ঘোষেরা জাতে কায়স্থ। মুখুজ্যাদেরই প্রজা বটে ওরা, কিন্তু অবস্থা ভালো। মন্দাকিনী শুনেছিলেন, যাদবের ব্যাটা নাকি শহর থেকে বউ এনেছে। এই হল তবে সেই বউ!

শিখাবউদির চোখের ওপর সরাসরি চোখ রাখেন মন্দাকিনী। বলেন, বামুনপাড়া, কায়েতপাড়ার থেকে কেউই সাহস করিয়া আসে না আমার কাছে। তুই যে বড় এলি?

শিখাবউদি মুচকি হাসে, আমার ভয়ডরটা একটু কম গো দিদিমা। আপনি বোধ লেয় আমাকে পুরাপুরি চিনতে পারেননি। ওই-যে, সে-বছর দুর্গাপূজার সময় আপনাদের গড়ে যাত্রাগান চলছিল, নতুন গিন্নিমা আমাকে বাড়ির ভিতর থিকে জল আনতে পাঠাল...। আর যেই না আমি অন্দরমহলে ঢুকেছি...।

ততক্ষণে ধাঁ করে মেয়েটিকে চিনে ফেলেছেন মন্দাকিনী। ওই রাতে অন্দরমহলে ওঁৎ পেতে ছিল রত্নহীরার ভাই মৃদুল। বউমা জেনেবুঝেই পাঠিয়েছিল মেয়েটাকে। শিখা অন্দরমহলে ঢোকামাত্রই তাকে জাপটে ধরেছিল মৃদুল। অন্য কোনও মেয়ে হলে ওই রাতেই নিঃশব্দে লুট হয়ে যেত, কিন্তু সে মেয়েটা ছিল অন্য ধাতের। চেঁচিয়ে ফাটিয়ে, মৃদুলকে চড়-থাপ্পড় মেরে, সে এক কাণ্ড। রাত না পোহাতে পালাতে পথ পায়নি মৃদুল। ব্যাপারটা হিরণ্ময়ের কানে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি আর চোটপাট করে কেলেংকারি বাড়াতে চাননি। ব্যাপারটা এভাবেই ধামাচাপা পড়ে গেল।

মন্দাকিনী জানতেন ঘটনাটা, কিন্তু মেয়েটাকে এতাবৎকাল চোখে দেখেননি। কিংবা ওইসময় দেখে থাকলেও ভুলে গিয়েছেন। ওইসব দিনে চাষিবাসিদের বউ-ঝিদের মুখ মনে রাখবার কোনও গরজই ছিল না মন্দাকিনীর।

এতক্ষণে শিখাবউদির চোখে সরাসরি চোখ রাখেন মন্দাকিনী। দু'চোখে প্রশংসার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। বলেন, তো, তুই সেই মেয়া! তুই তো সাক্ষাৎ বাঘিনী রে!

শুনে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শিখাবউদি।

একটা সম্পন্ন চাষিবাড়ির বউ বৈ তো নয়, তা সত্ত্বেও মন্দাকিনীর সমুখে শিখাবউদিকে এমন খিলখিলিয়ে হেসে উঠতে দেখে আগের দিনের মতো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন না মন্দাকিনী। তেমন বেয়াদবি বলে মনেই হল না ব্যাপারটাকে। বরং ওঁর সামনে অনেকদিন বাদে একজন কেউ এমন ঝরনার মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠাতে মন্দাকিনীর চারপাশ থেকে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অনেকখানি গুমোট বাতাস আচমকা সরে গেল।

কতদিন এমন করে হাসেননি মন্দাকিনী। কাউকে হাসতে দেখেননি। চিরটাকাল তাঁর চারপাশে ছিল এক জাতের সম্ভ্রমের কৃত্রিম বলয়। সেই বলয়ের মধ্যে বসবাস করে কারও পক্ষে খিলিখিলিয়ে হেসে ওঠা সম্ভব ছিল না। এমন কি মন্দাকিনীর পক্ষেও নয়।

শিখাবউদির হাসিটা চারপাশের হাওয়ায় তরঙ্গ তুলছিল। মন্দাকিনীর কানের কাছটিতে ক্রমাগত বাজছিল সেই সুরেলা হাসি।

শুনতে শুনতে শিখাবউদির দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনী। সেই প্রথম তাঁর মনেও বুঝি এমনিতরো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠার সাধ জাগে। তাঁর বুকের মধ্যে তেমন সাধটি বাসা বাঁধতে সাহস পায়, কারণ, ততদিনে তিনি তিলেতিলে আবিষ্কার করেছেন, তাঁর শরীর থেকে কবে কবে জানি খসে পড়তে শুরু করেছে জমিদার-বংশের যাবতীয় মহিমা। কবে কবে যেন একেবারে সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর মধ্যে। নিয়মিত ধোপা না আসায় তাঁর কাপড়চোপড়ে সেই আগেকার দিনের ঔজ্জ্বল্য আর নেই। শরীরের উজ্জ্বল ত্বক অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। শরীরের খাঁজে খাঁজে অজান্তে ময়লা জমেছে। নিজের হাতে-পায়ের নখ, যদিও মাঝে মাঝে নিজেই কেটে নিচ্ছিলেন, আগের মতো ঝকঝকে, আর চন্দ্রকলার মতো সুচারু থাকছিল না। মাঝে মাঝেই বেড়ে যাচ্ছিল, কাটবার দোষে এবড়োখেবড়ো, সামান্য ময়লাও জমছিল বেড়ে যাওয়া নখগুলোর খাঁজে খাঁজে। তাঁর গলা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল, মুখুজ্যাগড়ের তেজ, ঝাঁঝ, প্রভুত্ব। চোখমুখ থেকে খসে পড়ছিল জমিদারগিন্নি-সুলভ যাবতীয় অহং। তাঁর খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, এবং আচার-আচরণের মধ্যে এসে যাচ্ছিল একেবারে নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ আটপৌরে ভাব। এবং এই সবকিছুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাতে, ধীরে ধীরে একসময় তাঁর এটাও বোধগম্য হল যে, এইভাবে একা একা বোবার মতো বাঁচাটা প্রায় অসম্ভব। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পাশটিতে মানুষ চাই। কথা বলবার, কথা শুনবার, সুখদুঃখের ভাগ নেবার মতো মানুষ। কেন কি, মানুষ বিহনে মানুষ বাঁচতে পারে না।

সেই বিকেলে শিখাবউদির সঙ্গে মনের আশ মিটিয়ে গল্প করলেন মন্দাকিনী।

প্রায় পুরোটাই রত্নহীরার ভাই মৃদুলকে জব্দ করবার গল্প।

সন্ধে গড়িয়ে এল, আঁধার নামল; বকদিঘির পাড়ের কচুবনের দিক থেকে মশার দল পিলপিল করে ধেয়ে এল মন্দাকিনীর দিকে, হুল ফুটিয়ে সংঘটিতভাবে মৃগয়া করতে লাগল দুটি শরীরের ওপর, কিন্তু মন্দাকিনীর বুঝি তিলমাত্র হুঁশ নেই। গল্প-গল্পে এমনই বুঁদ হয়ে ছিলেন তাঁরা ওই সন্ধ্যায়, বাড়ির দাওয়া থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সারা হয়ে গেল কুন্দ, কিন্তু মন্দাকিনীরা শুনতেই পেলেন না।

মন্দাকিনীর আচমকা শিখাবউদিকে দেখে অতখানি গদগদ হওয়ার পেছনে সম্ভবত গুটিকয় মুখ্য ও গৌণ কারণ ছিল। শুধু বাঁধন-ছেঁড়া হাসিই নয়, মেয়েটার আন্তরিকতা, কথা বলবার সাবলীল ভঙ্গিতে ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হচ্ছিলেন মন্দাকিনী। মেয়েটাকে একটু একটু করে খুব ভালো লেগে যাচ্ছিল তাঁর। কোনও বিষয়েই ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই মেয়েটার। মুখে মনে একেবারেই এক। তাছাড়া, সে হল

ও-ই তেজস্বিনী, যে কিনা রত্নহীরার মতো শহুরে মেয়ের যাবতীয় অহংকে এক রাতেই একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছেড়েছে। একেবারে যাকে বলে থোঁতা মুখ ভোঁতা। রত্নহীরার মতো খাণ্ডার মেয়েকে টিট করেছে যে মেয়ে, তাঁকে মন্দাকিনীর পছন্দ না হয়ে যায়?

বিদায়কালে আচমকা মন্দাকিনী, সেই প্রথম, একটি স্বভাববিরোধী কম্মো ঘটিয়ে বসলেন একেবারে কুন্দর সুমুখেই। শিখাবউদির হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে ভরে নিয়ে খুব নরম গলায় বললেন, দিদিমা বলিয়া যখন ডাকলি মেয়া, দিদিমার কাছে রোজ চলিয়া আইস্‌বি। বুড়িটা কেমন আছে, মরিয়ালো না বাঁচিয়া আছে, দেখিয়া যাবি।

শিখাবউদি বলে, আসব দিদিমা, নিশ্চয়ই আসব।

—এখানে আসা অবধি কথা বলবার একটা মানুষ পাচ্ছিনি। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে, বল্?

এবং শিখাবউদি, তখনই আচমকা দেখতে পায় মন্দাকিনীর চোখ দুটো সামান্য ছলো ছলো লাগছে। গলাটাও কেমন ভেজা ভেজা।

শিখাবউদি বলে, কী যে বল তুমি দিদিমা, তোমার চারপাশের পাড়াগুলোতে কত কত মানুষ, আর তুমি বলতিছ কিনা কথা বলবার মানুষ পাচ্ছনি!

মন্দাকিনী খুব অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন শিখাবউদির দিকে। ওকে কী করে বোঝান, ও যাদের কথা বলছে, তাদের সঙ্গে তাঁরা খোসগল্প তো দূরের কথা, ভালো করে কথাটা বলতেও অভ্যস্ত নন কোনওকালেই। যারা তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভয় পেয়েছে চিরটাকাল, তাদের সঙ্গে তিনি গল্পগুজবে মেতে উঠবেন কেমন করে? তিষ্টায় ছাতি ফাটিয়া যাচ্ছে বলে যমুনা খালের ঘোলা জল আঁজলা-আঁজলা খাইয়া লিবা চলে?

শিখাবউদি বুঝি মন্দাকিনীর মনের কথা আন্দাজ করে নিতে পারে। খুব আন্তরিক গলায় বলে, কথা বলে দ্যাখো না ওদের সঙ্গে। ওরা মানুষ খাবাপ নয়।

মন্দাকিনী তো তখন দু'হাত নেড়ে বারণ করবার মতো অবস্থাতেই নেই। দিনভর, রাতভর বোবার মতো থাকতে থাকতে তাঁর তখন পাগল হওয়ার জোগাড়। কাজেই, শিখাবউদির কথার জবাবে মৌনই থাকেন তিনি। শিখাবউদি সেটাকে সম্মতির লক্ষণ বলেই ভেবে নেয়। ফলে, পরের দিন বিকেলে সে সঙ্গে নিয়ে আসে গুচ্ছাতপাড়ার জনা দু'তিন বউকে।

তারা কি সহজে আসতে চায়? মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামার সঙ্গে গল্প করা তো কোন্ দূরের কথা, তাঁর সামনেটিতে গিয়ে দাঁড়াতেই যে বুকের মধ্যে শুকনো বাঁশপাতার মতো কাঁপন শুরু হয়ে যায়। তাও শিখাবউদির বারংবার তাগিদেই ভয়ে ভয়ে আসে দু'একজন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মেঝের ওপর থাবড়ে বসে পড়ে। মাথায় ঘোমটা টেনে দেয় লম্বা করে। খুব জড়সড় হয়ে মিনমিনে গলায় দু'চারটে কথা-টথা বলে। তাও শিখাবউদি সঙ্গে ছিল বলে মন্দাকিনীর বিকেলটা অনেকদিন বাদে এরকম করে কাটে।

যাবার সময় শিখা ওই বউগুলোকে প্রায় হুকুমের ঢং-এ বলে দেয়, তোরা রোজ সকাল-বিকাল আসবি দিদিমার কাছে। কাজেকর্মে ওকে একটুখানি সাহায্য করে দিবি। একা মানুষ থাকেন...।

আর, অবাক কাণ্ড, পরের দিন সকালেই দু-একটা বউ পা ঘসতে ঘসতে এসে হাজির।

তারা মন্দাকিনীর ঘরদোর ঝাঁটপাট দেয়, বিছানাপত্র রোদে মেলে দেয়, উঠোনটা পরিপাটি করে নিকিয়ে দেয়। মন্দাকিনীকে কিছুই বলতে হয়নি। ওরা নিজেরাই করণীয় কাজগুলো নির্বাচন করে ফেলতে থাকে।

দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর দু'চোখে অতুল বিস্ময়! আশ্চর্য, সারাজীবনে যাদের একদিনের জন্যও সামান্যতম ইজ্জত দেননি তিনি, মিষ্টি গলায় কথাও বলেননি একটিবারের তরে, এমন কি, কস্মিনকালে করুণার যোগ্য বলেও মনে করেননি, তারাই কেমন তাঁর সুখসুবিধার জন্য, একটুখানি আরামের জন্য, নিজেদের থেকেই প্রাণপাত করছে! এরা বাস্তবিক কী জাত, বিছানা-বালিশ ছোঁয়ার যোগ্য কিনা, খাওয়ার জলের কলসিটাকে যে হাত দিয়ে সরিয়ে ঝাঁট দিল, ওই জল খেলে পরে মন্দাকিনীর কতটা জাত যাবে,

ওই মুহূর্তে সেসব কথা মনেই এল না তাঁর। তিনি কেবল সারাক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই রোগা-ময়লা মেয়েগুলোকে অতুল বিস্ময়ে দেখে গেলেন।

তারপর থেকে, শিখাবউদি তো আসতই রোজ, ওর সঙ্গে গুচ্ছাতপাড়ার বউগুলোও নিয়মিত মন্দাকিনীর বাড়িতে আসতে লাগল। দিনকতকবাদে, সে-ও শিখাবউদির উদ্যোগে, দলুইপাড়ার মেয়েরাও। যতই দিন যাচ্ছিল, একটু একটু করে আড় ভাঙছিল ওদের। মন্দাকিনী যে ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কন, তাতেই বুঝি মনে মনে কৃতার্থ ওরা। মন্দাকিনী লক্ষ করছিলেন, তাঁর সুখসুবিধের দিকে সারাক্ষণ কত নজর এদের! এরা কেন এমনটা হল, কী করেই বা এমনটা হতে পারল, বুঝে পান না মন্দাকিনী।

মন্দাকিনী বিস্ময়ে গদগদ হয়ে শিখাবউদিকে বলেন, এদের তো বেশ আড় ভাঙছে রে, শিখা! আমার তো দেখিয়া বেশ অবাক লাগছে!

শিখাবউদি হেসে বলে, ওদের যে আড় ভাঙবে তা আমি জানতাম, দিদিমা। আমার ভয় ছিল তোমাকে। তোমার আড় ভাঙতে ক'যুগ লাগবে, সেই ভাবনায় মরছিলাম আমি।

বাস্তবিক, মন্দাকিনীর সেই নিবিড় একাকীত্বের দিনগুলিতে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্য-সাহচর্য দিয়েছিল শিখাবউদি। তখনও অবধি তার জীবনে কোনওরূপ দুর্যোগ নেমে আসেনি। তখনও অবধি বল্লভদা তাকে পরিত্যাগ করে বেলদা বাজারে ঘর ভাড়া করে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতেনি। তখন গোটা পাড়ায় বেশ দাপটের সঙ্গেই ছিল সে। জমিদার-গিন্নির রোষে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় যখন আমাদের পাড়ার অধিকাংশ বউ-ঝিরা মন্দাকিনীকে এড়িয়ে চলত, শিখাবউদি তখন তাঁর সঙ্গে একেবারে বেপরোয়াভাবে মেলামেশা করত। বিকেলটি হলেই সেজেগুজে নিজেই চলে যেত মন্দাকিনীর বাড়িতে। আর, মন্দাকিনীর তখন এমনই অবস্থা, দিনান্তে দুটো কথা বলবার মতো মানুষজন পেলে সেটা হয় আকাশের চাঁদ পাওয়ার সামিল। কাজেই, শিখা বউদির মতো একজন কথাপটিয়সীকে পেয়ে গিয়ে একেবারে বর্তে যান মন্দাকিনী, পারলে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে বসান শিখাবউদিকে।

তারপর তো একদিন শিখাবউদির কপাল পুড়ল। বল্লভদা বেলদা বাজারে বাড়ি ভাড়া নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে লাগল। পৈতৃক জমিজিরেতগুলোকে বেচে দিয়ে ওই টাকায় জমি কিনল বেলদায়। ততদিনে শিখাবউদিকে টাকাপয়সা দেওয়া একবারেই বন্ধ করে দিয়েছে সে। শিখাবউদি, একমাত্র ছেলে বাবুনকে নিয়ে অকুলপাথাবে। জমিজিরেত বলতে কিছুই নেই। বাড়িটিরও ভগ্নপ্রায় দশা। তখন মা-বেটার মাঝে মাঝেই না খেয়ে দিন কাটে। সে এক আলাদা বৃত্তান্ত।

তখন সন্ধিপুর গাঁয়ের রাজনৈতিক ছবিটি এই রকম। দেশে জরুরি অবস্থা চলার দরুন হিরণ্ময় মুখুজ্যার যারপরনাই দাপট। সুযোগ বুঝে গজানন ঢুকে পড়েছে কংগ্রেসে। হিরণ্ময়ের ডানহাত সে। হাত দিয়েই মাথা কাটাতে চায় বিরোধীদের। ততদিনে নন্দ গুচ্ছাতেরও বয়েস হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে। আমার ছোটকাকা শ্রীকান্ত দত্তই কেবল সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজকর্ম করে।

আমি তখন পাশ করে মেদিনীপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ জমাবার চেষ্টা করছি। ছোটকাকাই আমার প্রথম মক্কেল। কারণ, বামপার্টি করে বলে হিরণ্ময় আর গজানন মিলে তার নামে একাধিক মিথ্যে মামলা করিয়েছে থানাকে দিয়ে। তখন কল্পনাথ পুরোপুরি নকশাল। বিহারের কোন্ প্রত্যন্ত এলাকায় নাকি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করছে সে। দীর্ঘকাল সন্ধিপুরে আসে না। লোক্যাল পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সেই সময়টাতে শিখাবউদি যে কবে-কবে বামপার্টির কাছাকাছি চলে এসেছে, আমরাও ততটা বুঝতে পারিনি।

ততদিনে আর কেবলমাত্র গৃহবধূটি নেই সে। সন্ধিপুরের বাম-রাজনীতিতে একটু-একটু করে সেঁধিয়ে পড়েছে কবে কবে। ততদিনে পল্টুদাকে নিয়ে বল্লভদার সঙ্গে তার মন কষাকষি একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। বল্লভদা বেলদাবাজারে বাসা নিয়ে একা একা থাকে।

একদিন সন্ধের মুখে আচমকা খুব ঝড়বৃষ্টি হল। ঝড় থামতেই গুচ্ছাতপাড়া আর দলুইপাড়ার দু'দিক

থেকে দু'জন এসে হাজির। কি? না, যাই, দেখি, কত্তামার বাড়িঘর ঠিকঠাক আছে কিনা?

দিনকয় বাদে আচমকা ভাইবউয়ের অসুখের খবর পেয়ে কুন্দ সন্ধের মুখে সাত-তাড়াতাড়ি চলে গেল পাশের গাঁয়ে ভাইয়ের বাড়িতে। একটু বাদে পাড়ার দু'তিন দিক থেকে দু-তিনজন মেয়ে এসে হাজির। কী? না, কুন্দ তো চলিয়ালো, যাই, কত্তামার কোনও কিছুর দরকার কিনা, রাত্তিরে কারুকে থাকতে হবে কিনা জানিয়া আসি।

মরসুমের প্রথম ঝড়ে কাঁচা আম ঝরে পড়ল গাদা গাদা। পরের দিন গুচ্ছাতপাড়ার মেয়েরা ঝুড়িভর্তি আম নিয়ে হাজির। মন্দাকিনী নাকি ওই দিয়ে আচার, আমসি ইত্যাদি বানিয়ে নিতে পারবেন। কুন্দকে দিয়ে ছিলিয়ে নেবেন। হুকুম করলে তারাও দুপুরে-দুপুরে এসে আম ছুলে দিতে রাজি।

মন্দাকিনী হামলে পড়ে বলেন, সেই ভালো। কুন্দটা একলাটি এতগুলা আম ছুলিয়া উঠতে পারবেনি। তদের আম, তোরাই ছুলিয়া দিয়া যা।

জটিলা, প্রমীলা, সন্ধ্যার দল কিস্তিতে কিস্তিতে এতগুলো আম দিয়ে গেছে, আমসি-আচার বানিয়ে দিলে মন্দাকিনীর দশ বছর চলে যাবে, কেন কি, এই বয়েসে কত আর আচার খাবেন তিনি! তবুও যে মন্দাকিনী একটুখানি রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দেননি, পুরোটাই ছুলাতে চাইলেন, তার একমাত্র কারণ হল, এতদ্দ্বারা জটিলা-কুটিলা-সন্ধ্যা-পঞ্চমীর দল ফি-বিকেলে ভিড় জমাবে মন্দাকিনীর দুয়োরে। অন্তত হপ্তাটাক আর প্রবল একাকীত্বে ভুগতে হবে না মন্দাকিনীকে। বাস্তবিক, তখন তো তিনি সারাক্ষণ নিজের চারপাশে একেবারে মরিয়া হয়ে মানুষ চাইছেন।

যারা ডাকলেই দৌড়ে এসে কাজকর্ম করে দিচ্ছিল, এদের সঙ্গেই ধীরে ধীরে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে মন্দাকিনীর। কেন জানি, এদের আর কিছুতেই ব্রাত্য, কিংবা মেলামেশার অযোগ্য বলে ভাবতে পারছিলেন না তিনি। বরং কিছুদিন যাবৎ কেবলই মনে হচ্ছিল, এদের সঙ্গে মিশে যা আনন্দ, তার কানাকড়িও বুঝি নিজের সমাজের মানুষগুলির সঙ্গে মিশতে গিয়ে পাননি এতকাল। তারা তো চিরকালই নিজেদের ঢাম দেখাতে আসত। গল্প মানেই তো নিজের গুণের কথা আর অন্যের দোষের কথা সাতকাহন করে বলা, আর সারাক্ষণ গল্পগুজবের নামে পরচর্চা করা। এছাড়াও, তাদের চোখেমুখে মন্দাকিনী সারাক্ষণ দেখেছেন তাঁর প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। আসত, বসত, গল্প করত, কিন্তু মন্দাকিনী সারাক্ষণ অনুভব করতেন, ওঁর সামনে সম্পন্ন বাড়ির মেয়েগুলো একধরনের হীনমন্যতায় ভুগত সারাক্ষণ। সেই হীনমন্যতা থেকে জন্ম নিত এক জাতের বিদ্বেষ। মন্দাকিনীর দৃষ্টি এড়াত না তা। গা ভর্বতি দামি শাড়ি আর গয়না, পরে, সুখের পায়রাগুলি ঘুরে বেড়াত মন্দাকিনীর চারপাশে। মন্দাকিনী প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন, শিষ্ট আচরণের আড়ালে তাদের বুকভর্তি কেবলই কটু বিষ। যেহেতু তিনি জমিদারের মেয়ে, জমিদারের বউ, ওরা তাঁকে সামনে কখনোই ঘাঁটাত না। কিন্তু মন্দাকিনী বুঝতেন, পেছনে তাঁর পিণ্ডি চটকাত প্রাণের আশ মিটিয়ে। সামনে প্রশংসায় ভরিয়ে তুলত, আড়ালে গিয়েই দ্বিগুণ পরিমাণ নিন্দা করত। যাদের কাছে বলত সেসব, তাদেরই দু'একজন, যারা মন্দাকিনীর থেকে বিশেষ করুণা প্রত্যাশা করত, লুকিয়ে এসে সেসব কথা ঢেলে দিয়ে যেত মন্দাকিনীর কানে। কখনও নিন্দুক মেয়েটি স্বয়ং এসে ভালোমানুষটি সেজে তার নিজের বলা কথাগুলি অন্যের মুখে বসিয়ে মন্দাকিনীর কানে তুলে দিয়ে যেত। বাস্তবিক, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে মন্দাকিনীকে সারাক্ষণ চোখ কান খোলা রাখতে হত, কে সত্যি কথাটি বলছে, কেই বা স্রেফ বানিয়ে বলছে, কিংবা প্রচুর রঙ চড়াচ্ছে। কে আন্তরিক আচরণ করছে, কেই বা স্রেফ অভিনয় করে চলেছে। কে গল্পগুজব করতে এসেছে, কেই বা মন্দাকিনীদের জ্ঞাতিশত্রুর চর হয়ে খবর জোগাড় করতে এসেছে। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে মেলামেশার আনন্দটাই ঘুচে যেত, মন্দাকিনীর। তার বদলে মগজের ওপর চাপ পড়ত নিদারুণ। সবাইয়ের প্রতি সন্দেহ জাগত সারাক্ষণ।

কিন্তু এইসব পাড়ার বউ-ঝিগুলো তো মোটেই তেমনটা নয়। মন্দাকিনীকে ঈর্ষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না ওদের, বরং নিজেদের সারাক্ষণ করুণার যোগ্য বলে ভাবতেই অভ্যস্ত এরা। আর এদের বুকের মধ্যে কত মমতা! সব ব্যাপারে কত বিবেচনা! কত দায়িত্ববোধ! আর, অল্পেতেই কতই না ভালোবেসে

ফেলতে পারে যে-কাউকে। কাজেই, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এরাই, সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে একটু একটু করে হয়ে উঠল মন্দাকিনীর গল্পগুজবের সঙ্গিনীও। সসম্ভ্রমে গল্পগুজব করে, সসম্ভ্রমে উঠে যায়। আনাগোনার ফাঁকে ফাঁকে আগ বাড়িয়ে খোঁজখবর নেয়। তাদের গলা থেকে ঝরে পড়ে আন্তরিকতা। কৃতজ্ঞতাও। কেন কি, এত বড় বংশের মেয়ে হয়ে মন্দাকিনী যে তাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন, গল্পগুজব করছেন, এতেই বুঝি কৃতার্থ ওরা, গদগদ।

দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর কেবলই মনে হতে থাকে, এদের সঙ্গে মেলামেশা করে অবলীলায় কাটিয়ে দিতে পারেন বাকি জীবনটা। কী দরকার তাঁর নিজের সমাজের পাটোয়ার মানুষগুলির সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য হেদিয়ে পড়বার? তারা তো তাঁকে খুব প্রতিদান দিয়েছে! সুদিনে এল-গেল, ভালোমন্দ খেল-দেল, সুযোগসুবিধে আঁচল ভরে নিল, পদে পদে তুষ্টিতে, প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে লাগল, কিন্তু যেই না মন্দাকিনীর কপালটি ফাটল, অমনি নিঃশব্দে কেটে পড়ল। ওদের একজনও তো বারেকের তরে তাঁর ভিটে মাড়ায়নি এই ক'মাসে, কোনও খোঁজখবরই তো নেয়নি।

বরং কুন্দ মারফত মন্দাকিনী শুনতে পান, ইদানীং নাকি রত্নহীরার সঙ্গে ওদের বড়ই দহরম-মহরম হয়েছে। এমনই নেমকহারাম ওরা। অথচ এই এরা? সুদিনে পাশ ভিড়তে পারেনি, অথচ এখন মন্দাকিনীর ঘোর দুর্দিন, কারোর কোনও উপকার করবার ক্ষমতাই নেই এখন, অথচ এরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে তাঁকে। তাঁর সঙ্গে একটুখানি মিশবার জন্য সারাক্ষণ বুঝি ব্যাকুল। তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য এরা আন্তরিকভাবে দুঃখবোধ করে।

এইসব ভাবতে ভাবতে, মন্দাকিনী বুঝতে পারছিলেন, এই গরিব-গুরবো মানুষগুলি একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তাঁর বুকের মধ্যে, দখল করে নিচ্ছে বুকেব ভেতরকার অনেকখানি জায়গা। ফলে, সুদিনে যাদের সঙ্গে পারতপক্ষে বাক্যালাপ করতেন না, তাদের সঙ্গেই, ডেকে ডেকে, আগ বাড়িয়ে ভাব করতে থাকেন মন্দাকিনী। এবং তারাই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে তাঁর সময় কাটাবার সখি সঙ্গিনী।

দিনের পর দিন এমনটা করবার ফলে, একটু একটু করে সাহস পেয়ে চাষিবাড়ির বউড়ি-ঝিউড়িরাও আরও বেশি বেশি করে হাজির হয় মন্দাকিনীর দুয়োরে। ওদের এমন আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ করেন মন্দাকিনী, এমন খোসগল্প জুড়ে দেন-ওদের সঙ্গে, দেখতে দেখতে ফি-বিকেলে তাঁর উঠোন ভবে যেতে থাকে তেমন মানুষে, যাদের হয়ত বা এককালে স্বয়ং মন্দাকিনীই ছোটলোক ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না।



আসল গোলটা বাধল দুর্গাপূজার সময়ে।

মুখুজ্যাগড়ে প্রতি বছর দুর্গাপূজাটা খুব ধূমধাম কবে হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। তখন অবধি সাপ্সা সন্ধিপুর গাঁয়ের সবচেয়ে জমজমাট উৎসব বলতে ওটাই। যদিও আমাদের ছেলেবেলায় ওটা ছিল একেবারেই মুখুজ্যাবাবুদের ব্যক্তিগত পারিবারিক পুজো, কিন্তু তাও সারা গ্রামের মানুষ গোটা বছর ধরে ওই দিনক'টির জন্য চাতক পাখির মতো উদগ্রীব হয়ে থাকত। বাবুদের বাড়ির পুজো, কিন্তু ওই উপলক্ষ্যে আমাদের গাঁয়ের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির ঝি-ঝিউড়িরা বাপের বাড়ি আসত ফি-বছর। আর, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাড়ির বাচ্চাগুলোর বুঝি আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা থাকত না। অন্যের বাড়িতে পুজো, কিন্তু তাই নিয়ে আমাদের মনে পুলকের অন্ত নেই। কৌতূহলও অগাধ। আর, সেইসব কৌতূহলের জবাব পেতে একমাত্র ঝংকারই ভরসা।

নিত্যিদিন তাই ঝংকারকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলি। পুজোর প্রস্তুতিপর্ব, ঝাড়পুছ কদ্দুর এগোল, বাজারহাটের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে, কুটুমবাটুমরা কে-কে এসে পড়েছে, আরও কে-কে আসবে, ক'রাত পালাগান হবে, কোন্ কোন্ অপেরা আসছে, ...হাজার প্রশ্নে ওকে একেবারে উত্যক্ত করে তুলি। কিন্তু এমনই ঠাণ্ডাধাতের ছেলে ঝংকার, বিরক্ত তো হতই না, বরং আমাদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব

দিতে ভালোইবাসত সে। বেশ জাঁক করেই বলত সেসব। কোনওদিন আমরা পড়ার চাপে ওই নিয়ে খোঁজখবর নিতে ভুলে গেলে ঝংকারই নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দিত ঘটনার একেবারে সাম্প্রতিকতম পর্যায়টি।

তখন আমাদের গাঁয়ে উৎসব-পার্বণ বলতে, ...প্রাইমারি স্কুলে সরস্বতী পুজো হত, মাঘ-ফাল্গুনে ভীম একাদশীর মেলা, চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন, আর নিচু সম্প্রদায়ের মানুষেরা করত বড়াম পুজো। এছাড়া, ফাগুন-চৈত্রে গাঁয়ে-ঘরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে শীতলার পুজো হত। তিনদিনের পুজো সেটা। তার মধ্যে এক রাতে পালাগান হত। তবে বড়াম পুজো, ভীম একাদশী, আর শীতলা পুজোতে গ্রামের গরিব-গুরবো, ব্রাত্য মানুষজনেরাই বেশি সামিল হত। বাবুদের কিংবা বাবুতুল্য পরিবারগুলো ওই সব পুজোতে চাঁদা-টাঁদা দিতেন, কিন্তু বড় একটা গা-ঘষাঘষি করতেন না। কাজেই, ওই পুজোগুলো আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে বড় একটা প্রাণের উৎসব ছিল না কোনওকালেই। আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল দুর্গাপূজার। পুজোর ক'দিন কেবল যে বাবুবাড়ির পুজোমণ্ডপের আনাচে কানাচে খেলে বেড়াতাম তাই নয়, ফি-বছর অষ্টমীর ভোগও পেতাম আমরা। সেই ভোজে শেষপাতে পায়েসও থাকত। এছাড়া, পুজোর কদিন রোজ রাতে আসরের সামনের দিকে বসে পালাগান শোনা, সেও এক বিরল অভিজ্ঞতা। অনেক আগে নাকি চারপাশের সব গাঁয়ের মানুষের জন্যই পাত পড়ত অষ্টমীর রাতে, পরবর্তীকালে শুধু সন্ধিপুর গাঁয়ের এবং পাশের গাঁয়ের নির্দিষ্ট কিছু নিমন্ত্রিত মানুষেরই পাত পড়ে। আমাদের ছেলেবেলায় ওই সংখ্যাটাও কিছু কম ছিল না। তারপর জমিদারি চলে গেল, ভেস্ট হয়ে গেল বহু জমি। বাবুদের বাড়ির দুর্গাপূজার রমরমাও কমে গেল।

তারপর তো সত্তরের দশকে একদিন হিরণ্ময় মুখুজ্যা গাঁয়ের মানুষকে ডেকে কৌশলে পুজোটাকে সার্বজনীন করবার প্রস্তাব দিলেন। সে অন্য প্রসঙ্গ।

মন্দাকিনী যে-বছর মুখুজ্যাগড় থেকে চলে এলেন বকদিঘির নতুন বাড়িতে, কয়েক মাস বাদেই দুর্গাপূজা বাবুদের বাড়িতে, আমাদের বুকের ভেতরটা তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লেগেছে, কেবলই দিন গুণি, কবে বাবুদের প্রতিনিধি হিসেবে দাশরথিকাকু এসে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন জানিয়ে যায়। আমরা মধ্যবিত্তবাড়ির বাচ্চারা সারাক্ষণ ঝংকারকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দিই, কিন্তু ঝংকারের মনে ওই নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাসই নেই। বরং পুজোর প্রসঙ্গ তুললেই, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

কারণটা বের করল কল্পনাথ। ঠাকুরমা বিহনে এবারের পুজোতে প্রাণ খুঁজে পাচ্ছে না সে। ফি-বছর মন্দাকিনীর কোলে বসে বসে পালাগান শুনতে শুনতে, পালাগানের সবকিছু মানে-বইয়ের মতো প্রাঞ্জল করে বুঝে নিতে নিতে কখন জানি মন্দাকিনীর কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত। মাত্তর শেষ দু'বছর বড়দের মতো আসরে বসে পালাগান দেখেছিল। ঠাকুরমা বিহনে পুজোর আনন্দটাই মাটি হতে বসেছে তার।

দুর্গাপূজার ক'দিন আগে হিরণ্ময় এলেন মন্দাকিনীর দুয়ারে।

বললেন, পূজার কদিন গড়ে গিয়েই থেকো। তোমাব বউমা বলিয়া পাঠাল।

মনে মনে বিষহাসি হাসতে থাকেন মন্দাকিনী। হিরণ্ময়ের শেষের কথাটা যে ডাহা মিছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। বলেন, ঘরসংসার ছাড়িয়া অতদিন কি রইতে পারব বাপ? আমি একদিনই যাব।

একটুক্ষণ গুম মেরে রইলেন হিরণ্ময়। এক সময় বললেন, বেশ। অষ্টমীর দিনই যেও তাহলে।

মন্দাকিনীও একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। একমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন শরতের আকাশে তুলোপেঁজা মেঘের খেলা।

একসময় সরাসরি হিরণ্ময়ের চোখে চোখ রাখেন। বলে, যাব, তবে আমি কিন্তু মাঝি-গুচ্ছাতপাড়ার লোকজনের সঙ্গেই গিয়া বুসব গোয়ালঘরের বারান্দায়। তাতে তোর আবার মান চলিয়াবেনি তো, বাপ?

মন্দাকিনীর কথায় একেবারে থ' হয়ে যান হিরণ্ময়। উঠে দাঁড়ান। থমথমে গলায় বলেন, থাক। তুমাকে আর যাইতে হবেনি।

খুব ঠাণ্ডা গলায় মন্দাকিনী বলেন, সেই ভালো।

সেই বিকেলে, সূর্য তখন কমলালেবুর রঙ ধরেছে, বকদিঘির পাড় জুড়ে খয়েরি কাঁকরের জাজিম পাতা, মধ্যে মধ্যে সবুজ ঘাসের ছোপ, ওইরকম সবুজ ঘাসের একচিলতে জাজিমের ওপর শেষবেলায় উপোসী বকের মতো স্থির হয়ে বসে ছিলেন মন্দাকিনী, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জলের দিকে।

আমি ফিরছিলাম স্কুল থেকে।

হঠাৎই বুঝি আমার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙে তাঁর। চিনি-চিনি ভাব করে তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে। দেখতে পান, একটা কালো রঙের বাচ্চা কাঁধে বইখাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছে সামনের সরু রাস্তা দিয়ে।

মন্দাকিনীর মাথার মধ্যে তখন বুঝি সদাসর্বদা জ্বলতে থাকা আগুনের কুণ্ডটি একটু একটু করে নিভছে। সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবার চণ্ডবাসনাগুলি বুকের মধ্যে থিতোতে লেগেছে সবে। মুখ ফিরিয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন তিনি।

ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। আমার দিকে কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে এক সময় বলে উঠলেন, অ্যাই, কাদের বাড়ির ছেলে রে তুই?

যতই না কেন আটপৌরে হয়ে গিয়ে থাকুন, যতই না কেন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করুন, ওই বয়সেও আমি জেনে গিয়েছি, তিনি মুখুজ্যাগড়ের বড়গিন্নি। কাজেই চোখেমুখে সম্ভ্রম ফুটিয়ে তাকাই ওঁর দিকে। বলি, দত্ত-বাড়ির।

আমার দু'চোখে যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভ্রম ছিল। তাই দেখে বুঝি মনে মনে খুশিই হন মন্দাকিনী। বেশ ভারিক্কি গলায় বলেন, শুন্, এদিকে আয়।

পায়ে পায়ে ওঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াই।

আমার পুরো শরীরটাকে পা থেকে মাথা অবধি চোখ দিয়ে জরিপ করে এক সময় মন্দাকিনী শুধোন, দত্তদের বাড়ির কার ছেলে তুই? নাম কি তোর?

—শঙ্কর।

—বাপের নাম কি?

ভয়ে ভয়ে বলি, রতিকান্ত দত্ত।

—ও। রতিয়ার ব্যাটা তুই? ইস্কুলে পড়িস? মন্দাকিনীর দু'চোখে বিস্ময়।

মাথা নেড়ে সায় দিই।

—সুহাসী তোর কে হয়?

—পিসি। বড়পিসি।

আবার একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনী। এক সময় শুধোন, তোরা তো কায়েত? নাকি সদগোপ?

—আমরা কায়স্থ।

—ইস্! কায়স্থ! বলতে বলতে মন্দাকিনীর ঠোঁট অজান্তে ভেঙে যায় বুঝি। বলেন, ছিলি চাষা, বাড়ির টঙে টিন পিটিয়া এখন কায়স্থ!

বলতে বলতে এতক্ষণে বুঝি সামান্য হাসি জমে মন্দাকিনীর ঠোঁটের ডগায়। বলেন, অ্যাই, তোর পিসি তো ভালো কেয়া-খয়ের বানায়। বানায় না?

—মাথা নেড়ে সায় দিই।

—সবার কাছে খুব নাম শুনি তোর পিসির কেয়া-খয়েরের। বলতে বলতে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মন্দাকিনীর মুখ।

এটা ঠিক। কেয়া খয়েরটা ভালোই বানায় বড়পিসি। খেয়ে খুব নাম করে সবাই। বানাবার প্রক্রিয়াটাও আমার জানা। বাজার থেকে কিনে আনে খয়েরের ঢেলা। আগের রাতে ভিজিয়ে রাখে জলে। মৌরি, ধনে, এলাচদানা, দারচিনি, লবঙ্গ, কেয়া ফুলের পরাগ-রেণু হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে রাখে। খয়েরের ঢেলা রাতভর জলে ভিজে নরম হয়ে যায়। তাতে মসলার গুঁড়ো মিশিয়ে আচ্ছা করে চটকে নেয়

বড়পিসি। তারপর কেয়া ফুলের লম্বাটে একটি পাপড়ি বেছে নিয়ে খানিকটা খয়েরের মণ্ড তার মধ্যে পুরে দিয়ে আর একটা পাপড়ি চাপা দিয়ে সুতো দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দেয়। রোদ্দুরে ভালো করে শুকিয়ে নিলেই হয়ে গেল কেয়া-খয়ের। ওরই গুঁড়ো এক চিমটে পানের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ভুরভুরে সুবাস ছাড়বে মুখে। অনেক দূর থেকে মানুষজন পাবে ওই সুবাস। পান শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ মুখে লেগে থাকবে ওই সুগন্ধ।

মন্দাকিনী থিরপলকে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। সারা মুখ যেন মমতার লালায় ভিজে যাচ্ছিল। এক সময় খুব নরম করে হাসেন। বলেন, কলা খাবি? গাছ-পাকা কলা। দাঁড়া, দিচ্ছি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মন্দাকিনী। ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে আসেন একটা প্রমাণ সাইজের পাকা মর্তমান কলা। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, খা।

হাত বাড়িয়ে কলাটা নিই। সসঙ্কোচে খেতে থাকি। খেতে খেতে হাঁটতে থাকি বাড়ির দিকে।

দু-পা না যেতেই পেছন থেকে ডাক দেন মন্দাকিনী। কাছে যেতেই চাপা গলায় বলেন, তোর পিসির পানবাটা থেকে এক তাল কেয়া-খয়ের আনিস তো কাল। কী রে, আনবি তো? চোখ টিপে বলেন, আরো পাকাকলা খাওয়াব তোকে।

একে তো বড়পিসিকে আমি মনে মনে ভয় করি খুবই, তার ওপর আমাকে যে একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে বলা হয়েছে, সেটা মন্দাকিনীর বলবার ধরনেই বুঝে ফেলেছি। খুবই দ্বিধা ছিল মনে, অথচ বিশাল সাইজের পাকা মর্তমান কলা, তার লোভও সংবরণ করা মুশকিল। কোনও জবাব না দিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। রাতভর ভাবলাম বিষয়টা নিয়ে। মন এক পা এগোয় তো দু'পা পেছোয়।

অবশেষে পাকাকলাই জিতল। সকাল বেলায় একফাঁকে বড়পিসির নজর এড়িয়ে তার পানের বাটা থেকে নিঃশব্দে তুলে নিই একটা কেয়া-খয়েরের তাল। যথাসময়ে তুলে দিই মন্দাকিনীর হাতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম একজোড়া মর্তমান কলা। একটা দিলাম কল্পনাথকে, কেন কি, সে আমাকে রানীহাঁস দিঘির পাড় থেকে খুঁজে দেবে বলেছে একখানা মিঠেনুড়ি, যা কিনা নাগাড়ে চুষতে থাকলে মিঠে রস বেরোয়, এবং সমবয়েসী বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র কল্পনাথই চেনে, রাশি রাশি কাঁকরের ভেতর থেকে ওই দুর্লভ জাতের নুড়ি।

কলা পেয়ে কল্পনাথ শুধোয়, কোথা পেলি?

বানিয়ে বানিয়ে বলি, বারীন-মামা এনেছে।

কল্পনাথ কথা বাড়ায়নি, কিন্তু সে যে কথাটা বিশ্বাস করেনি সেদিন, সেটা জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে।

পরবর্তীকালে, লোভনীয় ফুল-ফুলারি-মিঠাইয়ের লোভে আমি বেশ কয়েকবার বড়পিসির পানের বাটা থেকে চুরি করেছি কেয়াখয়ের।



কদিন ধরে আকাশের মুখ বেশ ভার ছিল। রাতের বেলায় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়াও। মন্দাকিনী বিছানায় শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছিলেন বাইরের দাপাদাপি। শুনতে শুনতে ভাবতে থাকেন মন্দাকিনী, আষাঢ় মাস কি পড়ে গিয়েছে? ঠাহর করতে পারেন না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, আকাশটা একেবারে পরিষ্কার। পুব আকাশে সূর্য উঠেছে, আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ।

কুন্দ লক্ষ করে, মন্দাকিনীর সারা মুখে বহুদিন বাদে খেলা করছে আলো-ঝলমলে রোদ্দুর। কুন্দকে ডেকে বলেন, চল্ কুন্দ, একবারটি যতি গুচ্ছাতের বাড়ি থিকে ঘুরিয়া আসি।

কুন্দ বুঝি আকাশ থেকে পড়ে। মন্দাকিনীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। গেল সন্ধের কথাগুলো ভুস-ভুস করে ভেসে ওঠে মনে।

গতকাল সন্ধেবেলায় হিরণ্ময় আচমকা এলেন মন্দাকিনীর ঘরে। সেই দুর্গাপুজোর কদিন আগে এসেছিলেন কয়েক দণ্ডের জন্য, অ্যাদ্দিন বাদে আবার এলেন। অন্ধকারে গা ঢেকে একেবারে চোরের মতো লুকিয়ে এলেন। দাওয়ায় পা দেওয়ামাত্রই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে।

কুশল বিনিময়ের আগেই হিরণ্ময় মন্দাকিনীর ওপর নেন বাঘের ঝাপট, কীসব শুরু করেছ তুমি? মান-মর্যাদা সব যে একেবারে ধুলায় লুটিয়া দিলে। চারপাশের মানুষজনের সামনে মুখ দেখানো দায়। প্রজাতুল্য মানুষেরা সব মুখ টিপিয়া হাসতিছে।

মন্দাকিনী বেশ কিছুক্ষণ থিরপলকে তাকিয়ে থাকেন পেটের ছেলের মুখের দিকে। সারা মুখে খুঁজতে থাকেন অনুতাপ জাতীয় কিছু। এক সময় খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেন, কেন, আমি আবার কী করলাম?

—করতে কী বাকি রেখেছ? ছোটলোকদের সঙ্গে দিনরাত উঠাবসা কচ্ছ। ওদের বউগুলার সঙ্গে সই-সহেলির মতো গা ঘষাঘষি কচ্ছ। ওদের ভাজা মুড়ি, ওদের বাড়ির পানদোক্তা, কেয়াখয়ের আনিয়ে খাচ্ছ, তোমার কি ঘেন্নাপিত্তি বলিয়া কিছুই নাই, মা? কুন বংশের ঝি তুমি, কুন বংশের বউ, ভুলিয়া গেছ সেটা?

খুব মন দিয়ে হিরণ্ময়ের কথাগুলো শুনছিলেন মন্দাকিনী। ততক্ষণে তিনি চিনে ফেলেছেন হিরণ্ময়ের বিপন্নতার জায়গাটাকে। ভেতর থেকে কুলকুলিয়ে ঠেলে উঠতে চায় হাসি। বহু কষ্টে সামলে রাখেন। ভালোমানুষি গলা করে জবাব দেন, ভুলিয়া গেছি রে বাপ, একেবারে ভুলিয়া গেছি। তুই বলাতে এইমাত্তর মনে পড়ল। তো, বল্ দেখি শুনি, অত বড় বংশের ঝি আমি, অত বড় বংশের বউ, আমার কি এমন ঘরে এমন অবস্থায় থাকাটা সঙ্গত?

হিরণ্ময় বুঝি সামান্য অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন, ছেলে-বউয়ের থেকে পৃথক হয়্যা তো অনেকেই থাকে, তাবলে তাদের কি এমনটা হইয়া যাইতে হয়?

খুব অসহায় চোখে মন্দাকিনী বলেন, কী করব বাপ, বাঁচতে তো হবে। ধোপা, নাপিত রাঁধুনি সব বন্ধ করিয়া দিলি তোরা, বাঁচলাম কি মরলাম, একটা খোঁজও নিস না, যেভাবে পারছি বাঁচিয়া থাইক্‌বার চেষ্টা কচ্ছি।

—কেন, ধোপা-নাপিত, রাঁধুনি-মুড়িভাজনি আসে না তোমার ঘরে?

—তুই সে খবরও রাখিস না বাপ? আমি যে বাঁচিয়া আছি, সে খবরটাও বোধ করি ছিল না তোর কাছে!

হিরণ্ময়ের কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। সামান্য ঢোঁক গিলে বলেন,—কিন্তু বংশের মানসম্মানটা রাখবে তো। মাঝি, গলা, সবার হাতে খাচ্ছ, সবার সাথে হা-হা হিহি কচ্ছ, একটা মানসম্মান বোধ নেই তোমার? এতে কবে মান যায় না তোমার, আমার, আমাদের সকলের?

—মান? আমার আর মানে কাজ নাই বাপ। মান এখন মানকচুর মতন সারা গায়ে কুটকুটাচ্ছে।

—তোমার না হয় মান-সম্মানবোধ সবই গেছে, কিন্তু তোমার তরে আমাদের যে মান লিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়।

আচমকা শুকনো খড়ের মতো জ্বলে ওঠেন মন্দাকিনী,—মানসম্মান? তুই বুড়ি-মাকে ঘর থেকে বার করিয়া দিলি, তার ধোপা-নাপিত অবধি বন্ধ করিয়া দিলি, এমন কি তার খাবার জলটুকুও কেউ দিলনি, তাতে তোর মান গেল নি? বেশি কথা বাড়াইসনি, বক্তিতা দিতে হইলে নিজের বউয়ের কাছে গিয়া দে' গা যা। আমি কার সাথে কথা বলতিছি, কার সাথে মেলামেশা কচ্ছি, কার হাতে কী খাচ্ছি, কেমন কবিয়া বাঁচিয়া আছি, তোর দেখবার দরকার নাই।

মন্দাকিনীর রুদ্ররূপ দেখে বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন হিরণ্ময়। এক সময় পায়ে পায়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। গাঢ় আঁধারে শরীরখানা ঢেকে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যান মুখুজ্যাগড়ে।

হিরণ্ময় চলে যাবার পর মন্দাকিনী সারাটা সন্ধে গুম মেরে থাকেন। এমনই গম্ভীব, থমথমে সে মুখ, কুন্দ অবধি কাছেপিঠে ভিড়তে সাহস পায় না'

সে রাতে কুন্দর সঙ্গে একটাও কথা বললেন না মন্দাকিনী। খেলেনও না ভালো করে।

গেল-সন্ধেয় হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর সেই যে মন্দাকিনীর সারা মুখে শ্রাবণের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, সারা সন্ধে স্থায়ী হয়েছিল তা। হিরণ্ময় চলে যাবার পর থেকে সেই যে গুম মেরে ছিলেন, সারা সন্ধে, রাতভর কুন্দর সঙ্গে বাক্যালাপ অবধি করেননি। ভয়ে, আশঙ্কায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে ছিল কুন্দ। আর, রাতটি পোহাতেই তাঁর একেবারে অন্য রূপ। চারপাশের রোদ্দুরের মতো ঝলমলে মুখখানি। একেবারে শিমুল তুলোর মতো হাওয়ায় যেন ভাসছেন কর্তা-মা। কিন্তু তাই বলে তিনি যে আচমকা এমন প্রস্তাবটি করে বসবেন, কুন্দ সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি।

দু'চোখ কপালে তুলে কুন্দ বলে, যতি গুচ্ছাতের বাড়ি যাবেন? আপনি? কেন?

—কেন কি? কুন্দর কথা শুনে আচমকা জ্বলে ওঠেন মন্দাকিনী,—মাগীর কথা শুনো না! বলি, মানুষের বাড়িতে মানুষ যায় না? তাবাদে, পরশু থিকে জটিলাটা কেন আসতিছেনি, জানাটা দরকার তো, না কী? জ্বর-জাড়ি হইল কিনা...।

কুন্দর চোখের তারা স্থির হয়ে থাকে মন্দাকিনীর মুখের ওপর। সহসা বড় দুর্জ্ঞেয় লাগে তাঁকে। তাও মন্দাকিনীকে নিরস্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় সে। বলে, সেটা আমি গিয়া জানিয়া আসতিছি। আপনার যাবার দরকারটা কি? গোটা রাস্তা জুড়িয়া কাদা প্যাচপ্যাচ করতিছে।

—কী কথা যে বলু তুই! মন্দাকিনী বিরূপ হয়ে ওঠেন কুন্দর প্রতি,—আমার দরকারে-অদরকারে, মাথাটি ধরবার খবর কাগের মুখে পাইলেও সে মেয়া দৌড়িয়া আসে, আর তার জ্বর-জাড়িতে আমি লোক পাঠিয়া খবর লিব? তাবাদে বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে কাদা হবে, এ আর কী এমন লতুন কথা।

—জ্বর-জাড়ি যে হয়েছে, সেটাই বা কে বলল আপনাকে?

—কেউ বলেনি, কিন্তু হইতেও তো পারে। চল্ চল্, একটিবার খোঁজ লিয়া আসি। বলতে বলতে পায়ে রবারের সস্তা চটিটি গলিয়ে নেন মন্দাকিনী।

কুন্দ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, গেল-রাতে হিরণ্ময়ের সঙ্গে তুমুল কথা কাটাকাটির পর সারারাত গুম মেরে রইলেন বড়মা, খেলেন না, দেলেন না, কুন্দর সঙ্গে ভালো করে কথাও বললেন না, অথচ রাতটি ফুরোতেই কী এমন পুলকের ব্যাপার ঘটল যে, সাত-সকালেই পাড়া বেড়াতে চললেন, তাও ফের গুচ্ছাতপাড়ায়!

তাও কুন্দ রেগে উঠে বলে, এই কাপড়ে যাবেন নাকি?

—কেন? নিজের পরনের আধময়লা থানটার ওপর এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নেন মন্দাকিনী,—খারাপ কি? আরে, আমি কি বেলদাবাজারে সিনিমা দেখতে যাচ্ছি নাকি? একই পাড়ার মধ্যে যাব...চল্ চল্, ফিরিয়া আইসিয়া আবার রান্না চাপাতে হবে।

কাদা রাস্তায় পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকেন মন্দাকিনী। পিছু পিছু কুন্দ। পথচারী মানুষজন মুখ ঘুরিয়ে দ্যাখে। মুখুজ্যাবাড়ির বড়-কর্তামা, এই সাত-সকালে গুচ্ছাতপাড়ার দিকে যাচ্ছেন কেন, বুঝে উঠতে পারে না কেউই।

আচমকা নিজের উঠোনে মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামাকে দেখে যতি গুচ্ছাতের বাড়ির লোকজন একেবারে হকচকিয়ে যায়। তখন তাঁর একেবারেই খালি পা। কাদা রাস্তায় বারবার চটি আটকে যাচ্ছিল, মাঝপথে পা থেকে খুলে ধরিয়ে দিয়েছেন কুন্দর হাতে। গুচ্ছাতদের উঠোনে যখন পৌঁছুলেন, গোড়ালি অবধি কাদা।

উঠোন থেকে যতি গুচ্ছাতের বউকে ডাক পাড়েন মন্দাকিনী, কী লো জটিলা, ক'দিন দেখা নাই কেন?

জটিলা তার আগেই মন্দাকিনীকে দেখতে পেয়েছিল ঘরের ভেতর থেকে। তড়িঘড়ি চটের আসন নিয়ে দৌড়ে আসে সে। কিন্তু আসন পেতে দেবার আগেই মন্দাকিনী ধপ করে বসে পড়েন দাওয়ার ওপর। বলেন, ভাবলাম, বাঁচিয়া আছু নাকি মরিয়ালু, দেখিয়া আসি।

মন্দাকিনীর পায়ের অবস্থা দেখে আসন ফেলে রেখে অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিটি নিয়ে পুকুরঘাটে ছোটে জটিলা। ঘটিভর্তি জল এনে ঢেলে দেয় মন্দাকিনীর পায়ের ওপর। হাত দিয়ে রগড়ে দিতে থাকে।

মন্দাকিনী হাঁ...হাঁ করে ওঠেন, করিস কি? দে, আমাকে ঘটিটা দে। জটিলার হাত থেকে জলভর্তি ঘটিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে নিজের পা দুটো ধুয়ে নেন।

মন্দাকিনীকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে, ভেবে পায় না বুঝি যতি গুচ্ছাইতের বাড়ির লোকজন।

মন্দাকিনী বসে বসে চারপাশটা জরিপ করতে থাকেন।

খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়িটার সামনে এক চিলতে নিকোনো উঠোন। উঠোনের এক প্রান্তে একটা হাড় জিরজিরে গাই বাঁধা রয়েছে খুঁটোয়। উঠোনটা শেষ হলেই কিছু গুল্মজাতের গাছ। ফুলের গাছ বলেই মনে হয়, কিন্তু কী ফুল সেটা মালুম করতে পারেন না মন্দাকিনী। সামান্য তফাতে একটা খতকুঁড়, তাতে খড়-বিচালি, এঁটোকাঁটা পচছে। একপাল মুরগি বাচ্চাসহ চরে বেড়াচ্ছে খতকুঁড়ের মধ্যে। খতকুঁড়টার পাশেই একচিলতে জমিতে সবজির চাষ। গোটাকয় বুড়ো বেগুন গাছ, লঙ্কাগাছ, সারবিহনে করুণ অবস্থা ওদের। লঙ্কাগাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে গিয়েছে। বেগুনের পাতাগুলোতে হলদে ছোপ পড়েছে। সবজি খেতের লাগোয়া একটা গুঁড়ি-পেয়ারার গাছ। তাতে ঝেঁকে পেয়ারা ধরেছে। লাটিমের মতো ছোট ছোট ফল। গাছটার মগডালে একটা কাক বসে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে।

যতির বউ জটিলা 'হু...শ' গোছের শব্দ করে কাকটাকে তাড়ায়। কাকটা উড়ে গিয়ে একেবারে বেড়ার লাগোয়া বুড়ো আমগাছটার ডালে গিয়ে বসে।

জটিলা কাকটাকে দেখে হাসতে থাকে। বলে, কী? পেটের জ্বালা উঠছে? বলে নিজেরা কী খাই তার ঠিক নাই, গুরু-ঠাকুরের তরে খাইদ্য চাই এই সাত-সকালে!

কাকের সঙ্গে এমন তুই-তোকারি করে কথা বলতে দেখে মন্দাকিনী জটিলার দিকে তাকান। বলেন, কাকটা তোদের পোযা নাকি রে?

এমন কথায় বুঝি মজা পায় জটিলা। বলে, হ্যাঁ, আমাদের সাত-পুরুষের গুরু-ঠাকুর। সক্কালটি হইলেই চলিয়া আসে। খাবারের তরে বায়না ধরে। বলেই কাকটার দিকে তাকায় জটিলা। বলে, কাল যে অতগুলা মাছের আঁশ, কানকো, নাড়িভুঁড়ি খাইলু? সেগুলা আগে হজম হউ।

একটা কাকের সঙ্গে এমনতরো কথায় মনে মনে অবাক মানেন মন্দাকিনী। তাঁদের মুখুজ্যাগড়ে যে চন্দনাটা রয়েছে খাঁচার মধ্যে, খিদে পেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচায়। লাল কাঁচা লঙ্কা দিলে একমনে ঠুকরে ঠুকরে খায়। বাকি সময়টা হয় খাঁচার তারগুলোকে প্রবল আক্রোশে ঠোঁট দিয়ে কামড়াতে থাকে, নয়তো ঝিম মেরে ঘুমিয়ে থাকে। খাঁচার পাশটিতে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ ওর সঙ্গে কথা-টথা বললে, পাখিটা বড় একটা বাজে না। খাঁচার পাশটিতে দাঁড়িয়ে মানুষটি নিজের মতো করে বলে যায়, পাখিটা তার নিজের তালে খাঁচার তার কাটবার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিংবা বসে বসে নিজের মনে ঝিমোয়। কিন্তু কাকটাকে দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর মনে হল, জটিলার কথাগুলোকে মন দিয়ে শুনছে ও। তিরস্কারটা হজম করতে গিয়ে ওর দু'চোখের মণিতে চাপা রোষ।

মন্দাকিনী একদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন কাকটাকে। জটিলার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পাখিটা। জটিলার তিরস্কারের জবাবে বার-দুই কঁ...কঁ করে আওয়াজ তুলল গলায়।

জটিলা ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। একটুবাদে গাদাখানেক পাকা কাঁঠালের ভুতি এনে ছুঁড়ে দেয় খতকুঁড়ের দিকে। অমনি আমগাছের মগডাল থেকে সাঁ...করে উড়ে আসে কাকটা। কাঁঠালের ভুতির দখল নিতে না নিতে চারপাশ থেকে আরও কয়েকটা এসে হাজির হয়।

একটা বছর-দুয়েকের বাচ্চা, এক্কেবারে উদোম গা, নাক দিয়ে অবিরাম সিগনি ঝরছে, টলোমলো পায়ে এসে দাঁড়াল মন্দাকিনীর সামনে।

মুখুজ্যাগড়ের দাসী-চাকরেরা ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাদের বাচ্চাদের গড়ের মধ্যে নিয়ে আসত। নোংরা বাচ্চাগুলোকে দেখামাত্তর মন্দাকিনী দূর থেকে গলা চড়াতেন, কার বাচ্চা রে এটা? ইস, কী নোংরা! দেখেই আমার বমি পাচ্ছে। বাচ্চাটা চলে যাওয়ার পর ওব হেঁটে-চলে বেড়াবার জায়গাগুলোকে ভালো করে মোছাতেন কুন্দকে দিয়ে।

আজ কিন্তু বাচ্চাটাকে দেখে, অস্বস্তি একটুখানি হচ্ছিল, কিন্তু সেই আগের মতো গা-রিরি ভাবটা টের পেলেন না মন্দাকিনী।

একটু বাদে জটিলা এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল।

মন্দাকিনী সস্নেহে তাকালেন বাচ্চাটার দিকে। শুধোলেন, কার বাচ্চা রে এটা?

জটিলা আঁচল দিয়ে বাচ্চাটার নাকের সিগনি মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, আমার ননদের ব্যাটা।

—কী নাম দিয়েছে অর মা-বাপ?

—ডাকনাম পঁটা। ভালো নাম এখনও দেয়নি। ইস্কুলে ভর্তি হবার সময় দিয়া দিবে। বলেই বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে জটিলা বলে, পঁটা...অ্যাই পঁটা...কত্তামার কোলে যাবি?

ততক্ষণে মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে একজাতের আলোড়ন শুরু হয়েছে। কেবল মুখে উচ্চারণ করেছে, বাস্তবিক বাচ্চাটাকে তাঁর কোলের দিকে এগিয়ে দেয়নি জটিলা, এমন কি এগিয়ে দেবার মতো কোনওরূপ অভিপ্রায়ও ফুটে ওঠেনি তার চোখে মুখে, কিন্তু বলে ফেলতে পারল তো কথাটা। এমন অচ্ছুৎ বাড়ির ভুষিকালো, নোংরা একটা বাচ্চাকে মন্দাকিনীর কোলে বসিয়ে দেবার প্রস্তাবটা তো করতে পারল জটিলা। এমনটাও যে ওদের স্বপ্নেরও অতীত থেকেছে চিরকাল।

অস্বস্তিকর ভাবনটাকে তাড়াবার জন্য কথার খেই বদলান মন্দাকিনী, ওই পেয়ারা গাছের ফলগুলা খেতে কেমন রে? মিষ্টি?

মন্দাকিনীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ততক্ষণে জটিলার নজর গিয়ে পড়েছে পেয়ারা গাছটার দিকে। বলে, তত একটা মিঠা লয়। তবে পাকলে এক্কেবার হলুদ হইয়া যায়। ভিতরে অল্প বীচি। খাবেন কত্তামা? পাড়িয়া দিতে কইব দু-চারটা?

—আরে, না, না। আমার দাঁতে অত জোর নাই। তুই তো দেখিসনি, গড়ের মধ্যে, ভিতর উঠানে ইয়াব্বড় পেয়ারা গাছ। খোদ কাশীর পেয়ারা। ইয়াব্বড় সাইজ তার। গুড়ের মতন মিষ্টি। আর, ভিতরে বীচি বলতে দু'চারটা।

জটিলা মুখুজ্যাগড়ের মধ্যে ঢোকেনি কোনওদিন। কাজেই তার পক্ষে ওই পেয়ারা গাছটিকে দেখবার প্রশ্নই ওঠে না।

কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু যতি গুচ্ছাতের বাড়ির কেউই বুঝতে পারছিল না, কী উদ্দেশ্যে আচমকা মন্দাকিনীর আগমন। কৌতূহল আর আশঙ্কায় ভরে যেতে থাকে সবাইয়ের বুক।

ততক্ষণে আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে উঁকি ঝুঁকি মারা শুরু হয়ে গিয়েছে। আশপাশের বাড়ির বাচ্চাগুলো, তাদের তো অত উচিত-অনুচিত জ্ঞান নেই, সটান হাজির হয় যতি গুচ্ছাতের উঠোনে। ভুলভুল করে দেখতে থাকে মন্দাকিনীকে।

মন্দাকিনী খুব স্বাভাবিক গলায় এর ওর নাম শুধোন। কেউ বা জবাব দেয়, কেউ বা লজ্জাসঙ্কোচবশত হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

এক সময় উঠোনে বাঁধা হাড়-জিরজিরে গাইটার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পড়েন মন্দাকিনী। গাইটা কোথায় বাঁধা থাকে, কী খায়, কতটা দুধ দেয়, কবে বাছুর হবে, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। এক সময় তাঁর নজর চলে যায় পেয়ারা গাছের আশেপাশে ফুটে থাকা বেগনি রঙের ফুলগুলোর ওপর। বলেন, এগুলা কী ফুল রে?

—নয়নতারা গো। জটিলা বলে।

—আর তার পাশের গাছটা?

—ভূতভৈরব।

—বলু কী' মন্দাকিনী স্পষ্টতই অবাক,...এই নামে কোনও গাছ আছে নাকি? বাপের জন্মেও শুনিনি।

বাস্তবিক, মন্দাকিনী এসব প্রায়-বুনো গাছগুলো তো এর আগে দেখেনইনি। মুখুজ্যাগড়ের বাগানে যেসব ফুলের গাছ রয়েছে, সেসব হল খানদানি জাতের। স্বর্ণচাঁপা, গোলাপ, জুঁই, চামেলি-লতা, কুন্দ..., একটা নাগকেশরের গাছও রয়েছে খিড়কির বাগানে। মবসুমে ওই গাছের পাশ দিয়ে হাঁটলে গন্ধে ম-

ম করে।

বুড়ো আম গাছটার দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনী শুধোন, এটা কী আমের গাছ?

—সিঁদুরমুড়ি।

—সিঁদুরমুড়ি! সে আবার কোন্ জাতের আম? তদের ভিটায় গোলাপখাস নেই? হিমসাগর?

জটিলা এসব জাতের নামই শোনেনি। সে বোকার মতো মাথা নাড়ায়।

এক সময় উঠে দাঁড়ান মন্দাকিনী। কুন্দর দিকে তাকিয়ে বলেন, চল্ কুন্দ, ফিরি এবার। বাড়িতে রাজ্যের কাজ।

এতক্ষণে জটিলা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শুধিয়ে বসে, কত কথায় আসছিলেন, বললেন না তো কত্তামা?

—ও মা! কত কথায় আবার কি? এমনি এমনি আসতে নেই? শুনো মেয়ার কথা! বলতে বলতে উঠোনে নামেন মন্দাকিনী। পা টিপে টিপে এগোতে থাকেন রাস্তার দিকে।

জটিলা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে মন্দাকিনীর দিকে। পুরো পাড়ার কাছে একরাশ প্রহেলিকা হয়ে ফিরে চলেন মন্দাকিনী। যাবার আগে কয়েকটি পাকা পেয়ারা মন্দাকিনীর হাতে প্রায় জোর করেই ধরিয়ে দেয় জটিলা। বিদায়কালে মন্দাকিনী বারংবার বলে যান, যাস্ না কেন রে আমার বাড়ি? এই আমি কেমন এলাম।

জটিলা আকাশ থেকে পড়ে বুঝি, কবে আবার তোমার বাড়িতে গেলামনি বড়-মা! প্রায়ই তো যাই।

—আরো ঘন ঘন যাবি। রোজ যাবি। এই সংসারে বাঁচিয়া রইতে গেলে মিলিয়া-মিশিয়া রইতে হবে।



ঠায় দুপুরে ক্ষেত থেকে ফিরে কথাটা শোনে যতি গুচ্ছাইত। শোনামাত্তর আচমকা শিয়রে বাজ পড়বার চমক।

অবাক যত না, ভয় পায় তার দশগুণ। জটিলাকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তোলে' কখন আইলেন, কুথায় বুসলেন, কী বললেন..., কেন আইলেন...।

জটিলা সঠিক করে কিছু বলতে পারে না। তাতে করে যতির তাবৎ রাগ গিয়ে পড়ে জটিলার ওপর। কিনা, শালী, তোর পাশ আইলেন তিনি, কেন আইলেন সেটা জানতে কি মান্দার নাকি কুলাসিনি যাইতে হবে?

দুপুরের মধ্যে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যায় প্রায় গোটা সন্ধিপুর গাঁয়ে, কিনা, মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামা, আজ আচমকা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন গুচ্ছাতপাড়ার যতি গুচ্ছাতের বাড়িতে।

শোনামাত্র ঢেউ ওঠে সন্ধিপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে। তরঙ্গ ছোটে চতুর্দিকে। কারণ হিসেবে নানা মুনির নানা তথ্য। কেউ বলে, যতি গুচ্ছাতের গাইয়ের বাচ্চা হবে। ওই গাইয়ের দুধ থেকে একপোয়া দুধ মাস-কাবারি কিনবেন তিনি। সেই কথাবার্তা পাকা করতে গিয়েছিলেন। কেউ বলে, জটিলাকে ওঁদের বাড়ির মাসকাবারি গেরস্থালি কাজে রাখতে চান বড়-কত্তামা, সেই তরেই...। এর ফলে রাস্তায়-ঘাটে, ক্ষেতে-খামারে যতি গুচ্ছাতের দিগদারি যায় বেড়ে। সবাই ওকে থামিয়ে, দাঁড় করিয়ে জানতে চায় মন্দাকিনীর আগমনের সঠিক কারণ। যতি গুচ্ছাত আমতা আমতা করতে থাকে। এর সঠিক জবাবটা তারও জানা নেই। সেটা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। অত বড় বাড়ির মেয়া শুধুমুদু চলিয়া যাবেন যতি গুচ্ছাতের মতো এক গরিব-গুরবোর ঘরে? নিঘাৎ কোনও গুহ্য কারণ রয়েছে, যা কিনা এতটাই গোপনীয় যে যতি গুচ্ছাত ভেঙে বলছে না কিছুতেই।

ফলে, মানুষজনের মনে রহস্যটা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে।

দিন কয়েক বাদে একদিন মন্দাকিনী কুন্দকে ডেকে বলেন, কুন্দ রে, যা তো একটিবার জটিলার বাড়িতে। ওই নয়নতারা না কী যেন গাছ, অর কয়েকটা চারা লিয়া আইস্‌বি। আর ওই ভূতভৈরবের চারাও। এখন বর্ষাকাল। পুঁতিয়া দিলেই ধরিয়াবে।

শুনে কুন্দ তো অবাক। লাগাবার মতন আর গাছ পাইলেনি তুমি দিদিমা! শেষমেশ নয়নতারা আর ভূতভৈরব! উ গাছ ফের কোউ লাগায় নাকি? উ'গাছ তো অমনি-অমনিই হয়। রক্তবীজের জাত সব।

—আ-হা, কথার কী ছিরি! মন্দাকিনী ঝামটে ওঠেন কুন্দর ওপর,—এমনি এমনি যদি হয় তো, কই, আমার ভিটায় নাই কেন? বল্, জবাব দে।

—এমনি এমনি হয় মানে, এমনই বুনো জংলা গাছ, যত্ন করিয়া লাগাবার কুনো মানে হয় না। ফুলগাছ লাগাতে হয় তো গুলাব গাছ লাগাও, জুঁই, টগর, চাঁপা লাগাও। নিদেন বেলিফুলের গাছ লাগালেও তো গোটা গরমকাল, বর্ষাকাল ফুলে ফুলে আলো করিয়া রাখবে, আর গন্ধে ম-ম করবে গোটা উঠান। তা নয়...।

—আ-হা! আলো করিয়া রাখবে! ম-ম করবে! মন্দাকিনী কুন্দর গলা নকল করে ভেঙিয়ে ওঠেন,—কাজ নাই আমার আলো করাতে। অত আলোয় দরকার নাই আমার। আমি নয়নতারা আর ভূতভৈরবই পুঁতব। তোর কী রে মাগী?

কুন্দ মন্দাকিনীর এইসব পাগলামোর কোনও মানেই খুঁজে পায় না। অল্প তফাতে সরে গিয়ে সমানে গজগজ করতে থাকে। গজগজ করতে করতে রওনা দেয় জটিলাদের বাড়ির দিকে। নিয়ে আসে নয়নতারা আর ভূতভৈরবের চারা। পিছু পিছু নিজের থেকেই হাজিব হয় ক্ষুদিরাম দলাই। সবজি খেতের একপাশে মাটি কুপিয়ে পুঁতে দেয় গাছগুলো। মন্দাকিনীর অনুরোধে ভিটের এককোণে বেড়ার গা ঘেঁষে একটা কাঠগোলাপের ডালও পুঁতে দেয় ক্ষুদিরাম।

কিন্তু বড়-কর্তামার বাগানের গাছগুলিকে দেখতে দেখতে তার দু'চোখেও জমাট বাঁধে বিস্ময়।



বিকেলের মুখে শিখা আসে।

দাওয়ায় ধপ করে বসে পড়ে বলে, দিদিমা গো, কীর্তন হচ্ছে কুমোরপাড়ায়। যাবে?

আজ সন্ধেয় কীর্তনের আসর বসবে জগু কুমোরের বাড়িতে। মন্দাকিনী জানেন। কিন্তু সহসা শিখার কথার কোনও জবাব দেন না তিনি।

শিখা শুধোয়, তোমাকে বলেনি জগাদা?

আমতা আমতা করে মন্দাকিনী বলেন, বলিয়া তো গেছে, কিন্তু..। মন্দাকিনীর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অন্ত নেই বুঝি।

শিখা নাছোড়বান্দা বায়না ধরে, চল দিদিমা। গলাটি বড় ভালো।

কতদিন কোনও উৎসব-পার্বণে যাননি মন্দাকিনী! এমনিতে মুখুজ্যাগড়ের বড়-কর্তামার পক্ষে যখন-তখন হুটহাট যেকোনও উৎসবে-পার্বণে চলে যাওয়াটা সম্ভব ছিল না কোনওকালেই। সাধারণ গেরস্তবাড়িতে যেমন 'উঠল বাই তো কটক যাই' গোছের ব্যাপার রয়েছে, শাড়িটা বদলে নিল, মাথায় চিরুনিটা একপ্রস্থ বুলিয়ে নিল, এবার 'মন চলো বৃন্দাবনে', মুখুজ্যাগড়ের বাসিন্দাদের তেমনটি হওয়ার জো ছিল না কোনওকালেই। তাঁদের ক্ষেত্রে কোথাও বেরোনো মানে, সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার। মুখুজ্যাদের বড় তরফ, ছোটো তরফ, অঘোর চক্কোতি, ব্রজেন দত্তর বউ, মেয়েরা, সে এক দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রস্তুতির ব্যাপার। তিন-চারটে গরুর গাড়ি নিয়ে পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে কিংবা মেলা দেখতে চলেছেন মুখুজ্যাগড়ের বড় কর্তামা।

যাবেন বিকেল গড়িয়ে, কিন্তু প্রস্তুতি চলছে সকাল থেকে। অন্দরমহলে মা-জননীরা সাজগোজ করছেন, পাশাপাশি কুন্দরাও তৈরি হচ্ছে, সদরমহলে গাড়োয়ান, লগদির দল সাজছে...। গরুর গাড়িতে লেপ-তোষক পাতা হল, গরুর শিংয়ে তেল মাখান হল, তৈরি হল জটিয়া-লগনার দল...। যথাসময়ে বাহনে চড়লেন মন্দাকিনীরা। সঙ্গে নেওয়া হল জল, খাবার, পানের বাটা, হাওয়া খাওয়ার পাখা। যখন বেরোলেন, সারা গাঁয়ের মানুষ ভুলভুল চোখে দেখতে থাকবে সেই দৃশ্য।

মুখুজ্যাগড় থেকে বেরিয়ে এসে বকদিঘির পাড়ে ডেরা পাতবার পর থেকে বলতে গেলে বাড়ি থেকে

তো বড় একটা বেরোনই নি মন্দাকিনী। দশজনের সমাবেশে গিয়ে মুখ দেখাতে লজ্জায় মাথা কাটা যেত তাঁর। কেন কি, ওঁকে দেখামাত্তর তো চতুর্দিকে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর শুরু হয়ে যায়, কিনা, হাই দ্যাখ, হিরু মুখুজ্যার মা। বুড়া বইসে হিরু মুখুজ্যা খেদিয়া দিছে গড় থেকে।

—রাজার মা এখন ঘুঁটাকুড়ানি। অট্টালিকায় রইয়া রাজভোগ খাইত, শয়েশয়ে দাসী-বাঁদীর উপর সারাক্ষণ হুকুম চালাইত, এবে বকদিঘির পাড়ে, মাঝিপাড়ার গা ঘেঁসিয়া কোঠাঘরে থাকে, হাত পুড়িয়ে রাঁধে, দুদিনেই সোনার অঙ্গ য্যান শুকিয়া আমসি।

—এ তার অদৃষ্টের লিখন। অদৃষ্টের উপর হাত আছে কারও? তার কর্মফল সে ভোগ কচ্ছে, তুমি-আমি ভাবিয়া কি করব?

—ঝাঁটা মরি অমন ব্যাটার মাথায়! এইরকম ঘটনা চলতে থাইক্‌লে আর ব্যাটা-পুত্তুর চাইবেনি মানুষ। কী কারণে চাইবে? ব্যাটা-পুত্তুর কেন চায় মাইন্‌সে? বুড়া বইসে দেখবে বলিয়া তো! এই যদি দেখভাল করা হয়, এই যদি মা-বাপের ঋণ শোধ করার তরিকা হয়, তবে মানুষ কুন্‌ আশায় ব্যাটা-পুত্তর চাইবে, বল?

—এত অপমানের পরও ইখেনে পড়িয়া আছে কেন? বাপের বাড়ি চলিয়া যায় না কেন? ওদেরও তো শুনেছি বিশাল অবস্থা।

যতক্ষণ অকুস্থলে থাকবেন মন্দাকিনী, ফিসফিস করে এহেন চর্চা চলতেই থাকবে।

তাবাদে, ইচ্ছে থাকলেই তো যাওয়া চলে না। মুখুজ্যাগড়ে থাকাকালীন সম্ভ্রান্ত প্রজাদের বাড়িতে, উৎসবে-পার্বণে নেমন্তন্ন পেতেন মন্দাকিনী। মুখুজ্যাগড় থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রজারা মুখুজ্যাগড়কে চটিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে কই? কাজেই, বহুকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও উৎসবে সামিল হননি মন্দাকিনী।

শিখার প্রস্তাবে তাই মনটা ঈষৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে বাপের বাড়ির এবং মুখুজ্যাগড়ের উৎসব-পার্বণের দিনগুলি।

জমজমাট রাস উৎসব হত মন্দাকিনীর বাপের বাড়িতে। কীর্তন হত, কৃষ্ণযাত্রার পালাগান হত, বহু মানুষ নিমন্ত্রিত হতেন ..। মুখুজ্যাগড়ের প্রধান উৎসব ছিল দুর্গাপূজা। চারপাশের পুরো এলাকাটা ভেঙে পড়ত ওই ক'দিন। কত জাঁকজমক সহকারে এইসব পূজা-পার্বণ হত। এছাড়া সম্পন্ন বাঙালি বাড়ি, বারোমাসে তের পার্বণ তো লেগে থাকতই মন্দাকিনীর বাপের বাড়িতেও।

সেসব দিনের জৌলুষের কথা চকিতে ঘাই মারে স্মৃতিতে। মনে পড়ে, কেবল রাস উৎসবই নয়, মন্দাকিনীর বাপের বাড়িতে জন্মাষ্টমীটাও পালন হত ধুমধামসহকারে। এছাড়া, কীর্তনের আসরও বসত মাঝে মাঝেই।

বাস্তবিক কতকাল কীর্তন শোনেননি মন্দাকিনী! মুখুজ্যারা শাক্ত। কাজেই, মুখুজ্যাগড়ে কীর্তন বড় একটা হত না। তবে এলাকার সম্পন্ন গেরস্থের বাড়িতে কীর্তনগান হলে মুখুজ্যাগড় তো আমন্ত্রিত হতই। সেই সুবাদে বহুবার কীর্তন শোনার সুযোগ হয়েছে মন্দাকিনীর। সেসব কীর্তনীয়াদের গানের গলা, সুমধুর সুর, এখনও অবধি বুঝি কানে ভাসে।

শিখার প্রস্তাবে মনের মধ্যে লোভ জাগে তাই। কিন্তু পরমুহূর্তে চাপা অস্বস্তি, কিনা, জগার উঠোনে গিয়ে সবার সঙ্গে মাটিতে থাবড়ে বসে কীর্তন শোনা, সেও এক মহা বিড়ম্বনার ব্যাপার। তার ওপর ওই গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর তো রয়েছেই।

মন্দাকিনী কাজেই, এক পা এগোন তো, দুপা পেছোন।

শেষ অবধি শিখার কথা ফেলতে পারেন না মন্দাকিনী। দোনামোনা করে রাজি হন।

সন্ধের পর শিখার পিছু পিছু পায়ে হেঁটে হাজির হন জগা কুমোরের উঠোনে। ওঁদের পিছু পিছু আসে কুন্দও।

মন্দাকিনীকে দেখামাত্তর হৈ-হৈ করে ওঠে জগা কুমোর। উঠোন পেরিয়ে আগড় অবধি এগিয়ে আসে। পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করে। ওঁকে কোথায় বসাবে, কীভাবে আপ্যায়ন করবে, ভেবে পায় না বুঝি।

আসরে পৌঁছে মন্দাকিনী দেখেন, ওঁর জন্য বসবার পৃথক ব্যবস্থা করেছে জগা। ওঁর আর শিখার। মন্দাকিনী পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে বসলেন 'স্পেশাল' চটের আসনে।

কিন্তু ততক্ষণে পুরো আসরের দৃষ্টি কীর্তনের দিক থেকে সরে এসেছে মন্দাকিনীর দিকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওঁকে পিটপিট করে দেখতে থাকে কুতুহলী মানুষজন। শুরু হয় নিজেদের মধ্যে ফিসফিসানি কথাবার্তা। মন্দাকিনীর পরিণতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি অতি সাবধানীদের মধ্যে কেউ কেউ জগা কুমোরের ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করে চলেছে সমানে। কেন কি, সে যে মুখুজ্যাবাড়ির বড়-কর্তামাকে ঘটা করে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, সেটা তো আর জানতে বাকি নেই কুমোরপাড়ার কারোরই। কথাটা কি এতক্ষণে হিরু মুখুজ্যার কানে গিয়ে পৌঁছোয় নি? মানুষ-কাক কি এতক্ষণে ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে কথাটা টুক করে ফেলে দেয়নি মুখুজ্যাগড়ের কর্তা-গিন্নির কানের পাশটিতে? আর, কথাটা যদি সত্যি-সত্যি কর্তাবাবুর কানে যায়, তবে মন্দাকিনীর তো কলাটা করবেন, তিনি তো ইদানীং ভারী তোয়াক্কা করেন কর্তাবাবুর রাগ-রোষের, মাঝের থেকে জগা কুমোরটা মারা পড়ল। এরপর ওকে কোনদিক থেকে জব্দ করেন কর্তাবাবু, সেটা দেখতে পাবে সন্ধিপুরের মানুষ।

মন্দাকিনীর দৃষ্টি এড়ায় না। কীর্তন শুনবেন কি, চারপাশের মানুষগুলোর চোখমুখের ভাবগতিক দেখতে দেখতে সারাক্ষণ কেমন জানি অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে বুকে। কেন কি, ফিসফিসানি কথাগুলো শুনতে না পেলেও চারপাশের মানুষজনের চোখের ভাষা তো পড়তে পারেন মন্দাকিনী। শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁকে নিয়ে পুরাতনী চর্চা, কিনা, কী মাইন্‌সের কী হাল...।

কীর্তন যখন মাঝামাঝি জায়গায়, একসময় শিখাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন মন্দাকিনী, মাথাটা খোব ধরেছে রে, বাড়ি যাব আমি। অগত্যা শিখাকেও উঠতে হয়।

শতচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে ওরা আসর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামে।

সকালবেলায় প্রায় বাসি মুখটি ধুয়েই মন্দাকিনী তাড়া লাগান কুন্দকে, চল্ কুন্দ, একবার প্রমীলার বাড়ি ঘুরিয়া আসি।

—এখন? এই সাতসকালে! কুন্দ আকাশ থেকে পড়ে।

—কেন? মন্দাকিনী ঈষৎ বিরক্ত হন বুঝি,—আমরা কি অর দোরে ভাত খাইতে যাচ্ছি নাকি যে অত সকালে গিয়া লাভ নাই! যাব, দুটা কথাবার্তা কইব, ফিরিয়া আইস্‌ব।

—কার সাথে কথা কইবে তুমি, বড়মা, অরা এখন কাজবাজে ডুবিয়া আছে। অদের ঘরে তো দশটা দাসী-চাকর নাই, ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ অদের্‌কে নিজের হাতে করতে হয়। এখন হইল বাসি কাজ সারবার সময়।

—ওরে, অরা বাসি কাজ সারুক না। আমি কি গিয়া অদেব কোলের উপর বসব? যাব, একটু-চাব দণ্ড গল্প-টল্প করব...। উ কাজ কইরবে, আমি গল্প করব। কাজ করতে করতে গল্প করা যায় না? খুব যায়।

—কিন্তু প্রমীলাকে এখন তো বোধ লেয় পাবেনি বড়মা। উ তো গুলু মা'তির ঘরে কাজ ধরেছে।

—আরে, কাজ ধরেছে তো...সে কি রাত থিকে চলিয়াবে নাকি গেরস্তর ঘরে!

—না, না, সে ভোর ভোর চলিয়া যায়।

—বেশ, তবে চল, সন্ধ্যার ঘরটা ঘুরিয়া আসি। শুনেছি, জ্বর হইছ্‌লো নাকি ক'দিন আগে...।

কুন্দ বুঝতে পারে, যে-কোনও কারণেই হোক, এই সাতসকালে একটিবারের তরে মাঝিপাড়ায় যাওয়াটা তাঁর খুব জরুরি। গলা চড়িয়ে বলে, উহ্, উঠল বাই তো কটক যাই!' এক্ষুনি মাঝিপাড়ায় না গেলে তুমার চলছেনি?

মন্দাকিনী ঝাঁ করে ক্ষেপে যান। চোখ পাকিয়ে বলেন, না, চলছেনি। তুইই বা একটা সামান্য বেপার লিয়ে মনিবের পারা অত জেরা করতিছু কেন? বলি, আমি তোর মনিব, না তুই আমার মনিব?

কুন্দ এবার ফিক করে হেসে ফেলে, লাও, ভালো কথাটা বলতে গেলাম,...এর মধ্যে মনিব-বাঁদির কী আছে? বলতে বলতে উঠোন পেরিয়ে আগড়ের দিকে হাঁটা দেয় কুন্দ,—চল, জটিলা না কুটিলা, সইন্ধা না সকাল, কার দোরে না গেলে ভাত হজম হচ্ছেনি তুমার,...চল।

মন্দাকিনীও নির্বিবাদে হাঁটা দেন কুন্দর পিছু পিছু।

মন্দাকিনী যখন গগনের বাড়িতে পৌঁছলেন, গগনের বউ প্রমীলা তখন দুধ দোয়ার তোড়জোড় করছে। ইদানীং গগনের বউয়ের থেকে এক পোয়া করে দুধ নিচ্ছিলেন মন্দাকিনী।

দুধটা চিরকালই মন্দাকিনীর বড়ই প্রিয়। সরু চালের ভাত, গাঢ় করে মারা দুধ, তার ওপর পুরু লালচে সর ভাসছে, তৃপ্তি করে মেখে খেতেন প্রায়ই। ক্ষীর-রাবড়িও বড়ই প্রিয় ছিল তাঁর। বিধবা হওয়ার পর যখন মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তখন দুধ খাওয়াটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুখুজ্যাগড়ে তিন-তিনটে গোয়ালে না-হোক গোটা দশেক দুধেল গাই তো ছিলই। সরেস্বতী নামের এক মাঝবয়েসি মেয়ে দু'বেলা আসত কেবল দুধ দুইতে। কিন্তু গাইয়ের বাঁট থেকে দুধ দোয়ার কৃৎকৌশল মন্দাকিনী কখনও তেমনভাবে খুঁটিয়ে দেখেননি। সময়ও পাননি, ইচ্ছেও করেনি।

সকালবেলায় দুধ দুয়ে গগনের বউ প্রমীলাই তা পৌঁছে দিচ্ছিল মন্দাকিনীর বাড়িতে। দিনকতক ধরে মন্দাকিনী বলছিলেন, তোর আর দুধ বইয়া আনার দরকার নাই। আমি নিজে গিয়া লিয়া আইস্‌বো।

শুনে প্রমীলা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, কিনা, আপনি কেন আসতে যাবেন বড়-মা, আমাদের অপরাধ আর বাড়াবেননি।

মন্দাকিনী বড় বড় চোখ করে তাকান প্রমীলার দিকে, ও মা, অপরাধের কী হইল? সকালবেলায় আমার কাজ নাই তো। বুসিয়া বুসিয়া গায়ে-হাতে খিল ধরিয়ালো।

মন্দাকিনীকে দেখামাত্তর প্রমীলা দাওয়ায় মাদুর পেতে দিল। মন্দাকিনী জুত করে বসলেন। প্রমীলা দুধ দুইতে লাগল উঠোনে।

বাছুরটা মায়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে চকচকিয়ে দুধ খাচ্ছিল। একসময় বাছুরটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সামান্য তফাতে, গাইটার মুখের নাগালের মধ্যে বেঁধে দেয় প্রমীলা। তারপর একটা বড় জামবাটি নিয়ে দুধ দুইতে বসে।

গাঢ় বিস্ময়ে গাই দোয়া দেখতে থাকেন মন্দাকিনী। প্রমীলা গাইটার এক-একটি বাঁট ধরে দু'আঙুলের আশ্চর্য কৌশলে নিংড়ে আনছিল দুধ। অবিরাম চররর...চররর আওয়াজ তুলে জামবাটির ওপর অবিরল ধারায় পড়ছিল দুধ। গাঢ় ফেনা জমছিল দুধের ওপর। গাইটা নির্বিকার মুখে বাছুরটার সারা শরীর চেটে দিচ্ছিল অপরিসীম স্নেহে।

দেখতে দেখতে এক সময় মন্দাকিনী গাই দুইবেন বলে বায়না ধরেন। বলেন, ও প্রমীলা আমি একটুখানি দুই?

প্রমীলা প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। বলে, আপনি পারবেননি বড়মা। অইভ্যাস না থাকলে...।

—মর্ পুড়ারমুখী, গাই দোয়া কী এমন কালীবিদ্যা যে তুই পারতিছু আর আমি পারবনি? বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মন্দাকিনী। দাওয়া থেকে নেমে এসে প্রমীলার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান।

প্রমীলা নাচার হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, পারবেন কি? চেষ্টা করিয়া দেখুন।

প্রমীলার জায়গাটিতে গিয়ে ঠিক ওরই মতো উবু হয়ে বসেন মন্দাকিনী।

গাইয়ের বাঁটে হাত ছোয়ানো মাত্তর সে চমকে ওঠে। মন্দাকিনী সামান্য চমক খেয়ে পিছিয়ে আসেন। বলেন, চমকিয়া উঠল কেন রে?

প্রমীলা হাসে, নৈতন হাতের ছুঁয়া লাগল তো, তাই জন্যে...।

—দূর মাগী, গাইয়ের পাশ আবার নৈতন হাত, পুরাতন হাত কী রে? বলেই আবার হাত ছোঁয়ান গাইয়ের বাঁটে। দু'আঙুল দিয়ে টানতে চেষ্টা করেন বাঁট, কিন্তু দুধের সেই ভরাট ধারা কই? একটুখানি চিরিক করে ঝড়ে পড়ে জামবাটিতে।

প্রীমলা লক্ষ করে, গাইটা একটু একটু করে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তার সেই তন্ময় ভাবটা উবে যাচ্ছে

ক্রমশ। পেছনের পা দুটো মাটির উপর ঠুকতে শুরু করেছে।

কিন্তু মন্দাকিনীকে নিরস্ত করতে সাহস পায় না প্রমীলা।

একটুক্ষণের মধ্যেই মন্দাকিনী বুঝতে পারেন, ব্যাপারটা দেখতে যতটা সোজা মনে হয়, ততটা সোজা না। ততক্ষণে তিনি ঘেমে উঠেছেন। বাঁটগুলোকে আনাড়ির মতো টানাটানি করায় গাইটাও যে অস্বস্তি বোধ করেছে, সেটাও বুঝতে অসুবিধে হয় না তাঁর। লক্ষ করেন, বাঁটগুলো পানিয়ে থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ দুধ না পাওয়ায় প্রমীলার কপালেও একটুখানি দুর্ভাবনার ছায়া।

একসময় গাইটা পেছনের একটা পা চালায় মন্দাকিনীর দিকে। বড় একটা লাগেনি, কিন্তু লাগতে পারত। মন্দাকিনী ঝটিতে পিছিয়ে আসেন। নাকালের একশেষ হয়ে এক সময় উঠে দাঁড়ান। বলেন, নাহ্ আইজ আর হবেনি। তবে আমি শিখিয়া লিবো, দেখিস, দু'চারদিন অভ্যাস করলেই শিখিযাবো।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে প্রমীলার বুঝি ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। মৃদু হেসে বলে, সব কাজ কি সবাই পারে মা? নাকি সব কাজ সবাইকে মানায়?

এ কথায় ক্ষেপে ওঠেন মন্দাকিনী। বলেন, ওকথা বলিসনি। না মানানোর কী আছে? করতে জানলে সব কাজই সবাইকে মানায়।

বলতে বলতে মন্দাকিনী পা বাড়ান উঠোন পেরিয়ে কুমড়ো মাচাটার দিকে।

হলুদ ফুলে ভরে রয়েছে গাছটা।

ফুলগুলোতে দেখতে দেখতে মন্দাকিনী বলে ওঠেন, ফুলের পিছনে সুপারির মতো ফুলিয়া রয়েছে, ওগুলো কী লো প্রমীলা?

মন্দাকিনীর মুখে 'লো' শব্দটা শুনে মজা পায় প্রমীলা। বলে, কুমড়া ফুলে জালি এসেছে গো বড়মা। ওগুলোর থিকেই তো কুমড়া হবে।

—তা-ই? এভাবেই তবে কুমড়া ফুলে ফল ধরে? আমি তো এর আগে দেখিনি কুনোদিন। সর্বাজির বাগান থিকে ইয়া বড় বড় কুমড়া আনিয়া উঁই করিয়া রাখত গুটিয়া, লগনার দল। হলুদ রঙের পাকা কুমড়া সব। কিন্তু ফুলের বোঁটায় কেমন করিয়া কচি কুমড়া ধরে, আমি কী করিয়া জানব বল্?

মন্দাকিনীর কথার ধরনে ফিক্ করে হেসে ফেলে প্রমীলা।

উঠোনের একপ্রান্তে একটা ছোট্ট খড়ের গাদা। একজোড়া মুরগি নেচে বেড়াচ্ছিল মাচাটার ওপরে। তাই দেখে প্রমীলা বলে ওঠে, আবার খোব বিষ্টি-বাদলা হবে বড়মা।

—তুই কী করিয়া জানলি তা? তুই কি খড়ি পাততে জানিস নাকি রে মাগী?

আবার মন্দাকিনীর মুখে 'মাগী' শব্দটা শুনে মজা পায় প্রমীলা। বলে, ও মা, দেখতে পাচ্ছনি, মুরগি লাচছে খড়ের গাদায়। তার মানে বিষ্টি হবেই। তাবাদে, অম্বুবাচী তো পরশু। অম্বুবাচীর দিনে বৃষ্টি না হইলে আর কবে হবে?

মন্দাকিনী জানতেন না, আগামী পরশুই অম্বুবাচী। জানতেন না যে অম্বুবাচীর দিনে বৃষ্টি হবেই। বলেন, তুই কি রোজ পাঁজি খুলিয়া দেখু নাকি? তোর ঘরে পাঁজি আছে?

ওঁর অজ্ঞতায় মজা পায় প্রমীলা। বলে, পাঁজির দরকার কি বড়মা? 'যে নাই জানে বার-তিথি/আষাঢ় মাসের সাত তারিখে অম্বুবাচী। খনার বচন। দুনিয়ার লোক জানে, ওইদিনে মা-বসমন্তা ঋতুমতী হন। তার ফলেই অঝোর ধারায় বিষ্টি হয় ওইদিনে।

আশ্চর্য, এসব কিছুই জানা ছিল না মন্দাকিনীর। মুখুজ্জ্যাগড়ে, চার দেয়ালে ঘেরা সোনার খাঁচাটিতে, জীবনের বারোআনাই তো কেটে গিয়েছে তাঁর। ওখান অবধি এসব লৌকিক বিশ্বাস, ছড়া-প্রবচনগুলি পৌঁছতে পারে না।

ঠিক তেমনি সময়ে গুচ্ছাতপাড়ার নকুল গুচ্ছাতের ব্যাটা খাঁদা এসে খুব মিনমিনে গলায় বলে, ও বড় মা, তুমার ঘরে কে যেন আস্‌সে।

—কে আবার আইল? মন্দাকিনী খাঁদার দিকে তাকান, তুই তাকে চিনুনি?

খাঁদা মাথা নাড়ে, এ গাঁয়ের লোক না।

সামান্য বিরক্ত দেখায় মন্দাকিনীকে। কে আবার এল এই সাত সকালে! মন্দাকিনীরা উঠে দাঁড়ান। বলেন, চললাম রে প্রমীলা। কে আইল দেখি। বিকালে একটিবার যাস্। কথা আছে তোর সাথে। যাস্ কিন্তু।

মন্দাকিনী পায়ে পায়ে হাঁটা দেন আগড়ের দিকে।

নিজের বাড়ির উঠোনের আগড়ে হাত ছোঁয়াবার আগেই মন্দাকিনী দেখতে পান, দাওয়ায় রাখা ভাঙা টুলটার ওপর বসে রয়েছে সীতাপতি, মন্দাকিনীর ছোটোভাই।

ক'দিন কাকের মুখে খবর পাচ্ছিলেন মন্দাকিনী, ছোটোভাই সীতাপতি এসেছে মুখুজ্যাগড়ে। কথাটা কানে আসামাত্তর নানা কারণে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মন্দাকিনীর মন।

বছরটাক আগে বড়দা বিশ্বপতি এসেছিল। ক'দিন ছিল। মন্দাকিনীর বাড়িতে একটিবারের তরেও আসেনি। সেজন্য অবশ্যি মন্দাকিনীর তিলমাত্র দুঃখু নেই। বরং মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল তাঁর, এই কারণে যে, বড়দা আসা মানেই তো দু'পক্ষেরই মধ্যিখানে কিছুক্ষণের জন্য একটি থমথমে আকাশ, চারপাশে হাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াজনিত গুমোট, ঈশেন কোণে কিঞ্চিৎ বিব্রত একখণ্ড কালো মেঘ, মাঝেমধ্যে অশনিসংকেত, একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছুটা ঝড়ো হাওয়া, এবং তার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। কাজেই, বড়দা না এসে ভালোই হয়েছে।

কিন্তু সীতাপতির ক্ষেত্রটা মন্দাকিনীর কাছে একটুখানি আলাদা। সেই ছেলেবেলা থেকে ছোটভাইকে বড় স্নেহ করতেন মন্দাকিনী, বড়ই নেকনজরে দেখতেন। সীতাপতিও বড়ই ন্যাওটা ছিল মন্দাকিনীর।

বিয়ের পর যখন মুখুজ্যাগড়ে এলেন, সীতাপতির বয়েস তখন নয় কি দশ। তখন বছরের মধ্যে পাঁচ-ছ মাস এসে মন্দাকিনীর কাছেই থাকত সীতাপতি। সেই সীতাপতি এখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। বিয়ে-থা করে ছেলেপুলে নিয়ে তার এখন ভরভরন্ত সংসার। বাবা মারা যাবার পর দুই ভাই তো পৃথক হয়ে যায়। সেও অন্তত বিশ বছর আগের কথা। এখন তো এমনই ঘোর সংসারী সে, বোনের বাড়ি আসার সময়ই পায় না। বাস্তবিক, কতদিন মুখুজ্যাগড়ে আসেনি সীতাপতি! বছর পাঁচ-ছ তো হবেই।

সীতাপতি মুখুজ্যাগড়ে এসেছে, খবরটা পাওয়া মাত্র আচমকা ছোটোভাইটাকে একটিবার দেখবার জন্যে বুকের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হচ্ছিল মন্দাকিনীর। তবে সেই অস্থিরতাটাকে উথলে উঠতে দেননি তিনি।

কেন জানি, ক'দিন ধরে ভেতর থেকে একধরনের সঙ্কেত ভেসে আসছিল, কিনা, এমনি এমনি আসেনি সীতাপতি। তাকে হয়তো বা কোনও বিশেষ কারণে তলব করে আনা হয়েছে। হয়তো বা মন্দাকিনীরই কারণেই। হয়তো বা সেই কারণেই ক'দিন যাবৎ ভেতর থেকে এক ধরনের সঙ্কেত পাচ্ছিলেন, কিনা, হয়তো বা সীতাপতি একটিবারের তরে হলেও আসবে মন্দাকিনীর বকদিঘির বাড়িতে।

সীতাপতিকে দেখতে দেখতে উঠোন থেকেই মিষ্টি হাসেন মন্দাকিনী। কয়েক মুহূর্তের জন্যে বুঝি পিছিয়ে যান চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের দিনগুলোতে, যখন ছোট সীতাপতি সারাদিন দিদির পিছু পিছু ঘুরতে ভালোবাসত। তখন একমাত্র মন্দাকিনীর কাছেই তার ছিল যা কিছু বায়না, আবদার...।

মন্দাকিনীর হাসির জবাবে সীতাপতি এক চিলতে হাসি ফেরৎ দেয় বটে, কিন্তু মন্দাকিনী লক্ষ করেন, সে হাসিতে তিলমাত্র প্রাণ নেই। বরং সীতাপতির সারা কপাল জুড়ে এক ধরনের থমথমে ভাব।

দেখতে দেখতে আজকের বর্তমানে ফিরে আসেন মন্দাকিনী। মনে মনে তৈরি হন। মুখে বলেন, কবে এসেছু তুই?

—দিন তিনেক হল। খুব থমথমে গলায় জবাব দেয় সীতাপতি,...তুমি এই সাত-সকালে কোথায় গিয়েছিলে?

চারপাশটা একটু একটু করে থমথমে হয়ে উঠেছে। টের পান মন্দাকিনী। আকাশের ঈশেন কোণে একখণ্ড কালো মেঘ জমছে। বাতাসে গুমোট ভাবটা বাড়ছে।

তাও মন্দাকিনী যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলেন, এই একটুখানি গগন দলাইয়ের বাড়িতে গেছলাম।

—গগন দলাইয়ের বাড়িতে! সীতাপতির ভুরুজোড়ায় অজান্তে ভাঙচুর হয়,...কেন? গগন দলাইয়ের

বাড়িতে তোমার কী দরকার?

—দরকার ছিল রে। মন্দাকিনী মিষ্টি হাসেন, ওর থিকে এক পুয়া করিয়া দুধ লিই তো, দুধটা আনতে গেছলাম।

—ওরা দুধটা পৌঁছে দিয়ে যায় না? তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়?

—অরাই পৌঁছিয়া দিয়া যায়, তবে আইজ আমি নিজে গেলাম আনতে।

—দুধ আনতে নিজেই মাঝিপাড়ায় চলে গেলে তুমি! সীতাপতির সারা মুখ জুড়ে প্রচ্ছন্ন ধিক্কার।

ততক্ষণে মন্দাকিনীর কপালে আড়াআড়ি শিরাদুটি টানটান হয়ে চিতিসাপ হতে চাইছে। তাও যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলেন, আসলে, অর থিকে গাই দুয়াটা শিখতে গিসলাম।

—গাই দোওয়া শিখতে গেছলে! তুমি! তুমি কি গাই দুইবে নাকি? সীতাপতি হতভম্ব।

—ভাবতিছি, একটা গাই পুষব বাড়িতে। নিজেই চরাব বুলাব, নিজেই দুইব, পয়সা দিয়া দুধ কিনিয়া আর পুষাচ্ছেনি।

মন্দাকিনীর কথা শুনে সীতাপতি প্রায় বাক্যিহারা হয়ে যায়। একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে সে। একসময় বলে, কথাগুলো বলতে তোমার তিলমাত্র বাধছে না? কোন্ বংশের ঝি তুমি, একেবারে ভুলে গিয়েছ?

সীতাপতির কথা শুনতে শুনতে মন্দাকিনীর কপালের চিতিসাপ দুটো আরো প্রকট হয়। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করেন তিনি। হালকা হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেন, তুই কি ইখ্নে বুসিয়া বুসিয়া জেরা করবি খালি? চল্, ভিতরে চল্।

সীতাপতিও বুঝি মনে মনে সেটাই চাইছিল। সদর-দাওয়ায় বসে থাকতে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। কেন কি, সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষজন তো ক্রমাগতই হাঁটছিলই। হাঁটতে হাঁটতে তারা সীতাপতিকে আড়নয়নে দেখছিল। সেটা সীতাপতির কাছে খুবই অস্বস্তিকর।

মন্দাকিনীর পিছু পিছু পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে সীতাপতি।

মন্দাকিনী খুব আদর করে বসান ওকে।

সীতাপতি বিনা বাক্যব্যয়ে বসে মেঝের ওপর মাদুরের আসনে। সারা ঘরে, ঘরের কোণে, আনাচ কানাচে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরিখ করতে থাকে।

অতি তুচ্ছ, সাধারণ আসবাবপত্র, বাসনকোসন, তৈজসাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরময়। সারা বাড়ি, ঘর, দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, আলনায় ঝুলতে থাকা কাপড়চোপড়,—সবকিছুর মধ্যে এক জাতের গরিব-গরিব ব্যাপার রয়েছে বলে মনে হয় সীতাপতির। সাধারণত বস্তি-টস্তিতেই ছোট জাতের মানুষের ঘরদোরে সবকিছুর মধ্যে এমনতরো নোংরা-নোংরা, ময়লা-ময়লা ব্যাপার থাকে। কিন্তু নিজেদেরই বংশে জনম নেওয়া একটি মেয়ে, যে কিনা জবরদস্ত জমিদারবাড়ির বউও বটে, তার এহেন করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে করতে অপরিসীম লজ্জায়, ঘেন্নায় সীতাপতির বুকের মধ্যে তীব্র অম্বলের চোঁয়া-জ্বলন চলতে থাকে নিঃশব্দে। ফলে, তার সারা মুখ জুড়ে যে এক ধরনের বিবমিষা ফুটে ওঠে, তা মন্দাকিনীর দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু মন্দাকিনী সেটা দেখেও দেখেন না। নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে তিনি একে একে বাপের বাড়ির প্রত্যেকের খবরাখবর নিতে থাকেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

খুব যান্ত্রিক গলায় সব প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে সীতাপতি। তবে, তার জবাব দেবার ধরনেই ততক্ষণে মন্দাকিনী বুঝে ফেলেছেন, আদরের ভাইটি তার দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। একজন ঝানু উকিল এসেছে তার মক্কেলের হয়ে সওয়াল করতে।

কাজেই, মন্দাকিনীর বুকের মধ্যে অবিরাম সতর্কতার ঘণ্টা বাজতে থাকে। তিনি মনে মনে একটা ঝড়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন নিঃশব্দে।

সেই সকালে বেশিক্ষণ আমড়াগাছি করে সময় নষ্ট করতে চায়নি সীতাপতি। খুব জলদি সে প্রসঙ্গে চলে আসে। মন্দাকিনীর জীবনযাপনের প্রসঙ্গ তুলে তুমুল তর্ক জুড়ে দেয়। মন্দাকিনীর ক্রিয়াকলাপ যে তাদের সবাইয়ের মাথা হেঁট করে দিয়েছে, ইচ্ছে থাকলেও ওদের পরিবারের কেউই যে হাজার

উৎসব—পাবর্ণেও সন্ধিপুরে পা রাখতে পারে না সীমাহীন লজ্জায়, এবং এর ফলে বংশের অবিবাহিতা মেয়েগুলোর জীবনেও যে নেমে আসতে পারে নিদারুণ অনিশ্চয়তা, সেটাই দিদিকে বারবার বোঝাতে চায় সীতাপতি, কিনা, 'পাত্রীর পিসি জাত খুইয়া মাঝিপাড়ায় গিয়া বাস কচ্ছে, মাঝি-জেলে-কৈবর্ত সবার হাঁড়িতে খাচ্ছে, এমন বংশের মেয়াকে বউ করিয়া ঘরে তুলবে কিনা ভাবো হে।'

শেষ পর্বে সীতাপতি একেবারে হিংস্র হয়ে ওঠে, আমাদের সক্কলের মান-সম্মান লিয়া তুমি এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পার না। তুমার কুনো অধিকারই নাই তেমনটা করবার।

তিলমাত্র বিচলিত দেখায় না মন্দাকিনীকে। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেন, তো আমাকে কী করতে বলিস্ তুই?

—তোমাকে ওইসব চুয়াড়-চাঁড়ালের সাথ মেশামেশি, ঘসাঘসিটা এক্কেবারে বন্ধ করতে হবে। তাদের ভিটাতেই পা দিতে পারবেনি তুমি।

—বটে! মন্দাকিনী সীতাপতির চোখে সরাসরি চোখ রাখেন, আমি তাহলে কার সাথে কথা কইব, কার সাথে মিশব, বলিয়া দিয়া যা। মানুষ তো আর বোবার মতো বাঁচতে পারে না দিনের পর দিন। মানুষকে বাঁচিয়া রইতে হইলে পাশে মানুষ চাই।

মন্দাকিনীর প্রশ্নটাকে সাবধানে এড়িয়ে যায় সীতাপতি। বলে, তুমি আমাদের সবাইকে কী পরিমাণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছ ভাবো দেখি। আমাদের মান-মর্যাদা একবারে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছ তুমি। চারপাশের মানুষ এসব দেখে কী ভাবছে বল দেখি?

ওই নিয়ে সারা সকাল চলতে থাকে তিক্ত বাদানুবাদ। মন্দাকিনী একের পর এক ছুড়তে থাকেন প্রশ্নের চোখাচোখা তীর। ঠোঁটে প্রবল ভাঙচুর এনে বলেন, তুই প্রকাশ্যে রাস্তার গা ঘেঁষিয়া বাহ্যি করতে বসলু, তাতে তোর মান গেলনি, আর পথচলতি মানুযজন সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ হাঁটছিল বলিয়া তাদের ধমকাচ্ছু! বলেন, যখন পেটের ছেলা রূপসি বউয়ের কথায় লাচিয়া তার ষাট বছর বয়েসি মা-কে শত মানুষের সুমুখ দিয়া খেদিযা দিল, তখন কুথা ছিলি রে তোরা? কার মানকচুর গাছে সার দিচ্ছিলু তখন? তখন তোদের মান যায় নি?

এসব কথার ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে না সীতাপতি। তাই বলে মেনে নিতেও পারে না দিদির যুক্তিগুলো। বেলা যত গড়ায় পরিবেশ ততোই উত্তপ্ত হতে থাকে। সময়ের গায়ে ছ্যাঁকা লাগতে থাকে মুহুর্মুহু।

একসময় খুবই তিক্ত পরিবেশ তৈরি করে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার হুমকি দিয়ে, সীতাপতি জোরে জোরে পা ফেলে মুখুজ্যাগড়ে ফিরে যায়। কুন্দর শত পীড়াপীড়িতেও এক কাপ চা-ও খায় না, এমন কি এক ফোঁটা জলও মুখে ঠেকায় না মন্দাকিনীর ভিটেয়।

সীতাপতি চলে যাবার পর মন্দাকিনী কুন্দর উপর বাঘের ঝাপট নেন, কিনা, চা খাবার তরে অত ঝুলাঝুলি কচ্ছিলি কেন রে মাগী? আদিখ্যেতাটা না দেখালে চলছিলনি? এরপর যদি বাইরের কেউ এলে নিজের থিকে কুটুম্বিতা কত্তে দৌড়িয়া যাউ তো চ্যালাকাঠে পিঠটা ভাঙব তোর।

মন্দাকিনীর রুদ্ররূপ দেখে থতমত কুন্দ রান্নাঘরে ঢুকে তখনকার মতো চোখের আড়াল হয়ে বাঁচে।

ইদানীং কুন্দর হয়েছে এক নতুন জ্বালা।

রোজ সকলে, পুরোনো আমাশার রোগীরা যেমন আগলবাগল হয়ে বাহ্যি বসতে ছোটে, কিংবা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, পান বা তামাকের নেশাড়ি মানুযেবা যেমন করে পান-তামাকের জন্যে হেদিয়ে পড়ে, মন্দাকিনীও ঠিক তেমনি করে ব্যাকুল গলায় কুন্দকে ডাক পাড়েন, চল্ কুন্দ, অমুকের বাড়ি ঘুরিয়া আসি। তমুকের বাড়ি একটিবার না গেলেই নয়। রোজদিনই নিজের থেকে যেতে থাকেন মাঝিপাড়া, গুচ্ছাতপাড়ার বাড়িগুলোতে।

এতোটা বাস্তবিক ওরাও আশা করেনি। জমিদার-বাড়ির বড়গিন্নিজ্ঞানে চাষাভুষো পড়শিরা তখনও অবধি তাঁকে সন্তর্পণে এড়িয়েই চলত। কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করে তিনি নিজেই হানা দিতে থাকেন পড়শিদের বাড়ি-বাড়ি। যাদের বাড়িতে একটুখানি পায়ের ধূলা দিতে কতোই না কার্পণ্য ছিল তাঁর, সেই

প্রজাতুল্য গেরস্থের বাড়িগুলোতে 'কী লো, কী করছিস তোরা?' বলে ঢুকে পড়তে থাকেন অবলীলায়।

বলেন, ঘরে বুসিয়া বুসিয়া হাতে-পায়ে বাত ধরিয়াল-অ। চলিয়া আইলাম। বুসতে কইবিনি?

মন্দাকিনীর এহেন আচরণে একেবারে হকচকিয়ে যায় মানুষগুলো। লজ্জায়, সঙ্কোচে, এবং ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায় বুঝি। কিন্তু সেদিকে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে মন্দাকিনী এমনভাবে গল্পগুজবে মেতে ওঠেন, যেন কতকালের বন্ধু-স্বজন এই মানুষগুলি।

ধীরে ধীরে, ওদের বাড়িতে যাওয়াটা মন্দাকিনীর কাছে একধরনের নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। একজাতের কড়া উত্তেজক নেশা।

একদিন দুপুরের পর মন্দাকিনী গেলেন গগন দলাইয়ের বাড়িতে।

মা পদিবুড়ি আর বউ প্রমীলা উঠোনে চাট্টি কুলখা শাক নিয়ে বাছতে বসেছে। সহসা মন্দাকিনীকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ওরা। যদিও তখন আর আগের মতো অবাক হয় না, কিন্তু তবুও বড় মানুষটা ঘর বয়ে এসেছে, ব্যস্ত হয়ে তো উঠবেই।

প্রমীলা দৌড়ে গিয়ে মাদুর নিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু তার আগেই মন্দাকিনী বসে পড়েছেন গগনের মায়ের পাশটিতে। চটের আসনের একপাশে।

প্রমীলা বলে, চটের উপর ক্যানে বড়মা, মাদুর পাতিয়া দিচ্ছি, বসুন।

—ক্যানে লো? প্রমীলাকে ধমকে ওঠেন মন্দাকিনী,...মাদুরে বুসলে কি আমার আরও দুটা পা গজাইবে?

একগাল হেসে প্রমীলা মন্দাকিনীর সঙ্গে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে বসে।

—এগুলো কী শাক র‍্যা?

—এগুলা? গগনের মা সসঙ্কোচে জবাব দেয়।—কুলখা শাক গো।

—কুলখা শাক? বাপের জন্মে নাম শুনিনি।

—শুনবে কী করিয়া, এ শাক কি তুমাদের ঘরে ঢোকে?

—কেমন করিয়া খায় এ শাক?

—ভাজিয়া খায়, চচ্চড়ি রাঁধিয়া খায়...।

—কেমন লাগে?

—ভালোই লাগে, তবে তুমাদের মুখে রুচবেনি। এসব হইল আমাদের গরিবানি শাকপাতা।

—আ মর, ছিনার মাগীর কথা শুনো না! মন্দাকিনী সহসা চটে যান, শাকের গায়ে কি গরিব-বড়লোক লেখা থাকে নাকি র‍্যা? কুলখা শাকের চাষ করু তোরা?

সে কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে প্রমীলা,...এ শাক চাষ করতে হয় না গো বড়মা। পুকুরের ধারে ধারে এ শাক আপনা-আপনিই হয়।

মন্দাকিনী কুন্দর দিকে তাকান, এদের পুকুরপাড় থিকে কিছোটা শাক লিয়া যাবি তো রে একদিন। রাঁধিয়া খাব।

বলতে বলতে মন্দাকিনী আলগোছে হাত লাগান শাকে, এক-একটি শাক ধরে বাছতে থাকেন অপটু হাতে। প্রমীলা বিস্ময়ে এমনই থ হয়ে যায় যে মন্দাকিনীকে নিরস্ত করবার কথাটাও বুঝি ভুলে যায়।

মন্দাকিনীর আদিখ্যেতায় কুন্দ মনে মনে বিরক্ত। বলে, এদের পুকুরপাড় থিকে ক্যানো, কুলখা শাক খাইতে হইলে বকদিঘির পাড়েই গাদ্দা।

—গাদ্দা তো অ্যাদ্দিন তুলিসনি কেন রে পুড়ারমুখী?

—আ-হা, আমি কী করিয়া জানব যে তুমার এইসব ইসিড়-বিসিড় শাকপাতায় মন? এসব শাক তুমরা বাপের জন্মে খাইছ নাকি?

সেকথায় সহসা থমথমে হয়ে ওঠে মন্দাকিনীর মুখ। বিড়বিড় করে বলেন,—বাপের জন্মে তো অনেক কিছোই করিনি, এখন তো সেসব কচ্ছি।

একটু বাদে মন্দাকিনী বলে ওঠেন, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়িতে পান নেই? খায় না কেউ?

গগনের মা খুব পানখোর। তার মুখে সারা দিনমান দোক্তাপান গোঁজা থাকে। কিন্তু ওই পান যে বড়-কত্তামা আচমকা চেয়ে বসবেন, এটা তার প্রত্যাশার অতীত ছিল।

মন্দাকিনীর প্রস্তাবে সে সসঙ্কোচে তাকায়। বলে, পান তো আছে, কিন্তু সে পান কি আপনাকে দিবা যায়?

—আ মর, খাবার চিজ যখন, না দিবার কী আছে? মুখটা বড় টক-টক লাগতিছে। যা তো পঞ্চমী—। গগনের বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনী বলেন—ভালো করিয়া একটা পান বানিয়া আন তো মা।

শশব্যস্ত হয়ে ময়লা হাতে পানসেজে নিয়ে এল প্রমীলাই।

মুখে পুরে এমন তৃপ্তি করে চিবোতে থাকেন মন্দাকিনী, দেখে মনে হবে, এমন খানদানি পান বুঝি কোনওকালেই খাননি।

বলেন, তোদের বাড়িতে কেয়া-খয়ের নাই? কেয়া-খয়ের দিলে এ পানের স্বাদ আরও বাড়িয়া যাইত। শঙ্করের বড়পিসি এমন কেয়া-খয়ের বানায়, খাইলে পাক্কা দুদিন গন্ধ থাকে মুখে।



এইভাবে, একটু একটু করে, পান, জল ও ফল-ফুলারির আদান-প্রদান ঘটতে ঘটতে একসময় তা রান্না করা তরকারিতে গিয়ে ঠেকে।

গায়ে গা লাগিয়ে মিশতে গিয়ে মন্দাকিনী তিলেতিলে অনুভব করতে থাকেন, এই ছোটোজাতের গরিব মানুষগুলির বুকের মধ্যে ধনীদের চেয়ে ঢেরগুণ মায়া, মমতা, উদারতা। এরা তাঁর স্বজাতিদের চেয়ে ঢের বেশি সরল এবং পরোপকারী। বাইরে ছোটোলোক বটে, কিন্তু তাদের মনগুলো অনেক বড় মাপের। তাদের অনাবিল আন্তরিকতা, ভড়ংহীন আচরণ, অন্তর থেকে অন্যের পাশে দাঁড়াবার প্রবণতা, সবকিছুর থেকে তিনি এতটাই মুগ্ধ হতে লাগলেন দিন দিন এবং ওই জীবনের মধ্যে থেকেই এমন এক নতুন স্বাদ পেতে লাগলেন, এতটাই বিচিত্র রসের সন্ধান পেলেন, ক্রমশঃ মজতে লাগলেন তাতে।

ধীরে ধীরে মেকি আভিজাত্যকে তাঁর অসহ্য বলে মনে হতে লাগল। তখন গা থেকে সোনার গহনাটি খুলে ফেলতে পারলেই বুঝি বাঁচেন। যেমন করে প্রখর গ্রীষ্মের দিনে কোথাও থেকে বেড়িয়ে ফিরেই গায়ের ভারী ভারী মহার্ঘ বসনভূষণগুলিকে খুলে ফেলতে পারলেই শান্তি আসে শরীরে, মনে।

ধীরে ধীরে তাঁর সামনে খুলে গেল এক আজব দুনিয়ার দরজা, যে দুনিয়ার খোঁজ তিনি এতাবৎকাল রাখতেন না, রাখবার প্রয়োজনই বোধ করতেন না। তাঁর চারপাশে এত যে অচেনা রয়েছে এই পৃথিবীটা, একেবারেই জানা ছিল না তাঁর।

ওই নতুন দুনিয়াটাকে চিনতে চিনতে, বুঝতে বুঝতে নিজেকেও বুঝি নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকেন মন্দাকিনী। বুকের মধ্যে যে একটা বন্দী পাখি একবারে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে ছিল একটি মহার্ঘ খাঁচায়, সে-যে দিন দিন ওই খাঁচার মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছিল, এটা সজ্ঞানে যেদিন উপলব্ধি করলেন মন্দাকিনী, সেটাও তাঁর কাছে এক বড়সড় আবিষ্কার।

ধীরে ধীরে ওই দুনিয়াটার প্রতি, তার সবকিছুর প্রতি, একধরনের ভালোবাসা দানা বাঁধল মন্দাকিনীর মনে। সেই ভালোলাগাটা মিছরির দানার মতো জমাট বাঁধতে লাগল আকারে। ওদের প্রতি, ওই জীবনটার প্রতি একটা অদম্য টান তৈরি হল।

এখন তো এই জীবনটাকে, চারপাশের এই মানুষগুলোকে প্রাণের অধিক ভালোবেসে ফেলেছেন মন্দাকিনী। মানুষগুলোকে খুবই আপনার বলে মনে হয়।

এখন মন্দাকিনী বোঝেন, কোন্ শক্তিতে, কোন্ মধুর জোরে, এই মানুষগুলো বংশ-বংশ ধরে সবচেয়ে কম খেয়ে, সবচেয়ে বেশি খেটে, বেঁচেবর্তে রয়েছে প্রজন্ম ধরে, রসে-বশে, প্রেমে প্রতিবাদে, সমাজ গড়ছে, ভাঙছে, স্বপ্ন দেখছে...।

প্রথম-প্রথম মনে হত, এমন জীবনেও স্বপ্ন দেখা সম্ভব? কিন্তু মন্দাকিনীর এখন আর কোনওই সন্দেহ নেই, ওরাও রীতিমতো স্বপ্ন দ্যাখে। কত হাজার উপায়ে যে বেঁচে থাকবার রসদ সংগ্রহ করে ওরা রুক্ষ জীবনের মাটি থেকে! কেমন করে একেবারে মরুভূমির ভেতর দিয়ে নালা কেটে কেটে ওরা ভিজিয়ে দিতে পারে উষর মরুর বুক। দেখতে দেখতে একেবারে অবাক হয়ে যান মন্দাকিনী।

অথচ মন্দাকিনী যে সমাজে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, সেখানে মানুষের দেহ-মনের সর্বাঙ্গে কতই না শেকল! সেখানে কথায় কথায় কত বাধা! সেখানে প্রতি মুহূর্তে কত হিসাব। সেখানে প্রাসাদে বাস করেও প্রতি মুহূর্তে কত হীনতা, নিচতা, ক্ষুদ্রতা।

কুন্দ ইদানীং লক্ষ করছিল, মন্দাকিনীর দৈনন্দিন জীবনে, আচার-আচরণে, কথায়বার্তায়, মুদ্রায়, রীতিনীতি পালনে নিজের অজান্তেই একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে চারপাশের গরিব-গুরবোদের জীবনযাপনের ধরনগুলি। জোরে জোরে কথা বলা, হো হো করে হেসে ওঠা, থপথপিয়ে পা ফেলে জোরে হেঁটে যাওয়া, ঘটির মুখে ঢকঢকিয়ে আওয়াজ তুলে জল খাওয়া, কথায় কথায় 'আ...মর' গোছের ব্রাত্য শব্দ উচ্চারণ করা, ভাতের মধ্যে কাঁচা লঙ্কা চটকে চটকে দলা পাকিয়ে নাচাতে নাচাতে মুখের মধ্যে পাচার করে দেওয়া, প্রথমে শুকনো ভাত মুখে পুরে তারপর ডাল কিংবা তরকারি নামমাত্র মুখে পোরা...সবকিছুই নিজের অজান্তেই সেঁধিয়ে যাচ্ছে তাঁর মধ্যে।

একদিন অনেক বেলা অবধি কিছুই খেলেন না মন্দাকিনী। তাই দেখে কুন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শরীল-টরীল খ্যারাপ নাকি বড়মা?

—আ মর্, শরীর খারাপ হইতে যাবে কেন?

—তবে? এতখানি বেলা হইল, অথচ কিছু খেলেনি...।

—বাহ্, আইজ পাড়ায় বড়াম পূজা নয়?

—বড়াম পূজা তো তুমার কি?

—বাহ্, বড়াম পূজার দিনে উপাস করতে হয় না? সব ঘরেই তো উপাস দিচ্ছে আজ। তুইও উপাস কচ্ছু।

এতকাল বড়াম পুজোর নামটাই কেবল শুনেছেন মন্দাকিনী। কিন্তু কেমন সে ঠাকুর, কেমন তাকে পুজো করবার ধরনাদি, তেমন করে কিছুই জানতেন না। নতুন পাড়ায় এসে দেখলেন, বড়াম পুজোর দিনে উপোস করে মাঝিপাড়া-গুচ্ছাতপাড়ার প্রায় সব্বাই। আর, তাই দেখে এ বছর বড়ামপূজার দিনে খোদ মন্দাকিনীই অন্যদের সঙ্গে উপোস করবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন।

মন্দাকিনী বলেন, তোরা সবাই উপাস করছু, আমিও কল্লাম।

কুন্দ হাসবে না কাঁদবে, ঠাহর পায় না।



চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে মন্দাকিনী একটু একটু করে বিশ্বাস করতে থাকেন যে, খড়ের গাদায় মুরগি নাচলে বৃষ্টি হয়। কথা বলতে বলতে আচমকা দাঁত কামড়ে ফেললে বড় জাতের মাছ খাওয়ার সম্ভাবনা। চালধোয়া পাখি জোড়সংখ্যক দেখলে সংসারে বিপদ ধেয়ে আসে..। জীবনে কখনও বঁইচি কিংবা আঁকো নামক বুনো কুলগুলি দাঁতেও কাটেননি, এখন রাধানাথ দলাইয়ের ব্যাটা পচাকে রোজ তাড়া দেন ওইজাতের কুল এনে দেবার জন্যে। এমন কি, মন্দাকিনী ধীরে ধীরে ছাগল, হাঁসের বাচ্চা এনে পুষতেও থাকেন। ছাগলগুলিকে রোজ নিজের হাতে দুব্বোঘাস খাওয়ান। হাঁসগুলোকে খুদে-জলে মেখে খেতে দেন নিয়ম করে। ডিম পাড়লে নিজের হাতে তুলে এনে ধরিয়ে দেন কুন্দর হাতে। বলেন, তুই খাবি, আর মাঝে মাঝে শিখা-জটিলার দুয়োরেও পাঠাস। শিখার ব্যাটাটাকে ইদানীং বেশ রোগা দেখায়। মাঝে মধ্যে ডিমসিদ্ধ খাইলে...।

ধীরে ধীরে মন্দাকিনী তাঁর নতুন ভিটেতে লাগাতে থাকেন সেই সমস্ত গাছ, যা সাধারণত

ছোটোলোকেরাই নিজেদের ভিটেতে লাগায়-টাগায়। বাস্তবিক, মুখুজ্যাগড়ের গাছেদের সঙ্গে ওইসব গাছের দুস্তর ফারাক। মুখুজ্যাগড়ের ভিটেতে রয়েছে সব অভিজাত গাছগাছাল,...একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ রয়েছে বিশাল ঘেরা উঠোনের এক কোণে, ফুলের মরসুমে সারা উঠোন মায় বৈঠকখানা অবধি ম-ম করতে থাকে। হিরণ্ময়ের বাবা কোত্থেকে যেন আনিয়েছিলেন কিছু চন্দনের গাছ, লাগিয়েছিলেন খিড়কি-পুকুরের পাড়ে, লাইন করে প্রায় হাফ ডজন, অ্যাদ্দিনে ওগুলো বেশ মোটা হয়েছে। অন্দরমহলের লাগোয়া ফুলের বাগানে কুন্দ, গন্ধরাজ, দোলনচাঁপা গোছের গাছ তো ছিলই, তার ওপর রত্নহীরা এলে পর নিজের বাপের বাড়ির শহর থেকে আনিয়েছিল গোলাপ ফুলের চারা, শীতকালটা ফুলে ফুলে মাতিয়ে রাখে গোটা বাগান। এসব গাছ ছোটোলোকদের বাড়িতে বড় একটা দেখা যায় না। তাদের বাড়িঘরের সামনের জমিতে জবা, ছোটো টগর, নয়নতারা, গাঁদা জাতীয় ফুলের গাছ, ভিটের সীমানা জুড়ে কাঠগোলাপ, মাদারি গোছের গাছ। বাস্তবিক, যদি কখনও ওই দু'জাতের ভিটের থেকে মুছে দেওয়া যায় বাড়ি ঘর, সরিয়ে নেওয়া হয় মানুষজনকে, তবুও শুধু গাছগাছালির ধরন দেখেই বলে দেওয়া যাবে, কোন্‌টা অভিজাত ভিটে, কোন্‌টাই বা সাধারণ ভিটে।

আসলে, মন্দাকিনী একটা অন্য দুনিয়ায় প্রবেশ করছিলেন। অসীম কৌতূহল নিয়ে দেখছিলেন দুনিয়াটাকে। আর, যতই দেখছিলেন, ততই বুঝি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলেন।

দিনের শুরুতেই যখন তাঁর উঠোনটি হরেক জাতের অ-কুলীন পাখি-পাখালে ভরে যায়, মন্দাকিনী তাদের সামনে ছড়িয়ে দেন খুদের দানা। অসীম বিস্ময়ে দেখতে থাকেন পাখিগুলোর খুঁটে খাওয়া। দাওয়ায় বসে তাঁর অলস সময় কেটে যায় মাঝ-উঠোনে শালিখগুলোর ঝগড়া দেখতে দেখতে। ইদানীং সময় পেলেই কামারপাড়ায় চলে যান পায়ে পায়ে। নিধু কামারের কামারশালে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোহা পুড়িয়ে, পিটিয়ে, বঁটি তৈরির কৃৎকৌশলটা দেখতে থাকেন স্বচক্ষে। কুমোরপাড়ায় গিয়ে জগু কুমোরের চাক ঘুরিয়ে হাঁড়ি-কলসি বানানোটা অসীম বিস্ময়ে দেখতে থাকেন সারা বিকেল। কেমন করে চাষারা ঢেঁড়সের বীজ পোঁতে ঝুরঝুরে মাটিতে, কেমন করে বেগুনের বীজতলা ফেলে মাটির কড়াইতে, কেমন করে ধানের বীজতলা থেকে বীজ তোলে, চারা রোয়, ধান কাটে, আঁটি বাঁধে..., কেমন করে ঢাক-কদমের গাছে ঢ্যামনা সাপ উঠে পাখির বাসা থেকে ডিম, বাচ্চা খেয়ে নেয়, আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে কালীসাধনা করে ত্রৈলক্য মাঝি, ঢাক বাজানোর তালিম নেয় ডোমপাড়ার ছোকরারা, মাঝিপাড়ার বাচ্চাগুলো বকদিঘির ওপাড়ের ঘাটে নেমে পুকুরের জল তোলপাড় করে গরমের দিনে, মন্দাকিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকেন সেইসব দৃশ্য। জটিলা-প্রমীলা-সন্ধ্যাদের বাড়িতে গিয়ে নিবিষ্ট মনে শিখে নেন, কেমন করে মুড়ি ভাজে, খই ভাজে ওরা। একেবারে সামনেটিতে বসে দেখতে থাকেন, কেমন করে শনের দড়ি পাকায় গগনের বাপ মুরুলি।...

বকদিঘির উত্তরপাড়ে মরসুমটি এলেই চাকুন্দার গাছগুলো হলুদ ফুলে ভরে যায়। বর্ষাকালে বকদিঘির ঈশেন কোণে শোলমাছের বাচ্চাগুলো ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে থাকে বুড়ি মায়ের পিছু পিছু। লেজওয়ালা কালো কালো ব্যাঙাচিগুলোর লেজ খসে খসে একদিন ব্যাঙ হয়ে যায়। ব্যাঙকে সাপে ধরে, মরণ-কান্না জোড়ে ব্যাঙটা। মন্দাকিনী প্রবল আগ্রহ নিয়ে সবকিছুর সাক্ষী হয়ে যান।

প্রমীলার বাড়িতে পোয়াতি গাইটা বাচ্চা প্রসব করল, রাতভর টানা-হেঁচড়া চলল, কুন্দর বারংবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও মন্দাকিনী কিছুতেই ওদের উঠোন ছেড়ে আসতে পারেন না। শিখার কাছে বসে তিতাকাল্লা দিয়ে লটে শাক, কুড়কুড়া ছাতু দিয়ে আলতি-কচুর ঝোল, সরষেবাটা দিয়ে চুনো মাছের পাতাপোড়া, কিংবা পাকা তালের মন্ড আর চালের গুড়ো শক্ত শক্ত করে মেখে, কলাপাতায় মুড়ে উনুনের জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পোড়াপিঠে বানানোর কৃৎকৌশলগুলি মনোযোগী ছাত্রের নিষ্ঠায় শিখে নেন। বাঁশের কচি কোঁড়ের ওপর মাটির হাঁড়ি চাপা দিয়ে রাখলে কিছুদিনের মধ্যে কোঁড়টি হাড়ির ভেতরে আকারে বাড়তে বাড়তে একসময় ফুলকপির মতো হয়ে ওঠে। রেঁধে খেলে যেন অমৃত্তো। মন্দাকিনী দাঁড়িয়ে থেকে বকদিঘির দক্ষিণপাড়ের বাঁশের ঝাড়ে বাঁশের কচি কোঁড়ের ওপর কুন্দকে দিয়ে হাঁড়ি চাপা দেওয়ান। ধীরে ধীরে গীমা-হিংচা-কুলখা-সানচা-শুশুনি-পিড়িং-খলসা, এবং

খামালু, শুডুম-আলু জাতীয় গরিবানি শাক-সবজিগুলিকে চিনতে ও চাখতে থাকেন। কচি লাউ কেটে খোসাগুলোকে কালোজিরে দিয়ে ভাজবার জন্যে আলাদা করে তুলে রাখেন। কাঁচকলার খোসা দিয়ে এমনই খাসা বড়া বানিয়ে ফেলেন যে, কুন্দও খেয়ে ধন্যি ধন্যি করতে থাকে। গগন দলাইয়ের ব্যাটাকে দিয়ে ওলদার জঙ্গল থেকে বন-কুঁদরি, কাঁকরোল আনিয়ে খান। ভাম, বেজি এত কাছ থেকে দেখেননি আগে। জীবনে সেই প্রথম জটিলাদের ভিটের মধ্যেকার ডোবার পাড়ে ভাম, আর শিখার ভিটের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো বেজিগুলোকে দেখতে দেখতে রোমাঞ্চে শিহরিত হন। আর, রোজদিন, শেষবিকেলে বকদিঘির পাড়ে বসে দেখতে থাকেন, বকেরা কেমন ধ্যান করবার কায়দায় শিকার করে পুকুরের মাছ। আর, এইসব দেখতে দেখতে, বুঝতে বুঝতে, চিনতে চিনতে, চাখতে চাখতে, তাঁর শরীর থেকে একটু একটু করে খসে পড়তে থাকে যাবতীয় আভিজাত্যের অভিজ্ঞানগুলি। তখন তিনি কুন্দকে নিয়ে গুচ্ছাতপাড়ায় কীর্তন শুনতে চলে যেতে পারেন অবলীলায়, কীর্তনের আসরে সবাইয়ের সঙ্গে মাটিতে থাবড়ে বসে পড়তে পারেন অক্লেশে, বরং সবাইয়ের থেকে তাঁকে আলাদা করে সনাক্ত করে বাড়তি মর্যাদা কিংবা সুখ-সুবিধে দিতে চাইলেই রেগে কাঁই হয়ে যান। মাঝিপাড়ার সন্ধ্যা দলুইয়ের কচি বাচ্চাটিকে, নাকভর্তি সিগনি তার, কোলে নিয়ে এমনভাবে আদর করতে থাকেন, মনে হবে, বুঝি নিজের ছেলের ছেলে নাতিটিকে কোলে নিয়েছেন। কথায় কথায় আউড়ে যেতে পারেন খনার বচন, কিনা, 'ষোল চাষে তুলা/তার অর্ধেক মূলা/তার অর্ধেক ধান/বিনা চাষে পান'। নির্দ্বিধায়, মুড়ি-মুড়কির মতো আউড়ে যেতে পারেন, 'কারোর দিন কাটে এমনি/কারোর বউয়ের পরেও তেমনি' গোছের শোলক, কিংবা 'এটির ভিতর ওটি দিয়ে, মাগ-ভাতারে রইল শুয়ে...' গোছের কালিদাসের হেঁয়ালি। কিংবা লরিয়া ডোমের কিপটেমোর গল্প শুনে অবলীলায় ছড়া কাটেন, 'এক পয়সার তৈল/কিসে খরচ হৈল/তোমার দাড়ি, আমার পায়/আরো দিয়েছি ছেলের গায়/ছেলেমেয়ের বিয়ে হ'ল/সাত রাত্তির গান হ'ল/কোন্ আবাগী ঘরে এল/বাকি তেলটা নিয়ে গেল।' তখন তিনি অনায়াসে খড়ের ছাওয়া চানঘরের বদলে বকদিঘিতে উদোম শরীর ডুবিয়ে চান করতে পারেন। চান চলাকালীন ওপারের ঘাটে বাসন মাজায় রত পচার মার সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রসের কথা বলতে পারেন, এবং চান শেষে ভিজে কাপড়টি উদোম শরীরে জড়িয়ে নিয়ে অবলীলায় বাইরের মানুষজনের সুমুখ দিয়ে ফিরে আসতে পারেন বাড়িতে। এমন কি, বিকেল নাগাদ পাড়া বেড়াতে যাবার কালে, পথ হাঁটতে হাঁটতে আচমকা পাতলা ঝোপের আড়ালে শরীরটাকে অর্ধেক আড়াল করে ঠিক গুচ্ছাত-দলুইপাড়ার মেয়েদের মতো, উর্ধ্বাঙ্গকে নুইয়ে জমিনের সমান্তরালে এনে একেবারে গাই-গরুর মুদ্রায় পেচ্ছাব করতে পারেন অবলীলায়।

একদিন কুন্দকে কাছটিতে ডাকেন মন্দাকিনী। বলেন, দ্যাখ্ তো রে কুন্দ, শিখাদের বাড়িতে পুকুরে জাল ফেলতিছে কিনা।

কুন্দ বিরক্তি মাখানো গলায় বলে, ক্যানে? অরা জাল ফেলতিছে কিনা তাতে তুমার দরকারটা কি?

—না, বলতেছিলাম, যদি জাল-টাল ফেলে তো সামান্য মাছ লিয়া আয় তো। আমার কথা কইবি।

—মাছ লিয়া কী করবে তুমি? কুন্দ অবাক চোখে তাকায়।

—মর্ মাগী, মাছ লিয়া লোকে কী করে? খাব, বুঝলি, খাব। সইর্যা দিয়া মাছের ঝাল-বাটনা খাবার বড় সাধ হয়েছে মনে।

কুন্দ কাজ থামিয়ে মন্দাকিনীর দিকে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকায়। চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে যায় বুঝি। বলে, তুমি মাছের ঝাল-বাটনা খাবে?

—ক্যানে? মাছের ঝাল-বাটনা কি একটা অখাদ্য চিজ নাকি? এমন করিয়া চাইয়া আছু ক্যানে?

কুন্দ বুঝি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে,—তুমি বলছ কি গো বড়মা? বিধবা মানুষ তুমি, মাছ খাবে কি?

—তোর কথা শুনলে গা জ্বলিয়া যায় কুন্দ। পচা দলাইয়ের মা কিংবা সন্তোষ মাঝির বউ মাছ খায় না? তারা বিধবা লয়?

—তারা আর তুমি এক হইল? মাঝি-বাগদির ঘরে অত বাছ-বিচার নাই। অদের সব চলে। তুমি হইলে

কিনা বামুনঘরের বিধবা। লিজের বংশটা দেখবে তো।

সেকথায় সহসা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন মন্দাকিনী,—আর বামুনঘর, উচ্চ বংশ, এসব দেখাইস্ না মাগী। বংশের মুয়ে নুড়া জ্বালিয়া দিই আমি। মাথা নাই তার মাথাব্যথা!

বাস্তবিক, এককালে দৈনন্দিন জীবনযাপনে উচ্চবংশসুলভ যেসব আঁটোসাটো নিয়মগুলি মানতে হত তাঁকে, মনে আনন্দ ছিল, তৃপ্তি ছিল, বেশ অহংকারও বোধ করতেন ওইসব মানতে গিয়ে, কিন্তু ইদানীং মন্দাকিনী বুঝি তিলেতিলে বুঝতে পারছিলেন, ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ঢিলেঢালা হয়ে এসেছে সেসব। ক্ষুদিরাম দলাইয়ের বিধবা মা, কিংবা সন্তোষ মাঝির বিধবা বউ বৈধব্যের তেমন কোনও নিয়মই মানে না। আমিষও খায়, একাদশী-টশীও করে না কস্মিনকালেও। তাদের সঙ্গে অবিরাম গা-ঘষাঘষির ফলে মন্দাকিনীর বুকের ভেতরের সংস্কারাদির মধ্যে নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে এক বৈপ্লবিক ওলোটপালোট। যেহেতু, মনের মধ্যে যাবতীয় উচ্চবংশের গরিমা, আভিজাত্যের গুমোর-টুমোর ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত, উঁচু জাতের মধ্যেকার কঠোর সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাগুলিও মনের গভীরে আলগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বাস্তবিক, নিজেদের সমাজের নিয়মকানুনগুলোর প্রতি কিছুদিন যাবৎ এক ধরনের বিদ্বেষ জমছিল বুকের মধ্যে। আভিজাত্যের এত বড়াই করে যারা, তারাই তো বুড়ো বয়েসে তাড়িয়ে দিল নিজের গর্ভধারিণী মাকে। কোনও যোগাযোগই তো রাখে না। নিচুজাতের সঙ্গে মিলেমিশে তো বেশ বেঁচে আছেন মন্দাকিনী। তাদের সর্বক্ষণের সাহায্য না পেলে বিপদে পড়ে যাবেন তিনি। আর, ভেতরে ভেতরে কিনা জাতের গুমোরে মরতে বলছে কুন্দ! কিনা, ব্রাহ্মণ বংশের বিধবা তিনি, মুখুজ্যা বংশের বউ, আ—হা, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! জাত নিয়ে ধুয়ে খাবেন নাকি?

হয়ত এভাবে, এতটা সচেতনভাবে কথাগুলো ভাবেননি মন্দাকিনী। হয়ত বা বুকের গভীরে অজান্তে সারাক্ষণ ঘাই মারছিল ভাবনাগুলো। আসলে, গরিব-গুরবোদের সংস্পর্শে অষ্টপ্রহর থাকতে থাকতে মানসিক গঠনটাই বদলে যাচ্ছিল তাঁর। স্বভাবের মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল মৌলিক পরিবর্তনগুলি। বামুনবাড়ির বিধবা হিসেবে মুখুজ্যগড়ে যেসব নিয়মগুলি মানতে পেরে চিরকাল গর্ববোধ করেছেন তিনি, সেই নিয়মগুলো অ্যাদ্দিনবাদে বোঝা মনে হতে থাকে তাঁর। সদাসর্বদাই কেবল মনে হয়, কিসের জন্য মানছি এসব? কার জন্য? এই যেমন, আমিষ খাওয়ার কথাটা মুখুজ্যাগড়ে থাকতে স্বপ্নেও ভাবেননি মন্দাকিনী। কিন্তু এপাড়ায় এসে অবধি দলাই, পয়ড়া, গুচ্ছাতদের সঙ্গে নিরন্তর ওঠাবসা করতে করতে কবে কবে যেন মনের মধ্যে ঢিলেঢালা হয়ে গেছে মুখুজ্যাগড়ের বাধ্যবাধকতাগুলি, আর তখনই তিনি অনুভব করতে লাগলেন, বুকের গভীরে আমিষের জন্য আকাঙক্ষা রয়েছে তাঁর মনে। সেটা এতদিনেও যায়নি। এখনও চোখের সামনে কাউকে মাছ-টাছ খেতে দেখলে লোভ হয়। আর, মুখুজ্যাগড়ের সংস্কার এবং বাধ্যবাধকতাগুলিকে যেহেতু আর তেমন মানতে চাইছে না মন, একদিন পচার মা-কে একান্তে বলেই বসলেন যে, তাঁর মাছ খেতে খুব ইচ্ছে করছে।

শুনে তো আঁতকে উঠতে চায় পচার মা। বামুনঘরের বিধবা মাছ খেতে চায়! লোকে শুনলে বলবে কী!

আ-হা, কী কথা! লোকে শুনলে বলবে কী! মন্দাকিনী রেগে টং।—নিজের পেটের ছা, বুড়া বইসে মাকে ভিটার থিকে খেদিয়া দিল, রাঁধাবাড়ার লোক দিলনি, এমন কি খাবার জলটুকুও কোউ তুলিয়া দিয়া গেলনি, লোকে শুনিয়া তো কিছু বললনি, অ্যাঁ? বামুনের বিধবা হইয়া কুন্দর আনা জল খাচ্ছি, কুন্দর রাঁধা ভাত খাচ্ছি, লোকে কিছু বলছেনি? আরে, স্বামী মরেছে বলেই তো বিধবা আমি, স্বামীর কারণেই তো এই ক্লেশ স্বীকার, সেই স্বামীর ভিটার থেকেই তো উচ্ছেদ হয়্যা গেলাম। স্বামী নাই, স্বামীর ঘরটাও নাই, শুধু পুড়ার নিয়মগুলাই থাকবে?

আসলে, মানতে চাইছে না মন। মুখুজ্যাগড়ের কোনও কিছুই আর মানতে চাইছে না। ওই গড়ের তৈরি সব রকমের নিয়মকানুনের প্রতি জন্মেছে তীব্র বিদ্বেষ। বিরূপতা।

সেদিন, ওই নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হল কুন্দর সঙ্গে।

অবশেষে মন্দাকিনীর অনমনীয় জেদের কাছে হেরে গেল কুন্দ। শিখার বাড়ি থেকে অবশেষে মাছ

আনালেনই মন্দাকিনী। কুন্দকে দিয়ে রাঁধালেন, জুত করে খেলেন, কিছুটা পাঠিয়ে দিলেন শিখার কাছে। কিছুটা পচার মায়ের কাছেও।

কুন্দর বয়ে আনা মাছের ঝাল-চচ্চড়ি পেয়ে পচার মায়ের চক্ষু চড়ক গাছ। সেই বিকেলেই কথাটা রটে গেল দলাইপাড়া ও গুচ্ছাতপাড়ায়।

বিধবা হওয়ার পর মাছ তো খেতেনই না মন্দাকিনী, কিন্তু সধবা থাকাকালীন যখন খেতেন, রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর-সিঙি-কই গোছের খানদানি মাছই খেয়েছেন। মৌরালা, পুঁটি গোছের ছোট মাছ মুখে তুলতেন না কদাপি। নতুন করে মাছ খাওয়াটা ধরবার পর তাঁর আর কোনও বাছবিচার রইল না। গরিব-গুরবোদের খাদ্য ওইসব ব্রাত্যজাতের মাছগুলির প্রতিই তাঁর বেশি বেশি টান। এমন কি, চ্যাং-ল্যাটা-চ্যালার মতো মাছ, যা কিনা মুখুজ্যাগড়ের রান্নাঘরে কখনোই ঢোকে না, মন্দাকিনী খেতে লাগলেন সেসব মাছ পরম তৃপ্তিভরে। একদিন গড়ুই মাছের টক দিয়ে খেয়ে ফেললেন এক থালা ভাত।



রোজ রোজ মায়ের নতুন নতুন কীর্তির কথা শুনতে শুনতে হিরণ্ময় মুখুজ্যার কান ঝালাপালা। সারাক্ষণ মস্তিষ্কে কাঁকড়া বিছের বিষ-দংশন। এমন অভিজাত বংশের মহিলা হয়ে সে যে এভাবে মাহিষ্য, কৈবর্ত, মাঝি, বাগদিদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে মুখুজ্যা পরিবারের মুখে চুনকালি দিতে থাকবে দিনের পর দিন, এটা বুঝি তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। বুঝতে পারেন, তাই নিয়ে হাসাহাসি শুরু করেছে চারপাশের মানুষজন। মন্দাকিনীর কাজকর্ম দেখতে দেখতে তাদের একেবারে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এমনটা তারা বাপের জন্মেও দেখেনি। সবাই দোষ দিচ্ছে হিরণ্ময়কেই।

প্রাইমারি স্কুলের হেড পণ্ডিত কামাখ্যা ভট্ট প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, হনুমানের লেজে আগুন দিয়া ছাড়িয়া দিছে হিরণ্ময়, হনুমানটা এবে প্রাণের দায়ে দৌড়াচ্ছে চতুর্দিকে, লেজের আগুনে স্বর্ণলঙ্কা তো পুড়বেই। আগুনটা দিবার কালে মনে ছিলনি?

কল্পনাথের বাবা অঘোর চক্রবর্তী বলেন, শালগ্রাম শিলাটিকে মন্দিরের বাইরে ফেলিয়া দিল হিরণ্ময়, মানুষজন তাকে কুড়িয়া লিয়া ওই দিয়া মশলা বাটতিছে, এতে আর অবাক হবার কী আছে!

সবচেয়ে মজা পেয়েছেন হিরণ্ময়ের জ্ঞাতিশত্রু অভয় মুখুজ্যার জামাই কমলাক্ষ ভটচাজ। বাংলা ও সংস্কৃতে ডবল এম.এ তিনি, পাঁচরোল হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, কিন্তু বংশগত আভিজাত্য বলতে কিছুই নেই, কেন কী তাঁর সাতপুরুষের মধ্যে কেউই জমিদার ছিল না, বরং কমলাক্ষর বাবা অন্যের বাড়িতে পুজোপাঠ করে সংসার চালাতেন। সেই বংশের মেধাবী ছেলেটি, নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে এখন ডবল এম.এ। একটা হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার।

অভয় মুখুজ্যার একটিমাত্র মেয়ে। কমলাক্ষর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওঁকে ঘরজামাই করে রেখেছিলেন অভয় মুখুজ্যা। বিদ্বান হিসেবে তাঁর চতুর্দিকে বড়ই খ্যাতি, কিন্তু হিরণ্ময়ের চোখে তিনি যজমানিয়া পুরুতের ব্যাটা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও ভবিষ্যতে অভয় মুখুজ্যার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক কমলাক্ষই, তবুও হিরণ্ময়ের কাছে তাঁর তিলমাত্র ইজ্জৎ ছিল না কখনোই। সুযোগ পেলেই তিনি একান্তদের কাছে আউড়াতেন ওই প্রবাদটা, 'কেলে বামুন, কটা শুদ্দুর, বাঁটিয়া মুসলমান/ঘরজামাই আর পুষ্যপুত্তুর, এ পাঁচ শালা এক-সমান।'

আসলে, শিক্ষিত মানুষ হিসেবে কমলাক্ষর এক ধরনের সম্মান ছিল পুরো এলাকায়। যদিও হিরণ্ময় আর অভয় একই জমিদার-বৃক্ষের দুটি ডালের দুটি ফল, কিন্তু চিরকালই হিরণ্ময়ের পরিবারটিই এলাকা শাসনের প্রশ্নে মধ্যগগনে জ্বলেছেন, অন্যদিকে অভয়ের পরিবারটি ছিল চিরকালই কোণঠাসা। কমলাক্ষ ঘরজামাই হয়ে আসার পর থেকে পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এতকাল গ্রাম্য বিচারের আসরে সারাক্ষণ ছড়ি ঘোরাতেন হিরণ্ময়ই। তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। কমলাক্ষর আগমনে তাঁর সেই প্রশ্নহীন প্রতিপত্তিতে একটু একটু করে চিড় ধরতে থাকে। বিচারের আসরে, যখন হিরণ্ময় তাঁর অনুগত

মানুষটির পক্ষে মনোমতো রায়টি আদায় করে নেবার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন, কমলাক্ষ তাঁর ধীরস্থির, যুক্তিশাণিত বক্তব্য পেশ করে জনতার মতামতকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন প্রায় প্রতিটি বিচার-সভায়। হিরণ্ময় লক্ষ করছিলেন, মানুষজন যদিও প্রকাশ্যে হিরণ্ময়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলছিল না, কিন্তু কমলাক্ষর যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল খুবই। এইভাবে, কমলাক্ষ নামক যজমানিয়া বামুনের ছেলেটি তাঁর এতকালের পারিবারিক মান-মর্যাদাকে একটা ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলেন ক্রমাগত। আর, অভয় মুখুজ্যা, যিনি এতকাল হিরণ্ময়ের দাপটের কাছে একেবারেই কোণঠাসা হয়ে ছিলেন, একটু একটু করে খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন ইদানীং। শিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে তাঁর দেমাকের ইয়ত্তা ছিল না। ইদানীং সব্বাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে এই ঢাকটাই পেটাতে শুরু করেছিলেন যে, টাকাপয়সা তো অনেকেরই থাকে, মুচি-মেথর, চোর-ছাঁচোড়েরাও টাকা কামায়, কিন্তু বিদ্যা, তার মুল্যই আলাদা। ওই সঙ্গে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সেই চিরকেলে শ্লোকটি আওড়াতেও ভুলতেন না। কিনা, 'বিদ্যত্বঞ্চ, নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্য কদাচন, /স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' অর্থাৎ কিনা, রাজার কদর কেবলমাত্র নিজের এলাকায়, কিন্তু বিদ্বানের কদর সর্বত্র। এতদ্দ্বারা তিনি এমন ইঙ্গিতই করতেন যে, হিরণ্ময়ের বিপুল ধনসম্পত্তি থাকলেও বিদ্যায় তিনি অভয়ের জামাইয়ের কাছে গো-হারান হেরে রয়েছেন।

এ ব্যাপারে হিরণ্ময়ের নিজের মধ্যেও সম্ভবত এক ধরনের হীনমন্যতা ছিলই, কেন কী, ক্লাস-এইট অবধি বিদ্যে নিয়ে তিনি কমলাক্ষর সঙ্গে তুলনায় একবারে গো-হারান হেরেই ছিলেন। হীনমন্যতা মানুষের মনে তৈরি করে বিদ্বেষ। হিরণ্ময়ের মধ্যে সেই বিদ্বেষ একেবারে অন্ধ হয়ে উঠেছিল। কত প্রকারে কমলাক্ষকে জনমানসে খাটো করা যায়, সেই ফিকিরই খুঁজতেন সারাক্ষণ। ইস্কুল-কলেজের পুঁথিগত বিদ্যেটুকু ছাড়া কমলাক্ষ যে হিরণ্ময়ের নখের যোগ্য নয়, সেটা নানা প্রকারে প্রমাণ করতে চাইতেন তিনি। শরীরে প্রবাহিত রক্তটাই যে মানুষের আসল, বংশ পরিচয়ের বাইরে আর সব পরিচয়ই যে অসার, সেটা তিনি সর্বদা উপমা-অলঙ্কার সহযোগে প্রমাণ করে দিতেন অনুগতদের সামনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কমলাক্ষর একধরনের প্রভাব দিন দিন বাড়ছিল। আর, সেটাই ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠেছিল হিরণ্ময়ের। তবুও আভিজাত্যের ধুয়ো তুলে কোনওগতিকে ঠেকনা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, সেটাই কিনা ইদানীং ফুটো করে দিচ্ছিলেন, আর কেউ নয়, নিজেরই গর্ভধারিণী মা।

তিরাশির পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে প্রধান হয়েছিল শিখাবউদি। সন্ধিপুরের ইতিহাসে সেটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার আগে অবধি কামাখ্যা ভট্টর ছেলে গজানন পার্টিতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। শিখাবউদি যাতে না দাঁড়াতে পারে, তার জন্য কম প্যাঁচ কষেনি সে। কিন্তু এলাকার প্রবীণ নেতা নন্দ গুচ্ছাত আর আমার ছোটোকাকা মিলে প্রায় লড়াই করে প্রধান বানিয়েছিল শিখাবউদিকে। ততদিনে গ্রামবাংলায় জোর কদমে অপারেশন-বর্গা চলছিল। শিখাবউদি প্রধান হওয়ার পর আরও তীব্র হল তার গতি। গ্রামে গ্রামে ফি-সন্ধ্যায় ভুমি-দপ্তরের অফিসারেরা এসে বর্গাদারদের দরখাস্তের শুনানি করত। শুনানির সঙ্গে সঙ্গে রায়। সাতদিনের মধ্যে বর্গাদার পড়চা পেয়ে যেত। জোতদাররা বর্গা-রেকর্ড আটকাবে, পার্টি নেতারা রেকর্ড করিয়ে ছাড়বে, এই নিয়ে শুরু হল সর্বত্র চোর-পুলিশ খেলা।

চারপাশের তাবৎ বর্গাদার বর্গা-রেকর্ডিংয়ের জন্য একেবারে হেদিয়ে পড়লেও মন্দাকিনীর জমির কোনও বর্গাদারই ভূমি-দপ্তরে কোনও দরখাস্তই করেনি। শিখা বউদির হাত ছিল তাতে। শিখাবউদি সবাইকে বলেছিল, বিধবা মানুষ, ছেলে-বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, ওই ক'বিঘা জমিই ভরসা। কাজ নাই ওগুলো রেকর্ড করিয়া। ভাগ ধান তো পাচ্ছ তুমরা।

কিন্তু উলটো ঘটনাটা ঘটল হপ্তাটাক বাদে। এক সন্ধ্যায়, বর্গা-রেকর্ডিংয়ের শুনানির আসরে গিয়ে আচমকা হাজির হলেন মন্দাকিনী। অফিসারকে সরাসরি বললেন, আমার জমিনগুলা যারা বর্গা করে, তাদের নাম-ধাম বলতিছি। তাদের নামে বর্গা-রেকর্ডটা করিয়া দাও তো বাবা। অরা লজ্জায় দরখাস্ত কত্তে পারতিছেনি।

শুনে অফিসার তো থ। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মন্দাকিনীর দিকে।

সেদিন আর কিছু হল না। মন্দাকিনীর বর্গাদারদের নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন সেদিনের মতো।

খবরটা সেই রাতেই পৌঁছয় হিরণ্ময়ের কানে। শুনে হৈ হৈ করে ওঠে হিরণ্ময়সহ সমগোত্রীয় স্বার্থান্বেষীরা। মন্দাকিনীর কুৎসায় ভরিয়ে ফেলে দশদিক। এবং যেদিন মন্দাকিনীর জমির বর্গারেকর্ডিংয়ের শুনানি হবে, তার আগের দিন হিরণ্ময় রেগেমেগে সটান চলে আসেন মন্দাকিনীর বাড়িতে।

বলেন, মা, নিজের নাক কাটিয়া আর কত পরের যাত্রাভঙ্গ করবে তুমি?

মন্দাকিনী খুব নির্বিকার গলায় জবাব দেন, আমি আবার কার নাক কাটলাম, বাপ? যে-যার নিজের নাক তো আগাম কাটিয়া বুসিয়া আছে।

মন্দাকিনীর জবাবে বুঝি সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় হিরণ্ময়ের। বলেন, সবাই যখন নিজের নিজের জমিন বাঁচাইতে ব্যস্ত, তুমি তখন কুন আক্কেলে যাচিয়া গিয়া বর্গা-রেকর্ডিংয়ের জন্য তদবির করিয়া আইলে? নাটকটা না কল্লে চলছিলনি?

—এর মধ্যে নাটকের কী দেখলি বাপ?

—নাটক নয়? কিনা, জমিদারের মা স্বয়ং চলেছেন তাঁর তাবৎ জমিনের ভাগ-রেকর্ড করাতে! শুনিয়া একেবারে ধন্য-ধন্য রব উঠবে চতুর্দিকে। রাতারাতি একেবারে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী হইয়া যাবে তুমি!

মন্দাকিনী মন দিয়ে শোনেন হিরণ্ময়ের কথাগুলো। আকাশের দিকে উদাস চোখে তাকান।

একসময় খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, তুই বৃথাই রাগ করতিছু বাপ। ভগবতী দেবী হওয়াটা আমার এ জীবনে কপালে লেখা নাই। কেন কী, ভগবতী দেবী হইতে গেলে একটা বিদ্যাসাগরকে পেটে ধরতে হয়। সে ভাগ্য করিয়া আসিনি, বাপ। যাক, খুলাখুলি বলতিছি তোকে। যা লেহ্য, সেটাই কত্তে যাচ্ছি আমি। মহৎ কিছু কত্তিছিনি। অরা দীর্ঘকাল বর্গাচায করিয়া আসতিছে। ওদের নাম রেকর্ড করবার আইন আছে। আমি সেই আইনটাকে মান্য কচ্ছি। মিথ্যা তো কিছু লেখা করাচ্ছিনি সরকারি খাতায়।

—দেখবে, এরপর যাও বা দু'মুঠা দিত, আর দিবেনি।

মন্দাকিনী স্থিরদৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ের দিকে। ঠোঁটের কোণে একচিলতে চাপা হাসি উঁকি মেরেই মিলিয়ে যায়। বলেন, ও ভয় আর কত্তিছিনি আমি। বলে পেটের ছেলেই দু'মুঠা ভাত দিলনি বুড়া বইসে...।

হিরণ্ময় বলে ওঠেন, ঠিক আছে, ভাগ-রেকর্ডটি হয়্যা গেলে যখন ধান দেওয়াটা পাকাপাকি বন্ধ করিয়া দিবে শালারা, তখন কী করিয়া ভাত জুটবে, ভাবো।

মন্দাকিনী মুচকি হাসেন, তুই কী তবে ওই ভয়টাই পাচ্ছু বাপ? ভাবতিছু, অরা আমাকে ধান না দিলে আমি আবার তোর দুয়ারে গিয়া ভাত মাগতে যাব। তোর কুনো ভয় নাই রে। আমি মরিয়া গেলেও তোর ভাতে এ জীবন পালবোনি। দরকার হইলে ভিক্ষা করিয়া খাব, তবুও না।

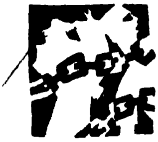
রাগে অন্ধ হয়ে হিরণ্ময় বলেন, আমি তো ঠিক ওই ভয়টাই পাচ্ছি মা। শেষ অবধি ভিক্ষার ঝুলি লিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আমার মুখটা ভালো করিয়া না পুড়াও তুমি!

হিরণ্ময়কে দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে আসে মন্দাকিনীর মুখখানি। খুব থমথমে গলায় বলেন, তোর মুখটা পুড়াবার তরে অন্যের দরকার হবেনি বাপ্। তুই নিজেই যথেষ্ট।

—ঠিক আছে, তুমার যা খুশি, তাই কর। আদা খাবে যে, ঝাল বুঝবে সে। আমার কুন্ কচুপুড়াটি। বলতে বলতে উঠোনে নামেন হিরণ্ময়।

পেছন থেকে মন্দাকিনী বলেন, আসলে তোর আফশোসটা, বাপ, অন্য জা'গায়। আমি মরিয়া যাবার পর, জমিগুলা এক্কেরে সাফ-সুতরা অবস্থায় তোর দখলে ফিরিয়া যাইত, সেই পথটা বন্ধ হয়্যা যাচ্ছে।

—উহ্, চিরকালটা আমাকে উল্টা বুঝলে তুমি। দাঁত কিড়মিড় করে বলেন হিরণ্ময়। দুমদাম পা ফেলে ফিরে যান গড়ে।



একদিন জটিলাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে স্বয়ং মন্দাকিনীই আগ বাড়িয়ে তুললেন কথাটা, তোরা তো গেঁড়ি চচ্চড়ি খাস, কেমন লাগে রে খেতে? একদিন খাওয়াবি আমাকে?

কথাটা শুনে জটিলা নিদারুণ সঙ্কোচ বোধ করে। কুন্দর সঙ্গে নীরব চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। শলা চায়।

একসময় সাহসে ভর করে বলে, তুমি ফের গেঁড়ি-গুগলি খাবে কি গো? তুমি হইলে বামুন বাড়ির বউ। তায় আবার বিধবা।

—তাতে কি? মন্দাকিনী নির্বিকার মুখে জবাব দেন, খাওয়ার চিজ, তাতে ফের বামুন-চাযি কী র‍্যা? তাবাদে তোদের ঘরের বিধবারা তো দিব্যি খায় ওসব।

—আমরা আর তুমরা এক? জটিলা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মন্দাকিনীর দিকে।

জটিলার কথাটা বুঝি সামান্যক্ষণের তরে অন্যমনস্ক করে তোলে মন্দাকিনীকে। আকাশের গায়ে দৃষ্টি বিঁধিয়ে ভাবতে থাকেন তিনি। ভাবতে ভাবতে ডুব মারেন অতলে। মানুষ কী, বাস্তবিক, জলের মতো? পাত্রের আকার ও রঙ অনুযায়ী নিজেদের আকার ও রঙ বদলাতে পারে মানুষও? নইলে, মন্দাকিনী, এমন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে তিনি, জমিদার বাড়ির বধূ, সারা জীবন অভিজাত্যের সাধনা করে এসেছেন, নিজের সমাজ থেকে বিতাড়িতা হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই এমন দ্রুত বদলে গেলেন কী করে?

একসময় মন্দাকিনী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে জবাব দেন, ব্যাপারটা কী জানিস জটিলা, তোরা আর আমরা, ভাবলে এক, তফাৎ করলে তফাৎ।

একটু বাদেই পুনরায় স্বমহিমায় ফিরে আসেন মন্দাকিনী। বলেন, কালই কিছুটা গেঁড়ি কারুকে দিয়া পাঠিয়ে দিস তো।

জটিলা-প্রমীলাদের বাড়ি থেকে যখন বারকয়েক গেঁড়ি আনিয়ে খাওয়া হয়ে গেল মন্দাকিনীর, কুন্দ একদিন সাহস করে বলে, কুঁড়াজালি দিয়া চিংড়ি মাছ ধরব, বড়মা?

মন্দাকিনী অবাক হয়ে শুধোন, কুঁড়াজালি! সেটা আবার কী রে? কেমন দেখতে হয়?

মন্দাকিনীর প্রশ্নে আস্কারা ছিল, তাই বুঝে কুন্দ চটপট একটা কুঁড়াজালি বানিয়ে হাজির করে মন্দাকিনীর সমুখে। মন্দাকিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন বস্তুটিকে। দুটো বাঁশের কঞ্চিকে আড়াআড়ি বেঁধে, ওদের চারটি ডগাতে বাঁধা হয়েছে রুমালের চেয়ে চারগুণ বড় একটা কাপড়ের চারটি খুঁট।

কুন্দ বলে, কুঁড়ার সঙ্গে আমানি মেখে তালতাল বানিয়ে এই কাপড়ের উপর রেখে দিয়ে কুঁড়াজালিটা সন্ধ্যাবেলায় বসিয়ে দিতে হবে ঘাটের কাছাকাছি অল্প জলে। তারপর দেখো, কী হয়।

সেই সন্ধেয় কুন্দ বকদিঘির ঘাটে অল্প জলে বসিয়ে এল একটা মাত্তর কুঁড়াজালি, এবং সত্যি সত্যি মন্দাকিনী পরের দিন সকালে উঠে দেখেন, কাপড়ের তৈরি জালের মধ্যে প্রায় দু'মুঠোটাক চিংড়ি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। কুন্দ আচমকা জালটাকে জল থেকে তুলে ফেলায় মাছগুলো জালের ওপরেই লাফাতে থাকে।

কুন্দ বলে, দুজনের একবেলার বন্দোবস্ত হয়্যালো। আরও একটা-দুটা কুঁড়াজালি বানিয়ে লিব আজই। রোজ সকালে পুয়াটাক মাছ পায়াবো তাইলে।

মন্দাকিনীর দু'চোখে তখনও অবধি জমাট বেঁধে ছিল বিস্ময়। এতসব এরা জানল কী করে? একই গাঁয়ের বাসিন্দা হয়েও তাঁরই বা কেন অ্যাদ্দিন জানা ছিল না এসব!

সেই শীতেই মন্দাকিনীর পা ফাটল। আর, সারা গায়ের চামড়া হল ডুমুরপাতার উল্টোদিকের মতো রোঁয়াওঠা, খসখসে।

যমুনা খালটা বহুদিন ধরে মজে যাচ্ছিল। কেউই বোধ করি তেমনভাবে খেয়াল করেনি সেটা। আগেকার দিনে নিয়মিত নৌকো চলত সে খালে, অথচ কালক্রমে তার এমনই হাল হল, মজতে মজতে এখন একটা সরু নালা বৈ কিছুই নয়। জরুরি অবস্থার সময়, গজানন তখন কংগ্রেসে মাতব্বর নেতা, হিরণ্ময় মুখুজ্জার সঙ্গে তখন তার গলায় গলায়। তখন দেশে গাঁয়ে পুলিশের দাপট। গরিব-গুরবোরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বাঁচে। পরিস্থিতিটার পুরো সুযোগ নিয়েছিল গজানন। হিরণ্ময়ের সঙ্গে সাঁট করে যমুনার মজে যাওয়া অংশটিকে ভাগাভাগি করে বন্দোবস্ত নিয়ে নিল কজনায় মিলে। সি. পি. এম.-এর নেতা নন্দ গুচ্ছাতের পেছনে তখন অহরহ পুলিশ ঘুরছে। আমার ছোটোকাকা একবার হাজতবাস করে ফিরে এসেছে। সব মিলিয়ে পার্টি-নেতৃত্ব তখন দিশেহারা। কাজেই, গজাননদের উদ্যোগে বাধা দিতে পারেনি কেউই।

শিখাবউদি সন্ধিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান্ হওয়ার পর, যমুনা খালটাকে জবরদখলকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সংস্কার করবার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে বুঝি ভীমরুলের চাকে রাতারাতি ঢিল পড়ল।

সাতাত্তরে জমানা সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যাওয়ায় হিরণ্ময় একেবারে বসে গেলেন। গজানন অবশ্য সি পি. এম.-এর নেতৃত্বকে ধরে ঢুকে পড়ল পার্টিতে। তিরাশির পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তারই প্রধান হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও পারেনি। তার জায়গায় প্রধান হয়েছিল শিখাবউদি।

তখন বল্লভদা তার অফিসের সহকর্মিনীকে বিয়ে করে বেলদা বাজারে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছে। শিখাবউদিদের সমস্ত খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সে। সেই সঙ্কটের দিনে মন্দাকিনী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিখাবউদিকে আশ্রয়, প্রশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য জুগিয়েছেন। এমন কি বল্লভের নামে মামলা করবার জন্য বার বার বলেছেন। শিখাবউদিকে ঘরে রাখা, সাহায্য করা ইত্যাদি নিয়ে মুখুজ্যাগড়ে ঝড় উঠেছে। সেটা কানে আসা ইস্তক মন্দাকিনী আরও বেশি বেশি করে শিখার পাশে শক্ত করে দাঁড়িয়েছেন।

ধীরে ধীরে শিখাবউদির চোয়াল শক্ত হয়েছে। শুরু হয়েছে তার রাজনীতির চর্চা। ধীরে ধীরে নন্দ গুচ্ছাত ও আমার ছোটোকাকার সঙ্গে যোগাযোগটা বেড়েছে তার। পার্টির গোপন মিটিংয়ে আনাগোনা জুড়েছে শিখাবউদি। সেসময় পার্টির সভাগুলো হচ্ছিল মন্দাকিনীর উঠোনে। মন্দাকিনী নিজেই শিখাবউদিকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। শিখা বউদিও প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছিলেন এই কারণে যে, এমন লেপাপুঁছা সাফসুতরো প্রশস্ত উঠোন তো গরিব-গুরবোদের বাড়িতে নেই।

ধীরে ধীরে বল্লভদার সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে শিখা বউদি। পার্টির কাজে আরও বেশি বেশি সময় দিতে শুরু করেছে। কিন্তু সে যে পরের ভোটে পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছে, সেটা আমরা ঘুণাক্ষরেও আগাম টের পাইনি। নন্দ গুচ্ছাত আর আমার ছোটোকাকা শ্রীকান্ত দত্ত মিলে যে ভেতরে ভেতরে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে সেটা, সন্ধিপুরের কাকপক্ষীতেও আগাম আন্দাজ করতে পারেনি তা।

শিখাবউদি ভোটে দাঁড়ানোয় সবচেয়ে খেপেছিল গজানন। ওই নিয়ে পার্টির মধ্যেই সে জলঘোলা করেছিল অনেক। ভোটে শিখাবউদিকে হারিয়ে দেবার জন্যেও তলেতলে খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ অবধি শিখাবউদি বিপুল ভোটে জিতে গেল।

ভোটের আগেই শিখাবউদি এলাকার মানুষকে কথা দিয়েছিল, ভোটে জিতলে হারিয়ে যাওয়া যমুনা খালটিকে আবার খুঁজে এনে ফিরিয়ে দেবে মানুষকে। কিন্তু কাজটাতে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়ল। হিরণ্ময় মুখুজ্যার অনুগত মানুষগুলি ততদিনে গজাননের পিছু পিছু বাম-পার্টিতে ঢুকে পড়েছে। তারা ততদিনে পার্টি-সংগঠনের অঙ্গ। শিখাবউদির সিদ্ধান্তটাকে বাণ্ডাল করে দেবার জন্যে তারা আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়তে থাকল। গজানন গিয়ে জেলা নেতৃত্বকে বোঝাল, যমুনা খালের দু'ধারে যেসব গরিব মানুষ জমির পাট্টা পেয়ে প্রায় এক দশক যাবৎ চাষবাস করে আসছে, শিখাবউদির এহেন হটকারী সিদ্ধান্তে তারা সব রাতারাতি জমিজিরেত খুইয়ে পার্টির অ্যান্টি হয়্যাবে। জেলা নেতৃত্ব শিখাবউদিকে ভেবেচিন্তে কাজে নামতে বলছিল বার বার।

সেই সুবাদে শিখাবউদি সন্ধিপুরের সব গরিব মানুষকে নিয়ে সভা ডেকে বসে মন্দাকিনীর উঠোনে।

সেই সন্ধ্যায় মন্দাকিনীর দাওয়ায় বসে বসে ক্ষণ গুণছিলাম আমি। কুন্দমাসি চা বানিয়ে দেয়। যমুনা খাল নিয়ে ওই মিটিংয়ে জোর রগড় হওয়ার সম্ভাবনা। সম্ভবত সেই কারণেই শিখাবউদি আমাকে সদর থেকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনেছে। মিটিং শুরু হতে তখনও দেরী আছে। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

চা খেতে খেতে আমি মন্দাকিনীর কথাই ভাবছিলাম। তাঁর বদলে যাবার কথাগুলোই মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘাই মারছিল। তাবাদে, কিছুদিন যাবৎ হিরণ্ময় মুখুজ্যাও আমাকে একেবারে ধরে পড়েছেন। রোজ রোজ মায়ের নতুন নতুন কীর্তির কথা শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা।

তখন আমি সদরে ওকালতি করি। আমার জেঠার সঙ্গে হিরণ্ময়ের সম্পর্কটা চিরকালই ভালো। তাঁরই উৎসাহেই জেঠা গাঁয়ের বিচার-পঞ্চায়েতে কলকে পেতেন চিরকাল। তাবাদে হিরণ্ময়ের বড়ছেলে সুবিকাশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়াশোনা করেছি গাঁয়ের স্কুলে।

একদিন আমাকে একান্তে ডেকে হিরণ্ময় বললেন, মাকে একটুখানি বোঝাও শঙ্কর। যা হবার হয়েছে, গড়ে ফিরে আসুক সে। মেয়েটার বিয়ের সময় হল। পাত্রও প্রায় স্থির। কিন্তু নতুন কুটুম, কী ভাববে বল দেখি? মেয়েটাকে কথা শোনাবে, খোঁটা দিবে কথায় কথায়। আর, আমাদের দুজনকে যারপরনাই খারাপ তো ভাববেই। তোমার কথা তো মানে বুড়ি। একটিবার বুঝিয়ে বল না। দরকার হইলে আমি আর তুমার জেঠিমা গিয়া ওর পা ধরতে রাজি।

ওঁর কথার ধরনে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। বলি, আপনি নিজে গিয়ে বলুন না। দেখুন না কী বলেন তিনি।

সারা মুখে এক ধরনের অসহায়তা ফুটিয়ে হিরণ্ময় বলেন, আমি তো হরেক বিষয় লিয়া বেশ কয়েক বার গেলাম। আমাকে দেখবা-মাত্তর খেপিয়া যাচ্ছে। কথা কানেই লিচ্ছেনি।

বলি, দেখি, সুযোগ বুঝিয়া কইব। কিন্তু আমার কথা তিনি শুনবেন কিনা কে জানে?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সেই সন্ধ্যায় মন্দাকিনী-দিদার সামনে তুলি কথাটা। বেশ বাঁধুনি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি ওঁকে।

মন্দাকিনী আমার দিকে থির পলকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনেন। একসময় দু'চোখে কপট প্রশংসা ফুটিয়ে বলেন, আমি তো ভুলিয়া গেছলাম, আরে, তুই তো উকিল। সদরে উকালতি করু। হিরু আর বউমা তাইলে তোকেই উকিল ঠাউরেছে। বেশ, বেশ। কত ফি দিল?

ওঁর কথার ধরনে আমি হেসে ফেলি। তাবলে সহজে হাল ছেড়ে দিই না। ওঁকে একটু একটু করে চেপে ধরতে চাই। হিরণ্ময়ের মেয়ে উমার ভবিষ্যতের ওপর জোর দিই। শ্বশুর-ঘরে অপমানের কথাটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ছবিটা আঁকি। ওরা এসে পায়ে ধরে মাফ চাইবে, সেটাও বলি।

এক সময় মন্দাকিনী খুব ঠাণ্ডা, অনুত্তেজিত গলায় বলেন, তো, তুই আমাকে কী কত্তে বলছু? ওই সিধা-সরল মানুষগুলার সাথ' মিশামিশি বন্ধ করিয়া দিতে হবে আমাকে?

আমি মনে মনে একটুখানি বিব্রত বোধ করি। মিনমিনে গলায় বলি, না... মানে... মেশামেশি করা বলতে...একটা জাতপাতের ব্যাপার তো আছেই আমাদের সমাজে। ওদের হাঁড়ির ভাত-তরকারি খাওয়া-টাওয়াতে তোমার কুটুম-বাটুম, আত্মীয়-পরিজন একটু অস্বস্তি বোধ করতিছে তো। সেই কারণে বলতেছিলাম, হিরণ্ময়-জেঠারা যখন চাইছেন, নিজেদের বাখুলে না-হয় ফিরিয়া গেলে। জানি, তুমি খুব রাগিয়া আছ, কিন্তু ওরা তোমার পেটের ছেলে, ছেলের বউ, দোষ না হয় করেছেই, কিন্তু তুমি তো মা, ছেলে মাফ চাইছে, একবার না হয় মাফ করিয়া দাও।

মন্দাকিনী আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। এক সময় হেসে ফেলেন। বলেন, শুনেছি নাকি উকিলেরা চোর-ডাকাত-লুচ্চা-বদমাশ, ফি পাইলে কোর্টে সবার হইয়া সওয়াল করে? সত্যি?

আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বলি, আমি কারোর হয়ে সওয়াল কত্তিছিনি, দিদিমা। আমার মনে হইল, তাই বললাম, এবার তুমার সিদ্ধান্ত তুমি লিবে।

—তোর মনে হইল? নাকি, আমার পাশ সওয়াল করবার তরে হিরণ্ময় জাপটিয়া ধরল তোকে? শহরে উকালতি কত্তে কত্তে তো খোব চালবাজ হয়েছু রে?

আমি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে থাকি। মিনমিনে গলায় বলি, আমার কুনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিলনি দিদিমা, বিশ্বাস কর, হিরুজেঠারা খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে...আমাকে আইসিয়া ধরল...?

—কষ্ট পাচ্ছে, নাকি ঘোর বিপাকে পড়িয়া গিয়া এখন পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতিছে? নরুনের বদলে নাকটাই কাটা যাবার উপক্রম। সেইতরেই...।

আমি আর কথা বাড়াই নে। কিন্তু ওইসব কথাবার্তার পর মন্দাকিনীর চোখমুখ থমথম করতে থাকে সারা সন্ধে।

বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটল সেই সন্ধ্যায়। প্রকাশ্য সভায় সেই প্রথম শিখাবউদির উদ্যোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখলেন মন্দাকিনী। অনেকক্ষণ ধরে অনেক উপমা সহকারে বোঝালেন, একটা নদীকে চিরকালের জন্য ফিরে পাওয়ার স্বার্থে কেন সবাইয়ের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিৎ। তাছাড়া, যারা এতকাল নদীটাকে জবরদখল করে রেখেছে, তারা তো কেউই সেই অর্থে গবিব নয়। মধ্যবিত্ত ধান্দাবাজ মানুষেরাই তো জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে নদীটাকে আত্মস্যাৎ করেছে। সর্বসাধারণের নদীকে জনাকয় মানুষ দখল করে রাখবে কেন?

সেদিন এমন গুছিয়ে বক্তব্য রাখলেন মন্দাকিনী, শিখাবউদিও বিস্ময়ে থ হয়ে যায়।

সেই সন্ধ্যায় অবশেষে ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে যায় প্রস্তাবটা।

মন্দাকিনী বলেন, যেদিন নদীটার দখল লিতে যাবে তুমরা সবাই, সেদিন আমিও যাব তুমাদের সাথ।



অবশেষে একদিন এক ঘুরঘুট্টি সন্ধ্যায় নিজেকে লুকিয়ে হিবণ্ময় প্রস্তাবটা নিয়ে সবাসরি হাজির হন মন্দাকিনীর বাড়িতে।

মন্দাকিনী তখন পুরোন শাড়ি দিয়ে একটা কাঁথা সেলাই করছিলেন এক মনে। কুন্দ পাকশালে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিল। নিজের মাকে এমন চুয়াড়-চাঁড়াল বাড়ির মেয়েদেব মতো কাঁথা সেলাই করতে দেখে হিরণ্ময়ের ভেতরটা রি-রি করে উঠেছিল।

হিরণ্ময় ভেতর-ঘরে ঢোকামাত্র, কাঁথা থেকে চোখ না সরিয়েই মন্দাকিনী খুব শীতল গলায় বলেছিলেন, আমার ইখ্‌নে তো চিয়ার-টিয়ার নাই বাপ। তুই বুসবি কুথা? এই মাদুরের আসনে বুসবি কি?

রাগে সর্ব ইন্দ্রিয় জ্বলতে শুরু করেছিল হিরণ্ময়ের। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে ছিলেন তিনি।

বলেছিলেন, ঢের হয়েছে, এবার গড়ে ফিরিয়া চল তুমি। আমি তোমাকে লিতে আস্‌সি।

মন্দাকিনীর হাতের সূঁচ ক্ষণেকের জন্য থেমে গিয়েছিল। ভুরুজোড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়েছিল। মুখ তুলে এক ঝলক চোখ ফেলেছিলেন হিরণ্ময়ের মুখের ওপর। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, বউমাই আবার ফিরিয়া যাবার তরে জেদ ধরেছে বুঝি?

এটা যে মন্দাকিনীর নেহাতই টিটকিরি, সেটা বুঝতে তিলমাত্র দেরি হয় না হিরণ্ময়ের। তাও টিটকিরিটা নিঃশব্দে হজম করেন তিনি। বলেন, কেন, রত্না এমনটা বলতে পারে না? মানুষ বদলায় না? তুমি বদলাওনি?

মন্দাকিনী খুব শীতল গলায় জবাব দেন, তা অবশ্য বদলেছি। তো, আমার ফিরিয়া যাবার দরকারটা কি, খুলিয়া বল্ তো। অ্যাদ্দিন বাদে আমাকে ফিরিয়া লিয়া যাবার কথাটা তোদের মনে হইল কেন?

হিরণ্ময় আমতা আমতা করেন। আসল কারণটা খোলসা করে বলতে বড়োই বাধে তাঁর। আলতো ঢোঁক গিলে বলেন, দ্যাখো, রত্নাকে লিয়া যা হবার হয়্যা গেছে। ঘর কত্তে গেলে তো ঘটি-বাটিতেও ঠুকাঠুকি লাগে। তা বলিয়া কুন্ বাড়ির মা তার ব্যাটা-বউকে ছাড়িয়া অন্য ভিটায় গিয়া বাস কত্তে চায়!

মন্দাকিনী অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ের দিকে। বলেন, আমি আবার কখন ঘর-সংসার

ছাড়িয়া ইখ্‌নে আসতে চাইলাম! তোরাই তো আমাকে খেদিয়া দিলি।

—না, মানে, তুমিই তো বলতেছিলে, রত্নার সাথ থাকাটা তুমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি দেখলাম, বুড়া বইসে অশান্তি লিয়ে থাকা—সেটাও তো ভালো নয়—মনে শান্তিটাই যদি না থাকে তো পরমান্নও তিতা লাগে...। সেইতরেই...।

—তো, এখন কি তুই ভাবলি যে মুখুজ্যাগড়ে ফিরিয়া গেলে আমার আর কুনো অশান্তিই থাকবেনি?

—না, থাকবে নি। আমি একটা বুদ্ধি ঠাওরেছি। গড়ের মধ্যে একটা দিকে থাকবে তুমি, রত্নার সাথ এক অন্নেও থাকবার কুনো দরকারই নাই তুমার। ও ওর মতো থাকবে, তুমি তুমার মতন।

মন্দাকিনী আবার হিরণ্ময়ের চোখে চোখ রাখেন।—এই খাসা বুদ্ধিটা কবে খেলল তোর মাথায়?

মন্দাকিনীর গলায় এবার আর টিটকিরিটা চাপা রইল না। কানের লতি নিঃশব্দে জ্বলতে থাকে হিরণ্ময়ের। তাও সামলে নিয়ে বলেন, না, মানে, বুদ্ধিটা প্রথম থেকেই ছিল—তবে রত্না তখন রাজি হচ্ছিলনি কিছুতেই।

—এখন বউমা রাজি?

—নাইলে তুমার পাশ আসি আমি?

—হঠাৎ অ্যাদ্দিন বাদে কেন রাজি হইল, সেটা বুঝতে পারছু তুই?

—বোঝা বলতে—আসলে, সে হয়তো অ্যাদ্দিন বাদে নিজের ভুলটা বুঝতে পারছে।

—'হয়তো' মানে? ভুলটা বাস্তবিক বুঝতে পারছে কিনা, সেটা তুই ঠিকঠাক জানিসনি?

সহসা হিরণ্ময় সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। গলাটা সামান্য চড়িয়ে বলে, তুমার অ্যাতো জেরার জবাব দিয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি ফিরিয়া যাবে কিনা বলো?

গলাটা অনেকখানি খাদে নামিয়ে মন্দাকিনী বলেন, জেরা কি সাধে কচ্ছি বাপ, ঘরপুড়া গরু মেঘ দেখলেও ভয় পায় যে।

—মানে?

—মানে, ন্যাড়া যে বেলতলা থিক্যা একবার সরিয়া আসে, তার তলায় ফের গিয়ে দাঁড়াইতে যে বড় ভয় করে বাপ। তাছাড়া—আমি তো ইখ্‌নে বেশ আছি। আমার তো কুনো কষ্ট নাই।

—এটা তুমার রাগের কথা।

—একটুও রাগের কথা নয়। বিশ্বাস কর্ তুই, আমি ইখ্‌নে দিব্যি আছি।

হিরণ্ময় পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকেন।

মন্দাকিনীও কাঁথার বুকে সুঁচ ফোটাতে থাকেন নিঃশব্দে।

—তাহলে তুমি ফিরিয়া যাবেনি?

হাতের সুঁচ থামান না মন্দাকিনী। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বলেন, আমাকে ফিরিয়া লিয়া যাবার কুনো উপায় নেই তোর।

—কেন?

—মাহিষ্য, কৈবর্ত, মাঝি, গলাদের সাথে মিশিয়া, তাদের হাতে খাইয়া-দাইয়া, জাত-কুল হারিয়া বুসিয়া আছি, আমাকে তোদের সমাজে ফিরাবি কী করিয়া?

—সে সব লিয়া তোমাকে ভাবতে হবেনি। অঘোর চক্রবর্তীর সাথে কথাবার্তা হয়্যা গেছে। একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লিলেই হবে।

—প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘরে তুলবি আমাকে? আমি যে মাছ, মাংস, গেঁড়ি, গুগলি সব খেয়েছি বাপ। ঘি পুড়লে আর বামুন খাবালে সেসব দোষ কাটিয়া যাবে?

—আরে, বলছি তো, প্রায়শ্চিত্ত করলে সব দোষ কাটিয়া যাবে। শাস্ত্রে সব বিধানই রয়েছে।

—বটে! মন্দাকিনী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ের মুখের দিকে। এক সময় তাঁর ঠোঁটের কোণে উঁকি মারে চাপা হাসি। বলেন, ধন্যি তোদের শাস্ত্র! তো, একটা কথা শুধাই তোকে, মানুষ তো পাপ করলেই তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি কুন পাপটা করেছি বাপ? মানুষের সাথে মানুষের

মেশামেশিতে খুব পাপ হয় বুঝি?

মন্দাকিনীর কথার জবাব খুঁজতে গিয়ে একটুখানি সময় নেন হিরণ্ময়। এক সময় খুব ভাঙা গলায় বলেন, আমি অতো কথা বুঝি না, মা। আমি শুধু একটা কথাই বুঝি, সমাজে বাস করতে হইলে সামাজিক নিয়মকানুনগুলাকে মান্য করতেই হবে। জাত-ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া সমাজে বাঁচা চলে না।

—সেই জাত-ধর্ম-সমাজ তো তোরাই গড়েছু বাপ। সমাজের নিয়মগুলা বানাবার কালে এদের থিকে মতো লিয়েছিলু তোরা?

—সমাজের নিয়মগুলা তো আমি-তুমি গড়িনি, কতকাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গড়েছে। আমাদের কাজ হইল সেসব নিয়ম মানিয়া চলা।

—তোদের নিয়ম তোরা মানতে থাক্, আমি তো তোদের কেউ নই। তোদের সমাজের নিয়মকানুন মানবার কী দায় পড়েছে আমার?

সে কথার জবাব দেন না হিরণ্ময়। বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন। একসময় নরম গলায় বলেন, তুমার রাগটা দেখছি এখনও যায়নি মা।

রাগ! হিরণ্ময়ের কথাটা শুনে সামান্য সময়ের জন্যে বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে যান মন্দাকিনী। সটান চলে যেতে পারেন সেদিনের ওই বিকেলটিতে। সেদিন বাস্তবিক তাঁর মাথায় রাবণের চিতা জ্বলছিল। সে চিতা নেভেনি অনেকদিন।

এক সময় মন্দাকিনী ধীর পায়ে ফিরতে থাকেন। বিগত সময়টুকুর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসেন একেবারে আজকের সন্ধেয়।

হিরণ্ময়ের দিকে মুখ ফেরান মন্দাকিনী। খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন,.. না রে, সত্যি বলতিছি, এখন আর তোদের উপর আমার তিলমাত্র রাগ কিংবা অভিমান নাইকো।

মন্দাকিনীর শেষ কথাগুলো বুঝি হিরণ্ময়ের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করে। সারা মুখে যথাসাধ্য উজ্জ্বলতা জড়ো করে বলেন, জানো, তুমি লগনাকে দিয়া যে পিয়ারা গাছটা পুঁতিয়েছিলে, সেটাতে এবছর কুঁড়ি এসেছে।

—পিয়ারা গাছ? মন্দাকিনী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়ের দিকে। কিছুতেই বুঝি মনে করতে পারেন না। বলেন, কবে বল্ দেখি? কোথায়?

—বা রে, এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলে? ওই যে খিড়কির পুকুরে পাড়ে, বকুল গাছটার পাশটিতে।

মন্দাকিনী বুঝি আরও ধন্দে পড়ে যান,...খিড়কি পুকুরের পাড়ে একটা বকুল গাছও আছে নাকি?

—আছে বৈকি। তুমি দেখছি সবই ভুলিয়া গেছ? আচ্ছা, তোমার সেই লালি গাইটাকে মনে আছে তো? যার দুধ খাইয়া রোজই তোমার মনে হইত, দুধে বুঝি চিনি মিশিয়া দিচ্ছে বামুন-দিদি। রোজই সেই কারণে বকতে তাকে।

মন্দাকিনী ভাবনার অতলে ডুব দিয়ে মনে করবার চেষ্টা করেন। স্মৃতির ভাঁড়ারে আঁতিপাতি হাতড়াতে থাকেন। একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, কে জানে বাপ, কোন্ গাইয়ের দুধ খাইয়া আমি টগর্-রাঁধুনিকে বকতাম..., আমার তো মনে নাই কিছু।

হিরণ্ময় বুঝি একটু একটু করে অবাক হচ্ছিলেন। বলেন, সে কি! এসব কিছুই মনে নাই তোমার?

মন্দাকিনী ততক্ষণে ডুব-সাঁতারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর ফেলে আসা মুখুজ্যাগড়ের আনাচে-কানাচে। ঘোলাটে স্মৃতিটাকে, ঠিক ধুলোবালিতে বিবর্ণ আয়নাটিকে ঘষেঘষে সাফ করবার ভঙ্গিতে, সাফ করতে থাকেন। কিন্তু একটু বাদেই তিনি আবিষ্কার করেন, কেবল সাধের পেয়ারা গাছটিকেই নয়, লালি গাইটিকেও নয়, মুখুজ্যাগড়ের অনেক কিছুই একটু একটু করে কবে যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে তাঁর স্মৃতিতে। পুরো গড়ের সবগুলো মহল, তার সবগুলো ঘর, বারান্দা, বাঁক-ট্যাক, গলিঘুঁজি, আজ আর পুরোপুরি স্মরণে নেই তাঁর। এমন কী রত্নহীরা, সুবিকাশ, উমা, এদের কারোর মুখই একেবারে সুস্পষ্টভাবে মনে পড়ে না। মনে হয়, বুঝি এজন্মের কথা নয় সেসব, মুখুজ্যাগড়ের তাবৎ গাছপালা, পাখিপাখাল, মানুষজন, আগের জন্মের যেন সবকিছু। জাতিস্মরের মতো তার কিছু কিছু আধো আধো

মনে থাকলেও, অনেকটাই এই ক'বছরে হারিয়ে গিয়েছে স্মৃতি থেকে।'

—আচ্ছা, উমার গালে একটা বড় তিল ছিলনি? গালে, নাকি কপালে?

—না, না তিল কুথা উমার মুখে? হিরণ্ময় আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকেন।

—তবে গড়ের মধ্যে কার গালে, নাকি কপালে একটা বড়সড় তিল আছে? ভুরুতে জটিল ভাঁজ তুলে ভাবতে বসেন মন্দাকিনী,—আমার যেন মনে হচ্ছে...।

—না, না, অন্য কারোর গালে দেখিয়া থাকবে তুমি।

হিরণ্ময়ের কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হন মন্দাকিনী। মনে মনে হাহাকার করে ওঠেন। বুকের মধ্যেটা একেবারেই ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এই ক'বছর সময় তাঁর স্মৃতি থেকে এতকিছু কেড়ে নিয়েছে! তাঁকে প্রায় নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা বানিয়ে ছেড়েছে!

এক সময় পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসেন মন্দাকিনী। বিড়বিড় করে বলেন, সত্যিই তোদের গড়ের অনেক কিছুই আমি ভুলিয়া গেছি বাপ। কী করিয়া ভুললাম বল্ তো?

এতক্ষণে হিরণ্ময় তাঁর মান-অভিমানের বেলুনটাতে সামান্য ফুঁ দেবার সুযোগ পান। বলেন, আমাদের উপর প্রবল রোষে তুমি আমাদের সক্কলকে, সব কিছুকে মন থিকে সরিয়া দিছ, মা। লচেৎ মাত্তর ক'বছরে এমনভাবে সবকিছু ভুলিয়া যায় কেউ?

হিরণ্ময়ের কথায় মন্দাকিনীর দু'চোখে করুণ ছায়া জমে। খুব ভেজা গলায় বলেন, অনেক কিছুই ভুলিয়া গেছি, এটা ঠিক, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোদের উপর আজ আর কুনো রাগ নাই আমার।

হিরণ্ময় মায়ের দিকে আশায় আশায় তাকান। খুব ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, যদি সত্যি সত্যি রাগ-অভিমান পুষিয়া না রাখো, তবে আমরা দুজনেই বলতেছি, ফিরিয়া চল তুমি। এই নিদারুণ লোকলজ্জার হাত থেকে আমাদের রেহাই দাও মা।

হিরণ্ময়ের গলায় অনেকদিন বাদে 'মা' কথাটা বেশ অন্যরকম শোনায় মন্দাকিনীর কানে। সেই ছেলেবেলায় ঠিক এমনি করে একেবারে বুকের ভেতর থেকে মন্দাকিনীকে মা বলে ডাকত হিরণ্ময়।

মন্দাকিনীর ভেতর-জগতে এক জাতের আলোড়ন শুরু হয় নিঃশব্দে। মা ডাকটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন তিনি। একেবারে দম আটকে বসে থাকেন। এক সময় তাঁর মুখমণ্ডলের কঠিন রেখাগুলি নরম হয়ে আসে।

মন্দাকিনীর মনের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটছে, সেটা বুঝি একটু একটু করে টের পেতে থাকেন হিরণ্ময়।

খুব অস্থির গলায় বলে ওঠেন, আমি তোমাকে না লিয়া নড়ছি না এখান থেকে।

মন্দাকিনীকে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়। তাঁর কপালে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। মুখের মধ্যে জিভটা অকারণে অলবলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চোখের কোল অল্প অল্প ভিজতে থাকে।

এক সময় হিরণ্ময়ের দিকে তাকান তিনি। নরম গলায় বলেন, ফিরিয়া যাইতে তো বলছু, কিন্তু কী করিয়া যাই বল্ দেখি বাপ? তোর উখেনে গিয়া থাকতে হইলে আমার সংসারটাকে কে দেখবে, বল্?

—যাহ্, কী যে বল তুমি! হিরণ্ময় ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চান মন্দাকিনীর কথাগুলো,—একলা মানুষ তুমি, তোমার আবার সংসার!

—একলা মানুষ কী রে? আমি চলিয়ালে আমার পাখিগুলাকে খাবাবে কে? এই অত অত পাখি আমার, গুপী, লালী, কবুতরী, হ্যাংলা, ভুষুণ্ডি—। আমার উঠোনেই তো দু'বেলা যত ভিড় অদের। যতো আবদার সব আমারই পাশ। আমার সাথেই তো যত কথা অদের। আমি চলিয়ালে কার সাথে আর কথা কইবে, বল? কথা কইতে না পারার কষ্টটা তো আমি বুঝি। বুকটা এক্কেবারে ফাটিয়া যাইতে চায়। আমাকে একবেলা না দেখতে পাইলে আমার ছাগলগুলা, ধলা-ছ্যাবলা-লালির দল তো ডাকিয়া ডাকিয়া গলার শিরা ছিঁড়িয়া ফেলবে। আমি নিজের হাতে অদের মুখের সামনে দুব্বাঘাস ধরিয়া না দিলে অদের পেট ভরবেই না। আমি চলিয়ালে আমার হাঁসগুলা কাকে ঘুম থেকে জাগাবার তরে রোজ শেষ রাতে ডাক পাড়বে, বল্? তাবাদে, আমার গাছগুলাতে দু'বেলা জল দিবে কে? আমার ভূতভৈরব, লঙ্কাজবা,

নয়নতারা, কাঠ-বেলি..., গুটিকয় রোগা-সোগা বেগুন-লঙ্কার গাছ, কে তাদের গোড়ার ঘাস-আগাছা নিয়মিত বাছিয়া দিবে? কে তাদের পাতা থিকে একটি একটি করিয়া শুঁয়াপোকা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে? যতি গুচ্ছাতের বউ জটিলা, তার ননদের ব্যাটা পঁটা, বড়ই ন্যাওটা আমার, আজ ছমাস শয্যাশায়ী। রোজ বিকালে একটিবার তাকে দেখিয়া না আইলে তার মনটা বড়ই উচাটান হয়। আমি চলিয়ালে তাকে গল্প শোনাবে কে? তোদের গড়ে ফিরিয়া গেলে তোরা কি আর আমাকে যতিয়ার বাড়িতে যাইতে দিবি? গগনার বউটা সামনের মাসেই বিয়াবে। আমাকে আগাম বলিয়া রাখছে, ব্যথা উঠলেই খবর পাঠাবে। আমি গিয়া ওর দাওয়ায় বুসলে পরে সে বিয়াবে, তার আগে লয়। পস্ট করিয়া বলিয়া দিছে আমাকে।— এমন অবস্থায় উকে ছাড়িয়া যাই কেমন করিয়া, বল্ দিকি?

মন্দাকিনীর কথাগুলো শুনতে শুনতে লজ্জায়, ঘেন্নায় হিরণ্ময়ের সারা শরীর রি-রি করছিল নিঃশব্দে। কিন্তু মন্দাকিনী যেন দেখেও দেখেন না তা। তিনি তখন আপন দুর্ভাবনায় মশগুল।

বলেন, পচার মা'টা বোধ করি আর বেশিদিন বাঁচবেনি। এই মাসটা পারায় কিনা সন্দেহ। উ মা'গী মরলে, পচাটা তো অকূল সায়রে ভাসিয়াবে। আমরা পাঁচজনা অর পাশটিতে গিয়া না দাঁড়ালে—। তাবাদে, দুদিন বাদে যমুনা খালটার দখল লিবে গাঁয়ের মানুষ। আমি অদের কথা দিছি, সে মিছিলে আমি সবার আগে রইব। না রে বাপ, এতসব ছাড়িয়া এখন আমার পক্ষে তোর গড়ে গিয়া থাকাটা এক্কেবারেই অসম্ভব। আমাকে মাফ করিয়া দে বাপ!

পরিচ্ছেদ ছয়

যুদ্ধ শেষে যে মানুষটি ফিরে চলেছেন ডেরায়...

সেই কাকভোর থেকে শুরু হয় তাঁর লড়াই। সে এক নিঃসঙ্গ লড়াই। দিনভর চলে তা। রাতভরও।

একা একা যেকোনও লড়াইই কঠিন হয়ে যায়। সহজতম লড়াইতেও হেরে যায় মানুষ। একা পেলে দুর্বলতম শত্রুটিও চরম সাহসী হয়ে ওঠে, নিজেরও বুকের বল অনেকখানি ক্ষয়ে যায়। তবুও তিনি নখে-দাঁতে চালিয়ে যাচ্ছেন লড়াইটা, নিরবচ্ছিন্নভাবে, আজ কত বছর!

তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সকালবেলায়, ফিরে এলেন সন্ধেবেলায়। পিছু পিছু এল তাঁর একজন পরম শত্রু। তিনি জানতেই পারেননি, বুঝতেই পারেননি। যখন বুঝতে পারলেন, তখন একেবারে সন্ধে নেমে এসেছে। তাও মানুষটি তো আজীবন লড়াকু, কাজেই ওই আকাট সন্ধেবেলাতেই শুরু করলেন লড়াই। সেই লড়াই এখনও চলছে।

ইদানীং আমার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয় তাঁর। তবে দেখা হলেই আমার চোখে চোখ রেখে তিনি বলেন, 'লড়াইটা অনেককে সঙ্গে নিয়েই লড়ব, এমনটা ভেবেই তো শেষবেলায় ফিরে এসেছিলাম জন্মভূমিতে, বল্ শঙ্কর। কিন্তু কী লাভটা হল!' আর তখনই তাঁর ফিরে আসার দৃশ্যটা ভাসতে থাকে আমার চোখের সামনে। মনে পড়ে যায় সেই এক বিকেলের কথা, পারিজাতকাকার উঠোনে আধখানা সন্ধিপুর এক টুকরো বাড়তি মেটেকে কেন্দ্র করে ঝগড়া পাতিয়েছিল, আর ঠিক তেমনই মুহূর্তে গাঁয়ে ঢুকলেন তিনি, একেবারে আগন্তুকের বেশে। তখন তাঁর দু'চোখে ছিল আবিষ্কারের আনন্দ। বিস্ময়।

ইদানীং মলিন বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছেন মানুষটি। তাঁর আজীবনের সঙ্গী সেই রহস্যময় সিন্দুকটি খাঁ-খাঁ করছে। এতদিনে নিজের রহস্যময়তা বেবাক হারিয়ে বেচারা বর্তমানে লোহার পাতে মোড়া একটা ঢাউস বাক্সবিশেষ। অথচ একদিন ওই সিন্দুকটাকে দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ের মানুষের মধ্যে কী বল্গাহীন কৌতূহল! তার মধ্যে কী কী সাত রাজার ধন কত কত পরিমাণে ঠাসা রয়েছে, তাই নিয়ে কতই না তর্কবিতর্ক, গবেষণা! এখন তার একদা-পালিশ-করা শরীরের ওপর পুরু ধুলো জমেছে! যদিও তিনি দাবি করেন, ওই বিবর্ণ সিন্দুকের তলায় কিছু দামি আসবাবের ভাঙা টুকরো নাকি এখনও অবধি ডাঁই হয়ে রয়েছে নিদারুণ অবহেলায়।

সেই কোন্ সাত-সকালে শিখা বউদি এসে সারাদিনের মতো বার্লি রেঁধে, ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে বিছানার পাশটিতে। কুঁজো ভরে রেখে গেছে জল। সে আর দিনভর আসার সময় পাবে না। কেন কি, সেও যে একটা লড়াই লড়ে চলেছে। এবং একটা নিরালম্ব মেয়ের পক্ষে লড়াইটা যে মোটেই সহজ নয়। তারও যে মরণ-বাঁচনের লড়াই সেটা। তবু মানুষটা শিখা বউদি, তাই নিজের এতখানি দুর্যোগের মধ্যেও এটুকু পারছে, অন্য মেয়ে হলে...।

একবাটি বার্লি আর এক কুঁজো জল, তাই সম্বল করে একটা গোটা দিন, রাত..., ওই নিয়ে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার স্বপ্ন দেখে চলা। ওই নিয়ে অবিবেচক নির্মম সময়ের বিরুদ্ধে মানুষটা বিষম লড়াইতে সামিল হন রোজ।

তাঁকে দেখতে দেখতে একটু একটু করে পেছোতে থাকি আমি। একেবারে চলে যাই আমার সেই ছেলেবেলায়। মনে পড়ে, সেই এক শীতের শেষ-বিকেলে কমলালেবুর মতো লালচে রোদ্দুর সারা গায়ে মাখতে মাখতে রানিহাঁস দিঘির পাড় বরাবার আমাদের গাঁয়ে ঢুকেছিলেন একজন আগন্তুক। আমার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরো।

ওই বিকেলে, তখন, পরিজাতকাকার উঠোনে এক-ভিড় মানুষ এক টুকরো মেটের জন্য, এবং সারা ঢাক-কদমের গাছ জুড়ে কয়েক ডজন কাক ফেলে-দেওয়া নাড়িভুঁড়ির টুকরো-টাকরা, ছাঁট ইত্যাদির আশায় তুমুল কলহ শুরু করেছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের রাস্তায় গরুর গাড়ির ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর আওয়াজ শুনে বিবদমান মানব-সমাজের সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। এবং দেখতে পায়, ছইহীন গরুর গাড়িটার ওপর একটা বিশাল আকারের সিন্দুক, তার ওপর গ্যাঁট মেরে বসে রয়েছেন সেই অদ্ভুত আগন্তুক।

ঠিক বসে রয়েছেন এমনটা বলা ঠিক নয়। আমাদের গ্রামের পাড়াগুলির ওপর তখন শীতের শেষ বিকেল একটু একটু করে তার মায়াজালটি বিস্তার করছে, লালচে কমলালেবু রোদ্দুরের গায়ে হালকা কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণ, আর, ওই আগন্তুক দু'চোখ দিয়ে ওই মায়া-মায়া গ্রাম-প্রকৃতিকে চাখতে চাখতে এগিয়ে চলেছেন রানিহাঁস দিঘির পাড় ঘেঁসে পুবদিক থেকে যে রাস্তাটা আমাদের গাঁয়ে ঢুকেছে, ওই রাস্তা বরাবর।

যখন পারিজাতকাকার বাড়ির সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা, ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর আওয়াজ শুনে এক টুকরো বাড়তি মেটেলির ঝগড়া থামিয়ে সবগুলি মানুষ মুখ ঘোরায় রাস্তার দিকে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে গরুর গাড়ি, সিন্দুক, এবং তার ওপর বসে-থাকা মানুষটির দিকে। আর, কাকেরা তো মানুষকে কোনওকালেই বড় একটা পাত্তা দেয় না, তারা আগের মতো কলরবেই মত্ত থাকে।

মনে আছে, কলহটা শুরু হয়েছিল গজানন আর অনাদি পয়ড়ার মধ্যে। গজানন ছিল আমার বন্ধু, সহপাঠী। আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেড পণ্ডিত কামাখ্যা ভট্টর ছেলে সে। একটুকরো বাড়তি মেটের জন্য দু'জনের মধ্যে বিতণ্ডা, একটু একটু করে তা ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো জমায়েতের মধ্যে, এবং একটুক্ষণের মধ্যেই তা কাক-কলহে পরিণত হয়েছিল পারিজাতকাকার উঠোনে।

আসলে, পারিজাতকাকা অনাদি পয়ড়াকে একটুখানি বেশি মেটে দিল দেখে গজাননও, তখন ছেলেমানুষ সে, আমাদেরই বয়েসি, একটুখানি হ্যাংলাও ছিল চিরকাল, জেদ ধরে, তাকেও আরও একটু মেটেলি-মাংস দিতে হবে।

—'আরে, সক্কলকে দিতে হবে তো।' পারিজাতকাকা নাচার গলায় বলে, 'তুই একলা খাইলে চলবে?'

—'অনাদিকাকাকে যে অতটা দিলে? উ পয়সা দিচ্ছে, আর আমি কি মাগনা লিচ্ছি?'

—'বটে তো। যার অত মেটেলি খাওয়ার ইচ্ছা, সে চইলা যাউ ব্যালদাবাজার, কিনিয়া আনুক যতটা খুশি মেটেলি, কেন কি, সেখানে খাসির যেখান থিকে যে-মাংসটি যতটা চাইবে খইদ্দার, সেই থানের মাংস ততটাই দিবে দোকানদার। একটা খাসির পুরা মেটেলিটাই কিনিয়া আনুক না অনাদি। বাধা দিচ্ছে কে? তাবলে এই গাঁওলি মাংসের বিকিকিনিতে কম-বেশি করাটা তো লেহ্য লয় হে পারিজাত।'

না, কথাটা গজাননকে বলতে হয়নি, পাশ থেকে বলে উঠেছিল কার্তিক পাল, কেন কি, গেল বছর একজনার সঙ্গে তার ছোট মেয়েটার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে যাওয়ার পরও অনাদি ভেতরে ভেতরে লোক লাগিয়ে বরটাকে বেশি পণের বিনিময়ে ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের শালির মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন গজরাতে গজরাতে একসময় থেমে গিয়েছে কার্তিক পাল, কিন্তু এই ধরনের ঘটনাতেই বোঝা যায়, বাইরের ঘা শুকিয়ে গেলেও ভেতরে থেকে যায় ক্ষত। সামান্য ছো পেলেই সে ক্ষত মুখ দেখায়। এই যেমন, কার্তিক পালকে গজাননের পক্ষে এবং অনাদির বিপক্ষে কথা কইতে দেখে তার চিরকালের জ্ঞাতিশত্রু জগৎ পাল বলে ওঠে, 'কে অত বেলদাবাজার দেখাচ্ছে হে? বেলদাবাজারে মুখ দেখিয়া যত খুশি মেটেলি দিবে? দস্তুর মতো দ্বিগুণ দাম লিবে তার তরে। যার অত পইসা বেশি হইছে, সে চলিয়া যাউ বেলদাবাজার। গাঁ-ঘরে মাংস কিনতে হইলে, সবাইকে সবকিছো

আপোসে ভাগাভাগি করিয়া লিতে হবে।'

—'ভাগাভাগি করিয়াই তো লিছ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেও কোউ একটা কিছো চিজ টুকচার বেশি চাইলে দিতে হবে না? একেবারে স্বেচ্ছায় কার্তিক পালের পক্ষ নেয় জগৎ পালের চিরশত্রু বঙ্কিম বাগ,—

—'না, দিবা হবেনি।'

—'দিবা হবেনি বলবার তুমি কে হে? যে খাসি কাটিয়া বিকছে, দিবে কি দিবেনি, সে বুঝবে।' আসরে নামে ভরত পয়ড়া।

—'বাহ্ বেশ কথাটি তো কইলে হে? খাসিটা আমার নয় বলিয়া অন্যায়ের পোতিবাদটাও করা যাবেনি?' কার্তিক পাল রেগে কাঁই হয়।

—'ওহ, কত আমার পোতিবাদ করনেওলা আইলেন রে! যেবার রবিচাষের মরসুমে আমার পুকুরটার জল শুকিয়া গেল, আর একটা মাত্তর সেচ পাইলে ফসলটা বাঁচিয়া যাইত, বঙ্কিম বাগকে কত করিয়া কইলাম, অথচ মাঠের ধান মাঠে শুকিয়া গেল, তাও একটা সেচ কিছোতেই অর পুকুর থিকে লিতে দিলোনি সে, তখন তো রা'টিও কাড়োনি। তখন কুথায় ছিল তুমার পোতিবাদ?'

—'আরে! কী আচানক কথা! তার পুকুর, সে যদি সেচের জল অন্যকে নাই দেয় তো আমাদের কী বলবার আছে?' অকস্মাৎ বঙ্কিম বাগের পক্ষ নেয় হারাধন রায়।

—'বটে তো। কুনোদিন তুমি বায়না ধরবে, কিনা, আমার বউটা বুড়ি হইয়া গেছে, তুমারটা জোয়ান আছে, দু'দিন শুইতে দাও তার সাথে।' পাশ থেকে পোঁ ধরে নগেন ভূএ্যা।

—'অ্যাই, মুখ সামলিয়া কথা কইবি। বিপদে-আপদে যদি পড়শিরা সহায় না হয়, তবে সমাজে বাস করা ক্যানে? শহরে চলিয়া গেলেই হয়। সিখেনে কোউ কারোকে চিনে না, কারোর তরে কারোর মাথাব্যথা নাই—।'

—'ও? গাঁয়ে বাস কচ্ছে বলিয়া তাকে চাওয়া মাত্তর ইন্দ্রের ঐরাবতটি দিতে হবে?'

—'ইন্দ্রের ঐরাবত কে চাচ্ছে হে? সামান্য একটুখানি মেটেলি, ছেলেমানুষ চেয়েছে।'

—'আ-হা, ছেলেমানুষ! বিয়া দিয়া দিলে এক্ষুনি দু'ছা'র বাপ হয়্যাবে!'

—'হ্যাঁ, হয়্যাবে বৈকি, তবে যে-সে মেয়ার সাথ বিয়া দিলে হবেনি। বিয়া দিতে হবে এমন মেয়ার সাথ, যে কিনা বিয়ার আগেই একটা ছা বিয়াই ফেলছে।'

শেষের কথা ক'টি বলেই জমায়েতের মধ্যে মুখ লুকোয় তারক দে। কিন্তু তার আগেই শরৎ মাইতি দেখে ফেলেছে বক্তার মুখ। ফলত, পারিজাতকাকার উঠোনে আচমকা বাজ পড়ে, কেন কি, শরৎ মাইতির মেয়েটা পাশের গাঁয়ের এক ছোকরার সঙ্গে লটর-পটর করে বাচ্চা বাধিয়ে ফেলেছিল পেটে। শরৎ মাইতির পুরো বংশটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোথায় যেন কোন্ বৈদ্যের কাছে নিয়ে গিয়ে খালাস করে এনেছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই রটনা পেয়ে গিয়েছে চতুর্দিকে যে, আজ এক বছর হাজার চেষ্টা করেও মেয়েটার জন্য বর জোটাতে পারছে না শরৎ মাইতি। যে দেখতে আসছে, দেখে গিয়েই আর এমুখো হচ্ছে না। শরৎ মাইতি জানে, যারা আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে, তাদের ভেতর তারক দে অন্যতম।

সহসা চিৎকার করে তারকের দিকে তেড়ে যায় শরৎ মাইতি, 'শালা, যত বড় মু' নয়, তত বড় কথা! এক ঘুসিতে দাঁত ভাঙিয়া দিবো।—'

—'কী কইলি? দাঁত ভাঙিয়া দিবি? অত ক্ষমতা তোর? পাশ থেকে হুংকার ছাড়ে তারকের জেঠতুতো দাদা মদন দে,— কই, ভাঙ্ দেখি। অ্যাই তারক, যা তো' রে অর পাশ। লে, ভাঙ্। কী হইল? ভাঙ্। ওরে বাপের ব্যাটা, ভাঙ্ না দেখি।'

আসলে, আমাদের গাঁয়ের নিয়মই তাই। প্রথমে ঝগড়াটা বাধে দুজনের মধ্যে। ঝগড়া ঠিক নয়, হয়ত বা মৃদু কথা কাটাকাটি। সামান্য উষ্মাপ্রকাশ। ক্রমশ, ধীরে ধীরে, একাধিক দুর্জ্ঞেয় কারণে চারপাশের মানুষজন কোনও না কোনও পক্ষভুক্ত হয়ে যায়। একজন কোনও একটা পক্ষ নিলে অন্যজন কোনও এক দুর্জ্ঞেয় কারণে তার বিপরীত পক্ষটি নেবেই নেবে। ফলে, প্রথমে সামান্য কথা-কাটাকাটি, একটু একটু করে তা তর্কাতর্কির রূপ নেয়। ক্রমশ তা বেড়া বাঁধা, আল কাটা, চুরি করে মাছ ধরা, আইবুড়ো

মেয়ের পেটে গর্ভসঞ্চার করা, চুরির টাকায় জমি কেনা, অবৈধ প্রেম, সেচের জল, জমির সীমানা,— একে একে সবকিছুকে ছুঁয়ে ফেলে। ফলে, তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। হাতাহাতি থেকে মারামারি। রক্তারক্তি। কলহের সূচনাকারী দুজন হয়ত বা এতটা চায়ইনি। হয়ত এই নিয়ে কোনও তর্কাতর্কিই চায়নি তারা। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আর সেটা তাদের নিজস্ব থাকে না। ব্যাপারটা এমনই এক সার্বজনীনতা পেয়ে যায়, বিবদমান প্রথম দুজন পুরো ইস্যুটাতে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর হয়ে যায়। তখন যদি অনাদি পয়ড়া বলে যে, 'ছাড় দেখি, বাদ দাও, গজাননই লিক সবটুকু মেটেলি, আমার দরকার নাই,' তো, একডজন মানুষ অনাদি পয়ড়ার ওপর বাঘের ঝাপট নেবে, কিনা, 'কী কথা কও তুমি? পুরো মেটেলিটা গজাননকে দিতে হবে ক্যানে? উ কি লবাব নাকি?' তার জবাবে যদি অনাদি বলে যে, 'বলতিছি তো, আমার দরকার নাই মেটেলির,' তো চারপাশের দশজনা ওকে থামিয়ে দিবে বলবে, 'তুমার দরকার না থাকে তো তুমি লিওনি। তুমি না নিলে অন্য কেউ লিবে, কিন্তু একজনকে সবটুকু মেটেলি দিতে হবে ক্যানে?' গজাননকে ছেড়ে তখন অন্যদিকেই বিঁধতে থাকবে ওরা,—'কে তুমি দাতাকর্ণ আইলে হে! অত যদি মেটেলি বিলাবার সখ, তো, নিমপুরার হাট থিক্যা একটা খাসি কিনিয়া আনিয়া নিজের উঠানে কাট, তখন যত খুশি মেটেলি বিলাবে, কোউ কিছো কইতে আইস্‌বে নি।' এইসব বলতে বলতে ওরা চেঁচামেচিটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যাতে করে পরবর্তীকালে মাংস কিনতে যারা এল, তারা এমনটাই বুঝবে যে, অনাদিই অন্য কাউকে অধিকাংশ মেটেটাই দেবার জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে, দেরিতে আসা মানুষগুলি একেবারে উল্টো ধারণার বশবর্তী হয়ে অনাদিকেই এই বলে বিঁধতে থাকবে যে, 'অনাদিটার স্বভাবই এমনধারা, পরের ধনে পোদ্দারি করতে চায়। লচেৎ একজন তার নিজের উঠানে খাসি কাটিয়া বিকছে, তুই কুন অধিকারে সবটুকু মেটেলি একজনকে দিবার সুপারিশ করু?'

—'আরে, অনাদির তো চিরকালই এমনটা স্বভাব। লচেৎ গরিব মানুষ হরির-লুট দিছে, সে বেচারির কোমরে জোর কম, মাত্র দু-সের বাতাসা এনেছে, তুই কেন ফোপরদালালি করিয়া পরথম কিস্তিতেই সবগুলা বাতাসা শেষ করিয়া দিলি? তোকে বাতাসা বিলির দায়িত্বটা দিল কে যে তুই উজবুদ্ধা বারান্দার কুলুঙ্গিতে রাখা বাতাসার ঠোঙ্গাটা লিয়া চারপাশে ছাটতে লাগিয়ালু?'

—'হাঁ..., সেবার বাগাম্বর দন্‌পাটের দোরে হরির-লুটের সময়ও তো এই কাণ্ডটাই ঘটাল অনাদি। আরে, তুই হইলি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খোঁজে তোর দরকারটা কী?'

অনাদির ওপর এইমতে ঝড়বৃষ্টি চলতে থাকবে অনেকক্ষণ অবধি, গজানন হয়ত বা ততক্ষণে মাংসের জামবাটিটি নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে, কিংবা ততক্ষণে বাড়িতেই পৌঁছে গেছে।

দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কিটা শুরু হলে পাড়ার কিংবা গাঁয়ের কে যে কার পক্ষ নেবে সেটাও এক গোলমেলে অঙ্ক। অনেক সূক্ষ্ম আর জটিল স্বার্থ জড়িয়ে থাকে তাতে। সেই কারণেই দেখা যায়, পনের দিন আগে যে মানুষটি কোনও ইস্যুতে একজনকে সমর্থন করেছে, পনের দিন বাদে অন্য একটা ইস্যুতে সে-ই ওর বিরোধিতা করছে।

সেদিনও, সেই শীতের বিকেলে, গজানন আর অনাদির মধ্যে চাগিয়ে ওঠা ঝগড়টা কতক্ষণ অবধি চলত কে জানে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আগন্তুক মানুষটি গাঁয়ে ঢোকায় কলহে ইতি টেনে সবাই মুখ ফিরে তাকায়। ভুলভুল করে দেখতে থাকে আগন্তুককে। পরমুহূর্তে মেটের ঝগড়া মুলতুবি রেখে সবাই আরও জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা জুড়ে দেয়, কিনা, শেষবেলায় গাঁয়ে ঢোকা আজব আগন্তুকটি বাস্তবিক কে বটে! কে হতে পারে!

আমাদের গাঁয়ে ভিনদেশি মানুষ যে কখনোই ঢোকে না তা তো নয়। ভাদ্র-আশ্বিনে ঢোকে হিন্দুস্থানী মহাজনরা, সারা মাঝিপাড়া ঘুরে ঘুরে ঋণকর্জ দেয় ওরা। দুর্গাপুজোর সময় বাবুদের বাড়ির কুটুম-বাটুমেরা আসে লটবহর সাজিয়ে। শীতের পর মাঠে ধান পাকলে আবার ফিরে আসে ওই হিন্দুস্থানী মহাজনের দল, সুদসহ আদায় করে কর্জের টাকা। আর তখনই আমাদের গাঁয়ের সম্পন্ন পরিবারগুলিতে শুরু হয়ে যায় বাৎসরিক মাহিন্দার নিয়োগের হিড়িক। বাৎসরিক মাইনে এবং তৎসহ কাপড়-গামছা,

তেল-বিড়ির চুক্তি হয়। সে সময়টা মাসটাক ধরে চলতে থাকে আমাদের গাঁয়ে মাহিন্দারদের ঘর-বদলের পালা। মুখুজ্যাবাবুদের বাড়ির এক মাহিন্দার হয়ত ভর্তি হল কল্পনাথদের বাড়িতে, কেন কি, মুখুজ্যাবাবুর মা মন্দাকিনী বড্ড ক্যাটক্যাট করে কথা কয়। আবার কল্পনাথদের মাহিন্দারটি চলে গেল ভট্টদের সংসারে, কেন কি, ভট্টদের বাড়িতে ইদানীং খাওয়াদাওয়াটা ভালো হচ্ছে। নতুন মালিকদের থেকে বায়না হিসেবে প্রত্যেকেই নিয়ে নেয় বছরের পুরো মাইনের অর্ধেক টাকা। ওই দিয়ে মেটায় মহাজনদের কর্জ। তৎসহ কিনে নেয়, ওই মহাজনদের থেকেই, এক-আধখানা সস্তা কম্বল কিংবা একজোড়া মোটা ছিটের লুঙ্গি। এছাড়া পাল-পার্বণে আসে যাত্রাগানের দল, গাছ কিংবা গরুর খোঁজে মুসলমান দালাল...। কিন্তু সেই বিকেলের আগন্তুক মানুষটি ছিল ওদের সকলের চেয়ে একেবারেই অন্যরকম। পারিজাতকাকার উঠোন থেকে আমরা দেখলাম, সামনের রাস্তা দিয়ে মাঝ-গাঁয়ের দিকে ঢুকছে একটা গরুর গাড়ি, তাতে একটা বিশাল সাইজের সিন্দুক, এবং সিন্দুকের ওপরে বসে রয়েছে লোকটি, নির্বিকার। পশ্চিম আকাশে দৃষ্টি বিঁধিয়ে সে যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছে।

আমাদের গাঁয়ের কেউ তো নয়ই, পাশাপাশি অঞ্চলেরও নয় কেউ, এমন কি লোকটাকে প্রথম দর্শনে এ-দেশীয় বলেও মনে হল না আমাদের। গায়ের রঙ লালচে ফরসা, সারা শরীরে লম্বা লম্বা লালচে চুল, লম্বা কাঠখোট্টা চেহারা. বয়েস আন্দাজ করা মুশকিল, তবে ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। পরনে রঙিন কুর্তা পাজামা, তার ওপর বাহারি কাজ করা জহরকোট, মাথায় জরির কাজ করা তিব্বতি টুপি।

দেখতে দেখতে আমরা সবাই নিদারুণ ধন্ধে পড়ে যাই। এমন একটা আজব মানুষ কেন যে ঢুকল এই শীতের পড়ন্ত বিকেলে আমাদের এই অজ গাঁয়ে, কারোই ঠাহর হয় না তা। গাড়িটা ক্যাঁচ্‌কোচ আওআজ তুলতে তুলতে এগিয়ে যায় মাঝ-গ্রামের দিকে।

ফলত, এক টুকরো বাড়তি মেটেলিঘটিত টানটান উত্তেজনাদির মধ্যে কিঞ্চিৎ খাদ মিশে যায় সেই বিকেলে। লোকটাকে নিয়ে প্রবল গবেষণা শুরু হওয়ায় কলহরত অনেকেই কিঞ্চিৎ এলমেলো এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাদের চিরকেলে প্রতিপক্ষটিকে ঠিক কতখানি কাত করবার কথা ভাবছিল এবং তার জন্য কতখানি লড়াই করবে বলে মনে মনে স্থির করেছিল, বেমালুম ভুলে যায় তা। এবং ওই পরিস্থিতিতে আধ সের মাংসের জায়গায় পারিজাতকাকা সুযোগ বুঝে ওজনে কিঞ্চিৎ কম দিলেও বড় একটা আপত্তি তো করেই না, মালুমই পায় না ব্যাপারটা। তার বদলে বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে, 'লোকটা, শালা, তুর্কি-মুসলমান না হইয়া যায় না।'

জমায়েতের কেউই সেদিন ওই আগন্তুক লোকটিকে দেখে চিনতেই পারেনি। এমনকি গরুর গাড়িটিকেও এ গাঁয়ের কারোর বলে মনে হয়নি তাদের। ওই শীতের প্রায়-সন্ধের আলো-আঁধারিতে মানুষটিকে নিয়ে গরুর গাড়িটি ধীর লয়ে চলে গিয়েছিল মাঝ-গ্রামের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন বাদে সন্ধিপুর গাঁয়ের চিরকেলে ঐতিহ্যটাই ভেঙে দিয়েছিল ওই আগন্তুক, কেন কি, ওকে দেখবার পর মেটেলি নিয়ে সারা গাঁয়ের কাজিয়াটা অসমাপ্ত অবস্থায় থেমে যায়। সব মিলিয়ে, ওই পড়ন্ত বিকেলে, মানুষটিকে নিয়ে সোরগোল উঠেছিল চতুর্দিকে। শীতের শেষবেলায় গ্রামের নিস্তরঙ্গ দিঘিতে একটা বড়সড় ঢিল পড়েছিল সেদিন। তার তরঙ্গগুলি আকারে বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে।

জমায়েতের ভেতর থেকে কে যেন মস্করা করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কার ঘরে কুটুম আইলো হে? এইবেলা টুকচার বেশি মাংস লিয়া যাও। লচেৎ ঘরে গিয়া বেইজ্জত হয়্যাবে।'

বুকের ভেতর সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে সেই সন্ধেয় বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছিল সবাই।

মনে আছে, পরের দিন সকালে গজাননের মুখ ভার।

অনেক সাধ্যসাধনায় জানা গেল তার বিমর্ষতার কারণ। গতকাল যে তিনপোয়া মাংস নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সে, তার বারো আনাই নাকি সাবাড় করে দিয়েছে একজনাতেই।

শুনে আমরা সবাই থ। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে আমার। ওদের হুলোটাই তবে কি পুরোটাই—।

গজানন খুব ব্যাজার মুখ বলে, 'হুলো ক্যেন হইতে যাবে? সে এক বুড়া ভাম।' তারপরই যার কথা উল্লেখ করল সে, শুনেই আমি বিস্ময়ে থ। বলে কিনা গত সন্ধ্যার ওই আগন্তুকই মেরে দিয়েছে বারো আনা মাংস।

গজানন দু-চোখ কপালে তুলে বলে, 'বাপ রে, লোকটা যেন এক আস্ত রাক্ষস।'

—'ঐ লোকটা গেল-সইন্ধ্যায় তোদের বাড়িতেই এসেছে তবে?'

মুহূর্তের মধ্যে মনের যাবতীয় হতাশা ঝেড়ে ফেলে খুব উৎসাহভরে মাথা দুলিয়ে সায় দেয় গজানন।

শুধোই, 'লোকটা কে?'

জবাবটা উচ্চারণ করবার আগেই গজাননের ব্যাজার মুখটার থেকে ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে যাবতীয় মেঘ। সারা মুখমণ্ডলে রোদ্দুর ফুটে ওঠে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঐ তো আমাদের মিলিটারি-দাদু।'

পরক্ষণেই নিজের আগের কথাগুলোর বিরুদ্ধে নিজেই সওয়াল জোড়ে,— মিলিটারি দাদুর আর কী দোষ! দোষ তো আমাদেরই। কোন্ আক্কেলে আমরা তাকে মাত্র আধা-সের মাংস খেতে দিয়েছি? যে-কিনা সকালের জলখাবারে দু-ডজন আন্ডা আর এক পাউন্ড রুটি খায়, সেই সঙ্গে জলের বদলে সের-দু-তিন খাঁটি দুধ, তাকে কিনা আমরা দিয়েছি আধা-সের মাংস!'

বলতে বলতে দাদুগর্বে এতটাই ফুলে ওঠে গজাননের পাঁজর-সার ছিপছিপে বুক যে, গেল-রাতে মাংসের বদলে শুধু ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার যাবতীয় আক্ষেপ বেমালুম ভুলে যায়, এবং, তার বদলে চোখে মুখে যৎপরোনাস্তি গুমোর ফুটিয়ে বলে, ঐরকম না খেলে জার্মানদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারত? কিংবা আফ্রিকায় দশাসই কাফ্রিদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে জিততে পারত?

গজাননের মিলিটারি-দাদুকে আমরা কখনোই চোখে দেখিনি। তবে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর কথা বিস্তর শুনেছি। তাঁর আসল নাম যজ্ঞেশ্বর ভট্ট। আমাদের গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের হেড-পণ্ডিত কামাখ্যা ভট্টর কাকা তিনি। সেই সুবাদে কামাখ্যা পণ্ডিতের ছেলে গজাননের তিনি মিলিটারি-দাদু। এবং যেহেতু আমরা অর্থাৎ, কল্পনাথ, ঝংকার রতন,—আমরা সবাই গজাননের বন্ধু ও সহপাঠী, সেই সুবাদে তিনি আমাদেরও মিলিটারি-দাদু।

গজাননের ঠাকুরদার ছোটভাই ছিলেন তিনি। সেই কোন্ উঠতি যৌবনে, মাত্র কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে ঘর ছেড়েছিলেন যজ্ঞেশ্বর। স্বদেশি দলে নাকি নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। মাঝে মাঝেই নাকি হাওয়া হয়ে যেতেন। দু-এক হপ্তা বাদে ফিরে আসতেন। তখনও অবধি সন্ধিপুরের মানুষ এমনটা আন্দাজও করেনি যে, যজ্ঞেশ্বর স্বদেশি দলে নাম লিখিয়ে লালমুখো সাহেবদের খতম করবার শপথ নিয়েছেন।

একদিন গভীর রাতে ইংরেজের পুলিশ চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ভট্টবাড়ি। দরজা খুলিয়ে সারা বাড়ির তল্লাসি নিল। যজ্ঞেশ্বর তখন হাওয়া। যজ্ঞেশ্বরের বাবাকে অনেক ধমক-ধামক দিয়ে ফিরে গেল থানার দারোগা। যজ্ঞেশ্বর বাড়ি ফিরলে অতি অবশ্যই থানায় খবর দিতে বলে গেল, আর তাতে করেই সবাই জানল, যজ্ঞেশ্বর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী স্বদেশি।

শুনে গোটা সন্ধিপুরের মানুষ বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর আর ফিরলেন না। তারপর আর গাঁয়ে ফেরেনইনি তিনি।

তাঁর ভাগ্যে কী কী ঘটতে পারে, তাই নিয়ে যখন সারা তল্লাট জুড়ে হরেক কিসিমের কানাঘুসো, গবেষণা, তারও অনেক পরে যজ্ঞেশ্বরের চিঠি এল। আর, ওই চিঠি থেকেই গাঁয়ের মানুষ জানল, যজ্ঞেশ্বর বেঁচে রয়েছেন। মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে তিনি তখন পাঞ্জাবে। খুব শিগ্‌গির নাকি তাঁকে চলে যেতে হবে কাবুলে।...

তারপর দীর্ঘকাল আর তাঁর কোনও খোঁজই পায়নি সন্ধিপুরের মানুষ। তাঁকে নিয়ে এত বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা অনেক হয়েছে, তাঁর অবস্থান নিয়ে কতই না উড়ো কথা ছড়িয়েছে চতুর্দিকে। একসময় সেসবও থিতিয়ে গেছে। তারপর, পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশ জুড়ে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশ-

ভাগ, স্বাধীনতা এক-এক করে ঘটে গেছে। ওই সবের মধ্যে একটু একটু করে মানুষের মন থেকে কবে যেন হারিয়েই গিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বর। তারপরও কতকাল কেটে গেছে..., একদিন পড়ন্ত বেলায় তিনি ফিরলেন। তাঁরও তখন পড়ন্ত বেলা।

তখনো আমরা ওঁকে কেউই দেখিনি বটে, কিন্তু ওই বয়সে গজাননের মিলিটারি-দাদুর কথা শুনেছি অনেকের মুখে। শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন জানি আমার বড়পিসিও তাঁর প্রসঙ্গ তুলত কখনো সখনো। আর, বড়পিসি যে শুধু শুধু কাউকে দীর্ঘকাল স্মরণ রাখে না, সেটা আমার চাইতে আর কেই বা বেশি জানে! গজাননও মাঝেমধ্যেই আমাদের কাছে বলত তাঁর নাম, তাঁর ঘর ছাড়ার প্রসঙ্গ। খুবই ভাসা ভাসা ছিল সেই বর্ণনা। তিনি নাকি যুদ্ধে গেছেন। কোন্ এক অজানা মুলুকে তিনি নাকি যুদ্ধ করে চলেছেন এতগুলি বছর ধরে। যুদ্ধ থামলেই নাকি ফিরে আসবেন তিনি।

সামান্য বড় হলাম যখন, আমাদের মনে সন্দেহ জাগত, গজানন হয়ত বা বানিয়ে বানিয়ে বলে সেসব কথা। তখনই যা বানিয়ে বলতে পারত ও!

আসলে, মিলিটারি-দাদুর সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই ছিল না তার। শুধু বড়দের মুখে শুনেছিল, তাদের ছোটদাদু মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে চলে গেছে কোন্ অজানা মুলুকে। কোথায় সে মুলুক, সেখানে এতকাল ধরে কার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি, এ ব্যাপারে কোনও সম্যক ধারণাই ছিল না তার। কিন্তু যেহেতু সে মুড়ি-মুড়কির মতো কথা বানাতে পারত, তার কল্পনাশক্তিও ছিল আকাশছোঁয়া, সে তার মিলিটারি-দাদুকে নিয়ে এমন গালগল্প করতে পারত, যেন সে নিজে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছে তাঁর হালহদিশ। প্রায় রোজদিনই তার কথাবার্তার মধ্যে এসে যেতেন তিনি। বিশেষ করে, আমাদের সেই ছেলেবেলাতে যখন সুভাষ বোসকে নিয়ে দেশের মানুষের মনে সীমাহীন কৌতূহল, উৎসাহ, তেইশে জানুয়ারিতে নেতাজির জন্মদিবস পালন করবার কালে যখন আমাদের স্কুলের ব্রতচারী মাস্টার কেশববাবু নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করতেন, বিমান দুর্ঘটনায় যে তাঁর মৃত্যু হয়নি, তিনি যে যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে এসে জহরলালের থেকে শাসনভার তুলে নিতে পারেন নিজের হাতে, যখন দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলতেন সেসব কথা, পাশটিতে বসে গজানন ফিস্‌ফিস্ করে বলত, 'দেখবি আমার মিলিটারি-দাদুও একদিন ফিরিয়া আইস্‌বে। নেতাজির সঙ্গেই ফিরিয়া আইস্‌বে সেও।' আমরাও মনে মনে ভাবতাম, যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসেন গজাননের মিলিটারি-দাদু তো বেশ হয়।

তারপর একদিন, পড়ন্ত বিকেলে, প্রায়-সন্ধের আলো-অন্ধকার সারা গায়ে মেখে তিনি ফিরে এলেন আমাদের গাঁয়ে।

যথেষ্ট পরিমাণ মাংস খেতে না পাওয়ার আক্ষেপটা যখন একটু একটু করে থিতিয়ে এল, গজানন শুরু করল তার মিলিটারি-দাদুর গল্প।

তার চোখে তখন মিলিটারি-দাদুর সবকিছুই রহস্যে মোড়া। তার পোশাক-আসাক, হাঁটাচলা, কথাবার্তা, সবকিছুই বুঝি আজব লাগছিল গজাননের চোখে। যতটা আজব লাগছিল, বাড়িয়ে বলছিল তার চেয়েও ঢেরগুণ বেশি। তার কাছে সবচেয়ে রহস্যময় ছিল সঙ্গে আনা ওই ঢাউস সিন্দুকটি। তার মধ্যে যে বাস্তবিক কী রয়েছে, তার অন্ধি-সন্ধি তখনও অবধি জানে না কেউই, আর জানে না বলেই রহস্যটা ফুলে ফেঁপে আকাশ ছুঁতে চায়।

একসময় সে দুনিয়ার যাবতীয় উদারতা নিয়ে আমাদের সবাইকে মিলিটারি-দাদুকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে।

গজাননের মিলিটারি-দাদুকে চাক্ষুষ দেখাটা আমাদের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।

সারা ছেলেবেলা জুড়ে যার কথা এত-এত শুনেছি, শুনতে শুনতে একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে বুকের মধ্যে, তাকে চাক্ষুষ দেখবার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা যেমন থাকে, পাশাপাশি এক ধরনের আশঙ্কায় দুরু দুরু করতে থাকে কচি বুকগুলি, কিনা, যে ছবিখানা আঁকা রয়েছে বুকের মধ্যে, তার সঙ্গে কতটা মিলবে, কতটা মিলবে না—।

আগের দিন গজাননের মিলিটারি-দাদুকে পারিজাতকাকার উঠোন থেকে একঝলক দেখেছিলাম,

তাও তখন দিনের আলো প্রায় নিভু-নিভু, একটা কলহের বাতাবরণ ছিল পারিজাতকাকার উঠোনে, মনের মধ্যে মাংস পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে ছিল চাপা আশঙ্কা, উদ্বেগ, খুঁটিয়ে কিছু দেখিনি। তখন এক টুকরো বাড়তি মেটে নিয়ে চারপাশের মানুষগুলি অশান্ত ছিল। তারই মধ্যে শীতের সন্ধের ওই ধোঁয়াশা মেশানো আলো-আঁধারির ভেতর ছইহীন গরুর গাড়িটি, তার ওপর এক বিশাল সিন্দুককে সিংহাসন বানিয়ে বসেছিলেন যে বৃদ্ধ মানুষটি, তাকে একঝলক মাত্র দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। চোখের ঘোর কাটতে না কাটতেই গরুর গাড়িটা চলে গিয়েছিল সূক্ষ্ম-নজরের বাইরে। তার মধ্যেও মনে হয়েছিল, বৃদ্ধ অথচ সুদর্শন একজন মানুষ।

ওই সন্ধ্যার পরবর্তী ঘটনা আমরা শুনি গজাননের মুখে। সেও পুরোটা স্বচক্ষে দেখেনি, কতকটার ছিল প্রত্যক্ষদর্শী, কতকটা শুনেছে, কিস্তিতে কিস্তিতে, দু-দিদির থেকে।



যজ্ঞেশ্বর যখন ভরসন্ধেয় গজাননদের উঠোনে গরুর গাড়ি থেকে নামলেন গতকাল, তখন সন্ধের আঁধার ঢেকে ফেলেছে চতুর্দিকের যাবতীয় দৃশ্যপট, গজাননদের উঠোনটিও পাতলা কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। অকস্মাৎ গরুর গাড়িটি হুড়মুড়িয়ে উঠোনে ঢুকে পড়ে।

তখন কামাখ্যা ভট্ট ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আহ্নিকে ব্যস্ত, সদরের উঁচু প্রশস্ত দাওয়ায় বসেছিল গজাননের মা সৌদামিনী, দু-দিদি কনক আর হীরা। আচমকা তারা দেখে, মাঝ-উঠোনে গরুর গাড়ির থেকে এক লম্বা, দশাসই ছায়ামূর্তি নামল, এবং ইতিউতি চোখ চাবাতে লাগল।

আধো-অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটিকে দেখে ভয়ে, আশঙ্কায় চটজলদি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে ওরা, মাঝ উঠোন থেকে গাড়োয়ান তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'কোথা গেলেন সব? কুটুম আইলো ঘরে।'

সে কথায় গজাননের মা সৌদামিনী দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে আগন্তুক কুটুমটির হালহদিশ নেবার চেষ্টা চালায়। খুব ফিনফিনে গলায় জানতে চায়, 'কোথাকার কুটুম? কী নাম?' কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে আসে না বাইরে। তার বদলে ঠাকুর-ঘরের মুখটিতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে রোষ প্রকাশ করে এই বলে যে, 'কত টাইম লাগে একটা মানুষের আহ্নিক সারতে! একটু জলদি করতে পার না? বাইরে বারিয়া দ্যাখ না, কে আইলো এই ভরসইন্ধ্যায়!'

কুটুমের এতখানি মানহানি গাড়োয়ানটিও বুঝি সইতে পারে না। গলায় গর্জন তুলে হাঁকডাক জুড়ে দেয় সে।—'আরে, মিলিটারি-ফেরত কুটুম। কেউ বারাবে, নাকি ফিরিয়া লিয়া যাবো?'

তখনই সৌদামিনীর মনে আলত ঘাই মারে সম্ভাবনাটা, তবে কি তিনি আইলেন অ্যাতো বচ্ছর বাদে! ফলত সে ঠাকুর-ঘরের সামনে গিয়ে এমনই হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় যে, কামাখ্যা ভট্ট ডানহাতে পৈতে জড়ানো অবস্থায় মন্ত্রের শেষ কলিটি উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে আসেন বাইরে, এবং বউয়ের হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে বাঁ-হাতে উঁচু করে তুলে ধরেন, যাতে মাঝ-উঠোনের সবকিছু দৃশ্যমান হয়।

ততক্ষণে কুটুমটি স্বয়ং পায়ে পায়ে চলে এসেছেন বারান্দার গা অবধি। তার দিকে হ্যারিকেনের আলোটি আরও তাক করতে করতে কামাখ্যা ভট্ট সামান্য অনিশ্চিত গলায় বলেন, 'কে—?'

জবাবে আগন্তুকের বিশাল গোঁফজোড়ার জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে থাকে ঝলকে ঝলকে হাসি।

হাসি থামলে পর আগন্তুক বাজখাঁই গলায় শুধোন, 'তুই কে? নাম কী?'

জবাবে কামাখ্যা কোনও গতিকে নিজের নাম বললে পর আগন্তুক পুনরায় হুংকার ছাড়েন, 'বাপের নাম কী?'

বাপের নাম শুনে আগন্তুক একটুক্ষণ চুপ মেরে থাকেন। একসময় সামান্য নরম গলায় বলেন, 'তোরা আমাকে চিনবি না, দাদাকে ডাক্‌। বেঁচে আছে তো সে?' বলতে বলতে কামাখ্যার ভয়কাতুরে অবস্থা দেখে পুনরায় হো-হো করে হেসে নেন খানিক। বলেন, 'ভয় নাই, চোর-ডাকু নই, বল্‌, যজ্ঞেশ্বর

এসেছে।'

যজ্ঞেশ্বর—! যজ্ঞেশ্বর—! সহসা কামাখ্যা ভট্টর পুরনো স্মৃতিতে মৃদু সুড়সুড়ি...। তার মানে—তার মানে...। 'আসুন, আসুন, দাওয়ায় উঠে আসুন। আপনার ভাইপো আমি। কামাখ্যা।' বউয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'মাদুর পাততে বল বারান্দায়। আলো দাও।'

অতঃপর দীর্ঘকায় মানুষটি ধীরপায়ে বারান্দায় উঠে এসে হ্যারিকেনের আলোর বৃত্তের মধ্যে দাঁড়ান। ভেতর থেকে মাদুর নিয়ে ফিরে আসে কামাখ্যার বড় মেয়ে কনক, পিছু পিছু ঘটিতে খাওয়ার জল নিয়ে ছোট মেয়ে হীরা।

মাদুরটা পেতে দিলে পর যখন বসতে উদ্যত মানুষটি, ঠিক সেই মুহূর্তে বালতিতে জল নিয়ে পুকুরঘাট থেকে শনৈ শনৈ ছুটে আসে বাড়ির মাহিন্দার চৈতন, আর ওকে দেখা মাত্তর কামাখ্যা মধুর স্বরে বলে ওঠেন, 'ছোট্কা, একটু সবুর ধরো, পাদুটো ধুয়ে বসো।'

অতঃপর চৈতন এনামেলের ঘটি নিয়ে আসে এবং জল ঢেলে দেয় যজ্ঞেশ্বরের পায়ে। দাওয়াতে বসে-বসেই পা ধুয়ে নেন যজ্ঞেশ্বর। মাদুরে এসে বসেন, এবং পানীয় জলের ঘটিটার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন কামাখ্যার ছোট মেয়ে হীরার দিকে।

ঢকঢকিয়ে জল খেয়ে ঘটিটাকে পাশে নামিয়ে রাখেন যজ্ঞেশ্বর। ধীরেধীরে দু'চোখ দিয়ে জরিপ করতে থাকেন পুরো চৌহদ্দিটা। একসময় তাঁর চোখদুটি থেমে যায় কনকের ওপর। কামাখ্যার দিকে তাকিয়ে শুধোন, 'তোর মেয়ে?'

তার জবাবে কামাখ্যা মাথা দুলিয়ে সায় দিতে দিতে হীরার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'দুটিই।'

—'ছেলে?'

—'একটি। সবার ছোট।'

ততক্ষণে গাড়োয়ানটি জোয়ালের ওপর বসে বসে বিড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'ল্যান, আমাকে ছাড়ুন এবার।'

কামাখ্যার নির্দেশে মাহিন্দার চৈতন এসে হাত লাগায় গাড়োয়ানের সঙ্গে, এবং দুজনে মিলে বহু মেহনতে বিশাল সিন্দুকটিকে এনে বারান্দার ওপর তোলে, এবং তাদের বয়ে আনবার ধরন দেখে প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেকেরই মনে প্রত্যয় জন্মায় যে, সিন্দুকটি একেবারে ঠাসবোঝাই।

বারান্দায় সিন্দুকটাকে তুলে যখন দুজনে শরীরের প্রথম কিস্তি ঘাম মুছে নিচ্ছে গামছায়, তখনই যজ্ঞেশ্বর বলেন, 'আমি যে-ঘরে শোবো সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ এটাকে।' এবং এই কথাটি বলে তিনি কামাখ্যাকে এক গুরুতর সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কেননা, লোকটিকে যেখানে পুরোপুরি সনাক্তই করা যায়নি এখনও অবধি, কোন্ ঘরে শোবেন তিনি, কামাখ্যা সেটা নিরূপণ করে কী করে! এল, যা-হোক একটা পরিচয় দিল, অমনি তাকে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে নিলাম, তাই আবার হয় নাকি? কত মানুষ জাল পরিচয় দিয়ে এসে, থেকে, গেরস্তের সর্বনাশ করে পালিয়েছে, এমন ঘটনার অভাব আছে নাকি? যজ্ঞেশ্বর নামে এই বাড়ির একজন যে সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে ঘর ছেড়েছিল সেকথা তো তল্লাটের প্রায় সব্বাই জানে, এমন কি দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে সে-খবর। কাজেই, কেউ একজন কিছু একটা ধান্দা নিয়ে যজ্ঞেশ্বর সেজে চলে এল ভরসন্ধেয়, একেবারেই অসম্ভব কি তেমনটা? ঠিকমতো সনাক্ত না করে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় নাকি? ব্যাপারটা নিয়ে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করা দরকার, পাড়াপড়শি শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি, নচেৎ কিছু একটা ঘটে গেলে সব্বাই তো দোষ দেবে কামাখ্যাকে।

কাজেই, যারপরনাই উপস্থিত-বুদ্ধির অধিকারী কামাখ্যা ভট্ট মধুর হেসে বলেন, 'এখন থাক না এখানে। ঘরে লিয়া যাবার লোক মিলবে। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম-টিশ্রাম লউন, জলটল খাউন...।'

কামাখ্যার কথার মর্ম কী বুঝলেন কে জানে, সহসা কিঞ্চিৎ গম্ভীর দেখায় যজ্ঞেশ্বরকে। কুর্তার পকেট থেকে চামড়ার মানিব্যাগ বের করে গাড়োয়ানের ভাড়া মেটান। ভাড়ার ওপর খোরাকিও ধরে দেন এতটাই, যাতে করে ওর না-হোক দু'বেলা ভরপেট খাওয়া হয়ে যাবে, এবং এই ঘটনাতেই উপস্থিত

সবাই মানুষটির অর্থবলের সন্ধান পেয়ে যায়।

গরুর গাড়িটি ক্যাঁচোর...ক্যাঁচোর....আওয়াজ তুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে পর কামাখ্যা খুব মধুর গলায় প্রস্তাব রাখেন, 'একটু জলখাবারের বেবস্থা করি?'

দু-হাত নেড়ে প্রস্তাবটাকে পত্রপাঠ বাতিল করে দেন যজ্ঞেশ্বর, 'এখন একটু চা খাবো কেবল। হবে তো?'

এমন প্রস্তাবে সত্যি সত্যি বিপদে পড়ে যায় কামাখ্যার পুরো পরিবার, কেন কি, তখনো অবধি আমাদের গাঁয়ে বড় একটা চায়ের চল্ ছিল না। কেবল মুখুজ্যাবাবুদের মতো কিছু সম্পন্ন বাড়িতে সকাল-বিকেল চা হত। সে ছিল একেবারেই বড়দের পানীয়। তার সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ হল, সুবিকাশ, ওই বাড়ির ছেলে সে, কিন্তু চায়ের স্বাদ থেকে সে পুরোপুরি বঞ্চিত। মুখুজ্যাবাড়ি ছাড়া চা হত বল্লভদার বাড়িতে। এনামেলের বাটিতে জল, দুধ, চা-পাতা এবং চিনি নিয়ে একসঙ্গে ফুটিয়ে চা বানাত বল্লভদা নিজেই। ওই বাড়িতে ও একাই খেত চা। বল্লভদার গেঁয়ো বাবা-মা জীবনে বারেকের তরে চেখেও দেখেনি ওই পানীয়টা। বল্লভদার বউ হয়ে যখন শিখাবউদি এল আমাদের পাড়ায়, বল্লভদার চা বানানোর আসবাব দেখে সে তো হেসেই খুন। ক্রমাগত দুয়ো খেতে খেতে এক হপ্তার মধ্যে বেলদাবাজার থেকে কেটলি কিনে আনল বল্লভদা। তখন তো সে বউ বলতে অজ্ঞান। পরে-পরে অবশ্য শিখাবউদি শ্বশুর-শাশুড়িকেও চা খাওয়া শিখিয়েছিল। শেষের দিকে তো বুড়ো-বুড়ির নেশা ধরে গিয়েছিল চায়ে।

তবে বল্লভ হল আধা-শহুরে ছোকরা। শহরের ইস্কুল-কলেজে পড়েছে সে। ফুড-ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়ে শহরে-গঞ্জেই থাকে। কিন্তু ভট্টরা তিন-পুরুষের চাল-কলা বাঁধা পুরোহিত, চায়ের পাট কোনওকালেই ছিল না ওদের। অথচ, মিলিটারি-দাদু যখন ওই ভর সন্ধেয় চায়ের জন্য হেদিয়ে পড়লেন, অ্যাদ্দিনবাদে ফিরেছেন এবং সঙ্গে কত বিশাল একখানা সিন্দুক বিবেচনায় অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়সহকারে কামাখ্যা বলে ওঠেন, 'হবে বৈকি? দেখছি।'

অতঃপর অন্দরমহলে ঢুকে স্বামী-স্ত্রী এবং দুটি সাবালিকা বিবাহযোগ্যা মেয়েকে নিয়ে একটা ছোট্ট বৈঠক সেরে নেন কামাখ্যা।

অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হয়, এমন পরিস্থিতিতে শিখাবউদিই একমাত্র মুশকিল আসান করতে পারে। সৌদামিনীই তাড়া লাগায় স্বামীকে, 'জলদি দৌড়িয়া যাও বল্লভের বউয়ের কাছে। সে ছাড়া গতি নাই।'

—'আমি?' কামাখ্যা মেয়া-মানুষের থেকে যে এর চেয়ে বেশি বিবেচনা আশাই করেন না, সেটা ব্যক্ত করেন এক নিঃশ্বাসে। এবং জানান যে, অন্তত দুটো কারণে তাঁর পক্ষে বল্লভের বউয়ের কাছে যাওয়াটা ঘোর বেকুবি হবে। প্রথমত, তিনি একজন পুরুষমানুষ, তায় গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের হেড-পণ্ডিত, সেই সুবাদে বল্লভও তাঁর ছাত্র, এই অবস্থায় ছাত্রের বউয়ের কাছে গিয়ে চায়ের ব্যাপারে অনুনয়-বিনয় করাটা ঠিক শোভনীয় নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি চলে গেলে ঘরে তো পুরুষমানুষ বলতে কেউই রইল না, কেবল তিনটি মেয়েমানুষ, আর কুঠরি ঘরে একটি শয্যাশায়ী থুত্থুরে বুড়ো। আর, মেয়ামানুষ তো চিরটাকালই বারোহাত কাপড়েও ল্যাংটা। আগন্তুক লোকটা তেমন কিছু বাধিয়ে বসলে জোরে জোরে কেঁদেকেটে পাড়াপড়শিকে জানান দিতেও পারবে না। গজাননটা থাকলেও না হয় কথা ছিল, এক ঢিলে দু'পাখি মারা যেত তাহলে। এক, গজাননকেই পাঠিয়ে দেওয়া যেত বল্লভের বউয়ের কাছে। গজাননদের পুরো দলটার সঙ্গে বউটার দহরম-মহরম খুব। দিনরাত ছেলেগুলো শিখাবউদি-শিখাবউদি করে অজ্ঞান। রোজ বিকেলে ওদের পুরো দলটাকে নিয়ে যমীখালের দিকে যায় শিখা, সন্ধেয় বল্লভদের উঠোনে মজলিশ বসায় মাঝেমধ্যে। কাজেই, গজাননের কথা কিছুতেই ফেলতে পারবে না শিখা। এতদ্দ্বারা মরল একটা পাখি। আর, গজানন গেলে সৌদামিনীকে ওই শহুরে মেয়েটার সামনে গিয়ে হাত কচলে দাঁড়াতে হত না। কারণ, এটা তো কামাখ্যার তিলমাত্র অজানা নেই যে, বল্লভের বউ শিখার সঙ্গে সৌদামিনীর তিলমাত্র সদ্ভাব নেই। সারা গাঁয়ে সে হল শিখার পার্মানেন্ট ক্রিটিকদের একজন। একে তো মেয়েটা পাড়ার মধ্যে তখনও অবধি বউ হয়ে আসা একমাত্র শহরের মেয়ে, তার

বেশভূষা, কথাবার্তা, চালচলন দেখতে দেখতে পাড়ার বয়স্করা যারপরনাই ক্ষুব্ধ, বিচলিত, তার ওপর তার মেলামেশারও কোনও বাছবিচার নেই। বল্লভের বন্ধুবান্ধব, এমনকী দেওরতুল্য ছোকরাদের সঙ্গে ও তার হাসিঠাট্টার, গালগল্পের সম্পর্ক। পাড়ার কম বয়েসি মেয়েগুলোও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে নিত্যিদিন। তারই মতো শাড়ি পরা, ছোকরাদের সঙ্গে কুণ্ঠাহীন হাসিঠাট্টা করা, এসব রপ্ত করছে দিন দিন। এককথায়, প্রবীণাদের মতে, ওই একটা মেয়েই পাড়ার মেয়েগুলোকে পচিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। কেবল গুণের মধ্যে এইটুকু যে, কারও কোনও অসুখে-বিসুখে, ঠেকায়-বেঠেকায়, বিপদে-আপদে, মেয়েটাই এগিয়ে আসে সবার আগে। কারও বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়েছে, মেয়েটা রোগীর শিয়রে বসে বসে জলপটি দেবে রাতভর। কোনও বাড়িতে পাত্রী দেখতে এসেছে বরপক্ষ, তাদের আধুনিক কায়দায় খাতিরযত্ন করবার প্রশ্নে মেয়েটা সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একহাতে দশজনার কাজ করে উতরে দেবে ঠেকাটা। তবুও স্রেফ বেহায়াপনার প্রশ্নে শিখাকে কোনওকালেই দুচক্ষে দেখতে পারে না সৌদামিনী। সেই কারণেই কামাখ্যা ভাবেন, গজাননটা বাড়িতে থাকলে সৌদামিনীকেও যেতে হত না বল্লভের বউ শিখার কাছে। নিত্যিদিন হাজারো কিসিমের বেহায়াপনা দেখতে দেখতে যার সম্পর্কে দু-দিন আগেও যারপরনাই কটু মন্তব্য করেছে সৌদামিনী, তার সামনে গিয়ে, সামান্য একটুখানি চায়ের জন্য, কাঁচুমাচু গলায় অনুরোধ-উপরোধ করতে হত না। কিন্তু গজাননটা গেছে পারিজাতের দুয়োরে। পারিজাত খাসি কেটে মাংস বেচছে, গজানন ওখানেই গিয়েছে বিকেলেরও আগে, এখনও অবধি তার ফেরার নাম নেই! কাজেই, মেয়েটা যতই চক্ষুশূল হোক, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে, 'ঠেকায় পড়লে ব্যাঙের পায়েও ধরতে হয়' বিবেচনায় সৌদামিনী বড়মেয়ে কনককে নিয়ে অন্ধকার ভেঙে ছুটল শিখা-বউয়ের কাছে,—'শিখা-বউমা, বুড়া মানুষটা চা খেতে চাচ্ছে, কী করা যায় বল তো?'

সন্ধিপুরে পা রাখা অবধি এই মহিলাই সবচেয়ে বেশি কটূক্তি করে আসছে জেনেও শিখা খুব শীতল গলায় শুধোয়, 'চিনি-দুধ নিশ্চয় আছে ঘরে? চা-পাতা দিলেই চলবে, নাকি গিয়ে বানিয়ে দিয়ে আসতে হবে?'

কামাখ্যার বউ ততক্ষণে হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেছে। গতগদ গলায় বলে, 'না মা, চা-পাতা লিয়া আমি কী করবো বল্, আমি তো মা, বাপের জন্মে চা তিয়ার কত্তে শিখিনি।'

কাজেই, শিখাবউদি চা-পাতাসহ হাঁটা দিল সৌদামিনীর পিছুপিছু। চা বানিয়ে এগিয়ে দিল যজ্ঞেশ্বরের দিকে। আর তখনই সৌদামিনী তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'লোকটার সাথ টুকচার কথাবার্তা বলিয়া বুঝবার চেষ্টা কর্ তো মা, আসল লোক তো? নাকি—।'

শিখাবউদি গিয়ে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। বলে, 'আমি আপনার আর এক নাত-বউ গো দাদু। আপনার নিশ্চয় প্রাণকিশোর ঘোষকে মনে আছে?'

যজ্ঞেশ্বর দু'চোখ শূন্যে ঘুরিয়ে মনে করবার চেষ্টা করেন, 'প্রাণকিশোর—প্রাণকিশোর—, তুমি কি মা পানু ঘোষের কথা বলছো?'

শিখা বউদি মাথা দুলিয়ে সায় দেয়, 'তার বড়ছেলে যাদব ঘোষ, আমি তার ছেলের বউ।'

—'তাদের কথা আমার মনে নেই, তবে পানু আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। দুজনে মিলে অনেক দৌরাত্ম্য করেছি ছেলেবেলায়। কেমন আছে সে?'

শিখা বউদি দু'চোখে শোক ফোটায়, 'তিনি আর বেঁচে নেই।'

শুনে একটুক্ষণ গুম মেরে থাকেন যজ্ঞেশ্বর। একসময় বিড়বিড় করে বলেন, 'আমারও তেমনটাই মনে হয়েছিল। ফেরার মুখেই ভাবছিলাম, খুব দেরি করে ফেললাম, অনেককেই হয়ত চোখের দেখা দেখতে পাবো না। অথচ তাদের কথা ভেবেই তো এই শেষবেলায় জন্মভূমিতে ফেরা।'

বলতে বলতে শিখাবউদির দিকে খুব অসহায় চোখে তাকান যজ্ঞেশ্বর, 'কী করব মা, ভেবে ঠিক করতেই সময় চলে গেল।'

শিখা বউদি এতক্ষণে একটুখানি আত্মীয়তা ফুটিয়ে তোলে চোখে মুখে, 'আপনার কথা কত যে শুনেছি আমি!'

সামান্য চমকে তাকান যজ্ঞেশ্বর, 'কার থেকে?'

—'কেন, গজানন, আপনার নাতি, আমার খুব বন্ধু সে। রোজ আপনার কথা শুনি ওর মুখে।'

—'সত্যি?' যজ্ঞেশ্বরের সারামুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—'শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে বারান্দার দেয়ালে আরাম করে ঠেস দেন যজ্ঞেশ্বর। বেশ এলিয়ে বসেন। সারা মুখমণ্ডল জুড়ে মাখনের মতো নরম তৃপ্তির প্রলেপ জমে। খুব ভেজা ভেজা গলায় বলেন, 'এইজন্যেই তো ফিরে এলাম দিদিভাই!'

একসময় শিখাবউদি অন্দরমহলে ফিরে যায়। কামাখ্যার বউকে আশ্বস্ত করে বলে যে, 'মনে হচ্ছে জাল-আদমি নয়।' তাতে করে পুরো ভট্ট-পরিবার সামান্য আশ্বস্ত হয় বটে, কিন্তু ওইটুকু মেয়ের কথার ওপর তো অতখানি নির্ভর করা যায় না, যার ওপর ভিত্তি করে মানুষটিকে সিন্দুকসহ প্রতিষ্ঠা করা যায় অন্দরমহলে। অথচ, লোকটাকে রাতভর বারান্দায় রেখে দেওয়াও যায় না, মূলত দুটো কারণে। এক, ঘোর শীতের রাত, আর 'মাঘের শীত বাঘ।' এমন রাতে গোয়ালের দেয়ালের ফুটো-ছিদ্রগুলোকেও ঢেকে দেয় গেরস্থ, যাতে ঠাণ্ডা না ঢোকে। কাজেই, বুড়োকে বারান্দায় ফেলে রাখলে তো রাত পোহাতেই ডবল-নিমুনিয়া। দ্বিতীয়ত, সেটাই বাস্তবিকপক্ষে একনম্বর, লোকটা যদি সত্যি সত্যি সেই মিলিটারিতে যাওয়া ছোটোকাকা হয়, তবে একরাতের জন্যও তাকে ঘরের বাইরে রেখে দেওয়াটা এক বিষম লজ্জা এবং অমানবিকতা বলে ধিকৃত হবে পরবর্তীকালে, বিশেষত, এমন বিশাল সিন্দুকটা বুড়োর সঙ্গে থাকায় লজ্জা যেন আগাম ঘিরে ধরে কামাখ্যাকে।

কাজেই, অনেক আলাপ-আলোচনার পর, আমার বড়জেঠু অর্থাৎ সতীকান্ত দত্তকে তুরন্ত্ ডেকে আনতে চৈতনকে দৌড় করিয়ে দেন কামাখ্যা, কেন কি, আমার জেঠু তখন সারা পাড়ায় একজন বুদ্ধিমান, বিবেচক মানুষ হিসেবে গণ্য হতেন, এবং তিনি কামাখ্যা ভট্টর ছেলেবেলার বন্ধু ও ভট্ট-পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে চিহ্নিত।

সিন্দুকটি বেশিক্ষণ সদর-বারান্দায় ফেলে রাখতে সাধ যাচ্ছিল না কামাখ্যার, কেন কি, ততক্ষণে ওর দুয়োরে স্রেফ কৌতূহলের বশে ভিড় জমিয়েছে চারপাশের নানান চরিত্রের মানুষজন, এবং তাদের মধ্যে যদু কাপড়িও রয়েছে, যে-কিনা ভদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোকরা হলেও পাড়ার মানুষ মনে মনে বিশ্বাস করে যে, খারাপ সংসর্গে পড়ে এখন চোর-ডাকাতদের গুড়িয়াল অর্থাৎ কিনা তথ্য-সরবরাহক।

সে রাতে আমার জেঠু গিয়ে প্রথম যে শলাটি দেন, সেটি ততক্ষণ অবধি কারোর মনে ঘাই মারেনি। জেঠু বলেন, তিরু জেঠাকে দিয়ে সনাক্ত করানো যাক না। হাজার হোক নিজের সহোদর ভাই, বাড়িও ছেড়েছে কুড়ি বছর বয়েসে, তিরু জেঠা যদিও অতীব অথর্ব, চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন, মাথাটাও সামান্য গ্যাছে, কিন্তু তাও, তাঁকে দিয়ে একবার সনাক্ত করানো হোক।

তখনই সমস্যা হল, ত্রিলোচন ভট্টকে লোকটার কাছ অবধি নিয়ে আসা হবে, নাকি, লোকটাকেই নিয়ে যাওয়া হবে ওর শোবার ঘরে, যে-ঘরটা কিনা অন্দরমহলের একেবারে শেষপ্রান্তে।

তিরুদাদুকে বাইরে আনার প্রধান ঝুঁকি হল, এই মাঘের শীতে তাঁকে বাইরে আনলে ঘোর বিপদ ঘটে যেতে পারে। এমনিতেই তো গলায় কফ-টফ জমে,...সারাক্ষণ কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছেন, তার ওপর...। আবার, অন্যদিকে, আগন্তুক লোকটিকে সনাক্ত না করেই একেবারে অন্দরমহলটি চিনিয়ে দেওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়, কেন কি, এমন ঘটনা তো কতই ঘটেছে, দূর সম্পর্কের অচেনা আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে রাত কাটাল, সদর-দরজা খিড়কি-দরজার অবস্থানসহ সারা ঘরের ছকটিকে মনে মনে এঁকে নিয়ে ফিরে গেল কুটুমটি, তারপর একদিন 'রাতের কুটুম' সেজে এসে সর্বস্ব লুটে নিয়ে ফিরে গেল।

অনেক আলোচনার পর তিরু দাদুকেই সদরে আনার নিদান দেন আমার জেঠু।

সেই অনুসারে শেষ অবধি তিরু দাদুকে ব্যাপারটা খুলে বলা হয়, এবং শোনা মাত্র তিনি ভাইকে দেখবার জন্য এতটাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, বুঝিবা সামান্য বিলম্ব ঘটলে ভাইকে না দেখেই তাঁকে চলে যেতে হতে পারে ওপারে। ফলে, আপাদমস্তক শরীর কম্বলে মুড়িয়ে, পাঁজাকোলা করে তাঁকে বাইরে

আনা হয়, এবং আগন্তুক লোকটির পাশে বসিয়ে দেওয়া মাত্রই তিনি দুর্বল হাতে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে, কেঁদেকেটে, জড়ানো খনখনে গলায় এমনই হা-হুতাশ জুড়ে দেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী কারোই বুঝতে দেরি হয় না, ওই লোকটির জায়গায় যে কাউকে, এমনকী একটা কাঠের গুঁড়ি রেখে দিলেও তিরুজেঠু প্রকট ভ্রাতৃস্নেহে ওটাকেই ভাই বলে জাপটে ধরতেন।

ফলত, প্রথম পরীক্ষাটা মাঠে মারা গেল।

অথচ রাত বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে। সিদ্ধান্ত যা নেবার জলদি-জলদি নিতে হবে। লাখ টাকার প্রশ্নটি হল, লোকটিকে রাতের বেলায় বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে কিনা, দিলেও কোথায় শুতে দেওয়া হবে রাতে? শীতের রাতে বাইরে শুতে বলা, সে এক অমানবিক ব্যাপার, তার ওপর যদি সত্যি সত্যি লোকটি বাড়ির ছোটকর্তা হয়, তবে সে হবে এক অমার্জনীয় অপরাধ। এবং সবার শেষে হলেও মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যা, সেটা হল, এমন বিশাল, ভারি সিন্দুক, যার মধ্যে বাস্তবিক কী ঠাসা রয়েছে, তাই নিয়ে সীমাহীন কৌতূহল সবাইয়ের মনে, এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছিল।

অবশেষে, অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, বৈঠকখানাতেই শোবার ব্যবস্থা হবে, ভেতর-ঘরের সঙ্গে সংযোগকারী দরজাটিতে ভালো করে খিল দিয়ে দিতে হবে, রাতটা কামাখ্যা-জেঠু জেগে থাকলেই ভালো হয়।

পরের দিন ঘটনাটা আমাদের সামনে বিশদ করে বলতে গিয়ে গজানন হেসেই কুটিপাটি। বলে, শুধু বাবাই নয়, কাল রাতভর বাড়ির কেউই চোখের পাতা এক করতে পারেনি। পরক্ষণেই পাদপুরণ করে সে, 'বাপ রে! সে কী নাকের গর্জন মিলিটারি-দাদুর!'

পরবর্তীকালে, যখন মিলিটারি দাদুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল আমাদের, ওঁর নাকডাকা নিয়ে আমরা খুবই ইলচি করতাম, সে ইলচিতে যোগ দিত শিখা বউদিও।

বলত, 'যুদ্ধের সময় রাতের বেলায় আর বন্দুক লাগত না, মিলিটারি-দাদুর নাকের গর্জনে ভয় পেয়ে শত্রুপক্ষ পালিয়ে যেত।



একেবারে পড়শি দু-চারজন ছাড়া আগের রাতে যজ্ঞেশ্বরকে দেখতে আসেনি কেউই। কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে কাকের মুখে খবর পেয়ে ধেয়ে এসেছিল মানুষজন, ভিড় জমিয়েছিল যজ্ঞেশ্বরের চারপাশে। তারা কুতকুতে চোখে দেখতে থাকে যজ্ঞেশ্বরকে।

তখন তো আমরা খুবই ছোটো, কিন্তু যারা যুবক, তারাও কেউ মানুষটিকে চোখে দেখেনি, দেখে থাকলেও সে এমনই বয়েসে যে তা আর তিলমাত্র বেঁচে নেই স্মৃতিতে। তবুও, পাড়ার মধ্যে প্রবীণ যারা বেঁচে ছিল তখনও, যজ্ঞেশ্বরের সমবয়েসি কিংবা কিঞ্চিৎ অনুজ, তারা একে একে হাজির হয়েছিল গজাননদের উঠোনে, সারা সকাল ধরে নানাভাবে পরখ করেছিল সত্যি সত্যি লোকটি তাদের সেই ছেলেবেলার খেলার সাথী যজ্ঞেশ্বর কিনা। তার বিশ-বছুরে শরীরে রক্ত-মাংস লাগিয়ে, বুড়ো বয়েসের যাবতীয় লক্ষণগুলি থাপনা করে দেখে নিতে চেয়েছিল, তাদের সেই জোয়ান বয়েসের যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে তা মেলে কিনা। অবশেষে, অনেকভাবে পরখ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ রায় দিয়েছে, হাঁ, এ আমাদের সেই যজ্ঞেশ্বরই বটে। বলেছে, 'কী কাণ্ড! অ্যাদ্দিন তুমি কোন্ মুলুকে ছিলে হে? তুমি যে বাঁচিয়া আছ, সেটাই ভাবতে ভুলিয়া গেছলাম আমরা।'

শুনে হা-হা করে হেসেছেন যজ্ঞেশ্বর। টাঙ্গির পারা গোঁফজোড়ার আড়ালে ঝলসে উঠেছে ধবধবে সাদা দাঁত।

বলেন, 'একেই বলে জন্মভূমির টান। সারা দুনিয়া ঘুরে শেষবেলায় মনে পড়ল তোমাদের কথা। ভাবলাম, আর কেন আতান্তরে ঘুরে বেড়ানো! তোমাদের মধ্যেই শেষ জীবনটা কাটাই। তোমাদের মধ্যে থাকতে থাকতেই মরি। আত্মীয়-পরিজনহীন বিদেশ-বিভুঁইতে কেনই বা শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে যাবো।

ফিরে যাই আপনজনদের কাছে।'

মানুষগুলি ভুলভুল করে দেখতে থাকে যজ্ঞেশ্বরকে। এতগুলি মানুষের শ্যেণদৃষ্টির সামনে একটি জলজ্যান্ত রহস্যের পুঁটলি হয়ে বসে থাকেন যজ্ঞেশ্বর। এইভাবে কেটে যায় সারা সকাল...দুপুর..। মানুষ আসে..., মানুষ যায়..., দ্যাখে, চেনে, এটা ওটা শুধোয়, সামান্য স্মৃতি-রোমন্থন করে, এবং হারিয়ে যাওয়া একটি মানুষের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে অকস্মাৎ ফিরে আসার বিস্ময়টুকুকে যষ্টিমধুর মতো চুষতে চুষতে চলে যায়।

আমরা গেলাম বিকেলবেলায়।

যখন হাজির হলাম গজাননদের উঠোনে, তক্তপোষের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে কাঁসার গেলাসভর্তি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন যজ্ঞেশ্বর, আর তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে বসে ছিল গাঁয়ের তাবৎ প্রবীণের দল।

আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাঁকে অবলোকন করতে থাকি।

মোটা ভুরুর তলায় একজোড়া রাগী-রাগী চোখ। নাকের তলায় টাঙ্গির মতো বাঁকানো গোঁফ। বাজখাঁই গলা। দেখতে দেখতে আমাদের মনে ভয়, সম্ভ্রম, বিস্ময়,...।

বড়দের ব্যূহ ভেদ করে যজ্ঞেশ্বরের কাছ অবধি পৌঁছনো অসম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে, কিন্তু কী আশ্চর্য, অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা যখন সেদিনের মতো ফিরে যাব কিনা ভাবছি, তখনই স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর ডানহাতটা নাচিয়ে আমাদের কাছে ডাকলেন ইঙ্গিতে। আমরা বলতে, আমি, কল্পনাথ, দিবাকর, রতন, সুবিকাশ আর ভগুল।

গজানন ফিসফিসিয়ে বলে, 'চল্, মিলিটারি-দাদু ডাকতিছে।'

যেতে গিয়ে আর পা সরে না রতন আর সুবিকাশের। শেষ অবধি আমি, কল্পনাথ আর ভগুল ভয়ে ভয়ে এগোলাম মিলিটারি-দাদুর দিকে।

কাছে যেতেই মিলিটারি-দাদু গজাননের দিকে তাকান, 'এরা কারা গজাননবাবু?'

গজানন বেশ সপ্রতিভ গলায় জবাব দেন, 'দাদু, এরা সব আমার বন্ধু। আমরা এক কেলাসে পড়ি।'

—'বটে!' বলতে বলতে বড়দের দিকে তাকালেন মিলিটারি-দাদু। মৃদু হেসে বললেন, 'এখন তোমরা যাও, এখন আমি দাদুভাইদের সঙ্গে গল্প করব।'

চারপাশে ঘনিয়ে বসা বয়স্ক মানুষগুলি বুঝি-বা সামান্য আহত হয়ে কেটে পড়ল একে একে। আমরা ভরাট করলাম শূন্যস্থান, তাও মানুষটির একেবারে গা ঘেঁসে নয়, সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে বসলাম। আর তখনই মিলিটারি-দাদুকে অনুপুঙ্খ দেখবার সুযোগ হল আমাদের।

গায়ের রঙ হয়ত বা এককালে টুকটুকে ফরসা ছিল, নিদারুণভাবে দীর্ঘকাল রোদে তেতে-পুড়ে বর্তমানে তামাটে। গনগনে তপ্ত তামা। মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা। নাকের তলায় টাঙ্গির মতো বাঁকানো ভারি গোঁফ। লালচে-কটা রঙ ধরেছে মাথার চুলে এবং সারা গায়ের রোমে। সারা গায়ে বড় বড় রোম। শরীর জুড়ে বিকট উগ্র গন্ধ। আমরা যে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে বসেছিলাম তার প্রথম কারণ যদি হয় মিলিটারি-দাদুর সম্পর্কে এক ধরনের অন্ধ ভয়, তো দ্বিতীয় কারণ হল ওই বেয়াড়া গন্ধটা। মানুষের শরীরে এমন উগ্র গন্ধ আমরা কখনোই পাইনি। দু-একদিন বসতে বসতে বুঝতে পারি, ঘামেরই গন্ধ। কিন্তু ঘামের গন্ধ যে অত ঝাঁঝাল হয়, আমাদের ধারণায় ছিল না তা।

বয়স্করা সব আসর খালি করে চলে যাবার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর চওড়া গোঁফের ফাঁকে হাসলেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'অব্ নাম বাতাও সব।'

আমরা একে একে নাম বললাম, বাবার নামও।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'বাবার নামে চিনতে পারব না, ঠাকুর্দার নাম বাতা।'

ঠাকুরর্দার নাম শুনে আমাকে আর কল্পনাথকে চিনতে পারলেন যজ্ঞেশ্বর।

কল্পনাথ বলল, 'উদেরকে এভাবে চলে যেতে বললে কেন? আমরা না-হয় পরে আসতাম।'

সেকথায় যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'এদের সঙ্গে তো সকাল থেকেই কথা বলছি,' তারপর গলাটা খাটো করে বলেন, 'ওদের তেমন কোনও কথা নেই, না শোনার, না বলার। আমাকে নিয়ে ওদের কোনও

কৌতূহলই নেই। যত কৌতূহল এই সিন্দুকটাকে নিয়ে।'

এরপর আমাদের সবাইয়ের পরিবারের গুষ্টির খবর বলতে থাকলেন নিজের থেকেই।

সেদিন সারা বিকেল কত গল্পই না করলেন যজ্ঞেশ্বর। কত আজব-আজব দেশের কথা। বললেন, 'সেইসব দেশের বাচ্চাদের গল্পই শোনাব তোদের।'

গল্প-গুজবের ফাঁকে একসময় আমি বলে উঠি, 'তোমাকে আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় একঝলক দেখেছি।'

—'কোথায়?' যজ্ঞেশ্বর চোখ বড়বড় করে তাকান আমার দিকে।

বলি, 'পারিজাতকাকার উঠানে মাংস কাটছিল, মাংস লিতে গেছলাম আমি আর গজানন, তখনই তো তুমার গরুর গাড়িটা পারিয়া গেল রাস্তা দিয়া, আমি আর গজানন দেখলাম। তখন তো খুব ঝগড়া চলছিল, খুব হৈ-চৈ কলরব..., তার মধ্যে পারিয়া গেলে তুমি। তখন তো আর জানিনি যে—।'

মাংস কাটার প্রসঙ্গে কেমন জানি খুব কৌতূহলী দেখায় যজ্ঞেশ্বরকে। বলেন, 'কার উঠানে মাংস কাটছিল, বললি?'

—'পারিজাতকাকা। পারিজাত দলুই।'

—'বাপের নাম কী?'

—'বাপের নাম ছিল অমূল্য দলুই। মরিয়া গেছে।'

—'তাই বল্।' চক্ চক্ করে ওঠে যজ্ঞেশ্বরের চোখদুটি,—'অমূল্যদার ব্যাটাই বুঝি মাংস কাটে এখন? আমাদের সময়ে অমূল্যদা কাটত, তাও মাসে মাসে নয়, কালেভদ্রে। শীতকালে একটু বেশি। তখন ওই মরসুমেই মানুষের ঘরে ধান-চাল। তো, ঝগড়া হচ্ছিল কেন? কী নিয়ে?'

—'বাদ দাও।' গজানন গতকালের লজ্জাকর ঘটনাটি চাপা দিতে চায় কুটুমগোছের মানুষটির কাছে।

কিন্তু সে কথায় কেমন জানি উতলা হয়ে ওঠেন যজ্ঞেশ্বর। খুবই ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, 'বল্ না, কী নিয়ে বেধেছিল ঝগড়াটা?'

গজানন অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে বলে, 'ওই...একটুকরা মেটের তরে—। বাদ দাও দেখি।'

—'ঝগড়া লাগে? একটুকরো মেটের জন্য? রক্তিরক্তি হয়?' বলতে বলতে যজ্ঞেশ্বরের সারামুখে ঘনিয়ে আসে শ্রাবণের মেঘ। বলেন, 'একদিন শোনাবো তোদের, আমাদের সময়ের মাংস কাটবার, মাংস খাওয়ার গল্প, মেটে বিলির গল্প। শুনলে বুঝতে পারবি, কেন ফিরে এলাম এই শেষবেলায়।'

এরপরই গাঁয়ের হরেক চৌমাথায়, বটতলায়, নাটমণ্ডপে, কিংবা মুখুজ্যাগড়ের দৈনন্দিন জমায়েতগুলিতে যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেইসব আলোচনায় সবাই যজ্ঞেশ্বরকে বাড়িয়ে-কমিয়ে, তার গায়ে হরেক রঙ চড়িয়ে শোনাতে থাকে অন্যকে। এবং তাঁর সিন্দুক নিয়েও অনেক রোমহর্ষক তথ্য চাউর হয়ে যায় বাজারে। তেমন রটনার জন্য যজ্ঞেশ্বর নিজেও কম দায়ী নন। কেন কি, ওই সন্ধের পর প্রায় দু'-তিনদিন কেটে গেল, অথচ সিন্দুকটা খুললেন না তিনি। ডবল তালা-মারা সিন্দুকটার চাবিগোছা সর্বক্ষণ থাকত তাঁর কোমরে। ওই নিয়ে বাহ্যি বসতেন, চান করতেন, খেতেন, ঘুমোতেন। কেউ সিন্দুকটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে আড়চোখে তাকাতেন তার দিকে। কেউ ওটার গায়ে হাত ছোঁয়ালে বিরক্তিতে কুঁচকে উঠত ভুরু। বাস্তবিক, সিন্দুকটার মধ্যে যে কী রয়েছে, কাকপক্ষীতেও জানতে পারেনি বেশ ক'দিন। ফলে, ওটার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব নানান রটনা ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ ঘটেছিল। গাঁয়ের মানুষজন, যারা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তারা যত না ওঁকে দেখত, তার চেয়েও ঢের বেশি কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকত ওই বিশাল সিন্দুকটার দিকে। ওর মধ্যে বাস্তবিক কী রয়েছে তা জানার জন্য হাঁকুপাকু করত মন। হাজারো দামি ও লোভনীয় সামগ্রীর স্বপ্ন ভাসত মনে। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ। তাও এককালের ইয়ার-বন্ধুতুল্য যারা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে হয়ত-বা এক সময় শুধিয়ে বসে, 'অতবড় সিন্দুকের মধ্যে কী হাতি-ঘোড়া আছে হে?' প্রশ্নটা করবার কালে তারা এমনই তাচ্ছিল্য ও নিরাসক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলত চোখেমুখে, যেন ওই প্রশ্নের জবাবটা জানবার জন্য তিলমাত্র গরজ নেই

ওদের। যেন ওটা নেহাতই একটা কথার কথা মাত্র। আর প্রশ্নটার জবাবে যজ্ঞেশ্বর সিন্দুকটার গায়ে, যেমন করে আদরের চৈতকের গায়ে হাত বোলাতেন রানা প্রতাপ, ঠিক তেমনি করে সস্নেহে হাত বোলাতে থাকেন আলত করে। বলেন, আমার সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সবই তো রয়েছে এই সিন্দুকে। জবাবটার মধ্যে এমনই এক জাতের ধোঁয়াশা ছিল, সিন্দুকের অন্তর্গত সামগ্রীর ব্যাপারে তিলমাত্র ধারণা তো জন্মায়ই না কারোই, বরং রহস্য আরও ঘনীভূত হয়।

আর, ততদিনে একটা নতুন জ্বালা বেড়েছে কামাখ্যা পণ্ডিতের। সারাক্ষণ মানুষজন আসছে যজ্ঞেশ্বরকে দেখতে। তারা এটা বলছে, ওটা পুছছে, যজ্ঞেশ্বরের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে হরেক কিসিমের তথ্য পেশ করছে..., সিন্দুকটাকে দু-চোখ দিয়ে অবিরাম চাটছে...। যতক্ষণ ওরা থাকে, কামাখ্যা পণ্ডিত মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পান না। খালি হরেক কাজের অছিলায় আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকেন। এবং সিন্দুকের অন্তর্গত মালকড়ি নিয়ে অপেক্ষাকৃত চতুর লোকেরা হাঁড়ির ভাত একটুখানি টিপে 'দেখবার উদ্যোগ করছে দেখলেই কামাখ্যা পণ্ডিত কথা ঘোরান অন্যদিকে। কাকার উদ্দেশে বলে ওঠেন, 'রাতে তো তুমার ঘুম হচ্ছেনি একতিল, গা ধুইয়া শুইয়া পড় না একটু। কথাবার্তা বলবার সময় কি বইয়া যাচ্ছে?'

এতদ্দ্বারা চতুর মানুষেরা বুঝে ফেলে, কামাখ্যা পণ্ডিত তাঁর বিদেশ-ফেরত কাকার অর্থ-বৈভব সম্পর্কে কোনও ধারণা দিতে চায় না আম-জনতাকে। আর তাতে করে মানুষজনের প্রত্যাশা ও সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। ফলে, সারা এলাকা জুড়ে যজ্ঞেশ্বর এবং তাঁর সিন্দুক সম্পর্কে উদ্ভট সব ধারণা ও বিশ্বাস তৈরি হতে থাকে।

কৌতূহল যে আমাদের মধ্যেও ছিল না তা নয়, এবং সেই কৌতূহল নিরসনের জন্য গজানন ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনও সোর্স ছিল না। ফলে, গজাননের গুমোর গেল বেড়ে। এমনিতে সে গুল মারতে ভালোবাসে, তার ওপর আমাদেব মনের মধ্যে মিলিটারি-দাদুর সিন্দুকটাকে নিয়ে অপার কৌতূহল জমতে দেখে সে একটু একটু করে বল্গাহীন হয়ে ওঠে।

দু-চার দিনের মধ্যেই যজ্ঞেশ্বরের সব রকমের আড়ষ্টতা ভেঙে গিয়েছিল।

সারা গাঁ-ময় চক্কর মারতে শুরু করেন তিনি। এবং তাঁর আবাল্য পরিচিত গাছগাছাল, বাড়িঘর, মানুষজনগুলিকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। অমুক মানুষটি এখনও বেঁচে রয়েছে কিনা, রানিহাঁস দিঘির পাড়ের ওই গাছটা কোথায় গেল, ওইখানে অমুকের কামারশালা ছিল,—এক কথায়, সারা গ্রামের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগের ইতিহাস এবং ভূগোলকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতে থাকেন যজ্ঞেশ্বর। পঞ্চাশ বছর আগের সময়টাকে হ্যাংলার মতো ছুঁতে চান। এর-ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে থাকেন। এখানে-ওখানে কারণে-অকারণে স্মৃতির ঝাঁপিটিকে খুলে ধরেন।

অধিকাংশ মানুষই তো চিনতে পারে না ওঁকে। অল্প সময়ের মধ্যে সেটা বুঝে ফেলায় যজ্ঞেশ্বর আলাপ করবার আগেই ঘটা করে নিজের পরিচয় দিতে থাকেন। 'চিনতে পারলে না তো? আমি তোমাদের কামাখ্যা পণ্ডিতের নিজের কাকা। মিলিটারিতে ছিলাম, আজাদ হিন্দে ছিলাম, দুনিয়ার অর্ধেকটা চষে এই শেষবেলায় বাড়ি ফিরেছি। নিজের মানুষগুলির পাশে। তোমার নামটি কী? কার ব্যাটা?'

কিন্তু এতসবের পরেও গাঁয়ের মানুষের আড় ভাঙতে চায় না সহজে। বিশেষ করে বাচ্চারা ওঁর কাছে ভেড়ে না। ভয়ে ভয়ে তাকায় দূর থেকে। বউ-ঝিরা ওঁকে দেখামাত্তর ঘোমটায় মুখ ঢাকে।

গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় অকারণে ঘুরে বেড়ান যজ্ঞেশ্বর। উজমুদ্দা ঢুকে পড়েন এর-ওর ঘরে। বলেন, 'কী হল? আমার সঙ্গে বাতচিৎ করবে না নাকি কেউ? মিশবে না আমার সঙ্গে? কত আশা নিয়ে শেষ জীবনে ফিরে এলাম যে আপনজনদের পাশে।'

যজ্ঞেশ্বরের প্রতি যত না, আমাদের যত কৌতূহল তাঁর ওই সিন্দুকটার প্রতি। বড়দের কৌতূহল অবশ্য সিন্দুক এবং তার অন্তর্গত মালকড়ি ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে। যজ্ঞেশ্বরের পৈতৃক সম্পত্তি, তার মধ্যে যা-যতটুকু যজ্ঞেশ্বরের প্রাপ্য, তার পরিমাণ তো কম নয়। জমি-জিরেত, ভিটে, পুকুর,—কেমন করে ভাগাভাগি হবে, যজ্ঞেশ্বর কী করবেন ওইসব সম্পত্তি নিয়ে, সেসব নিয়েই যত গবেষণা চলে বড়দের মধ্যে। যাবতীয় প্রত্যাশা তৈরি হয় ওগুলোকে নিয়েই। ওইসবের টানেই আসে ওরা, গল্পটল্প শোনে, তেল-টেল মারে।

যজ্ঞেশ্বর কাউকেই শুধু হাতে ফেরান না। সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর পরিমাণে আতর, হিং, আখরোট, কিশমিশ আর পেস্তা। আতর আর হিং বিলোলেন মেয়েদের মধ্যে। আখরোট, কিশমিশ, পেস্তা দিলেন বড়-বাচ্চা নির্বিশেষে। সবগুলো নয়, কিছুটা।

গাঁয়ের মানুষ কিশমিশ আর পেস্তা যদিও বা খেয়েছে মুখুজ্যাবাবুদের বাড়িতে বিয়ে-সাদির ভোজে, আখরোট তারা চোখেও দেখেনি। খোলাটা শক্ত বটে, কিন্তু কী ভালোই যে খেতে! খেয়ে ধন্য ধন্য রব তুলল সবাই।

আমরা ক'জন গল্প এবং কিশমিশ-পেস্তা-আখরোটের টানে নিয়মিত যেতাম বটে, কিন্তু ভেতরে বাসা বেঁধেছিল এক জাতের অচেনা ভয়, সম্ভ্রম, সঙ্কোচ। ওঁর সামনে পুরোপুরি সাবলীল হতে পারতাম না কিছুতেই। তবুও প্রায় রোজদিনই যেতে লাগলাম যজ্ঞেশ্বর দাদুর কাছে।

যাওয়া মাত্র সিন্দুকের ডালা খুলে বের করতেন ওই দাঁতভাঙা বিস্কুট। একটা করে দিতেন প্রত্যেকের হাতে। কিংবা কিশমিশ-আখরোট। তাও যৎসামান্য। আমরা মূলত ওই টানেই যেতাম। এবং যেতে যেতে একসময় সেই অচেনা ভয়টা ফিকে হয়ে এল বুকের মধ্যে। যজ্ঞেশ্বর দাদুকে বেশ সহজ সরল আর মজাদার মানুষ বলে মনে হতে লাগল আমাদের। তার চেয়েও মজাদার তাঁর সিন্দুকের ওই কিশমিশ, আখরোট, পেস্তাবাদামগুলি।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল যজ্ঞেশ্বরদাদুর, বিশেষ করে আমি, কল্পনাথ, গজানন, রতন আর সুবিকাশ তাঁর এমনই ন্যাওটা হয়ে গেলাম যে, দিনরাত ওইসবের লোভে ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মতো ঘুরঘুর করতে লাগলাম ওঁর আশে-পাশে।

আমাদের দেখা মাত্তর যজ্ঞেশ্বরদাদু দূর থেকে হাতের ইসারায় ডাকেন। পাশে গিয়ে বসলেই হাতে গুঁজে দেন আখরোট কিংবা পেস্তা।

খেতে থাকি। যজ্ঞেশ্বরদাদু তখন দেশ-বিদেশের হরেক গল্প বলতে থাকেন। যজ্ঞেশ্বরদাদুর মুখে ওইসব মুলুকের গল্প শুনতে শুনতে আমরা খানিক সময়ের জন্য চলে যাই ওইসব মুলুকে। এমনই ছিল তাঁর ভাষা দিয়ে ছবি আঁকবার ক্ষমতা। বাস্তবিক, সেই প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম, আর যা হোক, গল্প বলায় আমাদের মিলিটারি-দাদুর জুড়ি নেই। আমাদের চোখে-মুখে রোদ্দুর খেলতে দেখে তিনি বলেন, '...আর কী শুনলি! আরও কত গল্প রয়েছে আমার ঝুলিতে! পঞ্চাশ বছরেও ফুরাবে না। দেশ-বিদেশের কত আশ্চর্য মানুষ...তাদের নিয়ে আশ্চর্য গল্প-সব!'

আর তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সমবেতভাবে বায়না ধরি, 'আমাদেরকে সেসব গল্প শুনাতে হবে, দাদু।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু মিটিমিটি হাসতে থাকেন, 'শোনাব, অবশ্যই শোনাব। আবে তোদের সেসব শোনাব বলেই না অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এলাম দেশে। এতদিন ধরে যা দেখলাম, শুনলাম, বুঝলাম, সেসব আমার দেশের ছেলে-ছোকরাদের বলতে হবে। নইলে তারা দুনিয়াটাকে জানবে, বুঝবে কী করে?'

বলতে বলতে আস্তে আস্তে তক্তপোশ থেকে নামেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। পায়ে পায়ে এগিয়ে যান পাশের কুঠরিতে। সাবধানে খোলেন সিন্দুকটাকে। খানিকবাদে আবার বন্ধ করে ফিরে আসেন আমাদের কাছে। তখন তাঁর মুঠো-ভর্তি বিস্কুট।

আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বিস্কুট ধরিয়ে দেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। বলেন! এদেশের চিজ নয়। খেয়ে দ্যাখ্।'

খেয়ে দেখি, খুবই শক্ত, দাঁত ভেঙে যাবার জোগাড়। কিন্তু তার যা স্বাদ, একেবারে লেগে থাক মুখে!

তবে, গাঁয়ের সমবয়েসি অন্য ছেলেরা তাঁকে দেখে এমনই দমে যেত যে সহসা পাশ ভিড়ত না কেউ। আর, আমাদের চেয়েও যারা বাচ্চা, তারা তো যজ্ঞেশ্বরদাদুকে দেখলে দূর থেকে পালিয়ে বাঁচত।

এই সীমাহীন ভয়ের পেছনে আমাদের অবদানও কম ছিল না। আমরা বাচ্চাদের, এমনকি আমাদের সমবয়েসিদের সামনে যজ্ঞেশ্বরদাদুকে নিয়ে এমন-সব রোমহর্ষক গল্প করতাম, এমন একটা ভয়ঙ্কর ছবি আঁকতাম, ওরা আরও ভয় পেয়ে যেত। আমরা এমনটা করতাম এই কারণে, যাতে আমাদের খাদ্যের ও গল্পের ভাগিদার না বেড়ে যায়।

তারপর, অনেককাল বাদে, যখন আমরা বড় হলাম, শহরের স্কুলে পড়ি, আমি, কল্পনাথ, দিবাকর, মেসে-হোস্টেলে থাকি, উঁচু ক্লাসের পড়া বলে ইদানীং বাড়ি আসি খুবই কম। এলেও বইপত্তর সঙ্গে নিয়ে আসি। আগে যেমন ছুটিছাটায় বাড়ি এলে দিনভর আমি আর কল্পনাথ টো-টো ঘুরে বেড়াতাম, কিংবা দিনের প্রায় সারাটা সময় কাটিয়ে দিতে পারতাম যজ্ঞেশ্বর-দাদুর বাড়িতে, এখন আর সময় নিয়ে অত বিলাসিতা দেখাতে পারি না। এখন চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়েই থাকি। তবুও যে-কদিন থাকি, যতটা সম্ভব বেশি সময় আমি আর কল্পনাথ কাটাই মানুষটার সান্নিধ্যে।

তখন দিনের প্রায় পুরোটা সময় বিছানায় শুয়ে থাকেন যজ্ঞেশ্বর-দাদু।

একেবারে পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, 'কেমন আছ দাদু? কী করছ?'

খুব ম্রীয়মান হেসে যজ্ঞেশ্বর-দাদু জবাব দেন, 'লড়াই করছি রে।'

—আবা-র? আমরা মজা করি ওঁর সঙ্গে,—'সারা জীবনটাই তো লড়াই করলে এদেশে ওদেশে। এই বয়েসে আবার কার সঙ্গে কীসের লড়াই?'

সেকথায় আরও ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে যজ্ঞেশ্বর-দাদুর মুখ। বলেন, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, দাদুভাই। সারাজীবন, লড়াই থেকে আমার রেহাই নেই।'

যজ্ঞেশ্বর-দাদুর কথাগুলো ভারি দুর্জ্ঞেয় লাগে আমার কাছে। বলি, 'এই বয়েসে কার সঙ্গে লড়াই করতিছ তুমি?'

সেকথায় সামান্য সময়ের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। একসময় বিড়বিড় করে বলেন, 'একটা শত্রু আমার ভিনদেশে থাকতেই জুটেছিল শেষের দিকে। শত্রুটা বড়ই জ্বালাচ্ছিল আমাকে। ওর কারণেই পালিয়ে এলাম নিজের দেশে। এসে অবধি কিছুদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সে যে কবে কবে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে এখান অবধি এসেছে, বুঝতেই পারিনি। একদিন হঠাৎ একলাটি পেয়ে আমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, আমার থেকে পালানো অতই সোজা? সেই থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি ওর সঙ্গে। জানিনে কতদিন চলবে লড়াইটা।'

বলতে বলতে আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। একসময় আকাশের বুকে হারিয়ে যায় তাঁর দৃষ্টি। বলেন, 'অথচ, জানিস শঙ্কর, এককালে সে আমার বন্ধু ছিল খুবই। কবে কবে যেন শত্রু হয়ে গেল। কে যে কখন মানুষের বন্ধু হয়, শত্রু হয়, আগাম নির্ণয় করা মুশকিল। নইলে, সে যে কোনওদিন আমার শত্রু হয়ে উঠবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম আমি? আর, বন্ধু যখন শত্রু হয়, তখন তার থেকে বেশি ভয়, কেন কি, একদা বন্ধু থাকবার সুবাদে সে আমার জোরের জায়গাগুলো, দুর্বলতার জায়গাগুলো সাধারণ শত্রুর চেয়ে ঢের বেশি জানে।

কথাগুলো বলতে বলতে যজ্ঞেশ্বরদাদুর দু'চোখে ঘনিয়ে আসে এমনই এক জাতের আঁধার, যা দেখে আমার মুহূর্তে মনে পড়ে যায় মায়ের চোখ দুটি। ওই একই জাতের আঁধার তখন প্রায় সর্বক্ষণ ঘনিয়ে থাকত আমার মায়ের চোখে।

যজ্ঞেশ্বরদাদু বলে চলেন। একের পর এক রেখা টেনে টেনে এঁকে চলেন তাঁর শত্রুটির ছবি।

বলেন, 'বললাম তো, এক সময় সে ছিল আমার পরম বন্ধু। সুহৃদ। তার পিছু পিছু দিনরাত ছুটে বেড়িয়েছি কোনওদিকে না তাকিয়ে। আত্মীয়স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনদের ব্যাকুল নিষেধকে অগ্রাহ্য

করেছি। কেবল তার কথাকেই গুরুবাক্য-জ্ঞানে পালন করেছি দিনের পর দিন। একসময় সে-ই কিনা হয়ে উঠল আমার পরম শত্রু। দিনরাত আমার ওপর নির্মম প্রতিশোধ নিতে তৎপর। সে আমার বুকের ওপর সারাক্ষণ এক দুঃসহ বোঝা।' বলতে বলতে বেদনায় মুচড়ে যেতে থাকে যজ্ঞেশ্বরদাদুর বুক। বলেন, 'কেন যে অ্যাদ্দিন বাদে ফিরতে গেলাম দেশে! কী দুর্মতি যে হল আমার।'

সত্যিই তো। ততদিনে যজ্ঞেশ্বরের মুখ থেকে দুনিয়ার যাবতীয় স্বপ্নের মুকুলগুলির গল্প শোনা শেষ হয়ে গেছে আমাদের। গল্প শোনার বয়েসই পেরিয়ে এসেছি আমরা। এই বয়েসে আমরা অবলীলায় যজ্ঞেশ্বরদাদুকে পাল্টা প্রশ্ন করতে পারি,—তো ফিরলে কেন দাদু? ওইসব জা'গাতেই রইয়া যাইতে পারতে।'

তার জবাবে যজ্ঞেশ্বরদাদুর দু'চোখে ঘোর জমে। বলেন, 'ফিরে এলাম কেন জানিস দাদু? ফিরে এলাম এক টুকরো মেটেলির টানে।'

—'মানে?'

—'শোন্ তবে। কেন মাত্র এক টুকরো মেটেলি এত বছর বাদেও আমাকে টেনে আনল নিজের গ্রামে।'

বলতে বলতে যজ্ঞেশ্বর পেছোতে পেছোতে চলে গেলেন এক্কেবারে তাঁর ছেলেবেলায়। শোনালেন তাঁর কিশোর বয়েসের মাংস খাওয়ার গল্প। এক টুকরো মেটেলির কাহিনি।

বললেন, আমাদের গাঁয়ে তখন মাংস পাওয়া যেত কদাচিৎ। মাছ-মাংসের দোকান তো দূরের কথা, শাক-সবজির দোকান অবধি ছিল না। সারা গাঁয়ে দুটিমাত্র মুদির দোকান ছাড়া কোনও দোকানই ছিল না আমাদের গাঁয়ে। সপ্তাহে একদিন, ফি-শনিবার, হাট বসত পাশের গ্রাম মান্দারে। সেখানে শাক-সবজি, মাছ-মাংস, মনিহারি সামগ্রী, মাদুর, হাঁড়িকুড়ি,—এইসব পাওয়া যেত। হাট থেকে সামান্য তফাতে মহুল গাছের তলায় বসত পচানি আর হাঁড়িয়ার আসর। কাপড়চোপড় বলতে খান দু-তিন গামছা-লুঙ্গির দোকান। রঘু কামার কোদাল, কুড়ুল, দা, কাস্তে এনে সাজিয়ে বসত ঢাক-কদমের তলায়। আখের গুড়ের পায়া নিয়ে বসত নগেন সাউ। আর বসত তেলেভাজা, পাঁপড়ভাজা, আর সরষের তেলে ভাজা লাল লাল জিলিপি। গাঢ় খয়েরি রঙের ছোলাসেদ্ধ এনামেলের থালায় চূড় করে সাজিয়ে রাখত ভরত দাস, তার ওপর লঙ্কাভাজা গুঁজে রাখত। এইসব নিয়ে মান্দারের হাট। ওই হাটের জন্যই চারপাশের গাঁ-গুলো মুখিয়ে থাকত পুরো হপ্তা।

মান্দারের সঙ্গে সন্ধিপুরের ছিল দীর্ঘকালব্যাপী কলহের এবং রেষারেষির সম্পর্ক। সে কলহের কারণগুলি ছিল জটিল। ফলে, মান্দারের হাটের রমরমা দেখতে দেখতে সন্ধিপুরের মুখুজ্যারাও স্রেফ টেক্কা দেবার উদ্দেশ্যে, রাণিহাঁস দিঘির উত্তর পাড়ের ডাঙায়, নিজেদের জমিতে হাট বসাল ফি-শনিবার। উদ্দেশ্য, মান্দারের রমরমিয়ে চলতে থাকা হাটটিকে চৌপটি করে দেওয়া। হপ্তা চার-পাঁচ চলেছিল সেই হাট। তারপরই বন্ধ হয়ে গেল, কেন কি, মান্দারের হাট ছেড়ে খুব কম লোকই এল সন্ধিপুরের হাটে।

তো, হপ্তায় একদিন মান্দারের হাটটি বাদ দিলে সন্ধিপুরের মানুষের যা-কিছু দরকার তা সংগ্রহ করবার জন্য যেতে হত সাত মাইল দূরের বেলদাবাজারে কিংবা ছ-মাইল দূরের কেশিয়াড়ী বাজারে। কিন্তু সেসব বাজারেও বিকেলে খাসি কাটত না। ফলে, সাধারণভাবে, আমাদের গাঁয়ে, বিশেষ করে খাসির মাংস সহজ-লভ্য ছিল না। কেবল অমূল্যদা নিমপুরা কিংবা কুলটিকরির পশুহাট থেকে কখনো-সখনো কিনে আনত খাসি, নিজের উঠোনে কেটে বেচত।

যেদিন খাসি কিনতে যাবে অমূল্যদা, তার আগের দিন সারা সকাল জুড়ে গাঁয়ের সম্পন্ন পরিবারগুলোতে এসে জেনে যেত, পরের দিন খাসি কাটলে বাবুরা কে কতটা মাংস নেবেন? সেই পরিক্রমায় যদি অন্তত দশ-বারো সেরের বায়না পেত, তবেই আড়াই-প্রহরটাক বেলায় রওনা দিত খাসি কিনতে, নচেৎ নয়।

অমূল্যদা অবশ্য ষোল থেকে কুড়ি সেরের কম ওজনের খাসি কিনত না, কেন কি, তার চেয়ে কম ওজনের খাসি হলে তার পড়তা হত না। গাঁয়ের সম্পন্ন পরিবারগুলির থেকে দশ-বারো সেরের বায়না পেয়ে গেলেই বাকি মাংসটা দশে মিলে খুচরো কিনে নেবে এমন ভরসাতেই সে পা বাড়াত হাটের

দিকে।

শীতের মরসুমে, একে তো তখন সেটা মাংস খাওয়ার উপযুক্ত মরসুম, কারণ, শীতকালেই মাংসটা জমে ভালো, তার ওপর সদ্য ফসল ঢুকেছে ঘরে, গরিব-গুরবোদের পক্ষেও একপোয়া মাংস কিনে আলতি কচু দিয়ে ঝোল রেঁধে ছা-ছাওয়ালদের সামনে ধরে দেবার ক্ষমতা হয়েছে, কাজই অমূল্যদার উদ্যোগ মাঠে মারা যেত না। কিন্তু অন্য মরসুমে সমস্ত সম্পন্ন পরিবারে ঘুরে ঘুরেও অনেক সময় পাঁচ-ছ সেরের বেশি বায়না জুটত না। খুচরো বিক্রি আরো সের-চারেক হবে, এমনটা ধরে নিয়েও মাত্র দশ সেরি খাসি কিনতে রওনা দিত না অমূল্যদা, কেন কি, অত কম মাংস বেচে যাতায়াত ও খাইখরচা উশুল হবে না। কাজেই, অন্য মরসুমে অমূল্যদাকে বাড়ি-বাড়ি বায়না জোগাড় করতে দেখলেও আমরা বড় একটা নেচে উঠতে পারতাম না। কারণ, সেইসব উদ্যোগের বারো আনাই মাঠে মারা যেত।

একদিনের কথা বলি। সেটা ছিল শীতের মরসুমেরই এক মিষ্টি রোদ্দুরের বিকেল। আগের দিন অমূল্যদা এসে বায়না নিয়ে গিয়েছে। তারপর, সে যে খাসি কিনতে নিমপুরার হাটে গেল, খাসি নিয়ে ফিরে এল, সব খবরই আমরা যথাসময়ে পেয়ে গেছি। মাংসের ব্যাপারে আমার ছিল বাড়তি গরজ। কারণ, যারা জাতে বামুন নয়, কায়স্থ, মাহিষ্য কিংবা আরও নিচু জাতের, তারা খাসিমাংস না পেলে অবরে-সবরে মুরগি কেটে খেতে পারত, কিন্তু আমরা হলাম বামুন। পূজাপাট করি। আমাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে মুরগি ঢুকত না কদাচ। আর বাড়িতে কালেভদ্রে কুটুম-বাটুম এলে, কিংবা অন্য কোনও অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া বাজার থেকে মাংস কিনে আনবার রেওয়াজ ছিল না একেবারেই। কাজেই, গ্রামে খাসি কাটলেই বস্তুতপক্ষে আমরা মাংসের মুখ দেখতে পেতাম, নচেৎ নয়।

সেদিন অমূল্যদা একটা 'কালো ঘোড়া' কিনে এনেছে। খবরটা পাওয়া অবধি সেই সকাল থেকেই মনটা উড়ু উড়ু। ইস্কুলেও মন বসতে চায় না পড়াশোনায়। ইস্কুলে বসে বসেই পাকা করে ফেলি যে, স্কুলের ছুটি হওয়া মাত্র বাড়িতে বই-সিলেট রেখে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে এক সের মাংস আঁটবে এমন একটা এনামেলের জামবাটি নিয়ে দৌড়ে চলে যাব অমূল্যদার বাড়িতে।

প্রতিবারেই এমনটা ঘটে যে, সম্পন্ন বাড়িগুলির থেকে যতটা মাংসের বায়না নিয়ে গেল অমূল্যদা, তার দ্বিগুণ ওজনের খাসি এনেও কুলোতে পারল না। কেন কি, বায়না নেবার সময় যারা ততটা গা করে নি, যেই না খাসিটা কাটল অমূল্যদা, অমনি তাদের অনেকের মনেই মাংস খাওয়ার সাধ জাগল। ফলে, বিকেলটি গড়াতেই তারা একে একে হাজির হল অমূল্যদার উঠোনে, এবং লোভনীয় চিজ, কাউকেই তো বঞ্চিত করা চলে না, এমন বিবেচনায় সবাইকে যৎকিঞ্চিৎ করে দিতে গিয়ে বাঁধা খদ্দেরদের ভাগে পড়ল কম, এবং আমাদের যেখানে একসেরের কমে কুলোবেই না, অমূল্যদা গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে তিন পোয়া গছিয়ে দিল। কাজেই, সকাল থেকেই স্থির করেছি, একেবারে আগেভাগে গিয়ে বসে থাকব অমূল্যদার উঠোনে, এবং তা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে অমূল্যদা যদি মাংসের পরিমাণ তিলমাত্র কমাতে চায়, তাহলে এমন তুমুল প্রতিবাদ জানাব, যাতে করে শেষ অবধি হার মানতে হয় অমূল্যদাকে।

সেদিন ছিল শনিবার। স্কুলের হাফ ছুটি। সেটাও আমার কাছে খুবই প্লাস পয়েন্ট ছিল, কারণ, একে তো আগেভাগে গিয়ে হাজির হতে পারব অকুস্থলে যাতে বিলম্বে উপস্থিতির কারণে কেউ এমন যুক্তি দেখিয়ে আমার প্রাপ্য মাংসের পরিমাণ কমিয়ে দিতে না পারে যে, তোদের বাড়ির কেউ ত অতক্ষণ ছিলনি, কাজেই তোদের ভাগ থিকে আধসের মাংস গোকুলকে দিয়া দিলাম।'

সেদিন আমি যখন অমূল্যদার উঠোনে গিয়ে হাজির হলাম, তখন শীতের রোদ্দুরও বেশ চড়া। উঠোনের এককোণে চাটাই পেতে অকাতরে ঘুমোচ্ছে অমূল্যদা। দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে রাখা ছাগলটা এমন স্ফূর্তি-সহকারে বাঁশপাতা চিবিয়ে চলেছে যাতে করে যে-কারো মনে হবে, মৃত্যুভয় তখনও অবধি তিলমাত্র স্পর্শ করেনি পশুটাকে।

আমি অমূল্যদার পাশটিতে গিয়ে উবু হয়ে বসি। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু গলায় ডাকতে থাকি ওকে। 'অমূল্যদা, ও অমূল্যদা, উঠ, বেলা যে পড়িয়া আইল।'

বারকয়েক ডাকবার পর চোখ খোলে অমূল্যদা। ঘাড় হেলিয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকায়। তারপর আবার পাশ ফিরে শোয়।

ভারি বিরক্ত ও অসহায় হয়ে পড়ি আমি। অথচ ওই বয়েসে এটুকু বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছে যে, আজকের দিনে অমূল্যদাকে কোনওক্রমে রাগিয়ে দেওয়া চলবে না। কেন কি, তাতে করে মাংসের বিলি-ব্যবস্থার কালে, যখন উটকো খদ্দেরদের আবদার রাখতে বাঁধা খদ্দেরদের মাংসে কোপ পড়বে, তখন কোপটি পড়বে আমার মতো অসহায় বাচ্চাদের ওপর, কারণ, কোনওদিক দিয়ে তারা ধারেও কাটে না ভারেও কাটে না। আর, কম মাংস পাওয়ার নিট পরিণতি হল খাওয়ার সময় ভাগে নিতান্তই কম পড়ে যাবে। তখন পেটও ভরবে না, মনও ভরবে না।

বেলা আরও গড়ালে পরে অমূল্যদা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে। আড়চোখে নিরিখ করে বেলা। তারপর ধীর লয়ে হেঁটে যায় খিড়কির দিকে। খেজুর ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে থাকে। খেজুর পাতার ওপর ছরছরিয়ে পেচ্ছাব পড়ার শব্দ পাই উঠোন থেকে।

ফিরে এসে দাওয়ার ওপর বসে অমূল্যদা। ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। মৌজ করে টানতে থাকে বিড়ি।

দেখতে দেখতে খুব রাগ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাও অমূল্যদাকে না চটাবার সিদ্ধান্তেই অটল রইলাম।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে খুব ধীর লয়ে ওটাকে মেঝের ওপর ঘসতে থাকে অমূল্যদা। কেমন জানি অন্যমনস্ক লাগছিল ওকে। একটু বাদেই যে এত বড় একটা কাজে হাত দেবে সে, তার কোনও লক্ষণই নেই ওর চোখে মুখে। দেখে শুনে মনে মনে দমে যাই আমি। অমূল্যদা কি কোনও কারণে আজ খাসিকাটা বন্ধ রাখতে চাইছে?

একটু বাদে দাওয়া থেকে উঠোনে নামে অমূল্যদা। ভালো করে জল ছিটিয়ে ঝাঁটপাট দেয় উঠোনটাকে। তারপর ঘরের চাল থেকে দা নিয়ে হাঁটা দেয় খিড়কির কলাঝোপের দিকে, এবং তাই দেখে আমি বুঝে ফেলি, আমার সারা দিনের প্রতীক্ষা সফল হতে চলেছে।

খানিক বাদে খান-তিনেক আস্ত কলাপাতা নিয়ে ফিরে আসে অমূল্যদা। পরিপাটি করে পাতে মাঝ-উঠোনে, মণিখুঁটোর গা ঘেঁসে।

ঘরের চালে দা রেখে দিয়ে ঘরে ঢোকে অমূল্যদা। একটু বাদেই একটা কাটারি নিয়ে ফিরে আসে। উঠোনের এককোণে একটা পাথর পড়ে ছিল। দেখেই বুঝে ফেলি, ওটা কাটারিতে শান দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়। পাথরটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে কাটারিতে শাণ দিতে থাকে অমূল্যদা। তাই দেখে ছাগলটা বাঁশপাতার স্তূপ থেকে নজর সরিয়ে এনে তাকিয়ে থাকে অমূল্যদার দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিরপলকে দেখতে থাকে অমূল্যদার ক্রিয়াকলাপ।

কাটারিতে শান দেওয়া শেষ হলে পর পরনের লুঙ্গিটাকে কষে বেঁধে নেয় অমূল্যদা। কাটারিটা গুঁজে দেয় কোমরে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ছাগলটার দিকে।

অমুল্যদাকে এগোতে দেখে ছাগলটা আচমকা দ্বিগুণ গতিতে বাঁশপাতা খেতে শুরু করে। অমূল্যদা ওর কাছে গিয়ে খুব অলস হাতে দড়িটা খোলে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যায় খিড়কির দিকে। তখনও ছাগলটার মুখে আধ খাওয়া বাঁশপাতা।

খিড়কির দিকে একেবারে সীমানার গা ঘেঁসে একটা রোগাপানা শিরীষ গাছ। উঠোন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পাই, অমূল্যদা ছাগলটাকে শিরীষ গাছের গায়ে শক্ত করে বাঁধছে। ততক্ষণে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করেছে ছাগলটা। সম্ভবত বেচারি ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে তাব আসন্ন পরিণতির কথা।

অল্প সময়ের মধ্যেই খুব নিপুণ হাতে ছাগলটার মুখ বেঁধে দিতে পারে অমূল্যদা। উঠোন থেকে কেবল শুনতে পাই ওব গোঙানির শব্দ। কিন্তু আমি জানি, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ছাগলটা বিকট শব্দে চেঁচাতে থাকবে। মুখের বাঁধন তার অন্তিম আর্ত চিৎকারকে রুখতে পারবে না কিছুতেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে দু-কান শক্ত করে চেপে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যাতে করে মরণ-পথের যাত্রীর শেষ কান্নাটা আমাকে শুনতে না হয়।

বেশ কয়েক বার অনুরূপ অভিজ্ঞতা থাকায় সময়ের একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে আমার মধ্যে। কতক্ষণ বাদে কান খুললে ছাগলটার কান্না আর শোনা যাবে না, ওই বয়েসে তা আন্দাজ করতে পারতাম। সেই মতো কানদুটোর থেকে হাত সরিয়ে আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই খিড়কির দিকে। ততক্ষণে ধড় থেকে মুণ্ডুটাকে আলাদা করে ফেলেছে অমূল্যদা। ধড়টা সামনের পা-দুটো সমেত শূন্যে ঝুলছে। পেছনের পা-দুটো একত্রে বাঁধা রয়েছে শিরীষ গাছের রোগাটে কাণ্ডের গায়ে। তখনও অবধি তিরতিরিয়ে কাঁপছে ধড়টা। কাঁপার ধরন দেখে আমি নিশ্চিত হই, মরবার আগের মুহূর্তে খুবই ভয় পেয়েছিল বেচারা। ভয়জনিত সেই কাঁপুনি তখনও অবধি যায়নি ওর শরীর থেকে। ভয়কাতুরে ছাগলটাকে দেখে একটু অবাকই হলাম, কেন কি, সাধারণত রোগাসোগা বাচ্চাগোছের ছাগলেরাই খুব ভয় পেয়ে এতখানি কাঁপতে থাকে। কিন্তু এমন বিশ-সেরি দশাসই ছাগল যে ভেতরে ভেতরে এতটাই ভিতু, ভাবতেই পারিনি তা। পরে অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য দেখেছি যে ষণ্ডারাই ভেতরে ভেতরে বেশি ভিতু হয়।

ধড় থেকে চোখ সরিয়ে আমি ছাগলের মুণ্ডুটার দিকে তাকাই। নীলাভ চোখ দুটির মাঝখানে তুঁতরঙের মণিজোড়া, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমি অবাক হয়ে দেখি, ওর চোখদুটিতে যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। নির্বিকার দৃষ্টি নিয়ে চোখদুটো আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয়, একেবারে নির্বিকার নয় সে দৃষ্টি, তার বদলে কিছু বলতে চাইছে আমাকে, কিছু জানতে চাইছে আমার থেকে।

ততক্ষণে অমূল্যদা একটা পাতলা ছুরি দিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে ছাগলটার ছাল ছাড়াতে শুরু করেছে। আমি জানি, এ সময় তার মনোযোগ নষ্ট করা চলবে না কিছুতেই, কেন কি, সামান্য অসতর্কতায় যদি ছালের সঙ্গে একটুখানি মাংস চলে যায় তো সেটা এক ক্ষতি অমূল্যদার। আমি কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে থাকি। ততক্ষণে শিরীষ গাছের ডালগুলোতে এসে থানা গেড়েছে কাকের দল। কা-কা রবে চিৎকার জুড়েছে ওরা।

একটু বাদে ছাগলের শরীর থেকে চোখ না সরিয়ে অমূল্যদা বলে, 'দাওয়া থিকে বালতি লিয়া পুকুর থিকে জল লিয়া আয় তো।'

আমি দৌড় মারি উঠোনের দিকে।

ছাল ছাড়ানো হয়ে গেলে পর অমূল্যদা পুরো ধড়টাকে বালতির জলে ভালো করে ধোয়। তারপর, দড়িশুদ্ধু পা-দুটো গাছ থেকে খুলে নিয়ে শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে উঠোনের দিকে রওনা দেয়। অমূল্যদাকে ওই মুহূর্তে ছেড়ে থাকতে একবারেই ইচ্ছে করছিল না, তবুও ওই বধ্যভূমিতেই থেকে গেলাম আমি। শিরীষতলায় দাঁড়িয়ে কাকেদের আক্রমণ থেকে পাহারা দিতে থাকলাম মুণ্ডুটাকে। অমূল্যদা ফিরে আসার আগে আবারও মুণ্ডুটার সঙ্গে বারকয় চোখাচোখি হল আমার। ওই পড়ন্ত বেলায় একলাটি মুণ্ডুটার সান্নিধ্যে ছমছম করে উঠল আমার শরীর।

একটু বাদে, অমূল্যদার পিছু পিছু উঠোনে ফিরে এসে দেখি, ছাল ছাড়ানো ছাগলের লাশটা উঠোনের মণিখুঁটোতে ঝুলছে। তার শরীরের তিরতিরানি একেবারেই থেমে গিয়েছে দেখে মনে মনে স্বস্তি পেলাম আমি।

ততক্ষণে পায়ে পায়ে লোক জমতে শুরু করেছে অমূল্যদার উঠোনে। আর, শিরীষতলার সবগুলি কাক এসে থানা গেড়েছে অমূল্যদার বাড়ির চালে। মাংস, ছাল, কিংবা নাড়িভুঁড়ির একটু-আধটু টুকরো পাবে কি পাবে না তার কোনওই নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হানাহানি বাধিয়ে দিয়েছে ওরা। ওদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে উঠোনের জমায়েতটার ওপর থাপ্না করি আমি। ওই মুহূর্তে বেশি সংখ্যক লোক এসে পড়াটাকে মোটেই পছন্দ করছিলাম না। যাদের এমনিতে খুব পছন্দ করি, তাদের দিকেও বিষদৃষ্টিতে তাকাতে থাকি, কেন কি, এদের যে-কেউ আমার বরাদ্দ মাংসের খানিকটা ছিনিয়ে নিতে পারে।

এরপর, অমূল্যদা পরম নিষ্ঠাভরে পুরো ছাগলটাকে কেটে কেটে ফেলতে থাকে কলাপাতার ওপর। প্রথমে পেটটাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভুঁড়িটাকে নামিয়ে আনে কলাপাতার ওপর। তারপর একে একে সামনের

পা-দুটো, পাঁজর, শিরদাঁড়া, ঘাড়, এবং একসময় পেছনের পা-দুটিও। আমি জানি, এর পর অমূল্যদা কী করবে। প্রথমে সে ভুঁড়ির থেকে মেটে এবং বাড়তি চর্বিগুলোকে আলাদা করে একধারে সরিয়ে রাখবে। প্রায় বিশ-সেরি খাসি, ওই শীতের মরসুমে তার গায়ে চর্বিও লেগেছে দারুণ। তেলতেলে শক্ত শক্ত চর্বি।

আমি জানি, অমূল্যদা এরপর খাসির শরীরের প্রতিটি অংশকে ছোটো ছোটো করে কাটবে। ততক্ষণে তার উঠোনটি প্রায় ভরে এসেছে খদ্দেরে।

সমস্ত মাংসকে টুকরো টুকরো করে কাটবার পর অমূল্যদা সর্বপ্রথম পুরো মাংসটাকে ওজন করে দেখে নেয় মাংসের পরিমাণ কত দাঁড়াল। তারপর যত সের মাংস হল, হাতের আন্দাজে একসের করে ততগুলো স্তূপ বানায়। এতে তার কেটে যায় অনেকখানি সময়। এরপর আর একটিমাত্র কাজই বাকি রইল। শক্ত চর্বিগুলোকে নিয়ে সমান সংখ্যক তাল বানিয়ে রেখে দেবে প্রত্যেক স্তূপের ওপর।

এরপর ওজন করে সবাইকে মাংস দেবার পালা। বড়ই উত্তেজনাকর সেই মুহূর্তটি। আচমকা টের পাই, নেহাতই ছেলেমানুষ বলেই ঠাসবুনোট জমায়েতের ক্রমাগত ঠেলাঠেলিতে কখন জানি পেছনে পড়ে গেছি। অথচ আমি তো জানি, ওজন করে করে মাংস দেবার বেলায় সামনের মানুষই পেয়ে যাবে প্রথম সুযোগ। কে কত আগে থেকে অপেক্ষা করছে অমূল্যদার উঠোনে, সে বিষয়টা একেবারেই গৌণ হয়ে যাবে।

আমি হাতের ডেকচিটাকে মাথার ওপর তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠি, 'আমাকে পর্‌থম দাও অমূল্যদা, আমি পর্‌থম এসেছি।'

আক্কেল আছে বটে অমূল্যদার। দাঁড়িপাল্লায় প্রথম মাংসটি চাপিয়েই সে হাঁক পাড়ল, 'যজ্ঞেশ্বর, আগাই আয়। এই ধনা, পথ দে না অকে। সেই দুফোর থিকে আইসিয়া বুসিয়া আছে।'

অমূল্যদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভিজে যেতে যেতে এগিয়ে যাই সামনে। ততক্ষণে প্রথম দাঁড়ির মাল নেমে গিয়েছে মনু ময়রার বাটিতে।

আমার পালা আসে তার পরেই। কিন্তু দাড়িপাল্লার দিকে তাকিয়েই কান্না পেয়ে যায় আমার। তিনপোয়া মাংস ওজন করেছে অমূল্যদা। বলে, 'লে, ডেকচি পাত্‌।'

আমি ফোঁস করে উঠি, 'তিনপুয়া কেন? আমাদের তো একসের।'

—'আজ তিনপুয়াই লে বাপ, লোক এসেছে অনেক। সক্কলকে তো দিতে হবে। সামনের হপ্তায় একসের দুবো যা।'

আমি গোঁ ধরে থাকি, 'আমি এক সেরের কম লিবোনি। যা অর্ডার দিয়া হইছে, তাই দিতে হবে।'

আমার দিকে কটমট করে তাকায় অমূল্যদা, 'তাইলে, কুঞ্জ দাসের ঘরের লোক মাংস খাবেনি? অদের মাংস খাবার মন নাই? অদের ছা-ছাওয়ালেদের লোভ হয় না? শুধু তুই খাইলেই হবে? অন্যের জিভ্‌ভায় লালা সরে না? সব্‌বার কথা ভাব্‌, বাপ।'

বহুকষ্টে কান্না চেপে ডেক্‌চি পেতে ধরি।

আমার পরে পালা আসে গগন সাউয়ের, এবং লক্ষ করি ওর বেলায় ওজনে একটুখানি কম রেখে মেটের তাল থেকে একটা বড়সড় টুকরো কেটে নিয়ে ওজন করা মাংসের ওপর ফেলে দেয় অমূল্যদা।

তাই দেখে আমি বায়না ধরি, 'আমাকেও এক টুকরা বাড়তি মেটেলি দিতে হবে।'

অমূল্যদা বিরক্ত মুখে তাকায় আমার দিকে, 'আরে সব্বাইকে তো দিতে হবে। তুই একলা খাইলে চলবে?'

—'গগন জেঠাকে যে অতটা দিলে।' আমার অবুঝ অনুযোগ।

—'বা-রে, গগন-জেঠার ছোটো ছেলিয়াটা সদ্য টাইফট্‌ থিকে উঠল যে। তার এখন বলকারক চিজ্জ খাওয়া দরকার।'

অমূল্যদার দেওয়া যুক্তিটি গগনের শত্রুমিত্র সবাই ধ্বনিভোটে পাশ করে দিয়েছিল সেদিন, 'হ্যাঁ-হাঁ, বটে তো, সবার কথাই তো ভাবতে হবে। শুধু নিজেরটি ভাবলে চলবে?'

যজ্ঞেশ্বরদাদু এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান আমাদের দিকে। বলেন, 'শেষবেলাতে মনে পড়ে গেল অমূল্যদার সেদিনের কথা ক'টি, কিনা সকলের কথা ভাব্ বাপ। সেই কারণেই তো ফিরে এলাম সেইসব মানুষের কাছে, যারা ব্যবসা করবার বেলাতেও মনে রাখে যে, গগন সাউয়ের ব্যাটাটা টাইফয়েড থেকে উঠেছে, তাকে একটুখানি বেশি মেটে দিতে হবে।'

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমরা, যজ্ঞেশ্বরদাদু থামলে পরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে, উঠি,—'তারপর?'

'তারপর?' এর পরের পর্ব তো আরও রোমাঞ্চকর। তার উত্তেজনাও কিছু কম নয়, বরং ঢেরগুণ বেশি। যজ্ঞেশ্বরদাদু শুরু করেন ফের...।

মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরেই মাংস রাখবার নির্দিষ্ট জায়গায় ডেকচিটা নামিয়ে রেখে তার ওপর একটা বাটনা বাটবার শিল চাপিয়ে দিই, যাতে করে বিড়ালে না সাবাড় করে দেয়। তারপর পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে এসে পড়তে বসি, যদিও জানি আজ আর সন্ধেটা পড়াশোনাতে মন বসবে না কিছুতেই।

আমাদের সময়ে তো পাকশালে মাংস রান্না নিষিদ্ধ ছিল, মেয়েরাও রাঁধত না মাংস। তাদের মশলা বানিয়ে দিয়েই ছুটি। কাজেই, তুলসীতলায় সন্ধে দেখিয়ে...শঙ্খ বাজিয়ে...মা-দিদিরা খিড়কির দাওয়ায় বসে মসলা করতে লাগল ধীর লয়ে...।

দেখতে দেখতে রাগ হয়ে যায় আমার। কাছে গিয়ে বলি, 'মসলা করতেই যে রাত ভোর কবিয়া দিবে তুমরা। কখন রান্না হবে, কখন খাবো...?'

শুনে মা-দিদিরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, 'যে মাংস রাঁধবে তারই তো দেখা নেই...।'

সাধারণত ছোটোকাকাই রাঁধতেন মাংস। চাষবাস, পুজোআচ্চা ছাড়াও ভোজবাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন তিনি। রান্নাতে তাঁর নামডাক ছিল। ওই নিয়ে তাঁর মনে গুমোরও ছিল খুব। কিন্তু প্রতিবারেই নিজের বাড়িতে মাংস রাঁধবার প্রশ্নে বেঁকে বসতেন তিনি,—'এই সামান্য মাংস, হাঁড়ির তলায় পড়িয়া রয়, আমার দ্বারা হবেনি, অন্য কোউ রাঁধুক।' দিনভর ওই নিয়ে সবাই তোয়াজ করে যেত ছোটোকাকাকে। বাস্তবিক, ওই সন্ধেয় ছোটোকাকা গেছেন আড্ডা মারতে। তিনি এলেই তবে রান্না চড়বে। মা-দিদিদের ছেড়ে কাজেই, আমার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ে ছোটোকাকার ওপর, কিনা, আজকের দিনে আড্ডাটা একটু কম মারলে কী হয়! এইসব সাত-সতেরো ভাবতে ভাবতে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে থাকি আমি।

তারপর..., একসময়, মসলা বাটা হল..., মাংস চড়ল হাঁড়িতে..., ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িময়..., কষা-মাংসের গন্ধে ম-ম করতে লাগল চারপাশ..., আমরা বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তে পড়তে বারবার অন্যমনস্ক হতে যেতে লাগলাম, এবং দু-মিনিট অন্তর হরেক অজুহাতে উঠে গিয়ে দেখে আসতে লাগলাম, কাজটা কতদূর এগোল।

কষা মাংসে জল দেবার আগে দু'চার টুকরো মাংস তুলে রাখবে ছোটোকাকা। খিড়কির থেকে চেরা গলায় ডাক পাড়বে আমাদের। একসময় ডাক পেয়ে হুড়মুড়িয়ে পৌঁছে গেলাম খিড়কিতে। ছোটোকাকা আমাদের হাতে তুলে দেয় ছোট্ট একটি করে মাংসের টুকরো।

আমরা ওই টুকরোটিকে অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে থাকি অপরিসীম তৃপ্তিতে, যতক্ষণ সম্ভব মুখের মধ্যেই রেখে দিই চিবোনো মাংসটুকুকে। যেন ওটাকে গিলে ফেলা মাত্রই আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।

তারপর...একসময়..., মাংস রান্না শেষ হয়। গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় মাংসের ঝোলে। বাড়ির বারোমেসে মাইন্দার কানাইদা কলাপাতা কেটে আনে গাছ থেকে। সারবন্দী পাত পাড়া হয় ভেতরের দাওয়ায়। একসময় ভেতর থেকে ডাক পড়ে আমাদের। এক ডাকেই হুড়মুড়িয়ে খাওয়ার জায়গায় পৌঁছে যাই আমরা। পাতার সাইজ এবং আসনের কৌলিন্য দেখেই বুঝে ফেলি, বড়ো থেকে ছোটো কে বসবে কোন্ আসনে। সেইমতো ঝুপঝুপ করে বসে পড়ি।

ততক্ষণে খিড়কির দাওয়ায় মাংসের হাঁড়ির চারপাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাটি সাজিয়ে মাংস ভাগ করছে ছোটোকাকা। প্রত্যেকের বাটিতে যাতে নিরেট-মাংস, হাড়-মাংস, চর্বি এবং মেটের অনুপাত ঠিক থাকে, সেজন্য প্রতিটি মাংসের টুকরো হাতায় তুলে তুলে পরীক্ষা করে তবেই নির্দিষ্ট বাটিতে ফেলছে

সে। আবার, বড়োদের বাটিতে বেশি হাড় মাংস এবং ছোটোদের বাটিতে কম অথচ মাংসল টুকরোগুলি যাতে থাকে, সেটাও মাথায় রাখতে হয়েছে তাকে। আমরা সেই প্রক্রিয়াটি একটুক্ষণ দেখতে দেখতে মেটের জন্য জোরাল দাবি পেশ করে চলে এসেছি খাওয়ার জায়গাতে।

একসময় কলাপাতার পাতে ভাত ঢেলে দেয় মেজদি। গরম ভাতের ধোঁয়া হুতহুতিয়ে উঠতে থাকে ওপরের দিকে। ছোড়দি উনুনের পেট থেকে লোহার বালতিতে করে ভরে নিয়ে আসে কাঠ-কয়লার আগুন। প্রত্যেকের পাতের পাশে একহাতা করে আগুন দিয়ে চলে যেতে না যেতে পেতলের বারকোশে মাংসের বাটিগুলো ভরে নিয়ে হাজির হয় বড়দি। এক-একটি বাটি নামিয়ে দেয় আগুনের ওপর, যাতে করে ওই কনকনে শীতের রাতে বাটির মাংস এবং ঝোল অনেকক্ষণ অবধি গরম থাকে।

আমরা প্রথমে বাটির মধ্যেকার লাল-টকটকে ঝোলের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর সারবন্দী বাটিগুলোর মধ্যে কোন্ বাটিতে মাংসের পরিমাণ বেশি, কোন্‌টাতে কম, চোখ দিয়ে তার জরিপ চালাই। একসময় আলত করে তর্জনী ডুবোই গরম ঝোলের মধ্যে, পর মুহূর্তে তর্জনীটা মুখে পুরে দিয়ে ঝোলটার প্রাথমিক স্বাদ নিই জিভে।

একসময় ঝোল ঢালি ভাতে, মাখিয়ে নিয়ে খুব ধীর লয়ে খেতে শুরু করি। বিয়েসাদিতে খুব তেল-মসলা দিয়ে রাঁধলেও বাড়িতে খুব হালকা করে মাংস রাঁধত ছোটোকাকা, তবুও সে মাংসের যা স্বাদ হত, এখনো বুঝি লেগে রয়েছে জিভে। আমরা খেতে খেতে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিতাম, কার বাটির মাংস কতটা খরচ হল, কেইবা হা-ভাতের মতো প্রায় শেষ করে এনেছে বাটির মাংস, কেই-বা হাড় কেপ্পনের মতো মাংস গুলোকে জমিয়ে রেখেছে, শুধু ঝোল দিয়েই খেয়ে নিচ্ছে ভাত। আমরা জানি, যারা মাংস প্রায় শেষ করে ফেলেছে, তারা আর পাবে না মাংস। বড়জোর আধ-হাতা ঝোল পেতে পারে। তাও ঝোলটুকু ওই বাটিতে ঢেলে দেবার বেলায় বড়দি সামান্য গঞ্জনা দেবে, কিনা, অর্ধেক ভাতও খাওয়া হয়নি, এর মধ্যেই ঝোলটা শেষ করিয়া ফেলছু? মাংসের ঝোলের কি একটা পুকুর খোঁড়া হয়েছে বাড়িতে? বলতে বলতে ঝোলের সঙ্গে হয়ত বা মাংসের একটা ছুট টুকরো নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে ফেলে দিল ওর বাটিতে, আর তখনই আমরা, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, বড়দি ওকে বেশি ভালোবাসে।

ঠাকুমা একটা কথা বলতেন। মানুষের খাওয়ার ধরন দেখেই নাকি সঞ্চয়ী মানুষ এবং 'পুষ্কর' মানুষ নিশ্চিতভাবে চেনা যায়। যে কিনা খাওয়ার সময় লোভনীয় খাদ্যসামগ্রীগুলোকে সবার শেষে খায়, সে নাকি ভবিষ্যতে সঞ্চয়ী হবেই, সুখীও হবে সেই কারণে, কেন কি, সঞ্চয়ী মানুষেরাই পরবর্তীকালে সুখী হয়। আর যারা পাতে পড়তে না পড়তেই উত্তম পদটি আগেভাগে খেয়ে ফেলে শেষ পাতে খারাপ ব্যঞ্জনগুলি দিয়ে ভাত খায়, শেষ জীবনে তাদের কষ্ট কেউই ঠেকাতে পারবে না। আমি চিরকালই উত্তম ব্যঞ্জনটিকে একেবারে শেষে খেতাম।

দেখতে দেখতে ঠাকুমা প্রায়দিনই ভবিষ্যতবাণী করতেন, আমি নাকি শেষ জীবনে অতুল সুখের অধিকারী হব।

বলতে বলতে যজ্ঞেশ্বরদাদু তাঁর আগামী দিনের সুখের মুহূর্তগুলির কথা কল্পনা করতে করতে সামান্য সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান বুঝি।

আমরা কেমন যেন তলিয়ে গিয়েছিলাম সেই কতকাল আগের এক মাংস-রান্নার দিনে।

সহসা আমাকে বাস্তবের শানে আছাড় মারেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। গলায় রাজ্যের হাহাকার জড়ো করে বলেন, 'দেশে ফিরে এসে কোনই লাভ হল না রে দাদুভাই। মাঝের থেকে সিন্দুকে ভরে কত সাবধানে বয়ে আনা একটা মহামূল্য আসবাব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।'

আমি তখন মনশ্চক্ষে সিন্দুকের তলায় পড়ে থাকা ভাঙা আসবাবের টুকরোগুলোকে সনাক্ত করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠি।

আমরা বাচ্চারাও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, অ্যাদ্দিনবাদে আচমকা কাকার আগমনে কামাখ্যা ভট্ট যেমন হকচকিয়ে গেছেন, পাশাপাশি ভাবনায়ও পড়ে গেছেন খুব। কেন কি, মিলিটারি-দাদুর অনুপস্থিতিতে পুরো সম্পত্তিটা এতকাল জমিয়ে ভোগদখল করছিলেন তিনি, এবার সেই সম্পত্তির অর্ধেক, নেহাৎ কম নয় সেটা, বুঝিয়ে দিতে হবে কাকাকে। বাইরে খুব আদিখ্যেতা দেখালেও, 'ছোটোকাকা হেন নিধি, বলতে গেলে বাপেরই সমান সমান, এতকাল বাদে ফিরে এসেছে' গোছের মন ভেজানো কথা বলে আহ্লাদে দশ টুকরো হবার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে খুবই দমে গেলেন তিনি। প্রকাশ্যে কাকাকে পিতৃতুল্যজ্ঞানে খাতির যত্ন চালাতে থাকলেও ভেতরে ভেতরে শুভাকাঙক্ষীদের সঙ্গে শলা করতে লাগলেন, কিনা, সম্পত্তিটা ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে কী করা যায়? নাগাড়ে বারো বছর ভোগদখল করলে সম্পত্তির ওপর নাকি পাকাপোক্ত অধিকার জন্মে যায়। কথাটা সত্যি?

যারা কামাখ্যা ভট্টর চিরকালের বৈরি, এবং দু'তরফের সম্পত্তি একলা ভোগ করছে বলে যারপরনাই ঈর্ষান্বিত, তারাও বসে থাকতে পারে না। গ্রামের চৌমাথা, বটতলা, নাটমণ্ডপ জুড়ে তারাও ফিসফাস জনমত গড়ে তুলতে থাকে এই যুক্তি দেখিয়ে যে যতদিন মানুষটা ছিল না, তদ্দিন ভোগদখল করিয়া মজা মারলি, ঠিক আছে, কিন্তু যার সম্পত্তি সে যখন ফিরিয়া আস্সে, তখন তো তোর উচিত যার সম্পত্তি তাকে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দেওয়া। কেন, সে কি ধীরু ভট্টর ব্যাটা লয়? তিরু ভট্টর সহোদর ভাই লয়? সে কি বানের জলে ভাসিয়া আঁইল? এরপর তারা শাস্ত্র পুরাণকে আঁকড়ে ধরে, কিনা, রামচন্দ্রও যখন চোদ্দ বচ্ছর বাদে ফিরিয়া আইল, ভরত কি তাকে তার পৈতৃক রাজ্যপাট ফেরত দিতে তিলমাত্র দ্বিধা কচ্ছিল? সেটা না-হয় ছিল ত্রেতা, এটা না-হয় ঘোর কলি, তা বলিয়া ন্যায়, ধর্ম, বিচার, সবকিছু লোপ পায়্যাবে?

সবদিক বিচার বিবেচনা করে, তাই, আমার বড়ো জেঠার মতো শুভাকাঙক্ষীরা শলা দেয়, সম্পত্তিটা নিজের থেকেই ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত। আঙুলটা বাঁকালেই যেটা মানিয়া লিতে হবে, সেটা আগেভাগে মানিয়া লিয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া, হাত-পা ঝাড়া একলা মানুষটি, কদিনই বা বাঁচবে! তারপর তো ঝাঁকের কই ফের ফিরিয়া আইস্‌বে ঝাঁকে। শুধুমুদু ছ্যারকা গুয়ে লাঠি আছড়িয়া লাভ কী!

কিন্তু এটাও কামাখ্যার কাছে একটা অতীব অস্বস্তিকর সংশয়, কিনা, কাকাটি তার উপস্থিত ফিরে তো এল একলাটি, কিন্তু এই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসে সে যে কোথাও সংসার-টংসার পেতেছে কিনা, সেটাও তো খোলসা করে জানা যাচ্ছে না কিছুই। যদি সত্যি সত্যি অকৃতদার হয়, তাহলে অবশ্য সম্পত্তিটা দু'চার দিনের জন্য ফিরিয়ে দেওয়াতে আপত্তি করবার তেমন কিছু নেই, কেন কি, বুড়া চোখটি বুঁজলেই তো বাস্তবিক ঝাঁকের কইমাছগুলি ফের ঝাঁকে ফিরিয়া আইস্‌বে। কিন্তু ধর, যদি ভেতরে ভেতরে সংসার-টংসার করে থাকে কোথাও? যদি সম্পত্তিটার দখল টখল পাওয়ার পর ধীরে ধীরে বউ-বাচ্চাদের নিয়ে আসে, তাহলে তো কামাখ্যার পুরোটাই বরবাদ।

এইসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কামাখ্যা ভট্টর পুরো পরিবারটাই যখন জেরবার, ঠিক সেই মুহূর্তে একদিন যজ্ঞেশ্বরদাদুর কাছে আচমকা চলে আসে ললিত সাউ।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর ছেলেবেলার বন্ধু সে। সহপাঠী। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরদাদুর তুলনায় বুড়িয়ে গিয়েছে খুবই। সহসা চিনে উঠতে পারেন না যজ্ঞেশ্বরদাদু। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে।

ললিত সাউ ম্লান হাসে। বলে, 'তুমার আর দোষ কী! শরীরটা তো এক্কেরে ধ্বসিয়া গেছে। তুমার সহপাঠী আমি, কিন্তু দেখলে মনে হবে তুমার বাপ-দাদা কোউ।'

এমন কথায় যজ্ঞেশ্বরদাদুর কৌতূহল বেড়ে যায়। ললিত সাউকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন তিনি।

পাশে বসে ছিল গজানন, বলে, 'ও মিলিটারি-দাদু, তুমি ললিত দাদুকে চিনতে পারলেনি?'

—'ললিত—ললিত—ও হো—তুই আমাদের সেই ললিত! কী আশ্চর্য! তোকে তো চেনাই দায়। আশি

বছরের বুড়ো'।

আবারও ম্লান হাসে ললিত সাউ। বলে, 'শরীরের আর দোষ কী! সেই বলে না, গরিবের খাদ্য খুদ-খুঁড়া, কুড়ি বচ্ছরেই বুড়া। তাবাদে, গরিবের সংসারে সমস্যার তো অন্ত নেই। ভাবনা... চিন্তা...রাতে ঘুম হয় না...।'

এটা ঠিক, দুশ্চিন্তা মানুষকে অকালে বুড়ো বানিয়ে দেয়। যজ্ঞেশ্বরদাদুর বড়ই মায়া জাগে ছেলেবেলার বন্ধুটির প্রতি। বলেন, 'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে হুল্লোড়বাজ ছিলি তুই। তুই ছিলি আমাদের নেতা।'

সে কথায় ললিত সাউয়ের মুখে সামান্য গর্বের ছোঁয়া, কিনা, তার বিদেশ-ফেরত, ভি-আই-পি বন্ধুটি তাকে নেতার গুরুত্ব দিয়েছে।

বলে, 'সেসব দিনের কথা ছাড়, ভাই। সেসব দিন আর ফিরিয়া আইস্‌বেনি এ জীবনে। তার চাইতে কেমন আছ বল? ছোটো মেয়াটার বাচ্চা হইল, খবর পাইয়া দেখতে গেছলাম, ফিরিয়া আইসিয়া শুনি তুমি অ্যাদ্দিন বাদে ফিরিয়া আস্‌স। ভাবলাম, একবার দেখা করিয়া আসি। যতই হউক, এককালে তো আমার প্রাণের বন্ধু ছিল সে। সেসব দিনের কথা তো তিলমাত্র ভুলিনি আমি, সে মনে রাখছে কিনা দেখিয়া আসি।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু মধুর হাসেন, 'কেমন কথা বলছ তুমি? সেসব কথা ভুলতে পারিনি বলেই তো ফিরে এলাম। যতই দিন যেতে লাগল, বয়েস বাড়তে লাগল, তোমাদের কথা সারাক্ষণ মনে হতে লাগল। ঘুমের মধ্যে খালি তোমাদেরকেই স্বপ্নে দেখতে লাগলাম। দিনে-রাতে তোমরাই আমাকে ঘিরে রইলে সারাক্ষণ। ভাবলাম, না, নিজের জন্মভূমি, এত এত আপনজন, এদের ছেড়ে কেন দিন কাটাব বিদেশ-বিভুঁইতে? শেষ জীবনটা নিজের মানুষদের মধ্যেই গিয়ে থাকি। ওদের নিয়ে একসঙ্গে যষ্টিমধুর মতো চুষতে থাকি পুরোনো কালের দিনগুলোকে। মরতে হলে ওদের মধ্যে গিয়েই মরি।'

—'বেশ কচ্ছ। আইলে বলিয়াই তো শেষজীবনে চোখের দেখাটা দেখতে পাইলাম। মেয়ার বাড়ি থিকে ফিরিয়া যখন কথাটা প্রথম শুনলাম তুমার বন্ধুয়ানির মুখে, কিনা, তুমার ছা-বেলার প্রাণের বন্ধুটি ফিরিয়া আস্‌সে, শুনিয়া তো আমি থ।

যজ্ঞেশ্বরদাদু হাসেন। বলেন, 'আমাকে চেনে নাকি সে? শুনেছে নাকি আমার নাম?'

—'শুনেনি? কী যে কও! বিয়ার পর পর বাসর রাতেই তুমার কথা শুনেছে সে। বলেছি, 'আজকের দিনে আমার প্রাণের বন্ধুটি থাকলে, দেখতে, কেমন জমিয়া দিত আসর। আড্ডায়, মজলিসে, সে একলাই একশো। তারপর থেকে অদ্যাবধি, এমন একটা দিন যায়নি, তুমার প্রসঙ্গ উঠেনি আমার সংসারে।'

শুনতে শুনতে একেবারে গলে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। তাঁর জন্য এত ঘরে এত আসন যে পাতা রয়েছে, ভিন দেশ থেকে রওনা দেবার সময় স্বপ্নেও ভাবেননি এতটা!

সারা সকাল জুড়ে গল্প-গুজবে মজে যায় দুটি বয়স্ক মানুষ। বিদায় কালে ললিত সাউ বলে, 'আসল কথাটাই তো বলা হইলনি তোমায়। আমি তো আসলে একটা ফরমায়েস খাটতে আস্‌সি। তুমার বন্ধুয়ানিই আমাকে পাঠাল তুমার পাশ। জানতে চাইছে, ওর হাতের রান্না খাইতে কবে যাবে তুমি?'

শুনতে শুনতে একেবারে গলে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। মিষ্টি হাসিতে ভরে যায় ঠোঁটদুটি। বলেন, 'যেদিন ডাকবে সে। আমি তো এখন পুরাদস্তুর বেকার। একেবারে মুক্ত পুরুষ।'

ক'দিন বাদে ফের আসে ললিত সাউ। বলে, 'তুমার বন্ধুয়ানি পাঠাল তুমার পাশ। বলেছে, তুমি তো আমাদের হাতের ভাত খাবেনি, তো শুকনো খাবার কী খাইতে চাও? রুটি, লুচি, নাকি পরেটা?'

যজ্ঞেশ্বরদাদু আকাশ থেকে পড়েন, 'তোমাদের হাতের রান্না খাব না কেন?'

—'বাহ্, তুমি জাতে বামুন, আমরা মাহিষ্য।'

হা-হা করে হেসে ওঠেন যজ্ঞেশ্বরদাদু,—'আমি এখনো অবধি বামুন আছি নাকি? অর্ধেক দুনিয়া চষে বেড়াতে গিয়ে, সাত নদীর চোদ্দ ঘাটের জল খেতে গিয়ে কোন্ নদীর জলে যে ফেলে দিয়েছি জাতটাকে, সে আর মনে নেই। আমার এখন আর জাত বলে কিছুই নাই। আমি সবার হাতেই খাই,

সবকিছুই খাই। পাঁঠা, মুরগি, গরু, শুয়োর, সব। বন্ধুয়ানিকে বল, খেলে আমি ভাতই খাব, ওর হাতের রান্নাই খাব, যা খাওয়াবে তাই খাব, আর, ভাতের বদলে জলখাবার খাওয়াতে চাইলে আমি নেই।'

শুনে ললিত সাউয়ের চোখে মুখে এক ধরনের তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। খুব খুশি মনে বিদায় নেয় সে।

আর, তার পরপরই ভট্টদের পরিবারে ওঠে মৃদু তোলপাড়। যজ্ঞেশ্বরদাদু তাদের আচমকা ফেলে দিতে চাইছেন একটি অতীব মানহানিকর পরিস্থিতিতে। তিনি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়াবার সুবাদে জাতকুল খুইয়ে এসেছেন, তাঁর যে খাদ্য-অখাদ্য ভেদাভেদ ঘুচে গেছে, ছোঁয়াছুয়ি, মেশামিশির বাছবিচারও তিলমাত্র নেই, এসব কথা আন্দাজ করে নিয়েছে ভট্টবাড়ির সবাই। কিন্তু তাই বলে তিনি যে সেসব কথা ঢাক বাজিয়ে বলতে শুরু করেছেন দুনিয়াময়, এটা মেনে নিতে পারছে না কেউই।

ফলে, কামাখ্যা ভট্ট কাকাকে একান্তে শুধোন, 'তুমি নাকি ললিত সাউয়ের বউর হাতে ভাত খাবে বলিয়া কইছ?'

যজ্ঞেশ্বরদাদু ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকেন ভাইপোর দিকে। একসময় নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দেন। বলেন, 'হ্যাঁ, বলেছি তো। কী হয়েছে তাতে?'

এমন দৃপ্ত স্বীকারোক্তিতে মনে মনে দমে যান কামাখ্যা। মিনমিনে গলায় বলেন, 'না বলছিলাম কি, বাইরে হয়ত সবকিছুই চলে, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি, কিন্তু এটা হইল গাঁ-গঞ্জ। এখানে সবার সঙ্গে সমাজবদ্ধ হইয়া রইতে হয় আমাদেরকে। জাতপাতের বিচার তো এখনও অবধি উঠিয়া যায়নি। তাই...বলতেছিলাম. .।

—'কী আশ্চর্য. তোকে কে খেতে বলছে? খাব তো আমি। তোর তাতে জাত যাবে কেন?'

নিজের বিদেশ-ফেরত প্রাজ্ঞ কাকাকে এমন অর্বাচীনের মতো কথা বলতে দেখে মনে মনে রেগে কাঁই হন কামাখ্যা। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করেন না। মিষ্টি হেসে বলেন, 'কী আশ্চর্য! না খাইলেও এক ফেমিলিতে আছি তো, তুমি মাহিষ্য ঘরের ভাত খাইলে সমাজ আমাকে ত্যাজ্য করবে। আমার দু-দুটা বিবাহযোগ্যা মেয়া। তাবাদে গাঁয়ের বারোয়ারি শিব মন্দিরের পূজারি আমরা...।' গলাটা অকস্মাৎ অনেকখানি খাটো করে কামাখ্যা বলেন, 'আয়-উপায় ভালোই হয়। কিন্তু দিনকতক দিবাকর আচার্যরা পূজাটা লিবার তরে খোব ধরেছে সমাজের মুখিয়াদেরকে। কুনো প্রকারে ঠেকিয়া রাখছি...। কিন্তু তুমার এইসব কথাবার্তার পর সে আবার কোমরে কাপড় কষিয়া আসরে নামিয়া পড়ছে।'

—'আমার কথা? কী কথা?'

জবাবটা দিতে গিয়েও তা যাতে কোনও রূপ দোষারোপের পর্যায়ে না চলে যায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে কামাখ্যা খুব নরম গলায় বলেন, 'ওই-যে, কথাচ্ছলে তুমি কাউকে গরু-শুয়োর খাওয়ার কথা, কিম্বা জাতপাত না মানার কথা বলতিছ, নেহাতই কথার কথা সব, কিন্তু বজ্জাতগুলা ওইসব লিয়া এক্কেরে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া দিছে। আরে, ভিতরে ভিতরে কে কী করতেছে, কে যে কত জাত মানতেছে, জানতে তো আর বাকি নাই কারো, কিন্তু বিচারের আসরে অদের দিকেই টানিয়া কথা কইবে মুখিয়া-সমাজপতির দল।'

—'কেন?'

—'ওই-যে আমি ইস্কুলে চাকরি করি, তার উপর পূজা-যজমানিও মোটের উপর কম নয়, জমি-জায়গাও তুমার-আমার মিলিয়া অনেকের চাইতে বেশি, এই যে, একটু নুনে-ভাতে আছি, সহ্য হয় কারো? গাঁয়ের বাইরে ছিলে, ভালোই ছিলে। এসব এলাকার পরিবেশ যে কী জঘন্য হইয়া গেছে...!'

যজ্ঞেশ্বরদাদু মন দিয়ে শুনছিলেন কামাখ্যার কথা। একসময় ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শোন্, কামাখ্যা, একটা কথা ক-দিন ধরে বলব বলে ভাবছি। দ্যাখ্, আমি সারাটা জীবন আঘাটায় বেঘাটায় ঘুরে ঘুরে জাত-ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান একেবারে খুইয়ে বসেছি। সকলের সঙ্গে ওঠাবসা করেছি, সব জাতের হাঁড়িতে সব রকমের খাদ্যই খেয়েছি, এখনও আমার খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান সামান্যই। জাত-ধর্ম কিছুই মানি না আমি। পূজাআচ্চাও করিনা, পৈতাও পরি না, এঁটো-কাঁটাও মানি

না, বিছানায় বসে ভাত খাই,—এই বয়েসে এসব অভ্যাস বদলানোও যাবে না। কাজেই সবদিক বিবেচনা করলে আমার মনে হয়, আমার পক্ষে পৃথক অন্নে থাকাই সঙ্গত হবে।'

যজ্ঞেশ্বরদাদুর এমন প্রস্তাবে বুঝি মুহূর্তে বাজ পড়ে কামাখ্যার মাথায়। আম ও ছালা দুটোই যেতে বসেছে এমন আশঙ্কায় তিনি হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'কী যে বল কাকা, আমি কি তাই বলতেছি নাকি? তাই কখনও হয়? নিজের কাকা তুমি, বাপ আলাদা না কাকা আলাদা? তুমি কিনা থাকবে পৃথক অন্নে, লোকে কী বলবে আমায়?'

—'শোন্ শোন্।' কামাখ্যাকে হাত নাড়িয়ে থামান যজ্ঞেশ্বরদাদু,—'অবুঝের মতো কথা বলিস না। কাকা তোদের কাকাই রইলাম। কিন্তু এই বয়েসে আমি অভ্যাসগুলোকে কি ছাড়তে পারব? আর, এটা তো সত্যি কথাই যে তোর যজমানি রয়েছে, দু-দুটো বিয়ের বয়েসি মেয়ে রয়েছে, তোর আত্মীয়-কুটুম, সমাজ রয়েছে, সেসবও তো ভাবতে হবে।'

—'তা অবশ্যি ঠিক—, তবুও।'

—'তুই হয়ত ভাবছিস, এসব আমার রাগের কথা, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি অনেক বিচার-বিবেচনা করেই বলছি এসব।'

—'সে আমি জানি।' কামাখ্যা এতক্ষণে কাকার আঁচে একটুখানি হাওয়া করবার সুযোগ পেয়ে যান, 'তোমার কত বিবেচনা সে কি আমি জানিনি? আমরা তো সেই ছেলেবেলা থেকে শুনতেছি, কতখানি বিবেচনাবোধ ছিল তোমার! সব্বাই এখনও অবধি সে-কথা বলাবলি করে।'

কামাখ্যার প্রশংসাবাণীকে বড় একটা আমল না দিয়ে যজ্ঞেশ্বরদাদু বলেন, 'এক অন্নে থাকলে তোর যদি অসুবিধা হয়, সেটা আমি কাকা হয়ে চাইব?'

—'বটে তো। কাকা তো বাপেরই তুল্য।'

ততক্ষণে কামাখ্যা এটা ভেবে মনে মনে যারপরনাই আশ্বস্ত যে যজ্ঞেশ্বরদাদু রাগের বশে এহেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন কামাখ্যা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তাঁর। খুব ঝুঁকি নিয়েই কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। কেন কি, কামাখ্যার প্রস্তাবটাকে আন্তরিক ভেবে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর যদি বলে বসতেন, 'ঠিক আছে, অত করে যখন বলছিস, একসঙ্গেই না-হয় থাকব,' তাহলেই তো বিপদ রাখবার জায়গা ছিল না কামাখ্যার। তখন না পারত গিলতে, না পারত ওগরাতে। যাক বাবা, ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কাটল।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর দিকে গদ গদ চিত্তে তাকিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি যেমনটি চাইবে তেমনটিই হবে। তারপর ধর, ভিতরে ভিতরে তুমি তো আমার কাকাই রইলে, আমিও তোমার ভাইপো। গাই-বাছুরে মিল রইলে বাদাড়ে গিয়াও দুধ দিবে।' বলেই কামাখ্যা কাকার দিকে তাকিয়ে একচোখ ছোটো করে হাসেন। চাপা গলায় বলেন, 'সেই ভালো। তুমার ভিটাতে ঘর করিয়া রও তুমি। তুমার জমিজমা সব আমি চাষবাস করিয়া দিবো, এই বইসে তুমার কুনোই কষ্ট হইতে দিবোনি, কেন কি, তুমিও আমার একটা বাপ।'

—'জমিজমা চাষবাসের ব্যাপারটা পরে পশ্চাতে ভাবা যাবে।' বলতে বলতে সহসা কেমন অন্যমনস্ক দেখায় যজ্ঞেশ্বরদাদুকে। বলেন, 'সেটা তেমন কোনও ব্যাপারই নয়। তুইও চষতে পারিস, আমি নিজহাতেও চষতে পারি, অন্য কেউও ভাগে চষতে পারে...সেসব পরের কথা পরে।'

কাকাকে এহেন আকাশের দিকে চোখ ভাসিয়ে কথা বলতে দেখে মনে মনে দমে যান কামাখ্যা। মুখে কিছু বলেন না বটে, তবে মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকে।

আসলে, সেই প্রথম থেকেই কামাখ্যার ইচ্ছেটি ছিল খুব জটিল। যজ্ঞেশ্বরদাদু তাদের সঙ্গে একই পরিবারে থাকুক, এটা মনেপ্রাণে চাইতেন না তিনি। কেন কি, এতগুলো বচ্ছর কোন্ আঘাটায়-বেঘাটায় কাটিয়ে এলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু, কার সঙ্গে মেশামেশি, সংসর্গ, সহবাস করে এলেন, কী কী অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এলেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা আছে? দু'দুটো বিবাহযোগ্য মেয়ে কামাখ্যার। একটিবার যদি কোনও গতিকে রটে যায়, পাত্রীর এক দাদু, আধা-হিন্দু, আধা-মুসলমান, আধা-খ্রিস্টান। কেন কি, হিন্দুর

ঘরে জনম নিয়েছেন, সেই হিসেবে তিনি হিন্দু। কিন্তু তিনি গরু খেয়েছেন বলে নিজেই কবুল করেছেন। সেই হিসেবে তিনি মুসলমান। মুসলমানেরা গরু খায়, কিন্তু শুয়োর খায় না, এই লোকটা আবার খ্রিস্টানদের মতো গরু, শুয়োর দুই খেয়েছেন। কামাখ্যা মনে মনে ভাবেন, এমনই আক্কেল লোকটার, একটা ছেলিয়া-পুলিয়ার সংসারে আসতিছু তুই, তাদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কার, সমাজ-সংসারের নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ রয়েছে, কী দরকার ছিল অত হামবড়ামি করিয়া, হেন খেয়েছি, তেন খেয়েছি বলে অত হম্বিতম্বি করবাব? চোখের আড়ালে তুই কী খেয়েছু, কার সাথে কী করেছু, কেউ তো আর দেখতে যায়নি, কিন্তু আসামাত্তর নিজেই ঢাক বাজিয়া সে কথাগুলা বলবার কী দরকার ছিল? এগুলো শত্রুতা নয়? তাবাদে, লোকটার গায়ে একধরনের চাকাচাকা দাগ। কিসের দাগ কে জানে? একবার বিশ্বেশ্বর কবিরাজকে ডেকে এনে দেখানো উচিত কিনা সে ব্যাপারে শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে শলা নিচ্ছেন কামাখ্যা।

সব মিলিয়ে, ফুল-পুকুরের পাড়ে যে ভিটেটা রয়েছে, সেখানেই যজ্ঞেশ্বরদাদু পৃথকভাবে থাকুন, অথচ তাঁর ভাগের সম্পত্তিটাও যেন কামাখ্যার হাতছাড়া না হয়, এই দুটি পরস্পরবিরোধী স্বার্থকে এক জায়গায় এনে মেলানো যাবে কোন্ যাদুতে, সেটাই তিনি তাঁর আত্মীয়-বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন পক্ষকাল ধরে। এদিন যজ্ঞেশ্বরদাদু নিজেই পৃথক থাকবাব ইচ্ছে প্রকাশ কবে কামাখ্যার কাজটা অনেক সহজ করে দেন।

ছেলেবেলায় যজ্ঞেশ্বরদাদু নাকি খুব ডানপিটে ছিলেন। তিনি ফিরে আসাব পর পরই তাঁকে দেখে স্মৃতি উথলে উঠেছিল অনেকেরই। কতদিন বাদে প্রবীণেরা শুরু করল সেইসব গল্প। এর গাছের আম, ওর গাছের কাঁঠাল, কাঠবেড়ালির মতো গাছে চড়তে পারতেন, মাছের মতো সাঁতাব কাটতেন রানিহাঁস দিঘির জলে.. । সারাক্ষণ জুলুম করতেন এর-ওর ওপর। গ্রামের প্রবীণ মানুষেরা স্মৃতি থেকে তুলে আনে সেসব গল্প।

শুধু গ্রামের মানুষই নয়, যজ্ঞেশ্বরদাদু নিজেই বলতে থাকেন তাঁর দুষ্টুমির গল্পগাথা। সেসব গল্প এই শেষবেলায় এসেও ভোলেননি তিনি। আমাদের মতো নাতিদের কাছে সেইসব দিনের গল্প এমনভাবে করতেন, যেন পরশু দিনই ঘটেছে ঘটনাটা।

বলতেন, 'বুঝলে দাদুভাইয়েরা, আমাদের পাড়ায় নন্দ বুড়ি নামে এক বিধবা ছিল, পরেশ দাশের মা, খিটখিটে আর শুচিবাই হিসেবে তার খ্যাতি ছিল সারা গাঁয়ে। আমার তাতে করে কিছু যেত আসত না। কিন্তু ওর যেটা আমার খুব খারাপ লাগত, সেটা হল, পরেশদার বউকে সারাক্ষণ কষ্ট দিত খুবই। অথচ কী যে ভালো ছিল পরেশদার বউটা! চব্বিশ ঘণ্টা কী গাধার খাটুনিটাই না খাটত বউটা! তা সত্ত্বেও সারাক্ষণ ওকে গালমন্দ করত বুড়ি। এটা-ওটা লাগিয়ে ভাঙিয়ে ছেলেকে দিয়ে বেচারিকে মার খাওয়াত প্রায় রোজদিনই। আসলে, খুবই গরিব বাড়ির মেয়ে ছিল বউটা। বাপটা মরে গিয়েছিল ছেলেবেলায়। ভাইগুলো ওর দিকে ফিরেও তাকাত না। কাজেই, ওর হয়ে বলবার মতো কেউই ছিল না এই দুনিয়ায়। তো, বুড়ির ছিল বেড়াল পোষার সখ। একটা সাদা রঙের বেড়াল ছিল তার। সারাক্ষণ থাকত বুড়ির আশেপাশে। রাতেও বুড়ির কোলের মধ্যে শুত। একদিন কী করলাম জানিস, বুড়িব সাধেব সাদা বেড়ালের গায়ে আচ্ছা করে ভুষোকালি মাখিয়ে ছেড়ে দিলাম। ওই নিয়ে বেড়ালটা রাতের বেলায় বুড়ির বিছানাতে শুল ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে। সকালবেলায় কাপড়চোপড় আর বিছানার দশা দেখে ডাক ছেড়ে কেঁদেছিল বুড়ি দুপুর অবধি।'

এইসব গল্পগাথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে, কেবল দুষ্টুমি নয়, ওই বয়েসেও একটা প্রতিবাদী চরিত্র ছিলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব তরিকায় লড়াই করতেন তিনি।

কিন্তু এসব কিছু নয়, যজ্ঞেশ্বরদাদু ওই বয়েসেই গাঁয়ের কংসমামাদের কৃষ্ণভাগনে হয়ে উঠেছিলেন। ততদিনে এমন কথা খুব রটনা পেয়ে গেছে যে, তাঁর সঙ্গে স্বদেশিদের যোগ রয়েছে। এমন রটনার কারণ সম্ভবত দুটো। এক, যজ্ঞেশ্বরদাদুর এক মামা নাকি পাক্কা স্বদেশি ছিলেন। ততদিনে নাকি সেই সুবাদে

দু-একবার থানা-হাজত হয়ে গেছে তার। সেই মামার সঙ্গে খুব গলায় গলায় ছিল যজ্ঞেশ্বরদাদুর। আর, দুই, যজ্ঞেশ্বরদাদু ওই বয়েসেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে শিখেছিলেন, যেটা স্বদেশিদের আচার-আচরণের সঙ্গে খুব মানিয়ে যেত। কানু দাসের পেছনে তাঁর ওই বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর ফলে সে সরাসরি তৎকালীন জমিদার পূর্ণনারায়ণ মুখুজ্যার কোপে পড়ে যায়।

পূর্ণনারায়ণ বড়ই অত্যাচার করত গরিব প্রজাদের ওপর। নানা ছলে একই জমির খাজনা দশবার করে আদায় করত। সেবার মিথ্যে ঋণের দায়ে অন্যায়ভাবে কানু দাসের সবজি-খেতটার দখল নিল পূর্ণনারায়ণ। কানু দাস কেঁদেকেটে, মুখুজ্যা-বুড়োর পা জাপটে ধরেও রেহাই পেল না কিছুতেই। সারা গাঁয়ের মানুষ বুঝল, কানুর ওপর একটা নিদারুণ অন্যায় করা হল, কিন্তু জমিদারের কথার ওপর কথা বলবে এমন বুকের পাটা কার! ফলে, পাইক-লগদি দিয়ে একদিন জমিটার দখল নিয়ে নিল পূর্ণনারায়ণ।

অ্যাদ্দিন বাদে ঘটনাটা বলতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরদাদুর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। বলেন, 'তখন আমার বয়েস কত? পনেরো-ষোলর বেশি নয়। কিন্তু মুখুজ্যা-বুড়ার অন্যায় জুলুমটা মেনে নেওয়া কঠিন হল আমার পক্ষে। কী করলাম জানিস? যখন মজুর লাগিয়ে একদিনেই বেড়া বেঁধে আগড়ে তালা লাগিয়ে দিল মুখুজ্যার লোকজন, রাতের আঁধারে বেড়া ভেঙে, তালা খুলে, সবকিছু ছত্রখান করে দিলাম।

দিনকয়েক খুব হম্বিতম্বি করে আবার বেড়া বাঁধা করাল জমিদার। পরিপাটি করে সবজি লাগাল। যখন লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে গাছগুলো, ফুল ধরেছে, ফুলের বুকে জালি এসেছে এন্তার, এক রাতে, সারা রাত জেগে আবার বেড়া ভেঙে, খেতের তাবৎ সবজি উপড়ে সাফ করে দিলাম।'

'পূর্ণনারায়ণ গোপন সূত্রে আমার নামটা জেনে ফেলে। ফলে, পরের দিনই পুলিশ এল, ব্রিটিশ-সিংহের পুলিশ, কেশর ফুলিয়ে সারা গাঁ খুঁজে বেড়াল আমাকে। কিন্তু তখন আর পাবে কোথায় আমাকে? তার আগেই তো গাঁ ছেড়েছি। ফিরলাম এই এতদিন বাদে। এখন পূর্ণনারায়ণও বেঁচে নেই, কানু দাসও না।'

ফুল্লরাও নেই। যজ্ঞেশ্বরদাদু গাঁ ছাড়ার বেশ কয়েক বছর বাদে পাশের মান্দার গাঁয়ে বিয়ে হয়েছিল তার। এখন সে ওই গাঁয়েরই বাসিন্দা।

আমাদের গাঁয়ের নিতাই বোষ্টমের মেয়ে ফুল্লরা। তাকে ভালোবেসে ওই বয়েসে ন্যাড়া গাছের পলকা ডালে উঠে রোজ রোজ কাঠগোলাপের ফুল পেড়ে দিতেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। ওই ফুলে মালা গেঁথে রোজ রোজ তাদের কৌলিক দেবতা গৌর-নিতাইয়ের গলায় পরাত ফুল্লরা।

যজ্ঞেশ্বরদাদু নাকি রোজদিনই বায়না ধরতেন ফুল্লরার কাছে। বলতেন, 'তোর গৌর নিতাইয়ের সাথে আমার তরেও একটা মালা গাঁথিস না কেন রে ফুল্লরা? ওই কাঠের দ্যাবতাকে মালা পরিয়ে লাভ কী?'

ফুল্লরা জবাব দিত না, মালাও গেঁথে দিত না, কেবল মিটি মিটি হাসত। গাঁ ছাড়ার পূর্ব-মুহূর্তে যজ্ঞেশ্বরদাদু নাকি একমাত্র ফুল্লরার সঙ্গেই শেষ দেখাটা করেছিলেন। চুপিসারে নাকি বলে গিয়েছিলেন, 'যদি কোনও দিন ফিরি, ফুল্লরা তোর জন্যই ফিরব।'

বহুদিন সে কথা কারো কাছেই ভাঙেনি ফুল্লরা। বলল একেবারে পঞ্চাশ পেরিয়ে। তখন জোয়ান ছেলের মা সে। চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে। পান-দোক্তার রসে কালচে রঙ ধরেছে মাড়িতে। যজ্ঞেশ্বরদাদুর সেই কিশোর বয়েসের প্রতিজ্ঞার কথাটা সে ফাঁস করেছিল তখন, যখন ওই কাঁচা বয়সের শপথের আর বিশেষ কোনও অর্থ রইল না কারও কাছেই, ফুল্লরার কাছেও না।

এখন, অ্যাদ্দিন বাদে, ছেলেবেলার কোনও কথা উঠলেই নির্মল হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু, কেবল ফুল্লরার প্রসঙ্গ উঠলেই আচমকা খুব গম্ভীর হয়ে যান। সহসা ভারি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর চোখ দুটি।

সেই ফুল্লরা একদিন সম্ভবত চড়ুইদের মুখে খবর পেয়ে, এসেছিল যজ্ঞেশ্বরদাদুর সঙ্গে দেখা করতে। আমরা সেদিন হাজির ছিলাম যজ্ঞেশ্বরদাদুর কাছে। সেদিন খুব মজার কথোপকথন হয়েছিল দুজনের মধ্যে। শুনতে শুনতে আমরা বাচ্চারাও হাসি চাপতে পারছিলাম না।



কাকা-ভাইপোর এবংবিধ টানাপোড়েনের ধার ধারে না ললিত সাউ। সে যজ্ঞেশ্বরদাদুকে তাড়া দিতে দিতে অস্থির করে মারে, কিনা, কবে তার বউয়ের হাতের রান্না খেতে যাবেন যজ্ঞেশ্বরদাদু।

যজ্ঞেশ্বরদাদু খালি এড়িয়ে যান। মনে দুঃখ পাবে বিবেচনায় আসল কারণটা ফাঁস করেন না।

ললিত সাউয়ের পীড়াপীড়িতে একদিন আসল কারণটা বলেই ফেলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। বলেন, 'মূল ভিটে থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু না করা অবধি আমার আর বন্ধুয়ানির হাতের রান্না খাওয়া হচ্ছেনি, কেন কি, সবাই তো সমাজবদ্ধ হয়ে আছে, সমাজের কিছু নিয়ম-কানুনও রয়েছে। আমি হাত-পা ঝাড়া মানুষ নাও মানতে পারি, কিন্তু যারা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে, বাড়িতে একাধিক বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকে, তাদেরকে তো সবকিছু মানতে হয়। আর, এক ছাদের তলায় থেকে আমিও তো একেবারে বিপরীত আচরণ করতে পারি না। কাজেই, বন্ধুয়ানিকে একটু বুঝিয়ে বল, পাকা কথা হয়ে গিয়েছে কামাখ্যার সঙ্গে, পুবদিকের ভিটেটাতে খুব জলদি একটা ঘর বানিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমি, তারপরই কব্জি ডুবিয়ে খাব বন্ধুয়ানির হাতের রান্না।'

যজ্ঞেশ্বরদাদুর কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলার বন্ধুর প্রতি দায়িত্ববোধে টান টান হয়ে ওঠে ললিত সাউ। বলে, 'শুধু ঘর করিয়া দিলে হবে? জমি-জিরাতগুলার কী হবে? কামাখ্যা সেগুলোর দখল দিবে কিনা? শুধু ঘর লিয়া ধুইয়া খাবে নাকি তুমি?'

—'জমির দখল লিয়াই বা কী করব আমি?' যজ্ঞেশ্বরদাদু হাসেন,—'এই বয়েসে চাষবাস কবতে পারব? চাষবাসের কিছু বুঝি আমি? চাষবাস শিখেছি কখনো?'

—'আহ্।' ললিত সাউ প্রাণের বন্ধুর এমন ছেলেমানুষি কথায় যারপরনাই বিরক্ত হয়,—'চাষবাস কে করবে, সেসব পরে-পশ্চাতে দেখা যাবে, আপাতত জমিগুলার দখল তো লাও তুমি।' গলা খাটো করে বলে, 'সারাজীবন তো বন্দুক লিয়া যুদ্ধ কল্লে, জমি-জিরেতের আইন আর জানবে কী করিয়া? জমি তুমার বেদখল হয়্যা গেছে। আর, এদেশের আইন অনুসারে, জবরদস্তি দখলে রইলেও অধিকার জন্মিয়া যায় দখলকারীর। আমি বলি কি—।' যজ্ঞেশ্বরদাদুর দিকে একটুখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে ললিত সাউ,—'তুমি আগে দখল লাও তুমার সম্পত্তির, তারপর যাকে খুশি দাও। যদি কামাখ্যাকে দিয়া চাষ করাতে চাও, করাও। কিন্তু একটি বারের তরে নিজের দখলে লিয়া আইনের দিকটা পোক্ত করিয়া রাখ।'

প্রাণের বন্ধুর কথাগুলো শুনতে শুনতে যজ্ঞেশ্বরদাদু গুম মেরে যান।

বিষয়সম্পত্তির ভাগাভাগিতে যজ্ঞেশ্বরদাদুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল যে ভিটে, তারই ওপর মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে একটা দু'কামরার কোঠাবাড়ি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বানিয়ে দিলেন কামাখ্যা। বলেন, থাকবে বটে এখানে, তবে সাবেক বাড়িতে তোমার অবারিত দ্বার, কেন কি, বাপ যা, কাকাও তাই। নেহাৎ বজ্জাত আর নিন্দুকের মুখ চাপা দিতে—। তুমার দু-দুটা বিবাহযোগ্যা নাতনি—।'

একদিন ললিত সাউয়েব বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাদাম কিশমিশ জাতীয় উপহার সামগ্রী।

ললিত সাউয়ের বউ যশোদা খুব লাজুক ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ায় সামনে।

ললিত বলে, 'এই হল তুমার বন্ধুয়ানি। তুমার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।'

যশোদার দিকে একঝলক তাকান যজ্ঞেশ্বরদাদু। উপহার-সামগ্রীগুলি ধরে দেন হাতে। খুবই কুণ্ঠিত হাতে জিনিসগুলো নেয় যশোদা। একটু বাদে যজ্ঞেশ্বরদাদুর জন্য সরবৎ নিয়ে আসে।

পুরো সকাল, দুপুর ললিতের সঙ্গে গল্পগুজবে কাটে। যজ্ঞেশ্বরদাদু তাঁর প্রবাস-জীবনের গল্প শোনান তারিয়ে তারিয়ে। দুনিয়ার নানা দেশেব কথা বলেন। স্বপ্নের মতো দেশ সেসব। বলেন, 'বয়েস থাকলে বন্ধুয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার পাড়ি দিতাম ওইসব দেশে। ঘর বাঁধতাম সেখানে।'

শুনে ঘোমটার আড়ালে মিষ্টি হাসে যশোদা।

রঙ-তামাশার মধ্যেও ললিত সাউ নিজের কর্তব্য ভোলেনি। সে কথায় কথায় হিসেব কষে জানিতে

দেয়, বর্তমানে ওই এলাকার জমিতে যা ফলন, তাতে যজ্ঞেশ্বরদাদুর অংশের চোদ্দ বিঘা জমিতে যা ফসল হবে, ভাগচাষের ক্ষেত্রে অর্ধেক ধরলেও বছরে যা পাবে যজ্ঞেশ্বরদাদু, তাতে করে, একজন মাত্র মানুষ তো, পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে বাকি জীবনটা। বলেই সে চোখ টিপে শলা দেয় যজ্ঞেশ্বরদাদুকে, 'ভাইপোকে একটিবার শুধিও তো, বছরে কত ধান দিবে তুমাকে।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু খুব অস্বস্তি বোধ করেন, 'যাহ্, নিজের ভাইপো, অমন কথা শুধোনো যায় নাকি?'

—'অ্যাই, এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি তুমাকে।' ললিত সাউর দু'চোখে হারানিধি খুঁজে পাওয়ার আনন্দ,—'নিজের মানুষকে এসব কথা শুধোনো বাস্তবিকই কঠিন। কেন কি, সবাই তাইলে চামার ভাববে তুমাকে। অথচ তুমাকেও তো বাকি জীবনটা বাঁচতে হবে। রোগ-ব্যাধি আছে, বিপদ-আপদ আছে, সেসব কথা কে ভাবে? সেই বলে না, সুসুময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,/অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়। কাজেই, নিজের স্বার্থটা ভাবতে হবে তুমাকেও। নিজের মানুষকে সম্পত্তি দিয়া রাখলেই যত চক্ষু-লজ্জার বালাই। চাষ করিয়া পুরা ফসল ঘরে তুলবে সে, কেবল তুমাকে হিসাবমতো তুমার ন্যায্য প্রাপ্যটি বুঝিয়া দিবার বেলায় কিনা কাকা-ভাইপো সম্পোক্ক! আমি বলি কি—।' গলাটা আবার খাটো করে আনে ললিত সাউ,—'জমি যদি চাষ করতে দিতেই হয়, তবে একেবারে পরকে দাও। ফাল্‌তু চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। বছর-বছর গলায় গামছা দিয়া ফসল বুঝিয়া লিবে, বেগড়বাঁই কল্লে জমিন কাড়িয়া লিয়া অন্য কারোকে দিয়া দিবে, ফুরিয়া গেল কথা।'

সারা সকাল, দুপুর যখন ললিত সাউ প্রাণের বন্ধুর স্বার্থচিন্তায় মগ্ন রইল, বউ যশোদা তখন যজ্ঞেশ্বরদাদুর জন্য রাঁধল বাছা বাছা ব্যঞ্জন, যা কিনা মানী অতিথি-অভ্যাগতরা এলেই পরিবেশন করা হয়। সবশেষে রান্নাঘরে ডাক পড়ল যজ্ঞেশ্বরদাদুর, কিনা, ছোট্ট পেতলের হাঁড়িটি মেজে ধুয়ে উনুনের পাশটিতে রাখা হয়েছে, যজ্ঞেশ্বরদাদুকে কেবল উঠে গিয়ে একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ওই হাঁড়িতে দু-মুঠো ভাত বসিয়ে দিতে হবে নিজের জন্য।

যজ্ঞেশ্বরদাদু অবাক হয়ে তাকান। বলেন, 'কেন? তুমি তো আমাকে বন্ধুয়ানির হাতের রান্না খাওয়াবে বলে ডেকে এনেছ। এখন রান্না করতে বলছ কেন?'

—'আহাহা—।' লম্বা করে জিভ কাটে ললিত সাউ,—'রান্না করিয়াই খাবাবে তুমাকে। সব রান্নাই তো রাঁধতিছে উ। কেবল ভাতটাই যা—।'

—'কেন? ভাতটা আমাকে রেঁধে নিতে হবে কেন শুনি?'

—'তবে? মাহিষ্যর হাতে ভাত খাবে তুমি?'

—'সেই কড়ারেই তো এসেছি। তাবাদে, তরকারিগুলো খেতে পারছি, ভাত বেচারি কী দোষ করল শুনি?'

—'তরকারিতে জাত যায় না, কিন্তু নিচু জাতের হাতে, বামুন মানুয তুমি, ভাত খাওয়াটা চলেনি।

—'চলবে, চলবে। নিমন্ত্রণ খেতে এসে রান্নাবান্না আমার পোষাবে না। তাছাড়া অত সহজে জাত যায় না।'

সে কথায় স্পষ্টতই খুশি হয় ললিত সাউ এবং তার বউ।

ললিত বলে, কথাটা কি জান, তুমি সারা দনিয়া ঘুরছ, কত জিনিস দেখ্‌ছ, কত জ্ঞানের কথা শুনছ, তুমার মনটা তাই উদার। আর, এ তল্লাটের সব মানুষজন, কুঁয়ার ব্যাঙ সব, যত কুসংস্কার তাদের মনে। লচেৎ অন্যের হাতে খাইলে কারোর জাত যায় না। তাইলে তো ঠাকুর-দ্যাবতাদের কবেই জাত চলিয়া যাইত। কেন কি, তারা তো বামুনদের রান্না অন্নভোগ দু'বেলা খাচ্ছে, আর বামুনরা তো দ্যাবতাদের চেয়ে নিচু জাত, বটে কিনা?'

ললিত সাউয়ের যুক্তির বহর দেখে চমৎকৃত হন যজ্ঞেশ্বরদাদু।

খেতে খেতেও গল্পগুজব চলতে থাকে। যজ্ঞেশ্বরদাদু প্রসঙ্গক্রমে জানান, জীবনে কত-কত বছর অবলীলায় অজাত-বেজাতের হাতের রান্না খেয়েছেন।

বলেন, 'হাড়ি-ডোম, মুচি-মেথর, সব্বাইয়ের হাতে খেয়েছি। জাত-ফাতের কথা একেবারেই ভুলে

গিয়েছিলাম হে। অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এসে আবার মনে পড়ল। বলেন, একেবারে শেষের দিকে যে আমার রান্নাবান্না করত, ফাইফরমায়েশ খাটত, সে ছিল জাতে চামার।'

সেকথায় ললিত এবং তার বউ কেউই খুশি হয় না। যশোদা সামান্য সাবলীল হয়েছে। যজ্ঞেশ্বরদাদুর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলছে সে। বলে, 'তাই ফের হয়, দাদা? জাত-ধর্ম, এসব হইল ভগবানের ছিষ্টি। বামুন হইয়া তুমি যদি মুচি-মেথরের হাতে খাও, তবে তুমার পূর্বপুরুষ জল লিবে তুমার হাতে? বামুন বংশে জন্মেছ তুমি, কত জন্মের কত সুকৃতির ফল সেটা, এভাবে জাতধর্ম খোয়াতে আছে?'

—'হাঁ, যশোদা ঠিকই বলতিছে।' পাশে বসে পোঁ ধরে ললিত সাউ,—'আমরা না হয় জাতে মাহিষ্য, আমাদের হাতে না হয় খাইলে, কিন্তু তাবলে মুচি-মেথরের হাতে খাওয়া, না-না ঘোর অন্যায় সেটা। আমি বলি কি, একটা প্রাচিত্তির করিয়া লিচ্ছনি ক্যানে? নিজের ঘরেই পুরুত তুমার, অসুবিধাটা কি?'



একদিন ফুল্লরা এল যজ্ঞেশ্বরদাদুর সঙ্গে দেখা করতে।

তখন তার ষাট ছুঁই ছুঁই। বয়েসের তুলনায় অনেক টন্‌কো রয়েছে ফুল্লরা। বিধবা হয়েছে এক যুগ আগে।

যজ্ঞেশ্বরদাদু বসেছিলেন নিজের বাড়িতে উঠোনে। ফুল্লরা এসে দাঁড়াল সামনেটিতে।

সাদা থান পরনে। কপালে, নাকে রসকলিটি ভারি খুলেছে। গলায় কাঠের মালা। মিটি মিটি হাসছিল। বলে, চিনতে পার?'

যজ্ঞেশ্বরদাদু চিনতে পারেন না।

হাসতে হাসতে ফুল্লরা বলে, 'চেষ্টা করো।'

ফুল্লরাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। একটা পরিচিত মুখের ছায়া যেন ভাসছে মেয়েটির মুখে। কিন্তু ঠাহর হচ্ছে না কিছুতেই। যজ্ঞেশ্বরদাদু ভুরু কুঁচকে শুধোন, 'কে তুমি বল তো?'

ফুল্লরা লম্বা করে মাথা নাড়ে, 'না। বলবোনি। তুমাকেই চিনতে হবে।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু হেসে ফেলেন, 'জুলুম নাকি? চিনতে আমি বাধ্য?'

—'হ্যাঁ, বাধ্য তুমি। সত্যি সত্যি যদি আজ না চিনতে পার আমাকে, তবে আমার গৌর-নিতাইয়ের কাছে খুব দোষ লাগবে তুমার। কেন কি, গৌর-নিতাইয়ের সঙ্গে তুমার জন্যও একটা কাঠগোলাপের মালা গাঁথবার জন্য কম পীড়াপীড়ি করনি আমাকে।'

শুনতে শুনতে কুঁচকে থাকা ভুরু ধীরে ধীরে শোসর হয়ে আসে যজ্ঞেশ্বরদাদুর। মুখে ফুটে উঠতে থাকে দিনের প্রথম আলোর আভা।

খুব উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠেন, 'ফুল্লরা!'

মিটি মিটি হাসছিল ফুল্লরা। দেখতে দেখতে দেমাক ফুটে ওঠে যজ্ঞেশ্বরদাদুর মুখে, 'কেমন? চিনতে পারলাম কিনা?'

সে-কথায় অভিমানের মেঘ জমে ফুল্লরার সারা মুখে, 'খুব চিনলে যা-হোক, নিজের পরিচয় নিজেই খোলসা করলাম হ্যাংলার মতো। গৌর-নিতাই, মালা,...এরপর আর না চিনবার উপায় থাকে নাকি?'

যজ্ঞেশ্বরদাদু সারা মুখে অপরাধের হাসি। বলেন, 'না, না বিশ্বাস কর, খুব চেনা চেনা লাগছিল মুখখানি। আমার কী দোষ বল্, কতদিন আগের কথা! তখন কতই না কচি মুখখানি ছিল তোর! না-হোক চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর তো হবেই।'

—'বিয়াল্লিশ বছর।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু ফুল্লরার মুখের দিকে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, 'সাল তারিখ মুখস্থ রেখেছিস দেখি!'

—'দিন গুনতাম যে তোমার জন্য।' হাসতে থাকে ফুল্লরা, 'মালাটালা গাঁথতে বলিয়া লোভ দেখালে,

তারপর একদিন পালিয়া গেলে।'

—'ফিরেও তো এলাম।' যজ্ঞেশ্বরদাদুর মুখে পাল্টা হাসি,—'তোর জন্যই ফিরে এলাম।'

—'তাই নাকি?' যেন সামান্য লজ্জা পায় ষাট ছুঁই ছুঁই ফুল্লরা,—'খোব খোসামুদি শিখেছ বাইরে গিয়া।'

—'খোসামুদি?' যজ্ঞেশ্বরদাদু বলেন,—'যাবার সময় বলে গেছলাম, যদি ফিরি তোর জন্যই ফিরব। ফিরেছি কিনা?'

—'আমার জন্য?' ফুল্লরার দু'চোখে কৌতুক,—'তবু যদি চিনতে পারতে!'

—'চোখটা ভুলে গেছল তোকে। মানছি। কিন্তু মনটা ভোলেনি। মনের মধ্যে তুই ছিলি। ওই দিনগুলোর সব কথা মনে রয়েছে কিনা?'

—'তবে আর এই বাঁশবনে একলাটি পড়িয়া রইয়া লাভ কী?' ফুল্লরা মিটি মিটি হাসতে থাকে,—'চল, ঘর বাঁধি।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু হাসেন, 'মন্দ হয় না। এ বয়েসে আবার নতুন করে ঘর বাঁধলে।'

—'তাইলে দিন স্থির হয়্যা যাউ আজই।'

—'আমার তো কোনওই অসুবিধা নাই। তুই কি আর মেয়ে হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবি?'

—'না পারার কী আছে?'

—'লোক লজ্জা।'

—'লজ্জা কিসের? আমাদের জাতে কণ্ঠিবদল খুব চলে।'

সেই বিকেলে খুব হাসাহাসি চলে দুজনের মধ্যে। দুজনেই সম্ভবত স্বীকার করে, জোয়ান বয়েসে এমনতরো কথা এমনভাবে বলা সম্ভব ছিল না।

এরপর আরও দু-একবার পীড়াপীড়ি করে নিজের বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরদাদুকে ধরে নিয়ে যায় ললিত সাউ। দু-বেলা আনাগোনা করতে থাকে ওঁর বাড়িতে। সে বাড়িতে তখন যজ্ঞেশ্বরদাদু একলাটি থাকেন। ফলে, ললিত সাউয়ের পক্ষে যজ্ঞেশ্বরদাদুর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কথাগুলো একান্তে বলতে পারা সম্ভব হয়। কোনও-কোনও দিন স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই চলে আসে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব করতে। ডেকে নিয়ে গিয়ে এটা ওটা খাওয়ায়। আগামী দিনে আরও কী কী নতুন পদ রেঁধে খাওয়াবে তার মিলিটারি-বন্ধুকে, খুব লাজো লাজো মুখে সেই অঙ্গীকার করে যশোদা। আলতি-কচু দিয়ে মৌডাল ছাতু, চালের গুঁড়োতে ডুবিয়ে শিউলি পাতার বড়া, পোস্ত-পেঁয়াজের পাতা-চচ্চড়ি...।

তেমনই একদিন ললিত সাউ আর তার বউ মিলে কথাটা পাড়ল।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর অংশের জমিগুলো যদি তাকে ভাগে চষতে দেওয়া হয়, তবে বন্ধুর সংসারটিও বেঁচে যায়, পাশাপাশি সম্পত্তি এবং তার ফসলের ব্যাপারে ষোলআনা নিশ্চিন্ত হতে পারেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। এই বুড়ো বয়সে তাঁর অন্নচিন্তাটা আর থাকে না, কেন কি, যজ্ঞেশ্বরদাদু তো সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন ললিতকে, কারোর দু'পয়সা মেরে দেওয়াকে সে মহাপাপ বলে মনে করে।

দু'চোখ কপালে তুলে ললিত সাউ বলে, 'বিষয় নয় তো, বিষ। এ বিষের স্বাদ তো তুমি পাওনি। মানুষকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারে। দেবতুল্য মানুষকেও অমানুষ করিয়া ছাড়ে। এক্কেবারে নিজের লোকটিও পর হইয়া যায়।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু ভেবে ভেবে সারা হন। শেষ অবধি রাজি হতে পারেন না কিছুতেই।

বলেন, 'দ্যাখ, তারা আমার এক্কেবারে আপনজন, এক্কেবারে রক্তের সম্পর্ক, তাদের থেকে কেড়ে নিয়ে জমিগুলো তোমাকে দিই কেমন করে বল? লোকে কী বলবে? এটা ঠিক, সম্পত্তিটা পেয়ে যাওয়ার পর তারা আমাকে সব ব্যাপারে ফাঁকি দিতেই পারে। সে তাদের ব্যাপার। তাদের ধর্ম তাদের কাছে। কিন্তু আমি আমার ধর্ম থেকে তো বিচ্যুত হতে পারি না।'

খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায় ললিত সাউ। ধীরে ধীরে আনাগোনাটা একেবারেই কমিয়ে দেয়। যজ্ঞেশ্বরদাদু যখন ইলচি করে বলেন, কী হে, কত কিছু রেঁধে খাওয়াবার কথা ছিল বন্ধুয়ানির। মৌডাল ছাতু, শিউলিপাতার বড়া..., কই, কবে খাওয়াবে সেসব?

জবাবে ললিত সাউ ফোকলা দাঁতে হাসবার চেষ্টা করে। আলগোছে জবাব দেয়, 'হবে হবে..., বাস্ত কি...তুমি তো আর...।'

একদিন ললিত সাউ পুরোপুরি ছিন্ন করে দিল সম্পর্কটা। ইদানীং তো কাকের মুখেও খোঁজ নেয় না যজ্ঞেশ্বরদাদুর। তিনি যে একটা অতল খাদের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, যে-কোনও মুহূর্তে যে তলিয়ে যেতে পারেন, সেটা বোধ করি জানেই না তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুটি।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর পৈতৃক জমি-জিরেতের ভোগদখল সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান হলে পর কামাখ্যার মনোযোগ গেল কাকার সিন্দুকটির দিকে।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর ওই ঢাউস তেলচিটে বসা সিন্দুকটাকে নিয়ে কামাখ্যাদের তো বটেই, গ্রামবাসীদের মধ্যেও এক ধরনের চাপা দম-আটকানো কৌতূহল অনেকদিন যাবৎ ছিল। সিন্দুকটাতে অষ্টপ্রহর তালা লাগানো থাকত। চাবি থাকত যজ্ঞেশ্বরদাদুর কোমরে। প্রয়োজনে খুবই সন্তর্পণে তালা খুলতেন, শরীরেব আধখানা সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কীসব খোঁজাখুঁজি করতেন অনেকক্ষণ। সে সময়টায় কাছে যাওয়া তো কোন্ দূরের কথা, আশপাশ দিয়েও আনাগোনাও ছিল অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ। মানুষজনের কৌতূহলটা তাতে করে বেড়ে যেত আরও। কী যে রয়েছে ভেতবে, শব্দটব্দ শুনেটুনে আন্দাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। আর, আন্দাজ মানে তো স্রেফ কল্পনাশক্তিকে উসকে দেওয়া। অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যেত তা। ফলে, যজ্ঞেশ্বরদাদুর সিন্দুকেব ভেতরের সামগ্রী নিয়ে অনেক উল্টোপাল্টা রকমের রটনা ছিল চারপাশে। তাঁর আজীবন অর্জিত সম্পত্তির ধরন ও পরিমাণ নিত্যিদিন মানুষেব মুখে মুখে বদলে বদলে যেত।

ব্যাপারটা নিয়ে কামাখ্যার মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। গ্রামবাসীদের বেয়াড়া কৌতূহলের রাশটা যথাসম্ভব টেনে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন তিনি। প্রসঙ্গ উঠলেই চোখে মুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলতেন, 'তুমরাও যেমন! উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখতিছ। কুথা কি! গোটাকয় পুরনো রঙ চটা মিলিটারি র‍্যাপার, গন্ধে ভূত পালায়, কিছু পুঁথিপত্তর, বাঁকানো ছুরি দু-তিনটা, হাবিজাবি আরও কিছু জিনিস, বিনা পইসায় দিলেও লিবেনি কোউ, ব্যস। ওইসব লিয়ে বুঢ়া এমন ভাব দেখায়, যেন সাত রাজার ধন রয়েছে সিন্দুকে!'

বলাই বাহুল্য, এমন কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস করত না কেউই। বরং দামি কিছু সামগ্রীকে আড়াল করবার জন্যই যে কামাখ্যা এমন গল্প ফেঁদে চলেছেন, সেটা মনে হওয়া মাত্রই বুকের অন্তর্গত কৌতূহলটা আরও বল্গাহীন হয়ে উঠত।

একদিন লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে প্রসঙ্গটা কাকার সুমুখে তুলেছিলেন কামাখ্যা।

'কাকা, আমি বলি কি, একলাটি থাকো তুমি, দিনকাল ভালো নয়, তার উপর তুমার সিন্দুকে সাপ-ব্যাঙ যা থাকুক না কেন রটনা তো খুব, ভয় হয়, কুনোদিন বজ্জাত মানুষজন কিছু একটা না ঘটিয়া ফেলে! চুরি ডাকাতি তো খুবই হচ্ছে চতুর্দিকে। তাই বলি কি, সিন্দুকটা না হয় আমাদের বাখুলে লিয়া রাখি। সেখানে আমরা সবাই থাকি, দরজা জানালা পোক্ত...। চাবি যেমন তুমার কাছে থাকে, তেমনই থাকবে। কেন কি, তুমার যদি মনে হয়, আমরা তুমার সিন্দুক খুলিয়া...।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু গুম মেরে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। একসময় কামাখ্যার প্রস্তাবটা মাথা নেড়ে বাতিল করে দেন।

চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে কামাখ্যার। বলেন, 'আমাদেরকে বিশ্বাস হচ্ছেনি? তুমার জিনিস চুরি করিয়া লিবো আমরা?'

কামাখ্যার চোখ মুখ দেখে যজ্ঞেশ্বরদাদু বুঝতে পারেন, খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। কিন্তু ওকে কেমন করেই বা বোঝাবেন, কত দিন ধরে সিন্দুকটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে...একেবারে প্রাণের বন্ধুর মতো,

শরীরের একটা প্রত্যঙ্গের মতো...। কতদিন, বিদেশে বিভুঁয়ে ওটার ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছেন তিনি...। কতদিন ধরে, ওই মেহগিনি কাঠের চৌকোনা বাক্সটি একেবারে পাকা গৃহিনির মতো সুরক্ষা জুগিয়ে চলেছে যজ্ঞেশ্বরদাদুর একক সংসারটাকে...! জীবনের এই শেষপর্বে এসে তাকে এমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নাকি!

কিন্তু সেদিন আর যজ্ঞেশ্বরদাদু এত কথা খুলে বলেননি কামাখ্যাকে। কেবল গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। ওটা আমার কাছেই থাকবে।'

সত্যি সত্যিই একদিন ডাকাত পড়ল যজ্ঞেশ্বরদাদুর ঘরে। সবাই বুঝেছিল, ওই সিন্দুকের টানেই এসেছিল। দিনের পর দিন এমনতরো সম্ভব-অসম্ভব রটনা চলতে থাকলে ডাকাতরাই বা কতদিন লোভ সামলে থাকতে পারে! তাও যে এতদিন সময় নিল তারা, তা কেবলমাত্র একটি কারণেই। যজ্ঞেশ্বরদাদু মিলিটারি-ফেরত লোক। তাঁর শরীরে সাধারণের থেকে বল অধিক, মগজে শত্রুকে টিট করবার বুদ্ধি-কৌশল রয়েছে। অস্তরপাতিও থাকতে পারে সঙ্গে, যদিও এতাবৎকাল বের করেননি সাধারণের সুমুখে, কিন্তু থাকাটাও কিছু বিচিত্র নয়।

ডাকাতদের সম্ভবত যজ্ঞেশ্বরদাদুকে নিয়ে বড় বেশি বেগ পেতে হয়নি। সম্ভবত তিলমাত্র বাধা দেননি তিনি।

কিন্তু পরদিন খবরটা শোনা মাত্র কামাখ্যার তো বটেই সারা গ্রামের মানুষের মধ্যে হা-হুতাশের বন্যা বয়ে যায়। আর, কামাখ্যার তো পাগল-পাগল অবস্থা। যাকে সামনে পান তার সামনেই হাহাকার করে ওঠেন তিনি, কিনা, কত করিয়া কইলাম, বুড়া মানুষ তুমি, একলাটি থাক, দিনকাল ভালো নয়, আমার বাড়িতে সিন্দুকটা থাকুক, চাবি থাকুক তুমার কাছে। শুনল কথাটা? ভাবল বুঝি আমরা তাঁর টাকা-পইসা ধনদৌলত সব লিয়া লিবো। লাও, কত ভোগ করবে, কর। শেষ অবধি চোরের ভোগে গেল তো? সেই বলে না, গরিবের কথা বাসি হইলে মিঠা লাগে।'

কামাখ্যার হাহাকারের ফলে জনমানসে দু-কিসিমের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এক দলের মধ্যে বুড়োর ধনদৌলতের জন্য প্রবল হা-হুতাশ, অন্য দলের মধ্যে চাপা উল্লাস, কিনা, কামাখ্যা শালা বড় একটা দাঁও মারবার তালে ছিল, চোরের পো'রা ওর বাড়া ভাতে এক আঁজলা ছাই ঢালিয়া দিয়া গেছে। বেশ করেছে। শালার বড্ড লোভ। একদিকে ইস্কুল-মাস্টারি, তার উপর অতগুলা যজমানি, নিজের পৈতৃক জমিন, তার উপর বুড়ার তাবৎ জমিনগুলাও গ্রাস কল্ল, তাও সিন্দুকের মালগুলার জন্য একেবারে হাত ধুইয়া বুসিয়া ছিল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, যারা বুড়োব এক-সিন্দুক মাল একরাতে চোরের হাতে চলে যাওয়ায় আক্ষেপ করছিল, কিংবা যারা কামাখ্যার মুখের শিকার এভাবে ফসকে যাওয়ায় মনে মনে পুলক পাচ্ছিল, দু-তরফই আস্তে আস্তে নিভে আসে, কেন কি, সিন্দুকের মালিক অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরদাদুর চোখে-মুখে তিলমাত্র হা-হুতাশের লেশমাত্র ছিল না। আর, তাতে করেই ধুরন্ধর মানুষেরা বুঝে ফেলে, সিন্দুকে আসলে তেমন দামি কিছু ছিলই না। যে-কোনও কারণেই হোক, লাগাতার সাসপেন্স বজায় রেখে ভাইপোকে আশায় আশায় রাখতে চেয়েছিল বুড়ো। চোর ব্যাটারা ওইখানেই মেরে দিয়ে গেল বুড়োকে। আফশোস যদি করে থাকে বুড়ো, তো সেটা ওই কারণেই। কিনা, কামাখ্যাটা বুঝে গেল যে সিন্দুকে কিছুই নেই। কথায় বলে, আশায় বাঁচে চাষা। কাকার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ আখেরে সে-ই পাবে এ হেন আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে গেছে চোরেরা। সেই দুঃখটাই ভোলা কঠিন হয়ে উঠল কামাখ্যার পক্ষে।

আর, ধনদৌলত হাতানোতে নয়, অন্য জায়গায় যজ্ঞেশ্বরদাদুর বড়সড় ক্ষতি করে দিয়ে গেল চোরেরা। বুড়ো কাকার থেকে আর কোনও কিছুরই প্রত্যাশা নেই বিবেচনায় কামাখ্যার পুরো পরিবার একটু একটু করে ভুলে যেতে লাগল যজ্ঞেশ্বরদাদুর কথা।

রান্না করা খাবার যা এতাবৎকাল দিনে দু'বেলা কামাখ্যার বাড়ি থেকে যেত যজ্ঞেশ্বরদাদুর বাড়িতে, ক্রমশ অনিয়মিত হতে লাগল সে ব্যবস্থা। এবেলা যায় তো ওবেলা যায় না। গেলেও সময়ের ঠিক থাকে না কিছু। কোনওদিন দুপুরের আগে, কোনওদিন দুপুর গড়িয়ে। কোনওদিন দিন তরকারি, কোনওদিন

শুধু ডাল আর ভাত।

প্রথম প্রথম তাই নিয়ে খুব চেঁচামেচি করতেন যজ্ঞেশ্বরদাদু, তাঁর ভাগের জমিনজিরেত কামাখ্যার থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে ভাগে চাষ করানোর হুমকি দিতেন। তখন দিন-কয়েকের জন্য ঠিকঠাক আসত খাবার, কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার যেই-কে-সেই।

একসময় যজ্ঞেশ্বরদাদুর ধমক-ধামক, হুমকি, সবকিছুই গা-সওয়া হয়ে গেল কামাখ্যাদের। কেন কি, কামাখ্যা ততদিনে বুঝে ফেলেছেন, এসব বুড়োর ফাঁকা আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। জমিজিরেতের ঝক্কি সামলানো আর ওই বয়েসে বুড়োর কম্মো নয়। ফলে, কিছুদিন বাদে, যজ্ঞেশ্বরদাদুর হুমকির জবাবে কামাখ্যাও পাল্টা হুমকি দিতে লাগলেন ; কিনা, 'লিয়া লও তুমার জমিন, যাকে খুশি দিয়া চাষ করাও, রেহাই দাও আমাকে। আমার আর এই উটকা ঝামেলা সহ্য হচ্ছেনি। আজকাল চাষবাসে কত লাভ, যে চাষ করে সেই জানে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। মাঝের থেকে বারোমাস তিরিশদিন গুরুদেবের মতো সেবাপূজা চালাও, পান থিক্যা চুনটি খসলে দুর্বাশার রাগ, এসব আমার ভালো লাগতিছেনি।'

ততদিনে যজ্ঞেশ্বরদাদু বুঝে ফেলেছেন, হুমকিকে কাজে পরিণত করবার মতো অবস্থায় সত্যিই তিনি আর নেই। শরীরটা দ্রুত ভেঙে পড়ছে। নানা কিসিমের রোগ-ব্যাধি চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে বুড়ো শরীরটাকে। কাজকর্ম তো দূরের কথা, আগের মতো হাঁটাচলাও করতে পাবেন না তিনি। কামাখ্যারা দেখাশোনা না করলে, বাস্তবিক, বিপদেই পড়ে যাবেন।

ভাবতে গিয়ে বড়ই অসহায় লাগে যজ্ঞেশ্বরদাদুর। বুকের ভেতরটা নিঃশব্দে গুঁড়োতে থাকে। বুক জুড়ে জমাট বাঁধে চাপা অভিমান। এর চেয়ে বিদেশ-বিভুঁইই তো ভালো ছিল শতগুণ। অযত্নে, অনাদরে মরতে হত সেখানেও, কিন্তু বুকের ভেতরের বিশ্বাসটা অমন করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত না। সেখানে অন্তত এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে মরতেন যে, আপনজনদের মধ্যে ফিরলেন না বলেই এতটা কষ্ট পেতে হল। একটিবার যদি ফিরে যেতেন জন্মভূমিতে, আপনজনদের কাছে, তারা নির্ঘাৎ আদরে, সোহাগে, সেবাযত্নে ভরিয়ে দিত যজ্ঞেশ্বরদাদুর শেষ জীবনটা। এমন সর্বস্ব হারিয়ে চলে যেতে হচ্ছে, এই দুঃখটাই যে অষ্টপ্রহর কুরে কুরে খাচ্ছে যজ্ঞেশ্বরদাদুকে।

বিশ্বাস হারানো তো সর্বস্ব হারানোর সামিল।

অনেকদিন যাবৎ যজ্ঞেশ্বরদাদুর বাড়িতে গাঁয়ের মানুষের যাতায়াতটা কমে আসছিল। কাজকর্ম ছেড়ে কেনই বা যাবে মানুষ! মাগনায় ওই সারাক্ষণ রাজা-বাদশা-মারা গল্প শুনতে বয়েই গেছে তাদের। তাও কিছুদিন আগে অবধি গল্পগাছার শেষে সিন্দুকের তলানি হিসেবে দুটো বড়-এলাচ, এক টুকরো বিলিতি ফিটকিরি বা ওই জাতীয় কিছু এগিয়ে দিতেন শ্রোতাদের দিকে। কিন্তু ডাকাতির পর, একেবারে যাকে বলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। কাজেই, মানুষজনও ধীরে ধীরে বুড়োর ভিটে মাড়ানো ছেড়েই দিল।

কেবল বাচ্চারাই যেত তখনও অবধি। তারাও অবশ্যি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল, সিন্দুকের মাল কমে আসছে ক্রমশ। কারণ, প্রথম প্রথম যতটা পরিমাণ পেত রোজ, একটু একটু করে কমে আসতে লাগল তা। যজ্ঞেশ্বরদাদু অবশ্য ওই কমতিটা পুষিয়ে দিচ্ছিলেন গল্প দিয়ে। দেশ-বিদেশের কত আজব-আজব গল্পেরই না সঞ্চয় ছিল তাঁর ঝুলিতে। শুনতে শুনতে বুঁদ হয়ে যেতে হয়, এমনিই তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি। সবচেয়ে অবাক লাগত এটাই ভেবে যে, ওইসব স্বপ্নের দেশগুলিতে দস্তুর মতো গেছেন মানুষটি। গেছেন, থেকেছেন, যা-সব বলছেন, স্বচক্ষে দেখেছেন সবকিছু। নইলে, ওইসব মুলুকের গাছ, ফুল, নদী, পাহাড়, জীবজন্তু, পশুপাখি..., মানুষ,...তাদের হাজারো বৈচিত্র্য... না দেখলে এমন ছবির মতো বলতে পারে না মানুষ। মিলিটারিতে থাকাকালীন নাকি অর্ধেক দুনিয়া চষেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাবুলে, এবং শেষের দিকে বার্মায় ছিলেন। তারপরও ঘুরেছেন কোন্ কোন্ মুলুকে। রোজ রোজ

তাঁর সেই সারাজীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার কৌটোটি খুলে দেন বাচ্চাদের সুমুখে। বাচ্চাদের কাছে সেসব গল্পগাথা আখরোট-কিশমিশের চেয়ে কম উপাদেয় নয়। কাজেই, সিন্দুকের মালপত্তর ফুরিয়ে গেলেও বাচ্চাদের আনাগোনায় বড় একটা ভাঁটা পড়ল না।

গল্পগাথা ফুরোলে পর সবশেষে যজ্ঞেশ্বরদাদু বলেন, 'ঘুরতে ঘুরতে একদিন বুড়ো হয়ে গেলাম। তখন মনে পড়ল গাঁয়ের কথা। জন্মভূমির কথা। তোদের কথা। ভাবলাম, মরতে হলে অন্তত জন্মভূমিতে গিয়ে মরি। আপনজনদের মধ্যে। নিজের মানুষের কাছে গিয়ে মরেও সুখ।'

যজ্ঞেশ্বরদাদুর গায়ে এক ধরনের লাল চাকা চাকা ঘা ছিল। জমি-জিরেত আর সিন্দুকের প্রেমে পড়ে খুব একটা গা করেনি কেউ। ক্রমশ ঘাগুলো প্রকট হল সারা শরীরে।

প্রথম প্রথম সবাই ভাবল, দাদ্‌গোছের কোনও চর্মরোগ। চিকিৎসাও হল কিছুদিন, কিন্তু সারে না।

একদিন কে যেন আবিষ্কার করে ফেলল, দাদ্ নয় খোস নয়, এ হল শরীরের অন্তর্গত যৌনব্যাধির বহিঃপ্রকাশ। সিফিলিশ জাতীয় রোগ এটা। মিলিটারিতে আজীবনকাল থাকবার দরুন যৌন সংসর্গে পড়বার পরিণতি।

কথাটা যেই না ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে, অমনি মানুষজনের আনাগোনা যেটুকুও বা ছিল, একটু একটু করে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। বাচ্চাদেরও বারণ করে দেওয়া হল, যাতে ওরা গল্পের টানে বুড়োটার দোরে না যায়, কোনওক্রমেই ওর সংস্পর্শে না আসে।

কিন্তু বাচ্চারা রোগ-ব্যাধির গুরুত্ব অতশত বোঝে না। তারা আগে আসত দাঁত-ভাঙা বিস্কুট, আখরোট, পেস্তার টানে, এখন আসে স্রেফ দিন দু-বেলা অসম্ভব সব গল্পের টানে।

গল্প-টল্প শুনে ওরা একসময় যে-যার ঘরে ফিরে যায়, তারপর...সারাদিন...সারাটা দিন...একা একা শুয়ে-বসে সময় কাটান যজ্ঞেশ্বরদাদু। কিন্তু একটা পুরো দিনের দীর্ঘ সময় যেন কিছুতেই আর কাটতে চায় না। লাঠি ঠুকে ঠুকে পড়শির, এমনকি গজাননদের বাড়িতে গেলেও ওরা অস্বস্তি বোধ করে। কিনা, 'কালব্যাধি সর্ব অঙ্গে ধারণ করিয়া কেমন দুনিয়াময় ঘুরিয়ে বুলছে দ্যাখ দেখি! কাচ্চা-বাচ্চা লিয়া ঘর করি আমরা...। একটা বিবেচনা থাকবে তো মানুষের!'

কাজেই, কেউ কেউ প্রথমে ঠারেঠোরে, পরে সরাসরি শুনিয়া দেয় কথাটা।

শুনতে শুনতে একটা সময় এল, যখন অন্যের দুয়োরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। ফলে, সারাদিন, সারারাত তাঁর নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই কেটে যায়।

ক্রমে, যতই দিন যায়, দেহে-মনে অথর্ব হয়ে যেতে থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। দেহের চেয়ে মনের অসুস্থতা বেড়ে যেতে থাকে ঢেরগুণ বেশি। শেষ বয়েসে যে মনোবল নিয়ে ফিরে এসেছিলেন আপনজনদের কাছে, নিজের মানুষের সান্নিধ্যে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন, সেটা একেবারেই ভেঙে গেছে। তার ওপর দিন দিন শরীরের বলটুকুও বিদায় নিচ্ছে। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে বসতে কষ্ট। অল্পস্বল্প হাঁটাহাঁটি করলেই মাথা ঘুরে যায়। হাঁটু টনটন করে। ফলে, ইদানীং সারাক্ষণ পারতপক্ষে শুয়ে কিংবা বসেই থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু।

সারা গাঁয়ের মধ্যে এখনও অবধি একটি মানুষ তাঁকে পুরোপুরি ছেড়ে যায়নি। সে হল বল্লভের বউ শিখা। মানুষের উপকার করতে পেলে সে আর কিছুই চায় না। এমন কি শত্রুর উপকার করেও আনন্দ পায় সে। আর, কোনও ব্যাপারে কারও কোনও নিষেধাজ্ঞা সে কস্মিনকালেও শোনে না।

ইতিমধ্যে বল্লভদা'র সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বল্লভদা আবার বিয়ে করে বেলদাবাজারে ডেরা পেতেছে। শিখা বউদি থাকে শ্বশুরের ভিটেয় একটিমাত্র ছেলেকে নিয়ে। সে তার নিজের লড়াই লড়ছে। বড় কঠিন লড়াই তা। কিন্তু নিজস্ব লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সে রোজ এসে যজ্ঞেশ্বরদাদুর জন্য কিছু রেঁধে রেখে যায়। এ ব্যাপারে কারও বারণই শোনে না। এমনকি যজ্ঞেশ্বরদাদুও অনুযোগ করলে মুচকি হেসে বলে, 'এ গাঁয়ে যখন ঢুকেছিলে, প্রথম চায়ের গেলাসটি কে তুলে দিয়েছিল তোমার হাতে? শেষ

বার্লির গেলাসটিও আমিই তুলে দেব।'

ইদানীং আর শক্ত খাবার খেতে পারেন না যজ্ঞেশ্বরদাদু। সাগু-বার্লিই খান। শিখা বউদি সারা দিনের সাগু-বার্লি রেঁধে, ঢাকা দিয়ে যায়। সারাদিন কিস্তিতে কিস্তিতে তাই খান যজ্ঞেশ্বরদাদু। ওই মেয়েটা এলে তাও যাহোক সামান্য সময় মানুষের মুখ দেখতে পান তিনি। আর তো কেউই ভুলেও আসে না তাঁর বাড়ি। কামাখ্যারা তো বহুদিনই পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে আনাগোনা। খাবারও পাঠায় না ওরা। জমিজিরেতগুলো কিন্তু ভোগ করছে যথারীতি। যজ্ঞেশ্বরদাদুর মাঝে মাঝে মনে হয়, ওগুলো কামাখ্যার থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেন। কিন্তু পরক্ষণেই গুটিয়ে নেন তেমন ইচ্ছেটাকে। কাকেই বা দেবেন! সবাই তো একই ডালের পাখি। এ দুনিয়ার সবাই নেমকহারাম। ধান্দাবাজ।

ফুল্লরার গৌর-নিতাইয়ের নামে জমিগুলো দিয়ে দিবার কথাটা মনের মধ্যে ঘাই মারছিল কিছুদিন। ফুল্লরাকে ডেকে নিয়ে বলেও ছিলেন। ফুল্লরা হেসে এড়িয়ে গেছে প্রস্তাবটা।

ফুল্লরাও আসেনি কতদিন!



রোজকার মতোই, সকাল নাগাদ শিখা বউদি এসে সারাদিনের মতো বার্লি ফুটিয়ে রেখে গেছে।

তারপর এসেছে স্কুল-ফেরত বাচ্চাগুলো।

তারাও যখন চলে গেল, তখন তিনি গল্প শুরু করলেন চড়ুই পাখিদের সঙ্গে। যে কুঠরিটাতে অষ্টপ্রহর শুয়ে থাকেন তিনি, ওই ঘরের মেঝেতেই ছড়িয়ে রাখেন চাল-খুদের দানা। তাও কি পাখিগুলো কুঠরির ভেতর ঢুকতে চায়! মানুষ জাতটাকে যে তিলমাত্র বিশ্বাস করে না ওরা। মানুষের মতো পাজি জাত তারা তো আর দেখেনি। তাও, ধীরে ধীরে...রয়ে সয়ে...বুকের মধ্যে অনেক সাহস সঞ্চয় করে, যজ্ঞেশ্বরদাদুর অনুনয় ফেলতে না পেরে, এবং সর্বোপরি লোভনীয় খাদ্যের টানে, ইদানীং অবোধ পাখিগুলো ঢুকে পড়ে কুঠরির ভেতরে। এখন তাঁকে আর ততখানি ভয় পায় না ওরা। যখন মেঝে থেকে চাল-খুদের দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে পাখিগুলো, যজ্ঞেশ্বরদাদু তখন ওদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেন। খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ওরা তাঁর সঙ্গে কিচিরমিচির করে যৎকিঞ্চিৎ গল্পগুজব চালায়। ওই পাখিগুলোই তখন তাঁর কথা বলবার সঙ্গী। চড়ুই পাখিদের কথা তিনি শিখে নিয়েছেন অল্পস্বল্প। এখন আর ওদের কথা বুঝতে বড় একটা অসুবিধে হয় না। কষ্ট হয় না নিজের কথাগুলোও ওদেরকে বোঝাতে। শুয়ে শুয়ে ওদের হরেক প্রশ্ন করেন তিনি। তথাকথিত আপনজনদের নিয়ে অনেকানেক কূট প্রশ্ন। জবাবও পেয়ে যান পাখিদের ভাষায়। ওদের কোনও কোনও আওয়াজকে প্রশ্ন বলে মনে হয় তাঁর। জবাব দিয়ে দেন নিজের ভাষায়। চড়ুইগুলো ঠিক বুঝে নেয় যজ্ঞেশ্বরদাদুর ভাষা। সেটা বোঝা যায় ওদের পরবর্তী কার্যকলাপে। তিনি হাত নেড়ে চলে যেতে বললে, ওরা উড়ে পালিয়ে যায়, ধমকে চুপ করতে বললে কয়েক দণ্ড কিচিরমিচির করে না।

কিন্তু একসময় ওরাও তো চলে যায়। চলে যেতে হয় ওদের, কেন কি, মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়া চাল-খুদের দানাগুলোতে তো ওদের সবাইয়ের পেট ভরে না। কাজেই, বাড়তি খাদ্যের সন্ধানে ওদের বেরোতেই হয়। তবে পাড়ার বাচ্চাগুলো যেমন গল্পটি শোনা হল, অমনি হাঁটা দিল বাড়ির পানে, বাড়তি একদণ্ডও রইল না, পাখিগুলো অতটা ধান্দাবাজ নয়। খাওয়া-দাওয়া ফুরোলেও ওরা দু-চার দণ্ড বাড়তি থেকে যায় নিঃসঙ্গ মানুষটির কুঠরিতে। একসময় অবশ্য ওদের ছেড়ে দিতেই হয়। নইলে যে ওদের দিনভর খালি থেকে যাবে পেট।

শেষ মুহূর্তে যজ্ঞেশ্বরদাদু ওদের পিছু ডাকেন। বলেন, 'শোন্, শোন্।'

ওদের মধ্যে দু-চারটে চলে যেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থেকে যায় আরও দু-চার দণ্ড। মেঝের থেকে শেষ দানাগুলি খুঁটে নিতে থাকে।

যজ্ঞেশ্বরদাদু বলেন, 'হ্যাঁ রে, তোরা ফুল্লরার বাড়ির দিকে যাস নে? দেখা হলে আমার খবরটা দিস

তো ওকে। বলিস্, তোমাকে একটিবার যেতে বলেছে। একটিবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে তোমায়। মনে করে বলিস কিন্তু। খাবার-দাবারে মজে গিয়ে ভুলে যাস নে যেন। আর, সাউপাড়ার দিকে তো মাঝে-মধ্যেই যাস তোরা, ললিত সাউয়ের সঙ্গে দেখা হয় তোদের? আমার কথা কিছু বলে? সে ছিল আমার ছেলেবেলার জিগরি দোস্ত। যখন ফিরে এলাম, আমাকে দেখে কতই না খুশি হয়েছিল সে এবং তার বউ। কেন যে আমাকে ভুলে গেল সবাই!'

বাস্তবিক, শিখা বউদি এসে রেঁধে বেড়ে চলে যাবার পর সারাদিন ধরে যজ্ঞেশ্বরদাদুর জীবনে সে এক নিশ্ছিদ্র একাকীত্ব। কেবল ওই বাচ্চাগুলোই ওঁর তখন ভরসা। ওরাই এখনও অবধি আসে দিনের কোনও একটা সময়ে। তাও সবাই নয়। যাদের মধ্যে গল্পের ক্ষিদে বেশি এবং যারা বাপ-মায়ের অবাধ্য, তারাই কেবল আসে। গল্পের টানেই আসে ওরা। যতক্ষণ গল্প চলে, বসে থাকে। গল্প থামলেই ওরা পায়ে পায়ে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। তখন আর একটুক্ষণও ধরে রাখা যায় না ওদের।

সেই কারণেই রোজ সকালে উঠে যজ্ঞেশ্বরদাদু একটা দীর্ঘ গল্পের মুসাবিদা করতে থাকেন মনে মনে। প্রতিজ্ঞা করেন, যেভাবেই হোক আজ যত বেশিক্ষণ সম্ভব গল্প বলে বাচ্চাগুলোকে ধরে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

কিন্তু পারেন না। অল্পক্ষণ কথা বলেই গলা শুকিয়ে যায়। জিভ জড়িয়ে আসে। তার মধ্যেও তাঁকে চালিয়ে যেতে হয় গল্প, কেন কি, গল্পের টানেই তো বাচ্চাগুলো এখনও অবধি আসে-টাসে, সামান্য সময়ও তো ওদের সান্নিধ্যে কাটানো যায়। মানুষের সান্নিধ্যে। কিন্তু একটুক্ষণ বাদেই গলার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে যজ্ঞেশ্বরদাদুর। জিভ জড়িয়ে আসে। উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

শুনতে শুনতে একসময় বাচ্চারা অনুযোগ করে, 'ও দাদু, তুমি এমন ফিস্‌ফিস্ করিয়া গল্প বলতিছ কেন? শুনতে পাচ্ছিনি যে আমরা।'

যজ্ঞেশ্বরদাদু আপ্রাণ চেষ্টা করে গলার স্বর অল্পস্বল্প তোলেন। কিন্তু একটু বাদেই পুনরায় হাঁফাতে থাকেন তিনি। ঢোঁক গিলতে থাকেন জোরে জোরে। ঢকঢকিয়ে জল খান। কিন্তু তাও বেশি কথা বললেই জিভ জড়িয়ে আসে। গলার স্বর নেমে যায়।

বাচ্চারা বুঝে ফেলে, গল্পটা আর শেষ করতে পারবেন না মিলিটারি-দাদু। তারা উঠে দাঁড়ায়, 'আজ যাই দাদু, বাকিটা পরে শুনবো।'

—'পরে শুনবি কী রে?' যজ্ঞেশ্বরদাদু সহসা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। শরীরের তাবৎ শক্তি গলায় জড়ো করে বলেন, 'এইবারেই তো শুরু হবে আসল গল্পটা। মজার জায়গাটা তো এইবার আসবে।'

—'আসুক।' বাচ্চারা খুব নিষ্ঠুরভাবে হাঁটা দেয় যে-যার বাড়ির দিকে,—'ওই মজার জায়গাটা কাল আসিয়া শুনবো।'

বাচ্চাগুলোকেও বড় একটা দোষ দেওয়া চলে না। তারা তো কেবল ওই গল্পের টানেই আসে। এছাড়া তো আর কোনওই আকর্ষণ নেই তাদের যজ্ঞেশ্বরদাদুর কাছে। বরং ইদানীং তাঁর কাছে আসবার ঝুঁকি অনেক। কীসব ছোঁয়াচে ব্যাধি রয়েছে নাকি মানুষটার শরীরে। বাপ-মার তাই কড়া হুকুম, খবরদার যেন বাচ্চাগুলো না যায় ওঁর কাছে। বাচ্চাগুলো স্কুল-ফেরত লুকিয়ে-চুরিয়েই আসে। তারা জানে, কথাটা ওদের বাপ-মায়েদের কানে কোনও গতিকে ফাঁস হয়ে গেলে দুঃখ আছে কপালে। তাও ওরা আসে, কেবল ওই গল্পের টানে। সেটাই যদি বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে তো কীসের টানেই বা তারা বাপ-মায়ের দাবড়ানিকে অগ্রাহ্য করে ছুটে আসবে মিলিটারি-দাদুর কাছে!

বাচ্চাগুলোও তাই রোজ রোজ যজ্ঞেশ্বরদাদুর ওইসব গল্পের প্রতি একটু একটু করে আসক্তি হারিয়ে ফেলছে। যজ্ঞেশ্বরদাদু বেশ বুঝতে পারছেন তা।

তাবাদে, শুধু তো চিঁ-চিঁ করে কথা বলা নয়, গল্প বলতে বলতে ইদানীং মিলিটারি দাদু কাহিনির ধারাবাহিকতা এবং পারম্পর্যও যে হারিয়ে ফেলেন পদে পদে। ইদানীং রোজ রোজ একই ব্যাপার ঘটে। গল্পের খেই যায় হারিয়ে। স্মৃতি ঘন ঘন প্রতারণা করে। বাপকে ছেলের দাদা বানিয়ে দেন, জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন শাশুড়ির, শীতকালে আম ফলিয়ে দেন গাছেগাছে...। ধরা পড়ে গিয়েও লজ্জা

পান না তেমন। হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, ভুল হয়ে গেছে দাদুভাই, আম নয়, কমলালেবুর বাগান। ফল পেকে একেবারে লাল হয়ে রয়েছে। শীতে তো কমলালেবু ফলে, দাদুভাই।'

বাচ্চা হলেও ওরা ততক্ষণে বুঝে ফেলে, এ এক বিরাট ফাঁকি। কোনওগতিকে জোড়াতালি দিয়ে সামাল দিলেন মিলিটারি-দাদু। তারপর আর গল্পটা জমে না তেমন। উশখুশ করতে করতে একসময় উঠে দাঁড়ায় বাচ্চারা। 'চলি দাদু, দেরি হইলে মা বকবে।'

ওদের বিদেয় দিতে মন চায় না যজ্ঞেশ্বরদাদুর। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠেন, 'তাহলে, বিকেলে আসিস। আসবি তো? ওই গল্পটা তো তোদের বলাই হয়নি।'

—'কোন্ গল্পটা?' বাচ্চারা আশায়-নিরাশায় দুলতে দুলতে মুখ ফিরে তাকায়।

—'সে এক মজার দেশের গল্প দাদুভাই। সে-দেশে এক জাতের পাখি আছে, টিয়েবই এক জাত ওরা, কথা বলে ইংরেজিতে। তাদের বলে টকিং-বার্ড।'

—'এমনি এমনি কথা বলে?' বাচ্চাগুলো চোখে মুখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে তাকায়।

—'এমনি এমনি।'

—'কোউ শেখায় না?'

—'কেউই শেখায় না। তোমরা এসো না বিকেলে। সেবার কথা-বলা পাখিদের রাজ্যে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল আমার! সেই গল্পটাই বলব তোমাদের। উহ্, সে এক অভিজ্ঞতা!'

বাচ্চারা একরাশ সন্দেহ নিয়ে তাকায় মিলিটারি-দাদুর দিকে। দোনোমনো করে ফিরে যায় যে-যার ঘরে। বিকেলে আসার ব্যাপারে চটজলদি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ওরা, কেন কি, দাদুর সম্পর্কে ইদানীং তাদের যাবতীয় টান, মোহ, বেশ ফিকে হয়ে এসেছে। ইদানীং যতটা গর্জাচ্ছেন দাদু, ততটা বরষাচ্ছেন না। অনেকখানি জল মেশাচ্ছেন দুধে। ইদানীং আর রঙ থাকছে না। ঠিক যেন নারানগড়ের তাঁবু-খাটানো সিনেমা। ফি-হপ্তায় পোস্টার সেঁটে দিয়ে যায় গাঁয়ের যত্রতত্র। ইস্কুলে, ক্লাবঘরের দেয়ালে, নাটমণ্ডপে, বাসন্তীতলায় ..। এক পোস্টারেই প্রায় গোটা কাহিনির মর্মার্থ ঠেসে দেওয়া থাকে। নাচ-গান, দুর্ধর্ষ মারামারি, মেসিনগান হাতে দৈত্যের মতো মানুষ, আকাশে হেলিকপ্টার উড়ছে...। ওই পোস্টারটি দেখা মাত্তর আদেখলার মতো কাছা খুলে দৌড়তে থাকে গাঁয়ের তাবৎ জোয়ান ছোকরা। আগলবাগল হয়ে দেখতে যায় কম-বয়েসি বউড়ি-ঝিউড়ির দল। ফিরে এসে সবাইয়ের মুখ থমথমে। মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াতে থাকে পুরো একটি বেলা। একসময় অন্তরঙ্গদের কাছে উগরে দেয় ক্ষোভ। দুশ শালা, এ একটা সিনিমা হইল? দুর...দুর, বাজে। লাচ গান নাই, মারপিট নাই।'

—'সেকি!' শুনে সমবয়েসীরা তাজ্জব,—তবে যে পোস্টার জুড়িয়া খালি লাচ-গান, মারামারি? সেসব কিছুই নাই?'

—'আছে, তবে নামমাত্র। অথচ পোস্টার দেখিয়া মনে হয়, কতই না লাচগান, মারপিট!'

ইদানীং বাচ্চাগুলোরও তেমনটাই মনে হয়। দাদু তার গল্পের যে পোস্টারটি দেখায়, ইদানীং প্রায় ক্ষেত্রেই গল্পে ওগুলো থাকছে না। কাজেই মিলিটারি-দাদুর হাজার লোভ দেখানোতেও তেমন করে বাজে না বাচ্চাগুলো। বলে, 'দেখি—যদি বাবা-মা ছাড়ে—, যদি মিসিন-কলে ধান কুটতে না যাই—।'

—'কী যে বলিস তোরা!' এতক্ষণে বুঝি সামান্য বিরক্ত হন যজ্ঞেশ্বরদাদু,—'মানুষের মতো কথা বলা পাখির দেশ,... ওই দেশের গল্প..., সেটা ছেড়ে ধান কুটতে যাবার কথা মনে এল তোদের? না এলে পস্তাবি কিন্তু। সে পাখি মানুষের গলায় গানও গায়।'

ওরা চলে যায়। ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। ঘরের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায় চড়ুইয়ের দল। কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে কত কথাই না বলে চলে ওরা। ভাগ্যিস ওদের ভাষাটা শিখে নিতে পেরেছেন যজ্ঞেশ্বরদাদু, তাই পাখিগুলোর কথাবার্তা শুনতে শুনতে কেটে যায় অনেকখানি সময়। ওরা অবশ্য একটু বাদেই উড়ে যায়। আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। কাজেই, তখন

জানলার ফাঁক দিয়ে চোখ চারিয়ে ভাব জমাতে হয় জানলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা নিমগাছটার ডালে বসে থাকা কাঠবিড়ালিটার সঙ্গে। কাঠবিড়ালিগুলো এমনিতেই বেজায় ছটফটে। খুবই চঞ্চল। ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তেমন সুখ হয় না। এই রয়েছে এ-ডালে তো পরমুহূর্তে ও-ডালে। দু-দণ্ড সুস্থির হয়ে থাকতে জানে না ওরা। তাও ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান যজ্ঞেশ্বরদাদু। একেবারে মনের মতো সঙ্গী কোথায় পাবেন এই অথর্ব বয়েসে!

কাঠবিড়ালিটা চলে গেলে পর, আবার একলা হয়ে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। একেবারেই শুনশান একলা।

তখন যেন কিছুতেই আর কাটতে চায় না দিন। সময়টাকে অনন্ত বলে মনে হয়। সকাল থেকে দুপুর...বিকেল...সন্ধে...রাত...সারারাত...এমনি করে শেষ হয় একটি দিন...। দণ্ডেদণ্ডে, পলে পলে...। নিঃসঙ্গ...একেবারেই নিঃসঙ্গ। আর, একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেই শুরু করতে হয় লড়াইটা। দিনভর রাতভর চলতে থাকে। এক সময় অবসন্ন হয়ে আসে শরীর,... মন...। দুর্দমনীয় শত্রুটি কী এক নিষ্ঠুর আক্রোশে ভারি হয়ে চেপে বসে তাঁর ওপর। একটু একটু করে তাঁকে মৃতবৎ করে তোলে। তখন শত্রুটার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য এক কিসিমের বর্ম বেছে নেন তিনি। বর্মটির নাম স্মৃতি। একেবারে স্মৃতির গভীরে গিয়ে আশ্রয় নেন। ডুবে যান পুরনো দিনের কথায়।

স্মৃতি অবশ্য বড়ই প্রতারক। ইদানীং আর চাইলেও পুরনো দিনগুলোকে এনে ঠিকঠাক হাজির করতে পারেন না। যা-যেটুকু আসে, এলমেলো, পারম্পর্যহীন, অসম্পূর্ণ। তবুও, ওদের আড়ালেই এমন করে লুকিয়ে থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু, শত্রুটার উপস্থিতি টের পান না। হয়ত বা শত্রুটাও খুঁজে পায় না ওঁকে।

বাস্তবিক, ইদানীং ওই বর্মটাই তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই বাঁচিয়ে দেয়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। ময়লা, শতচ্ছিন্ন কাঁথায় শুয়ে শুয়ে দিনভর, রাতভর কতই না ভাবনায় ডুবে যান তিনি। কখনও কখনও মনটা ফোঁপরা বাঁশের মতো লাগে, আর তখনই তাঁর মনে হয়, কী লাভ হল এই শেষবেলায় আপনজনদের মধ্যে ফিরে এসে!



ইদানীং পড়ার চাপে বাড়ি যাবার সময়ই পাই নে। কদাচিৎ গাঁয়ে গেলে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও অন্তত একটিবার যজ্ঞেশ্বরদাদু-দাদুর কাছে যাই। দেখে আসি তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা। শুনে আসি তাঁর লড়াইয়ের গল্প। প্রত্যক্ষ করে আসি সেই লড়াইয়ের আয়ুধগুলিকে।

ইদানীং তিনি দিনভর শুয়ে থাকেন তাঁর আলো-হাওয়াহীন কুঠরিতে। সামনের ঘুলঘুলি দিয়ে তিনি পথচলতি রাস্তাটার ওপর চোখ বিঁধিয়ে রাখেন, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়েন। তবে, নিটোল ঘুম আর আসে না ইদানীং চোখে।

আমাদের সামনে প্রায় হাহাকারের ভঙ্গিতে বলেন, 'একটু যদি ঘুম আসত, বুঝলি শঙ্কর, দিনের কিংবা রাতের যে-কোনও প্রহরে, বেঁচে যেতাম।'

বলেন, ঘুম যে মানুষের ওপর ঈশ্বরের কী এক বিরাট আশীর্বাদ, আমি দিনরাতে হাড়ে হাড়ে টের পাই তা। অথচ একদিন ছিল, যখন আমি না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতাম তিন-চার রাত অনায়াসে। তখন হরবখ্‌ত বলতাম, কী দরকার ঘুমের? কেন যে অলস মানুষগুলো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করে জীবনের মূল্যবান সময়টুকু!'

কিছুদিন যাবৎ যজ্ঞেশ্বরদাদু তাঁর এক শত্রুর কথা বলছিলেন। ভিনদেশে থাকাকালীনই নাকি শত্রুটা মুখ দেখাচ্ছিল মাঝে মাঝে। চারপাশ থেকে নাকি ঘিরে ফেলছিল যজ্ঞেশ্বরদাদুকে। তাই জন্যেই না শেষবেলায় তার থেকে পালাতে শুরু করেছিলেন তিনি। পালাতে পালাতে মনে হয়েছিল, নিজের মানুষগুলির কাছেই যাই। সেটাই তো স্বাভাবিক। সেটাই তো সবাই করে। কোনও শত্রু তাড়া করলে, স্রেফ নিরাপত্তার সন্ধানে মানুষ তো নিজের বাড়ির দিকেই ধাওয়া করে। আপনজনদের কাছেই তো পৌঁছতে চায়।

এখন বুঝি, যজ্ঞেশ্বরদাদুর সেই পরম শত্রুটির নাম সময়। একলা পেলেই একেবারে ভারি হয়ে চেপে

বসে তাঁর বুকের ওপর। তখন একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মানুষজন কাছে থাকলে, সারাক্ষণ কলকল করতে থাকলে, শত্রুটা পাশে ভেড়ে না। কিন্তু একলাটি হয়ে গেলে, তখন সে এক দুর্বিষহ অবস্থা তাঁর! যেসব মানুষের প্রতি অখণ্ড ভরসায় যজ্ঞেশ্বরদাদু ফিরে এসেছিলেন নিজের মুলুকে, যাদের নিয়ে নিজের নিরাপত্তা-বলয়টি বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই মানুষগুলোই কেমন বেমালুম ভুলে গেল ওঁকে কেমন তাঁকে সবদিক থেকে একলাটি করে দিয়ে কেটে পড়ল একে একে! এখন পাখিপাখালই তাঁর একমাত্র ভরসা। তাদের সান্নিধ্যেই দিনের অন্তত কিছুটা সময় কাটাতে পারেন।

ইদানীং ঘরের মধ্যে একা একা শুয়ে শুয়ে কত কথাই না মনে আসে যজ্ঞেশ্বরদাদুর। বিড়বিড় করে সারাক্ষণ নিজের সঙ্গেই বলতে থাকেন কতকিছু কথা। মানুষের জীবন, কর্মাবলী..., তার ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান...। ঘোলাটে হয়ে আসে চোখের মণি। আক্ষেপে ভারি হয়ে আসে গলা। ইদানীং একান্তে নিজেকেই বাহবা দেন,—ভাগ্যিস, পাখ-পাখালের ভাষাটা শিখে নিতে পারলাম! মানুষের ভাষা তো দেখছি শেষ জীবনে কোনও কাজেই লাগল না।

সহসা পাশ থেকে কেউ বলে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক।'

চমকে তাকান যজ্ঞেশ্বরদাদু। সারা মুখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে খুঁজতে থাকেন বক্তাটিকে। এক সময় পেয়েও যান। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। দেওয়ালের আনাচে-কানাচে কোথায় যেন থাকে ও। মাঝে মাঝে আড়াল থেকে কথার পিঠে কথা বলে ওঠে। এমনকি, এতটাই ক্ষমতা ওর, যজ্ঞেশ্বরদাদু মনেমনে কিছু ভাবলেও তা কেমন করে যেন বুঝে ফেলে ও আড়াল থেকেই। ভাবনাটি মনোমতো হলে, আড়াল থেকেই বলে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক।'

মাঝে মাঝে অবশ্য চোখের সামনে হাজির হয়, তবে অধিকাংশ সময়েই নিখোঁজ। নিজেকে দিনভর এতটাই লুকিয়ে রাখে যে, যজ্ঞেশ্বরদাদু প্রায়সময়ই ভুলে যান ওর কথা। শুধু কথাবার্তা কিংবা ভাবনা-চিন্তার মধ্যিখানে হঠাৎ-হঠাৎ তার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠতে হয়।

যখন গল্পের আড্ডায় বাচ্চাদের কেউই তার কথা বিশ্বাস করছে না বলে বিরক্তিতে তেতো হয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বরদাদুর মন, তখনই দেয়ালের মাথা কিংবা দরজার আড়াল থেকে আচমকা সে সুস্পষ্ট গলায় বলে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক'।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান যজ্ঞেশ্বরদাদু। প্রাণীটা সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে, নিজের অস্তিত্বটুকু জানতেও দেয় না অধিকাংশ সময়, কিন্তু কেমন সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনে যায় সর্বক্ষণ! সবাই যখন অন্যমনস্ক, শুনছে কি শুনছে না, তখনি সে কোন্ আড়াল থেকে বলে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক'। অর্থাৎ 'বলে যাও তুমি, কেউ না শুনুক আমি শুনছি। বড়ই মূল্যবান কথাগুলো। ভারি সত্যি।' এমন মনোযোগী শ্রোতা যজ্ঞেশ্বরদাদু তাঁর এত বছরের জীবনে আর পাননি বললেই চলে। ওই এক টেপ-রেকর্ডার ছাড়া।

বাস্তবিক টেপরেকর্ডারও এক আশ্চর্য প্রাণী। যজ্ঞেশ্বরদাদুর মতে এমন অদ্ভুত প্রাণী বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই এই দুনিয়ায়। আড্ডায়, জলসায়, সবাই যখন হাজারো কলরবে ভেঙে পড়েছে, ও তখন এককোণে বসে নিঃশব্দে শুনে চলেছে সবাইয়ের কথাবার্তা, গান, বিতণ্ডা, চিৎকার, স্বগতোক্তি...। এমন সংযম আর কোনও প্রাণীর মধ্যেই দেখেননি যজ্ঞেশ্বরদাদু। তবে টিকটিকির সঙ্গে তাকে এক আসনে বসানো চলে না। কেন কি, টেপ-রেকর্ডার তো আর প্রাণী জগতের কেউ নয়, নেহাতই নিষ্প্রাণ এক যন্ত্র, যদিও যজ্ঞেশ্বরদাদুর মাঝে মাঝে মনে হয়, যন্ত্রটির মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে প্রাণ। রয়েছেই। নইলে এত নিখুঁতভাবে শোনে কেমন করে? পরবর্তীকালে এমন নিখুঁতভাবে শুনিয়ে দেয় কেমন করে? কী করে গায় অমন জটিল গানগুলি অত নিখুঁত করে! তাই তো শুধু নয়, গানের মধ্যে গলার টানে, মিড়ে মিড়ে বিচরণের কালে মাঝে মাঝে একটু বাড়তি কিছু করে বসে, যেটা যজ্ঞেশ্বরদাদুর সন্দেহ, গায়ক তেমনটি করে গাননি। রেকর্ডারই খোদার ওপর কিঞ্চিৎ খোদকারি করেছে।

যজ্ঞেশ্বরদাদুর বাবা ছিলেন টোলের নামকরা পণ্ডিত। মাঝে মাঝেই বলতেন, 'শুধু প্রাণীদেহেই নয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে, প্রতিটি উদ্ভিদে, পাথরে, ধূলিকণায়, রয়েছে প্রাণ, সুপ্ত অথবা

জাগ্রত...। পরমা প্রকৃতির লীলাভূমি এই ব্রহ্মাণ্ডে জড় বস্তুও নিষ্প্রাণ নয়।'

ভাবতে ভাবতে ছেলেবেলার কত কথাই বুকের মধ্যে ঘাই মারে। কত স্মৃতি প্রাচীন মাছের মতো পিঠ ওলটায়...। তাঁর অতি প্রিয় টেপ-রেকর্ডারটির মধ্যে যে প্রাণের অস্তিত্ব মাঝে মাঝেই টের পেতেন তিনি, সেটা কোনও মতেই কল্পনাবিলাস বলে মনে হয় না তাঁর। বরং মাঝে মাঝে ক্যাসেটে, দু-গানের মধ্যবর্তী নিস্তব্ধ অংশগুলির থেকে অতি ক্ষীণ, সূক্ষ্ম আওয়াজ ভেসে আসত তাঁর কানে। মনে হত, কে যেন গাইছে, বাজাচ্ছে, বলছে কত কিছু...। কত দূরে যেন সমুদ্রের গর্জন...যেন শত কোটি মাইল দূরবর্তী...লক্ষ লক্ষ ঢেউ যেন অবিরাম আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে...। সব মিলিয়ে একটা সমবেত অর্কেস্ট্রা... অতি অস্পষ্ট...অতি ক্ষীণ...মিলিয়ে যায় পরক্ষণে, গানে-বাজনায়... আবৃত্তি, বক্তৃতায়...।

যজ্ঞেশ্বরদাদু বিস্মিত হয়েও বিশ্বাস করেন, তাঁর সেই প্রিয় টেপ-রেকর্ডারটি নির্দিষ্ট শব্দগুলি বাদেও আরও অনেক শব্দপুঞ্জ নিজের থেকে ধরে রাখে তার শরীরে..., যা কোনও দিন সচেতনভাবে রেকর্ড করেননি যজ্ঞেশ্বরদাদু। দেয়ালের ওই টিকটিকিটার সঙ্গে তুলনীয়, নিঃশব্দ মনোযোগী বলতে তাঁর ওই টেপ-রেকর্ডারটির কথাই মনে হয়, যার ধাতব অবয়বের মধ্যেই কোথাও, যজ্ঞেশ্বরদাদুর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ ছিল, যে কোনও রূপেই হোক, ছিল।

একদিন হারিয়ে গেল ওটা, হায়, সম্ভবত বার্মার জঙ্গলে।

এইভাবেই যজ্ঞেশ্বরদাদুর দিন কাটে, রাত কাটে। সময়টাকে অনন্ত মনে হয়। সকাল থেকে দুপুর...বিকেল...সন্ধে...রাত...সারারাত..., এমনি করে শেষ হয় একটি দিন...দণ্ডেদণ্ডে... পলেপলে...। পশু-পাখি, গাছগাছালির সঙ্গে কথা বলেও তাঁর খিদে মেটে না। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে না পারায় তিনি বুভুক্ষু থেকে যান। যাদের মধ্যে জন্ম নেওয়া, বেড়ে ওঠা, যাদের জন্য ঘর ছাড়া, যুদ্ধে যাওয়া, ফিরে আসা, সেই মানুষগুলিই যে একচিলতে বাক্যালাপ করতে যজ্ঞেশ্বরদাদুর থেকে চড়া মূল্য চায়!

শরীরের অন্তর্গত অনেক যন্ত্রণা।

গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। একতিল ঘুম হয় না রাতে। নিঃসঙ্গতা যেন ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খায়। নাড়িতে শেষ মুহূর্তের আগমন-বার্তা টের পান অহরহ। একা থাকলেই সে পা টিপে টিপে আসে। শিয়রে এসে দাঁড়ায়। তার কদাকার মুখ, ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান, সইতে পারেন না যজ্ঞেশ্বরদাদু।

ইদানীং আর বিছানা ছেড়ে এক মুহূর্তের তরে উঠতে পারেন না তিনি। কোনওগতিকে ঘসটে ঘসটে উঠোনে গিয়ে মলমূত্র সেরে আসেন। ফের এসে শুয়ে পড়েন। শুয়ে শুয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকেন।

শিখা বউদি যে সকালে এসে সারাদিনের মতো বার্লি ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে যায়, শিয়রে কুঁজোয় ভরে জল রেখে যায়, যজ্ঞেশ্বরদাদু কোনওদিন খান, কোনওদিন খান না। শুধু যতক্ষণ শরীরে কুলোয়, জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরে।

পুবদিকে এক চিলতে জানলা। ওই দিয়ে রোদ্দুর ঢোকে দিনের প্রথম প্রহরে। ছটফটে পাখির মতো রোদ্দুর। লেজ দোলাতে দোলাতে বসে জানলার শিকে, পাল্লায়, বিছানার এককোণে...। বেশিক্ষণ নয়, তারপরই সে উড়ে পালায়, চলে যায়। তারপর...যজ্ঞেশ্বরদাদুর বুকের ওপর এক অখণ্ড, অনন্ত, রৌদ্রহীন দিন... এক দীর্ঘ... অন্ধকার রাত...।

জানালা দিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন যজ্ঞেশ্বরদাদু। বাচ্চাগুলো স্কুলে যায়... ফিরে আসে... খেলতে যায়...। যজ্ঞেশ্বরদাদু ওদের চিঁ-চিঁ-গলায় ডাকেন,—আয়, আয় রে, একটা দারুণ গল্প শোনাব আজ।

এক নাগাড়ে ডাকাডাকি করলে পর দু-একজন অবশেষে আসে। এসেই অস্থির বায়না ধরে, 'কই, বল, গল্প বল।'

কথা বলতে পারেন না যজ্ঞেশ্বরদাদু। চোখদুটি বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ঠোঁটজোড়া কাঁপতে থাকে

তিরতিরিয়ে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়।

—'গল্প না বললে আমরা চলিয়াবো কিন্তু।' হুমকি দেয় বাচ্চার দল।

ফলে, প্রাণপণে চোখ খুলতে হয় যজ্ঞেশ্বরদাদুকে। ঠোঁটদুটিকে শরীরের প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়াতে হয়। এক্ষুনি গল্প শুরু না করলে চলে যাবে ওরা। আর, ওরা চলে গেলেই সে আসবে। শিয়রে এসে দাঁড়াবে। কদাকার মুখখানি নিয়ে, পাথরের চোখে তাকিয়ে থাকবে যজ্ঞেশ্বরদাদুর দিকে।

বাচ্চাগুলোর কাছে ইঙ্গিতে জল চান যজ্ঞেশ্বরদাদু।

একজন কলসি থেকে জল গড়িয়ে এনে ফোঁটা ফোঁটা জল ঢেলে দেয় ওঁর মুখে। যজ্ঞেশ্বরদাদু দু-চার ফোঁটা খেয়েই সরিয়ে নেন মুখ। শরীরের সমস্ত শক্তি এনে জড়ো করেন জিভের ডগায়। গল্প শুরু করেন অবশেষে।

'একদিন...একদিন...যুদ্ধ শেষ করে আমি ফিরে যাচ্ছি ডেরায়...আমি ফিরে যাচ্ছি...।'

—'ধেৎ!' বাচ্চাগুলো উঠে দাঁড়ায়,—'তুমি রোজ রোজ আশা দিয়া ডাক, কিন্তু গল্প বল না।'

ওরা চলে যায়।

আধো চেতনায় ওদের প্রাণপণে ধরে রাখতে চান যজ্ঞেশ্বরদাদু। হাতের আঙুলগুলি প্রাণপণে নাড়িয়ে ওদের চলে যেতে বারণ করেন। ঠোঁটজোড়া কাঁপিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, 'একদিন.. আমি...যুদ্ধশেষে...ফিরে যাচ্ছি ডেরায়...' ফিরে যাচ্ছি...ফিরে যাচ্ছি...ফিরে যাচ্ছি...।'

পরিচ্ছেদ সাত

বাস্তুসাপ, সে বড়ো আশ্চর্য প্রাণী



বিকেলে ভাতঘুম থেকে উঠে সবেমাত্র মদন দাসের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে গোপেশ দেখলেন, পশ্চিম আকাশটা ডগোমগো রক্তের মতো লাল, আর সাপটা শেফালির ঘরের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে। চৌকাঠের মুখেই সাপটাকে আচমকা দেখে ফেললেন গোপেশ।

মাত্র কিছুদিন হল সাপটাকে দেখছেন গোপেশ। গোপেশের ভিটের মধ্যেই কোথাও থাকে নির্ঘাত, গোপেশের চোখে পড়েনি এযাবৎকাল। হয়ত বা এই ভিটেরই মধ্যে কোনও গর্তে-কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শীতঘুমে ছিল। গরম হাওয়া গায়ে লাগামাত্র ইদানীং আড়মোড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। গোপেশ চকিতে দেখতে পান, সাপটার মুখের ভেতর থেকে চেরা জিভ লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে বারবার। দেখতে দেখতে নিঃশব্দে শিউরে ওঠেন গোপেশ।

এমনিতে সাপেদের তো বনে-জঙ্গলে, ঝোপেঝাড়ে থাকবার কথা। কিন্তু বাস্তুসাপ কেন জানি, গেরস্থের ভিটেটাকেই আদর্শ আশ্রয় বলে মনে করে। প্রথম-প্রথম হয়ত বা মানুষকে একটু-আধটু ভয়-ডর করে ওরা। কিন্তু ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেলে তখন খুব স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করে ভিটেময়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত শীতল সাবলীল গতিতে সে বাইরে বেরিয়ে যায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য। খেয়েদেয়ে আবার হেলতে দুলতে ফিরে আসে যথাস্থানে।

গোপেশের ভিটের মধ্যেও নির্ঘাত সাপটার বসবাস ছিল বেশ কিছুদিন। গোপেশ বুঝতে পারেননি। দিন কয়েক আগে আচমকা দেখে ফেললেন। তবে, তিনি দেখে ফেলবার আগেই ওটা শেফালির নজরে এসেছে কিনা সেটা অবশ্য জানা নেই গোপেশের। যতই হোক, শেফালিও এই ভিটেতে না-হোক বছর-তিনেক তো রয়েছেই। এই ভিটেতে বারো মাস, চব্বিশ ঘণ্টা বসবাস করবার সুবাদে, গোপেশের টের পাওয়ার ঢের আগেই তো শেফালিরই সাপটাকে দেখে ফেলা সম্ভব। ব্যাপারটা একটু একটু করে ভাবিয়ে তোলে গোপেশকে।

সাপটাকে দেখে ফেলবার পরমুহূর্তেই গোপেশ শেফালির মুখের ওপর চোখ রাখেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেফালির শরীরে সেই রহস্যময় অসুখটাকেও শনাক্ত করে ফেলেন।

এমনিতে শেফালি মানেই, এককালে সর্বাঙ্গে তার একঝাঁক পাখি কলকল করত সারাক্ষণ। চারপাশের মানুষজন, পাড়াপড়শি, এমন কি নিজের স্বামী-শ্বশুরের সঙ্গেও সারাক্ষণ হাসিঠাট্টায়, খুনসুটিতে মশগুল থাকত সে। দিবাকর মারা যাবার পরও তার শরীর থেকে পাখির ঝাঁকটা একেবারে উধাও হয়ে যায়নি। গোপেশও মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, পাখিগুলো থাক। আহা থাক। নইলে, এই কাঁচা বয়সে কী নিয়েই বা বেঁচে থাকবে মেয়েটা! সেই কারণে গোপেশই শেফালিকে সারাক্ষণ উসকে দিতেন। শেফালির শরীরের পাখিগুলোকে নানাজাতের দানাপানি জোগাতেন। বাস্তবিক, দিবাকরের অবর্তমানে শেফালিকে সদা-সর্বদা উৎফুল্ল রাখবার হাজারটা উপায় খুঁজে বের করতেন তিনি।

উৎফুল্লই থাকত শেফালি। তার মধ্যে উৎফুল্ল থাকবার একটা প্রবণতা রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকেই। মুখ গোমড়া করে বেশিক্ষণ থাকতেই পারে না। কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসে, আর কারোর

সঙ্গে কোনও কারণে মন কষাকষি হলে, ভাব না হওয়া অবধি বুঝি কিছুতেই স্বস্তি পায় না সে।

কিন্তু দিবাকরের চলে যাবার পর কিছুদিন মনমরা হয়ে থাকলেও সেই বিষণ্ণতাটুকু নিজ স্বভাবের গুণে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল শেফালি। গোপেশও তাকে যৎপরোনাস্তি সাহায্য-সহায়তা করেছিলেন। ধীরে ধীরে মনের ভেতরের স্ফূর্তি ভাবটা অল্প হলেও ফিরে এসেছিল, অন্তত বাহ্যত সবাইয়ের মনে হয়েছিল সেটাই। চিরকাল দেখন-হাসি মেয়েটার মুখে ইদানীং বিষণ্ণতার সেই জমাট ভাবটা দেখা যাচ্ছিল না। মানসিক সংকটটাকে ধীরে ধীরে বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারছিল শেফালি। কেবল ইদানীং মাঝে মাঝেই তার শরীর জুড়ে ফুটে বেরোচ্ছিল ওই অচেনা অসুখের লক্ষণগুলি। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয়, গোপেশ যেদিন শেফালির ভিটের মধ্যে সাপটাকে দেখতে পান, সেদিনই শেফালির শরীরেও ওই অচেনা অসুখটা আবিষ্কার করেন তিনি। যেন অসুখটা আচমকাই চাগিয়ে ওঠে শেফালির শরীর জুড়ে।

এই যেমন আজ। একটু আগে সাপটাকে দেখতে পেয়েছেন গোপেশ, আর পরমুহূর্তে দেখতে পেলেন, শেফালির ফরসা মুখখানিতে একটু একটু করে লাল আভা জমছে...। গোপেশ জানেন, এটা হল ওই রহস্যময় অসুখটারই পূর্বাভাস। এরপর লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে আরও প্রকট হবে। তার দু-চোখের মণি জুড়ে দেখা যাবে এক জাতের চাপা অস্থিরতা! ঠোঁটজোড়া তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকবে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বইবে দ্রুতলয়ে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কালে নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠবে। ঘনঘন শ্বাস নিতে থাকবে শেফালি। সারা মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠবে। বুকটা উথালপাথাল হয়ে ওঠানামা করবে। আর, চোখদুটো যেন একজোড়া চকচকে ধারাল ছোরা আড়াআড়ি বসানো, ছোরা দুটো একবার এদিক...তো একবার ওদিক...। এবং ওই মুহূর্তে গায়ে হাত না দিয়েও, পূর্ব অভিজ্ঞতাব থেকে গোপেশ কিংবা যে কেউ নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলবেন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে শেফালির।

গোপেশ দেখতে পান, ইতিমধ্যেই শেফালির ঠোঁটজোড়া তিরতিরিয়ে কাঁপতে লেগেছে, আলুথালু চুলের রাশ ঢেকে ফেলেছে মুখের অর্ধেকটা, সারা মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। ওর চোখের ছোরাদুটোকে দেখতে দেখতে গোপেশের সারা বুক জুড়ে দুর্ভাবনার মেঘ জমতে থাকে।

গোপেশ আচমকা সাপটাকে দেখলেন, আর পরক্ষণেই শেফালির শরীর জুড়ে ফুটে উঠল ওই অচেনা অসুখের লক্ষণগুলো! তবে কি সাপটার জেগে ওঠার সঙ্গে শেফালির অসুখটার কোনও অদৃশ্য অথচ কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে! তবে কি শেফালিও প্রতিবারেই, গোপেশ দেখবার আগেই, সাপটাকে দেখে ফেলে! এবং সেই কারণেই কি সে এমন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে! বাস্তবিক, শেফালি কি নিজের ভিটেয় বসবাস করা সাপটার কথা জানে? সাপটাকে কি চেনে শেফালি? সাপটা কখন ঘুমিয়ে থাকে, কখনই বা জেগে উঠে উৎপাত জুড়বে, শেফালি কি তা বুঝতে পারে আগাম? নিজের ভিটে, ওর তো বুঝতে পারা উচিত।

গোপেশের মনে হয়, একদিন ওই নিয়ে সরাসরি শুধিয়ে বসেন শেফালিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে গুটিয়ে নেন নিজেকে। কে জানে, কথাটা কেমনভাবে নেবে শেফালি! তাছাড়া, সে যদি এখনও অবধি সাপটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকে তো গোপেশ প্রসঙ্গটা তোলা মাত্রই নিদারুণ ভয় পেয়ে যেতে পারে। নিজের ভিটের মধ্যে আচমকা বিষধর সাপের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলে মানুষজন তো ভয় পাবেই। তবে ওকে কিছু জিজ্ঞেস না করেও গোপেশের কেন জানি বিশ্বাস হয়, সাপটার কথা জানে শেফালি। এমন কি, ভিটের মধ্যেকার কোনও এক গোপন কুঠরিতে সাপটা আচমকা জেগে উঠলে, শেফালি তাও মুহূর্তে টের পেয়ে যায়। এবং বুঝতে পারা মাত্রই ভয়ে, আশঙ্কায়, আতঙ্কে কিংবা অন্য কোনও মানসিক বিভ্রাটের ফলে আচমকা এমন রহস্যময়ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। গোপেশ বোঝেন, এমন হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়। গোপেশ, সাহসী পুরুষ-মানুষ তিনি, এই নিয়ে কতবার সাপটাকে দেখলেন, তাও সাপটাকে এক ঝলক দেখামাত্র প্রতিবারেই তাঁর সারা পরিণত শরীর অজান্তে কেঁপে ওঠে। সারা শরীর জুড়ে একধরনের চিনচিনানি ভয় জাগে, আর শেফালি তো নেহাতই বাচ্চা মেয়ে।

অবশ্য সাপটাকে স্বচক্ষে না দেখলেও, সাপটার কথা সজ্ঞানে না জানলেও, সাপটা ভিটের মধ্যে জেগে উঠলেই শেফালির শরীরে নিজের থেকেই ওই রহস্যময় অসুখটা চাগিয়ে উঠতে পারে। পারেই।

যেমনটা হয় কুমোরপাড়ার গঙ্গারামের মায়ের। কাজুবাদামের সংস্পর্শে আসামাত্রই তার সারা শরীর কোলা ব্যাঙের মতো ফুলে উঠবেই। না, কাজুবাদাম তাকে দেখতে বা ছুঁতে হবে না, বাড়িতে কাজুবাদামের আমদানি হলেই, সেটা গঙ্গার মা জানতে পারুক চাই না পারুক, সারা শরীর তার ফুলতে শুরু করবে তখনই। খোঁজখবর করে দেখা যাবে, কেউ না কেউ কাজুবাদামের আমদানি করেছে বাড়ির মধ্যে।

শেফালির ক্ষেত্রেও তেমনটা হতে পারে। সাপটাকে সে সচেতনভাবে দেখুক কিংবা না দেখুক, তার অস্তিত্ব সচেতনভাবে উপলব্ধি করুক, চাই না করুক, তার শরীর জুড়ে ওই রহস্যময় অসুখটা চাগিয়ে উঠতেই পারে।

প্রমোদ চক্রবর্তী, কল্পনাথের জ্যাঠামশাই, কবিরাজি এবং হোমিওপ্যাথি দুই-ই করেন দীর্ঘদিন, রোগীকে দেখেই তার শরীরের অন্তর্গত ব্যাধির নাকি সন্ধান পেয়ে যান।

বলেন, মেয়েটার শরীরে অসুখ, মনে অসুখ। বলেন, যেমন ওপরে ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যায়, অন্তরালে তার উৎস হল আগুন, যেমন শরীরে একাধিক ফোঁড়া হলে বুঝতে হবে, শরীরের অভ্যন্তরে দূষিত হয়ে গিয়েছে রক্ত, ঠিক তেমনই মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে কিংবা মনের গভীরে কোনও ব্যাধির সৃষ্টি হলে, বাইরে তার লক্ষণগুলো ফুটে উঠবেই।

প্রমোদ জেঠু খুব গাছ-গাছালও করেন। ফুল, ফল ও সবজিতে ভরিয়ে রাখেন ভিটের চারপাশ। বলেন, কেবল প্রাণীরই নয়, গাছ-গাছালের শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও রোগের সৃষ্টি হলে গাছের পাতায়, ডালে, কাণ্ডে সেইসব রোগের লক্ষণগুলো ফুটে বেরোয়। সেই লক্ষণগুলোকে চিনতে না পারলে রোগটাকে সারানো যাবে না কিছুতেই।

শেফালির শরীরের ও মনের সেই অসুখটাকে ইদানীং বুঝি অল্পস্বল্প চিনতে পারেন গোপেশ।

কিছুদিন যাবৎ শেফালির সারা শরীর জুড়ে ওই রহস্যময় অসুখটা ক্রমশ বাড়ছিল। বাস্তুর মধ্যে সাপটাও জেগে উঠছিল ঘনঘন। আগে হয়ত বা হপ্তায় দু-হপ্তায় এক-আধবার অসুখটা পুরোপুরি কাবু করে ফেলত ওকে, কিন্তু ইদানীং খুব ঘনঘনই হচ্ছে। গোপেশ লক্ষ করে দেখেছেন, পড়ন্ত বিকেল থেকে এমনটা হতে থাকলে সন্ধের অন্ধকারে পা টিপেটিপে শেফালির শরীরে প্রবেশ কববে একটা শয়তান ঝড়। একটু বাদেই মেয়েটার শরীর জুড়ে দাপাদাপি শুরু হবে। তার মুখমণ্ডল থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকবে যাবতীয় কমনীয় অভিব্যক্তিগুলি। সারা মুখে জমতে থাকবে ঝামা-পাথরের রুক্ষতা। গোপেশ ভালো কথাটা বলতে গেলেও ফিরে আসবে রূঢ় জবাব। তখন বিড়বিড় করে আপনমনে কতকিছু বলতে থাকবে শেফালি। কিন্তু সেসব কথা তিলমাত্র বোধগম্য হবে না গোপেশের। কোনওরূপ প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না সেসব কথায়। সন্ধে যত ঘনিয়ে আসবে, রাত যত বাড়বে, ততই বাড়তে থাকবে ওই দাপাদাপি। সারারাত ধরে চলতে থাকবে সেই ঝড়ের মাতন। রাতভর মেয়েটাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে বিদেয় নেবে। যাবার বেলায় আধমরা মেয়েটার শরীর থেকে নিঃশেষে শুষে নিয়ে যাবে শক্তির তলানিটুকুও। পরের দিন অনেক বেলা অবধি মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোবে মেয়েটা। বিছানা ছেড়েও সে এমনই স্খলিতগমনে হাঁটতে থাকবে, দেখলেই মনে হবে বুঝি আগের রাতে কোনও এক কড়া নেশা করেছিল, সকাল অবধি রয়ে গেছে সেই নেশার রেশ। দুপুর পর্যন্ত থাকবে শেফালির ওই মদালসা ভাব। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে সে। বিকেল নাগাদ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আবার আগের মতো হাসি-খুশি হুল্লোড়ে পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-কুটুমের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করবে। এমনকি শ্বশুরের সঙ্গে সেই আগের মতো খুনসুটি করবে, যেমনটি বিয়ের পর থেকেই করে আসছে ও।

সকাল থেকেই এক্কেবারে স্বাভাবিক ছিল শেফালি। শ্বশুরকে পরিপাটি করে জলখাবার দিয়েছে, বেরোবার মুখে জলদি-জলদি ফেরার হুকুম জারি করেছে, সারা সকাল রান্নাঘরে ঢুকে তরিবত করে রেঁধেছে। বিউলির ডাল, সরষেবাটা আর কাঁচালংকা দিয়ে চুনো মাছের শুকনো-শুকনো ঝাল, পেঁয়াজ-পোস্ত। দুজনের জন্যই রেঁধেছে এসব। রান্নাবান্না শেষ করে দ্বিতীয়বার চান করেছে শেফালি।

ধোয়া কাপড়-চোপড় পরেছে। বেলা বারোটা বাজিয়ে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বকবক করতে করতে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে পরম মমতায় মুছিয়ে দিয়েছে গোপেশের ঘেমো মুখ। গোপেশ চান করে এলে পর পরিপাটি করে খেতে দিয়েছে। পাশে বসে পাখার হাওয়াও করেছে। তারপর নিজে খেয়েদেয়ে এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে নিজের কুঠরিতে গিয়ে এলিয়ে দিয়েছে শরীর। গোপেশও নিজের কুঠরিতে হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কখন। আর, বিকেল নাগাদ ভাতঘুম থেকে জেগে উঠে পুলিনের দোকানের উদ্দেশে পা বাড়াবার মুহূর্তেই তিনি আচমকা দেখে ফেললেন সাপটাকে, পরমুহূর্তে দেখতে পেলেন শেফালির সারা মুখে সেই পুরোনো অসুখটার যাবতীয় পূর্বলক্ষণ।

প্রতিবারই শেফালির এমন আচম্বিতে বদলে যাওয়া দেখতে দেখতে ইদানীং কেমন ভয় করে গোপেশের। শঙ্কায় দুরুদুরু করতে থাকে বুক।

প্রমোদ জেঠু বলেন, মানুষের শরীর, সে এক বিচিত্র, রহস্যময় যন্ত্র। তার রহস্যের কূলকিনারা পাওয়া দায়। খানিকটা নদীর মতো তার আচার-আচরণ। একদিকে একটা নিয়ম মেনে চলে, অন্যদিকে নিদারুণ খামখেয়ালি। তার স্রোতের মুখে একটা বাঁধ দিলে, সে দু-পাশের বাঁধের দুটো জায়গা ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে পুরো এলাকায়।

আমার বড়োপিসি, বালবিধবা সে, এক বছরও স্বামীর ঘর করেনি, স্বামী মারা যাবার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে থাকে। জীবনের নৌকোটাকে একা একা বাইতে গিয়ে নোনা হাওয়ায় কবে যেন তার চোখদুটোই পচে গিয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় জটিল রহস্য সে তার নিজস্ব তত্ত্ব দিয়ে সমাধান করে সুখ পায়।

শেফালির রহস্যময় অসুখটার কথা শুনে সে নিশ্চিত গলায় রায় দেয়, এ হইল নয়নতারা আর শেফালির নিজস্ব লড়াই। যে হারবে, সে মরবে। এই লড়াইটা নয়ন অনেকদিন ধরে চালিয়েছিল সুভদ্রার সঙ্গে। সুভদ্রা হেরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল ওপারে। এবার এদের একজনের পালা। অবশ্য এখন পরিস্থিতিটা একটু বদলেছে। এই বয়েসে শেফালির এমন আগুনের খাপরার পারা রূপের কাছে নয়নের জিতে ফেরা মুশকিল, তবুও ওই যে বলে না, আশায় বাঁচে চাষা। বড়োপিসির মতে, নয়ন শেষ মুহূর্ত অবধি আশা ছাড়বে বলে মনে হয় না।

তাঁর পুরো নাম নয়নতারা, কিন্তু বড়োরা সবাই তাকে নয়ন বলেই ডাকে। আমরা ডাকি নয়ন-কাকিমা। আমাদের প্রাণেশকাকার বউ তিনি। শশাঙ্কদার মা। তিনি আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী দিবাকরেরও মা বটে। তাঁকে দেখলে, বিশেষ করে তার চোখদুটোর দিকে তাকালে, সেই ছেলেবেলাতেই আমার মনে হত, একটি অস্থির পাখি বুঝি খাঁচার ভেতর থেকে, নীল আকাশের দুনিয়াটাকে দেখতে দেখতে বাইরে বেরোবার জন্য মরণপণ ছটফট করছে। সেই ছটফটানি দেখেছি, যখন যুবক দিবাকর কী এক মুক্তির দশককে সফল করবার জন্য বিষধর কালসাপের মাথায় চড়ে নৃত্য শুরু করেছে। সেই সময়টায় আমরা নয়ন-কাকিমার দিকে তাকাতে পারতাম না।

প্রাণেশ ঘোষ, নয়নতারার চেয়ে অন্তত দশ-পনেরো বছরের বড়ো ছিলেন তিনি, তার ওপর তাঁর শরীরের গড়নটাই এমন ছিল, বয়সের তুলনায় একটু বেশি বয়স্ক বলেই মনে হত। মাঝারি হালের চাষি ছিলেন ওঁরা। বাড়ির অবস্থা খারাপ ছিল না। শুনেছি, খুবই গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন নাকি নয়নতারা। কিন্তু তাঁর শরীর জুড়ে স্নিগ্ধ রূপ ছিল, তাই একটু বেশি বয়সের হওয়া সত্ত্বেও প্রাণেশকাকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল এক কথায়, কিনা, পুরুষমানুষের আবার রূপ, বয়েস! সোনার গহনা, তার আবার বাঁকা-ত্যাড়া।

গোপেশকাকা, প্রাণেশের সহোদর ভাই বটে, কিন্তু দাদার সঙ্গে তার চরিত্রের তিলমাত্র মিল ছিল না কস্মিনকালেও। প্রাণেশ ছিলেন সর্বার্থে এক দেখন-বুড়ো মানুষ। রোগা, সিড়িঙ্গেপানা শরীর ছিল

তাঁর। আচার-আচরণে, জীবন-যাপনে কোনও প্রাণ ছিল না। তবে চিরকালটাই সরল, সিধেসাদা, আর সংসার এবং নয়ন-অন্ত প্রাণ ছিলেন প্রাণেশ। সংসারের প্রত্যেকটি প্রাণীকে একেবারে মুরগির মায়ের মত আগলে রাখতে চাইতেন তিনি। তার জন্য নিজের সুখ, আরাম ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সুখ পেতেন।

বারো মাস, তিরিশ দিন চাষবাস নিয়েই থাকতেন প্রাণেশ। ভিটের মধ্যে অনেকখানি জমি ছিল, দু-দুটো পুকুর। জমিতে সম্বৎসর হরেক জাতের সবজির চাষ করতেন, আর, পুকুর দুটোতে করতেন মাছের চাষ। তাঁকে দিনভর দেখা যেত, সবজি-খেতে জল দিচ্ছেন, নিড়াচ্ছেন, সার দিচ্ছেন, কিংবা পুকুরে মাছের ডিম ছাড়ছেন, চারাপোনাগুলো ধরবার জন্য জাল ফেলছেন, চারাপোনার সাইজ পরখ করছেন, সব মিলিয়ে এই ছিল তাঁর বিচরণের দুনিয়া। এছাড়া তাঁর অন্য কোনও সখসাধ ছিল না বললেই চলে। তিনি গানবাজনা, কিংবা পালাগানের আসরে কস্মিনকালেও যেতেন না। পোশাক-আশাক নিয়েও তাঁর কোনও বাড়তি আতিশয্য ছিল না। সব মিলিয়ে তাঁর ছিল একেবারেই গতানুগতিক, আটপৌরে জীবন, বদ্ধ জলের মতো একঘেয়ে।

অন্যদিকে একই মায়ের পেটের ভাই হয়েও গোপেশের জীবনটা ছিল আগাগোড়া নাটকে ভরা। তাঁর ছিল রাজপুত্তুরের মতো রূপ। তবে সেই রূপের মধ্যে এমন এক ধরনের মেয়েলি কমনীয়তা ছিল, হাঁটনে-চলনে ছিল এমনই এক ধরনের মেয়েলি ছন্দ, শরীরের হেলনে-দোলনে ছিল এমনসব মেয়েলি ভঙ্গি, মুদ্রা, গলার স্বরও ছিল এমনই চিকন, তাঁর হাসিতে, কটাক্ষে, ভ্রূভঙ্গিতে ছিল এমনই এক ধরনের লাস্য, যা দেখতে দেখতে পাড়া-পড়শির কেবলই মনে হত, মেয়ে বানাতে বানাতে কী এক অন্যমনস্ক খেয়ালে ওঁকে ব্যাটাছেলে বানিয়ে ফেলেছেন বিধাতা-পুরুষ। একে তো বুড়ো বয়সের ছেলে, তার ওপর বাড়ির ছোটো, সঙ্গে এমন কন্দর্পকান্তি রূপ, ফলে, সেই ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মায়ের নয়নের মণি ছিলেন গোপেশ। তাঁর কোনও ইচ্ছেতেই ওরা 'না' করত না কখনোই। তার ফলে, যা খুশি করবার, যখন যেখানে খুশি নিজের খেয়ালি ছন্দে ঘুরে বেড়ানোর অঢেল স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে ভালোবাসত পাড়ার প্রায় সবাই, বিশেষ করে, বড়ো হয়ে যা-যতটুকু শুনেছি, বুঝেছি, বিশেষভাবে পছন্দ করত তারাই, যাদের সমকামিতা নিয়ে রটনা রয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে।

আমাদের গাঁয়ে গিরিধারী দাসের ছিল কৃষ্ণযাত্রার চালু দল। গোপেশ মাত্র দশ বছর বয়েসে ওই দলে ভর্তি হয়ে যান। শ্রীরাধিকার পার্ট করে অল্প দিনের মধ্যেই খুব নাম করে ফেলেন। সবাই তাঁর চিকন গলার গান শুনে, আর মেয়েলি ছাঁদে হাঁটা-চলা, কথা বলা, হাত নাড়া দেখতে দেখতে একেবারে ধন্য-ধন্য রব তোলে। রাতারাতি পালাগানের সমঝদারদের মধ্যে রটে যায় তাঁর নাম। তিনি যখন 'মানভঞ্জন' পালায় অভিমানী রাধা হয়ে গান ধরেন, 'না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে-/মরিলে তুলিয়' রেখো তমালেরি ডালে/আমি তমাল বড়ো ভালোবাসি...।' শুনতে শুনতে সারা আসর চোখের জলে ভাসতে থাকে। যখন 'মাথুর' পালায় বিরহিণী হয়ে কাঁদেন, সে কান্নায় শামিল হয় শত শত মানুষ।

দেখতে দেখতে নেশাটা বুঝি ধরে যায় গোপেশের মনে। ফলে, বয়েস সামান্য বাড়লে পর অপেরা দলে নাম লেখালেন তিনি। মফস্বলের দলগুলোতে একাঙ্গীর রোলে চুটিয়ে অভিনয় করতে লাগলেন।

আমরা আমাদের ছেলেবেলায় গোপেশকে চোখে দেখিনি একদিনের তরেও। কেবল তাঁর নামই শুনেছি পাড়ার সবাইয়ের মুখে। তিনি যখন দেশান্তরী হন, আমরা তখন জন্মাইনি। তবে জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছিলাম তাঁর কথা। তিনি তখন কলকাতার নামকরা অপেরা দলে জবরদস্ত সব ফিমেল রোলে আসর মাতিয়ে বেড়ান।

শুনেছি, নয়নতারা যখন বউ হয়ে এলেন, গোপেশ তখনও অবধি দেশান্তরী হননি। দুজনেই সমবয়েসি হওয়ায় গোপেশের সঙ্গে নাকি নয়নতারার প্রথম দিন থেকেই এক ধরনের মধুর মাখামাখির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অন্য কেউ হলে কী হত বলা যায় না, কিন্তু নিতান্তই সিধে সরল প্রাণেশ, দেওর-বউদির অন্তরঙ্গ সম্পর্কটাকে বাঁকা চোখে দেখেননি একদিনের তরেও। কিন্তু আমার বড়োপিসির

মতো মানুষেরা তখনই পাঁচ কথা রটাতে শুরু করে। বিশেষ করে, প্রাণেশের কাঠখোট্টা বুড়ো-বুড়ো চেহারা আর গোপেশের কাঁচা কার্তিকের মতো রূপটি বড়োপিসিদের তেমন রটনাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

তখনও অবধি গোপেশ বাড়িতে থেকে আশপাশের অপেরা দলগুলোতে খেপ খেটে বেড়াতেন। একদিন বালিঘাইয়ের ধাওয়া-পার্টির থেকে ডাক এল তাঁর, কিনা, 'শাজাহান' পালায় মমতাজ সাজতে হবে তাঁকে। সে ডাক ফেরাবার প্রশ্নই ওঠেনি, কেন কি, তখন বালিগাইয়ের 'ভার্গব-অপেরা' ওরফে ধাওয়া-পার্টি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা- আসাম জুড়ে আসর কাঁপাচ্ছে।

ধাওয়া-পার্টিতে অভিনয় করবার জন্য ঘর ছাড়লেও, গোপেশ কিন্তু ওই অপেরায় বেশিদিন থাকেননি। চলে গিয়েছিলেন কলকাতার দলে। বছর-বছর দল বদলাতেন। যখন 'রয়্যাল বীনাপাণি অপেরা'-তে কাজ করেছিলেন তিনি, একবার নাকি পুজোর সময় আমাদের গাঁয়ে মুখুজ্যাদের গড়ে গাইতে এসেছিলেন। কথাটা রাতারাতি রটে গিয়েছিল গ্রামময়, সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছিল গাঁয়ের ছোকরার অভিনয় দেখতে। কিন্তু আসরে কেউই নাকি চিনতে পারেনি গোপেশকে। পরের দিন যখন শুনল, ওই ডাকসাইটে শাহাজাদি আসলে গোপেশই, ধন্য ধন্য রব উঠেছিল চতুর্দিকে। শুনে ওঁর বাপ-মায়েরও বুঝি আনন্দ ধরে না, কিনা, তাদের ছেলে মস্ত অভিনেতা হয়েছে।

এইসব করতে করতে বুড়ো বাপ-মাকে দেখাশোনা করবার সময় পাননি গোপেশ। তাঁকে বহুদিন চর্মচক্ষে দেখেনি সন্ধিপুর গাঁয়ের মানুষ। মাঝে মাঝে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা, নানা রটনা, এধার-ওধার থেকে উড়তে উড়তে, ভাসতে ভাসতে চলে আসত সন্ধিপুর গাঁয়ে। তিনি নাকি অপেরা দলে ঘুরতে ঘুরতেই পেতে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ঘর, সংসার। কে নাকি কোন কুটুমের গাঁয়ে পালাগান শুনতে গিয়ে দেখে এসেছে, অপেরা-দলেই একটি মেয়ের সঙ্গে গোপেশের গায়ে-গা লেপটে থাকার দৃশ্য। পালাগানের পর তারা নাকি একই ঘরে একই বিছানাতে শোয়। অপরূপ সুন্দরী নাকি সে মেয়ে।

ততদিনে অপেরা দলগুলোতে পুরুষ-ফিমেলের পাশাপাশি একটি দুটি করে 'অরিজিনাল ফিমেল'ও ঢুকতে শুরু করেছে। তখন গোপেশের বয়েস পঁচিশ ছুঁই-ছুঁই। কচি বয়েসি নায়িকার রোলে, মফসস্‌লের দলগুলোতে যদিও-বা চালিয়ে নেওয়া যায়, কলকাতার অপেরা দলে একেবারেই চলে না। কাজেই, গোপেশ তখন রানি, রাজমহিষী, বেগমসাহেবা গোছের বয়স্ক রোলগুলো করেন, আর কচি রোলগুলোর জন্য ঢুকে পড়েছে এক ডাকসাইটে সুন্দরী। সে-ই তখন আসর কাঁপাচ্ছে। ফলে, দলের মধ্যে গোপেশের গুরুত্ব আর সেই আগের মতো ছিল না। শোনা গেছে, কী কারণে যেন বনিবনা না হওয়াতে অপেরা-দলের মালিক নাকি রেগেমেগে ছাড়িয়ে দিতে চাইছিল গোপেশকে, কিন্তু ওঁর প্রণয়িনী সেই হিরোইন মেয়েটি নাকি তৎক্ষণাৎ জিনিসপত্তর গুছিয়ে তৈরি, কিনা, সেও থাকবে না দলে। বাধ্য হয়ে নাকি মালিক নিজের দলে রাখতে বাধ্য হয় গোপেশকে।

এসব কথা নানাজনের মুখে শুনতে শুনতে গাঁয়ের চরিত্রহীন, লম্পটদের মধ্যে তারিফ করবার হিড়িক পড়ে যায়, কেন কি, বিধাতা-পুরুষ এমন একখানা রূপ দিয়েছেন ওকে, ওর পিছুপিছু মেয়েরা ঘুরবে না তো কার পিছুপিছু ঘুরবে! এবং পাশাপাশি অনুশোচনারও বন্যা বয়ে যায় এই কারণে যে, নিজেদের শরীরের এমন সাধারণ, আটপৌরে গড়ন দিয়ে বিধাতাপুরুষ তাদের মেরে রেখেছেন জন্মলগ্নেই। গোপেশের মতো এমন ভুবনভোলানো রূপ তারাও পেত কি, তাহলে 'ভাদ্রমাসে ধানের খেতে ফাতনা নাচিয়ে মিনিটে দুটো চ্যাং মাছ ধরবার মতো', চারপাশের যুবতি মেয়েগুলোকে পটাপট আটকে ফেলত নিজেদের 'ভগবান প্রদত্ত' বঁড়শিতে। সুন্দরীর দল তাহলে ওদের পেছনেও দিনরাত আঠার মতো লেগে থাকত। বঁড়শিতে আটকিয়া যাবার 'কোম্পিটিশন পড়িয়া যাইত তেবে'।

বাপ এবং মা যখন একে একে চলে গেল ওপারে, গোপেশ তখনও অবধি বাংলা-বিহার জুড়ে আসরের পর আসর মাতাচ্ছেন। প্রাণেশ ঘোষ লোক-মারফত খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চালু দল, চষে বেড়াচ্ছে দুনিয়া, খুঁজে পাওয়া কি অতই সোজা! তাও ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে, প্রায় অসাধ্য সাধন করে তাকে খুঁজে বের করেছিল প্রাণেশদের অন্তরঙ্গ পড়শি ভুবন কপাট। বাপ মরবার এগারো দিন

বাদে, শ্রাদ্ধ-শ্রান্তি ততদিনে চুকে বুকে গেছে, ভুবন কপাট ফিরে এসে তার বিশ্বপরিক্রমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করেছিল প্রাণেশ, নয়নতারা এবং গাঁয়ের কৌতূহলী মানুষজনের কাছে। এও বলেছিল যে, গোপেশের নাকি এমনই অধঃপতন হয়েছে, বিয়ে না করেও একটা ফাটাফাটি মেয়েমানুষের সঙ্গে বর-বউয়ের মতো বসবাস করেন। পালাগানের মালিক নাকি ভুবন কপাটকে একান্তে পেয়ে সাতকাহন করে বলেছে সেসব কথা।

ভুবন কপাট শুধু যে সেই কুহকিনী নারীটিকে স্বচক্ষে দেখেছিল তাই নয়, তার কুহকিনী স্বভাবের অনেক ফেনায়িত গল্প শুনে এসেছিল বহুজনের থেকে। না-হোক মাসটাক ধরে সে কিস্তিতে কিস্তিতে শুনিয়েছিল সেই এক রহস্যময়ীর কিসসা।

শুনতে শুনতে গাঁয়ের রসিক ব্যক্তিদের ঠোঁটের কোণে জমেছিল, শীতের মরশুমের গাঢ় খেজুর রসের মতো, আঠালো হাসি। সবাইয়ের মনে এমনই বিশ্বাস মিছরির মতো দানা বেঁধেছিল যে, মেয়েটি বাস্তবিক সব অর্থেই কুহকিনী। আর, সেইসব কথা শুনতে শুনতে প্রাণেশ এবং নয়নতারার মুখে জমেছিল অন্তহীন গাঢ় বিষাদ।

তারপর একদিন, বয়েস তখন তার পঁচিশ পেরিয়ে, অবশেষে গাঁয়ে ফিরে আসেন গোপেশ।

সন্ধিপুর গাঁয়ের কিশোর-কিশোরীরা এবং বউড়ি-ঝিউড়িদের অনেকে তখনই গোপেশকে সেই প্রথম দেখল। চোখেমুখে দীর্ঘদিনের রাত্রি উজাগরের ক্লান্তি, অবসাদ, আর শরীর জুড়ে অনিয়মের অজস্র চিহ্ন থাকলেও, তাঁর শরীরের বাঁধুনিটি নাকি তখনও অবধি অটুট ছিল।

প্রথম দিনকতক তিনি নাকি শুধুই দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোতেন। তারপর যখন, ধীরে ধীরে, ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি আর চন্দন রঙের পাঞ্জাবি পরে, ঝাঁকড়া চুলে আলবার্ট কেটে, গলায় পুরু করে পাউডার চড়িয়ে, রাস্তায়-ঘাটে বেরোতে থাকেন, সকাল-বিকেল গাঁ-বেড়ানো শুরু করেন, সমবয়েসিদের কাছে কিস্তিতে কিস্তিতে পেশ করতে থাকেন তাঁর দীর্ঘ প্রবাসজীবনের ইতিবৃত্ত, তখনই সেসব কথা চুঁইয়ে চুঁইয়ে চলে আসতে থাকে অল্পবয়েসিদের কাছে, যাদের বয়েসের কারণে কৌতূহলটা অনেকগুণ বেশি। অথচ ওই বয়েসের কারোর সঙ্গেই বাক্যালাপ করতেন না গোপেশ।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও ওই প্রেমিকা মেয়েটির কথা কারোর কাছেই ফাঁস করেননি গোপেশ। সমবয়েসিদের হাজার জেরাতেও একটি বাক্য অবধি বের করা যায়নি ওঁর পেট থেকে। তাতে করেই সবাইয়ের মনে সন্দেহটা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে, কিনা, ভুবন কপাটের বয়ে আনা খবর মিথ্যে তো নয়ই, বরং ওই কুহকিনীর সঙ্গে গোপেশের সম্পর্কটা আরও রহস্যময়। গোপনীয়তার গূঢ় মোড়কে আড়াল করে রাখার মতোই অবৈধ। সেই কারণেই সবাইয়ের মনে বিশ্বাসটা আরও গাঢ় হয়েছে যে, এসেছেন বটে, কিন্তু বেশিদিন গোপেশ থিতু হবেন না গাঁয়ে। সেই ছেলেবেলা থেকেই যা উড়ন্ত পাখির মতো মন ওঁর, তার ওপর দুনিয়ার অন্য কোনও প্রান্তে একটি মায়াবী খাঁচা ফাঁকা পড়ে রয়েছে ওঁর জন্য। কাজেই, দুদিন না যেতেই নির্ঘাত আবার ফুড়ুত করে উড়ে পালালেন বলে! পালাবেনই। এই সমাজবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ জীবন তাঁর বেশিদিন সইবে না।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে গোপেশ থেকে যান টানা মাস-দুই। খান-দান আর ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে ঘুমোন, মাঝে মাঝে সেজেগুজে গাঁ বেড়াতে বেরোন। কেন ফিরে এলেন, আবার চলে যাবেন কিনা, কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেন না। যে মেয়েটার সঙ্গে ছিলেন তিনি এতকাল, সেটি রইল কোথায়, খোলসা করে বলেন না তাও। তখন তাঁর ভরভরন্ত বিয়ের বয়েস। অথচ সংসার পাতবার কোনও তাগিদই দেখা গেল না তাঁর মধ্যে।

আমরা তখনো অবধি জন্মাইনি। বড়ো হয়ে পাঁচজনের মুখে শুনেছি মাত্র।

গোপেশ গাঁয়ে ফিরে আসায় খুশি হয়েছিলেন তাঁর দাদা প্রাণেশ ঘোষ এবং বউদি নয়নতারা। বহুদিন বাদে তাঁরা আকাশের চাঁদ ফিরে পেয়েছিলেন বুঝি।

যদিও পাক্কা ন-বছর বাদে ফিরে এসেছিলেন গোপেশ, কিন্তু তাঁকে সংসারী করার কথাটা তেমন করে ভাবেননি প্রাণেশ ও নয়নতারা। কেন কি, তিনি আদপে থিতু হবেন কিনা তারই যখন ঠিক-ঠিকানা

নেই। বিশেষ করে যখন জানা গিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই একটি কুহকিনী মেয়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক গড়ে ফেলেছেন। কেমন সে মেয়ে, কেমন সেই সম্পর্ক, তাই নিয়ে সবাই অন্ধকারে থাকলেও, এ ব্যাপারে কারোর মনেই কোনও সন্দেহ নেই যে, যা রটে তার কিছুটা হলেও ঘটে। তাহলে আর একটা পরের মেয়েকে কেনই বা ওর গলায় বেঁধে দিয়ে তার জীবনটা নষ্ট করা!

কিন্তু যখন মাসের পর মাস কেটে গেল, যখন সবাই বুঝল যে, মানুষটার পাখনা-জোড়াতে আর ওড়াউড়ির জন্য সেই ব্যাকুলতা নেই, তখনই প্রাণেশ এবং নয়নতারা তাঁর জন্য মেয়ে খোঁজাখুঁজি জুড়ে দিলেন।



বড়োপিসির সই-সহেলিরা বলল, শুধু সুভদ্রার সঙ্গে কেন, তনুর সঙ্গেও লড়াইটা কম জমেছিল নয়নের?

বড়োপিসি ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় এমনতরো মন্তব্য। বলে, তনুর সাধ্য কি নয়নের মতো গভীর জলের মাছটির সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে? তনুটা তো হ্যাংলার মতো ঘোরাঘুরি করত গোপেশদার পিছু পিছু। নয়নের সঙ্গে তার লড়াইটা শুরু হওয়ার আগেই তো তনুর মাথাটা গেল।

এটা ঠিক, গোপেশ ফিরে আসাতে প্রাণেশ আর নয়নতারার পাশাপাশি আমাদের গাঁয়ের আর একজনও খুশি হয়েছিল নির্ঘাত। সে তনুপিসি।

তনুপিসি ছিল পাড়ার কিনুকাকার বোন। আমার বড়োপিসির সঙ্গে তার ছিল একেবারে গলায় গলায় ভাব। দুজনের মধ্যে বয়েসের পার্থক্য ছিল ঢের। পার্থক্য ছিল রূপ, স্বভাব আরও অনেক-কিছুতেই। কিন্তু একটি জায়গায় ভারী মিল ছিল দুজনের।

তনুপিসির বিয়ে হয়েছিল জকপুরে। জকপুর বাজারে কাটা-কাপড়ের ছোটোখাটো দোকান ছিল তার স্বামীর। হাওড়া জেলার মঙ্গলার হাটে দোকানের মাল কিনতে গিয়ে বাসচাপা পড়ে মারা যায় সে।

সস্তায় কাটা-কাপড়ের খোঁজ নেওয়া তার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথায়, কোন হাটে কিংবা বাজারে সস্তায় কাটা-কাপড় পাওয়া যায়, তাই নিয়ে ছিল তার সর্বক্ষণের ভাবনা। পথেঘাটে যার সঙ্গেই দেখা হত, সামান্য এ-কথা ও-কথার পরই শুধিয়ে বসত, তোমাদের ওদিকে কাটা-কাপড়ের হাট-বাজার আছে? ভালো মাল পাওয়া যায়? এমনকি তনুপিসিকে দেখতে এসেও নাকি মেয়েকে প্রশ্ন শুধোবার বদলে কিনুকাকাকে শুধিয়েছিল, আপনাদের এ-অঞ্চলে কাটা-কাপড়ের ভালো বাজার রয়েছে? ভালো মাল পাওয়া যায়? দাম কেমন যাচ্ছে? সস্তা?

চারপাশের সবগুলো কাপড়ের হাট পরখ করে শেষ অবধি হাওড়ার মঙ্গলার হাটটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তনুপিসির বরের। ফি-হপ্তায় ওই হাটেই যেত সে। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেত, ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। তনুপিসি নাকি বারংবার নিষেধ করেছিল, অত দূরে যাইওনি, কাছাকাছি কাপড়ের হাট নেই? লোকটা কান দেয়নি। বলেছিল, কাপড়ের হাট তো সবখানেই আছে, তবে মঙ্গলার হাটে মাল খুব সস্তা। সস্তার মাল খুঁজতে খুঁজতে একেবারে হয়রান হয়ে থাকত লোকটা।

স্বামীকে নিয়ে তনুপিসির নাকি দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সেই ছেলেবেলায় কোন এক জ্যোতিষী নাকি তার কর গুণে সুস্পষ্ট গলায় রায় দিয়েছিল, অকাল বৈধব্যের যোগ আছে। জ্যোতিষীর কথাগুলো বুঝি বুকের মধ্যে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। বিয়ের পর একটি তরতাজা বর পেল বটে, কিন্তু তাতে করে তার দুর্ভাবনা বাড়ল বৈ কমল না। আরও একবার জ্যোতিষীকে দিয়ে নিজের বিবাহোত্তর হাতটা দেখাবার কথা মাঝেমাঝেই মনে হত তার।

কিন্তু একদিন সেই প্রয়োজনটা চিরকালের মতো ঘুচে গেল তনুপিসির জীবনে। এক হপ্তায় মাল কিনতে মঙ্গলার হাটে সেই যে গেল লোকটা, আর ফিরল না। তার বদলে মাঝরাতে এল তার মৃত্যুর সংবাদ। পাক্কা দু-দিন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল তনুপিসি।

কিছুদিন বাদেই ভরন্ত ফর্সা শরীরে ততোধিক ফর্সা সাদা থান জড়িয়ে তনুপিসি ফিরে এল বাপের বাড়িতে। কিন্তু সাদা থানে জড়িয়ে সে নিয়ে এল একটা উপোসী, আগ্রাসী শরীরকেও।

আমার বড়োপিসি আর তনুপিসির মধ্যে একটা জায়গায় খুবই মিল ছিল, কিনা, দুজনেই ছিল বাল-বিধবা এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর দুজনেই ফিরে এসেছিল বাপের ভিটেয়। দুজনের কষ্টের জায়গাটা ছিল হুবহু এক। সেই কারণেই দুজনের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। খুবই আনাগোনা ছিল দুজনের। তনুপিসিই বেশি আসত আমাদের বাড়িতে। সাধারণত বিকেল নাগাদই আসত। সদর পুকুরের পুবপাড়ে গিয়ে বসত দুটিতে। ওদের নিজস্ব একটা দুনিয়া ছিল, নিজস্ব কিছু কথা ছিল, যা অন্যদের কাছে বলা যায় না, অন্যরা সেসব কথার তাৎপর্য উপলব্ধিও করতে পারবে না, এমনটাই বুঝি বিশ্বাস করত ওরাও। সারা বিকেল সদর পুকুরের পাড়ে ফিসফিস করে গল্প করত ওরা। ধারেপাশে কেউ গেলে বিরক্তই হত। কোনও কোনও দিন তনুপিসি রাতে থাকতও আমাদের বাড়িতে। দুজনে রাতে এক বিছানায় শুত। সারারাত ঘুমোত না। কীসব বিড়বিড় করে গল্প করত রাতভর। এখন মনে হয়, সারারাত উজাগর হয়ে নিজেদের ক্ষতস্থানেই মলম লাগাত দুটিতে।

দিনকতক শহরে কাটিয়ে আসার সুবাদে তনুপিসির মধ্যে ঠাটবাট, আদবকায়দা এবং আধুনিক দুনিয়ার রীতিনীতি নিয়ে এক ধরনের উত্তমর্ণ ভাব ছিল। সে-ই আমাদের গাঁয়ে প্রথম হাতকাটা ব্লাউজ পরা শুরু করে। স্বামী বেঁচে থাকাকালীন মঙ্গলার হাট থেকে কিনে এনে সেসব উপহার দিয়েছিল তনুপিসিকে। পরবর্তীকালে অবশ্য শিখাবউদিও ওই জাতের ব্লাউজ পরত।

সুযোগ পেলে শহরের কত কথাই না শোনাত তনুপিসি। উত্তম-সুচিত্রার সিনেমার গল্পগুলো হুবহু বলে যেতে পারত। সর্বসমক্ষে 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার...' গেয়ে উঠত অবলীলায়, কোনও সংকোচ ছিল না তার ওই গেয়ে ওঠার মধ্যে।

শিখাবউদি যখন এ গাঁয়ে বউ হয়ে এল, তনুপিসির ওপরেই পড়ল তার সঙ্গে কথা বলবার দায়িত্ব। কেন কি, শহরের মেয়ে সে, তার সুমুখে গাঁউলি ভাষায় বকরবকর করলে ভাববে, গাঁইয়া।

গাঁয়ে-ঘরে গুড়ের ব্যবসা করত রহমত চাচা। গাঁয়ের সমান সম্পর্কের সবাইকে কাকা বলতাম আমরা, কেবল রহমতকেই চাচা বলতাম। বড়োপিসিকে কারণ শুধোলে পর সে বলেছিল, মুসলমানকে চাচা বলতে হয়। শীতকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খেজুরের রস আর গুড় বেচত রহমত চাচা। পিঠে আর গুড় শীতকালে খুব জমে যেত।

তখন মাঝেমাঝেই খুব পিঠে হত আমাদের বাড়িতে। বড়োপিসিই উদ্যোক্তা। সঙ্গে অবশ্যই থাকত তনুপিসি। সকাল থেকে ঢেঁকিতে চাল কুটত দুটিতে। ঢেঁকিশালে কাজ করতে করতেও গল্পগুজবে বুঁদ হয়ে থাকত। সে-রাতে তনুপিসি থেকে যেত আমাদের বাড়িতে। পিঠে বানানো শুরু হত একটু বেশি রাতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পর দুটিতে শুরু করত কাজ। সারারাত চলত পিঠে তৈরির কারখানাটি। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে আমরা শুনতে পেতাম, রান্নাঘরে পিঠে তৈরির পাশাপাশি বিড়বিড় করে চলেছে দুটিতে। পা টিপেটিপে হাজির হতাম রান্নাঘরের মুখটিতে। তখন হয়ত তনুপিসি চাপা গলায় বলে চলেছে শহরে থাকাকালীন তার দেখা কোনও সিনেমার কোনও এক ডগোমগো প্রেমের গল্প। গল্পের কোনও দৃশ্যে নায়িকার মুখে কোনও ভালোবাসার গান থাকলে তনুপিসি তারও দু-এক কলি গেয়ে শুনিয়ে দিচ্ছে অপটু গলায়। কোনও হাসির দৃশ্য বলতে গিয়ে বড়োপিসির গায়ে লুটিয়ে পড়ছে সে, আর, শুনতে শুনতে হেসেহেসে কুটিপাটি বড়োপিসিও লুটিয়ে পড়ছে তনুপিসির গায়ে। আমাদের দেখামাত্র ভুরুতে কপট রোষ ফুটিয়ে তাকাত তনুপিসি। পরমুহূর্তে ফিক করে হেসে ফেলত। আমাদের হাতে ধরিয়ে দিত একটি করে পিঠে। আমরা বাসিমুখে পিঠেটি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।

তনুপিসি আমার বড়োপিসির মতো খারাপ দেখতে ছিল না। তার শরীরে রূপ ছিল, ডগোমগো যৌবন ছিল। চোখের তারায় বিচিত্র বাঙ্ময়তা ছিল। শুনেছি, গোপেশের প্রতি তার নাকি ছিল আবাল্যের দুর্বলতা। বিয়ের আগে নাকি সেকথা আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েওছিল গোপেশকে। গোপেশ গাঁয়ে

থাকলে শেষ অবধি কী হত বলা যায় না, কিন্তু তনুপিসির যখন বিয়ের সময় পেকে এল, গোপেশ তখন দেশান্তরী। অপেরা-দলে পালাগান করে বেড়াচ্ছে সে।

যখন ফিরে এল গোপেশ, তনুপিসি তখন স্বামী খুইয়ে ফিরে এসেছে বাপের ভিটেয়। আর তখনই সে হয়ত বা আচমকা বুঝতে পেরেছিল, ভেতর-উঠোনের সন্ধ্যামালতীর লতাটা তখনও অবধি বেঁচে রয়েছে। এবং, গোপেশের ফিরে আসার খবর শুনে সেই লতা বুঝি আবার একটু একটু করে চারাতে শুরু করেছে।

একদিন অযাচিতভাবে নয়নতারার সঙ্গে গল্প করতে চলে এল তনুপিসি। এবং একটুখানি গল্প করবার পর নয়নতারার বুঝে ফেলল, সে আসলে গোপেশের সন্ধানেই এসেছে।

এরপর গোপেশের সঙ্গে একটু একটু করে ভাব করতে চাইল তনুপিসি। কোনওরূপ রাখঢাক না করেই সে গোপেশের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, কথা বলবার জন্য হাজারো ছুতো খুঁজত। সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে বেঁধে রাখতে চাইত। গোপেশের আনাগোনার পথে আগাম দাঁড়িয়ে থাকত। দেখা হলেই গল্পগাছায় আটকে রাখতে চাইত ওকে, যতক্ষণ সম্ভব। গল্পগাছার মধ্যে কু-ইঙ্গিতও দিত হাসতে হাসতে। কথাবার্তার মধ্যে আচমকাই বলে উঠত, এমন রূপবান শরীরটা লিয়ে ভোগ করতে ইচ্ছা করে না তুমার? শুনে অবধি গোপেশ তো তাজ্জব। কিংবা একদিন হয়ত-বা কোনও কারণে গোপেশের গায়েগতরে খুব ব্যথা হয়েছে, শোনামাত্রই তনুপিসি মুখ টিপে হেসে ফেলত। চাপা গলায় বলত, দিনদিন শক্ত বিছানায় শুইলে গায়ে-হাতে ব্যথা তো হবেই। গদিতে শুইতে হয়। একেবারে জ্যান্ত গদিতে। তেমন নরম গদির উপর দু-একদিন শোও, ব্যথা বেদনা পালিয়াবে। এমনই হালকা চালে কথাগুলো বলত তনুপিসি, গোপেশের মনে হত বুঝি-বা ঠাট্টা, পরমুহূর্তে মনে হত পুরোটা ঠাট্টা নয়। কখনও জন্মমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কথা বলবার মতো থমথমে মুখে উচ্চারণ করত এমন কথা, যা শুনে গোপেশ শিউরে উঠতেন, কিন্তু পরমুহূর্তে হেসে লুটিয়ে পড়ত তনুপিসি। প্রায়দিনই কথাবার্তা একটু একটু করে আমিষের দিকে এগোচ্ছে দেখলেই গোপেশ কৌশলে কেটে পড়তেন।

একদিন নাকি একেবারে হাসির ছলে মোক্ষম কথাটা গোপেশকে বলে ফেলেছিল তনুপিসি। তখনও গোপেশ বিয়ে করেননি। নয়নতারা ওকে রাজি করাবার জন্য দিনরাত পিছুপিছু ঘুরছে। তখনই একদিন শিবমন্দিরের সামনের ঢাক-কদমের তলায় ওকে একা পেয়ে গল্পগুজবে মেতে উঠবার কালে এক ফাঁকে তনুপিসি নাকি গোপেশকে আচমকা শুধিয়ে বসেছিল, কী হইল? বাবুর নাকি বিয়ে কত্তে তিলমাত্তর মত নাই?

তার জবাবে গোপেশ নাকি বলেছিলেন, আমি তো সংসারে বেশিদিন থাকবনি। খুব শিগগির ঘর ছাড়িয়া পালিয়াব। কী দরকার একটা পরের মেয়েকে গলায় বাঁধবার?

সেকথায় তনুপিসি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে গোপেশের দিকে। এক সময় খুব গম্ভীর গলায় বলে, সেই ভালো, চলো, আমরা দুজনাতে একদিন পালাই। বলেই থিরপলকে লক্ষ করতে থাকে গোপেশের প্রতিক্রিয়া।

তনুপিসির কথা শুনে গোপেশ বুঝি চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে যান। একেবারে বাক্যিহারা হয়ে যান তিনি।

গোপেশের হতচকিত চোখমুখ দেখতে দেখতে একসময় খিলখিলিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে তনুপিসি। বলে, কী? এক্কেরে বোবা মারিয়া গেলে যে?

গোপেশ বুঝি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন খানিক। তনুপিসির কথাগুলোকে মশকরা বলেই ধরে নিয়েছেন। কাজেই তিনিও একটুখানি পালটা মশকরা করতে চান। বলেন, আমাকে লিয়া কোথায় পালাতে চাস তুই?

—ও মা, তার আমি কী জানি? তুমি পুরুষ মানুষ, তুমিই ঠিক করবে সেটা। তুমি যেখানে লিয়া যাবে, আমি সেখানেই চলিয়াবো। জানো তো, তোমার মতন কাঁচা কাত্তিকের সাথ আমি লরকেও রইতে রাজি।

গোপেশের ততক্ষণে মজা লেগেছে খুব। খুব যেন ভাবছেন ব্যাপারটা নিয়ে এমনই ভঙ্গি করে বলে

ওঠেন, সত্যি, তোকে লিয়া কোথায় যাওয়া যায় বল্ দেখি?

—এক কাজ করো। আমাকে লিয়া তোমার সেই পুরানো অপেরা-দলেই ফিরিয়া চল।

—ধ্যুস, সেখানে গিয়ে আমি পার্ট করব, তুই কুন কচুপুড়াটা করবি শুনি?

—কেন? আমিও ভর্তি হয়্যাবো অপেরা দলে। তুমার সাথ পার্ট করব। তুমি হবে হিরো, আমি হবো তুমার হিরোইন। মানাবেনি আমাকে?

গোপেশের প্রতি নিজের আবাল্যলালিত দুর্বলতার কথাটি দুনিয়ার কারোর কাছেই লুকোতে চায়নি তনুপিসি। এমন কি বিয়ের পর সুভদ্রা-কাকিমা যখন গোপেশের সংসারে পা রাখল, এমন খোলামনের মানুষ ছিল তনুপিসি, দু-চার দিনের মধ্যেই ভাব করে ফেলল সুভদ্রার সঙ্গে। এবং একদিন হুট করে বলেই ফেলল কথাটা, জানিস তো, তোর বরের প্রতি আমার বড়োই দুর্বলতা ছিল। ছেলেবেলা থেকেই বড়ো চাইতাম ওকে মনে মনে। প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া ফেলছিলাম ওকে। এখনও ওকে দেখামাত্তর আমার বুকের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া উঠে রক্ত। সাবধানে রাখিস বরকে, যে কোনও দিন হাতিয়ে লিতে পারি। বলেই নিজের পুলকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠত তনুপিসি।

আর, সুভদ্রা তখন একেবারেই নতুন, তনুপিসিকেও চেনে না, গোপেশকেও নয়। তনুপিসির কথাগুলো শুনতে শুনতে একেবারে কাঠ মেরে যায় সে।



বাস্তবিক, আমাদের চোখে গোপেশকাকা আর নয়নকাকিমা ছিলেন আজীবনকাল অপার রহস্যে মোড়া দুটি মানুষ।

ওঁদের পুরো জীবনটাকেই আমাদের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হয়। কেবল নাটকে গল্পেই ঘটে তেমনটা।

উড়নচণ্ডী ছেলেটির জন্য বুঝি জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্বেগ ছিল গোপেশের বাপ-মায়ের। পড়ন্ত বেলায় যদি কোনওগতিকে ফিরে আসে হতভাগা, এই বিবেচনায় মরবার আগে জমি-জিরেত, ভিটে-পুকুর ভাগাভাগি করে রেখে গিয়েছিল দু-ছেলের মধ্যে। বিষয়-সম্পত্তি যা রেখে গিয়েছিল, নেহাত কম নয় তা। এক ছেলে আর দুই মেয়ে নিয়ে প্রাণেশের তখন ভরভরন্ত সংসার। অন্য কেউ হলে হয়ত-বা সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা পাকাত, কিন্তু প্রাণেশের মধ্যে অত কূটবুদ্ধি কোনওকালেই ছিল না। তার ওপর সহোদর ভাইটিকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন তিনি। ফলে, বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাউন্ডুলে ভাইটিকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার কথা ভাবতে লাগলেন। পাড়া-পড়শি, শুভার্থীদের কাছে মাঝেমাঝেই উত্থাপন করতে লাগলেন কথাটা। ওই সময়টায় আমার বড়োপিসির মতো পাড়ার পোড়খাওয়ারা ধরেই নিয়েছিল, প্রাণেশ যতই চেষ্টা করুক, গোপেশের পক্ষে সংসারী হওয়া সম্ভব হবে না। নয়নতারাই ওকে সংসারী হতে দেবেন না।

সতেরো বছরের নয়নতারা যখন ঘোষ পরিবারে আসেন গোপেশের বয়েস তখন বড়ো জোর ষোলো। সেই প্রথম থেকেই নয়নতারা দেওরটিকে ভালোবাসতেন খুবই। একেবারে সমবয়েসি ছিলেন ওঁরা। সম্ভবত সেই কারণেই একটা বন্ধুত্বের, খুনসুটির সম্পর্ক প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে। সারাক্ষণ দুজনেই দুজনের পেছনে লাগতেন। কথায় কথায় ঝগড়া, অভিমান বুঝি লেগেই ছিল দুজনের মধ্যে।

সতেরো বছরের বউদির সঙ্গে ষোলো বছরের দেওরের এই ধরনের রঙ্গ-রসিকতাগুলো হয়ত বা মানিয়ে যেত, কিন্তু পঁচিশ বছরে ঘরে ফিরেও সে যদি আগের মতোই আচরণ করতে থাকে, আর তাই দেখে পাড়াপড়শির ভুরুতে যদি গভীর ভাঁজ পড়ে তো তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

নয়নতারার সঙ্গে গোপেশের আবাল্য মাখামাখির সম্পর্ক নিয়ে বড়োপিসিদের মনে তো আকণ্ঠ সন্দেহ ছিলই। গোপেশ যে শেষ অবধি নয়নতারার টানেই ওই কুহকিনীর বাঁধন কেটে চলে এসেছেন, এ নিয়ে তাদের মনের মধ্যে কোনওরূপ সংশয়ই ছিল না। কিন্তু স্বয়ং নয়নতারাই যখন গোপেশকে

বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, যখন চর্তুদিকে মেয়ের সন্ধান করতে লাগলেন, পাড়ার প্রবীণার দল সামান্য ধন্ধে পড়ে গেল। কেবল আমার বড়োপিসিই বুক ঠুকে বলতে লাগল, এটা নয়নের একটা ছল। গোপেশ যে কোনও মেয়েকেই পছন্দ করবে না, এটা নাকি তার মতো নিশ্চিতভাবে আর কেউই জানে না। মাঝের থেকে বিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়ে পাড়া-পড়শির মুখও বন্ধ করা গেল, এবং শেষ অবধি বিয়েটা হলও না। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। শ্যাম ও কুল দুই-ই রইল। নয়নের বুদ্ধির তল পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে দুষ্কর।

যাদের মনে বড়োপিসির মতো অতখানি জিলিপির প্যাঁচ নেই, তারাও প্রাণেশ আর নয়নতারার এহেন উদ্যোগকে সমর্থন করতে পারছিল না। গোপেশের জন্য যখন কোমর বেঁধে মেয়ের খবরাখবর নেওয়া চলছে, দেখতে দেখতে তারা প্রাণেশকে দুয়ো দেয়, কিনা, অত যে খাঁচা খুঁজিয়া বেড়াচ্ছ, পাখি খাঁচায় থিতু হবে নাকি শিকলি কাটিয়া ফের উড়িয়া পালাবে, সেটার নিষ্পত্তি কর আগে।

কথাটা প্রাণেশকেও ভাবাচ্ছিল। বাস্তবিক, বিয়ে করবার পরপরই মেয়েটাকে ফেলে গোপেশ যদি শিকলি কেটে হাওয়া হয়ে যায়! যদি চলে যায় ওই কুহকিনীর কাছে! প্রাণেশ এক-পা এগোন তো তিন-পা পেছোন।

অবশেষে, দিন কয়েক বাদে, সমস্যাটার নিষ্পত্তি করে দেন গোপেশ স্বয়ং। বড়োপিসি এবং পাড়ার তাবৎ গবেষক-গবেষিকাদের একেবারে অতল জলে ফেলে দিয়ে এক কথায় রাজি হয়ে যান তিনি। আর, তাতে করে সবাইয়ের মনে ধন্ধটা আরও বাড়ে।

গোপীবল্লভপুরের দিক থেকে একটা গরিব ঘরের মেয়েকে গোপেশের জন্য ঘরে তোলেন প্রাণেশ আর নয়নতারা। মেয়েটি দেখতে তেমন রূপসি নয়। শ্যামলা রঙের ওপর মাঝারি গড়ন তার। একটা রূপবান পুরুষকে মজিয়ে রাখবার মতো রূপ আর ছলাকলা সে ধারণ করে না অঙ্গে। বয়েসটাও একটু বেশি-বেশি লাগে। তবুও গোপেশ রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়ের পর প্রাণেশ গোপেশের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি যথারীতি বুঝিয়ে দেন লোকজন ডেকে। বউ সুভদ্রাকে নিয়ে ভিটেরই একধারে পৃথক সংসার পাতেন গোপেশ। বেশি বয়সের বিয়ে, তাও রূপবান গোপেশকে দেখলে মনে হয়, বউয়ের চেয়ে ঢের কমবয়েসি সে।

বিয়ে করে সুভদ্রাকে ঘরে আনবার পরেও গোপেশ আর নয়নতারার মধ্যেকার সম্পর্কটা একই রকম থেকে যায়। সেই সারাক্ষণ ঠাট্টা-মশকরা, কথায় কথায় মান-অভিমান। নতুন বউ হয়ে এসে সুভদ্রা মুখ কালো করে দেখতে থাকে সেইসব দৃশ্য। দেওর-বউদিতে সারাক্ষণ যেন মজে রয়েছে। একে অন্যকে বুঝি চোখে হারায় প্রতি মুহূর্তে।

দেখতে দেখতে একটু একটু করে গম্ভীর হতে থাকে সুভদ্রা। তার সারামুখে একটু একটু করে মেঘ জমতে থাকে। তার ওপর পাড়ার তথাকথিত শুভাকাঙ্খী প্রবীণারাও যখন সুভদ্রাকে আড়ালে সতর্ক করে দেয়, কিনা, নিজের বরকে সামলে-সুমলে রাখ্ মাগি, শেষমেশ ঘুড়ির সুতাটি কাটিয়া গেলে তখন কাঁদিয়া কূল পাবিনি, কেন কি, পুরুষমানুষ, তা সে যতই কেন ভালোমানুষ হোক, একটুখানি নজরে নজরে রাখতে হয়। আর, গোপেশ তো চিরটাকাল কুহকিনীদের ফাঁদে পড়তে ওস্তাদ।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখের মেঘটা দিন দিন গাঢ় হয়।

দেওরের সঙ্গে মাখামাখিটাকে সুভদ্রা যে সহজভাবে নিচ্ছে না, সেটা নয়নতারা বুঝতে পেরেছিলেন পয়লা চটকাতেই। কাজেই তাঁকে সুভদ্রার ভুল ভাঙাবার দায়িত্বটাও নিতে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে বুঝি সুভদ্রার ভুলটা ভেঙেছিল। অন্তত তেমনটাই মনে হয়েছিল নয়নতারার।

একটা ছেলের জন্য বড়োই সাধ ছিল সুভদ্রার মনে। ফুলশয্যার রাতেই নাকি সে গোপেশের কাছে বায়না ধরেছিল, তাদের প্রথম সন্তানটি যেন অবশ্যই ছেলে হয়। এমনভাবে বলেছিল, যেন গোপেশই সেটা স্থির করবার মালিক। গোপেশের সঙ্গে নয়নতারার এমনই খোলামেলা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, পরের দিনই হাসতে হাসতে কথাটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন বউদির কাছে। গোপেশ বলেছিলেন, সুভদ্রাকে তুমি বোলোনি বউদি, আমার কিন্তু একটা মেয়ের সাধ। নয়নতারাও হাসতে হাসতে সেসব

কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন পাড়া-পড়শির কাছে। বাস্তবিক, একটা মেয়ের বুকের মধ্যেকার এমন একটা পবিত্র বাসনার কথা প্রকাশ করে না বলবারই বা কী আছে!

কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছর পরও যখন গোপেশের কোনও বাচ্চা-কাচ্চা হল না, তখন আমার বড়োপিসির মতো পোড়া খাওয়া মানুষেরা 'কার দোষে বাচ্চা আসছে না সুভদ্রার পেটে' এই নিয়ে প্রবল গবেষণা জুড়ে দেয়। সুভদ্রার মুখে কুলুপ, মেয়েমহলের হাজারো প্রশ্নে সে চুপ করে থাকে।

দাদা প্রাণেশ ঘোষ, বোকাসোকা ভালোমানুষ তিনি, বাউন্ডুলে ছোটোভাইটি বিয়ে থা করে থিতু হবে সংসারে, এমন স্বপ্ন সবে দেখতে শুরু করেছিলেন, গোপেশের বিয়ের পাঁচ বছর পরও সুভদ্রার পেটে বাচ্চা না আসায় তাঁর ভয়টা তো কাটলই না, বরং দিনদিন বাড়তে লাগল তা। সারাক্ষণ তিনি আশঙ্কায় দিন কাটাতে থাকেন, কিনা, আবার না শিকলি কেটে পালায় আদরের ভাইটি তার! কেন কি, বহু ক্লেশে গাছটা যদি বা থাপনা করা গেল সংসারে, চার-পাঁচ বছরেও ফল এল না সে গাছে। কাজেই, কীসের আশায় আর গোপেশের মতো বাউন্ডুলে মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকবে অফলা এক বৃক্ষের তলায়! বিশেষত, যেখানে প্রাণেশের কাছে এমনই খবর রয়েছে যে, অপেরা-দলে থাকাকালীন যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন গোপেশ, তার একটি ছেলেও রয়েছে। ছেলেটি বাস্তবিক কার, গোপেশের সঙ্গে ওই ছেলের সম্পর্ক কতখানি, সে রহস্য হাজার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারেননি প্রাণেশ। এমনটা হতেই পারে যে, ভেতরে ভেতরে গোপেশেরই আত্মজ সে। সুভদ্রার পেটে নিতান্তই যদি কেউ না আসে, কিছুদিন অপেক্ষা করে গোপেশেব পক্ষে তাঁর আত্মজটির কাছে ফিরে যাওয়াটা কি একেবারেই অসম্ভব!

এইসব হাজারো আশঙ্কায় ভুগতে ভুগতেও চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি প্রাণেশ। বাউন্ডুলে ভাইটিকে সংসারে বেঁধে রাখবার জন্য সব চেষ্টাই করেছেন তিনি।

মাঝে মাঝে প্রাণেশ একেবারে ব্যাকুল হয়ে চেপে ধরেন নয়নতারাকে। বলেন, কেন বাচ্চা আসতিছেনি বউমার পেটে? কী বেবস্থা লিচ্ছে অরা? খোঁজখবর লাও। চুপটি মারিয়া বুসিয়া রইলে চলবে?

নয়নতারাও ভেতরে ভেতরে অস্থির ছিলেন। কিন্তু সুভদ্রার পেট থেকে কথা বের করা বুঝি শিবেরও অসাধ্য।

নয়নতারাকে আড়ালে মিনতি করে বলেছেন প্রাণেশ, সুভদ্রাকে বুঝাও বড়োবউ, সে যেন গোপেশটাকে টুকচার যত্নআত্তি করে। সে যেন আবার না উড়িয়া পালায়। বল, যেন এক্কেরে পাকে পাকে বাঁধিয়া ফেলে উড়নচণ্ডীটাকে।

শুনে নয়নতারা এমনই গম্ভীর মুখে তাকান স্বামীর দিকে, এমনই থমথমে হয়ে ওঠে ওঁর মুখ, প্রাণেশ আরও ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকেন।

ততদিনে পাড়াময় হাজারো কথার বীজ পুঁতেছে নানাজনে। সেইসব বীজ থেকে চারা গজিয়েছে রাতারাতি। শনৈশনৈ বাড়ছে তারা, ডালপালায়, আকারে-কলেবরে বাড়ছে।

কেউ বলে, বিয়ে করেছে বটে গোপেশ, কিন্তু সুভদ্রার পেটে বাচ্চা আসুক এটা সে চায় না, কেন কি, তার বংশধর তো কোথায় যেন বাড়তিছে। ওটাই তো তার আসল সংসার। এই বিয়েটা লোক-দেখানো। স্রেফ পাড়াপড়শি পাঁচজনের মুখ চাপা দেওয়ার জন্য।

কেউ বলে, সুভদ্রার শরীরে দোষ রয়েছে। তার বড়ো বোনটারও নাকি কাচ্চাবাচ্চা হয়নি।

সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্তটা আড়ালে-আবডালে চাউর করতে থাকে বড়োপিসির দল। এই বাচ্চা না হওয়াটা নাকি নয়নেরই একটা চাল। তারই ইন্ধনে গোপেশ নাকি সুভদ্রার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ই না। সে কুহকিনী তো গোপেশকে জাদু করেছে সেই কবে থেকে। সে যা বলবে, গোপেশ তাই শুনবে। সুভদ্রাকে নামকা ওয়াস্তে বউ সাজিয়ে রেখে রূপবান দেওরের শরীর নিয়ে আসল মজাটা সেই মাগিই লুটতে চায়।

কিন্তু সুভদ্রাই বা এই ব্যবস্থাটা মেয়ে হয়ে মেনে নিচ্ছে কেন? মা হতে সাধ হয় না তার? তার জবাবও বড়োপিসিদের মুখে তৈরি, কিনা, গরিব ঘরের মেয়ে সে, ছ-বোনের মধ্যে সেজো, বাপটা হাঁপানির

রোগী, ভাইগুলোও অপগণ্ড, ঘোষদের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েই তো বর্তে গিয়েছে সে, গোপেশের কিংবা নয়নের কাজের প্রতিবাদ করবে, হেন সাহস তার কোথায়? তাড়িয়ে দিলেও উঠবে কোথায়? বাপ-ভাই তো ওকে ভিটে মাড়াতেও দেবে না।

যার যেটার অভাব, তাই নিয়েই বুঝি তার যাবতীয় খিদে। সুভদ্রার মধ্যে এমন এক মা-মা ব্যাপার ছিল, ফলে, পেটে ছেলে এল না বটে, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই তার মধ্যে ওই মা-মা ভাবটা বেড়ে যেতে লাগল দিন দিন। তার ফল হল এই, নয়নতারার এক ছেলে এবং দু-মেয়ে দু-দিনেই তার ন্যাওটা হয়ে যায়। দিনের অধিকাংশ সময় কাকিমার সান্নিধ্যেই কাটাতে ভালোবাসে তারা। খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-ঘুমোনো, সবই কাকিমার কাছে। সুভদ্রাও ওদের বলতে অজ্ঞান। সারাক্ষণ বাচ্চাগুলোকে চোখে হারায় বুঝি। নয়নতারাও নিজের ছেলেমেয়েগুলোকে সারাক্ষণ এগিয়ে দেন সুভদ্রার দিকে।



তখনকার দিনে বউয়ের পেটে বাচ্চা না এলে সবাই দোষ দিত বউকেই। এবং সম্পন্ন পরিবারের ছেলেদের মধ্যে আর একটি বিয়ে করবার চল ছিল। কাজেই, কিছুদিন বাদেই প্রাণেশ ছোটোভাইটিকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার জন্য পীড়াপীড়ি জুড়ে দেন। কিন্তু গোপেশ প্রস্তাবটা তো পত্রপাঠ বাতিল করে দেনই, তার ওপর সবাই অবাক হয়ে দেখে, ছেলে না হওয়া নিয়ে গোপেশের মনে যেন কোনওরূপ তাপ-উত্তাপ নেই।

দেখেশুনে পোড়খাওয়া মানুষজনের ভুরুতে গভীর ভাঁজ পড়ে। আশঙ্কা হয়, এবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা টিকে থাকলে হয়! কেন কি, সাধারণত ছেলেপুলে না হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেকার সেই আঠালো ভাবটাই একটু একটু করে তার ঘনত্ব হারাতে থাকে। বাঁধনটা একটু একটু করে ঢিলেঢালা হয়ে আসে।

গোপেশের বয়েস তখন তিরিশের কোঠা পেরোয়নি। তার চেয়েও বড়ো কথা, তার টকটকে গায়ের রং, আর সারা শরীর জুড়ে এমনই এক কমনীয় লাবণ্য ছিল, বয়েসটা একেবারেই চাপা পড়ে যেত। যেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের টাটকা যুবক সে। ফলে, চারদিক থেকে কনের বাবারা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু ধোপে টেকে না একটাও। কেন কি, বেঁকে বসেন স্বয়ং গোপেশই। কোনও এক রহস্যময় কারণে তিনি আর বিয়ে করতেই চান না। পাড়াসুদ্ধ মানুষের অনুরোধ-উপরোধেও তিলমাত্র টলানো যায় না তাকে। তা বলে আবার বাউন্ডুলে জীবনে ফিরেও যান না তিনি। তাই দেখে বড়োপিসির চোখমুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেন কি, গোপেশের সঙ্গে নয়নতারার সম্পর্ক, গোপেশের বিয়ে, বাচ্চা না হওয়া ইত্যাদি নিয়ে তার এতকালের গবেষণা একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা খুঁজে পায়, যখন সুভদ্রার পেটে দীর্ঘদিন বাচ্চা না আসা সত্ত্বেও গোপেশ দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন না কিছুতেই। এতদিনে তাদের চোখে অঙ্কটা একে-একে দুই হয়ে মিলে যায়, কিনা, এই কথাটাই তো আমরা বলতেছিলাম কদ্দিন ধরিয়া। গরিবের কথা বাসি হইলেই মিঠা হয়। এবারে বুঝলে তো? একেবারে জলের মতো সোজা হইয়া গেল তো বেপারটা? অঙ্কটা মিলিয়ালো তো? তাই তো বলি, নয়নের বুদ্ধির সঙ্গে পারবে কে? এমন কলির কেষ্টর মতো রূপ দেখিয়া সেই প্রথম দিন থেকেই মজিয়া রইছে মাগি। যতই ভুবন কপাট আইসিয়া কুন্ এক কুহকিনীর গল্প শুনাক, আমরা জানতামই, গোপেশ একদিন-না-একদিন নয়নের টানে ফিরিয়া আইস্‌বেই। আর, নয়নের তো বুদ্ধির সীমা-পরিসীমা নাই। তাই পাড়া-পড়শির মুখ বন্ধ করতে বিয়ে-কে-বিয়ে দেওয়াও হল, বাচ্চা যাতে না হয় তারও বন্দোবস্ত করা গেল। এবার সুভদ্রা রইল সুভদ্রার মতো, ঢ্যামনা-ঢ্যামনিকে আর দ্যাখে কে! এখন বউদি-দেওরে, আসল বিপদটা না বাধিয়ে, যতই না কেন ফস্টিনস্টি করুক, কারোর পক্ষে কিচ্ছুটি বুঝবার জো নেই। এক্কেবারে আগের থেকে কষা অঙ্ক। ভুল হবার উপায় নাই।

এসব কথা প্রাণেশের কানেও যে সাতমুখ ঘুরে আসে না, তা নয়। নয়নের কানেও আসে। প্রাণেশ

এমন কথা শোনামাত্রই ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। পচা মন যাদের তারাই এমনটা ভাবে। আমি আমার বউকেও চিনি, ভাইকেও।

আর, নয়ন, তিনি শুধু দিন দিন গম্ভীর হতে থাকেন। তার বিষণ্ণ চোখদুটোর মধ্যে সেই অস্থির পাখিদুটো বুঝি খাঁচার ভেতর থেকে নীল আকাশের দুনিয়ায় বেরোবার জন্য মরণপণ ছটফট করতে থাকে।

গোপেশ-সুভদ্রার বাচ্চা না হওয়ার ঘটনাকে বড়োপিসিরা যেভাবে ব্যাখ্যা করল, পাড়ার মধ্যে তার প্রতিপক্ষ দলটি তার সঙ্গে একমত হয়নি কোনওদিনই। তাদের মতে, কেউ আটকে দিয়েছে। আর, এ ব্যাপারে যাকে তাদের সবচেয়ে বেশি সন্দেহ, সে আর কেউ নয়, তনুপিসি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কাউকে লাগিয়ে কাজটা করিয়েছে তনুপিসিই। অবিশ্বাসীজনরা যখন তাদের চেপে ধরে, কিনা, এমন আঁকাড়া সন্দেহের হেতু কি, তার জবাবে তারা সারামুখে দুনিয়ার প্রাজ্ঞতা ফুটিয়ে জবাব দেয়, তনু যে গোপেশের জন্য পাগল ছিল, তা তো দুনিয়ার লোক জানে। গোপেশকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ফন্দিও এঁটেছিল সে। গোপেশই রাজি হননি। তাই, তিনি যখন পাঁচজনার অনুরোধে উপরোধে বিয়ে করে ফেললেন, তনুপিসি চায়নি, তার ভালোবাসার মানুষটি অন্য কারোর শরীরে বীজ ঢেলে ফসল ফলাক।

বড়োপিসির প্রতিপক্ষের কথাটা যখন একটু একটু করে বিশ্বাস করছে অনেকেই, তখনই পুরুষোত্তমপুর থেকে ওঝা এল সুভদ্রাকে ঝাড়তে। বেশ কয়েকবার এল ওরা। কিন্তু বাঁধন খালাস করতে পারল না।

অবশেষে একদিন কল্পনাথের কাকা, আমাদের সবাইয়ের বাণীবিনোদকাকা—তাঁর অগাধ জ্ঞানের তল পায় না সন্ধিপুরের মানুষ, সেই কারণেই অনেকের তিনি দু-চোখের বালি, অনেকে আবার তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত সমীহ করে,—গোপেশকে ডেকে একান্তে বলেন, এযুগের ছোকরা তুই, কী গুণিন-ওঝা করছিস! দুজনে ডাক্তারের কাছে যা। পরীক্ষা-টরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা-টিকিৎসা করা।

বাণীকাকার অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে গোপেশ সুভদ্রাকে নিয়ে মেদিনীপুর শহরে যান ডাক্তার দেখাতে। শ্বশুরবাড়ি হয়ে প্রায় হপ্তাটাকা বাদে ফেরেন তিনি। গুম মেরে থাকেন আরও কয়েক দিন।

প্রাণেশ আর নয়নতারার ততদিনে কৌতূহলে, উৎকণ্ঠায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম।

ওদেরই নিরবচ্ছিন্ন জেরার মুখে একদিন গোপেশ ফাঁস করে দেন সব রহস্য। সবাইকে খোলসা করে জানিয়ে দেন ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল। নিজের মুখে কবুল করেন, দোষ রয়েছে তাঁর নিজেরই শরীরে। বাচ্চা না হওয়ার যাবতীয় দায় তাঁরই। সুভদ্রা সম্পূর্ণ সুস্থ। রীতিমতো মেদিনীপুরে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তার রায় নিয়েই এমন কথা বলছেন তিনি।

সন্ধিপুরের পুকুরে সেটা ছিল এক বড়োসড়ো রকমের ঢিল। ফলে, তরঙ্গ ওঠে চতুর্দিকে।

মেয়েমহল গোপেশের এমন উদারতা দেখে যারপরনাই বাহবা দেয় তাকে, কেন কি, সাধারণত এমন ক্ষেত্রে ব্যাটাছেলেরা কথাটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে না, বরং যাবতীয় দোষের দায় চাপিয়ে দেয় বউটির ঘাড়ে। তার ফলে বউটিকেই আজীবনকাল বাঁজা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন কাটাতে হয়। আঁটকুড়ি নামটা তার কপালে স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে যায়। কেবল গোপেশের বেলায় হল তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

গোপেশ ফিরে এসে ডাক্তারের রায়টি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবার পর শুভার্থীদের মুখে মেঘ জমে ঘন হয়।

কেবল তনুপিসির চোখদুটি দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দিন-কয়েক বাদে একদিন পুকুরপাড়ে ওৎ পেতে ছিল তনুপিসি। গোপেশ পথ হাঁটছিলেন আপন খেয়ালে। আচমকা ওঁর পথ আগলে দাঁড়ায় তনুপিসি। গোপেশের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই মুচকি হাসে। দু-চোখে বিজলি হেনে বলে, কী ব্যাপার, খবর যা শুনলাম, সত্যি?

—কার খবর? কীসের খবর? গোপেশ গম্ভীর মুখে তাকান।

—ডাক্তারি পরীক্ষায় নাকি তুমারই দোষ বেইরেছে?

কথাটা শোনামাত্র গোপেশের সারামুখে বুঝি একপোঁচ কালি লেপে দেয় কেউ। সন্তান উৎপাদনের অক্ষমতা, পুরুষের কাছে এর চেয়ে ব্যর্থতা কিছু হয় না। খুব বিষণ্ণ গলায় গোপেশ বলেন, ঠিকই শুনেছু রে তনু। কী করব বল্, অদৃষ্ট। অদৃষ্টের উপর মাইন্‌সের হাত নেই।

—আ-হা, এর তরে অত দুঃখু করবার কী আছে গো? চোখের তারায় ঝিলিক মেরে তনুপিসি বলে, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে তো। সেই বলে না, ভগবান যা করেন মঙ্গলের তরে।

—আমার ভালো হইল এতে? গোপেশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তনুপিসির দিকে।

গোপেশকে ব্যাপারটা ভেঙে বোঝাতে থাকে তনুপিসি। বলে, ভালো মানে ভালো, তুমারই তো পোয়াবারো গো। সেই তুলনায় বইল্‌তে গেলে সুভদ্রারই তো হইল বিপদ।

—মানে? তনুপিসির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান গোপেশ।

—বা-রে। তনুপিসির চোখেমুখে ততক্ষণে উপচে পড়ছে চাপা কৌতুক। চোখ মটকে বলে, সুভদ্রা উলটাপালটা কিছু করলেই ধরা পড়িয়াবে, কিন্তু তুমি যে-কারোর সাথে যা খুশি কত্তে পার, ধরা পড়বার সামান্য সম্ভাবনা নাই। বলেই এমন চোখে তাকায় তনুপিসি, চমকে ওঠে গোপেশ, কেন কি, সে চোখের তারায় ততক্ষণে ফুটে উঠেছে নীরব আমন্ত্রণ।

মাথার ওপর গাছের ডালটাতে বসে বসে কা-কা করতে থাকা কাকটাকে হাতের মুদ্রায় তাড়িয়ে দেয় সে।

কেবল বড়োপিসিরাই ছিল ব্যতিক্রম, এছাড়া পাড়ার অনেক অভিজ্ঞ মানুষই এমন আশঙ্কা পোষণ করেছিল যে, গোপেশের সঙ্গে সুভদ্রার সম্পর্কটা শেষ অবধি ভেঙেই যাবে।

এমন আশঙ্কার আরও একটা শক্তপোক্ত ভিত ছিল। গোপেশের মধ্যে তো আবাল্য একটি বাউন্ডুলে মানুষের বসবাস। আর, বাউন্ডুলে মানুষের ঘরের চাবিকাঠিটি তার নিজের কাছে থাকে না কখনোই। সতেরো বছর বয়েসে ঘর ছেড়েছিলেন তিনি। ফিরে আসেন প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি। এবং ওই ক-বছরে তিনি কেবল দশঘাটের জলই খাননি, শোনা যায়, ওই যে একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে সংসার পাতবার কথাটা ডালপালা মেলে বেড়েছে সন্ধিপুরের প্রত্যেকটা মানুষের মনে, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও তো গোপেশ পেতেছিলেন সংসারটা। এবং যে মেয়েটিকে নিয়ে তিনি ঘর বেঁধেছিলেন, সেই মেয়েটি নাকি ছিল সব অর্থেই এক কুহকিনী। বিশেষ করে যখন গোপেশের বাবা মারা গেল, খবরটা দিতে এবং ওই উপলক্ষ্যে তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে দূত হয়ে যে গিয়েছিল, সেই ভুবন কপাট শুধু যে সেই কুহকিনী নারীটিকে স্বচক্ষে দেখেছিল তাই নয়, তার কুহকিনী স্বভাবের অনেক ফেনায়িত গল্পও শুনে এসেছিল বহুজনের থেকে। সেই সংসারের সামাজিক বৈধতা কতখানি ছিল, তার পেছনে শরীরী লালসাটাই মুখ্য ছিল কিনা, দু-দিনের জন্য গোপেশের চোখে রং লেগেছিল কিনা, এসব বাস্তবিক বলা দুষ্কর। তবে, পুরুষের পক্ষে শরীরী লালসা কিংবা চোখের রংও কিছু কম কথা। কাজেই, সেই কুহকিনীকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে সুভদ্রার মতো একটি অফলা গাছের শরীর জড়িয়ে কতদিন থাকবেন গোপেশ, কেনই বা থাকবেন, সে বিষয়ে গাঢ় সংশয় ছিল অনেকেরই মনে।

এ দুনিয়ার দুটি মানুষের সম্পর্ক ঠিক কোন আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া থাকে, এ বিষয়ে নানান মুনির নানান মত।

এ বিষয়ে বাণীবিনোদকাকা তত্ত্বকথা শোনান। বলেন, মানুষে মানুষে সম্পর্কটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বার্থের ওপর। স্বার্থের বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই মায়াবৎ মিথ্যে।

কথাটা শুনে, সেই ছেলেবেলায়, আমি আর কল্পনাথ প্রতিবাদ করে উঠতাম। বলতাম, তাই আবার হয় কাকু? বাবা, মা, ভাই, বোন, মায়া-মমতার বাঁধনে জড়ানো এইসব সম্পর্কগুলো একেবারে ভুয়ো?

—একেবারেই ভুয়ো। একেবারেই বানানো। মানুষ নিতান্তই স্বার্থের কারণে ওগুলো সম্পর্কের শরীরে যত্ন করে মাখিয়েছে যুগেযুগে। চিরকালই তাই ঘটেছে। জানিস তো, একটা সময় ছিল, যখন মানুষে-মানুষে কোনও সম্পর্কই ছিল না। একেবারেই একা-একা থাকত মানুষ। কেউ কাউকে চিনতই না তেমন করে। একা একা ঘুরত, খাদ্য-খাবার খুঁজত, আত্মরক্ষা করত, মরতও একা একা। এমন সময়

এল, যখন মানুষ বুঝল, একাএকা বাঁচার চেয়ে একসঙ্গে একজোট হয়ে থাকলে তাদের অনেক বেশি লাভ। একসঙ্গে শিকার করতে গেলে সহজে জীবজন্তুকে কবজা করা যায়। বন্যজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও সংঘবদ্ধ হয়ে থাকাটা অনেক বেশি সুবিধের। ফলে, মানুষ একদিন সমাজ গড়ল। একেবারে স্বার্থের খাতিরেই সমাজবদ্ধ হয়েছিল মানুষ। তারপর ধীরে ধীরে এল পরিবারের ধারণা। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে...। অবাধ যৌন সংসর্গে বাচ্চাগুলোকে মানুষ করা যাচ্ছিল না। মুক্ত পুরুষ ও মুক্ত নারীর অবাধ সংগমের পরিণতিতে যে বাচ্চা হত, একটা সময়ের পর তারা অনাথ হয়ে যেত। পর্যাপ্ত দেখভালের অভাবে মারা যেত অকালে। অথচ সে যুগে বেশি বেশি মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিল। শিকার করা, আত্মরক্ষা করা, দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ানো, সবকিছুর জন্যই বহু সংখ্যক মানুষের দরকার হত। বাচ্চাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই মানুষের সমাজ একসময় পরিবার-প্রথার জন্ম দেয়। একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর আজীবনের সম্পর্কের ধারণা তৈরি করে। তাদের দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চাগুলোর সঙ্গেও একটা আবেগের সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। সেইসব আবেগ ঘন হতে হতে, পল্লবিত হতে হতে আজকের দিনের রমণীয় সম্পর্ক-বৃত্তটি তৈরি হয়েছে।

গোপেশ আর সুভদ্রার সম্পর্ক টিকে থাকবার প্রসঙ্গে আমাদের জন্মের ঢের আগেই নাকি তেমন মন্তব্যটা করেছিলেন বাণীবিনোদকাকা, কিনা, মানুষে মানুষে সম্পর্কটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বার্থের ওপর। স্বার্থের বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই মায়াবৎ মিথ্যে।

বাণীবিনোদকাকার কথা যদি সত্যি হয়, তবে গোপেশের সঙ্গে সুভদ্রার সম্পর্কের মধ্যে কতখানি এবং কী ধরনের স্বার্থ ছিল, তা নিয়ে সেই ছেলেবেলাতেই আমি আর কল্পনাথ অল্পস্বল্প গবেষণা করতাম। গোপেশের ছেলেপুলে হওয়ার কোনও আশা নেই। তাঁর নিজের শরীরেই দোষ রয়েছে, এমন কথাটা তিনি নিজের মুখে কবুলও করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আর যখন দ্বিতীয়বার বিয়েই করলেন না কিছুতেই, তখন কথাটা আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছিল সবাই। সবাই তখন গোপেশের দ্বিতীয়বার বিয়ে না করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল এই কারণে যে, দুটো কেন, একশোটা বিয়ে করলেও যখন বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, গোড়াতেই যখন গলদ, কী হবে দু-টা মেয়ার সর্বনাশ করিয়া? একটা কাঁদছে, কাঁদুক। তখন উঠল সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। বাস্তবিক, সুভদ্রা তখন দিনরাত কেবল কেঁদেকেঁদে বুক ভাসাচ্ছে।

একদিন নয়নতারা সুভদ্রাকে একান্তে কাছে ডাকেন এবং প্রস্তাবটা দেন।

বলেন, হ্যাঁ রে ছোটো, নিজের পেটে একটাকে ধরতে পারলিনি, সে দুঃখ ঘুচাবার সাধ্যি নাই আমার, কিন্তু ভাবিয়া দ্যাখ আমার একটিকে যদি দিই তোকে, লিবি?

নয়নতারার তখন এক ছেলে, দু-মেয়ে।

সুভদ্রা এমন প্রস্তাবে ভারী আশায় আশায় তাকায় বড়ো জায়ের দিকে। কথাটাকে নিয়ে নিজের মধ্যে বেশ কয়েকদিন খই ভাজবার আদলে নাড়াচাড়া করতে থাকে সে। অবশেষে একদিন আচমকা বায়না ধরে বসে, লিতে পারি, কিন্তু আমার ছেলে চাই। নয়নতারার তখন দুটো ছেলেই নেই তো দেবেন কোত্থেকে।

নয়নতারা হেসে বলেন, আমার তিনটাই তো তোরই ন্যাওটা। তোরই তো ছেলে-মেয়ে ওরা। তুই-ই তো বলতে গেলে মানুষ করছিস সব ক-টাকে। তোর জন্য তো সারাক্ষণ অজ্ঞান ওরা। আমার কাছে আর কতক্ষণ থাকে? স্বপনটা তো মনে মনে বোধ লেয় তোকেই মা বলিয়া মনে করে। তুই তিনটাকেই লে না।

কিন্তু এতে করে সুভদ্রাকে ভোলাতে পারেন না নয়নতারা। সুভদ্রার বায়না একটুও থামে না। বলে, না, ওতে হবেনি, একেবারে নিজের মতো করিয়া দাও। একেবারে প্রথম থেকেই আমার হবে ও।

নয়নতারা মুখ টিপে হেসেছিলেন জায়ের আবদারে। বলেছিলেন, তাহলে সবুর ধর, পরেরটা হইলে, তোকে দিব। একেবারে নাড়ি কাটবার পর থেকে ও হবে তোর ছেলে।

প্রাণেশও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন কিছুদিন ধরে। বাস্তবিক, ছোটো ভাইটার যদি সত্যিসত্যি

বাচ্চাটাচ্চা না হয়, তবে ওর সম্পত্তির ওয়'রিশ হবে কে? নয়নতারার প্রস্তাবটা তারও মনমতো হল খুব।

বলেন, সেই ভালো। পরেরটা হইলে অকে প্রথম থেকেই দিয়ে দাও। একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকে মনের মতো করিয়া মানুষ করুক। একেবারে নিজের মতো করিয়া গড়িয়া লিক।

নয়নতারার সিদ্ধান্তটা পাড়াময় চাউর হতে সময় নেয় না। কিন্তু বড়োপিসি ভুরুতে ভাঁজ তুলে ওই অঙ্গীকারের অসারতা প্রমাণ করে দেয় এক কথাতেই।

বলে, নয়নের এ এক চালাকি বই নয়। পরের বারে যে ব্যাটাছেলে হবেই তার কুনো গেরেন্টি আছে?



ইদানীং সুভদ্রা মাঝেমাঝেই মাথার যন্ত্রণায় ভুগছিল।

যখন ধরত, মাথা একেবারেই তুলতে পারত না।

নানাজনে নানা উপায় বাতলায়, টোটকা দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

যেদিন তার মাথা জুড়ে ওই বিষ-যন্ত্রণাটা শুরু হয়, সেদিন আর কিছুতেই উঠে বসতে পারে না সুভদ্রা। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, সব কিছু পড়ে থাকে। তার জন্যে অবশ্য ভাবতে হয় না সুভদ্রাকে। খবরটা পাওয়া মাত্র ও-বাড়ি থেকে নয়নতারা দৌড়ে এসে সাত হাতে সামলে দেন সবকিছু। রান্নাবান্না করে ঢাকা-চুকো দিয়ে সুভদ্রার মাথায় কিছুক্ষণ হাত-টাত বুলিয়ে চলে যান।

আমার বড়োপিসি বলে, এ অন্য কারণে মাথার যন্ত্রণা। পেটে একটা না আইলে সারার লয়। এরপর আরও কত উপসর্গ দেখা দিবে।

তারপর..., একদিন সন্ধেবেলায়, সুভদ্রা মাথার যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে শুয়ে ছিল শোওয়ার ঘরে, ওদিকে প্রাণেশ গেছে নাট-মণ্ডপে কীর্তন শুনতে, আর নয়নতারাদের উঠোনটা জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে।

মাঝ-উঠোনে মাদুর পেতে বউদি-দেওরে মিলে সাপ-লুডো খেলছিলেন। খেলা যত না, ঠাট্টা-মশকরাই বেশি। ইদানীং ওটা যেন আরও বেড়েছে।

আগে এমন দৃশ্য দেখলে সুভদ্রার সারামুখে আষাঢ়ের মেঘ জমত। কারণ, এই দুনিয়ার কোনও মেয়ের পক্ষেই তার স্বামীর এমন অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশাটাকে সহজ মনে মেনে নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে গোপেশকে এ ব্যাপারে কোনওকালেই সন্দেহ করে না। কেন কি, বিয়ের কনেটি হয়ে এ-ঘরে পা রাখা ইস্তক তো সে দেখে আসছে দেওর-বউদির এমন মাখামাখি। তাও হয়ত বা মেয়েলি স্বভাববশত সে বাঁকা চোখে দেখতে পারত ব্যাপারটাকে, কিন্তু যেদিন থেকে সে শুনেছে, গোপেশের অক্ষমতার কথাটা, সেদিন থেকেই তার মনের মধ্যেকার যাবতীয় কাঁটা বুঝি নিঃশেষে উপড়ে ফেলেছে। ব্যাপারটাকে সহজ মনেই মেনে নিয়েছে সে। গোপেশ যখন খুশি নয়নতারার সঙ্গে ঠাট্টা-খুনশুটি করেন, তাঁর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান, কখনও বা তার কোলে ধপ করে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন।

নয়নতারা হাসেন, প্রশ্রয় দেন। মুখে কপট রোষ ফুটিয়ে বলেন, এতখানি বয়েস হইল, তোমাব ছেলেমানুষি কাটবে কবে, অ্যাঁ? সুভদ্রাকে ডেকে দেখান দৃশ্যটা। দ্যাখ লো, সুভদ্রা। তোর বরের কোলে শুবার শখ হয়েছে। বলেই গোপেশের মাথাটি কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চান। বলেন, এতই যদি কোলে মাথা দিয়ে শুবার শখ, তবে নিজের বউয়ের কোলে মাথা দিয়ে শোও গিয়ে।

গোপেশ প্রাণপণে মাথাটাকে শক্ত করে চেপে রাখতে চান নয়নতারার কোলের ওপর। তাই দেখে সুভদ্রাও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

সেই সন্ধেয়, জ্যোৎস্নাভরা মাঝ উঠোনে বসে সাপ-লুডো খেলায় মশগুল ছিলেন দুজনে। গোপেশের ঘুঁটিটা বার বার সাপের পেটে গিয়ে থেমে যাচ্ছিল। ঘুঁটি চালনায়ও বারবার ভুল হচ্ছিল তাঁর। সেদিন মনটা তাঁর কেন জানি খুব উড়ুউড়ু ছিল। ওই নিয়ে নয়নতারা মাঝে মাঝে দুষছিলেন

গোপেশকে। বলেন, খেলায় মন নাই তো, যাও, বউয়ের মাথাটা টিপে দাও গিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতের একটা নিজস্ব রহস্যময়তা রয়েছে। গলানো সোনার মধ্যে দুনিয়াকে মায়াবী লাগে। মনের আঁটোসাঁটো বাঁধনগুলো ঢিলেঢালা হয়ে যায়।

এক সময়ে খেলা থামিয়ে, ফিনফিনে জ্যোৎস্নার মধ্যে নয়নতারার মুখের দিকে তাকান গোপেশ।

নয়নতারা বলেন, কী হইল? ঘুঁটিটায় চাল দাও।

গোপেশ বুঝি শুনতেই পান না নয়নতারার কথা। ওঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকেন।

একসময় ঠাট্টার ছলে আচমকা তোলেন কথাটা। বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন, তুমি যে সুভদ্রাকে কী একটা দিবে বলিয়া কড়ার করেছ, তার কদ্দূর-কী হইল?

আচমকা কথাটা শুনে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না নয়নতারা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন গোপেশের দিকে। বলেন, কী আবার দিব বলেছিলাম?

—বা-রে, দুনিয়াময় ঢাক পিটিয়া বললে, এর পরের বাচ্চাটা অকে দিবে, এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলে?

নয়নতারা আকাশ থেকে পড়েন। দু-চোখে কপট রোষ নিয়ে তাকান গোপেশের দিকে।

নয়নতারার রোষটাকে বড়ো একটা পাত্তা দেন না গোপেশ। ব্যাকুল গলায় বলেন, কবে দিবে, বল না? আমার যে আর তর সইছেনি। একটু জলদি-জলদি করো না গো।

নয়নতারার দু-চোখের কপট ভ্রূকুটিগুলি প্রকট হয়। খর-দৃষ্টি নিয়ে তাকান দেওরের দিকে। চোখ পাকিয়ে বলেন, মশকরা হচ্ছে? আমি তোমার বউদি না?

—মশকরা নয়। গোপেশের গলা থেকে ব্যাকুলতা বুঝি ঝরে ঝরে পড়ে, সত্যি আমার আর সবুর সইছেনি।

বিস্ময় আর লজ্জার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেন নয়নতারা। আলগোছে আকাশের চলমান চাঁদটার দিকে অপাঙ্গে তাকান। মুখ টিপে হাসেন। বলেন, ধৈর্য ধরতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। সেই আছে না, অসময়ে ফলে না বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।

সে সন্ধ্যায় ফুরফুরিয়ে হাওয়া বইছিল খুব। নয়নতারার খোলা চুল, শাড়ির আঁচল, পতপতিয়ে উড়ছিল। চাঁদের আলোয় চারপাশের সবকিছুকে কেমন মায়াবী লাগছিল।

গোপেশও নির্নিমেষ চাঁদটাকে দেখতে থাকেন। উতল হাওয়া মেখে নিতে থাকে শরীরে। একসময় খুব মৃদু গলায় বলেন, একটা কথা বলব, বউদি?

—কী কথা? জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারিতে নয়নতারা চোখ ফেলেন গোপেশের মুখের ওপর।

—বলছিলাম কী, দিবেই যখন, একেবারে আপনার করিয়া দাও।

—মানে? নয়নতারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন দেওরের দিকে।

—মানে, একেবারে আপন ছেলে। একেবারে নিজের রক্ত থেকে জাত।

দু-চোখে দুনিয়ার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন নয়নতারা।

সহসা তাঁর চারপাশে যাবতীয় হাওয়া-চলাচল থেমে যায় বুঝি। জ্যোৎস্নাটাকে কুহকিনীর মতো লাগে। নয়নতারার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। রক্তের মধ্যে শুকনো শিরীষ ফলের বীজগুলো ঝনঝন আওয়াজ তোলে। একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায় শরীর। সহসা গোপেশের কথার কোনও জবাব দিতে পারেন না। গোপেশের মুখের দিকে তাকাতে অবধি পারেন না তিনি।

জ্যোৎস্নাটা আরও গাঢ় হয়ে আসে। শনশনিয়ে হাওয়া বয়। সে সন্ধেয় আর সাপ-লুডোর খেলাটা জমে না।

একসময় নয়নতারা নিজেই ভেঙে দেন খেলাটা। বলেন, সুভদ্রার বুঝি খুবই মাথা ধরেছে আজ। যাও, দ্যাখো গিয়া, কেমন আছে সে।

গোপেশকে আর কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ান নয়নতারা।

মাথার ওপর চাঁদটা শরশর করে হাঁটতে হাঁটতে কোন অনির্দিষ্টের পথে পাড়ি দেয়।

সেই এক সন্ধ্যেয় গোপেশের আলগোছে উচ্চারণ করে ফেলা কথাগুলো নয়নতারার মনের মধ্যে

তীব্র আলোড়ন তোলে। কিছুতেই কথাগুলোকে ভুলতে পারেন না তিনি। তার মনের মধ্যে কেবলই পাক খেয়ে বেড়ায় কথাগুলো। চেতনে অচেতনে সারাক্ষণ ঘাই মারতে থাকে। তিলমাত্র সুস্থির থাকতে দেয় না নয়নতারাকে। তাঁর দু-চোখের মধ্যেকার বন্দী পাখিটা বহুদিন বাদে আবার খাঁচা থেকে বেরোবার জন্য অস্থির দাপাদাপি জুড়ে দেয়।

সেই সন্ধেয় গোপেশের প্রস্তাবটা নয়নতারার মনে একটি দু-ফলাওয়ালা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল।

গোপেশের মূল প্রস্তাবটার পিছু পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে আরও একটি দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ান নয়নতারা। মনের মধ্যে নিদারুণ ধন্ধ শুরু হয়, কিনা, গোপেশ যদি সত্যি সত্যি তেমন শক্তি রাখেন, তবে তিনি কেন তা সুভদ্রার ওপর প্রয়োগ করলেন না? এ কী রহস্য?

এ প্রশ্নের জবাব বহুদিন যাবৎ পাননি নয়নতারা। গোপেশকে জিজ্ঞেস করেও তেমন কোনও সদুত্তর পাননি তিনি।

যেদিন দিবাকরকে সুভদ্রার কোলে তুলে দিলেন নয়নতারা, সুভদ্রার সারা মুখ এক জ্যোতির্ময় আলোয় ভরে গিয়েছিল।

বুকের মধ্যে অকস্মাৎ হাজার-হাজার পাখির কলতান। আচমকা একটা জ্যান্ত বাচ্চার মালিকানা পেয়ে যাওয়ার আনন্দটা সে কেমন করে উপভোগ করবে সেটাই বুঝি ভেবে পাচ্ছিল না।

নয়নতারা ও ঈশ্বরের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল তার মন। ব্যাপারটা তখনও অবধি পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। নয়নতারার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে শুধিয়েছিল, এক্কেবারে সবদিনের মতন দিয়া দিলে তো, দিদি?

নয়নতারা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, এক্কেবারে সবদিনের তরে।

—আর কুনোদিনও ফেরত চাইবেনি তো?

নয়নতারা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা দিলাম, তা আবার ফেরত চাইব? আমাকে এই চিনলি তুই?

আচমকা একটা খেলার পুতুলের দখল পেয়ে যাবার মতোই হয়েছিল ব্যাপারটা, সুভদ্রার কাছে। পুতুল খেলায় একেবারেই মেতে গিয়েছিল সে।

সেই যে রয়েছে না, লোভনীয় মিঠাইটি পেলে দলবলের থেকে দূরে সরে গিয়ে আলাদা করে বসে খায় দলের সন্দেহবাতিক স্বার্থপর বাচ্চাটি। তার মনের মধ্যে বুঝি এমনই আশঙ্কা পাক দিতে থাকে, কিনা, সবাইয়ের সঙ্গে বসলে কেউ যদি ফুঁসলে কিংবা গা-জোয়ারি করে বাগিয়ে নেয় মিঠাইয়ের অর্ধেকটা! কিংবা কারোর মিঠাই আগাম ফুরিয়ে গেলে যদি আধ-খাওয়া মিঠাইয়ের ভাগ চায়!

কাজেই, দু-দিন না যেতেই সুভদ্রা-গোপেশ এককাট্টা হয়ে দাদা প্রাণেশের কাছে পেশ করে আবদারটা, কিনা, মূল ভিটের থেকে একটুখানি তফাতে গিয়ে বসবাস করতে চায় তারা।

কারণটা খোলসা করে না বললেও বুঝে নিতে কারোর কষ্ট হয়ে না তেমন। মিঠাইটিকে নিয়ে একটুখানি তফাতে পালাতে চাইছে স্বার্থপর বালকটি। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় তারিয়ে তারিয়ে খেতে চাইছে। পাশাপাশি বসবাস করলে যদি নয়নতারা, কেবলমাত্র গা-লাগালাগি সান্নিধ্যের কারণে একটু আধটু ভাগ চায় দিবাকরের! মানুষের মন তো, বলা যায় না কিছুই।

কুমোরপাড়ার পুবদিকে ঘোষেদের একটা ভিটে ছিলই। ভাগাভাগিতে সেটা গোপেশের ভাগেই পড়েছিল। দাদা-বউদির অনুমতি নিয়ে ওই ভিটেতেই উঠে গেল গোপেশরা তিনজনাতে।

সেই দিবাকর, আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু সে, স্কুলের সহপাঠী, তার জীবনটাও গোপেশের মতোই আগাগোড়া নাটকে ভরা।

বললাম বটে বন্ধু, কিন্তু সেই অর্থে সে আমার বন্ধু হয়নি কখনোই। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ফোর

পর্যন্ত এবং জুনিয়র স্কুলে এইট পর্যন্ত প্রায় একসঙ্গেই কাটিয়েছি আমরা চার-পাঁচজন। আমি, কল্পনাথ, গজানন, দিবাকর...। মূলত এইট পাশ করে আমরা চারপাশের হাইস্কুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়লাম।

ততদিন অবধি তো একসঙ্গে কাটিয়েছি গাঁয়েই। নাইনে আমরা গিয়ে ভর্তি হলাম বেলদা হাইস্কুলে। আমি, কল্পনাথ আর দিবাকর। সুবিকাশ তো কবেই চলে গিয়েছে মেদিনীপুরে, ওর মামার বাড়িতে থেকে পড়ছে সে। গজানন পড়াশোনা ছেড়ে দিল।

তো, আমরা তিনজনাতে বেলদা স্কুলে রইলাম পাক্কা তিন বছর। সেই হিসেবে কল্পনাথকে বাদ দিলে, দিবাকরের সঙ্গেই সবেচেয়ে বেশিদিন একত্রে কেটেছে আমার। কিন্তু সে তুলনায় তার সঙ্গে আমার ততখানি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। সে যে নিবিড় বন্ধুত্বের অযোগ্য ছিল, তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং অনেকের চেয়ে সে ভালো ছিল। অনেক উদার ছিল তার মনটা। অনেকের চেয়ে বেশি কিছু গুণের অধিকারী ছিল সে। তার আন্তরিকতায়ও কোনও ঘাটতি ছিল না। সে আমাকে ভালোওবাসত খুব। তবুও কল্পনাথের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের যে নিবিড়তা, এমনকি গজানন কিংবা সুবিকাশের সঙ্গেও যেমনটা, দিবাকরের সঙ্গে তেমনটা ছিল না কোনওদিনই।

আসলে, প্রায় কারোর সঙ্গেই তেমন বন্ধুত্ব ছিল না দিবাকরের। ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল খুব চাপা স্বভাবের। কথা বলত খুবই কম। তার মধ্যে উষ্ণতার নিদারুণ ঘাটতি ছিল। একসঙ্গে ঘুরছি, ফিরছি, পড়াশোনা করছি, আড্ডা মারছি, দলের মধ্যে সারাক্ষণ নিঃশব্দে রয়েছে দিবাকর, এতটাই নিঃশব্দ যে, আমরা হয়ত-বা একসময় ওর উপস্থিতির কথাটাই ভুলে গিয়েছি। দলের মধ্যে থাকলে তাও একরকম চলে যেত, কিন্তু একা-একা ওর সঙ্গে দশ মিনিট কাটানোও ছিল বড়োই কঠিন, বাস্তবিক এতটাই শীতল ছিল ওর সান্নিধ্য। দুটো একটা মামুলি কথার পর চুপ করে থেমে যেত সে। একেবারেই গুম মেরে যেত। এরপর ওর সঙ্গে কথা বলা মানে প্রশ্নোত্তরের পালা। আমি প্রশ্ন করলে সে কেবল জবাব দেবে তার।

আসলে, কেন জানি নে, সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত, দিবাকরের মনের মধ্যে তিলমাত্র আনন্দ নেই। এক জাতের চাপা বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে রয়েছে অষ্টপ্রহর। তার বুকের মধ্যেকার আধমরা পাখিটা ছিল বড়োই নিঃসঙ্গ ও অসুখী। তারপর তো, মাত্র বারো-তেরো বছর বয়েসে, তার বুকের মধ্যেকার অসুখী পাখিটার জীবন থেকে যাবতীয় আনন্দ নিঃশেষে হারিয়ে গেল। আরও দুঃখী, বিষণ্ণ হয়ে গেল ও, আরও নিঃসঙ্গ।

অত সুখ যে তার কপালে সইবে না, এটা নাকি আগাম বুঝতে পেরেছিল সুভদ্রা। গোপেশের কথাবার্তার থেকে পরবর্তীকালে কিস্তিতে কিস্তিতে যা বুঝেছে মানুষজন, তাতে করে তাদের মনে এমন বিশ্বাসটাই গাঢ় হয়েছে যে, যে-কোনও কারণে সুভদ্রা বুঝতে পেরেছিল যে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না, কিংবা বাঁচতে চায় না।

দিবাকরের যখন বারো-তেরো বছর বয়েস, একদিন সত্যি সত্যিই একেবারে আচমকাই ওপারে চলে গেল সুভদ্রা।

সকলের কাছে একেবারে প্রত্যাশিত ছিল সেই চলে যাওয়াটা।

এমনিতেই অনেক কিসিমের জটিল রোগব্যাধিতে ধরেছিল তাকে। শেষের দিকে মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হত। যন্ত্রণার চোটে একেবারে পাগলের মতো গড়াগড়ি দিত বিছানায়। গোপেশ ওকে চিকিৎসাও করিয়েছিলেন বেলদা বাজারেব ডাক্তারের কাছে। নয়নতারা রোজ এসে গাছ-গাছড়ার রস বানিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিনদিন ক্রমশ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ওর শরীর। তা বলে হঠাৎ যে এমন করে চলে যাবে সুভদ্রা, এতটাই আকস্মিকভাবে, কেউই ভাবেনি তা।

আমার বড়োপিসির অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, শরীরে নয়, সুভদ্রার যা-কিছু রোগ ছিল মনে। মনের ভেতরটা কুরে কুরে ক্ষয় করছিল কিছুতে। সে নাকি শেষের দিকটায় নয়নতারাকে তিলমাত্র সইতে পারত না। নয়নতারার দেওয়া গাছ-গাছড়ার রসগুলো খেতে চাইত না কিছুতেই। ওইসব রস গলাধঃকরণ করতে তার নাকি নিদারুণ আপত্তি ছিল। নয়নতারার দেওয়া ওষুধ, অনুপান, পথ্য—সবকিছুকেই গাঢ় সন্দেহের চোখে দেখত সে।

কার থেকে বড়োপিসি এসব তথ্য পেয়েছিল তা আমাদের পুরোপুরি জানা ছিল না। আমরা সন্দেহ করতাম তনুপিসিকে। একে তো সারা গ্রামের সব গোপন খবর সারাক্ষণ কোন পথে যেন ডানা মেলে উড়ে আসত তনুপিসির কাছে, এ ব্যাপারে তার দক্ষতা ছিল আকাশচুম্বী। সেসব খবর এতটাই মিলে যেত যে, মানুষজন তনুপিসির খবরের ওপর খোদ রাজ্যপালের দেওয়া খবরকেও বুঝি কম মান্যি দিত।

এক্ষেত্রে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল। বিয়ের পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও গোপেশ সম্পর্কে তনুপিসির আগ্রহ তিলমাত্র কমেনি। বরং সেই আগ্রহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা যোগ হয়েছে।

বাস্তবিক, কিছুদিন যাবৎ তনুপিসির মাথার মধ্যে সামান্য ছিট লক্ষ করা যাচ্ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই গোপেশের প্রসঙ্গে সে নির্লজ্জের মতো প্রগলভ হয়ে উঠত। ওই একটা ব্যাপারে শালীনতার সমস্ত সীমাই অতিক্রম করে যেত সে। যখন-তখন সটান চলে যেত গোপেশের বাড়িতে, এবং সুভদ্রাকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করত যে, একবাড়িতে দুটো বউ নিয়ে অনেকেই বাস করে। মুসলমানেরা তো চার-চারটে বউ নিয়ে থাকে। আর, তনুপিসি সুভদ্রার তেমন সতীন হবে না, যাতে করে সুভদ্রার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বরং সুভদ্রা যেমন দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, যেভাবে মুখে-আগুন মাথার যন্ত্রণাটা দিনদিন তাকে কাবু করে ফেলেছে, তনুপিসি থাকলে, সংসারটা নিশ্চিত ভাঙনের থেকে রক্ষা পাবে, কেন কি, বাড়ির সব কাজকর্ম তো সে-ই করবে। সুভদ্রা দিনভর মাথার যন্ত্রণা নিয়ে গড়াগড়ি দিক না বিছানায়, ঠিক সময়ে রান্না করা অন্ন-ব্যঞ্জন পৌঁছে যাবে তার কাছটিতে।

শোনা যায়, সুভদ্রা নাকি এমন প্রস্তাব শুনে রাগের চোটে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাবার বদলে মিটিমিটি হাসত। এবং ভারি আশ্চর্যের কথা, নয়নতারার প্রতি তার যেমন তীব্র অসূয়া ছিল, তনুপিসির প্রতি তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এ এক ভারি রহস্য।

তনুপিসিই নাকি বড়োপিসিকে কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়েছিল এসব গূঢ় তথ্য। এবং সব তথ্যকে পরিপাক করে বড়োপিসি একটা সিদ্ধান্তেই এসেছিল যে, নয়নতারাই আপন স্বার্থে সুভদ্রাকে কৌশলে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল। এবং যেহেতু সুভদ্রার বাপের বাড়ির অর্থবল, লোকবল বলতে কিছুই ছিল না, এমন মর্মান্তিক ঘটনার কোনওরূপ ময়নাতদন্ত হতেই পারল না।

সুভদ্রা চলে যাবার পর গোপেশের সংসারে এক ধরনের অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। ততদিনে দিবাকর গাঁয়ের জুনিয়র স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ছে। গোপেশ নিজেই হাত পুড়িয়ে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ান তাকে। যতটা সম্ভব যত্নআত্তি করেন। সুভদ্রা চলে যাবার পর দিবাকরের প্রতি নয়নতারার স্নেহ-সোহাগ যেন বাঁধভাঙা রূপ নিতে লাগল। দিনের মধ্যে দশবার এসে তিনি দিবাকরের তত্ত্বতালাশ নিয়ে যান। যতটা বেশি সময় সম্ভব থাকেন গোপেশের বাড়িতে। আর তাই, দেখে বড়োপিসিরা আড়ালে মুখ টিপে টিপে বিষহাসি হাসতে থাকে, কিনা, তাদের যাবতীয় অঙ্ক একেবারে ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।

আমি দিবাকর আর কল্পনাথ হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিলাম ভালোভাবেই। তিনজনেই ভর্তি হলাম মেদিনীপুর কলেজে, আমি থাকলাম কেরানিটোলার মেসে, কল্পনাথ আর দিবাকর নিমতলার চকের কাছাকাছি আর একটা মেসে। কিন্তু তাতে করে আমাদের দৈনন্দিন মেলামেশার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না।

কিন্তু কোনও এক রহস্যময় কারণে, যতই দিন যেতে লাগল, আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎটা একটু একটু করে কমে এল। কেবল ছুটিছাটায় বাড়ি এলে দেখা হত কল্পনাথ আর দিবাকরের সঙ্গে। একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম, একদিকে আমার সঙ্গে ওদের মানসিক দূরত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে দিবাকরের সঙ্গে কল্পনাথের বন্ধুত্বটা গাঢ় হচ্ছে দিনদিন। এও বুঝতে পারছিলাম, ওদের দুজনের নিজস্ব কিছু কথা তৈরি হয়েছে, যা তারা সংগোপনে বলাবলি করত কেবল নিজেদের মধ্যেই। এমনকি আমারও সে আলোচনায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তখনও অবধি বুঝতে পারিনি, কী সে কথা।

জেনেছিলাম অনেক পরে। একদিন শিখাবউদিই আমাকে একান্তে ডেকে বলেছিল কথাটা। সে বড়ো সর্বনাশা কথা।

আমরা সবাই শিখা বউদিকে খুবই ভালোবাসতাম। তার পরামর্শ, উপদেশ আমাদের কাছে অলঙ্ঘনীয় ছিল।

আমাকে একান্তে পেয়ে শিখাবউদি বলল, তোর বন্ধু দুটো কোথায় কীসব করছে, তার খোঁজ-খবর রাখিস?

আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকি শিখাবউদির দিকে।

শিখাবউদি মৃদু ধমক দেয়, কেবল আড্ডা মারলেই বন্ধু হয়? বন্ধুর মনের খোঁজও রাখতে হয়, বুঝলি? বলেই শিখাবউদি একটি কবিতা আওড়াতে থাকে।

এই পৃথিবীতে বন্ধু পাওয়া কি সোজা?
বেড়ে ওঠে ঋণ, বেড়ে ওঠে কত বোঝা
তার চেয়ে সোজা সাগরে মুক্তো খোঁজা।
সব শুক্তিতে মুক্তো তবু কি থাকে?
ক্বচিৎ কখনো মিলে যায় তালেফাঁকে
না যদি মেলে তো কাদা ঘাঁটাটাই সাব
একা একা হাঁটি ত্রিভুবন-সংসার।

কবিতাটা শেষ করে আমার দিকে তাকায় শিখাবউদি। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সারা মুখ। বলে, কার কবিতা বল্ দেখি?

আমি মিটিমিটি হাসতে থাকি। একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে বলি, পল্টুদার।

পল্টুদার নামটা ঠিকঠাক বলে দেওয়ায় খুবই খুশি হয় শিখাবউদি। কিন্তু পরমুহূর্তে মুখের হাসি অকস্মাৎ গিলে ফেলে।

কঠিন গলায় বলে, তো, যাও, দু-বন্ধুতে তলেতলে কোথায় কোন পাহাড়টি উলটোচ্ছে, খোঁজ খবর নাও। নইলে যে-কোনওদিন একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও শিখাবউদির মুখ থেকে সেদিন বের করতে পারিনি কল্পনাথ আর দিবাকরের রহস্যময় কাণ্ডকারখানার সম্পর্কে বাড়তি কোনও তথ্য।

জানতে পেরেছিলাম অনেকদিন বাদে। শুনে বিস্ময়ে আমি থ।



দিবাকর আঠারো না পেরোতেই তার বিয়ের কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন গোপেশ। সেই আকাঙ্খার মধ্যে বড়ো একটা স্বাভাবিকতা ছিল না বটে, কেন কি, এত অল্প বয়েসে কোনও মেয়েরই বিয়ে দেয় না এযুগের বাপেরা। কিন্তু মূলত দুটো কারণে গোপেশ তেমনটা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। একে তো আজ কত বছর হাত পুড়িয়ে রান্নাবান্নাসহ বাড়ির তাবৎ গেরস্থালি কাজবাজ করে চলেছেন তিনি, নাগাড়ে গৃহিণীপনা করে করে তিনি বলতে গেলে ক্লান্ত, তার ওপর কানাঘুষোয় দিবাকর সম্পর্কে এমন-সব কথা কানে আসছিল যে, নিজেকে আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিলেন না।

যখন বিশ বছর বয়েস হল দিবাকরের, একটি সুলক্ষণা মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দেবার ব্যাপারে পাকাপাকি করে ভাবতে শুরু করলেন গোপেশ। আর, দিবাকরও কেন জানি সে বিয়েতে বড়ো একটা গররাজি হয়নি। হয়ত বা সুভদ্রা বিহনে বাপের দিগদারির কথাটা তাকেও কষ্ট দিচ্ছিল মনে মনে।

সন্ধিপুরের লাগালাগি গাঁ মান্দার। মধ্যিখানে কেবল যমুনা খাল। ওই গাঁয়েরই সতীশ দাসের মেয়ে শেফালির সঙ্গে রাতারাতি বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন গোপেশ।

শেফালিকে দেখতে যায়নি দিবাকর। সে তখন তার কাজকর্মে এতটাই মশগুল যে এইসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নেই। বলে, বিয়ে করতে বলেছ, রাজি হয়েছি, কিন্তু ওসব মেয়ে-টেয়ে দেখতে যাওয়া আমার দ্বারা হবে-টবেনি।

ছেলেকে আর ঘাঁটাননি গোপেশ। নিজেই গেলেন মেয়ে দেখতে। শেফালিকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না গোপেশ। কী রূপ মেয়ের! সারা শরীর জুড়ে যেন ভরভরন্ত জোয়ার খেলছে। যেন আগুনের খাপরা একটি। মাথায় একরাশ কালো চুল, বাপের নির্দেশে খোঁপা খুলে যখন পিঠের ওপর এলিয়ে দিল চুলের ঢল, এক্কেবারে মা-দুর্গার মতো লাগছিল। দেখতে দেখতে পুলক যেন বাঁধ মানছিল না গোপেশের মনে। এমন মেয়ের বাঁধন এড়িয়ে ছেলে তার কেমন করে আঘাটায়-বেঘাটায় ঘুরে বেড়ায়, দেখা যাক। কেবল মেয়েটির চোখদুটিতে যা-একটু বিষণ্ণতার ছায়া। গোপেশ দেখেও দেখেন না। বিয়ের জল শরীরে পড়লে এই বিষণ্ণতা কেটে যাবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

দিবাকরকে কনে দেখতে যাওয়ার কথা বলায় সে বড়ো একটা গা করে না। বলে, তোমার যখন পছন্দ হয়েছে, আমি আবার দেখবটা কী?

দু-চারবার সাধাসাধি করে একসময় সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলেন গোপেশ। মেয়ের যা চোখ ঝলসানো রূপ, পঞ্চাশ বছর বয়েসে গোপেশেরই তাক লেগে গিয়েছিল, আর দিবাকর তো তরতাজা জোয়ান। ভালো না লেগে যাবে কোথায়!

শেফালির সঙ্গে কখনোই নিজের পুত্রবধূর মতো আচরণ করেননি গোপেশ। এক্কেবারে নিজের মেয়ের মতো ভাবতেন ওকে।

যেদিন বিয়ে করে ফিরল দিবাকর, ওইদিনই গোপেশ টের পেয়েছিলেন, বউমাটির মাথায় সামান্য ছিট রয়েছে। নতুন বউমাকে কন্যার স্নেহে জড়িয়ে ধরেছিলেন গোপেশ। বলেন, ছেলের সঙ্গে আজীবনকাল একটা মেয়েও চাইছিলাম, এতদিনে পাইলাম তা। তুই আমার বউমা নয় রে, তুই আমার মেয়ে। বলেই শেফালির কপালে খুব ঘন করে চুমু খেয়েছিলেন গোপেশ। তার জবাবে শেফালিও যখন শ্বশুরের কপালে চকাস করে চুমু খেল, পাড়ার মানুষজন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। ফিসফিসানি শুরু হয়ে যায় আড়ালে, কিনা, এ কী দিশ্যি হে! শ্বশুরের কপালে চুমু খাচ্ছে ছেলার বউ! কালে কালে আরও কত দেখব!

শেফালির বাবা বলেছিলেন, একে সামান্য ছিট বলতিছ বেহাই? ওই ছিটে একটা আস্ত ফুলসার্ট হয়্যাবে।

—তার মানে? বকাসকা লোক পাইয়া একটা আস্ত ছিটগ্রস্ত মেয়েকে গতিয়া দিলে মোর ঘাড়ে, আবার হাসা হচ্ছে? গোপেশের চোখেমুখে কপট রোষ।

—ছিটলামির এখনই দেখলে কি, বেয়াই? মিটিমিটি হাসতে থাকেন শেফালির বাবা, টুকচার সবুর ধরো, টুকচার লুয়া-পুন্না হউ।

বাস্তবিক, দিবাকরের বউ হয়ে যেদিন গোপেশের উঠোনে পালকি থেকে নামল শেফালি, উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ছিল সে। আমরা যারা দিবাকরের ছেলেবেলার বন্ধু, স্বচক্ষে দেখেছি, আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন গোপেশ। একেবারে নিজের আত্মজাকে জড়িয়ে ধরবার মতো করে জড়িয়ে ধরেছিলেন শেফালিকে।

গদগদ গলায় বলেছিলেন, আমার ঘরে শেফালি ফুলটি ফুটল শরৎকালে। একেবারে টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়ল আমার উঠানে। সুভদ্রা বাঁচিয়া থাকলে কুড়িয়া লিয়া গিয়া ঠাকুরের থানে রাখত, সে বিহনে আমিই লিয়া যাই। চল মেয়ে, ঠাকুরকে আর তোর মাকে গড় করবি চল। আহা রে, তোর মা বাঁচিয়া রইলে আইজ সুখের সায়রে ভাসত।

শেফালিকে ঘরের মধ্যে বরণ করে নিয়ে গেলেন নয়নতারা। দোতলার কুঠরিতে ঠাকুর-ঘর। সেখানে শেফালিকে প্রণাম করিয়ে একতলায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন শাশুড়ির পায়ে প্রণাম জানাবার জন্য।

তখনকার দিনে গ্রামেগঞ্জে ফোটো তুলবার তত রেওয়াজ ছিল না। কেউ মারা গেলে সম্পন্ন পরিবারে মৃতের পায়ের ছাপ আলতা দিয়ে নিয়ে নেওয়া হত কাগজে। তারপর ওই পা-দুটিকে বাঁধিয়ে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হত ঘরের দেওয়ালে।

শেফালি শাশুড়ির পায়ের ছাপেই প্রণাম করল।

আর, নয়নতারা, সেই প্রথম আমি দেখেছিলাম তার বিষণ্ণ চোখদুটিতে খুশির আলো, মেঘলা আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল এক চিলতে রোদ্দুর।

আমাদের সবাইয়ের কাছে খুবই স্বাভাবিক লেগেছিল তা, কেন কি, আমরা সবাই জানতাম, দিবাকর ছিল আসলে প্রাণেশকাকা এবং নয়নকাকিমার দ্বিতীয় পুত্র। দিবাকরও সেটা জানত। সম্ভবত শেফালিও।

সেই প্রথম থেকেই গোপেশ নিজের মেয়ে হিসেব গ্রহণ করেছিলেন শেফালিকে। তখনকার চল্ হিসেবে ছেলের বউকে, বউমা বলে ডাকবারই রীতি ছিল। কিন্তু গোপেশ একদিনের জন্যও বউমা বলে ডাকেননি ওকে। শেফালি বলেই ডেকেছেন। এবং 'তুমি' নয়, 'তুই'। সেই প্রথম দিন থেকেই গোপেশের যত বায়না, জুলুম, সবই শেফালির কাছে। শেফালি হাসিমুখে সইতও সবকিছু। শ্বশুরকে যত্ন করত, আদর করত, প্রয়োজনে শাসনও। এ ব্যাপারে কেউ কিছু শুধোলে শেফালি নিজেই মিষ্টি হেসে বলত, সত্যি, শ্বশুরবাড়ি নাকি বাপের বাড়ি, কোথায় যে আছি, সেটাই তো বুঝতে পারি না। ভয় করে বাবা, অত সুখ সইলে হয়।

গোপেশ নিজেকে শেফালির ব্যাটা বলে পরিচয় দিতেন সর্বত্র। মাঝে মাঝেই হুমকি দিতেন শেফালিকে। —তোর ব্যাটাপুত্তুর হইলে, সে কিন্তু হবে মেজো। কেন কি, আমিই তোর বড়োব্যাটা। সে জায়গাটা আমি প্রাণ গেলেও ছাড়িয়া দিতে নারাজ।

শুনতে শুনতে শেফালি হেসে কুটিপাটি হয়। বলে, আমি আমার বড়ো ব্যাটার বিয়ে দুবো আবার।

গোপেশ চোখ পাকিয়ে তাকান।

শেফালি বলে, রাগ করবার কী হইল? তোমাকে দেখলে কে কইবে, পঞ্চাশ পারিয়া গেছ। যখন আমাকে দেখতে গেলে, সত্যি বলছি, সবাই তোমাকেই বর বলিয়া ঠাউরেছিল।

দু-চোখে তুমুল রোষ জমিয়ে গোপেশ দৌড়ে এসে শেফালির গালটা টিপে দেন। বলেন, তোর বাপ ঠিক কথাই বলেছিল। তোর মাথায় যা ছিট, একটা ফুলশার্ট হয়্যাবে।

ভয় করে বাবা, অত সুখ সইলে হয়। কথাটা মাঝে মাঝেই বলত শেফালি। ওর কপালে সত্যি সত্যি অত সুখ সয়নি বেশিদিন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে গোপেশকে একেবারে অন্ধ করে দিয়ে, শেফালিকে একেবারে অকুলপাথারে ভাসিয়ে দিয়ে ওপারে চলে গেল দিবাকর। সে এক ভারি রহস্যজনক মৃত্যু।

দিবাকরের বিয়ের পর আমি শহর থেকে ফিরলে পরে মাঝে মাঝেই যেতাম ওদের বাড়িতে। আমি যে দিবাকরের ছেলেবেলার বন্ধু, সেটা শেফালি ততদিনে জেনে গিয়েছে। তার আচার-আচরণে প্রকাশ হয়ে পড়ে তা। আমি, দিবাকর আর শেফালি, তিনজনাতে খুব আড্ডা হয়, দুপুরে খাওয়াদাওয়াও হয় কোনও কোনও দিন। শেফালি রাঁধেও খাসা।

তেমনি একদিন সন্ধে নাগাদ আমি গিয়েছি দিবাকরের বাড়িতে। সেদিন কী কারণে যেন গোপেশ বাড়ি ছিলেন না। দিবাকরও নেই বাড়িতে। শেফালি একলাটি মুখ কালো করে বসে ছিল দাওয়ায়।

বলি, দিবাকর কোথায়?

সে কথার জবাব দেয় না শেফালি। মাদুর পেতে দেয় দাওয়ায়। বলে, বোসো শংকরদা।

আমি আবারও শুধোই, দিবাকরটা গেল কোথায়?

দু-চোখে গভীর হতাশা ফুটিয়ে শেফালি বলে, ওরা লোধাপাড়ায় গেল।

—ওরা মানে?

—ও আর কল্পদা।

—কেন?

—সেই কথাটাই তোমাকে বলতে চাচ্ছি ক-দিন ধরিয়া।

এরপর একসময় শেফালি আসল কথাটা পাড়ে। বলে, তোমার বন্ধুটি কি করে জান কিছু?

আমি বুঝিতে পারিনে ওর কথা। বলি, কোথায় কী করছে?

তখনই শেফালি দেয় সেই সর্বনাশা খবরটা। থমথমে গলায় বলে, ওরা দুজনে নকশাল করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপেশ ফিরে আসেন। আমাকে দেখে খুশিই হন তিনি। শেফালি কিন্তু একফাঁকে চাপা গলায় আমাকে সাবধান করে দেয়, খবরদার, বাবা যেন কিছু জানতে না পারে। সইতে পারবেনি।

শিখাবউদি এবং পরবর্তীকালে শেফালি যতই না কেন চেপে রাখবার চেষ্টা করুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গোপেশ এবং নয়নতারার কাছে কিছুই অজানা ছিল না।

দিবাকর যে নকশাল হয়েছে, সেটা জেনে কিংবা আন্দাজ করে অবধি নয়নতারা সকলের অজান্তে চোখের জল ফেলেছেন। হাজার হোক ছেলেটা তো ওরই। ওর কথা ভাবতে ভাবতে নয়নতারা দিনদিন শুকিয়ে যেতে থাকেন। মুখে অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম আসে না। গোপেশকে একা পেলেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠে বলেন, ও ঠাকুরপো, একটা কিছু করো তুমরা। ছেলেটাকে ফিরাও।

তখন নকশালদের ধরপাকড়ও চলছে খুব। দিনের পর দিন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে দিবাকর। তাও গোপেশ কেন যে একটি ফুটফুটে মেয়েকে এনে ওর গলায় বেঁধে দিলেন, সেটা আমাদের কাছে একেবারেই দুর্জ্ঞেয় ছিল। তার চেয়েও বড়ো কথা, দিবাকরও যে কেন এমন প্রস্তাবে রাজি হল, বুঝতে পারিনি আমি। সম্ভবত গোপেশের মনে এমন আশাই উঁকিঝুঁকি মেরেছিল যে, বিয়ে-থা করলে দিবাকরের ওইসব ঘোড়ারোগ কেটে যাবে। কেন কি, এই দুনিয়ায় সুন্দরী মেয়ের বাঁধনের চেয়ে বড়ো বাঁধন আর কী আছে!

অবশেষে দিবাকরের বিয়ের বছরটাক বাদে সেই ঘটনাটা ঘটল। খুব আকস্মিকভাবে ঘটে গেল তা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই ঘটনার পরিণতিতেই দিবাকর চিরতরে হারিয়ে গেল।



যে-রাতে গোপেশ আকস্মিকভাবে নয়নতারাকে একটা ছেলে চেয়ে বসেছিলেন, একেবারে নিজের করে পেতে চেয়েছিলেন ছেলেটাকে, ইঙ্গিতটা এতটাই স্পষ্ট ছিল, নয়নতারার বুঝতে তিলমাত্র কষ্ট হয়নি। একে তো জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারবশত নিদারুণ ঝাঁকুনি নয়নতারাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রায় অসাড় করে ফেলেছিল, তার ওপর আরও একটা গূঢ় রহস্যের জালে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, কিনা, ডাক্তারি রিপোর্ট অনুযায়ী গোপেশ যদি সত্যি সত্যি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে থাকেন তো ওই রাতে এমন প্রস্তাবটা নয়নতারাকে তিনি দিলেন কেমন করে? এই রহস্যের জট সে-রাতে খোলেনি। অনেকদিন যাবৎ দুর্জ্ঞেয় ছিল তা। অনেক পরে নয়নতারার লাগাতার জেরার জবাবে কারণটা অবশেষে খোলসা করেছিলেন গোপেশ।

আসলে, দোষ ছিল সুভদ্রারই শরীরে। সুভদ্রার অগোচরে ডাক্তারবাবুই তেমন কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন গোপেশকে। গোপেশ তা সত্ত্বেও ভালোবাসতেন বউকে। তিনি চাননি, সুভদ্রা চারপাশের সবাইয়ের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকুক সারাটা জীবন। সকলের চোখে তাচ্ছিল্যের পাত্রী হোক। তাই, ওদের সন্তানহীনতার যাবতীয় দায় গোপেশই তুলে নিয়েছিলেন নিজের ঘাড়ে। এমনকি সুভদ্রাকেও বুঝি বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন তা। তার ফলে, নয়নতারার সঙ্গে গোপেশকে এতখানি মেলামেশা করতে দেখেও তিলমাত্র বিচলিত হয়নি সুভদ্রা। কিংবা এমনটাও হতে পারে, সুভদ্রাকে হাজার চেষ্টা করেও বিশ্বাস করাতে পারেননি তা। সুভদ্রা হয়ত মরবার আগের মুহূর্ত অবধি তুষের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে। হয়ত নয়নতারার সঙ্গে গোপেশের মাখামাখি সম্পর্কটাকে মনে মনে কোনওদিনই মেনে নিতে পারেনি সে। এইসব কারণেই হয়ত বা তার শরীর জুড়ে এত-এত রোগব্যাধির উৎপাত। হয়ত-বা এইসব কারণেই মাথায় অসহনীয় যন্ত্রণার বীজ পুঁতেছিল সুভদ্রা স্বয়ং।

বল্লভদার বউ শিখাবউদি। নয়নতারা সম্পর্কে ছিল তাঁর জ্ঞাতি খুড়-শাশুড়ি। বয়েসে নয়নতারার চেয়ে ঢের ছোটো হলেও শিখাবউদির সঙ্গে গলায় গলায় সম্পর্ক ছিল তার। একদিন সম্ভবত কোনও একান্ত মুহূর্তে শিখাবউদির কাছে নিগূঢ় কথাটি ফাঁস করে ফেলেছিলেন নয়নতারা, কিনা, দোষটা ছিল

সুভদ্রার শরীরে, গোপেশ ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। শিখাবউদি সেটা গোপনই রেখেছিল। হয়ত বা গোপন রাখতও চিরকাল, যদি না এক নিদারুণ প্রয়োজনের মুহূর্তে কথাটা আমার কাছে ফাঁস করতে বাধ্য হত সে। বাস্তবিক সে ছিল এক জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ।

শেফালি ঘরে আসার পর ভবঘুরে মনটাকে কিছুটা হলেও সংযত করবার চেষ্টা চালাচ্ছিল দিবাকর। নকশালি কাজকর্ম অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছিল সে। দলের থেকে সমস্ত সম্পর্ক একটু একটু করে ছিন্ন করছিল। ওই নিয়ে কল্পনাথের সঙ্গে তার মনোমালিন্যও শুরু হয়েছিল।

তখন বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত সে। কিন্তু নকশাল হয়ে দীর্ঘকাল আঘাটায়-বেঘাটায় ঘুরে বেড়াবার দরুন শরীরের ওপর যে নিদারুণ অত্যাচার হয়েছিল, শরীর তার নির্মম শোধ নিল।

একদিন নিজের বাড়ির উঠোনে মাথা ঘুরে পড়ে গেল দিবাকর।

তৎক্ষণাৎ দোলা বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বেলদা হাসপাতালে। তখন তার শরীরের অবস্থা রীতিমতো সঙ্গিন। যত জলদি সম্ভব তার শরীরে রক্ত দেওয়া দরকার বলে জানিয়ে দিলেন ডাক্তার। ছোট্ট হাসপাতাল। সবসময় রক্তের সরবরাহ থাকে না। তার ওপর দিবাকরের রক্তের গ্রুপ বি-নেগেটিভ, যা বাস্তবিক এক দুর্লভ জাতের রক্ত। সচরাচর পাওয়া যায় না।

নয়নতারার শরীরে রক্ত বলতে কিছুই নেই। রোগে-ভাবনায় তার ততদিনে অস্থিচর্মসার অবস্থা। রক্ত দেবার মতো অবস্থায় নেই সে। বাধ্য হয়ে প্রাণেশকেই ডেকে এনে তুলে দেওয়া হল হাসপাতালের বেডে। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখল, প্রাণেশের সঙ্গে দিবাকরের রক্তের গ্রুপ মিলল না একটুও।

কিন্তু তখন রহস্য আর বিস্ময়টাকে উপভোগ করবারও বুঝি সময় নেই কারো। একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ছে দিবাকর। যেকোনও মুহূর্তে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।

অবশেষে একরকম নিরুপায় হয়ে, আমি যখন রক্তের জন্য তড়িঘড়ি মেদিনীপুরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখনই শিখাবউদি আমাকে আড়ালে ডেকে নেয়।

বলে, মেদিনীপুর কি ইখেনে? যাইতে আসতে বহুত সময় লাগিয়াবে।

বলি, যত সময়ই লাগুক, আনতে তো হবেই। রক্ত না দিলে তো জীবন বাঁচানোই দায় হবে দিবাকরের।

শিখাবউদি একটুক্ষণ ইতস্তত করে। একসময় ফিসফিস করে বলে, গোপেশকাকাকে দিয়ে একবার চেষ্টা করলে হয় না?

—গোপেশকাকা? মন থেকে সায় দিতে পারি নে শিখাবউদির কথাতে। বলি, মিলে যেতেও পারে, নাও মিলতে পারে। গ্যারান্টি তো কিছু নেই। কিন্তু ধরো যদি না মেলে তো মাঝের থেকে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হবে।

আসলে, আমি আর অপেক্ষা করতে রাজি ছিলাম না। কেন জানি আমার বারবার মনে হচ্ছিল, দিবাকরের শেষ সময় উপস্থিত।

শিখাবউদি বলে, তা হোক তুই গোপেশকাকাকে দিয়ে একবার চেষ্টা কর।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, তুমি কেন বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। এখন নষ্ট করবার মতো সময় একেবারেই নেই আমাদের হাতে। গোপেশকাকার রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে মাঝের থেকে বেশ কিছুটা সময় বরবাদ হয়ে যাবে।

কিন্তু শিখাবউদিকে কথাটা বুঝিয়ে বলবার হাজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই আমি। শিখাবউদি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। বলে, তুই একবার ডাকিয়া লিয়া আয় না গোপেশকাকাকে। ওই তো বাইরে বুসিয়া আছে। একটিবার চেষ্টা করতে দোষ কি? তাছাড়া, মেদিনীপুরে গেলেই যে রক্ত পায়াবি, তারই বা কী গেরেন্টি আছে?

শিখাবউদির কথা মতো খুবই ক্ষুণ্ণ মনে ডেকে আনলাম গোপেশকাকাকে।

গোপেশের রক্ত পরীক্ষা করা মাত্র বুঝি বাজ পড়ল সবাইয়ের মাথায়, কেন কি, দিবাকরের রক্তের গ্রুপ গোপেশের সঙ্গে মিলে গেল।

কিন্তু তখন আর ওই নিয়ে গবেষণার সময় নেই। গোপেশের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে পুশ করা হল দিবাকরের শরীরে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল দিবাকর। একদিন বাড়িতে ফিরেও এল। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে বায়ো-সায়েন্স পড়া ছাত্রটি সেই থেকে একেবারে থম মেরে গেল।

দিবাকরের পরবর্তী জীবনের ঘটনা বড়োই মর্মান্তিক। পার্টির কাজকর্মে ইদানীং যতটা ঢিলে দিয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি ডুবতে লাগল দিনদিন। একসময় বাড়ি ফেরা একেবারেই বন্ধ করে দিল সে। কোথায় যে থাকে, খায়, ঘুমোয়, কেউই তার হদিস পায় না। কেউ বলে, আদিবাসীদের বাড়িতেই থাকে সে। কেউ বলে, ওলদা-চণ্ডীর জঙ্গলের ভেতরেই তার পাকাপাকি আস্তানা।

সেই সময়টা আমাদের এলাকায় পরপর কয়েকটা নকশালি অপারেশন হয়ে গেল। পুলিশি তৎপরতা বাড়ল। এবং একদিন থানা থেকে গোপেশের তলব এল, কিনা, একটা ডেড-বডি শনাক্ত করতে হবে।

পুলিশের সঙ্গে দিবাকরদের সংঘর্ষ নিয়ে এলাকায় দু-রকম রটনা রয়েছে।

এক ধরনের রটনা হল, এলাকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অপারেশনগুলি সমস্তই দিবাকরের নেতৃত্বেই হয়েছে। এবং শেষ অপারেশনটি করতে করতে একেবারে পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল পুরো দলটি। অন্যরা কোনও গতিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু দিবাকর পালাতে পারেনি কিছুতেই।

অন্য রটনাটি হল, পুলিশের দল নাকি ওদের দেখতেই পায়নি। পুলিশের পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে যাওয়ার পুরো সুযোগ ছিল ওদের। অন্যরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পালিয়ে যেতে পারলেও দিবাকর কোনও এক রহস্যময় কারণে আচমকা পুলিশের দিকে গুলি চালিয়ে বসে, এবং সরাসরি পুলিশের পালটা গুলির সামনে বুক পেতে দেয়।

আমাকে কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছিল অন্য একটি বিষয়। সেটা হল, সেদিন হাসপাতালে শিখা বউদি সবাইকে ছেড়ে গোপেশের শরীর থেকে রক্ত নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল কেন? অতটা নিশ্চিত সে হল কেমন করে? কোন তথ্যের ভিত্তিতে সে অত নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলল, গোপেশের রক্ত দিবাকরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে? এ কী রহস্য?



দিবাকর যে এমন আচমকা চলে যাবে, সেটা খুব মর্মান্তিক হলেও অনেকের কাছেই একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, যে সর্বনাশা রাজনীতিতে নিজেকে শামিল করেছিল সে, তাতে করে আজ হোক, কাল হোক তাকে এই ধরনের কোনও চরম মূল্য দিতে হতই। কিন্তু কেউই তেমন করে দেখল না, আচমকা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কেনই বা সে পুনরায় সর্বনাশা ঝাঁপ দিতে গেল জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে। এ কি তবে কোনও মানসিক যন্ত্রণার সর্বনাশা বহিঃপ্রকাশ! কাজেই, সবাই জানল, নকশাল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে সে, কেবল আমার মনে বিঁধে রইল একটা অচেনা কাঁটা।

কাঁটাটা আজও খচখচ করে যখন-তখন।

আমার কেমন জানি সন্দেহ হয়, নয়নতারার সঙ্গে গোপেশের সম্পর্কটা আচমকা ধরে ফেলতে পেরেছিল সে। সেই সম্পর্কের সঙ্গে যে তার জন্ম-ইতিহাসটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেটাও বুঝি তার অজ্ঞাত থাকেনি। বাস্তবিক, আমার মনে ইদানীং আর কোনওই সংশয় নেই, হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর থেকেই দিবাকর তার স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রেক্ষাপটটি নিজেই রচনা করেছিল।

দিবাকর যখন চলে গেল ওপারে, সে সময়টা বড়োই দুঃসময় গেছে গোপেশের। বুকের ভেতরটা নিরন্তর করাত দিয়ে যেন ফালাফালা করে কাটে কেউ। নিজের জন্য যতটা না, শেফালির জন্য বুকের মধ্যে তার নিরন্তর হাহাকার। কচি বয়েসে স্বামী হারিয়ে শেফালি তখন উন্মাদিনী প্রায়। গোপেশ ভেবে পান না, কী উপায়ে সামাল দেবেন স্বামীহারা উন্মাদিনী মেয়েটিকে। এমন ভরভরন্ত জোয়ারের সময় তার শরীর জুড়ে উথালপাথাল নদী, সেই নদীতে একা একা কী করেই বা বাইবে ফুটো নৌকোটি। কেমন করে বিতাবে সারাটা জীবন! গোপেশই বা কোন বাক্যবন্ধ দিয়ে সান্ত্বনার জল জোগাবেন তার মরুভূমির

মতো মনটাতে।

বাধ্য হয়ে শেফালির বাপেরই শরণাপন্ন হন গোপেশ। আকুল হয়ে ডেকে পাঠান ওকে।

বলেন, অকে তুমি লিয়া যাও বেয়াই। ইখেনে থাকিয়া আর কী হবে অর? আমিও আর দিনদিন চোখ মেলিয়া দেখতে পাচ্ছিনি ওইটুকু মেয়েটার কষ্ট।

শেফালির বাপ-দাদারা নিতে এসে ফিরে গেল বারবার, কিন্তু শেফালি আগের মতোই অনড়। বুড়ো ছেলেটাকে ছেড়ে কিছুতেই বাপের বাড়িতে ফিরে যাবে না সে। বাপ-দাদাদের প্রস্তাবে বারবার মুখ ফিরিয়ে নেয় শেফালি।

দেখতে দেখতে কান্নায় বুক ভাসান গোপেশ। ওর ওই কচি বয়েসে এমন বিধবার বেশ তিনি সহ্য করতে পারেন না কিছুতেই। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, বাপের দোরে ফিরিয়া যা রে মেয়া, একটা ভালো ছেলে দেখিয়া আবার বিয়া দিক তোর বাপ। এখানে তোর ভবিষ্যৎ কী? একলা একলা সারাটা জীবন কাটানো সোজা কথা নয়।

শেফালি গা করে না। কখনও হেসে উড়িয়ে দেয় শ্বশুরের কথাগুলো। কখনও বা দুরন্ত রোষে ফুঁসে ওঠে।

বলে, তবে যে বলতে, আমার বড়োব্যাটা তুমি, মিছা কথা কইতে? বল?

—মিছা কথা কেন হবে? বড়োব্যাটাই আমি তোর।

—তবে যে বড়ো চলিয়া যাইতে বলছ? ব্যাটাকে ছাড়িয়া আবার বিয়ার পিঁড়িতে গিয়া বসে নাকি কোনও মা?

কান্না থামিয়ে গোপেশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ওই অপার রহস্যময়ীর দিকে। ওর মনের অন্ধি-সন্ধি খুঁজে খুঁজে হয়রান হন। মনের কোন স্তর থেকে কথাগুলো বলছে শেফালি, মালুম করবার চেষ্টা করেন। বলেন, আরে, ব্যাটা তো আমি রইলামই। ব্যাটা থাকতেও তো আবার ঘরসংসার বাঁধে মানুষ।

—সেটা পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে হয়।

—মেয়েদের ক্ষেত্রে হইতে বাধা কীসের? বিদেশে তো আকছার হয় তেমনটা।

—এটা বিদেশ নয়, বাবা, এদেশে মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়।

গোপেশ বুঝি কথা খুঁজে পান না। বলেন, তবুও নিজের বাপ-মায়ের কাছে থাকলে মনে অনেকটাই শান্তি পাবি তুই।

গোপেশের দিকে শীতল চোখে তাকায় শেফালি। তাকিয়েই থাকে। একসময় থমথমে গলায় বলে, চলিয়া যাইতে যে বলছ, বিয়ের পর বাপ-ভাইয়ের ঘরে থাকলে আমার সম্মানটা বাড়বে বলিয়া মনে করো তুমি? সেখানে মেয়েদের আরও বেশি অপমান, বাবা। বিয়ের পর বাপের ঘরে মেয়েদের দু-দিনের বেশি রইতে নাই।

গোপেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন শেফালির দিকে। এইটুকুন একটা মেয়ে, সারাক্ষণ চড়াই পাখির মতো কলকল করে ঘুরে বেড়ায়, একটুখানি ছিটেল বলে তাকে কতদিন খেপিয়েছেন গোপেশ, এই ক-দিনে কেমন করে এতখানি পরিণত হয়ে উঠল সে!

এক সময় হাল ছেড়ে দেন গোপেশ। বাস্তবিক এ এক অন্য জাতের মেয়ে। গোপেশ এতদিন একেবারেই চিনতে পারেননি ওকে।

কিন্তু তাও শেফালিকে কোনওগতিকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার চিন্তাটা মগজ থেকে নড়ে না কিছুতেই। একটা ভরা যুবতী মেয়ের শরীর জুড়ে সারাক্ষণের বিছে-কামড়ানো যন্ত্রণাটা তো হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি।

ধীরে ধীরে বুঝি শোকটাকে ঘুম পাড়াতে পেরেছিল শেফালি। দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে ডুবে যেতে চাইছিল দিনদিন। সাত-ভোরে উঠেই ঘর-গেরস্থলির কাজে মন দিত, ঘরদোরে ঝাঁটপাট দেওয়া, উঠোন-দাওয়া গোময় দিয়ে নিকোনো, গোরুগুলির যত্নআত্তি করা, সংসারের রান্নাবান্না, কাচাকুচি,

গোপেশ যখনই দেখেন, কেবলই কাজ করছে মেয়েটা। বাধা দিতে গিয়েও পিছিয়ে যান গোপেশ, কেন কি, তাঁর এমনটাই মনে হয়েছে যে, হাজারটা কাজের মধ্যে থাকলেই ভালো থাকবে শেফালি।

ধীরে ধীরে কেমন যন্ত্রবৎ হয়ে গেল মেয়েটা। অন্তত বাইরে থেকে তাকে দেখে বোঝার উপায় রইল না যে, খুব সম্প্রতি সে হারিয়ে ফেলেছে তার জীবনের সুখের চাবিকাঠিটি। ওই কচি বয়েসেও ওর এতটা মনের জোর দেখে অবাক হয়ে যেতেন গোপেশ।

ছেলে বেঁচে থাকতে যাও বা শ্বশুর-শ্বশুর ভাব ছিল গোপেশের মধ্যে, ধীরে ধীরে তা বেমালুম উবে যেতে থাকে। এক সময় শেফালির পুরোপুরি বাপ হয়ে ওঠেন তিনি। একেবারে জন্মদাতা বাপের মতোই আচরণ করতে থাকেন ওর সঙ্গে। প্রথমেই ওকে শাড়ি পরতে বাধ্য করেন। শেফালি রাজি না হওয়ায় ওকে ধমক দিয়ে রাজি করান।

বলেন, শুন মেয়া, আমার ঘরে থাকতে হইলে তোকে পুরাপুরি আমার মেয়া হইয়া রইতে হবে। শাড়ি তো পরবিই, খোঁপা বাঁধবি, ফিতা লাগাবি, পাউডার-স্নো মাখবি, টিপ পরবি। বিধবার বেশে যদি একটিবার আইসু আমার সুমুখে তো মরা মুখ দেখবি আমার। আর, খাবা-দাবাতেও তিলমাত্র বাছবিচার নয়। দিবাকর বাঁচিয়া রইতে মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-রসুন যেমনটি খাইতিস, ঠিক তেমনটাই চলবে। এর যেন তিলমাত্র ব্যত্যয় না দেখি।

—কিন্তু পাঁচজনে পাঁচ কথা রটাবে যে?

—রটাক। পাঁচজনের পাঁচ কথায় পিসাব করিয়া দিই আমি। একটা কচি মেয়ার মনের ভাঁপন যারা বুঝতে পারে না, তাদের কথায় কী আসে যায় রে? আর, অত যদি বিধবা সাজার শখ তো চলিয়া যা তোর বাপের পাশ। এ ব্যাপারে কুনো সমঝোতায় আইস্‌তে রাজি নই আমি।

গোপেশের জেদের কাছে হার মেনেছে শেফালি। বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে গোপেশের যাবতীয় নির্দেশ। এখন গোপেশের বাড়িতে একেবারে আইবুড়ো মেয়ের মতোই থাকে সে। গোপেশ কখনও তার বাপ, কখনও তার ছেলে। বাচ্চা ছেলের মতো শেফালির কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে আদর খান, আবার ইচ্ছে মতো জড়িয়ে ধরে আদর করেন, কোনও কারণে অভিমান হলে মাথায় হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেয়ে ভোলান মেয়েকে। হাটে-বাজারে গেলে ফিতে কাঁটা, গন্ধ তেল কিনে এনে ধরে দেন। হাতে ধরে মেলায় পার্বণে নিয়ে যান, মাঝে মধ্যে বেলদায় নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখিয়ে আনেন। কিনা, আমি না করলে আর কেই বা করবে! আমার একটা নিজের মেয়ে স্বামীহারা হয়্যা আমার ঘরে আইসিয়া রইলে, আমি তো ওর জন্য করতাম এসব, না কি?

আস্তে আস্তে বুঝি শান্ত হয়ে আসে শেফালির মনটা। আবার আগের মতো হাসিখুশি আর উচ্ছল দেখায় তাকে। শ্বশুরের সঙ্গে আগের মতো ঠাট্টা-খুনসুটি করতে থাকে সে। মনের গভীরে যদি কোনও ক্ষত থাকেও-বা, বাইরে তার প্রকাশ ঘটে কদাচিৎ। কেবল মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে তার কী যে হয়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতে থাকে। তখন রাঁধে না, বাড়ে না, খায় না, কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ অবধি করে না। মেজাজ হয়ে যায় বেজায় খিটখিটে। কথায় কথায় সবাইকে, এমনকি গোপেশকেও ছোবলাতে আসে। ওই সময়টাতে শেফালিকে খুবই অপ্রকৃতিস্থ লাগে গোপেশের। বড়োই অচেনা। দেখলে মনে হয়, শরীরের কোথাও বুঝি নিদারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। অথচ জিজ্ঞেস করলে জবাব তো দেয়ই না, বেশি পীড়াপীড়ি করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। মুখে যা আসে তাই বলে হটিয়ে দেয়, এমনকি গোপেশকেও।

দেখে শুনে মনে মনে প্রমাদ গোনেন গোপেশ। শেফালিকে শহরের কোনও ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাবে কি, শেফালি কথাটা পুরোপুরি শেষ করতেই দেয় না গোপেশকে। বলে, ডাক্তার কী চিকিচ্ছা করবে আমার? আমার কিছুই হয়নি।

এইভাবে যখন কাটছিল দিন, আচমকা গোপেশের কানে একটা খবর আসে।

খবরটা যাচাই করবার পর মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি। দু-তিন রাত ঘুমোতেই পারেন না। অথচ শেফালিকে কথাটা মুখ ফুটে শুধোতে নিদারুণ সংকোচ হয় তাঁর।

ঠিক তেমন মুহূর্তে গোপেশ একদিন বাস্তুর মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেললেন সাপটাকে। তাঁরই পাশ দিয়ে শেফালির কুঠরির মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে গেল সাপটা।

সন্ধিপুর আর মান্দার, পাশাপাশি দুটি গ্রাম। ও গাঁয়ের খবর-টবর সব ডানা মেলে উড়ে আসে, এ-গাঁয়ের খবরাখবরও ডানা মেলে উড়ে যায় পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে।

মান্দারের জুনিয়র স্কুলে এইট অবধি পড়েছিল শেফালি। লেখাপড়ায় নাকি খুবই ভালো ছিল সে। কিন্তু এইট পাশ করে তারপর আর পড়েনি। শহরের হোস্টেলে রেখে মেয়েকে পড়াবার সাধ্যি ছিল না শেফালির বাপের, তেমন মানসিকতাও ছিল না। বয়েসকালে, দিবাকরের সঙ্গে বিয়ের আগে, জনার্দন মিত্রর ছোটো ছেলে অজয়ের সঙ্গে নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল শেফালির। অজয়ও এইট অবধি পড়েছিল গাঁয়ের জুনিয়র স্কুলে। কিন্তু শেফালি স্কুলে ঢোকার অনেক আগেই স্কুল ছেড়েছে সে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে বেলদা স্কুল থেকে।

অজয়ের সঙ্গেই বিয়েটা হয়ে যেত শেফালির। কিন্তু দেনা-পাওনায় আটকে যাওয়ায় সে বিয়ে হতে পারেনি। অজয়ের বাবা চড়া দাম হেঁকেছিল ছেলের। সেই খাঁই মেটাতে পারেনি শেফালির বাপ। কিন্তু অজয়ের নাকি খুবই পছন্দ হয়েছিল শেফালিকে।

এসব খবর পরবর্তীকালে এসেছিল গোপেশের কানে। কিন্তু শেফালিরও যে অজয়কে সমান পছন্দ ছিল সেটা তার জানা ছিল না।

সেই খবরটাই খুব সম্প্রতি এসেছে গোপেশের কানে। আর, সেই থেকে গোপেশের মনটা বড়োই উচাটন। খবরটার সত্যতা যাচাই করতে আকুলি-বিকুলি করছে তাঁর মন। খবরটা শোনা ইস্তক, তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। একটা চকমকি আলো, থেকে থেকে জ্বলে উঠতে চায়। অভাগি মেয়েটার মনের হালহদিস জানতে পারলে সেই মোতাবেক একটা ব্যবস্থা নেওয়া যায়। হয়ত বা তাতে করে দুঃখী মেয়েটার জীবনটাকে একটুখানি বদলে দেওয়া যায়।

কিন্তু সরাসরি কথাটা শেফালিকে শুধোতে সংকোচ হয় গোপেশের। এ এমনই একটা প্রসঙ্গ' নিজের মেয়েকেও সোজাসাপটা শুধোনো যায় না, আর এ'ত যতই হোক পরের মেয়ে। কাজেই গোপেশ এক-পা এগোন তো দু-পা পেছোন।

তাও একদিন খুব কৌশলে কথাটা পাড়েন গোপেশ।

গ্রীষ্মের সন্ধেবেলায় উঠোনে মাদুর পেতে বাপ-বেটিতে বসেছিল। ফুরফুরিয়ে হাওয়া বইছিল। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল গোপেশের।

উঠোনের শেষ প্রান্তে একটুখানি জমির মাটি কুপিয়ে পুরু করে গোবর সার ছড়িয়ে গোপেশ তাতে গুটিকয় লংকা আর বেগুনের চারা লাগিয়েছেন। বেশ লকলকিয়ে বাড়ছে গাছগুলো। রোজ বিকেলে সদরপুকুর থেকে বালতি বালতি জল ভরে এনে গাছগুলোর গোড়া ভিজিয়ে দেয় শেফালি।

গোপেশ দেখতে পান, লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা সবজির গাছগুলো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

একটু বাদে উঠোনে আসে শেফালি। সন্ধের মুখে চান সেরে একটা গোলাপি রঙের ধোয়া শাড়ি পরেছে। চুলে খোঁপা বেঁধেছে পরিপাটি করে। গোলাপি রঙের টিপ পরেছে কপালে।

শেফালি আসামাত্র পুরো উঠোনটা এক ধরনের স্নিগ্ধ সুবাসে ভরে যায়। গোপেশকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়, যেকোনও পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপ ধরে শেফালি। দিবাকরটা নিতান্তই হতভাগ্য। এমন মেয়ের সান্নিধ্যেও তার মন ভরল না।

গোপেশ দেখতে পান, শেফালির দু-হাতে দুটো বাটি।

আম-তেল দিয়ে চালভাজা মেখেছে শেফালি। একটা বাটি বসিয়ে দেয় শ্বশুরের সামনে। অন্যটা নিয়ে বসে পাশটিতে। খেতে খেতে চলতে থাকে গপ্পোগুজব। হালকা চালে হাবিজাবি কথা সব। ভাবতে গেলে কোনও মাথামুণ্ডুই নেই তার। গোপেশও বুঝি সেটাই চান। সারাক্ষণ হালকা হালকা কথা দিয়ে

ভুলিয়ে রাখতে চান শেফালির মনটাকে। কিন্তু কতদিন তা পারবেন, তা তিনি নিজেও বুঝি জানেন না। একটা ভরভরন্ত যুবতী মেয়ের মন কেবল ছেলে-ভোলানো ঠাট্টা-মশকরা দিয়ে দীর্ঘকাল ভুলিয়ে রাখা যায়?

কথার পিঠে কথা চাপিয়ে দুজনেরই মনে যখন একটা ফুরফুরে ভাব এসেছে, তখনই গোপেশ একটুখানি চালাকির আশ্রয় নেন। একফাঁকে নিজেদের একান্ত গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন অজয়কে।

বলেন, তোর বাপের গাঁয়ের ছোকরাগুলা বড্ড ভালো রে।

শেফালি অমন আচমকা-কথার মাথামুণ্ডু ধরতে পারে না। বলে, কার কথা বলতিছ?

—আলাদা করিয়া কার কথাই বা কই? জনার্দনদার ব্যাটা অজয়ের কথাটাই ধর না, কী ভদ্র ছোকরা!

আচমকা অজয়ের প্রসঙ্গে শেফালি যুগপৎ বিস্মিত এবং কৌতূহলী।

—কেন? সে আবার কী কল্ল?

—না, করবে আবার কী! খুবই নিরাসক্ত গলায় বলেন গোপেশ,—সেদিন অদের বাড়ির সামনে দিয়া আসতে গিয়া আচমকা সাইকেলটার পিছনের চাকায় হাওয়া কমিয়াল। তখন ঠা-ঠা দুপুর। রাস্তায় ঘাটে জনমনিষ্যি নাই। কী করি, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া ভাবিতিছি, এমন সময় অজয় বারিয়া আইল ঘর থিকে। শুধাল, কী হইল, গোপেশকাকা? দাঁড়িয়া আছো যে বড়ো?

এই অবধি বলে থামেন গোপেশ। আড়চোকে একঝলক দেখে নেন শেফালিকে। বাকি কথাটুকু বলবার প্রয়োজন আছে কিনা পরখ করেন বুঝি।

খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল শেফালি। চোখের তারায় কিছু অচেনা সংকেত টের পাচ্ছিলেন গোপেশ। শেফালির হাতের মুঠোয় দু-চার দানা আধখাওয়া চালভাজা থমকে থেমে গিয়েছিল, গোপেশ দেখতে পান।

গোপেশ থামতেই শেফালি সরাসরি তাকায় ওর মুখের দিকে। বলে ওঠে, তারপর?

গোপেশ আড়চোখে দেখে নেন শেফালিকে। বলেন, তারপর—আমার অবস্থা দেখিয়া, ঘর থিকে পাম্পার আনিয়া সাইকেল পাম্প দিয়া দিল।

গোপেশ কয়েক মুহূর্ত থামেন। আড়চোখে ফের একপ্রস্থ দেখে নেন শেফালিকে। দুজনের মধ্যিখানের জটিল সময়টাকে একটুখানি বয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেই বুঝি একমুঠো চালভাজা পুরে দেন মুখে। চিবোতে থাকেন একমনে।

শেফালির হাতের মুঠোয় চালভাজার দানাগুলি খানিক উশখুশ করে একসময় থেমে যায়। অন্যমনস্ক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

একসময় গোপেশ বলেন, একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছি উকে।

হাতের চালভাজার দানাগুলোকে আলতো হাতে মুখের মধ্যে ছুড়ে মারে শেফালি। একমনে চিবোতে থাকে অলস লয়ে। ওই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শ্বশুরের দিকে। একসময় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

গোপেশ ঝাঁ করে তাকান শেফালির দিকে। শেফালির সারামুখে তখন বাঁধভাঙা হাসির রেশ।

দেখে অবাক হয়ে যান গোপেশ। এমন অনাবিল হাসি শেষ কবে দেখেছেন তিনি শেফালির মুখে! তবে কি... তবে কি... যা আন্দাজ করছেন মনে মনে, কানাঘুষোয় যা শুনেছেন, সেটাই সত্যি।

গোপেশ বোকা-বোকা চোখে তাকান। কিছুই না বোঝার ভান করেন। বলেন, হাসতিছু যে? অত হাসির কী হইল রে, মেয়া?

সেকথায় শেফালির হাসিটা বুঝি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বলে, হাসিতিছি তুমার কথা শুনিয়া।

সেকথায় গোপেশের মুখে বোকাবোকা ভাবটা বুঝি আরও প্রকট হয়। বলেন, যাব্বাবা! হাসবার মতন কুন কথাটা বললাম আমি?

—হাসবার মতো কথা লয়? শেফালির সারামুখে তখন শ্বশুরের প্রতি চাপা ভর্ৎসনা, —সাইকেলে টুকচার পাম্প দিয়া দিল, এই একটা সামান্য কাজের তরে একেবারে বাড়িতে আসার নিমন্ত্রন্ন?

—সামান্য? শেফালির দিকে কটমট করে তাকান গোপেশ, তোর পাশ সামান্য কাজ হইল এটা? ভাব্ দেখি, সে ওই সাহায্যটুকু না কল্লে সেদিন অতটা পথ সাইকেল ঠেলিয়া ঠেলিয়া জান বারিয়া যাইত।

শেফালি আবারো চোখ মেলে তাকায় গোপেশের দিকে। কী যেন আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকে শ্বশুরের মুখের রেখায়।

গোপেশও আঁতিপাঁতি কিছু খুঁজতে থাকেন শেফালির মুখে।

গোপেশের ছলনাটুকু কি আন্দাজ করে ফেলেছে ওইটুকু মেয়ে! গোপেশ বুঝতে পারেন না। তবে বুঝতে পারলেও ক্ষতি নেই, বরং সেটা একদিক দিয়ে ভালোই। এমনটা ভেবে নেন গোপেশ।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শেফালি বলে, কথা নাই, বার্তা নাই, এই যাকে-তাকে যখন-তখন ঘরে আসার জন্য বলাটা ছাড়ো তো দেখি বাবা। আমি এসব একেবারেই পছন্দ করি না। কাকা বলিয়া ডাকল, অমনি 'বাড়িতে আইস', সাইকেল পাম্প দিয়া দিল, অমনি, 'বাড়িতে আইস,' এমন সিধা-সরল হইলে চলে?

—আরে, ডাকলেই কি আর কেউ ঘর বইয়া চলিয়া আইল নাকি? কথার কথা। ভদ্দতা বলিয়া একটা কথা আছে না?

শেফালি গুম মেরে বসে থাকে।

—তা বাদে, তার আসার টাইম কুথা? সে এখন বেস্ত মানুষ। তিনবেলা তার টিউশনি।

শেফালি জবাব দেয় না।

একটিবার আড়চোখে শেফালিকে দেখে নিয়ে গোপেশ বলেন, শুনতে পাই নাকি খুবই ভালো পড়ায়।

এবার ঝাঁজিয়ে ওঠে শেফালি। বলে, চালভাজাগুলা শেষ করবে, নাকি এক্কেরে ভাতের সঙ্গে খাবে ওগুলা? চা করব কি? খালি সারাক্ষণ একই কথা ভ্যাজোর-ভ্যাজোর...।

—চা আর খাবোনি। কিন্তু তুই অত রাগিয়া গেলু কেন? রাগিয়া যাবার মতন কী বললাম আমি?

—না। শেফালি গোপেশের দিকে সরাসরি দৃষ্টি হেনে বলে, আর কুনোদিনও একে-অকে বাড়িতে ডাকবে না তুমি। তাইলে আমি কিন্তু খোব রাগিয়াবো।

বলেই পুনরায় গুম মেরে যায় শেফালি। মাঝ উঠোনে, ফুরফুরে হাওয়ায় একেবারে ছন্দপতন ঘটে বুঝি।

গোপেশ আচমকা খেপে ওঠার ভান করেন। উরুতে চাপড় মেরে বলে ওঠেন, একশোবার ডাকব। আমার বাড়ি, আমি যাকে খুশি, যখন খুশি নিমন্তন্ন করিয়া ডাকিয়া আনব। তাতে তোর কী রে মেয়া? বাপের সঙ্গে তক্কো!

আসলে, রাগিয়ে দিয়ে শেফালির প্রতিক্রিয়াটি মালুম করতে চেয়েছিলেন গোপেশ। আচমকা উথলে উঠলে কথার ফেনার সঙ্গে মনের তলার থেকে, একেবারে পাঁকের ভেতর থেকে কিছু উঠে আসে কিনা পরখ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেফালি আর মুখ খোলে না। গোপেশের দিকে এক ঝলক আগুনে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েই মুখে এক্কেবারে কুলুপ আঁটে সে। কোনও ঝাঁজালো মন্তব্যও করে না, কোনওরূপ তর্কেও যায় না, কিন্তু তার ঠোঁটজোড়াতে তীব্র অসূয়ার রেশ লেগে থাকে অনেকক্ষণ। তার চোখদুটির পানে তাকিয়ে গোপেশের মনে হয়, এই সাঁঝপ্রহরে বুঝি খুব ঘুম আসছে শেফালির চোখে।

গোপেশ আর কথা বাড়ান না। কিন্তু শেফালির ওই আচমকা রেগে যাওয়াটাকে মনের মধ্যে খেলিয়ে খেলিয়ে বিশ্লেষণ করতে থাকেন।

আসলে, রেগে কাঁই হয়ে যাওয়া শেফালির মুখ থেকে ওই নিয়ে আরও কিছু মন্তব্য আশা করেছিলেন তিনি। শেফালি একেবারে গুম মেরে যাওয়াতে একটুখানি হতাশ হন।

কিন্তু মাত্র প্রথম দিনে ওই অবধি গিয়ে ফিরে আসেন গোপেশ। আচমকা কথা ঘুরিয়ে বলেন, আজ রাইতে একটুখানি ছোলার ডাল কর তো রে। অনেক দিন ছোলার ডাল দিয়ে রুটি খাইনি।

খুব ধীরে ধীরে শ্বশুরের দিকে মুখ ফেরায় শেফালি। বেশ কয়েক পলক ধরে দৃষ্টির তুলিজোড়া

বোলাতে থাকে ওর মুখে। একসময় ফিক করে হেসে উঠে বলে, বাচ্চা ছেলে একটা।

আর, সঙ্গে সঙ্গে শেফালির কোলে মাথা দিয়ে সটান শুয়ে পড়েন গোপেশ।

শেফালি আড়চোখে দেখে নয় গোপেশকে। ওর মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলোতে থাকে।

একসময় বলে, হ্যাঁ বাবা, এই বয়েসে তোমার যা রূপ, যৌবনকালে যে কী ছিলে তুমি!

বলে, আমি ঠিক কচ্ছি, আবার একটা মা আনব ঘরে। দেখো, এখনও সাজিয়ে গুজিয়ে তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলে কনে-তো-কনে, কনের মা-ও আইসিয়া বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাইবে।

শুনতে শুনতে গোপেশ কপট রোষে তাকিয়ে থাকেন শেফালির দিকে। সেই বিয়ের দিনেই তাঁর মনে হয়েছিল, এ মেয়ের মাথায় একটুখানি ছিট রয়েছে। সেটা ক্রমশ মালুম হতে থাকে।

চোখ পাকিয়ে বলেন, অ্যাই, আমি তোর শ্বশুর হই না? যা মুখে আসে তাই বলিস? এবার থিকে শ্বশুরের সামনে ঘোমটা দিবি।

শেফালি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।



একদিন সকাল দশটা নাগাদ গোপেশের বাড়িতে সত্যি সত্যি অজয় এসে হাজির।

গোপেশ তো ওকে দেখে অবাক। যেন আচমকা আকাশের চাঁদ পান তিনি। ওকে নিয়ে কী করবেন, কোথায় বসাবেন, ভেবে পান না বুঝি। শেফালির উদ্দেশে হাঁকডাক জুড়ে দেন। কোথা গেলি, ও শেফালি, দেখিয়া যা, কে এসেছে!

শেফালি তো অতশত জানে না, শ্বশুরের আকুলিবিকুলি ডাকাডাকিতে, দৌড়ে এসে অজয়কে দেখা মাত্তর যেন ভূত দেখে সে। বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে যায়। শ্বশুরের দিকে এমন চোখে তাকায়, ঠিক যেমন করে কোনও ষড়যন্ত্রীর দিকে তাকায় মানুষ।

গোপেশ শেফালির ওই দৃষ্টিকে তিলমাত্র পাত্তা দেন না। একটুও অস্বস্তি বোধ করেন না তিনি। ওঁর মুখে অপরাধবোধের বিন্দুমাত্র ছাপ দেখতে পায় না শেফালি। বরং শেফালির অগ্নিদৃষ্টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে ফিক করে হেসে ফেলেন। বলেন, দেখতিছু কী? সেদিন ওই খরদুপুরে, উ না থাকলে কী দুর্গতিটা যে হইত! উহ, বড়ো বাঁচা বাঁচিয়া গেছি।

কতদিন বাদে আচমকা শেফালিকে দেখে বুঝি চোখ ফেরাতে পারে না অজয়। রূপ যেন ফেটে বেরোতে চাইছে শেফালির সর্বাঙ্গ দিয়ে। তার ভরাট বুক আর নিতম্ব পেঁচিয়ে উঠে গিয়েছে একটি ফুল-ফুল ছাপা শাড়ি। ঘন চুলের ঢাল ঢেকে দিয়েছে পুরো পিঠ। চোখের কোল ঈষৎ ভরাট। একই গাঁয়ের মেয়ে সে, কিন্তু প্রথম দর্শনেই অজয়ের মনে হয়, এই শেফালি তার সম্পূর্ণ অচেনা।

অজয়কে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যায় শেফালি। ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকাতেই পারে না।

গোপেশ তখনও অবধি সাতকাহন করে অজয়ের গুণকীর্তন করে চলেছেন। তারই ফাঁকে তিনি অজয়ের মুগ্ধতাটুকু আড়চোখে দেখে নিতে পারেন।

শেফালির সামনে অতখানি প্রশংসা করায় যার-পর-নাই লজ্জা পায় অজয়। বলে, গোপেশকাকার খালি বাড়িয়ে বলা অইভ্যাস। সাইকেলে টুকচার পাম্প করিয়া দিছি, তার তরে এমন করিয়া বলতিছ, যেন কী এক পাহাড় উলটিয়া দিছি!

—সেটাই বা আজকালকার দিনে ক-জন করে? এ দুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা চলে না বাপ।

এইভাবে দু-জনের মধ্যে চলতে থাকে নাগাড়ে তর্ক। অজয় প্রমাণ করতে চায়, ওইদিন সে এমন কিছু করেনি, যার জন্য তার অতখানি প্রশংসা প্রাপ্য হয়। আর, গোপেশ প্রমাণ করতে চান, অজয় বা করেছে, এযুগে তেমনটাই কেউ বড়ো একটা করে না। এই নিয়ে চাপানউতোর চলতেই থাকে।

ততক্ষণে শেফালি তার আকাশচুম্বী বিস্ময়টাকে সামলে নিয়েছে। সে ধীর পায়ে ভেতরে চলে যায়। রান্নাঘরের চৌকাঠ চেপে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার গলা শুকিয়ে আসতে থাকে। রান্নাঘরে

কে ঢকঢকিয়ে জল খায় সে। তারপর কী মনে হয়, একগ্লাস জল নিয়ে গিয়ে নামিয়ে আসে অজয়ের ামনেটিতে।

গোপেশ বলে ওঠেন, শুধু জল দিলে হবে? অজয়ের তরে জলখাবারের ব্যবস্থা কর্। তোর বাপের গাঁয়ের ছোকরা সে। বলতে গেলে কুটুমই। কুটুমকে কী করিয়া খাতির-যতন কত্তে হয় জানিসনি? শিখায়নি তোর বাপ? বলেই এক অচেনা আনন্দে মিটিমিটি হাসতে থাকেন গোপেশ।

অজয় গলায় খুব অস্বস্তি ফুটিয়ে বলে, আমি খাইয়া বারিয়েছি। চলিয়া যাব একটু বাদেই।

—ওই আনন্দেই থাকো। বলেই গোপেশ তাকান শেফালির দিকে। বলেন, আজ অজয় ভাত খাবে ইখেনে। পুকুরে জাল দিয়া মাছ ধরব। ভালো করিয়া রাঁধ্ দেখি। কতদিন ভালোমন্দ খাইনি।

গোপেশের শেষের কথায় রাগ হয়ে যায় শেফালির। মুখের তাবৎ রেখায় গোঁসা ফুটিয়ে বলে, হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন তো কিছু খাইতে পাওনি তুমি!

—আরে সে কথা লয়। গোপেশ শেফালির সঙ্গে সন্ধি করতে চান, খাবনি কেন, তবে ঘরে কুটুম আইলে যেমন ভূরিভোজটা হয়, সেটা কি আর সম্বৎসর হয় গাঁয়ে-ঘরে? বুঝলে অজয়, আমার শেফালি যেমন মাছের তেলঝোল রাঁধে, অমনটি তুমি আর কোথাও খাওনি। আজ খেয়ে দেখো। জিভে তুমার লাগিয়া রইবে।

অজয়ের সামনে নিজের রান্নার এমন লাগামছাড়া প্রশংসা শুনে শেফালি বুঝি আরও খেপে ওঠে। গোপেশের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ধমক লাগায় চোখে, তুমি থামবে? তুমার না আজ হাটে যাবার কথা? সকাল সকাল রওনা না দিলে কখন পৌঁছবে হাটে, কখন ফিরবে?

—হাটে যাইতে আমার বইয়া গেছে। গোপেশ ফুৎকারে উড়িয়ে দেন শেফালির কথাগুলো। আমি বলিয়া একটা বিড়ি খাইয়া জাল লিয়া পুকুরে নামব। বলেই তিনি কুলুঙ্গিতে বিড়ির খোঁজে হাত বাড়ান।

অজয়ের সামনে শেফালি কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। তাই দেখে গোপেশ বলেন, একই গাঁ-র ছেলে-মেয়ে তোরা, অজয়কে অত লজ্জা পাবার কী আছে বুঝি না! বলতে বলতে জাল নিয়ে পুকুরের দিকে রওনা হন গোপেশ।

শেফালি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দেখতে থাকে গোপেশকে। একসময় নাচার হয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়তে থাকে। বলে, আচ্ছা যা হোক এক পাগল জুটেছে এই সংসারে! এসব লোককে রাঁচিতে রাখিয়া আসতে হয়।

একটু বাদেই অজয়ের জন্য জলখাবার নিয়ে বাইরে আসে শেফালি। মুড়ি, গুড়, পাকা কলা...। কাঁসার রেকাবিটা অজয়ের সামনে নিঃশব্দে নামিয়ে দেয়।

গোপেশ ততক্ষণে জাল নিয়ে নেমে পড়েছে সদর পুকুরের জলে।

—খাও অজয়দা। অজয়ের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু গলায় বলে শেফালি।

অজয়ের মুখমণ্ডল থেকে তখনও অবধি অস্বস্তিটা তো কাটেইনি, বরং একা-একা শেফালির সান্নিধ্যে থাকবার দরুন সেটা আরও বেড়ে যায়. মিনমিনে গলায় বলে, আমি খাইয়া-দাইয়া এসেছি। শুধুমুদু...।

শেফালি জবাব দেয় না। পায়ে পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় সে।

অল্পক্ষণ চুপ থেকে একসময় রেকাবিটা নিজের দিকে টেনে নেয় অজয়।

মাছ দিয়ে দু-তিনটে পদ রাঁধে শেফালি। অজয় তেল মেখে চান সেরে আসে কুয়োতলায়। রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় দুজনের পাত পেড়ে দেয় শেফালি।

খেতে খেতে মান্দার গাঁয়ের হাজার প্রসঙ্গ তোলেন গোপেশ। শেফালির বাপের বাড়ির সবাইয়ের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে খোঁজ নেন। ওইসব নিয়ে হরেক প্রকারে জেরা করতে থাকেন অজয়কে।

এরপর আসে শেফালির রাঁধা তেলঝোলের প্রসঙ্গ। গোপেশ বলেন, তেলঝোলটা কেমন হয়েছে বল দেখি? মাছটা একটু-চার পাকা হইলে স্বাদটা আরও বাড়ত। কিন্তু কী করব, জালটা পুরোনো হইয়া গেছে। দু-চার জা'গায় ফাটিয়া গেছে। বড়ো মাছগুলা বারিয়া যায়। একটা নৈতন জাল না কিনলেই নয়। এরপর যখন আইসবে, নৈতন জালে মাছ ধরিয়া খাবার তুমাকে।

বলতে বলতে হঠাৎই বুঝি মনে পড়ে যায় গোপেশের, হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমাদের গাঁয়ের লক্ষ্মীনারান কামিল্যা তো ভালোই জাল বুনে।

অজয় খাওয়া থামিয়ে জবাব দেয়, বুনে তো।

—জাল বুনিয়া বিক্রিও তো করে।

—করে তো।

গোপেশ এবার একেবারে হামলে পড়েন, তুমাকে বাবা আমার একটা কাজ করিয়া দিতেই হবে।

গোপেশের দিকে তাকায় অজয়।

—লক্ষ্মীনারানের থেকে একখানা নৈতন জাল আনিয়া দিতে হবে আমাকে। আমি দাম দিয়া দুবো। বল, কবে আনবে?

বলতে বলতে গোপেশ এতটাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, যেন জালটা সন্ধের মধ্যে পেলেই ভালো হয়।

ঠোঁটের কোণে বুঝি হাসি চলকে ওঠে অজয়ের। বলে, তার কাছে নৈতন জাল আছে কিনা দেখতে হবে তো।

—আছে, আছে। গোপেশের বুঝি তর সয় না। বলেন, তুমি আজই ফিরিয়া গিয়া খোঁজ লিবে। যদি পাও তো কালই লিয়া আইস্‌বে।

একটা সামান্য জালের জন্য গোপেশকে এমন বাচ্চা ছেলের মতো উতলা হয়ে উঠতে দেখে খুবই মজা পায় শেফালি। মুখ টিপেটিপে হাসতে থাকে সে। নিঃশব্দে উপভোগ করতে থাকে একজন বয়স্ক মানুষের ছেলেমানুষি আচরণ। ঠোঁট উলটে বলে, ব্যস, শুরু হয়্যালো পাগলামি। এক্ষুনি জাল না হইলে দুনিয়া অন্ধকার!

—কী কথা বলু তুই মেয়া! গোপেশ দৃশ্যত ভারী বিরক্ত হন, —ঘর কন্তে একটা জাল না হইলে চলে?

গম্ভীর গলায় শেফালি বলে, জাল একটা দরকার বটে, কিন্তু সেটা এক্ষুনি না হইলেও চলে।

বিকেল গড়িয়ে বিদেয় নেয় অজয়।

গোপেশ বারবার বলতে থাকেন, আবার আইস বাবা, এ তোমার এক কাকার ঘর, যখন খুশি চলিয়া আইস্‌বে। আর, নতুন জাল যদি পাও তো কালকেই।

সেদিন, অজয় চলে যাবার পর সারা বিকেল, সন্ধে, বারবার ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন গোপেশ।

শুনতে শুনতে এক সময় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শেফালি।

গোপেশ তার অমন আচানক হাসির মর্ম বুঝতে পারেন না কিছুতেই। কিন্তু কেমন জানি তাঁর মনে হয়, বহুদিন বাদে আজ বড়ো ঝরঝরে লাগছে শেফালিকে।

কিন্তু সেই রাতে শেফালির শরীর জুড়ে আবার সেই রহস্যময় অসুখটার দাপাদাপি শুরু হয়। ভেতর থেকে কিছুতে যেন বারবার দুমড়ে মুচড়ে দিতে চায় ওর শরীরটা।

এবং একটু বেশি রাতে সাপটাকে আবারও দেখতে পান গোপেশ।

সাপটা ওঁর পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে শেফালির ঘরে।



যেদিন শেফালির ভিটেয় সাপটাকে প্রথম দেখতে পেলেন গোপেশ, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তাঁর।

শেফালি ভয় পেয়ে যেতে পারে, তাই তাকে কথাটা বলেননি, কিন্তু সাপটাকে আরও ভালো করে নজর করতে চেয়েছিলেন। কী জাতের সাপ, বিষধর কিনা, মালুম করতে চেয়েছিলেন নিঃশব্দে। সাপ হলেই যে বিষধর হবে তার তো কোনও মানে নেই। অনেক সাপকে দেখলে ভয় করে বটে, কিন্তু তার শরীরে বিষ থাকে না। আবার কোনও কোনও জাতের সাপ রয়েছে, দেখতে কুলোয় না, কিন্তু তার শরীর জুড়ে তীব্র বিষের সঞ্চয়।

সাপটাকে যখন আঁতিপাঁতি পরখ করে চলেছেন, তেমনই একদিন অজয় কাঁধে একটা নূতন জাল

নিয়ে হাজির হল গোপেশের বাড়িতে।

গোপেশ তখন বাড়ি ছিলেন না।

অজয়ের গলার স্বরেই শেফালি বুঝে ফেলে। প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না সে। একসময় সসংকোচে বাইরে বেরোয়।

বলে, বাবা তো নাই, কামারদোরে ফাল পাজাতে গাছে।

এরপর অজয়কে কী বলা যায়, ভেবে পায় না শেফালি। কাঁধে জালের বোঝা নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে অজয়।

অগত্যা শেফালিকে মুখ খুলতে হয়। বলে, আইস অজয়দা। বাবা এক্ষুনি ফিরিয়া আইস্‌বে। তুমি আবার জাল বইয়া আনতে গেলে কেন?

অজয় দাওয়ায় উঠে আসে। জালটাকে কাঁধ থেকে নামায়। শেফালি দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দেয়। বলে, বুসো। বলেই ঘরের ভেতরে চলে যায় শেফালি। অজয় বসে থাকে একলাটি।

একা একা বসে বসে চারপাশটা নিরিখ করতে থাকে সে। দেখে, উঠোনের সজনে গাছের একটা নিচু ডালে একটা হাঁড়ি বাঁধা রয়েছে। একটা গোবরা শালিখ সুরুৎ করে ঢুকে পড়ল ওর মধ্যে।

একটু বাদে গ্লাসে করে জল এনে শেফালি নামিয়ে দেয় অজয়ের সামনে।

—এটা কে বেঁধেছে? হাঁড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধোয় অজয়।

অজয়ের প্রশ্নে সারা মুখে কৌতুক ফুটিয়ে তোলে শেফালি। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে থাকে। হাসির দমকে তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকা চুলের ঢল ভেঙে পড়ে মুখের দু-পাশে। ঠোঁট টিপে জবাব দেয়, আমি।

—তুমি! অজয় দু-চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে শেফালির দিকে।

শেফালি বলে, শালিখটা বাচ্চা ফুটিয়েছে ওর মধ্যে। দেখছ না, পোকামাকড় ধরে এনে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে।

ঢকঢকিয়ে জল খায় অজয়। শেফালির মুখের দিকে তাকায়। তার ঠোঁটের কোণে একচিলতে অস্বস্তি মাখানো হাসি উঁকি মেরেই মিলিয়ে যায়।

একসময় খুব মৃদু গলায় শুধোয়, কেমন আছ, শেফালি?

এর কোনও জবাব সহসা মনে আসে না শেফালির। সে তো একথাটা ভুলতে পারে না যে, সবকিছু ঠিকঠাক চললে, অজয়ের সঙ্গেই বিয়ে হত তার।

খুব অন্যমনস্ক গলায় বলে, তুমি বসো, আমি একটা রান্না চড়িয়েছি উনুনে। বলেই ত্বরিত পায়ে ঘরের ভেতরে চলে যায় শেফালি। অজয় একা একা বসে থাকে।

একটু বাদেই কামারশাল থেকে ফিরে আসেন গোপেশ। অজয়কে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। গলা চড়িয়ে শেফালির উদ্দেশে বলেন, দেখেছু শেফালি, অজয় ঠিক এনেছে জাল। আমি জানতাম, অব কথার দাম আছে।

ভেতর থেকে কোনও জবাব না আসায় মনে মনে একটুখানি ক্ষুন্ন হন গোপেশ। বলেন, তুমাকে জল-টল দিয়েছে? যা তালকানা মেয়া! পরমুহূর্তে অজয়ের সামনে খালি গ্লাস দেখে নিশ্চিন্ত হন গোপেশ। বলেন, তুমি বুসো, আমি ফালগুলা তুলিয়া রাখি। তুমার সাথ অনেক কথা আছে আমার।

—আমি কিন্তু এবার উঠব।

—উঠবে মানে? গোপেশ বুঝি আকাশ থেকে পড়েন, উঠলেই হল? নতুন জাল দিয়া মাছ ধরব, খাওয়া-দাওয়া হবে, তা বাদে তুমাকে জালটার দামটাও তো দিবা হয়নি।

দিনকতক বাদে গোপেশ কথাটা সরাসরি পাড়েন শেফালির কাছে।

বলেন, হ্যাঁ-রে মা, একটা কথা জিগাব, ঠিকঠাক জবাব দিবি তো?

—কী কথা? শেফালি ভুরু কুঁচকে তাকায় গোপেশের দিকে।

—সত্যি করিয়া ক' দেখি, অজয়কে তো'র কেমন লাগে?

আচমকা এমন প্রশ্নে হকচকিয়ে যায় শেফালি। ভুরু কুঁচকে তাকায় গোপেশের দিকে। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে বিরক্তির ছাপ দেখতে পান না গোপেশ, বরং তিনি লক্ষ করেন, প্রশ্নটা শোনা মাত্তর শেফালির সারা মুখে ডালিমের কোয়ার মতো এক ধরনের লালচেপনা আভা জমেছে।

শ্বশুরের দিকে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকায় শেফালি। বলে, এ আবার কেমনতরো প্রশ্ন?

—যেমনতরোই হোক, জবাবটা কিন্তু ঠিকঠাক চাই। বাপের সামনে মিছা কথা বললে বাপটা কিন্তু মরিয়াবে।

ইতিমধ্যে অজয় হরেক অছিলায় গোপেশের বাড়িতে এসেছে। গোপেশই বারবার উদ্যোগ নিয়েছেন, যাতে অজয় অছিলাগুলো পেয়ে যায়। শেফালি তা খেয়াল করেছে কিনা কে জানে।

গোপেশ লক্ষ করছেন, অজয়ের সামনে একটু একটু করে সাবলীল হয়ে উঠছে শেফালি। এখন অজয়ের উপস্থিতিতেও বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে হাঁটাচলা করে, কথাবার্তা কয়, কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসেও ওঠে। একদিন তো কী কথায় যেন আচমকা বলে উঠল, একটা মেয়ের সন্ধান করো তো অজয়দা। আমার বড়োছেলেটার বিয়ের বইস হয়েছে, এবার বিয়েটা না দিলেই নয়। বেশ রূপসি বউ হওয়া চাই কিন্তু। একটা রূপসি মেয়াকে আনিয়া গলায় বাঁধিয়া না দিলে, অর বাউন্ডুলেপনা যাবেনি।

শেফালির কথাগুলো শুনতে শুনতে আর ওর দু-চোখের ভঙ্গি দেখতে দেখতে গোপেশ বুঝি চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে যান।

গোপেশের প্রশ্নটা শোনামাত্তর গুম মেরে গিয়েছে শেফালি। ভুরুজোড়ায় ঘনঘন ভাঙচুর হচ্ছে।

গোপেশ আর ব্যাপারটাকে অস্পষ্ট রাখতে চান না। তিনি সরাসরি চোখ রাখেন শেফালির চোখের ওপর। বলেন, শুন বেটি। যদি সত্যি সত্যি অকে ভালো লাগে তোর, তবে পষ্ট করিয়া ক আমাকে।

শেফালি দু-চোখে দুনিয়ার বিস্ময় জড়ো করে বলে, কেন? ভালো লাগলে কী করবে তুমি?

—কী আবার করব, আর সাথে তোর ব্যা দিয়া দিব।

—ধ্যাৎ, কী যে বল! শেফালি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায় শ্বশুরের কথাগুলো।

—ধ্যাৎ কী? গোপেশ আরো শক্ত করে চেপে ধরতে চান শেফালিকে, আমরা, তোর দুই বাপ মিলিয়া ঠিক করিয়া ফেলছি সেটা। অজয়েরও মত আছে বলিয়া মনে হয আমার। এখন, তোর মতামতটা পষ্টাপষ্টি জানতে পারলে অজয়ের কাছে দু-বেহাইতে মিলিয়া কথাটা পাড়ি।

শেফালি বুঝতে পারে, ওর বিয়ের ব্যাপারে ওর বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যেই যাবতীয় কথাবার্তা সেরে রেখেছেন গোপেশ। অজয়কে নিয়েও ভাবনাচিন্তা সারা। এখন কেবল শেফালির মতামতটুকুর অপেক্ষা।

শ্বশুরের দিকে কটমটিয়ে তাকায় শেফালি। দু-চোখে কপট রোষ ফুটিয়ে বলে, তুমাদের কি অন্য কুনো কাজকর্ম নাই? দুনিয়ায় আর কুনো ভাবনাচিন্তার বিষয় খুঁজিয়া পাচ্ছনি তুমরা? বলেই দুমদুম পা ফেলে চলে যায়।

—শুন। পেছন থেকে শেফালিকে থামান গোপেশ। ওর চোখে চোখ রেখে বলেন, তাইলে অজয়ের সাথ কথাবার্তা শুরু করি?

—বটে! লিকলিকে বেতের মতো সপাং করে পিছু ফেরে শেফালি, —পষ্ট করিয়া শুনিয়া লাও কথাটা। বিয়ে আমি করবনি। অজয়দাকেও নয়, কাউকেই নয়।

বলতে বলতে দুমদাম পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় শেফালি, কিন্তু ওর কথা বলবার এবং চলে যাবার ধরন দেখতে দেখতে গোপেশের কেন জানি মনে হয়, যতটা রোষ প্রকাশ করে গেল মেয়েটা, বুকের ভেতরে বাস্তবিক ততখানি রোষের সঞ্চয় নেই।



বাস্তবিক মেয়েটার ওই নিদারুণ অসুখটা নিয়ে গোপেশের মনে বুঝি দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

শেফালির বাপকেও জানিয়েছেন ব্যাপারটা। ওরাও বারকয় এসে দেখে গেছে মেয়েকে। আর, গাঁয়ে-ঘরে তো একেবারে চাপা থাকে না কোনও কথাই, গ্রামাঞ্চলে গোপন কথার শরীরে পাখনা গজায় রাতারাতি। কাজেই, শেফালির ওই বেয়াড়া রোগটার কথা এক সময় ছড়িয়ে পড়ে সারা গাঁয়ে। আর, গাঁ-গঞ্জ হল সেই জায়গা, যেখানে মানুষ নিজের চেয়ে অন্যের খোঁজখবর রাখতে এবং তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে অধিক ভালোবাসে। ফলে, শেফালির বেয়াড়া রোগটা কেবল তাকেই তিলেতিলে দগ্ধে মারলেও, তা সারা গাঁয়ের মানুষজনের একান্ত গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে আমার বড়োপিসির মতো মানুষেরা তো শেফালির সমস্যাটাকে একান্তভাবে নিজেদের সমস্যা জ্ঞান করে নিরাময়ের উপায় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে।

একদিন বড়োপিসিই প্রথম শেফালির রোগটাকে চিনে ফেলেছে বলে দাবি করে।

বলে, রোগ-টোগ কিছো নয়, অর ভাতারই ভর করতিছে অর উপর। কচি বইসে চলিয়া গেল তো, সখসাধ কিছোই মিটেনি। যত জলদি পারিস একটা ওঝা ডাক তোরা। আর পারিস তো গয়ায় গিয়া দিবাকরের পিন্ডিটাও দিয়া আয়।

শুনে সন্ধিপুরের বারোআনা মানুষের মনে ধরে কথাটা। অতৃপ্ত আত্মার পক্ষে এমনটা করা অসম্ভব নয়। ডাক তবে ওঝাকে। সে এসে মন্ত্রপূত ঝাঁটা ঘা-কতক মারুক শেফালির পিঠে। জুতো পুড়িয়ে শুঁকাক। লংকা পুড়িয়ে মেয়েটার নাকের সামনে ধরুক।

বড়োপিসির কথাতেই সায় দেয় সবাই।

একমাত্র শিখাবউদিই বারবার অন্য কথা বলছিল। তখন শিখাবউদি প্রায় রোজদিনই যাচ্ছিল শেফালির কাছে। অল্প বয়েসে স্বামীহারা মেয়েটিকে হরেক প্রকারে সান্ত্বনা জুগিয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু যেহেতু সে গোপেশের দু-চোখের বালি বরাবরই, গোপেশ যখন থাকতেন না ঘরে, তখনই যেত। গোপেশ অবশ্য জানতে পারতেন তা, কিন্তু শেফালির একাকীত্বের কথাটা ভেবেই তিনি ওই ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেননি। আসুক। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে কচি মেয়েটার যদি একাকীত্বের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

সারা গ্রাম যখন ওঝা আনার পক্ষে, শিখাবউদিই কেবল বলেছিল অন্য কথা। বলেছিল, ভূত-টুত বাজে কথা। শেফালিকে কোনও মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও তোমরা। ও মনের অসুখে ভুগতিছে।

শুনে বড়োপিসির দল ফোঁস করে ওঠে। বলে, ওই মাগিই তো মাথাটা খাচ্ছে শেফালির। সারাক্ষণ ওর কাছে গিয়ে কী সব গুজুর-ফুসুর কচ্ছে। ওই করেই তো বিগড়ে দিচ্ছে মেয়েটার মন।

শিখাবউদির শহুরে হালচাল আর স্পষ্ট কথার ঝাঁঝের দরুন গাঁয়ের অনেকের মতো গোপেশও এমনিতে কোনও কালেই দেখতে পারেন না শিখাবউদিকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সারা গাঁয়ের মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে শিখাবউদির সঙ্গে একমত হলেন তিনি।

অজয় নিয়ে এল ভালো ডাক্তারের খবর। মেদিনীপুর সদরে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছে। চেষ্টা করলে আগেভাগে ডেট পাওয়া যাবে। কিন্তু কথাটা শেফালির কাছে পাড়া মাত্তর সে তেড়ে মারতে যায় অজয়কেই। বলে, ডাক্তার কী করবে? আমার কিচ্ছু হয়নি।

একদিন সন্ধেবেলায় হাস্কিং-মেশিন থেকে ধান কুটিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে পর গোপেশ দেখেন, সাঁঝ প্রহরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে শেফালি।

মনে মনে প্রমাদ গোনেন গোপেশ। যদিও প্রস্তুতিপর্বটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়নি, কেন কি, সারা বিকেল বাড়িতে ছিলেন না তিনি, তবুও শেফালিকে একঝলক দেখে নিয়ে গোপেশের মনে কোনওরূপ সন্দেহ থাকে না, মেয়েটার শরীর জুড়ে দুশমনটা আসছে। একটু বাদেই সে ঢুকে পড়বে শেফালীর শরীরে।

সারা শরীরে তুষেব গুঁড়ো, গোপেশ আর ঢোকেন না শেফালির ঘরে। সদর পুকুরে চান করতে নামেন তিনি।

এখন তাঁর কত কাজ! শেফালি তো সারা সন্ধে কুটোটি নাড়তে পারবে না। রান্নাবান্না সবকিছু আজ সারতে হবে গোপেশকেই। একটু বেশি রাতে শেফালি যদি বিছানা থেকে উঠে কিছু মুখে দিতে পারে, তাই না কত! ততক্ষণে দুশমনটা যদি ওর শরীর ছেড়ে যায়, তবেই না। নইলে তো রাতভর ছটকাতে থাকবে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে হবে গোপেশকে।

চান সেরে রান্না চড়ান গোপেশ। দাওয়ায় বসে বসে আনাজ কুটতে থাকেন, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে দেখতে থাকেন, শেফালির শরীরে শয়তানটা কতখানি জাঁকিয়ে বসল।

খুব মগ্ন হয়ে আনাজ কুটছিলেন গোপেশ, আচমকা তার নজর পড়ে যায় ভেতর ঘরের চৌকাঠের দিকে।

দেখতে পান, সাপটা তার কালোপানা শরীরটা নিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ঝটিটি উঠে দাঁড়ান গোপেশ। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকেন তিনি। কিন্তু সাপটাকে আর দেখতে পান না।

চৌকাঠ পেরোলে একটা বৈঠকখানা মতো ঘর। তার একদিকে একটা চৌকি পাতা রয়েছে। এমনিতে বসা-টসা হয়, তাবাদে বাইরের কুটুমবাটুম গোছের কেউ এলে শোয়-টোয়। চৌকির তলায় বাক্সো-প্যাঁটরা, ধান ওজন করবার দাঁড়িপাল্লা, হাবিজাবি আরও অনেককিছুতে বোঝাই। ঘরের এককোণে বীজধানের বস্তা ডাঁই করে রাখা।

বৈঠকখানার দু-দিকে দুটো শোওয়ার ঘর। একটার দরজা পুবমুখো, অন্যটার দক্ষিণে। পুবমুখোটাতে সুভদ্রাকে নিয়ে গোপেশ শুতেন। অন্যটা খালিই পড়ে থাকত। দিবাকরের বিয়ে হওয়ার পরে শেফালিকে নিয়ে ওই ঘরটাতেই শুত সে। বর্তমানে পুবমুখোটাতে গোপেশ শোয়, দক্ষিণমুখোটাতে শেফালি। মধ্যিখানে বৈঠকখানার আড়াল।

সাপটাকে প্রথমে বৈঠকখানা ঘরেই আঁতিপাঁতি খুঁজতে থাকেন গোপেশ। কিন্তু কোথাও তার টিকিটিও নজরে পড়ে না। টর্চ জ্বালিয়ে চৌকির তলাটা ভালো করে দেখেন গোপেশ। বীজধানের বস্তাগুলোর মধ্যেও টর্চের আলো ফেলেন। কিন্তু না, সাপটা যেন বাইরের চৌকাঠ পেরোনো মাত্তর হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে কি সাপটা ভেতর-ঘরে ঢুকে গেল? যদি তাই হয়, তবে দুটি শোওয়ার ঘরের মধ্যে কোন ঘরটিতে গিয়ে সেঁধাল ওই কালনাগিনি! শেফালির ঘরে নয় তো!

একসময় গোপেশের মনে হয়, এইভাবে আগলবাগল হয়ে না খোঁজাই ভালো। ব্যাপারটা যদি শেফালির নজরে পড়ে যায়, তবে জেরায় জেরায় একেবারে অস্থির করে তুলবে। আর, জেরার চোটে যদি গোপেশ সাপটার কথা বলে ফেলেন, তবে বলা যায় না, ভয়ে আতঙ্কে শেফালি কী কাণ্ড ঘটায়!

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে নিজেকে নিরস্ত করেন গোপেশ। তাঁর মনের মধ্যে একটা ভরসাই ক্রিয়া করতে থাকে যে, সাপটা আর যাহোক, তার কিংবা শেফালির চরম কোনও ক্ষতি করবে না। গোপেশ কাজেই হ্যারিকেন নিয়ে ফিরে আসেন বাইরের দাওয়ায়। কুটনো কোটা শেষ করে রান্না চড়ান।

রান্নাবান্না সেরে শেফালির ঘরে ঢোকেন গোপেশ। শেফালিকে তুলে কিছু খাওয়ানো দরকার।

ঘরে ঢুকে দেখেন, যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে শেফালির।

গোপেশ মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন। দিনের পর দিন মেয়েটার এতখানি কষ্ট বুঝি আর চোখ মেলে দেখতে পারেন না তিনি।

শেফালির বিছানার কাছে এগিয়ে যান গোপেশ। ওর মাথায় আলতো হাত রাখেন।

খুব মমতা মাখানো গলায় শুধোন, খুব যন্তন্না হচ্ছে রে, মা? বল, আমাকে বল, আমি তোর এক বাপ। বাপের কাছে কিছো লুকাতে নাই মা।

শেফালি জবাব দেয় না। খুব বিজাতীয় গলায় গোঙাতে তাকে সে। তার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে।

গোপেশ শেফালিকে দু-হাত দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। বিড়বিড় করে বলেন, উঠ, উঠ দেখি, চাট্টি খায়া লিবি চল।

অকস্মাৎ দু-হাত দিয়ে গোপেশের গলাটা জড়িয়ে ধরে শেফালি। গোপেশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

অবুঝ মেয়েটার দু-হাতের প্রবল বাঁধন থেকে যতই নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা চালাতে থাকেন গোপেশ, ততই ওকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরতে চায় শেফালি।

দেখতে দেখতে অপার স্নেহ উথলে ওঠে গোপেশের বুক জুড়ে। চোখদুটি ধীরে ধীরে ভরে আসে জলে।

কন্যাসমা মেয়েটার পিঠে মোলায়েম হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, না, না, কাঁদে না মা, ভালো হয়্যা যাবি। আমি কালই তোকে সদরের ডাক্তারের পাশ লিয়া যাব। এক্কেবারেই না কইতে পারবিনি। রোগে-তাপে ডাক্তারের পাশ যাইতে হয় মা। অবুঝ হইলে চলে? এবার চল দিকি, চাট্টি খায়্যা লিবি চল।

বলতে বলতে শেফালির হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন গোপেশ। কিন্তু এমন প্রবল শক্তিতে ওকে আঁকড়ে থাকে শেফালি, গোপেশ অসহায় বোধ করেন। ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অঝোরে কেঁদে চলে শেফালি। গোপেশ প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন স্থাণুর মতো।

তারপরই ঘটে যায় সেই সর্বনাশা ঘটনাটা...।

ওর পিঠে বোলাতে থাকা গোপেশের হাতটাকে স্বহস্তে টেনে নিয়ে নিজের সুগঠিত স্তনের ওপর চাপিয়ে দেয় শেফালি। দু-পা দিয়ে গোপেশের পা-দুটোকে সমানে চটকাতে থাকে। আর, ওই অবস্থায় গোপেশের উর্ধ্বাঙ্গের যতটুকু নাগালের মধ্যে পায়, ততটুকু এলাকা জুড়ে দাপাদাপি চালাতে থাকে ওর ঠোঁট। ঠোঁট দিয়ে গোপেশের ঠোঁট, নাক, গাল, কানের লতি, মুখের নাগালের মধ্যে যা-ই পায়, তাকেই কামড়ে, চুষে, ঠোঁট ঘসে ঘসে, একেবারে অস্থির করে তোলে গোপেশকে।

গোপেশ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। থরথর করে কেঁপে ওঠে তাঁর সারা শরীর। শরীরের যে প্রত্যঙ্গগুলো শেফালির ঠোঁটজোড়ার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল, একটু একটু করে অসাড় হয়ে আসে।

একসময় নিঃশব্দে কুলকুলিয়ে ঘামতে থাকেন গোপেশ। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, একটা ক্ষুধার্ত সাপিনি প্রবল বুভুক্ষা নিয়ে একটু একটু করে পেঁচিয়ে ধরছে ওকে। এই মুহূর্তে ওর সারা শরীর জুড়ে একটা গরল-নদী বইছে।

গোপেশের কোনওই সন্দেহ থাকে না, সেই মুহূর্তে মেয়েটা পুরোপুরি উন্মাদিনী। কিংবা তার চেয়েও বিপজ্জনক। কোনও এক প্রবল আক্রোশে গোপেশের শরীরটাকে নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে সে। তাকে মুখের কথায় নিরস্ত করতে চাইলে কোনওই ফল হবে না, কেন কি, সেই মুহূর্তে বাহ্যজ্ঞান একেবারেই লোপ পেয়েছে শেফালির।

শেফালির দু-বাহুর আঁটোসাঁটো বাঁধনে বন্দী গোপেশ মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আকুল গলায় ডাকছিলেন। বুকের পাঁজরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল নিঃশব্দে। একটা যুবতী শরীরের যাবতীয় উষ্ণতা, তিলতিল চারিয়ে যাচ্ছিল গোপেশের শরীরে। মগজের বোধবুদ্ধি অসাড় হয়ে আসছিল তাঁর। তার মধ্যেও নিজেকে প্রাণপণে স্থির রেখে গোপেশ যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলতে থাকেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখতিছি। সুস্থ হয়্যাবি তুই। ডাক্তারের ব্যবস্থা কচ্ছি আমি। কালই তোর ব্যবস্থা হবে। এবার ছাড় আমাকে, ছাড় মা।

বলতে বলতে নিজেকে যতই ছাড়িয়ে নিতে চান গোপেশ, শেফালি ততই প্রবল শক্তিতে জড়িয়ে ধরে ওকে। ওর ডান হাতটা সজোরে টেনে নিয়ে বারংবার চাপিয়ে দেয় নিজের বুকের ওপর।

—আচ্ছা, আচ্ছা বুঝিয়া গেছি। ব্যবস্থা কচ্ছি। সুস্থ হয়্যাবি। আগে ছাড় তো আমাকে।

বলতে বলতে গলাটা কেঁপে যেতে থাকে গোপেশের। একেবারে শেষ মুহূর্তে শরীরের যাবতীয় শক্তি একত্র করে নিজেকে কোনওগতিকে শেফালির নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন তিনি। এক দৌড়ে নিজের ঘরে পালিয়ে বাঁচেন। বিছানার ওপর বসে কুকুরের মতো হাঁফাতে থাকেন অনেকক্ষণ।

আর, সেই মুহূর্তে শুনতে পান সাপটা ঘরের মধ্যেই কোথায় যেন ফোঁসফোঁস আওয়াজ তুলেছে।

ঘরের মধ্যে সাপটাকে খুঁজে বেড়ায় গোপেশের চোখদুটি। দেখতে পান না সাপটাকে, কিন্তু ওর ফোঁসফোঁস আওয়াজে মালুম পান, কুঠরিরই কোথাও সাপটা আপন মনে গর্জাচ্ছে।

অনেক রাতে সাপের গর্জনটা থামে। কিন্তু গোপেশের শরীর, মন, অনেকক্ষণ কিছুতেই সমে ফিরতে চায় না। বিছানায় বসে বসেই তাঁর সারারাত কেটে যায়। ওঘরে শেফালি কেমন আছে, কী করছে, দেখে আসতেও সাহস পান না গোপেশ।

শেষরাতে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল শেফালি।

গোপেশের চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের রাতটা একটু একটু করে ভোরের দিকে গড়াতে থাকে।

আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়েন তিনি। শেফালি জেগে ওঠার আগেই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে চান। কালকের রাতের ওই ঘটনার পর এমনিতেই মরমে মরে রয়েছেন। একটা দুঃসহ লজ্জা তাঁকে রাতভর এক অদৃশ্য করাত দিয়ে ফালাফালা করেছে। দিনের আলোয় কেমন করে শেফালির মুখোমুখি হবেন, সেই ভাবনায় তাঁর পাগল হওয়ার উপক্রম। শেফালিও নির্ঘাত মরমে মরে রয়েছে এখন। গোপেশের মুখোমুখি হতে তারও বুক ফেটে যাবারই কথা।

সারা শরীর জুড়ে লক্ষ বিছের কামড়জনিত যন্ত্রণা। বিশেষ করে গোপেশের শরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ গেল-রাতে শেফালির ছোবল খেয়েছে, ওই জায়গাগুলো নিদারুণভাবে জ্বলছিল। পুড়ে গিয়ে ফোস্কা পড়ে গেলে যেমনটি লাগে, ওই জায়গাগুলোতে তেমনই দগদগে জ্বালা বোধ করতে থাকেন গোপেশ।

উঠোনে গোপেশের গামছাটা শুকোচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে টেনে নেন গোপেশ। তারপর উঠোন পেরিয়ে আগল খুলে বাইরে আসেন। শেফালি নিজের ঘরে কী করছে, উঁকি মেরে দেখবারও সাহস হয়নি তাঁর।

সারা বাড়ি সুনসান। গাছ-গাছালির মগডালে কাঁচা ঘুম ভেঙে কাকের দল সবে ডাকতে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যে শেফালির কোনও সাড়াশব্দও পান না গোপেশ। হয়ত বা শেষরাতে ঝড়টা থামলে পর অকাতরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু একসময় তো সে ঘুম ভাঙবেই। তখন গোপেশের সামনে সে কেমন করে দাঁড়াবে সেই ভাবনায় একেবারে অস্থির হয়ে ওঠেন গোপেশ।

গোপেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, কী নিদারুণ লজ্জায় ধিকিধিকি পুড়ছে মেয়েটা। গোপেশের মুখোমুখি হওয়াটা এই মুহূর্তে তার কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সমান।

গোপেশ উঠে দাঁড়ান। পায়ে পায়ে বেরিয়ে যান আগড় ঠেলে।

আসলে, শেফালিকে বেশ কিছুক্ষণ একা থাকবার সুযোগ করে দিতে চাইছিলেন গোপেশ। গেলরাতের ঘটনার পর শ্বশুরের সামনে মুখ দেখানোর বিড়ম্বনার হাত থেকে শেফালিকে এই উপায়ে বাঁচাতে চাইছিলেন তিনি। শুধু কি শেফালিকেই? নিজেকেও নয় কি?

পায়ে-পায়ে যমুনা খালের দিকে হাঁটতে থাকেন গোপেশ।

ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে কবে। উদোম ধানখেতের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ। মানুষেরই পায়ে পায়ে তৈরি। গোপেশ হাঁটতে থাকেন।

তখনও ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটেনি। এমন ব্রহ্মমুহূর্তে বহুদিন ফাঁকা মাঠে হাঁটেননি গোপেশ। উদোম খেতের মধ্যে মধ্যে রোগাপানা গাছ-গাছালগুলোর ডালে ডালে পাখিপাখাল ডাকছে। মাঝিপাড়ার দু-একজন লোক প্রাতঃকৃত্যের উদ্দেশে হাঁটা লাগিয়েছে খালের দিকে। আলো-আঁধারিতে লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন গোপেশ, চিনতে পারছেন না।

খালপাড়ে যখন পৌঁছোলেন গোপেশ, ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। শনশন হাওয়া বইছে। ভোরের ঘুমপাড়ানি হাওয়া। সারা শরীর জুড়িয়ে যায়।

খালের এপার থেকে মান্দার গাঁ-টাকে দেখা যাচ্ছিল। হাঁটলে মিনিট পনেরো-বিশ। গোপেশের একবার মনে হল, হাঁটতে হাঁটতে চলে যান শেফালির বাপের বাড়িতে। এমন ঘোর সংকটের কালে শেফালির বাপের থেকে শলা নেওয়াটা জরুরি। কিন্তু ভেবে চিন্তে নিজেকে নিরস্ত করেন গোপেশ। গেলরাতে যা ঘটে গিয়েছে, গোপেশ তো সেসব কথা প্রাণ গেলেও বলতে পারবেন না মুখ ফুটে। শেফালির বাপকে তবে কী বলবেন তিনি!

খালপাড়ে ঝোপের আড়ালে বসে বহুদিন বাদে প্রাতঃকৃত্য সারলেন গোপেশ। খালের জলে নেমে মুখহাত ধুলেন। খালের জলের দিকে থির-পলকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। জলে নিজের ভাঙাভাঙা ছায়া দেখলেন নিষ্পলক।

গা-টা কেমন জানি গুলোচ্ছিল। খালে এখনও কোমর সমান জল রয়েছে। গোপেশের ইচ্ছে করল, সারা শরীর ডুবিয়ে চান করে নেন। পাশাপাশি একটা আশঙ্কা বুকের ভেতরে নিঃশব্দে চরে বেড়াচ্ছিল। অত সকালে খালপাড়ে ওঁকে দেখে কেউ যদি কৌতূহলী হয়ে কিছু শুধিয়ে বসে! অত সকালে খালপাড়ে আসার কী কারণ দেখাবেন তিনি? অবশ্য খালপাড়ে বিঘেটাক জমি রয়েছে গোপেশের। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তার থেকে অল্প তফাতে জমিটা।

পায়ে-পায়ে জমিটার কাছেই চলে গেলেন গোপেশ। জলে নেমে ডুব দিয়ে চান করলেন। ততক্ষণে মাথায় বুদ্ধি খেলে গিয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, জমিটাতে চোত-বোশেখে কী চাষ করা যায়, তারই তত্ত্বতালাশ লিচ্ছিলাম। তারপর মনে হইল, চানটাও সারিয়া লিই।

চান সেরে পাড়ে উঠলেন গোপেশ। গামছাটা পরে নিয়ে পরনের কাপড়টা শুকোতে দিলেন মাঠে। ততক্ষণে রোদ্দুর উঠেছে।

কাপড়টা শুকিয়ে গেল অল্পেতেই। গোপেশ এখন কী করেন! একটু বাদেই রোদ্দুরের তেজ বাড়বে। এই উদোম মাঠে তখন আর বসে থাকা সম্ভব হবে না। সাতপাঁচ ভেবে গাঁয়ের পথ ধরেন গোপেশ। অথচ বাড়ি ফিরতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

শেফালি হয়ত বা এতক্ষণে বিছানা ছেড়েছে। ফেরামাত্তর ওরই মুখোমুখি পড়তে হবে গোপেশকে। ভাবতে গিয়ে সর্ব ইন্দ্রিয় দুঃসহ লজ্জায় রি-রি করে ওঠে।

গাঁয়ে ঢুকতেই গোপেশের পা-দুটোকে কে যেন শক্ত শেকল দিয়ে বাঁধল। বাড়ির দিকে মুখ ফেরাতেই শেকলে পড়ল হ্যাঁচকা টান। গেল-রাতের অভিজ্ঞতাটা মগজের মধ্যে তোলপাড় তোলে। শেফালির কামাসক্ত মুখটা ভাসতে থাকে চোখের সামনে। মগজের কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে দুঃসহ যন্ত্রণা শুরু হয়। মুখ ফেরান গোপেশ। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে থাকেন, লক্ষ্যহীন।

স্কুলটা পেরিয়েই মদন দাসের দোকান। চাল-ডাল-মশলা, মনিহারি-স্টেশনারি, সবকিছুই পাওয়া যায়। দোকানের একপ্রান্তে চায়ের আয়োজন। পাশেই পার্টি-অফিস তো। পার্টি-অফিসের বাবুদের তাগিদেই বছর-দুয়েক হল চালু করেছে ওটা।

দোকানের সামনে লম্বা বারান্দা। সেখানে সকাল থেকেই তাসের আসর বসায় বেকার ছোকরার দল। সকাল থেকে দুপুর, আবার বিকেল থেকে রাত্তির। গোপেশ দূর থেকে দেখতে পান, দু-চারজন তাসুড়ে এই সাত-সকালে এসে হাজির। মদন দাস বাধা দেয় না। প্রথমত, ব্যবসায়ী মানুষ সে, এইসব বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানোদের চটাতে চায় না। দ্বিতীয়ত, ওরা কেবল তাসই খেলে না। ওই সুবাদে দিনভর চা-সিগারেটও খায়। মদন দাসের তাতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই।

গোপেশ পায়ে-পায়ে মদনের দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান।

ততক্ষণে দু-চারজন খদ্দেরও ভিড় জমিয়েছে। বারান্দায় পেতে রাখা বেঞ্চিতে গিয়ে বসেন গোপেশ। চায়ের দোকানের বাচ্চাটাকে চায়ের অর্ডার দেন।

তাই শুনে মদন দাস এক ঝলক তাকায় গোপেশের পানে।

বলে, আইজ দেখি পচ্ছিম দিকে সূয্যি উঠেছে! বউমার হাতের চা ছাড়িয়া তুমি কিনা দোকানের চা খেতে এসেছ!

গোপেশ ততক্ষণে এহেন অস্বাভাবিক কাজের একটা কৈফিয়ত খাড়া করে ফেলেছেন মনে মনে।

বলেন, আরে, দ্যাখো না, বউমা কাল রাত্তিরে রান্নাঘরের জানালাটা বোধ লেয় ঠিকঠাক লাগায়নি, সব দুধ বিড়ালে খায়্যা গেছে। ইদিগে সকালবেলায় চা না পাইলে আমার মাথা ধরিয়া যায়।

—তাও ভালো। মদন দাস টিপ্পনি কাটে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেল বলিয়া আমার দোকানে একটা খইদ্দার বাড়ল।

দোকানের বেঞ্চিতে বসে বসে পরপর দু-গেলাস চা খেলেন গোপেশ। ততক্ষণে বারান্দার একপাশে তাসের খেলা জমে উঠেছে। কিন্তু চা তো খাওয়া শেষ। কতক্ষণ শুধুমুদু বসে থাকা যায়। বিশেষ করে গোপেশকে যারা জানে, তারা তো উলটো-পালটা ভাববেই। এই এত বছরে কে কবে গোপেশকে দোকানে-বাজারে শুধু বসে বসে কালক্ষয় করতে দেখেছে।

গোপেশ বসে বসে ভাবতে থাকেন, কোন অজুহাতে আরও অনেকক্ষণ মদন দাসের দোকানে বসে থাকতে পারেন তিনি।

একসময় গোপেশ শুধোন, তুমার দোকানে ন্যাপথলিন আছে হে?

—ন্যাপথলিন কী হবে?

—আর বলোনি, কাপড়-চুপোড়গুলান পোকায় কাটিয়া শেষ করিয়া দিল।

কৌটো হাতড়ে মদন দাস বলে, ন্যাপথলিন তো ফুইরে গেছে হে। বিকালে পাইয়া যাবে। মাল কিনতে বেলদাবাজার রওনা দিছে বড়োখোকা। দুপুরের আগে ফিরিয়া আইস্‌বে। বিকালে আইস, পায়্যাবে।

—আবার বিকালে কে আসতে যাবে? গোপেশ বলেন, সংসারে একটিবার ঢুকলে বাহির হওয়া শক্ত। আমি বরং কুমোরপাড়ার থিকে ঘুরিয়া আইসি। একটা নতুন ফাল দিবার কথা। কাজটা শেষ কল্ল কিনা দেখিয়া আসি। এদেরকে তো ফের তাড়া না লাগালে কাজ করে না। অথচ আগাম লিয়া বুসিয়া আছে। যাই, ফিরার পথে চিজটা লিয়াই ফিরব। বড়োখোকাকে বল, ভুলিয়া না যায়। যেন মনে করিয়া আনে চিজটা।

মদন দাসের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামেন গোপেশ। অলস পায়ে হাঁটতে থাকেন কুমোরপাড়ার দিকে। একটু বাদে পথ বদলে হাঁটা দেন পোস্ট অফিসের দিকে। পথচারী পরিচিত মানুষজনকে বলেন, একটা পোস্টকার্ড দরকার গো। একটা জরুরি চিঠি লিখতে হবে।

ঘুরে ফিরে বেলা দশটা নাগাদ গোপেশ আবার ফিরে আসেন মদন দাসের দোকানে। চায়ের দোকানে এখন ফুলুরি-বেগুনি ভাজা চলছে। রেপসিডের তেল, উগ্র গন্ধ ছড়িয়েছে বাতাসে।

তেলেভাজা বড়ো একটা খান না গোপেশ। বিশেষ করে দোকানের তেলেভাজা তো কদাপি নয়। আজ তিনি স্থির করলেন, তেলেভাজা দিয়ে চাট্টি মুড়ি খাবেন।

বললেন, দে তো রে, দু-খান বেগুনি আর এক কৌটো মুড়ি। বড়োখোকা কখন ফিরবে তার তো কুনো ঠিকঠিকানা নেই, এদিকে খিদা পায়া গেছে জোর।

মদন দাস বলে, বড়োখোকার ফিরতে দেরি আছে। তুমি ঘরে গিয়া খাইয়া-দাইয়া আসো না কেন?

—আবার কে যায়! গোপেশ আড়মোড়া ভাঙেন। এসেছি যখন একেবারে লিয়াই ফিরব চিজটা।

মুড়ি খেয়ে আরও একপ্রস্থ চা খেলেন গোপেশ। তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তাসুড়েদের পাশটিতে। একসময় বসেই পড়লেন ওদের গা ঘেঁসে। একটুক্ষণের মধ্যে একজন খেলুড়ের পরামর্শদাতা বনে গেলেন তিনি।

মনটা ভেতরে ভেতরে বড়োই অস্থির আজ। চা খাচ্ছেন, কথাবার্তা বলছেন, তাস খেলছেন, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ঢাকের বাদ্যি সারাক্ষণ বেজেই চলেছে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না গোপেশের।

অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় শেফালির কথা। এখন কী করছে শেফালি? তিনি তো ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে-টলে নিজেকে কোনওগতিকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু শেফালি তো সারা বাড়িতে একলাটি। তার মনের অবস্থা তো আরও সঙ্গিন। অপরাধবোধে তো এতক্ষণে তার পুড়তে থাকবার কথা।

ভাবতে ভাবতে আচমকা বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে গোপেশের। মনের ভাঁপনে দগ্ধ হতে হতে শেফালি যদি ভালোমন্দ একটা কিছু করে বসে! এতক্ষণে সেটা করে বসেনি তো!

ভাবতে গিয়ে বুকের টিপটিপানিটা শতগুণ বেড়ে যায়। গোপেশের মনে হয়, শেফালির এমন মানসিক অবস্থায় তাকে একলাটি বাড়িতে রেখে গোপেশের বাইরে বাইরে থাকাটা একেবারেই উচিত হয়নি। এখন ওকে পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত ছিল গোপেশের। হাজার হোক, শেফালি গেল-রাতে যা করেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তো করেনি। তখন তো সে গুরুতর অসুস্থ ছিল। গোপেশ তো দীর্ঘদিন তার শরীরের অন্তর্গত অসুখের কথাটা জানেন।

গোপেশের মনে হল, এতক্ষণে একটা কিছু না ঘটিয়ে বসল শেফালি!

আচমকা উঠে দাঁড়ান গোপেশ। বলেন, ঠিকই বলেছ তুমি মদন। বড়োখোকার ফিরবার যখন কোনও ঠিক নাই, বেকার বুসিয়া বুসিয়া ভেরেন্ডা ভাজিয়া লাভ কি? বাড়ি চললাম আমি। বিকালে আইসিয়া লিয়া যাব চিজটা। ওইসঙ্গে তুমার চা-মুড়ি-তেলেভাজার দামটাও মিটিয়া দিয়া যাব।

চা-তেলেভাজার দামের জন্য মদন দাস তিলমাত্র চিন্তিত নয়। গোপেশকে সে ভালোমতোই জানে। পয়সা না মেটানোর লোকই নয় সে।

মদন বলে, আমি তো তুমাকে তখন বললাম সেটা। বিকালের আগে পাবেনি চিজটা।

রাস্তায় নেমেই পা চালান গোপেশ। মনটা ভারি অস্থির-অস্থির লাগছে। আচমকা মনটা হাজার প্রকারে কু গাইতে লেগেছে। ঘরে ফিরে যে কী দেখবেন তিনি! হায় ভগবান, শেফালি যেন ঠিক থাকে।

ঠায় দুপুরে যখন ঘরে ফিরলেন গোপেশ, পুরো বাড়িখানা খাঁ-খাঁ করছিল।

উঠোনে দাঁড়িয়েই বাড়িটাকে দু-চোখ দিয়ে জরিপ করতে থাকেন তিনি। উঠোন থেকেই দেখতে পান, শেফালির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

আচমকা মনটা হাজারো প্রকারে কু গাইতে থাকে। নাভিমূলে বেড়াল-আঁচড়ানি শুরু হয়।

গোপেশ পায়ে পায়ে এগিয়ে যান। নিঃশব্দে পা রাখেন দাওয়ায়। কান এড়ে শুনতে চান ভেতরের শব্দ।

কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঘরের ভেতরটা সুনসান ঠেকে।

গোপেশ পায়ে পায়ে গিয়ে শেফালির ঘরের জানালায় আলত উঁকি দেন। দেখেন, চৌকির ওপর আলুথালু ঘুমোচ্ছে শেফালি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে ওঠানামা করছে তার শরীর।

দেখতে দেখতে বুঝি ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে গোপেশের। জানালার পাশ থেকে সাবধানে সরে আসেন। পায়ে পায়ে চলে আসেন নিজের ঘরে। শব্দ না করে ঘরে ঢোকেন। দেখতে পান, ঘরের মধ্যে, মেঝের ওপর ভাত-তরকারি ঢাকা দেওয়া রয়েছে কাঁসার থালায়। পাশটিতে ঘটিভর্তি জল।

গোপেশ বুঝতে পারেন, এতকিছুর পরও পরিপাটি করে রান্নাবান্না সেরেছে শেফালি, কিন্তু রান্নাঘরে না রেখে গোপেশের ঘরেই বা রাখতে গেল কেন খাবার?

ব্যাপারটাকে মগজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আলত নাড়াতে থাকেন গোপেশ। কারণটা হয়ত বা অল্পস্বল্প আন্দাজও করতে পারেন। তবে কি সারা সকাল বাড়ির বাইরে কাটাবার অন্তর্নিহিত কারণটা বুঝে ফেলেছে শেফালি! তবে কি সে এটাও বুঝে ফেলেছে যে, যেহেতু রান্নাঘরটা শেফালির ঘরের লাগোয়া, গোপেশ রান্নাঘরের দিকে নাও যেতে পারেন! ধন্যি মেয়ের বুদ্ধি! গোপেশ মনে মনে প্রশংসা না করে পারেন না।

রান্না তো করেছে, গোপেশের জন্য পরিপাটি করে সাজিয়েও রেখেছে, কিন্তু গোপেশ বুঝতে পারেন না, মেয়েটা নিজে খেল কিনা? গেল-রাতের ওই সর্বনাশা ঘটনার পর তার মনের যা অবস্থা, খাবার তার গলা দিয়ে না নামাই স্বাভাবিক।

তিলমাত্র খেতে ইচ্ছে করছিল না গোপেশেরও। তবুও মেঝেতে পেতে রাখা আসনে গিয়ে বসেন তিনি। ঢাকনা খুলে ভাত মাখেন। কিন্তু এক গ্রাস মুখে দেওয়া মাত্র সারা শরীর গুলিয়ে ওঠে, এমনই হিক্কা ওঠে সর্বাঙ্গ জুড়ে, ডান হাত দিয়ে মুখ চেপে উঠে পড়েন তৎক্ষণাৎ। দরজা খুলে বাইরে এসে

সোজা পুকুরঘাটে চলে যান। ভালো করে কুলকুচো করে করে মুখ ধোন। ব্রহ্মতালুতে জল দিয়ে চাপড়াতে থাকেন অনেকক্ষণ ধরে।

দাওয়ায় ফিরে এসে গামছা দিয়ে মুখ-হাত মুছে নিজের ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েন বিছানায়। চোখ মুদে পড়ে থাকেন বটে কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। গেল-রাতের ঘটনাটা চোখের সুমুখে প্রেতনৃত্য নাচতে থাকে সমানে।

শুয়ে শুয়ে আরও একটা কথা ভাবতে থাকেন গোপেশ। এই যে তিনি বাড়িতে এলেন, হাঁটাচলা করলেন, দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন, পুকুরঘাটে গিয়ে মুখহাত ধুলেন, শেফালি কি কিছুই জানতে পারেনি? এতটাই কি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে সে। নাকি, জেগে থেকে সবই জানতে পারল। জেনেও সাড়া দিল না ইচ্ছে করেই। তবে কি গোপেশের মতো শেফালিও দুঃসহ লজ্জাবশত শ্বশুরের সামনে আসতে চাইছে না কিছুতেই?

সম্ভবত সেটাই ঠিক। গোপেশ তো স্রেফ লজ্জায় কাঁটা হয়ে রয়েছেন, শেফালির তো অনুতাপে এবং তীব্র অপরাধবোধে বুকের ভেতরটা ফালাফালা হচ্ছে অবিরাম।

ভাবতে গিয়ে খুব মায়া জাগে গোপেশের মনে। একবার মনে হয়, সটান ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। একেবারে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে-টলে গেল-রাতের ঘটনাটাকে একেবারেই হালকা করে দেন। কিন্তু পরমুহূর্তে এক দুঃসহ লজ্জা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। না, এই মুহূর্তে শেফালির সামনে গিয়ে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

সারা দুপুর নিজের বিছানায় কেবলই এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন গোপেশ। চোখে তাঁর ঘুম আসে না কিছুতেই।

বিকেল না ঘনাতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন গোপেশ। নিজের কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসেন বাইরে। দেখতে পান, শেফালির ঘরের দরজা তখনও অবধি ভেতর থেকে বন্ধ। গোপেশের মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে শেফালি।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র কে যেন গোপেশকে ভেতর থেকে প্রবল তাড়া লাগায়। এক অচেনা ভয়ে, তরাসে অবশ হয়ে আসে মন।

গোপেশ নিঃশব্দে উঠোনে নামেন। পায়ে পায়ে বেরিয়ে যান আগড় ঠেলে। হনহনিয়ে হাঁটতে থাকেন মদন দাসের দোকানের দিকে। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, পেছন থেকে কেউ বুঝি সমানে তাড়া করছে ওঁকে। বুঝি হাঁটার গতি সামান্য কমালে সে ধরে ফেলবে গোপেশকে। আর, তাহলেই এমনই এক লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটবে, যা ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে তাঁর। কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল, তাঁর এই পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা শেফালি না কোনওগতিকে দেখে ফেলে।

সতী পুকুরের পাড়ে এসে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়েছে। একটা চলে গিয়েছে মদন দাসের দোকানের দিকে, অন্যটা কেশব ঘোষের হাস্কিং-মেশিনের দিকে। মদন দাসের রাস্তাটা ধরতে গিয়েও থমকে থেমে যান গোপেশ। সাত-পাঁচ ভেবে হাস্কিং মেশিনের পথ ধরেন।

আসলে, মদন দাসের দোকানে বসে থাকাকালীন ওই সকালবেলাতেই তাঁর মনটা খচখচ করছিল অস্বস্তিতে। এমনিতে ঘরের কাজকর্ম ফেলে পুরো সকালটা কোনও দোকানে কিংবা আড্ডাতে বসে বসে কাটিয়ে দিলেন গোপেশ, তাও এক প্যাকেট মাত্র ন্যাপথিলিনের জন্য, গ্রামবাসীর কাছে এটা একেবারেই পরিচিত দৃশ্য নয়। দোকানে মাল কিনতে এলেন, কেনাকাটা শেষ হলেই, বড়ো জোর দু-একটা কাজ-অকাজের কথা সেরে, ঘরে ফিরে যান গোপেশ। ফালতু কথায় সময় নষ্ট করবার বান্দা তিনি নন। সেই মানুষটা কিনা সারা সকাল এর-ওর সঙ্গে স্রেফ গুলতানি মেরে কাটিয়ে দিল, তাও এক প্যাকেট মাত্র ন্যাপথলিনের জন্য।

গোপেশের খেয়াল হল, উপস্থিত মানুষজনেরা থেকে থেকে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের চোখে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। হারাধন বেরা তো শেষমেষ একসময় বলেই ফেলল, কী হে, আজ যে বড়ো বুসিয়া বুসিয়া গুলতানি মারতিছ? কাজকাম নাই ঘরে?

—এই যাই। আসলে, ন্যাপথলিনটা খোব দরকার কিনা, তাই...। প্রতিবারই আলগোছে জবাব দিয়েছেন গোপেশ।

শেষের দিকে বিস্ময় ঝরে ঝরে পড়ছিল প্রত্যেকের চোখ থেকে, কিনা, গোপেশের আইজ হইল কী?

হারাধনটা ফিচেল খুব, গোপেশের ছেলেবেলার বন্ধু, গোপেশের দিকে তেরচা চোখে তাকায় সে। বলে, কী হে, বউমা ঘরে নাই?

গোপেশ নিঃশব্দে মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দেন, শেফালি ঘরেই আছে।

হারাধনের কথায় উপস্থিত মানুষজন বুঝি রহস্যের গন্ধ পায়। বলে, অর গুলতানি মারার সাথে অর বউমার ঘরে থাকা না থাকার সম্পর্ক কী?

—বা-রে, তুমরা জান নি? সে বড়ো কড়া মেয়া! গোপেশকে তিলমাত্র বেচাল হইতে দেয় না। সময়ে সিনান, সময়ে ঘুম, তার শাসন বড়োই কড়া।

শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে বড়োই অস্বস্তি বোধ করছিল গোপেশ। হারাধনের মুখের ওপর জরিপ চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল, ওর কথার মধ্যে বাস্তবিক কোনও প্রচ্ছন্ন খোঁচা রয়েছে কিনা। যুবতি বউমার সর্বক্ষণের এমন কড়া শাসনকে এরা আসলে কী চোখে দেখছে?

—বাপ রে, সে এক মেয়া বটে! শ্বশুরকে দেখভাল করবার তরে, অমন কাঁচা বইস, তাও বাপের দোরে ফিরিয়া গেলনি।

এমন মন্তব্যের অন্তর্নিহিত মর্ম কি? এতদ্বারা কী বোঝাতে চাইল হারাধন? ভাবতে ভাবতে লজ্জায় রি-রি করে ওঠে মন। মনে মনে গাল পাড়তে থাকেন হারাধন এবং তার সঙ্গীসাথিদের। যারা যেমন, তারা অন্যকে তেমন চোখেই দেখবে। লচেৎ নিজের ছেলের বউ, নিজের মেয়ের তুল্য সে, হলই বা কাঁচা বয়েস, থাকলই বা শরীর জুড়ে অগাধ রূপের সম্ভার, তাই বলে ওকে নিয়ে অমন নোংরা কথা ভাবতে পারে কেউ?

সকালের ঘটনাটা মনে হতেই এক ধরনের অস্বস্তি তিলেতিলে গ্রাস করে ফেলতে থাকে গোপেশকে। কাজেই, শেষ অবধি মদন দাসের দোকানের দিকে না গিয়ে হাস্কিং-মেসিনের পথই ধরলেন। কে জানে, বলা তো যায় না, সারা সকাল কাটিয়ে এসেছেন, আবার বিকেলে গিয়ে হাজির হলে, ন্যাপথলিনটা পেয়ে গিয়েও সন্ধে থেকে রাত অবধি ঠায় বসে থাকলে, সত্যি সত্যি কী না কী ভেবে বসে ওরা! যা পাপী মন আজকের দিনের মানুষের! আর, এটা তো ঠিক, একটু বেশি রাত অবধিই বসে থাকতে হবে গোপেশকে। এমন সময় ফিরতে হবে তাঁকে, যখন খাবার ঢাকা দিয়ে শেফালি শুয়ে পড়েছে নিজের ঘরে। তো, পরপর দু-বেলা অতখানি সময় অকারণে একঠাঁই বসে থাকলে তো তারা, পাপী মন যাদের, উলটোপালটা ভাববেই। আর, শুধু তো মনে মনে ভেবেই ক্ষ্যান্ত থাকবে না ওরা। মানুষ হল মাছির জাত। নোংরা পেলেই মুখ লাগাবে। মুহূর্তের মধ্যে মুখে করে তুলে নিয়ে উড়ে যাবে দিকে দিকে। দু-দিনেই টি-টি পড়ে যাবে সর্বত্র। না, মানুষের সুবুদ্ধির প্রতি অতখানি আস্থা স্থাপন করা সমীচীন নয়। তার চেয়ে বরং অন্যদিকে যাওয়াই ভালো।

গতকালই ধান ভানিয়ে এনেছে কেশব ঘোসের হাস্কিং-মেশিন থেকে। কাজেই, আজ ওখানে যাওয়ার একটা প্রাসঙ্গিকতা তো রয়েছেই। কালকের কোটানো চালগুলো কেন আগের মতো পরিষ্কার হল না, কেন চালগুলো অত ভাঙল, জিজ্ঞেস করতে হবে না? না বললে সেকথা জানবেই বা কী করে কেশব ঘোষ? সে তো আর খড়ি পাততে জানে না। মেশিনের দোষ, নাকি মেশিনম্যানের দোষ, এসব তো খুঁজে বের করতে হবে কেশবকে। সারাতে হবে ত্রুটি। নচেৎ দিনের পর দিন চালের কুয়ালিটি খারাপ হলে মানুষজন সইবে কেন তা? নগদ দাম নিয়ে খারাপ চাল নেবে কেন তারা? তারা তখন সোজা চলে যাবে মান্দার গাঁয়ে। সেখানে দত্তদের মেশিনে ডবল হলার লাগিয়েছে। ধান ভানছেও খাসা। কাজেই, কেশবের খদ্দের ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকবে, অথচ কেশব তার কারণটা তিলমাত্র আন্দাজ করতে পারবে না। কারণ, মানুষজন তো আর তাকে বলে কয়ে যাবে না যে, শোনো হে, এই কারণে ছাড়লাম

তোমার মেশিন। না, তা বলবে না। আজকের দিনের মানুষ সহজে কারোর সঙ্গে সম্পর্ক তেতো করতে চায় না। এ ক্ষেত্রেও করবে না। ক্রমাগত ভাঙা চাল বেরোচ্ছে দেখলে নিঃশব্দে কেটে পড়বে। আর, তখন যদি গোপেশ বলতে যান যে, এ তো আমি জানতামই। দিনদিন চাল যা ভাঙছিল তোমার মেশিনে! কেশব ঘোষ তো তৎক্ষণাৎ অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলবে, জানতেই যদি যে ভাঙা চাল বারাচ্ছে, অ্যাদ্দিন তবে বলনি কেন কথাটা? মেশিনটা সারিয়া লিতাম তৎক্ষণাৎ। অ্যাদ্দিন বাদে, মচ্ছোবটা পুরোপুরি পাকিয়া যাবার পর বলতিছ কিনা আমার মেশিনে চাল ভাঙে! এখন জানিয়া আমার লাভটা কী শুনি? বারোআনা খরিদ্দার তো চলিয়ালো দত্তদের মেশিনে। কাজেই, কেশব ঘোষের মেশিনের দিকে যাওয়ার পেছনে খুব শক্তপোক্ত যুক্তি খুঁজে পান গোপেশ।

হাঁটতে হাঁটতে সকালের কথাগুলোই ভাবছিলেন গোপেশ। হারাধনের কথাগুলো খচখচ করে বিঁধছিল বুকের গভীরে। কথাগুলোকে সোজা-সরল বলে মনে হচ্ছিল না আর। স্বামী মারা যাবার পর কেবল শ্বশুরকে দেখভাল করবার জন্য, শরীর জুড়ে নিরন্তর দুরন্ত জোয়ার-ভাটা খেলছে এমন একটা মেয়ে, শ্বশুরের ভিটেতে পাকাপাকি থেকে গেল, এমন ঘটনাকে তো বাস্তবিক সোজা চোখে দেখতে পারা মুশকিল। মানুষজনকে তো বড়ো একটা দোষ দেওয়াও চলে না। আর, গোপেশ মুখে যাই বলুন, বুকের ভেতরে যে মানুষটার বসবাস, সে তো কদাপি মিছে কথা বলতেই জানে না, ওই মানুষটা যে মাঝে মাঝেই গোপেশকে জানান দেয়, তোর প্রতি শেফালির আচরণটার মধ্যে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে রে গোপেশ। ভারি দুর্জ্ঞেয় সেই আচরণ। একটু সাবধানে থাকিস গোপেশ।

কেশব ঘোষের মেশিন-ঘরের সামনে যখন পৌঁছোলেন গোপেশ, ততক্ষণে সন্ধে নামে নামে। মেশিন-ঘর জমজমাট। কেশব ঘোষের দম ফেলবার ফুরসত নেই। ওদিকে ধানগুলো জমা দিয়েই আড্ডা জমিয়েছে মানুষজন। একের পর এক পালা এলেই হলারে ঢুকবে ধান। আগে-পিছে নয়। সেটা একদিক থেকে ভালো। কাউকে কোনওরূপ তাড়া লাগাবার বালাই নেই।

মানুষগুলো কলকল করছে মেশিন-ঘরের বাইরের দাওয়ায়। গোপেশ গিয়ে পাশটিতে নিঃশব্দে বসে পড়ে। একটুক্ষণের মধ্যেই আড্ডায় শামিল হয়ে যায় সেও।

দেশগাঁয়ের কথা সব। রাজনীতি, অর্থনীতি, পুজোর হিসেবে গরমিল, চরিত্রহীনের লাম্পট্য, গাঁয়েঘরের ঘটমান কোনও প্রসঙ্গই বাদ যায় না। গোপেশও অংশ নেন সেইসব আলোচনায়। সময় নিঃশব্দে বয়ে যেতে থাকে। গেল-রাতের দুঃসহ স্মৃতিটা একটুক্ষণের জন্য ফিকে হয়ে আসে।

একসময় হাস্কিং-মেশিনের কাজ শেষ হয়। সব ধান কোটা হয়ে যায়। একে একে চলে যায় ধান-কুটিয়ের দল। জায়গাটা একটু একটু করে শূন্য হয়ে যায়। মেশিনঘর বন্ধ করবার তোড়জোড় শুরু করে দেয় কেশব। এইবার অগত্যা উঠে পড়তে হয়।

কিন্তু ঘরে ফেরার কথাটা মনে হওয়া মাত্র গোপেশের সারা শরীর জুড়ে ঈষৎ ঘামের সঞ্চার হতে থাকে। বুকের মধ্যে মৃদু ঢিপঢিপানি শুরু হয়। গেল-রাতের পর আবার একটি ঝিম-অন্ধকার নিশুত রাত। আজ রাতেও যদি বাস্তুসাপটা প্রচণ্ড গরমে গুমোটে বাইরে বেরিয়ে এসে তাণ্ডব জুড়ে দেয়! সাপটা কি এতক্ষণে ঢুকে পড়েছে শেফালির ঘরে! আজও কি শেফালির শরীর জুড়ে রহস্যময় অসুখটা শুরু হয়েছে বিকেল থেকে!

তার চেয়েও একটা বড়ো ভয় পাক দিয়ে দিয়ে উঠছিল। গোপেশের নাভিমূল থেকে শুরু করে ভয়টা সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগোচ্ছিল বুকের দিকে।

অকস্মাৎ গোপেশ আবিষ্কার করেছেন, কেবল শেফালির ঘরেই নয়, তাঁর ঘরেও একটা সাপ রয়েছে। গতকাল রাতে সাপটাকে হঠাৎ দেখে ফেলেছেন গোপেশ। সাপটা গতকাল রাত থেকেই গোপেশের শরীরের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। কোনও সন্দেহ নেই, সাপটাকে নির্ভুলভাবে চিনে ফেলেছেন তিনি। ওরই ভয়ে দুরুদুরু কাঁপছে ওঁর শরীর, মন..., শুকিয়ে আসছে বুক। ঘরে ফিরে নিজের কুঠরিতে ঢুকতে কিছুতেই সাহসে কুলোচ্ছে না।

আচমকা পায়ের শব্দে গোপেশ তাকিয়ে দেখেন, মেশিন-ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে

অজয়। বিস্ময়ে, রোমাঞ্চে, ভয়ে একেবারে থ মেরে যান গোপেশ।

অজয় এসে পাশটিতে দাঁড়ায়। বলে, শেফালি তোমায় খুঁজতে পাঠাল। কী এক টক পান্তা খাওয়া নিয়ে নাকি চটেমটে সকাল থেকে বাড়ির বাইরে বাইরে রয়েছ?

কেশবের মেশিন-ঘরে তখনও অবধি যারা ছিল, সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

অজয় তরিবত করে শোনাতে থাকে ঘটনাটা, যা সে শেফালির মুখ থেকে শুনেছে।

বলে, গোপেশকাকার তো অম্বলের ধাত। অথচ রোজরোজ পান্তার তারে বায়না ধরবে। আর পান্তাটি পেটে পড়লেই বুক-গলা জ্বলতে শুরু করল। শেফালি তাই আজ সকালে কিছুতেই পান্তাভাত খেতে দেয়নি। তাই নিয়ে শ্বশুর-বউতে কথা কাটাকাটি। গোপেশকাকা সেই যে ঘর ছেড়েছে, সারাদিন আর ফেরেনি।

এমন কথায় যারপরনাই মজা পায় শ্রোতার দল। কেউ কেউ একেবারে আক্ষেপের বন্যা বইয়ে দেয় এই বলে যে, তাদের কপালেও যদি এমন একটি বউমা জুটত, যে কিনা শ্বশুরের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি সারাক্ষণ এতটাই দৃষ্টি রাখে।

শুনতে শুনতে হতভম্ব গোপেশ অজয়ের দিকে তাকিয়ে শুধোন, তুমি কখন আইলে?

অজয় কিঞ্চিৎ অবাক হয় বুঝি। বলে, বা-রে, আজ আমার আসার কথা ছিলনি? তুমিই তো আজ আসতে বলেছ আমাকে। কী যেন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আমার সাথ? সারা সন্ধ্যা বুসিয়া বুসিয়া যখন উঠব-উঠব করতিছি, তখনই শেফালি কাঁদিয়া কইল, যাও অজয়দা, মানুষটাকে খুঁজিয়া আনো। সারাদিন অন্নজল পেটে পড়েনি তার। বল, তার তরে একহাঁড়ি পান্তাভাত রাঁধিয়া রাখছি আমি।

এত বিস্ময়ের মধ্যেও হেসে ফেলেন গোপেশ। বলে, শেফালি এখন কেমন আছে? রাগটা ঠাণ্ডা মেরেছে?

—আমি তো রাগ-রোষের চিহ্ন দেখলামনি অর চোখেমুখে। দিব্যি তো ঘুরিয়া বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখিয়া প্রায় হামলিয়া পড়িয়া বলল, তুমি আসিয়া গিয়া ভালো হয়েছে অজয়দা। যাও তো, মানুষটাকে খুঁজিয়া আনো তো। সারাটা দিন না-খাইয়া, না-দাইয়া কুথায়-কুথায় ঘুরিয়া ফিরছে। বলল, এবারে তুমার গোপেশকাকার জন্য একটা রাগ ভাঙাবার লোক আনিয়া দিতে হবে। আমি আর সামাল দিতে পাচ্ছিনি।

বলতে বলতে ফিকফিক করে হাসতে থাকে অজয়। পরমুহূর্তে হাতঘড়িতে চোখ ফেলে চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। খুব অস্থির গলায় বলে, চল, চল, তুমাকে ঘরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ফের ফিরতে হবে।

—ফিরতে হবে মানে? এই এত রাইতে কুথাকে যাবে তুমি? পাগল!

—ফিরতে আমাকে হবেই। কাল ভোরভোর আমাকে বেলদা যাইতে হবে।

—এখান থেকেই খুব যাইতে পারবে তুমি। আমাদের গাঁ থিকে বেলদা যাবার রাস্তা নাই? আসলে, তোমাকে খুব দরকার আমার। খুব বিপদে পড়িয়া গেছি আমি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান গোপেশ। হাঁটা দেন বাড়ির দিকে।

রাস্তায় এসেই অজয়ের দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন তিনি। চাপা গলায় বলেন, আসলে, আমার বাড়িতে একটা বাস্তুসাপ ঢুকিয়া রইছে। একটা নয়, একজোড়া।

—বলো কি! মাঝরাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে যায় অজয়। কতদিন ধরিয়া আছে উ'গুলা?

—শেফালির কুঠরিতে তো একটা থাকতই। মাঝে মাঝেই ঢুকত, বারাত। গেল রাতে আচমকা জেনেছি, আমার কুঠরিতেও বাসা বেঁধেছে আরও একটা। কুঠরির মধ্যে কুথায় যেন ফোঁসফোঁস আওয়াজ তুলছিল অনেকক্ষণ। শেষরাত নাগাদ থামল। সাপদুটাকে তো মারতে হবে বাপ। লচেৎ কখন যে ছোবল মারবে সেই ভয়েতেই কাঁটা হইয়া আছি। কাল রাতভর ঘুম হয়নি ওর ভয়ে। না জানি কোন মুহূর্তে সাপটা ছোবল মারে আমাকে, শেফালিকে। তুমি আইসিয়া ভালোই হয়েছে। একটু যদি সাহায্য করো, সাপদুটাকে তবে মারিয়া ফেলা যায়। কাকার তরে এটুকু করবে না তুমি?

একটু বেশি রাতে অজয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজের ভিটেয় পা রাখেন গোপেশ।

আজ পাশে অজয় থাকায় কেমন যেন ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। সর্বনাশা বাস্তুসাপের ভয়টা একটু একটু করে পাতলা হয়ে আসছে গোপেশের।

পরিচ্ছেদ আট

স্বর্গ আর নরকের মধ্যে ছোট্ট একটা পাঁচিল

খুদির মা মাঝে মাঝেই একটা যাত্রাপথের ছবি আঁকত।

সে পথ কিছুটা কল্পনাপ্রসূত, কিছুটা অঘোর জেঠুর বউয়ের পড়া পুরাণের অংশের সঙ্গে তার হুবহু মিল।

খুদির মা বারো বছর ছিল কল্পনাথদের বাড়িতে।

কল্পনাথের বাবা অঘোর চক্কোত্তি ছিলেন ভাটপাড়া ফেরৎ পণ্ডিত। রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যাত্যাগের মুহূর্ত থেকে শুরু হত তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। শয্যাত্যাগের মন্ত্র দিয়ে শুরু হত তাঁর দিন। তারপর, প্রহরে প্রহরে প্রতিটা কাজের জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রোচ্চারণ। এমনিভাবে রাতে শয্যাগ্রহণের মন্ত্র দিয়ে শেষ হত তাঁর দিন।

অঘোর চক্কোত্তির বউ, আমাদের মহেশ্বরী জেঠিমাও ছিলেন শাস্ত্র-পুরাণের পোকা। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির গল্প ছিল তাঁর ঠোঁটের ডগায়। পড়ে শোনাতেন যত, মুখে মুখে বলতেন আরও বেশি।

আনাজ কুটছেন, রান্না করছেন, পুকুরঘাটে গা ধুচ্ছেন, বাসন মাজছেন..., সারাক্ষণ মুখে লেগে রয়েছে কথায় কথায় পুরাণের কাহিনি। দণ্ডকারণ্যে পৌঁছে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অবাক নয়নে কী দেখলেন?... ফলপুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত,/ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।। /নানা পক্ষীকলরব শুনিতে মধুর,/সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।। /বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি,/শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।/রম্য জল, রম্য ফল, মধুর সুস্বাদ,/আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।

পুকুরঘাটে মাছ ধুতে ধুতে নিজের মন্দ কপালের জন্য মনস্তাপ করতে করতে শুনিয়ে দিলেন নলরাজার কাহিনি। কিনা, কপাল খারাপ ছিল, তাই নলরাজার হাত থেকে পোড়া চ্যাংমাছটিও ধোওয়ার সময় জীয়ন্ত হয়ে গিয়ে হাত-পিছলে পালিয়ে গেল। সেটা যে চ্যাংমাছই ছিল সেটা কত্তামা জানলেন কেমন করে, শাস্ত্রপুরাণে বাস্তবিক এমন ব্রাত্য মাছের নাম উল্লেখ করেছে কিনা, এসব প্রশ্ন মাথায় এলেও খুদির মা মুখ ফুটে কোনওদিন মহেশ্বরী জেঠিমাকে তা শুধোতে পারেনি। কিন্তু তা বলে সেজন্য তার মনের মধ্যে তিলমাত্র অবিশ্বাসও পয়দা হয়নি। বাড়তি কৌতূহল আর অবিশ্বাস তো আর এক বস্তু নয়। কাজেই, মহেশ্বরী যখন যা শোনাতেন, খুদির মা সেসব কথা-কাহিনি অখণ্ড মনযোগ দিয়ে শুনত।

ভুবন কপাটের বাড়িটার গায়ে এসেই বলা যায় বামুনপাড়া শেষ। মহেশ্বরী পাড়ার অন্যদের সঙ্গে বৈকালিক হাঁটাহাঁটিতে বেরিয়ে ভুবন কপাটের বাড়ির কাছটিতে পৌঁছে থমকে থেমে গেলে পর পাড়ার অল্পবয়েসি বউ-ঝি-রা যদি আরও একটুখানি এগোবার জন্য বায়না ধরত, তো, তার জবাবে মহেশ্বরী পঞ্চবটী বনে সীতার লক্ষ্মণগণ্ডি পেরোবার কাহিনিটা শুনিয়ে দিতেন এটাই বোঝাতে যে, মেয়েদের গণ্ডি পেরোনোটা সবসময়ই সর্বনাশা। বলতেন, গোটা রামায়ণের মূল কথা তো এটাই। রাম মায়া-হরিণের পিছু পিছু ছুটছেন। কুটিরে সীতা। তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন লক্ষ্মণ। আচমকা মায়া-হরিণরূপী মারীচ রামের গলা নকল করে চিৎকার করে উঠল, কিনা, প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, রাক্ষসের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।... তখন মারীচ করে রাবণের হিত,/রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।/আইস লক্ষ্মণ

ঝাঁট, কর পরিত্রাণ,/রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ॥ তাই শুনে লক্ষ্মণ রামকে বাঁচাবার তরে দৌড়ল। যাবার বেলায় কুটিরের চারপাশে একটা গণ্ডি কেটে দিয়ে সীতাকে বলল, বউদি, এই গণ্ডিটা পারাবেনি।

কাহিনিটা শেষ করে মহেশ্বরী সিদ্ধান্ত টানেন এই বলে যে, রাবণের পীড়াপীড়িতে সীতা ওই গণ্ডিটা না পারালে তো রাবণ অকে ধরিয়া লিয়া যাইতে পারতোনি। তাইলে রাম-রাবণের যুদ্ধটাও হইতোনি। তাইলে রামায়ণটাও লিখাই হইতোনি। তাই বলি বাছা, গণ্ডিটা পারাতে নাই। অনর্থ বাধে অতে।

পাড়ার কোনও রমণী যখন স্বামী ও দেওর বাদেও বেপাড়ার একটি যুবককে তার রতিক্রীড়ার সঙ্গী হিসাবে জোগাড় করে নেয়, তাই নিয়ে যখন মেয়েমহলে 'ধিৎকার' ওঠে, মহেশ্বরী তাদের দ্রৌপদীর গল্প শোনান, কিনা, পাঁচ-পাঁচটা স্বামী পেয়েও সে মেয়া মনে মনে কর্ণের জন্য হেদিয়ে মরত। তবুও শাস্ত্রে-পুরাণে সে মাগি সতী। অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরীস্তথা,/পঞ্চকন্যা স্মরেৎ নিত্য সর্বপাতক নাশন।

সব মিলিয়ে অঘোর জেঠুর সংসারটা জুড়ে ছিল অষ্টপ্রহর এক ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। কথায় কথায় মন্ত্রোচ্চারণ, পূজাপাঠ, বারব্রত, শাস্ত্র-পুরাণ চর্চা, ধূপ-ধুনো...। তেমন পরিবেশে খুদির মায়ের কেটেছে পাক্কা বারোটি বছর।

ভারী অদ্ভুত মানুষ ছিল খুদির মা। সেই অল্প বয়েস থেকেই প্রবাদ-প্রবচন আর ছড়া-শোলোক থাকত তার ঠোঁটের ডগায়। সিধে ভাষায় কদাচিৎ কথা বলত। সাধারণ কথাটিকেও ছড়া-শোলোকের নুনরসে জারিয়ে পরিবেশন করবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছিল সে। শাস্ত্র-পুরাণ সে পড়েনি কোনওকালেই, কিন্তু স্রেফ অঘোর জেঠুর বাড়িতে থেকে অষ্টপ্রহর শুনতে শুনতে রামায়ণ-মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনেকানেক গল্প জানা হয়ে গিয়েছিল তার। সুযোগ পেলেই সেসব গল্প সে উগরে দিত সমবয়সি পড়শিদের কাছে। বিশেষ করে রামায়ণের 'অঙ্গদ-রায়বার' অধ্যায়টা, বলতে গেলে, বারো আনাই মুখস্থ ছিল তার। রাবণের সভায় গিয়ে বালিপুত্র অঙ্গদের হম্বিতম্বি, অঙ্গদকে দেখে সমস্ত সভাসদের রাবণের রূপ ধারণ এবং তাই দেখে রাবণকে ঠেস দিয়ে অঙ্গদের চোখা চোখা কথা, খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তার। ওই যে... কোন্ বাপ তোর চেড়ির অন্ন খাইল পাতালে,/কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল অর্জুনের অশ্বশালে॥/কোন্ বাপ তোর দগ্ধ হইল জমদগ্নির তেজে,/মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥... সবশেষে ওই-যে, ওই পংক্তি দুটি, ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য রে তোর মা-কে,/এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে॥

আর তখনই কথার পিঠে কথা চড়িয়ে একসময় এসে যেত খগেন দলাইয়ের বউয়ের প্রসঙ্গ।

খগেন দলাই ছিল বাপের বেশি বয়সের ছেলে। বেশি বয়সের বাচ্চারা নাকি দুবলা হয়, তারা নাকি বহু ব্যাপারে খামতি নিয়েই হাজির হয় দুনিয়ায়। সেই খামতিগুলো আর ইহকালে পূরণ হয় না। খগেনটা ছিল নিতান্তই কোলকুজোঁ। ছেলেবেলা থেকেই হাঁপানির টান ছিল তার। শরীর জুড়ে আরও হরেক কিসিমের অভাব-অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধি বাসা বেঁধেছিল সেই বাচ্চা বয়েস থেকে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চন্দ্রকলার মতো বাড়ছিল। দুর্বল শরীর নিয়ে জন্মালে জাতক নাকি আজীবনকাল স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগে। খগেনও ভুগত। আর, বাচ্চা বয়েসে স্নায়ু-দুর্বলতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল, বিছানায় পেচ্ছাব করা। এ দুর্বলতা অনেক বাচ্চারই থাকে, কিন্তু বয়েস একটুখানি বাড়লেই চলে যায়। কিন্তু খগেনের গেল না। আকাট জোয়ান বয়েস অবধি সে নিয়মিত বিছানায় মুততো। তাই নিয়ে মা-ব্যাটায় রোজ সকালে ধুন্ধুমার বাধত। পাড়া-পড়শির কাছে নিত্য ঘটনা ছিল ওটা।

যখন বিয়ের কথা উঠল খগেনের, পাড়া-পড়শি যা নিয়ে ওকে টিটকিরি দিতে লাগল, সেটা হল, বিয়া দিয়া লাভ নাই, বউ টিকবেনি। বরকে বিছানায় মুততে দেখিয়া ফুলশয্যার রাইতেই ভাগবে। টিটিকিরি নয়, আশঙ্কাটা সত্যিসত্যিই ছিল অনেকের মনে। বর যদি ফি-রাইতে বিছানায় সেলো-টিউবোয়েল চালু করে, যুবতী মেয়া থাকে কখনও? বাস্তবিক, কথাটা এতটাই প্রচার পেয়ে গিয়েছিল যে, বিয়ের কথা শুরু হওয়ার আগেই মেয়েপক্ষ টের পেয়ে যেত, কিনা, পাত্র রোজ বিছানায় মুতে। পয়লা চটকায় সরে পড়ত তারা।

তা সত্ত্বেও খগেনের একদিন ধুমধাম সহকারে বিয়ে হয়ে গেল শুকারোলের দাশু দণ্ডপাটের মেয়ের সঙ্গে, কেন কী, আজও কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা এমনই অসহায় যে, কানা, খোঁড়া, বোবা ছেলের জন্যও মেয়ে জুটে যায় অবলীলায়। কিন্তু পাড়া-পড়শি ভেবেই নিয়েছিল যে, বিয়েটা হল বটে, কিন্তু মেয়া দু-দিনেই ভাগিয়াবে।

কিন্তু অবাক কথা, শুকারোলের মেয়ে ভাগল না, বরং বহাল তবিয়তে থেকে গেল।

রহস্যটা ফাঁস হল কিছুকাল বাদে। জানা গেল, মেয়েও ওই পথের পথিক। খগেন যদি ছানতা তো বউ হল চালুনি।

সবাই রঙ্গ করে বলল, দেবাদেবী এক্কেরে সমান। বিছানায় মুতবার প্রশ্নে এ বলে, আমাকে দ্যাখ, ও বলে, আমাকে।

তো, কালে কালে এক কাঁড়ি কাচ্চাবাচ্চা হল ওদের এবং খগেন কিছুদিনের মধ্যে হরেক ব্যাধির প্রকোপে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। খগেনের মা ততদিনে গত হয়েছে। সংসারের এতগুলো প্রাণীর মুখে অন্ন জোগানোর দায় চাপল খগেনের বউয়ের ওপর। এসেছিল খগেনের সতীনক্কী বউটি হয়ে, দেখতে কুলোত না, মুখে রা-টি ছিল না, আধ হাত ঘোমটা না দিয়ে রাস্তায় বেরত না। সেই মেয়ে এখন সারা দলুইপাড়ার মক্ষীরানি। তার সঙ্গে পাড়া-বেপাড়ার ডজন খানেক জোয়ান পুরুষের আশনাই। ওদের কল্যাণেই সংসারটা চলে এখন।

কাজেই, অঙ্গদ-রায়বার আউড়াবার পরপরই প্রতিবারেই অনিবার্যভাবে চলে আসত খগেনের বউয়ের প্রসঙ্গ। আর, প্রতি ক্ষেত্রেই খুদির মা আওড়াত ওই দু-পংক্তি, ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য রে তোর মা-কে,/এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে?

এমনিতে এমন ঘটনা ঘটলে গাঁ-ঘরে একেবারে টি-টি পড়ে যায়। কুলটা মেয়েটিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তড়িঘড়ি বিচারসভার আয়োজন করেন পাড়ার বিচারকরা। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হল এই কারণে যে, খগেনের বউ ছিল মূলত তাঁদেরই আশীর্বাদধন্য। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক, সেখানে কে কার বিচার করে! এমন কি, খগেনের ছেলেমেয়েদের চোখের সামনেই ঘটত এসব। কেউই রা কাড়ত না। খগেনের বউয়ের চোখেমুখে সারাক্ষণ লেগে থাকত একধরনের বেপরোয়া, ডোন্ট কেয়ার ভাব। পাড়ার কেউ যদি শুভাকাঙ্খী সেজে উপদেশ দিতে যেত, কিনা, বড্ড কথা উঠতিছে রে বউ, এক্কেরে কান পাতা যাচ্ছেনি। তো, তার জবাবে একেবারে নিরাসক্ত গলায়, একটুও উত্তেজিত না হয়ে খগেনের বউ জবাব দিত, যারা বলাবলি কচ্ছে, তারা আমার সংসারটাকে পালিয়া দিয়া যাউ। আমার রাত পুহালে আড়াই সের চাল, ঘরের মরদের তরে দু-শিশি মিকচার, দিয়া যাউ এসব চিজ, তারপরে কী বলতে চাচ্ছে, শুনব।

এমন কথায় শুভাকাঙ্খীর দল পালিয়ে পথ পেত না।

তো, কল্পনাথের বাড়িতে থাকাকালীনই ওকে কথায় কথায় শাস্ত্রপুরাণ আওড়াতে দেখে মাঝিপাড়ার মানুষজন বিস্ময়ে থ হয়ে যেত। তাদের মধ্যে খুদির মা সম্পর্কে এক ধরনের সম্ভ্রমবোধ তৈরি হচ্ছিল।

বারো বছর বাদে যখন বেরিয়ে এল চক্কোত্তিদের সংসার থেকে, খুদির মা ততদিনে হয়েছে কথা-কাহিনি, প্রবাদ-প্রবচন, আর শোলোকের একটি জলজান্ত পুঁটলি। চক্কোত্তি-বাখুল থেকে বেরিয়ে এসে সে যখন দলুইপাড়ায় স্বামীর ভিটেয় পাকাপাকি আস্তানা গাড়ল, অঘোর-গৃহিণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব যখন তাকে সর্বক্ষণ পদেপদে অপ্রস্তুত করল না, তখন থেকেই দলুইপাড়ায় শাস্ত্র-পুরাণ পটিয়সী হিসেবে নিজের একটা শক্তপোক্ত জায়গা তৈরি করবার ব্যাপারে যত্নবান হল সে। কথায় কথায় পুরাণের গল্প আউড়ে সে পাড়াপড়শিদের সারাক্ষণ তাক লাগিয়ে দিতে লাগল। মহেশ্বরীর মতো অতটা নির্জলা বলতে পারত না বটে, মাঝেমাঝেই জায়গার নামে, বর্ণনায় অনেক খুঁত থেকে যেত, কিন্তু গুচ্ছাতপাড়া, দলুইপাড়ার কাছে এই না কত!

খুদি ছিল জাতে মাঝি, আমার এবং কল্পনাথের প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠী।

স্রেফ সহপাঠী বললে সবটা বলা হল না। আমরা ছেলেবেলায় খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। সন্ধিপুর গাঁয়ের একেবারে পুবপ্রান্তে মাঝিপাড়া। পাড়ার একেবারে শেষপ্রান্তে খুদিদের বাড়ি। তারপরই আদিগন্ত ধানের খেত। দূরে গাঁ-ছাড়া মনসা-দিঘি। দিঘির পাড়ে আদ্যিকালের বুড়ো অশ্বত্থ গাছ। সবাইয়ের মুখে মুখে সে গাছের নাম 'চোখটেপা অশ্বত্থ'। ওই নামকরণের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। খুদির বাপ জড়িয়ে রয়েছে ওই ইতিহাসের সঙ্গে।

তাঁতীরা নাকি জাত-বুদ্ধু। বিশাইপাড়ার গুণধর বিশাই নাকি ছিল বোকাদের শিরোমণি। সে নাকি গাই-গোরু আর বলদের তফাৎ বুঝত না।

জামাইকে চালাক-চতুর জ্ঞানে সঙ্গে নিয়ে খাকুড়দার হাটে গিয়েছে বলদ কিনতে। বলদ নিয়ে সন্ধে উতরিয়ে শ্বশুর-জামাইতে বাড়ি ফিরেছে। পরের দিন ভোর-ভোর গোয়ালে ঢুকে গুণধর দেখে, সদ্য কেনা গোরুটি লেজের তলা দিয়ে প্রস্রাব করছে।

জামাইকে ঘুম থেকে তুলে গুণধর দেখায় দৃশ্যটা। বলে, কী গোরু বাছলে হে, জামাই ? এ যে পোঁদে মুতে! এ-তো তাইলে গাই গরু হে। বলদ হইলে তো পেটের তলা দিয়ে মুত্‌ত।

ফুলতলার মাঠে গুণধরের দু-বিঘার চাক। 'কয়া' জাতের ধান রুয়েছে শ্রাবণে। আশ্বিনে তাতে তেড়ে থোড় এসেছে। গুণধর রোজ সকালে মাঠের ধারটিতে দিয়ে দাঁড়ায়। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে পুরুষ্টু ধানখেতটির দিকে। বারংবার উচ্চারণ করে, কয়া, রে কয়া,/ মোকে কি করবি দয়া?

খুদির বাপটা ছিল মহা পাটোয়ার। ধূর্ত বুদ্ধিতে তার বুঝি জুড়ি ছিল না। গুণধরের খেতের সামান্য তফাতে বাহ্যি বসতে বসতে সে শুনতে পায় গুণধরের এহেন মিনতি। কয়া রে, কয়া,/ মোকে কি করবি দয়া?

পরের দিন, আগে থেকে খেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে খুদির বাপ। এবং গুণধর প্রার্থনাটি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে গলা সামান্য বিকৃত করে বলে ওঠে,থোড়ে যদি দিবি দা (কাস্তে),/তবে চাট্টি পাবি যা।

গুণধর তিলমাত্র কালবিলম্ব না করে থোড় অবস্থায় পুরো খেতের ধান কেটে ফেলে। সন্ধিপুরের মানুষ তো তাই দেখে থ।

একদিন এক গেরুয়া সাধু এল গুণধরের বাড়িতে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করতে থাকে সে। এ বাড়িতে অশুভ আত্মার বসবাস। রোগব্যাধি জ্বরজারি এ-ঘর ছাড়বেনি। ধান-চাল সব আপসেই উধাও হয়ে যাবে।

তাই শুনে গুণধর সাধুকে ধরে এনে দাওয়ায় বসায়। এবং এহেন সংকটের সমাধান কামনা করে। সাধুটি একটা যজ্ঞ করবার পরামর্শ দেয়। যজ্ঞ করলেই নাকি ঘর ছাড়বে ভূত। যজ্ঞের উপাচার-সামগ্রীর তালিকা তৈরি হয়।

যজ্ঞের দিনক্ষণ স্থির হয়। গুণধর কেশিয়াড়ির বাজারে গিয়ে তালিকা ধরে ধরে কিনে আনে সবকিছু। লালপেড়ে শাড়ি, কালোপেড়ে ধুতি, লাল গামছা, পান-সুপারি, ধূপ-ধুনো, গুগ্‌গুল, গাওয়া ঘি, নতুন হাঁড়ি, মালসা, ওইসঙ্গে নগদ টাকাও লাগবে।

ঠিক দিনে সাধু পৌঁছে যায় গুণধরের বাড়িতে। সঙ্গে একটা সাগরেদ। সারাদিন দফায় দফায় পুজোআচ্চা করে। সন্ধেটি নামলে পর তাবৎ সামগ্রীসমেত ঘরের ভূতটিকে বেঁধে নিয়ে চলে যায় মনসাদিঘির পাড়ে। সঙ্গে যায় গুণধর। সাধু ওই অশ্বত্থ গাছটার তলায় সবকিছু সাজিয়ে রাখে। খানিকক্ষণ মন্ত্রতন্ত্র আওড়ায়। একসময় গুণধরকে বসিয়ে দেয় গাছের তলায়। চোখ মুদে থাকতে বলে সারাক্ষণ। বলে, ঘর-হারানো ভূত যতই হম্বিতম্বি করুক, চোখ খোলা চলবেনি। গুণধর চোখ মুদে বসে থাকে। একটু বাদেই শুরু হয় খ্যাপা ভূতের তাণ্ডব। গুণধরের দিকে ছুটে আসে মাঠের ভেজা-ভেজা ঢিল। গুণধর দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে।

পরের দিন অলির ভোরে দিঘির পাড়ে বাহ্যি বসতে গিয়ে খুদির বাপই প্রথম আবিষ্কার করে গুণধরকে।

চোখ মুদে নিশ্চল বসে রয়েছে সে।

খুদির বাপ পাড়া থেকে লোক ডেকে আনে।

সবাইয়ের ডাকাডাকিতে যখন চোখ খোলে গুণধর, সাধুরাও নেই, চোখের সামনে থেকে তাবৎ সামগ্রী মায় নগদ সওয়া-কুড়ি টাকাও উধাও।

তাই নিয়ে দিনকয় পর্যাপ্ত হাসাহাসি চলে এবং গাছটি 'চোখটেপা অশ্বত্থগাছ' অভিধায় ভূষিত হয়।

সন্ধিপুরের মানুষের গাঢ় সন্দেহ, ওই ধাপ্পাবাজ দুটোকে সাধু সাজিয়ে গুণধরের বাড়িতে পাঠিয়েছিল খুদির বাপই।

খুদি হল তেমন বাপেরই যোগ্য সন্তান। সেটা আমরা সেই ছেলেবেলাতেই হাড়ে হাড়ে টের পেতাম। ওই বয়সেই চালাকি বুদ্ধিতে একেবারে চৌকশ হয়ে উঠেছিল সে।

একসঙ্গে পড়াকালীন আমি, কল্পনাথ, গজানন, ঝংকার মাঝে মাঝেই যেতাম খুদির বাড়িতে।

জাতে মাঝি ওরা, আমাদের মতো উঁচু জাতের ছেলেদের, বিশেষ করে কল্পনাথের মতো ঘোর বামুনের ছেলের পক্ষে ওর বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়াটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। আর ঝংকার তো ছিল খোদ জমিদারের ছেলে। আমাদের গাঁয়ের জমিদার বংশের শেষ কুলপ্রদীপ হিরন্ময় মুখুজ্জের ছেলে সে। তার ক্ষেত্রে তো খুদিদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেওয়াও নিষেধ।

আমরা যেতাম ওদের বাড়ির উঠোনের পেয়ারা গাছটির টানে। সে বড় আশ্চর্য জাতের গাছ ছিল। পেয়ারাগুলো ফলত বেয়াড়াগোছের লম্বাটে, আর ডাঁসা হলেই তার ভেতরটা লাল হয়ে যেত। যখন পুরোপুরি পাকত, তার শাঁসটি হত পাকা তরমুজের মতো লাল। আমরা ওই জাতের পেয়ারা আর দুটি দেখিনি সারা তল্লাটে।

আমরা, খুদির সহপাঠীরা গেলে, খুদির নীরব প্রশ্রয়ে গাছ থেকে পেয়ারা পাড়লে, খুদির মা বড় একটা আপত্তি করত না। তার সম্ভবত দুটো কারণ ছিল। এক, খুদির মা যেহেতু কল্পনাথদের বাড়িতে দীর্ঘকাল কাজ করত, মনিবের ছেলেকে পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিতে বাধত তার। দুই, তিন-তিনটে ঘোর বামুনের ছেলে, তাদের মধ্যে আবার একজন জমিদার বাড়ির, ঘর বয়ে এসেছে, খুদির মা বোধ করি সেজন্য যারপরনাই শ্লাঘা বোধ করত। পড়শিদের কাছে মান বেড়ে যেত ওর। একে-ওকে শুনিয়ে বলত সেকথা। বাবুদের ছেলেপুলেরা আইল, পিয়ারা-টিয়ারা খাইয়া-দাইয়া গেল...।

পড়শিরাও সম্ভবত সেজন্য কিঞ্চিৎ ঈর্ষা বোধ করত খুদির মায়ের প্রতি।

সেই ছেলেবেলাতেই খুদির মায়ের প্রতি, স্রেফ একটি কারণে, আমার অপরিসীম দুর্বলতা ছিল। আমার মাকে যখন আপয়া আখ্যা দিয়ে সারা গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে ওর প্রতি দোষারোপ আর ব্যঙ্গ -বিদ্রূপের অন্ত ছিল না, তখন যে ক-জনা মানুষ মায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলত, খুদির মা তাদের একজন।

মা আজ আর নেই, কিন্তু আমার সেই শৈশব-কৈশোরের দুঃসহ লজ্জার দিনগুলিকে আমি ভুলতে পারিনি আজও। সেদিনের সেই দুঃস্মৃতি আজও দগদগে ঘায়ের মতো থেকে গেছে আমার মনে। সেই স্মৃতিতে বড়োপিসিরা যেমন রয়েছে, বাণীবিনোদ কাকারাও রয়েছেন। বড়দের মধ্যে বাণীবিনোদ কাকা, আমার নিজের ছোটোকাকা আর বল্লভদার বউ আমাদের শিখাবউদি, এরাই কেবল আমাকে আশ্রয় দিতেন। তাঁরা যে ব্যাপারটা একেবারেই বিশ্বাস করতেন না, সেটা বহুভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমার নিদারুণ কষ্টের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করতেন।

ছোটোদের মধ্যে কেবল কল্পনাথই আমার সমব্যথী ছিল। আর ছিল খুদির মা। ছেলেবেলায় আমরা তাকে ডাকতাম, পুঁটিপিসি। আমাকে সে কতবার একান্তে বলেছে, এসব তোর বড়পিসির শয়তানি। নিজে তো সোয়ামীর ঘরে সংসার কত্তে গেলনি, তোর মায়ের সংসার করাটা তার অসহ্য লাগতিছে। লচেৎ এমন লক্ষী-পিতিমের মতো মুখ, অকে দেখিয়া বারালে কারোর অশুভ হইতে পারে?

একেবারে নিরক্ষর এক গ্রাম্য রমণীর মুখে এমন কথা শুনে আমি ওই বয়সে কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে যেতাম।

খুদিদের পাড়ার পর থেকেই যে ধানের মাঠটির শুরু, তার প্রথম কিস্তিটি শেষ হয়েছে যমুনা খালের

পাড়ে। আমাদের গ্রামটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেড় দিয়ে খালটি চলে গিয়েছে কালিয়ান গাঁয়ের দিকে। সেই আধখানি চাঁদের সরু ধারাটির গা ঘেঁসে যখন আমরা ক-বন্ধুতে বসতাম বিকেলের দিকে, প্রায়দিন খুদিও থাকত সঙ্গে। আমরা যখন গল্পগুজবে বুঁদ হয়ে যেতাম, সে তখন খালের হাঁটুজলে খালিহাতে চ্যাং-গড়ুই মাছ ধরবার সাধনায় মশগুল থাকত। প্রায়দিনই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করত সে। বেনাগাছের শিকড়ে সদ্যধরা মাছগুলোকে গেঁথে নিয়ে সে বাড়ি ফিরত আমাদের সঙ্গেই।

সেই ছোটবেলা থেকেই খুদির ছিল দোক্তা পানের নেশা। স্কুলে যখন আসত, পড়াশোনা করত, সারাক্ষণ ওর গালের মধ্যে গুঁজে রাখত দোক্তা-পান। মাঝেমাঝেই সুরুৎ করে পানের থেকে রস চুষে নিত খুদি। আমরা পাশ থেকে সেই আওয়াজ শুনতে পেতাম।

মাঝে মাঝেই ওই নিয়ে ভয় দেখাতাম খুদিকে, কিনা, তোর মাকে বলিয়া দিব।

তাতে করে তিলমাত্র ঘাবড়াত না খুদি।

তার সেই অপরিসীম সাহসের কারণটা ফাঁস হল একদিন। বাস্তবিক, একদিন খুদির বাড়িতে পেয়ারা খেতে গিয়ে দেখি, খুদির-মা নিজের হাতে একটা দোক্তাপান সেজে এনে ধরে দিল খুদির সামনে।

কল্পনাথ বলে ওঠে, নিজের ছেলেকে দোক্তাপান খাওয়া শিখাচ্ছ পুঁটিপিসি?

খুদির-মা তার জবাবে রহস্যময় হাসত। জবাব দিত না।

নিজের ছেলেকে এমন বেয়াড়া নেশাটি স্বহস্তে দান করবার পেছনের রহস্যটি বোঝা গিয়েছিল অনেক পরে।

খুদির মা-ই সেটা ভেঙে বলেছিল আমাদের কাছে। কিনা, ভবিষ্যতে যখন বড় হবে খুদি, যখন লায়েক হবে, বিয়ে-থা করে বউ আনবে, বউয়ের কথায় দিনরাত নাচবে, তখন যদি বউ মন্ত্রণা দিয়ে বাড়িতে পান-দোক্তার পাট তুলে দেয়, কিনা, বুড়ি বুসিয়া বুসিয়া দিনভর পান-দোক্তার শ্রাদ্ধ কত্তিছে! এই ব্যবস্থায় আর সেটি হওয়ার জো নেই। নেশাটা খুদিকেও ধরিয়ে রাখা হল, ওইটানে ওকে জীবনভর পান-দোক্তা কিনে মজুত রাখতে হবে ঘরে। তাতে করে খুদির মায়েরও চাহিদা পূরণ হবে।

পরিশেষে, খুদির মা রহস্যময় হাসি হেসে তার আর একটি গুহ্য পরিকল্পনার কথা আগাম জানিয়ে দেয় আমাদের। খুদির বউ আসা মাত্তর তাকেও পান-দোক্তার নেশাটা ধরিয়ে দিতে চায় বুড়ি। কেন কী, তখনও অবধি সে মেয়ার মাড়ির বিষথলিতে বিষ জমেনি, কুলোপানা চক্কর হয়নি মাথায়, তখনই যদি ধরিয়ে দেওয়া যায় নেশাটা, তাহলে সারাটা জীবন আর দেখতে হবে না খুদির মাকে। অন্তত পান-দোক্তার জন্য হাহাকার তুলতে হবে না।

প্রাইমারি স্কুলে পাশ দেওয়ার পর খুদি আর পড়েনি। আমাদের সঙ্গে তার মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ একটু একটু করে থেমে যাচ্ছিল। মাঝে, তখন আমি কলকাতায় ল'পড়ছি, এক অঘটনের জেরে খুদির সঙ্গে আমার ও কল্পনাথের সামান্য যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। অঘটনটা ঘটেছিল তার মায়ের জীবনে। এমনই সে অঘটন, সারা সন্ধিপুর গাঁয়ে একেবারে হই-চই পড়ে গিয়েছিল।



কেন জানি, আমি আর কল্পনাথ সেই ছেলেবেলা থেকেই বিশ্বাস করতাম, খুদি তার মাকে কোন্ এক রহস্যময় কারণে দু-চোখে দেখতে পারে না।

আসল কারণটা সে খুলে বলত না কিছুতেই। কিন্তু নানান কথাবার্তায়, আচার-আচরণে মায়ের প্রতি তার বিষ-বিদ্বেষটা চাপা থাকত না। এবং পেটের ছেলে যে তাকে দেখতে পারে না, বুড়ি নিজেও সেটা জানত। আমাদের ধারণা, তার নিগূঢ় কারণটাও জানা ছিল বুড়ির।

খুদির মায়ের নাম ছিল পুঁটি। খুদির জন্মের আগে অবধি খুদির মাকে ওই নামেই ডাকত সবাই। ওর কোনও পোশাকি নাম ছিল কিনা আমাদের জানা ছিল না। যদিও বা ছিল কোনওকালে, আমাদের স্মৃতি থেকে তা হারিয়ে গিয়েছিল কবেই। পুঁটি নামেই ওকে গ্রামের অর্ধেক মানুষ ডাকত। পরবর্তীকালে,

স্রেফ বয়েসের কারণে তার নামের পরে একটা বুড়ি যোগ হয়ে গিয়েছিল। পুঁটিবুড়ি। গাঁয়ের বাকি অর্ধেক মানুষ ডাকত খুদির-মা।

দক্ষিণপাড়ার পচু দলাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পুঁটির। কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন কোনও পুত্রসন্তান হয়নি। পরপর দু-দুটি মেয়ে হয়েই মরে গেল। অথচ একটা পুত্রসন্তান চাই-ই যে পুঁটির। কেন কী, বংশে একটি ছেলে না থাকলে মহেশ্বরীর ভাষ্যমতো, শুধু যে বংশরক্ষাই হবে না তাই নয়, মরবার পর ঢ্যামনা-ঢেমনিকে কুম্ভীপাক নরক থেকে উদ্ধার করবে কে? বলেই পুঁটি রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে অপুত্রক দশরথের খেদোক্তি থেকে দু-চার লাইন শুনিয়ে দেয়, কিনা, ইহকালে না হইল আমার সন্ততি/পরকালে কীরূপে পাইব অব্যাহতি।/সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ,/আমার মরণে বংশে নাই একজন।/অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুখ,/প্রভাতে না দেখে লোকে অপুত্রের মুখ॥

কাজেই, একটি ছেলের জন্য পুঁটির আর পচুর তখন আগলবাগল অবস্থা। যত্রতত্র মানসিক করে, হত্যে দেয়। সারা অঙ্গ জড়িবুটি, তাবিচ-কবচে ভরিয়ে ফেলে।

দেখতে দেখতে একদিন বাচ্চা এল পুঁটির পেটে। ঢ্যামনা-ঢেমনির আনন্দ তো আর ধরে না।

পুঁটি যখন পাঁচ-ছ'মাসের পোয়াতি, একদিন পচু ওকে নিয়ে গেল খড়গপুরে ইন্দাবাজারের সাধুবাবার কাছে।

এলাকায় খুব নামডাক সেই সাধুর। সে নাকি অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে। শিকড়বাটা খাইয়ে পেটের থেকে ওষুধ বের করে দেয়। বন্ধ্যা নারীর পেটে বাচ্চা পয়দা করে। পেটের বাচ্চা ছেলে নাকি মেয়ে হবে, পেটে কান পেতেই নাকি বলে দিতে পারে।

পুঁটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে-টেখে সাধুবাবা বলল, ছেলে হবে। কোনও ভুল নেই।

আনন্দে আত্মহারা পচু-পুঁটি ফিরে আসে। ওই নিয়ে ডগোমগো থাকে বাকি কটা মাস।

কার্তিকে বড়ই টান সংসারে। কিন্তু পচুর বড়ই ইচ্ছে, ছেলের সম্মানে ঘটা করে সাধ খাওয়ায় পুঁটিকে। আসলে, প্রসূতি সাধ খেলে তার নির্যাস তো বাচ্চাও পাবে।

একদিন খুব ঘটা করে সাধভক্ষণ হল পুঁটির।

পুঁটি অবাক চোখে পচুকে শুধোয়, টাকা পাইলে কুত্থেকে?

পচু রা-কাড়ে না। জবাবটা এড়িয়ে যায়। এটা-সেটা বলে পাশ কাটায়।

পুঁটি নাছোড়বান্দার মতো বারংবার একই কথা শুধোলে পরে একদিন খাপ্পা হয়ে বলে ওঠে, তুই মাগি সাধ খাওযার লোক, সাধ খাবি। আমি জুটাবার লোক জুটিয়েছি। আদার বেপারি তুই, জাহাজের খোঁজে তোর দরকারটা কি?

তবুও পুঁটির কৌতূহল যায় না। বাস্তবিক, ওই ঘোর কার্তিকে পচু যে এমন ঘটা করে সাধ খাওয়াবার টাকা কোত্থেকে পেল, পুঁটি জানলই না।

সে রহস্য ফাঁস হয়েছিল অনেকদিন বাদে। ফাঁস করেছিল পচুর প্রাণের স্যাঙাৎ প্রাণতোষ মিদ্যা।

কিন্তু সাধুবাবার ভবিষ্যৎবাণীতে মুতে দিয়ে পুঁটি বিয়োল মেয়ে। পচু তো মরমে মরে রইল দিনকয়। খড়গপুরের সাধুকে বাপ তুলে গাল পাড়ল মনের আশ মিটিয়ে। শালা, সাধু না ঘোড়ার ডিম। গেরুয়া পরলে আর চুল-জটা রাখলেই সাধু হয় না। মাঝের থেকে গুচ্ছের টাকার শ্রাদ্ধ। সাধভক্ষণ বাবদও এক কাঁড়ি বরবাদ।

পাড়া-পড়শিরা প্রবোধ দেয় পচুকে। ভাবিসনি, পরের মরসুমে হবে। এত লোকের হচ্ছে, আর তুদের হবেনি? গাছ যখন ফলতে শুরু করেছে, তখন আর ভাবনা নাই। আজ নয়ত কাল হবেই।

পাঁচজনার সান্ত্বনাবাক্যে তখনকার মতো প্রবোধ মানে মন। আবার আশায় বুক বাঁধে দুজনায়।

কিন্তু বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, পুঁটিগাছে আর ফুল ধরে না কিছুতেই।

দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে ওঠে পুঁটি। আগলবাগল হয়ে, যে-যা বলে, তাই করে। আবার হত্যে-মানত শুরু করে হরেক দেবতার থানে।

একদিন পচুর প্রাণের সাঙ্গাৎ প্রাণতোষ দেয় গুহ্য খবরটা।

পচুর বাড়িতে ছিল তার নিত্য আনাগোনা। পুঁটির সঙ্গে ছিল তার বন্ধুপত্নীসুলভ রং-তামাশার সম্পর্ক।

একদিন পুঁটিকে একান্তে পেয়ে বলে, বুঝলে বউদি, পচুর দ্বারা তুমার গাছে আর ফল ফলবার আশা নাই।

পুঁটি বাক্যিহারা হয়ে তাকায় প্রাণতোষের দিকে। ভুরু কুঁচকে শুধোয়, এ কথার মানে?

প্রাণতোষ চাপা গলায় বলে, পচুর আর বীজ চারাবার ক্ষ্যামতা নাই।

এরপর প্রাণতোষ একটু একটু করে কাঁঠালটি ভেঙে বের করে এক-একটি কোয়া।

বলে, তুমি যখন পুয়াতি হইলে, সাধু যখন বলিয়া দিল যে তুমার ছেইলা হবেই, তুমাকে সাধ খাবাবার টাকা জোগাড় করতে পচু বেলদার হাসপাতালে গিয়া ভেসেকটমি করিয়া আস্‌সে। সেই সুবাদে পেয়েছিল গুটিকয় নগদ টাকা। ওই টাকা দিয়েই সাধভক্ষণ হয়েছিল তুমার। কাজেই, যতই না ঠাকুরের কাছে মানত কর, হইত্যা দাও, অর দ্বারা পেটে আর কিছুতেই বাচ্চা চারাবে না তুমার।

প্রাণতোষের মুখে এমন আকাশ ভেঙে পড়া কথাটি শুনে প্রথমে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে পুঁটি। অবশেষে প্রাণতোষ যখন মা-কালীর নামে কিরা কাড়ে, তখন আর অবিশ্বাস করতে পারে না। ফলত, পুঁটি তিনদিন তিনরাত নাগাড়ে কাঁদে। পচুর সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ করে দেয়।

ধীরে ধীরে একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয় দুজনার মধ্যে। সেই সুযোগটা নেয় পচুর প্রাণের বন্ধু প্রাণতোষ। একদিন তারই ঔরসে খুদির জন্ম হয়। পচু বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। কারণ, কথাটা তুললে তো সেও ধরা পড়ে যাবে।

যখন প্রাণতোষের ঔরসে ভূমিষ্ঠ হল খুদি, পাড়া-পড়শির পরামর্শে খুদির বাচ্চাটাকে খগেন দলাইয়ের মায়ের কাছে দান করে দিয়ে পরমুহূর্তে এক আঁজলা খুদ দিয়ে পুনরায় কিনে নেয় খুদির মা। আর, তার ফলেই নাকি বেঁচে যায় বাচ্চাটা। খুদ দিয়ে কেনা হল বলে খুদির মা তার নাম রাখে খুদিরাম।

খুদি জন্মানোর পর বছর না ঘুরতেই পড়শিদের একটা বড়োসড়ো অংশ খুদির-মায়ের আরও একটি ছেলের জন্য হেদিয়ে ওঠে।

তাদের মতে, একটিমাত্র ছেলে রেখে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই।

সেই কথাটাকে জোরদার করে তোলে স্বয়ং প্রাণতোষ। খুদির মায়ের সামনে সে প্রায়ই বলতে থাকে একটাই কথা, কিনা, এক্কা, না বক্কা। এরপর সে শাস্ত্রপুরাণ থেকে অনুরূপ উদাহরণ আহরণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কিনা, এই দুনিয়ায় সব কিছুই জোড়ায়-জোড়ায়, রাম-লক্ষ্মণ, কিষ্টো-বলরাম, গণেশ-কার্তিক, লব-কুশ, শুম্ভ-নিশুম্ভ, সব্বাই। এমন কি এই শরীলটাকে দ্যাখ, দুটি পা, দুটি হাত...কেন? সব দুটি করিয়া কেন? একটা করিয়া থাইক্‌লে কী ক্ষেতি হইত? তার জবাবে কেউ যদি এমন যুক্তি দেখায় যে, একটি মাত্র পায়ে মানুষ ভালো করিয়া হাঁটতে পারবেনি, একটি মাত্র হাত থাইক্‌লে মানুষকে এক হাতেই খাইতে এবং ছুঁচাইতে হবে, তবে প্রাণতোষ, উত্তেজিত হয়ে আরও মোক্ষম উদাহরণ পেশ করত, কিনা, তাইলে মাইনষের দুটা কান, নাকের দুটা ফুটা, দুটা চোখ, দুটা অ্যাঁড়াকুষা, মেয়াদের দুটা মাই থাকে ক্যানে? একটা করিয়া থাইকলে কি মানুষ শুনতে পাইতনি, দেখতে পারতনি, নাকি দম লিতে পারতনি? একটা মাই থাইক্‌লে বাচ্চা কি কিছো কম দুধ পাইত? তা সত্ত্বেও সবকিছো দুটা-দুটা ক্যানে? না, একটা লিয়া পুরাপুরি নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। সেই একটি যদি কুনোগতিকে বিকল হয়্যা যায় কিংবা বিগড়িয়া যায় তো সবকিছো অচল হয়্যা যাবে।

শ্রোতাদের মধ্যে অভিলাষ বিশাই, তখন সে কেশিয়াড়ি-মেদুনপুর বাস, 'মদনমোহন'-এর ড্রাইভার, সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সায় দেয় যে, বাসের বেলায়ও তো চার-চারটে চাকা সত্ত্বেও একটা বাড়তি চাকা রাখা হয় গাড়িতে। তাকে বলে স্টিপনি। কেন কী, মাঝপথে একটা যেদি ফটাস করিয়া ফাটিয়া যায়? অতএব দুটি চাই। অন্তত দুটি। একটি চাকা, অন্যটি, অভিলাষ-ড্রাইভারের ভাষায়, স্টিপনি।

কাজেই, পাড়া-বেপাড়ার একাধিক শুভার্থীর ক্রমাগত তাগাদায় এবং খুদির-মায়ের গোপন

আশকারায় প্রাণতোষ বন্ধুপত্নীর জঠরে আরও একটি বীজ থাপনা করবার প্রস্তাব রাখে।

সম্ভবত শেষের দিকে পুঁটি নিমরাজিও হয়েছিল, কিন্তু সেই কম্মোটি সমাধা হওয়ার আগেই খুদির বাপটা গেল আচমকা মরে। ফলে, খুদির মায়ের জোড়া ফলের স্বপ্নটি মুকুলেই শুকিয়ে গেল। কেন কী, কেবল বাচ্চা চারিয়ে দিলেই তো হল না, যাকে সামনে রেখে প্রাণতোষের এমনতরো বন্ধুকৃত্য, সে-ই যখন রইল না, পুঁটির পেটে বাচ্চা চারালে তার আইনগত জিম্মা নেবে কে? শেষমেষ পুঁটির কলঙ্কে ভরে যাবে সন্ধিপুরের আকাশ-বাতাস।

তো, আচমকা স্বামীকে হারিয়ে খুদির-মা দু-চোখে সরষে ফুল দেখতে থাকে। বাড়ির মানুষটাই তো খাটাবাটা করে খাওয়াত। নইলে খুদির বাপের ওই তিন কাঠার ভিটেটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে খুদির মা দক্ষিণপাড়ার সাউদের বাখুলে মাসকয় কাটিয়ে অবশেষে খুদিকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে অঘোর চক্কোত্তির বাখুলে গিয়ে ঝিয়ের কাজ নেয়। ওইখানেই এক এক করে বারোটি বছর কেটে যায় তার।

খুদির মা যেদিন আচমকা দুম করে মরে গেল, খুদি তখন আকাট জোয়ান। মাঝেরপাড়ায় উঠে গিয়ে তখন পঞ্চমীর সঙ্গে পরম সুখে ঘরকন্যা করছে সে।

মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে তিলমাত্র দুঃখ পেতে দেখা যায়নি খুদিকে। তার বদলে, মাঝেরপাড়ায় বাঁশপাতি পুকুরের পাড়ে বসে সে নির্বিকার গলায় মন্তব্য করেছিল, আমার কথাটা মিলল তো?

মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর খুদি যদিও মাঝে মাঝেই বলত কথাটা, কিনা, আমার মা-র বাতি নিভল বলে, দুনিয়ার কোটা শেষ তার। কিন্তু সে যে বাস্তবিক এত জলদি মরে যাবে, পাড়া-পড়শি সেটা আন্দাজ করে উঠতে পারেনি।

এমন অকস্মাৎ সেই মরণ, সমবয়সি পড়শিরা কাঁদবার অবধি সময় পায়নি। ছাগল চরাচ্ছিল রানিহাঁস দিঘির পাড়ে। ঠায় দুপুরে ছাগল তাড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল। একেবারে নিজের বাড়ির আগড়ের মুখটাতে এসেই মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গেল।

খুদির বউ পঞ্চমীর সঙ্গে খুদির মায়ের কোনও কালেই পটত না। সন্ধিপুর মাঝেরপাড়ার শশধর ভুঞ্যার বেটি সে। বাপটা ছিল চিরদিনই পাটোয়ার। পঞ্চাতের মেম্বর ছিল কিছুকাল। এলাকার অধিকাংশ মানুষের মতে, ঐ ক'-বছরে এক্কেরে 'মারিয়া ফাঁক করিয়া দিছে'। মেয়েগুলোকেও বিয়েশাদি দিয়েছে ওই সময়কালে। খুদিও ওই সময়ে শশধরের খপ্পরে পড়ে মায়ের অমতেই বিয়ে করে ফেলে পঞ্চমীকে।

বউ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল খুদি, আগড়ের বাইরে থেকেই হুঙ্কার ছেড়েছিল, তোর তরে একটা মুগুর লিয়া আইলাম মা।

পঞ্চমী শুনে মুখ টিপে হেসেছিল।

বিয়ের পর যে-ক মাস বাপের ভিটেতে ছিল খুদি, পঞ্চমীর সঙ্গে খুদির মায়ের ঝগড়া-কলহ লেগেই থাকত। এমনিতেই পঞ্চমীর সঙ্গে কখনোই এঁটে উঠতে পারত না খুদির মা, তার ওপর সবক্ষেত্রে খুদি বউয়ের পক্ষ নিত।

তারপর একদিন সে শশধর ভুঞ্যার ক্রমাগত উসকানিতে বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল।

তো, খুদি তখন তার শ্বশুরের কল্যাণে বাঁশপাতি-পুকুরের পাড়ে আলাদা সংসার পেতেছে। মায়ের সঙ্গে তখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ তার। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, আমি তো বলিয়া দিছি কবেই। খুব শিগগির ভবের লীলা সাঙ্গ হয়্যাবে বুড়ির। এরপর বাঁচলে গু-য়ে-মুতে হইত্তো।

পাড়া-পড়শিরা যখন কাঠকুঠো জোগাড় করে শ্মশানে যাবার জন্যে প্রস্তুত, খুদি এল এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে, এবং পড়শিদের মধ্যে এটাই প্রচার করবার চেষ্টা করল যে, সে বহুবার বুড়িকে তার কাছে গিয়ে

থাকবার অনুরোধ জানিয়েছে, এমন কি, তার বউও কতবার এসে সাধাসাধি করেছে। কিন্তু বুড়ি যদি না যায়, তবে, মানুষ তো আর গোরু-ছাগল নয় যে তাকে টানিয়া-হিঁচড়িয়া লিয়া যাওয়া যাবে।

পাড়া-পড়শিরা অবশ্য তেমন কোনও ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারে না।

অতঃপর খুদি এমন একটা জনমত তৈরি করবার জন্যে যত্নবান হয় যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সবাইয়ের চলে যাওয়াই উচিত।

ছেলেবেলা থেকেই খুব চালাক চতুর হয়ে উঠেছিল খুদি। খুব বাক্‌পটু ছিল, আর প্যাঁচালো বুদ্ধি ধরত মগজে। আমরা ছেলেবেলাতেই টের পেতাম তা। প্রাইমারি স্কুলে পাশ দিয়েই পড়াশুনায় ইতি। বুড়ির কথা তিলমাত্র কানে তুলত না। কিছুদিন অমূল্য দলুইয়ের খাসি-কাটার ব্যবসাতে জোগাড়দারের কাজ করেছিল। ওর কাছেই নেশাভাঙে হাতেখড়ি। তখন তার বয়েস পনের কী ষোল। এরপর গিয়ে জুটল শশধর ভূঞ্যার সঙ্গে। দেশে-গাঁয়ে পাঁঠাকে খাসি করত শশধর। ওটাই ছিল ওর পেশা। তলতা বাঁশের ছালের দিকটাকে পাতলা করে চেঁছে নিয়ে ছুরির মতো ব্যবহার করত তা। পাঁঠাকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে তার অণ্ডকোষদুটিকে বাঁশের ছিলাতি দিয়ে কেটে বের করে দিত। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিত কালাপুষ্প পাতার রস। দিন-কয়েক খুব কঁকাত পাঁঠাটা। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেত ঘা। খুদি ছিল সেই কাজে শশধরের সাগরেদ। শশধর যখন 'অপারেশন' করত, খুদি তখন পাঁঠাটাকে প্রাণপণে চেপে ধরত। অপারেশনের পর শশধরের হাতে জল ঢেলে দিত। কালাপুষ্পের রস লাগিয়ে দিত পাঁঠার ক্ষতস্থানে। শশধরের সঙ্গেই আঘাটায়-বেঘাটায় ঘুরে বেড়াত সে। ওই করতে গিয়েই শশধরের মেজো মেয়ে পঞ্চমীর সঙ্গে আশনাই। কাজের পর শশধরের সঙ্গে এক ঠেকে বসে ধেনো খায়, আর ফাঁক-ফোঁকরে পঞ্চমীর সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা করে।

খান-ছয়েক মেয়ে শশধরের। ততদিনে বড়টিকে কোনও গতিকে পার করতে পেরেছে। তখনও অবধি পিঠোপিঠি পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে। কাজেই, খুদির সঙ্গে পঞ্চমীর প্রেমের আগুন জ্বলে উঠতে দেখে মাগ-ভাতারে তাতে সঙ্গোপনে হাওয়া করতে থাকে। ভাগ্য সহায়, তাই তিরাশির পঞ্চায়েতের ভোটে ওদের পাড়ার থেকে সিপিএম-এর টিকিট জুটে যায় শশধরের কপালে। এককাঁড়ি ভোটে জিতেও যায় সে। আচমকা তার মান-সম্মান বেড়ে যায়। চতুর-চূড়ামণি খুদিও তখন একটা বড় ঘাটে নৌকা বাঁধবার জন্য ব্যাকুল। কাজেই, 'পঞ্চায়েত'-এর জামাই হওয়ার জন্য সে উঠে পড়ে লাগে। এবং একদিন শশধরকে দিয়ে মায়ের কাছে প্রস্তাবটা তোলায়।

কিন্তু পঞ্চমীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবটা দেওয়া মাত্তর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে খুদির মা। দু-দিন আগেও যেজন পাঁঠাকে খাসি করে ভাত জুটিয়েছে, খুদির মায়ের উঠোনে বসে ওর পাঁঠাগুলোকেও খাসি করেছে বছরের পর বছর, তার মেয়ের সঙ্গে কিনা বিয়ে দেবে নিজের একমাত্র ছেলের! তা বাদে, পঞ্চমীর স্বভাবচরিত্র নিয়ে ততদিনে টি-টি পড়েছে সন্ধিপুর গাঁয়ে। কাজেই, খুদির মা মেঝেতে চাপড় মেরে বলে দিল, ছেইলা আমার আজীবন আইবুড়ো থাকবে, কিন্তু শশধরিয়ার ওই ধুমসী মেয়ার সঙ্গে কদাচ লয়।

কিন্তু খুদির তখন ফেরার উপায় নেই। পঞ্চমীকে ততদিনে মনপ্রাণ সঁপে বসে আছে। তবে মায়ের অমতে বিয়ে করবার একটা বাস্তব সমস্যা হল, কোথায় তুলবে বউকে?

শশধর দিল মোক্ষম টোপ। যদি একটা খাসের জমিন পাইয়া দি তোকে? পঞ্চাতের মেম্বর আমি। এটুকু আমার পাঁশ জলভাতের তুল্য।

প্রস্তাবটা শুনে খুদি বুঝি আকাশের চাঁদ পায় হাতে। মায়ের অমতেই বিয়েটা সেরে ফেলে সে।

বিয়ের পর শশধর জামাইকে একটা শলা দেয়। বলে, খাস জমিনের বেবস্তা কচ্ছি, সে তো আমার দু-টুসকির বেপার, কিন্তু তুই প্রথমে বাপের ভিটায় বউকে লিয়া তোল্। কেন কী, তুই ভিটাতে না থাকলে অটা বেদখল হয়্যাবে। তোর দিদি সুবাসীর ভাতারের তো শুনি চাল-চুলা নাই। দুনিয়ার কুনো থানই তো শূন্য থাকে না বাপ। কাজেই, তুই ভিটা থিকে বারিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সে মাগি বরকে সঙ্গে লিয়া থানা গাড়তে পারে তোর বাপকেইলা ভিটাতে। তারপর ধর্, পাটির বেপার তো, খাস জমিনটা

শেষ অবধি হইলনি। পাটির ভিতর থিকেই হয়ত বা নন্দ গুচ্ছাতের গুরুপ্ বাগড়া দিয়া দিল, তখন তো আমও যাবে, ছ্যালাও যাবে।

শশধরের পরামর্শটা তখনকার মতো পছন্দ হয়েছিল খুদির। ফলে, ভিটেতেই বউকে নিয়ে তুলল।

বিয়ের আগে যতটা আপত্তি করেছিল খুদির মা, বউকে ঘরে তুলবার সময় কিন্তু ততটা প্রতিরোধ এল না ওর দিক থেকে। কেবল হপ্তাটাক গুম মেরে রইল। খুদির সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ করে দিল।

খাটিয়ায় চড়িয়ে বুড়িকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। কিন্তু দাহ করবার পূর্বমুহূর্তে ঘটল সেই অঘটনটা।

চিতাটিতা সাজিয়ে তাতে বুড়িকে পরিপাটি করে শুইয়ে দিয়ে একটুখানি বিড়ি খেয়ে নিচ্ছিল শ্মশানযাত্রীর দল। আচমকা কে যেন নজর করল, চিতার মধ্যে বুড়ির শরীরটা অল্পস্বল্প নড়ছে। চোখের ভুল বলে সে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। কিন্তু দু-দণ্ড বাদেই আবার একজন দেখল ওই একই দৃশ্য। নড়েচড়ে উঠল লাশ। শ্মশানযাত্রীর দল বিস্ময়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল চিতার দিকে। স্পষ্ট দেখল, সাজানো কাঠের তলায় খুদির মায়ের শরীরটা একটু একটু নড়ছে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল বুড়ি। ঘোর মেশানো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে। একসময় ওপরের কাঠ ঠেলে সরিয়ে উঠে বসল চিতার ওপর।

শ্মশানযাত্রীরা ততক্ষণে প্রাণভয়ে দৌড় মেরেছে নিরাপদ দূরত্বে।

খুদির মা বসে বসেই এদিক তাকায়, ওদিক তাকায়। দেখতে থাকে চারপাশের গাছগাছাল, দিঘির জল, মাথার ওপর আকাশ...। ওর চোখ চারানোর ধরন দেখে যে-কারোরই মনে হতে পারে, একেবারে নতুন জায়গায় এসে পড়লেই মানুষ এমনতরো অচেনা চোখে তাকায়। যেন ভূতমুড়ির শ্মশানটাকে কস্মিনকালেও দেখেনি খুদির মা।

শ্মশানযাত্রীরা ততক্ষণে প্রাথমিক আতঙ্কটা কাটিয়ে উঠে, ধীরপায়ে চিতার সামান্য তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে। ভুলভুল চোখে দেখছে বুড়িকে।

বুড়ি ভারী বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চারপাশটা দেখে চলেছে তখনো অবধি। শুধু শ্মশান এলাকাই নয়, চারপাশে সামান্য তফাতে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকেও খুব অচেনা চোখে তাকাতে থাকে খুদির মা। এমনকি খুদির দিকেও এমন অচেনা চোখে তাকায়, যেন কস্মিনকালেও দেখেনি ওকে।

সাহসী দু-চারজন ততক্ষণে চলে এসেছে চিতার পাশটিতে। কিনা, আকাট দুফোরবেলায় ভূত বুসিয়া রইবে চিতার উপর? তাই আবার হয়? চল দেখি, বেপারটা খতিয়ে দেখি।

মুখে জলের ঝাপটা-টাপটা দেবার পর, দু-চোল জল-টল খেয়ে, ধীরে ধীরে একসময় সামান্য ধাতস্থ হয় বুড়ি। কিন্তু চারপাশের মানুষজনের হাজার কৌতূহলী প্রশ্নের কোনও জবাবই দেয় না সে। মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে চিতার ওপর বসে থাকে।

একটা জলজ্যান্ত মানুষ চিতার ওপর বসে বসে দুনিয়াটাকে ভুলভুল চোখে নিরিখ করছে, বাস্তবিক বড়ই পীড়াদায়ক দৃশ্য সেটা। কাজেই দলুইপাড়ার মুরুব্বিরা নিজেদের মধ্যে শলা করে বুড়িকে চিতা থেকে নামিয়ে নেয় এবং যে খাটিয়ায় চড়ে শ্মশানে গিয়েছিল খুদির মা, ওই খাটিয়ায় চড়েই ফিরে আসে বাড়িতে।

ততক্ষণে সারা সন্ধিপুর গাঁ জুড়ে খবরটা চাউর হয়ে গিয়েছে। এবং চারপাশ থেকে পিলপিলিয়ে লোক আসছে এমন অলৌকিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে।

বাস্তবিক, খুদির মা যেদিন যমপুরী থেকে ফিরে এল, সেই দিনটা সন্ধিপুর গাঁয়ের মানুষের কাছে ছিল এক ঘোর বিস্ময়ের দিন।

খুব ছেলেবেলা থেকেই ছাগল পোষার খুব নেশা ছিল খুদির মায়ের। একেবারে ছেলেবেলার নেশা।

ছাগল চরাতে গিয়েই প্রথম দেখা হয় কুন্দনের সঙ্গে। সেই স্মৃতি অনেকদিন অবধি ঘাই মারত খুদির মায়ের মনে। এখনও অবধি কুন্দন ওর বুকের মধ্যে বসে রয়েছে কিনা, থাকলে কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে, ভগবানকে মালুম।

আমরা যখন ছোট, দেখেছি, খুদির মা ছিল বাচ্চাদের পটাতে ওস্তাদ। হাত সাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে ও খুব সহজেই বাচ্চাদের মন জয় করে নিত। বাচ্চারা খুব সহজেই ওর ন্যাওটা হয়ে যেত।

যখন, আমাদের সেই ছেলেবেলায়, খুদির সঙ্গে পেয়ারার লোভে যেতাম ওদের বাড়ি, মাঝে মাঝেই বায়না ধরতাম, ও পুঁটিপিসি, হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাও।

দু-একবার সাধলেই রাজি হয়ে যেত খুদির মা। চটজলদি হাতের কাছে যা পেত, নুড়ি, পাথরের টুকরো, গোটা সুপুরি কিংবা কাঁচা লংকা, ওই দিয়ে দেখিয়ে দিত মজার মজার হাতসাফাইয়ের খেলা।

শুধোতাম, পিসি, তুমি কোথায় শিখলে গো এমন খেলা?

তার জবাবে খুদির মা নীরব থাকত। আচমকা গুম মেরে যেত সে। তখন খুব উদাস, অন্যমনস্ক দেখাত ওকে। কখনও-বা 'শিখিয়া দিছ্‌ল একজন, তোরা অকে চিনবিনি' গোছের কথা বলে পাশ কাটাত। কখনও-বা 'খেলা দিখতিছু, খেলা দ্যাখ্, কে শিখাল, তাতে তদের কী দরকার র‍্যা? আদার ব্যাপারী হয়্যা জাহাজের খোঁজ লিস ক্যানে?' বলে বকে দিত আমাদের। ওর এড়িয়ে যাওয়া কিংবা বকে দেওয়ার ধরনেই এক কিসিমের রহস্য মাখানো থাকত, যাতে করে আমাদের কৌতূহল যেত বেড়ে। আমরা খুদির মাকে একেবারে জাপটে ধরতাম। তখনই, সেই আমাদের ছেলেবেলায়, খুদির মা একটু একটু করে ঘুড়িতে সুতো ছাড়বার আদলে বলত সেই বৃত্তান্ত। এখনও বেশ মনে আছে, তার বলবার ধরনে ছিল এক ধরনের যষ্টিমধু চিবোনোর তৃপ্তি।

বেদের দলের প্রসঙ্গটা এসে যেত তখনই। আর, তার বারোআনা জুড়ে থাকত একা কুন্দনই। আর, খুদির মা-র পট ভেদ করে তখন বেরিয়ে আসত নির্ভেজাল পুঁটি, যে কিনা কারোর মা নয়, বউ নয়, দু-চোখে মায়াকাজল পরা কেবলই এক গ্রাম্য কিশোরী।

খুদির মায়ের বয়ান অনুসারে, সেবার একদল বেদে এল সন্ধিপুরে। সন্ধিপুরের ডাঙায় এসে তাঁবু পাতল ওরা। সাকুল্যে তিন-চারটে তাঁবু। ওতেই গাদাগাদি করে থাকত মেয়া-মরদ, বাচ্চা-বুড়ো নিয়ে চোদ্দ-পনেরজনের দলটি।

কুন্দন ছিল ওই দলেরই ছেলে। পুঁটির বয়েস তখন এগার কী বার। কুন্দনের সামান্য বেশি। কিন্তু হলে কী হবে, তার চাবুকের মতো ছিপছিপে চেহারা, দু-চোখে বিজলির মতো ঝিলিক মারা দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসির রেশ।

দেখতে দেখতে ওকে নিজের চেয়ে ঢের বড়, ঢের বেশি পরিণত বলে মনে হত পুঁটির।

বেদেরা যখন এসে তাঁবু খাটিয়ে ডেরা পাতল সন্ধিপুরের ডাঙায়, সারা গ্রাম, এমনকি আশেপাশের পরশুরাম, রাংটিয়া, খেজুরকুটি গ্রামগুলোতে তড়িঘড়ি সতর্ক হয়ে যায় মানুষ। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে একটাই কথা, বেদেরা এসেছে, অতেব গিরস্তরা সাবধান। বাড়ির ধানচাল, আনাজ-সবজি, ঘটি-বালতি, থালাবাটি, কোদাল-কুড়ুল, ছাগল-মুরগি, আর ঘরের বাচ্চা—সামাল্‌কে। কেন কি, হাত সাফাইয়ে ওস্তাদ এরা।

পুঁটির সবদিনই কৌতূহলটা কিঞ্চিৎ বেশি। ছাগল নিয়ে রানিহাঁস দিঘির দিকে যেতে যেতে রোজদিনই অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকত তাঁবুগুলোর দিকে। সকলের সঙ্গে বেদেদের দলের ওই ছেলেটাকেও দেখতে পেত। তার নাম যে কুন্দন, সেটা তো তখনও অবধি জানত না সে। কিন্তু ছেলেটা ওই বয়সেই ওকে খুব টানত মনে মনে। তবে আমাদের কাছে গল্পটা বলবার সময় সেটা স্বীকার করত না খুদির মা। বলত, ওই ছেলেটাই প্রথম পুঁটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বলত, আমি? আমি তো ভয়ে মরি। কেবল ভিনদেশি বেদের ছেলে বলে নয়, ওই বয়সে এমন ডাকাবুকা দেখতে

ছিল কুন্দনকে, এমন চাবুকের মতো ছিপছিপে চেহারা, এমন লালচে ফরসা শরীর, বালির্বণ মাথার চুল, নীলচে কটা চোখ, চোখের তারায় মুহুর্মুহু ঝিলিক মারে বিজলি! সেই ছেলা যখন একদিন ঠায় দুফোরে রানিহাঁস দিঘির পাড়ে এক্কেরে পাশটি ঘেঁসিয়া দাঁড়াল, ওকে দেখিয়া তো আমি ডরে মরি আর কী। তার উপর জায়গাটা এমনই খাঁ-খাঁ নিজ্জন, এমনই গাছগাছালিতে আঁধার-আঁধার ভাব, গা-টা ছমছম কচ্ছিল আমার।

বলতে বলতে ওই বয়েসে পৌঁছেও আমাদের চোখের সুমুখে স্পষ্টতই শিহরিত হয়ে উঠত খুদির মা। কিন্তু ওই শিউরে ওঠার মধ্যে ভয় যত না ছিল, আমাদের ওই বয়েসেই মনে হত, তার চেয়ে বেশি থাকত রোমাঞ্চ।

সন্ধিপুরের ডাঙায় ডেরা পাতলে বাহ্যি বসতে আর চান করতে রানিহাঁস দিঘিটাকেই ব্যবহার করতে হয়। ওটাই সবচেয়ে কাছে। দিঘিটা কিঞ্চিৎ গাঁ-ছাড়া হওয়াতে নির্জন। বড় বড় গাছ-গাছাল এবং দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়ের সহাবস্থান সেখানে।

একদিন কুন্দন গিয়েছিল চান করতে। দিঘির পাড়ে গুটিকয় ছাগল নিয়ে চরাচ্ছিল পুঁটি। গুচ্ছাতদের ছাগল। পুঁটি মাস-মাইনেতে চরাত। ওদের মধ্যে তার নিজেরও একটা পাঁঠি-বাচ্চা ছিল। ওটাকে স্পেশাল যত্ন নিয়ে চরাচ্ছিল, বড় করছিল পুঁটি, কিনা, বড় হয়ে বাচ্চা বিয়োবে, সেই বাচ্চাগুলো বড় হবে। এইভাবে, পুঁটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, কেবল ছাগল পুষেই অনেক টাকা জমিয়ে ফেলবে সে।

রানিহাঁসের পাড়ে কত কিসিমের গাছ। তাদের মধ্যে ছাগলদের অতিশয় প্রিয় চাকুন্দা ঝোপ অগুনতি। চাকুন্দা পাতায় ছাগলদের খাদ্যগুণ অগাধ। তাড়াতাড়ি বাড়ে, শরীরে মাংস জমে অধিক। গায়ের রোম উজ্জ্বল, চিকন হয়। কজেই পুঁটি, একটু দূরে হলেও রোজ চলে যায় সেখানে।

তো, সেদিন রানিহাঁস দিঘির পাড়ে ছাগল চরাচ্ছিল পুঁটি, কুন্দন গিয়েছিল চান করতে। ওই ছিপছিপে চাবুকের মতো চেহারাটি নিয়ে ওই ভরদুপুরে গায়ের আলখাল্লা খুলে রেখে ছেলেটা স্রেফ ল্যাঙটটি পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানিহাঁসের জলে।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে-রোমাঞ্চে দৃশ্যটি স্থির পলকে দেখেছিল পুঁটি। দেখতে দেখতে তার বুকের ধুকপুকানিটা বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলেছিল সেই জলকেলি। আর, পুরো সময়টা পুঁটি তিলেকের তরেও চোখ ফেরাতে পারেনি।

যখন জল থেকে উঠল সে, পাড়ে দাঁড়িয়ে ডোরাকাটা পায়জামা আর আলখাল্লা পরে পুঁটির দিকে এগিয়ে এল, পুঁটির বুকের মধ্যে ধুকপুকানিটা আরও বেড়ে গেল।

কুন্দন কিন্তু পুঁটির কাছে আসার জন্য এগোয়নি। সে ফিরতে চাইছিল ডেরার দিকে। পুঁটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান দিয়েই পথ। কাছে আসতেই পুঁটির সঙ্গে চোখাচোখি। আর, পুঁটি দেখল, ছেলেটার চোখের তারাদুটিতে তখনই বাজপাখির তীক্ষ্ণতা। গলায় তাবিজ, এক কানে দুল।

ছেলেটি কাছে এসে চোখের কোণে হাসল। বলল, ইধার কেয়া করতা?

জবাব দেবে কি, পুঁটির তো তখন সারা শরীর দ্রুত ভিজে যাচ্ছে ঘামে। তবুও কোনওগতিকে জবাব দিল, ছাগল চরাতা!

পুঁটির হিন্দি বলবার ধরনে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ছেলেটা। বলে, ছাগল মতলব বখরি?

এইভাবে দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীর মধ্যে ভাঙা ভাঙা কথা চালাচালির ফাঁকে ফাঁকে পরিচয় ঘটেছিল সেদিন।

একেবারে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে চার চোখের মিলন।

খাটিয়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে এসে পাক্কা দুদিন কিস্তিতে ঘুমোল বুড়ি। হতচকিত ভাবটা কাটতে আরও দুদিন গেল। একসময় পুরোপুরি না হলেও কাজ চালানোর মতো বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল খুদির মা।

আর তখন থেকেই, পাড়ার সব ব্যাপারেই লাগাম ছাড়া কৌতূহল যাদের, পেট ফুলে মরছিল এ ক-দিন, একেবারে হামলে পড়ল বুড়ির ওপর। কিনা, কী হইছ্লো লো তোর? মরলি বা কী করিয়া, আবার বাঁচ্লি বা কী করিয়া?

সে কথার জবাবে বুড়ি আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। খুব ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এর জবাব জানা নেই তার।

লব গুচ্ছাতের মায়ের মতো যারা অ্যাদ্দিন বুড়ির সুখদুঃখের সাথী ছিল, চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে থাকে, ঠাকুরের অসীম করুণা, এক্কেরে যমের দুয়ার থিক্যা ফিরিয়া আইলু রে।

পারুল মাসি শুধোয়, যম তোকে হাতে প্যায়াও ছাড়িয়া দিল?

তাই শুনে প্রসন্নবুড়ির তাৎক্ষণিক জবাব, যমরাজ অকে লিবেক? অ যে যমেরও অরুচি।

প্রাণতোষের বউ প্রসন্ন, খুদির মায়েরই সমবয়েসি সে, চিরটাকাল স্বামীর ন্যায্য দখল ফিরে পেতে চেয়েছে খুদির মায়ের থেকে। কিন্তু তার মতে, খুদির মায়ের এমনই কুহক বিদ্যা আয়ত্তে রয়েছে যে, সে মিনসে চিরটা কাল সোনা ফেলিয়া রাং বাঁধ্ল কাপড়ের খুঁটে। সেই মনস্তাপে দগ্ধ হতে হতে একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছিল প্রসন্ন। ততদিনে দুজনেরই যৌবন দ্রুত পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে।

যৌবন চলে গেল, স্বামীর দখল পাওয়ার প্রশ্নটা অর্থহীন হয়ে গেল, কিন্তু তাও আজীবনকাল খুদির মায়ের প্রতি এক ধরনের বিষ-বিদ্বেষ পুষে রেখেছে প্রসন্ন।

বারবার যম এবং যমপুরীর কথা শুনতে শুনতে খুদির মায়ের দু-চোখের তারায় কিছু অচেনা আধচেনা ছবি জমে বুঝি। কেন কি, তার পরপরই সে ধীরলয়ে শোনাতে শুরু করে এক আশ্চর্য কাহিনি। সন্ধিপুরের মানুষ বাপের জন্মেও শোনেনি তেমন কথা।

খুদির মা মরে গিয়েও আবার বেঁচে ওঠার পেছনে যে কাহিনিটি বলতে শুরু করে, সে কাহিনির গোড়াপত্তন করেছিল সম্ভবত তার পড়শিরা। বিশেষ করে লব গুচ্ছাতের মা। সে খুদির মাকে জড়িয়ে ধরে বারংবার ছলছল চোখে বলছিল, বাস্তবিক, এ হইল এক্কেরে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়া আসা।

পড়শিরাও তার কথায় তাল দিচ্ছিল, কিনা যমের দুয়ারে গিয়া আবার ফিরিয়া আসা, এমন অব্বাক কাণ্ড কেউ বাপের জন্মেও শোনেনি।

বারংবার কথাটা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক খুদির মা একসময় সম্ভবত একটা ঘটনার সন্ধান পেয়ে থাকবে, নইলে সে পড়শিদের কথাটাকেই এমন কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরতে চাইবে কেন! গোপন ঘটনা ফাঁস করবার ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল সেই আশ্চর্য কাহিনি।

বাস্তবিক যমের দুয়োর থেকেই নাকি ফিরে এসেছে সে। যমের সঙ্গে তার চাক্ষুষ দেখাও হয়েছে।

শুনে কৌতূহলী পড়শিরা একটা পিলে-চমকে-দেওয়া গল্পের সন্ধান পেয়ে যায়। দু-চোখ আকাশে তুলে শুধোয়, বলিস কী লো! খোদ যমরাজকে এক্কেরে স্বচক্ষে দেখিয়া আইলু তুই?

তার কথাটা চারপাশের সবাইয়ের বিস্ময়বোধটাকে এমনিভাবে উথলে দিয়েছে দেখে কী ভাবল বুড়ি কে জানে, সে গলায় এক ধরনের প্রত্যয় জড়ো করে বলতে থাকে, দেখেছি বৈ কি। এক্কেবারে সামনে থিক্যা, যেমন করিয়া তদের দেখতিছি, এমন।

বলেই সে পুরো ঘটনাটা বিতাং করে শোনাতে থাকে পড়শিদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের।

বুড়ি নাকি রানিহাঁস দিঘির দিক থেকে ছাগলগুলোকে নিয়ে ফিরছিল। তখন থেকেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করছিল। খুবই তেষ্টা পেয়েছিল ওর। নিজের বাড়ির আগড় খুলে উঠোনে সবেমাত্র ঢুকেছে, মাথায় সিংওয়ালা দুটো তাগড়াই চেহারার লোক, গায়ের রং ঘোর কালো, ইয়াব্বড়ো পাকানো গোঁফ, পরনে মালকোছা মারা কাপড়, চোখগুলো ভাঁটার মতো জ্বলতিছে, আচমকা এসে দাঁড়াল বুড়ির সামনেটিতে। বলল, চল্ পুঁটি, যমপুরী থিকে তোকে লিতে

এসেছি। তারপর, বুড়ি কিছু বলবার আগেই যমরাজের সেপাইরা ওকে বেঁধেছেঁদে রওনা হয়ে যায় যমপুরীর দিকে। এবং আকাশপথে উড়তে উড়তে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে যায় যমলোকে। একেবারে বেলদার 'শ্রীগৌরাঙ্গ চিত্রমন্দির'-এ আসা 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবির স্টাইলে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেয় যমরাজের সামনে।

—বলিস কী লো! লব গুচ্ছাতের মায়ের দু-চোখ আকাশের পানে উঠে স্থির হয়ে থাকে।

যমরাজ বসে ছিলেন বিশাল একটা ঘরে। যমদূতরা তাঁর একেবারে সামনেটিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় খুদির-মাকে।

যমরাজ বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন ওকে।

আচমকা বলে ওঠেন, এ কাকে লিয়া আইলি তোরা? এ-তো সন্ধিপুরের পুঁটিবুড়ি। এর তো এখনও অবধি সময় হয়নি। তোদের আনতে বলেছিলাম পরানপুরের পুঁটিকে।

বলতে বলতে যমরাজ পায়ের থেকে শুঁড় বাঁকানো বিদ্যাসাগরী চটি খুলিয়া মারতে যায় যমদূতগুলাকে। মার খাইতে খাইতে অরা বলতে থাকে, ভুল হয়্যা গেছে পর্‌ভু। ক্ষ্যামা দান। যমরাজ তখন বলে, যা একে খাবিয়া-দাবিয়া ছাড়িয়া দিয়া আয়। কাজেই, খুদির মাকে স্বর্গের রাজভোগ, পরমান্ন গাণ্ডেপিণ্ডে খাইয়ে যমরাজের সেপাইরা ওকে নিয়ে আবার রওনা দেয় সন্ধিপুরের দিকে। খানিকটা এগিয়ে একটা পাহাড়ের চুড়ো থেকে শূন্যে ফেলে দেয় রানিহাঁস দিঘির পাড়ে।

গল্প থামিয়ে খুদির মা বলে, অত উঁচা থিকে পড়িয়া গিয়াই জ্ঞান হারালাম আমি। জ্ঞান ফিরতে দেখি, ভূতমুড়ির শ্মশানের মধ্যে চিতার উপরে শুইয়া আছি।

শুনতে শুনতে পড়শির দল বুঝি চোখের পাতনি ফেলতেও ভুলে যায়। খুদির মার দিকে এমন চোখ তাকায় ওরা, যেন সে কোনও অন্যলোকের বাসিন্দা। বুড়িকে ভয় করবে, নাকি ছেন্দা-ভক্তি করবে, এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই দিনকয় কেটে যায় তাদের।



বেদেরা তখন গেরস্তের ঘরে ঘরে গিয়ে হাতসাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে ভিক্ষে করে। ওই সঙ্গে হরেক কিসিমের জড়িবুটি, নানান রঙের পুঁতিপাথর বেচে। আর, ফি শনিবার মান্দারের ডাঙায় হাট বসলে, সেখানে গিয়ে হরেক কিসিমের কসরতের খেলা দেখিয়ে লোক জুটোয়, তারপর নানান শিকড়বাকড় জড়িবুটি, কবচ-তাবিচ, ধনেস পাখির তেলসহ একাধিক মালিশের তেল বেচে।

পুঁটি সেই টানে যেত ফি-শনিবারের হাটে। অবাক নয়নে দেখত ওদের কসরতের খেলা। লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, হাত দিয়ে হাঁটা, পালটি খাওয়া।

কুন্দন সবে তখন তালিম নিচ্ছে বাপ-জেঠাদের থেকে। ফি-হাটে ল্যাঙট আর কালো রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সে খেলা দেখায়। সেই ছেলেকে রানিহাঁসের পাড়ে একলাটি পেয়ে পুঁটির কৌতূহল বুঝি আর বাঁধ মানে না।

পরবর্তীকালে কুন্দনের সূত্রেই ওদের ডেরার আনাচেকানাচে পুঁটির ঘুরে বেড়ানো। ওদের সঙ্গে আলাপ। আনাগোনা। তাবাদে রোজ চানের সময় রানিহাঁস দিঘির পাড়ে কুন্দনের সঙ্গে কথাবার্তা হত পুঁটির। কেউ কারো ভাষা বড় একটা বুঝত না। তাও আকারে ইঙ্গিতে কখনও বা দু-একটি শব্দ, দেখতে দেখতে বেশ ভাব হয়ে গেল ছেলেটির সঙ্গে। পুঁটি তাকে ভেট দিত হরেক গ্রামীণ সামগ্রী। পাতিলেবু, ভাজাদোক্তা, আমচুর...। সেই সময়ই পুঁটি ওর থেকে শিখে নিয়েছিল কিছু হাতসাফাইয়ের খেলা। সেইসব খেলাই সে পরবর্তীকালে বাচ্চাদের সামনে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত।

কুন্দনের সঙ্গে সংস্রবের কারণে সে ওদের থেকে শিকড়বাকড়, জড়িবুটির ব্যবহারও শিখেছিল কিছু কিছু। আর, পরবর্তীকালে ইনিয়েবিনিয়ে সেসব কথা এমন করে বলত খুদির মা, আমাদেরই ওই বয়েসেও সেটাকে পিরিত বলেই মনে হত। কিন্তু যে বয়েসে পৌঁছে গল্পটা বলত খুদির মা, ওই বয়েসে

আর কুন্দন নামক এক ভিনদেশি কিশোরের সঙ্গে পিরিতজনিত লজ্জায় কথাটিকে ঢাকবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করে না মানুষ। তার ওপর ওর মরদটাও মরেছে ঢের আগে। কাজেই, ওর কানে গেলে, 'শালী, তুই বেদের ছেইলার সাথ পিরিত কচ্ছিলু!' বলে দু-ঘা গুমসে দেবে, সে ভয়ও নেই। আর, আমরা তো সবাই বাচ্চা। ওই বয়েসে পিঠের মধ্যেকার পুরটির স্বাদ ঠিকঠাক বুঝতে পারব না, এমনটাই সম্ভবত ছিল খুদির মায়ের ধারণা।

কাজেই, বেদেদের কথা বলতে গিয়ে খুদির মা প্রতিবারই এনে ফেলত কুন্দনের প্রসঙ্গ। আর, কুন্দনের প্রসঙ্গ ওঠা মাত্তর এমন দৃষ্টিকটুভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ত যে, আমরা একসময় হেসেই ফেলতাম।

কুন্দনের প্রসঙ্গ শেষ হলে পর আমাদের মূল প্রশ্নের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে খুদির মা। এক্কেবারে শেষপর্বে গিয়ে ফাঁস করে কথাটা। বলে, ওই কুন্দনই আমাকে রানিহাঁস দিঘির পাড়ে হাতে ধরিয়া শিখিয়েছিল যাবতীয় হাতসাফাইয়ের খেলা। রানিহাঁস দিঘির পাড়ের মাকড়া পাথরের নুড়ি থেকে জুতসই নুড়ি বেছে নিয়ে ওই দিয়ে হয়েছিল আমার হাতেখড়ি।

খুব তৃপ্তিতে আচার খাওয়ার মতো করে খুদির মা বলেছিল সেকথা।

ডেরা গোটাবার সময় কুন্দন নাকি ওকে প্রস্তাব দিয়েছিল, ওদের দলে ভিড়ে যাবার জন্য। পুঁটিরও বড়ো একটা আপত্তি ছিল না। কেন কী, ততদিনে কুন্দনের প্রতি এক ধরনের টান তৈরি হয়ে গেছে ওর মনে।

শেষ অবধি অবশ্য বেদেদের দলে ভিড়ে যায়নি পুঁটি। তবে কুন্দনের অভাবটা সে উপলব্ধি করেছে, তার সারাটা কৈশোর-যৌবন ধরে।

বেদের দল একদিন গাঁ ছেড়ে চলে গেল। এক গ্রাম্য কিশোরীর বুকের মধ্যে পাকাপাকি রং লাগিয়ে দিয়ে কুন্দনও চলে গেল দলের সঙ্গে। কিন্তু ছাগল পুষবার নেশাটা আর ছাড়তে পারল না খুদির মা। এমনকি, বিয়ের পরও শ্বশুরবাড়িতে লুয়াপুন্না হওয়ার পর একটি-দুটি করে ছাগল পোষা শুরু করেছিল। মাঝে যে সময়টা অঘোর চক্কোত্তির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ওই সময়টুকু কোনওক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছিল নেশাটাকে; কিন্তু খুদি ওকে পাকা বয়সে যখন ছেড়ে গেল, যখন বউকে নিয়ে শ্বশুরের পাড়ায় গিয়ে সংসার পাতল সে, ওই নেশাটাই বাঁচিয়ে দিল বুড়িকে। আবার বহুদিন বাদে ছাগলের বাচ্চা কিনে পুষতে লাগল খুদির মা। ধীরে-ধীরে তার ঘর নানা বয়সের ছাগলে ভরে গেল। বুড়ি তাদের দিনভর চরাত, ফেরাত, হরেক প্রকারে আদরযত্ন করত। যেভাবে নিজের পেটের ছেলে খুদিকে এককালে 'মানুষ' করেছিল পরম মমতায়, ঠিক তেমনি করেই অপত্যস্নেহে মানুষ করত অবোধ প্রাণীগুলোকে। ওই করে কেটে যেত ওর সময়।

সবগুলো ছাগলের আলাদা আলাদা নাম দিত খুদির মা। মিষ্টি মিষ্টি নাম সব। লালী, ভুলি, দুলি, চাঁদা, ধবলি...। খুব নরম গলায় নাম ধরে ধরে ডাকত ওদের। ছাগলগুলোও খুব বাধ্য ছিল বুড়ির। ডাকলেই সাড়া দিত। দিনভর ওদের জন্য কচি ঘাস, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, গেরস্থের বাড়ি থেকে পুঁইয়ের মেচি, লাউয়ের খোসা ইত্যাদি জোগাড় করে এনে ধরে দিত ওদের মুখের সামনে। শীতকালে প্রত্যেকের পিঠে বেঁধে দিত চটের বস্তা। সবাই বলত, খুদি নয়, ওই ছাগলগুলোই বুড়ির ছেলা-মেয়া।

কিন্তু ছাগলগুলো যখন বড় হল, গায়েগতরে বেশ নাদুসনুদুস হল, একদিন গুটিপায়ে ওর চৌহদ্দির ভেতর ঢুকত ব্যাপারির দল।

বুড়ি তাদের আদর করে বসাত। বদনায় জল দিত। দোক্তাপাতা কিংবা বিড়ি-দেশলাই দিয়ে পাদ্যঅর্ঘ দিত ওদের।

একসময় কাজের কথায় আসত ওরা। শুরু হত মাল যাচাই, দরদাম। তখন, ধীরে ধীরে বদলে যেত বুড়ি। সে তখন একেবারে পাক্কা ব্যবসাদার। প্রতিটি ছাগলের জন্য পৃথকভাবে দর কষাকষি জুড়ত। ওদের শরীরের বিভিন্ন অংশ টিপে-টুপে দেখিয়ে দিত, মাল কত সরেস। নিজের হাতে ওদের দাঁতের পাটি চিরে দেখিয়ে দিত, যাতে করে ছাগলগুলোর বয়েস সম্পর্কে ব্যাপারিরা নিঃসন্দেহ হতে পারে।

মাল পরখের পর দরদাম শুরু হত। থুরথুরে বুড়ির সঙ্গে তাগড়া ব্যাপারির সে এক দীর্ঘক্ষণের রাশি টানাটানি পর্ব। একসময় সে পর্বও চুকত। দরদামে রফা হত। একটি কী দুটি ছাগল নিয়ে রওনা দিত ব্যাপারি, আর, সে হয়ত বা তখনও অবধি আগড় পেরোয়নি, অমনি আচমকা উথলে উঠত বুড়ির যাবতীয় শোক। বাড়ির উঠোনে সজনে গাছটার তলায় পা ছড়িয়ে শুরু করত ছাগলগুলোর জন্য মড়াকান্না। সে কান্নায় বুঝি পাষাণও গলে যায়। তখন বিক্রি হয়ে যাওয়া ছাগলগুলোর নাম ধরে ধরে ডাকত বুড়ি। ডাকতে ডাকতে কান্নার দমকে গলা ধরে আসত ওর।

দেখেশুনে পড়শিরা বলত, ছাগলগুলোকে অত যত্নআত্তি করে বড় করাই বা কেন, যদি অতই মায়া তবে কসাইয়ের হাতে তুলেই বা দেওয়া কেন, আবার পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসাই বা কেন? যখন পুষছিল, তখন বুঝেনি যে একদিন বিকিয়া দিতে হবে, এবং শেষমেষ কাটিয়া কুটিয়া মাংস হয়্যা, মাইন্‌ষের পেটেই যাবে অরা?

বুড়ি কান্না থামিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আকাশের দিকে থির পলকে তাকিয়ে থাকত। এক সময় উদাস গলায় জবাব দিত, মাংস হয়্যা যে মাইন্‌ষের প্যাটে যাবে, সে তাদের কপাল। তাদের অদিষ্টের নেকন। এ দোনিয়ায় সব একদিকে, কপাল একদিকে। সেই বলে না, কপালের আর এক নাম গোপাল। আমি তো আর তা বদলিয়া দিতে পারি না। কিন্তু তা বলিয়া, পুষছি যখন, কিষ্টোর জীব সে, কষ্টে রাখব কেন? জীবে সেবা, সেটা আমার কত্তব্য। সেই কত্তব্যটাই কবি আমি।

বলতে বলতে আরও উদাস হয়েঁ আসে বুড়ির গলা। বলে, আমার ধম্‌মো আমার পাশ। আমি আমার কত্তব্য করিয়া যাই, অন্যরা যদি তাদের কত্তব্য না করে, ওদের কাটিয়া কাটিয়া মাংস খায়, তো সে কৈফিয়ত তারা উপরউয়ালার কাছে দিবে। দিতেই হবে। সেখানকার আইন বড়ই কড়া। ধনী-গরিব, পেটে-পিঠে নাই সে বিচারির পাশ।

সবাই বুঝতে পারে, এতদ্বারা বুড়ি নিজের পেটের ছেলে খুদিরই কর্তব্যবোধের প্রতি কটাক্ষ করল, কেন কি, বছর-তিনেক হল, বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে খুদি। খাসের জমিতে লোনের টাকায় ঘর বানিয়ে উঠে গেছে সেখানে। মায়ের খোঁজটুকু অবধি নেয় না। খুদির মায়ের দিন কাটে ঝুপড়ি ঘরে, একাকী নিঃসঙ্গ জীবন, আয়-উপায় না থাকায় দিন চলে না। ছাগলগুলোই একমাত্র ভরসা। নইলে ভিখ মেগে দিন গুজরান হত।

খুদির-মায়ের ছাগলের নামকরণপর্ব সারা গাঁয়ের মানুষের কাছে যুগপৎ কৌতূহল এবং আশঙ্কার বিষয় ছিল। কারণ, গাঁয়ের মানুষের একটা অংশ বিশ্বাস করত, ওই নামকরণ-প্রক্রিয়াটি খুব সিধে-সরল ছিল না। নামকরণের মধ্যে খুদির-মায়ের কিছু পরিকল্পিত ছক কাজ করত। কারোর সঙ্গে ঝগড়া কিংবা স্বার্থহানিজনিত রোষ থাকলে, গাঁয়ের মানুষ প্রায় নিশ্চিত হয়ে যেত, পরের মরসুমের ছাগল বাচ্চাগুলোর নামকরণের বেলায় ওই ঝগড়ার নির্মম প্রতিশোধ নেবে খুদির মা। প্রতিপক্ষের নামেই ছাগলগুলোর নাম রাখবে। এমন কি, যে পাইকারের সঙ্গে দরদামে পোষাল না, সামান্য কথা কাটাকাটি হয়ত-বা হয়ে গেল, পরের মরসুমে ছাগল কিনতে এসে সে নির্ঘাৎ আবিষ্কার করবে, ছাগলগুলোর একটির নাম রাখা হয়েছে ওই পাইকারের নামে।

প্রথম প্রথম ওই নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছিল কেউকেউ, বিচারও বসিয়েছিল, কিন্তু তাতে ক্ষতি বৈ লাভ হয়নি। কেন কি, প্রতিপক্ষের নামে ছাগলগুলোর নামকরণ করলেও সেইসব নামে কেবল নিজের পাড়াতেই ডাকত বুড়ি। ক-জনা আর শুনতে পেত সে ডাক! আর, কেউ তো নিজের ছাগলকে, গায়ের ঝাল ঝাড়তে চাইলেও, সারাক্ষণ ডেকে বেড়াতে পারে না। মানুষের তো অন্য কাজকর্মও রয়েছে। অথচ বিচার দেবার ফলে হল কি, সারা গ্রাম জুড়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার পেল তা। মুখে মুখে ঘুরতে লাগল বিষয়টা। তাতে করে প্রতিপক্ষের লাভের চেয়ে ক্ষতি হল বেশি।

কাজেই খুদির মায়ের ছাগল বাচ্চা বিয়োলেই গাঁয়ের মানুষের বুক দুরু দুরু। কার সঙ্গে কবে কী নিয়ে সামান্য মন কষাকষি হয়েছে বুড়ির, যদি সেই সুবাদে ওদের নামেই রেখে দেয় ছাগল-বাচ্চাগুলোর নাম!

শুধু বড়রাই নয়, আমরাও ওই ভয়ে বেশ কাবু হয়ে থাকতাম। কে জানে, যদি বুড়িকে কোনও কারণে চটিয়ে দিয়েছি বলে আমাদের নামেই ছাগলের নাম রেখে দেয়! কাজেই, খুদির মাকে আমরা পারতপক্ষে চটাতাম না। ও আমাদের কোনও কাজের ফরমায়েশ করলে আমরা তৎক্ষণাৎ করে দিতাম তা। এছাড়াও নানাভাবে তুষ্ট করবার চেষ্টা চালাতাম ওকে।



ততদিনে ঘোর-ঘোর ভাবটা একটুখানি কেটেছে। তখনই, ওকে নিয়ে পড়শিদের সীমাহীন বিস্ময়টাকে উপভোগ করতে করতেই সম্ভবত খুদির মায়ের মনে হতে থাকে, ঘটনাটা বড়ই সংক্ষিপ্ত, সাদামাটা এবং আটপৌরেভাবে পরিবেশন কবে ফেলেছে সে। এমন একটা ঘটনা, যা কিনা সন্ধিপুরের ইতিহাসে এর আগে আর কস্মিনকালেও ঘটেনি, মুখপুড়ি বুড়ি তার এমন ল্যাজামুড়াহীন বর্ণনা দিল, যেন দুপুর নাগাদ মান্দারের হাটে গিয়া দু-আঁটি খসলা শাক কিনিয়া ফিরিয়া আস্‌সে বিকাল বিকাল।

ভাবতে ভাবতে খুদির-মার মনে সম্ভবত এক কিসিমের আক্ষেপ জন্মে থাকবে, কারণ, সেই বিকেল থেকেই তার যমের দুয়ারে যাবার গল্পটার গায়ে গজাতে থাকে একাধিক অঙ্কুর, যেমনি করে বীজ-আলুর শরীরে এখানে-ওখানে, সর্বাঙ্গে একটু একটু করে অঙ্কুর গজাতে থাকে। ফলে, সকালে কেবল যমের দক্ষিণ দুয়োর দিয়ে যে কাহিনির সূত্রপাত ঘটিয়েছিল খুদির-মা, বিকাল নাগাদ তা গোটা যমপুরীতে গিয়ে ঠেকে। এবং সেই বিকেলে কৌতূহলী শ্রোতাদের দোসরা দলটির কাছে ঘটনাটা বলতে গিয়ে সে যমপুরীর এবং যমরাজের প্রতিমার খাঁচায় পাতলা করে আরও একপ্রস্থ মাটি লেপে দেয়।

বলে, যমপুরীটাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আমার চক্ষু তো ছানাবড়া! কী বড় বড় ইমারত! পুরোটাই সোনাদানা, হীরা-জহরত দিয়া তৈরি। আর, যেটাকে যমরাজের ঘর বলিয়া কইছিলাম, সেটা তো আসলে সাদামাটা ঘর নয়, সেটা হইল যমরাজের দরবার। যমরাজ বুসিয়া রইছেন সিংহাসনে, তাঁর দেহের বর্ণ গাঢ়নীল, মাথায় একজোড়া শিং, সোনার মুকুট, পায়ে বাঁকানো শুঁড়ওয়ালা বিদ্যাসাগরী চটি...।

খুদির মায়ের সেই বর্ণনা অঘোর চক্কোত্তির বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো যমরাজের ফোটোর সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে গেলেও উপস্থিত কেউই সেটা নিয়ে বড় একটা ভাবতে চায় না। বরং মাঝিপাড়ার এক নিরক্ষর বুড়ির মুখে যমপুরীর এবং যমরাজের দরবারের এমন নিখুঁত বর্ণনা শুনতে শুনতে পড়শির দল বিস্ময়ে থ-হয়ে যায়। কিনা, স্বচক্ষে না দেখলে কেউ এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে পারে না।

পরের সেশনেই বর্ণনাতে আরও কয়েক থান গয়নাগাঁটি চড়ে।

খুদির মা বলে, আমাকে টানিয়া হিঁচড়িয়া যে বড় ঘরটার মধ্যে লিয়া গেল যমদূতেরা, সে ঘরটা কত বড় জানু? বেলদার 'শ্রীগৌরাঙ্গ' সিনিমা হলের চাইতেও বড়। ঘরে ঢুকিয়া আমার চোখ দু-টা ঝলসিয়া যায় আর কী! অত বড় ঘরের পুরো দেয়ালটাই নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি। দেয়ালের গায়ে শত-শত গাছ-গাছাল, লতাপাতা আঁকা। লতাপাতার গায়ে কত যে ফুল! সব হীরা-জহরত দিয়া বানিয়েছে স্বর্গের কারিগররা। গাছে-গাছে কত-কত সোনার বন্ন পাখি, তাদের পাখনা জুড়ে মণিমুক্তার কাজ। চোখের কোটরে লাল মণি গুঁজিয়া দিছে, কিনা, চোখের মণি ওগুলা।

পরের সেশনেই সেই হলঘরের বাইরে একটা বিশাল বাগিচাও গড়ে তোলে খুদির মা। হলঘরের বাইরের দেয়ালে কারিগরদিগের আঁকা বাগিচা নয়, একেবারে জ্যান্ত গাছের বাগিচা সেটা। সেই বাগিচায় কত-কত গাছ। তাতে কত-কত ফল-ফুল...।

পরের সেশনেই সেইসব গাছের ডালে ডালে দলে দলে শুকপাখি বসিয়ে দেয় বুড়ি। তারা গাছে-গাছে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকে এবং গান গায়।

পারুল মাসির বুঝি শুকনো বর্ণনায় মন ভরছিল না। পরবর্তী কাহিনির জন্য বুঝি মনে মনে হাঁকুপাকু করছিল সে। মাঝপথে বর্ণনা থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, অত বড় ঘরে যমরাজ একলাটি বুসিয়া কী কচ্ছিলেন লো?

খুদির মা বোধকরি বুঝতে পারে, অত বড় হলঘরে শুধু একা যমরাজকে বসিয়ে রাখলে বেচারির মান থাকে না।

বলে, একলা হইতে যাবে ক্যানে? যমপুরীর রাজা সে। তার দরবারে লোকের অভাব? মন্ত্রী, সিনাপতি, পাত্র-মিত্র, তা বাদে সুমুখে বাঁধানো খাতা লিয়া চিত্তগুপ্ত, হলঘরটা লোকজনে গিজগিজ করতিছে সারাক্ষণ।

পাছে খুদির মা হলঘরে উপস্থিত মান্যগণ্যদের কথা বলতে গিয়ে আবার বর্ণনায় ঢুকে পড়ে, সেই কারণে পারুল মাসি মাঝপথেই উস্‌কে দেয় ওকে। বলে, তারপর, তারপর? তুই ঢুকিয়া কী কল্লি?·

—ঢুকিয়া দেখলাম, যমরাজ একটা সোনার সিংহাসনে বুসিয়া রইছেন। তাঁর গায়ে মণিমুক্তা বসানো সোনার জমকালো পোশাক। মাথায় হীরা-জহরত বসানো বাহারি তাজ। ইয়াব্বড়ো মোছ। আর, তাজ ফুঁড়িয়া একজোড়া শিং। পায়ে শুঁড় তোলা লাগরা-জুতা। জুতার গায়েও যে কত কত মণিমুক্তা!

খুদির মা পুনরায় যমরাজের জুতোর বর্ণনায় ঢুকে পড়তে চাইছে দেখে পারুল মাসি বিস্ফারিত নয়নে বলে ওঠে, বাপরে। এ-তো সেই 'রয়েল বীণাপানি অপেরা'-র রাবণের পারা! সেবার বাবুদ্যার বাখুলে আইসিয়া 'পুরুষোত্তম' পালা গাইয়া গেল, মনে নাই? রাবণটা তো ওর-মই দেখতে, না-গো খুড়ি?

খোদ স্বর্গের দরবারে দেখে আসা যমরাজের সঙ্গে কোথাকার যাত্রাওয়ালার তুলনা দেওয়ায়, ব্যাপারটাকে ঠিক খোলা মনে নিতে পারে না খুদির মা। চোখে মুখে অসন্তুষ্টি ফুটে ওঠে। চারপাশের কারোর কারোর নজর এড়ায় না তা। কাজেই, পারুলমাসির অবোধ কথাটাকে নস্যাৎ করবার দায় চেপে বসে লব গুচ্ছাতের মায়ের কাঁধে।

বলে, কার সাথ কার তুলনা! চাঁদে আর মেনি বাঁদরের পোঁদে। সে হইল কিনা গোটা যমপুরীর রাজা, আর, এটা হইল কিনা মুহে রং-মাখা মাস-মাইনার নটক্কি।

—সে তো ঠিকেই। বোকার মতো কথাটা বলে ফেলে সে যে উপস্থিত প্রায় সকলের কাছে খেলো হয়ে গিয়েছে, এটা বুঝতে পেরেই পারুলমাসি তাড়াতাড়ি শুধরে নেয় নিজেকে। বলে, তা তো বটেই। আমি শুধু একটা তুলনা দিচ্ছিলাম মাত্তর।

—তুলনা দিচ্ছিলে বেশ কথা, কিন্তু বল দেখি মাসি, তিনকাল গিয়ে তো এককালে ঠেকেছ, চাঁদের সাথ মেনি-বাঁদরের পোঁদের তুলনা হয়? লব গুচ্ছাতের মা তার চির প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাগে পেয়ে আর ছাড়তে চায় না সহজে।

যমরাজ প্রায় খুইয়ে বসা মানটুকু আবার ফিরে পাওয়ায় খুদির মায়ের বুকটা জুড়োয় বুঝি এতক্ষণে। পাঁজরে ফুরফুরিয়ে সু-বাতাস বইতে থাকে। বলে, যাগগা, যা বলতিছিলাম, ...তো, যমরাজ বুসিয়া রইছেন এক্কেরে শেষে। উনার সুমুখে গোটা হলঘরটা। যমরাজের দু-ধারে সার সার চিয়ারে বুসিয়া আছেন মন্ত্রী-সেনাপতির দল। উনাদের গায়েও সোনার পোশাক, তবে টুকচার কমা। আর, সক্কলের পিছে একটা করিয়া দাসী দাঁড়িয়া আছে।

—দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া কী কত্তিছে অরা?

—বিশাল বিশাল পাখা দিয়া হাওয়া কত্তিছে। সোনার ঝালর দিবা পাখা সব। তো, যখন যমদূতেরা লিয়া গিয়া আমাকে ঢুকিয়া দিল ঘরে, সারা ঘর কী ঠাণ্ডা। হাঁটতে গিয়া দেখি, মেঝেতে মণিমুক্তা বসানো পুরু গালিচা। পা এক্কেরে দাবিয়া যায়।

পারুলমাসি গতিক বুঝে খুদির মাকে ছাগল-খেদানোর মতো করে তাড়া লাগায়, গালিচার কথাটা বুঝা গেছে, এবার তুমি গিয়া কী কল্লে, সেটা বল।

—সামনে সামনে আমি, আমার পিছে একজোড়া যমদূত। যমরাজ বুসিয়া শুঁড়ওয়ালা জুতা পরা পা-দুটা সমানে লাচাচ্ছিল। আমাকে দেখিয়া থামিয়া গেল পা। চিত্তগুপ্তের দিকে চাইয়া বলল, এ কাকে আনা করালে হে?

চিত্তগুপ্ত তার সামনে রাখা খাতাটাকে ফর্‌ফর্ করিয়া উল্টাইতে লাগল। একসময় খাতার একটা

পাতায় আইসিয়া আটকিয়া গেল চোখ। ভুরু কুঁচকিয়া তাকাল যমদূত দু-টার দিকে। খর গলায় শুধাল, এ কাকে ধরিয়া আনলু রে শালারা? এ তো সন্ধিপুরের পুঁটিবুড়ি। তদের তো পরানপুরের পুঁটিকে আনতে পাঠালাম। শালারা গন্দভেরও অধম।

—কথাটা কে বলল?

—কে বল্‌ল মানে? ভুরু কুঁচকে পারুল মাসির মুখের দিকে তাকায় খুদির মা।

—না, বলছিলম কি, কথাটা যমরাজ কইল, নাকি চিত্তগুপ্ত কইল?

—বললম্ তো, চিত্তগুপ্ত কইল।

—না, গতকাল কইছিলে কিনা, যমরাজই বলতেছিল কথাটা। বলতে বলতে পারুলমাসি লক্ষ করে খুদির মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শ্রোতারাও খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে পারুলমাসি বলে, তো, যমদূতরা কী জবাব দিল?

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা চাপা পড়ায় বুঝি সবাইয়ের সঙ্গে খুদির মাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, জবাব দিবে কি, তাদের তখন মেনি-মুয়া অবস্থা। বলে, ভুল হয়্যা গেছে মহারাজ।

—যমরাজ কইল, যা, যা, একে জলদি জলদি ছাড়িয়া দিয়া আয়। তারপর আমার দিকে চাইয়া যমরাজ কইল, যাও মা, তুমার এখনতক্ক সময় হয় নাই।

আমি কইলাম, লিয়া যখন আসছেন, আমি আর ফিরিয়া যাবোনি। লোকে কী কইবে? একবার মরিয়ালে আবার সে বাঁচে নাকি? তা বাদে, আমি আর কুন্ সুখে ফিরিয়াবো ঘরে? ঘর-সনসারে মোর তরে কুন্ সুখটা অপেক্ষা কত্তিছে?

—বটে তো। তারপর?

—যমরাজ কইল, উপায় নাই মা, সময় না হইলে তুমাকে ইখন ভত্তি লিবা যাবেনি।

আমি কইলাম, কিন্তু পাঁচজনায় আমাকে ভূত ভাববে যে। তা বাদে, এতক্ষণে আমার শরীল তো বোধ করি পুড়িয়া দিল সক্কলে মিলিয়া।

—তোমার দাহকাজ এখনতক্ক শুরু হয়নি, মা। সবেমাত্তর চিতা সাজানোর কাজ চলতিছে।

আমি বলি, তাও ফের হয়? বাসি মড়া এতক্ষণ ফেলিয়া রাখে কখনও?

যমরাজ কইল, তোমার ছেইলা আসতে দেরি কত্তিছে মা। সেই কারণেই দাহ কত্তে দেরি। যাও, বেশি দেরি কল্লে আর লিজের শরীলে সেঁধাতে পারবেনি।

কী আর করি, যমরাজের আজ্ঞামতো যমদূতগুলার সাথে আবার ঘরের পথ ধরি। তারপর, খানিক বাদে তো পাহাড়ির চূড়া থিকে ফেলিয়া দিল আমাকে।



খুদির মা'র যমলোক থেকে ফিরে আসার ঘটনাটা নিয়ে যে চারপাশে অতখানি তোলপাড় উঠবে খুদির মাও বোধ করি তা ভেবে উঠতে পারেনি।

ফলে, ধীরে-ধীরে সে যমরাজের দরবারের সাদামাটা বর্ণনাতে হরেক কিসিমের অলঙ্কার চড়াতে থাকে। এবং পুরো কাহিনিটি আকারে ও প্রকারে বাড়তে থাকে।

তৃতীয় দিনেই যমরাজের দরবারের পাশাপাশি একটা প্রাসাদও গড়ে ফেলে খুদির মা।

খুদির মা বলে, যমপুরীর কথাটা তো ভুলিয়াই গেছলাম। যমরাজের দরবারের পাশেই সে এক বিশাল রাজবাড়ি। ইয়া বড় বড় সোনার থাম। বড় বড় দরজা জানলা, জাফরিঘেরা বারান্দা। তাতে যমের বউ আর তার ছেইলা-পুইলারা থাকে। সিং-দরজার কাছে আধ ডজন দারোয়ান খাড়া রয়েছে। যমদূতগুলা হাসিয়া কইল, ভুলভুল করিয়া দেখু কি রে বুড়ি, আমাদের রাজামশয়ের বাড়ি। আমি তো দিদি হাবার মতো দেখতিছি। রাজবাড়ির সুমুখে একটা বিশাল ফুলের বাগিচা। তাতে কত রং-বেরঙের যে ফুল-পাখি-ঝরনা।

খুদির মা এরপর রোজদিনই প্রতিমার খাঁচায় মাটি লেপতে থাকে, একটু একটু করে। ফলে, যমপুরী

ও সংলগ্ন এলাকার বর্ণনায় অনেক কিসিমের অনুপঙ্খ এসে যেতে থাকে। যমপুরী সংলগ্ন ফুলের বাগিচা ছাড়াও প্রাসাদের লাগাও বৈতরণী নদীটির প্রসঙ্গও এসে যায়।

সবশেষে চতুর্থ দিনে, বুড়ির কাহিনিতে নরক কুণ্ডও যুক্ত হয়। খুদির মায়ের মুখে নরক-কুণ্ডের বর্ণনা অঘোর চক্কোত্তির বউয়ের থেকে শোনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নরকের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়।

একদিন অঘোর চক্কোত্তির বাড়ি থেকে ডাক আসে খুদির মায়ের। খোদ মহেশ্বরী ডেকে পাঠান তাকে। যেহেতু তাদের বাড়িতে পাক্কা বারোটি বছর ছিল খুদির মা, মহেশ্বরীর ডাক খানিকটা দাবির-রূপ ধরে আসে। খুদির মা এতে করে মনে মনে যারপরনাই শ্লাঘা বোধ করে। এবং একদিন বিকেলবেলায় সপারিষদ অঘোর চক্কোত্তির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

খিড়কির উঠোনে চক্কোত্তি-গিন্নির থেকে যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে সপারিষদ খুদির মা-কে বসতে দেওয়া হয়। খুদির মার জন্য বরাদ্দ হয় একটি প্রায় বাতিল কম্বল-আসন। সেই আসনের ওপর বসে খুদির মা অল্পক্ষণের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এই বাড়িতেই তার কেটেছে নাই নাই করেও বারোটা বছর। প্রায় প্রতি বিকেলেই আসর সাজিয়ে বসতেন মহেশ্বরী। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠ করতেন সন্ধে অবধি। খুদির মা ছিল সেই আসরের একজন স্থায়ী শ্রোতা। শাস্ত্র-পুরাণ জুড়ে কত কত গল্পগাথা, কত কত জায়গার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। শুনতে শুনতে এক সময় মহেশ্বরীর সঙ্গ ধরে কত অচিন 'লোক'-এ যে ঘুরে বেড়াত খুদির মা, সেসব আজ স্মৃতি।

মহেশ্বরীর সামনে তার যমপুরী থেকে ফিরে আসার গল্প শোনাতে গিয়ে, সেই প্রথম, খুদির মায়ের বর্ণনায় কিছু গুণগত পার্থক্য লক্ষ করে তার সঙ্গিনীরা।

খুদির মা সেদিন যমপুরীকে স্বর্গধামের সঙ্গে জুড়ে দেয়। কিনা, যমপুরী থেকে বের হয়ে সিপাই দু-টা বলে, ভুল করিয়া যখন আনিয়া ফেলছি, টুকচার আক্কেলসেলামি দিই। চল্ তোকে ফিরতি পথে স্বর্গটাও দেখিয়া লিয়া যাই। গাঁয়ে ফিরিয়া পাঁচজনকে জাঁক করিয়া কইতে পারবি। এই বলে তারা খুদির মাকে সোজা নিয়ে যায় স্বর্গধামে। আর, স্বর্গধাম মানেই তো পিছে-পিছে এসে যায় ইন্দ্রের প্রাসাদ, ঐরাবত হাতি, অপ্সরাদের নাচ...। প্রাসাদের সামনে কী সুন্দর ফুলের বাগান। নাম তার নন্দনকানন। সেখানে ফুটে রয়েছে শয়ে শয়ে পারিজাত ফুল। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা নদী। পাহাড়ের গায়ে অজস্র ঝরনা, ফোয়ারা...। আর, কী ফুরফুরে আরামদায়ক হাওয়া বইছে। হাওয়াতে অচেনা ফুলের গন্ধ। দেবরাজ ইন্দ্রের সে কী বিশাল দরবার! পুরোটাই সোনাদানা দিয়ে মোড়া। দরবার আলো করে বসেছে দ্যাবতারা। অপ্সরারা পেছনে দাঁড়িয়ে চামর দুলিয়ে চলেছে। উর্বশী-মেনকা- রম্ভার দল নেচে চলেছে অবিরাম।

খুদির মা সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত করল দ্যাবতাদের। তারপর ঝকঝকে সোনার মেঝেতে থাবড়ে বসল।

অনেকক্ষণ ধরে স্বর্গপুরীর বর্ণনা দেবার পর খুদির মা একসময় অলকানন্দা নদীর বর্ণনা দিতে শুরু করে। বলে, নদীর জল ঠিক কাচের পারা ঝকঝকে। দু-ধারে কত কত সবুজ চিকন ঘাস। যেন যতদূর চোখ যায়, নরম ঘাসের গালিচা পাতা।

শুনে লব গুচ্ছাতের মা হাহাকার করে ওঠে, কিনা, আহা রে, তোর ছাগলগুলাকে সাথে লিয়া গেলে বেচারিরা চরিয়া-বুলিয়া আসতে পারথো।

অতঃপর একটি গুরুতর জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় খুদির মাকে। কেন কি, এতকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য নিদেনপক্ষে যতটা সময় দরকার, খুদির মা তো অতক্ষণ ছিল না যমলোকে। তবে?

খুদির মা কিন্তু ততটা সময় যমপুরীতে ছিল বলেই দাবি করতে থাকে।

এতে করে শ্রোতাদের মধ্যেকার কেউ-কেউ মৃদু আপত্তি তোলে এই কারণে যে, তার প্রথম দিনের বয়ানে অন্যতর কিছু ছিল। সেদিন খুদির মা বলেছিল যে, তাকে প্রায় তৎক্ষণাৎ যমপুরী থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যমরাজ।

কথাটা ঠিক। খুদির মাকে ভুলবশত নিয়ে যাওয়া হয়েছে, চিত্রগুপ্ত এমন ঘোষণা করবার পর পরই

খুদির মাকে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়া হয় বলে প্রথম দিনেই কবুল করেছিল সে।

খুদির মা বলে, সব কথা কী আর সব সময় মনে থাকে মাইজো-দি। তবে এখন সব ধীরে-ধীরে মনে পড়তিছে।

এরপর খুদির মা যে সংশোধিত বয়ান দেয়, তা হল, চিত্রগুপ্ত যমদূতদের গালাগাল দিয়ে খুদির মাকে তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেবার আদেশ দিলেও দয়ার সাগর যমরাজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, মেয়াটা অদ্দুর পথ হাঁটিয়া আস্‌সে, একটা রাত থাকিয়া যাউ। গা-হাতের বেথা মারিয়া কাল সকালে যাউ।

কিন্তু খুদির মা যখন দিনের পর দিন ঘটনাস্রোতকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলল, তখন বাস্তববাদীদের একাংশ এমন প্রশ্ন তুলল যে, তুই তো ছিলি মাত্র এক রাইত, এর মধ্যে এত জা-গা ঘুরলি কী করিয়া? তো, এমন বালখিল্যসুলভ কথায় দুয়ো দিতে থাকে অন্যরা, কিনা, স্বর্গের একদিন একরাত মানে আমাদের কতদিন, সে ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে তোর?

মহেশ্বরী সারামুখে যৎপরোনাস্তি প্রাজ্ঞভাব ফুটিয়ে বলেন, ব্রহ্মার চোখের একটি পলকের সমান মর্তধামে একটি পুরো যুগ।

এরপর, আর ওইসব বিষয়ে কূটতর্ক তুলে দ্বিতীয়বারের জন্য বোকা বনতে চায়নি কেউই।

ফলত, খুদির মা তার যমপুরীবাসের সময়কালকে মর্তের মাপকাঠিতে নামিয়ে আনার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে পড়ে।

এরপর আসে ফিরতি পথের বর্ণনা।

খুদির মা বলে, যাবার সময় তো হুশ করিয়া চলিয়া গেছলাম। কিছোই তেমন দেখা হয়নি। ফিরতিপথে যা-সব দেখলম্ মা, সে কেবল শাস্তর-পুরাণেই মেলে।

এরপর খুদির মা তার ফিরতি পথের অজস্র ছবি আঁকতে থাকে। সেসব বর্ণনা কখনও মিলে যায় পাণ্ডবের স্বর্গে যাওয়ার রাস্তার সঙ্গে, কখনও বা পুরাণের আরও অনেক ঘটনার যাত্রাপথের সঙ্গে।

খুদির মা বলে, প্রথমেই পড়ল নাই-নাই করিয়া সাত-সাতটা সাগর। দুধসাগর, ক্ষীরসাগর, মধুসাগর, আরও কত কত সাগর যে দেখ্‌লম, সবগুলার নাম আর মনে নাই মা। সাগরগুলা পারালেই একটা উঁচা পাহাড়। তার পাশেই একটা বিশাল পুষ্করনি।

—মন্দার পাহাড়। পাশ থেকে বলে ওঠেন মহেশ্বরী,—মন্দার পর্বত জম্বু দ্বীপের উত্তর/এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর/সর্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি/আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি।/স্বর্গ হইতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর/কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর॥

স্বচক্ষে দেখা জায়গাগুলো এইভাবে শাস্ত্র-পুরাণের স্বীকৃতি পেয়ে যাওয়ায় মনে মনে বুঝি যারপরনাই চমৎকৃত হয় খুদির মা স্বয়ং। বলে, সেই পাহাড়ে একটা রাক্ষসের বাস। বাপ-রে, কী অর বিকট শরীর। আগুনের ঢেলার মতো চোখ।

মহেশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে আওড়াতে শুরু করেন, রাঙা দুই আঁখি তার, খোঁখর হৃদয়/বন্য জন্তু ধরে মারে, কারে নাহি ভয়।/দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান,/জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙা মুখখান।/শিরে দীর্ঘ জটা কটা দীর্ঘ সর্বকায়,/লম্বোদর অস্থিসার শিরা গোনা যায়।/বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে,/পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।/মেঘের গর্জন ন্যায় ছাড়ে সিংহনাদ,/মহা ভয়ঙ্কর মূর্তি রাক্ষস বিরাধ।।

শুনতে শুনতে খুদির মায়ের দু-চোখে ত্রাস ফুটে ওঠে। বলে, তারই পাশে আরও একটি পাহাড়। একেবের মেঘের মতো রং তার।

মহেশ্বরী মুখ টিপে হাসতে থাকেন নিঃশব্দে। বলেন, জানি, জানি।

মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর,/আরোহিল পাণ্ডুপুত্র, তাহার উপর।
ছত্রিশ যোজনা সেই পর্বত প্রসর,/অতি অনুপম যেন সুমেরুশিখর।
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারিমাস/নানা শব্দে কোলাহল শুনিতে তরাস।
সেই ত-পর্বত রক্ষা করে দেবগণ/পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন।

মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর/দিব'রাত্র নাহি জানি পর্বত উপর।
মেঘবর্ণ গিরিবর মেঘের আকার/বৃক্ষচ্ছায়া বিরাজিত দিবসে আঁধার।
পঞ্চনারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে/কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে।

এক নাগাড়ে এতখানি আবৃত্তি করে সামান্য দম নেন মহেশ্বরী। চারপাশের বউড়ি-ঝিউড়ির দল তাঁর শাস্ত্র-পুরাণের ওপর এতটা দখল দেখে, তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর স্মৃতিশক্তির বহর দেখে যারপরনাই চমৎকৃত।

নিজের যাত্রাপথটি মহেশ্বরীর বর্ণনার সঙ্গে এভাবে হুবহু মিলে যাওয়ায় আত্মবিশ্বাসটা বুঝি হু-হু করে বেড়ে যায় খুদির মায়ের।

খুব প্রত্যয়ী গলায় বলে, ওই পাহাড়টাতে থাকে কেবলই রাক্ষসীর দল। মেঘের মতনই গা-র রং অদের। এক্কেরে ভুষিকালির পারা। অরা অষ্টপ্রহর বাঘের ছাল পরিয়া থাকে। অদের প্রত্যেকের গলায় মুণ্ডুমালা ঝুল্‌তিছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দেন মহেশ্বরী। বলেন, জানি।
মহা ভয়ঙ্কর মূর্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা/বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর/ব্রহ্মাঅগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর।
লোল জিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন/হাঁড়িয়া-মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান গলে মুণ্ডুমালা/মাণিক-কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা।

—খানিক এগাতে না এগাতেই আরও একটা পাহাড়। এক্কেরে সোনার পাহাড় সেটা।

তৎক্ষণাৎ মহেশ্বরীর গলায় বেজে ওঠে তার শাস্ত্রীয় বর্ণনা—
সোনার পর্বতে দশদিক সুপ্রকাশ/সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ।
সোনায় গঠিত গোড়া দেখিতে সুঠাম/শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম।

—উহ, কী যে সোন্দর সে পাহাড়! বলতে বলতে খুদির মায়ের বুঝি সর্বাঙ্গ জুড়ে রোমাঞ্চ। বলে, কত কিসিমের গাছ যে রয়েছে সিখনে, তার বুঝি কুনো ইয়ত্তা নাই। ভূ-ভারতে বুঝি অত ধরনের গাছ নাই।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন অঘোর-গিন্নি :
গুবাক কাঁঠাল তাল তমাল পিয়াল/করঞ্জা জম্বীর টাবা নারঙ্গ রসাল।
ছোলঙ্গ চন্দন গিলা জাতি-জায়ফল/হরিতকী রম্ভা আম্র কদম্ব শ্রীফল।
কাকড়ি সেহড়া বট বহেড়া গাম্ভীরি/শিউলি শিরীষ চাঁপা কামরাঙ্গ গিরি।
নাগেশ্বর নারাঙ্গ কেশর সুশোভন/কুসুম কিংশুক আর পাটলি কাঞ্চন।
বৃক্ষ মূল লতা গুল্ম অতি ভীম ডাল/ভ্রমর গুঞ্জরে ডাকে কোকিল রসাল।

—তারও পরে আরও একটা পাহাড়। সুয্যিদেব ওই পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেলেন।

শুনেই অঘোর চক্কোত্তির বউয়ের ঠোঁটের ডগায় মৃদু মৃদু হাসি। বলে—
অস্তাচল পর্বত সাগরের ভিতর/জল হইতে গিরি ওঠে সহস্র শিখর।
দেখিয়া হইবে সবে সভয় অন্তর/অন্বেষিহ সাবধানে মহেশসাগর।

—তো, ওইখানেই আমাদের পত্থম দিনের যাত্রার ইতি। ওইখানেই পোঁছেই যমদূতরা কইলো, বুস্ বুড়ি। এখানেই রাইতে রইব আমরা।

—বলু কী রে! অবোধ পড়শিদের বিস্ময় আর আশঙ্কা বুঝি বাধা মানে না। বলে, ওই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে?

—জঙ্গল হইলে কী হবে? সে জা-গা এমনই সোন্দর, চারপাশে কত কত ফুলের গাছ, সোনার পাখি-পাখাল ঘুরিয়া বুলছে চারপাশে...।

—ফলপুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত/ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।
নানা পক্ষীকলরব শুনিতে মধুর,/সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।

বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি/শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ/আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।

—পরের দিন অলির ভোরে ফের হাঁটতে শুরু কল্লম আমরা। দেখতে দেখতে আরও একটা পাহাড়। তার চূড়া যেন আকাশ ছুঁবার চায়। চারপাশটা এক্কেরে খাঁ-খাঁ। জন্তু-জানোয়ার মানুষজন কেউ নাই সে পাহাড়ে।

—আকাশ পরসে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর/সপ্ত অশ্ব-রথে যায় দেবতা ভাস্কর।
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাজে/বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে।
জীবজন্তু পশুপক্ষী নাহি একজনা/উত্তপ্ত বাতাস বহে যেন অগ্নিকণা।
পাপিষ্ঠ পরানী যদি যায় তথাকারে/আরোহণ মাত্র সেই জ্বলে পুড়ে মরে।
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর/নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার।

—সেই পাহাড়ের গায়ে একটা বিশাল বাড়ি। ষোলআনা সোনা দিয়া তিয়ার হয়েছে সেই বাড়ি।

—ক্রৌঞ্চের নির্মাণ পুরী অতিশয় শোভা/ইন্দ্রের নন্দন জিনি কাননের প্রভা।
স্বর্গ হইতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী/হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি।
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর/জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর।
নির্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার/তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান-অনুসার।
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির/অন্ধকার আলো করে জিনিয়া মিহির।
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর/তাঁর পূজা করে দেব দানব ঈশ্বর।
কিন্নরের রাজ্য পুরী অতি অনুপাম/স্থাপিয়াছে দেব-দেব মহাদেব নাম।
বীণা বংশী বাজে, কেহ গায় শিবগীত/গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত।
চারিপাশ মধুভাসে নাচয়ে নর্তনী/নাহি অন্য জাতি নারী সকলি ব্রাহ্মণী।
কেহ গন্ধ চুয়া দেয় পুষ্প পারিজাত/বিল্বপত্রে গানবাদ্যে পুজে বিশ্বনাথ।
স্তবপাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে/একপদে স্তব কেহ করে জোড়হাতে।
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়/অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয়।
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ/অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগপরায়ণ।
হেঁটমুণ্ডে ঊর্ধ্বপদে কেহ আছে তথা/এইরূপে বামদেবে সেবয়ে দেবতা॥

—সেই বাড়ির পাশ দিয়া একটা লদী বইছে।

—রেবা নামে পুণ্য নদী পর্বত উপর/অতি সুনির্মল জল, শোভে মনোহর।

—ওই পাহাড়ের উলটাদিকে আরও একটা পাহাড়। যমদূতগুলা কইল, ওই পাহাড়ে নাকি কিরাতদের বাস।

—মণি মরকতে পুরী অতি শোভা করে/চৌরাশি যোজন তার উপর বিস্তারে।
বৃক্ষে অন্ধকার, নাহি জানে দিবারাতি/তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্তি অতি।
নানা বর্ণ অস্ত্র ধরে, লোহিত বরণ,/মণিরত্নে বিভূষিত প্রচণ্ড কিরণ।
পিন্ধন গাছের ছাল তাম্রবর্ণ কেশ/কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ।

এইভাবে, অসংখ্য পাহাড়, নদী ও রম্য উপবন পেরিয়ে একদিন সেই পাহাড়ের চুড়োয় এসে পৌঁছয় খুদির মা, যেখান থেকে যমদূতেরা তাকে ফেলে দিয়েছিল নিচে।

ততক্ষণে খুদির মা-র মনের মধ্যেকার যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় বেমালুম ঘুচে গিয়েছে। স্মৃতির খোপে খোপে বাসা বেঁধে থাকা দৃশ্যপটগুলিকে আর নেহাতই গাঁজাখুরি কল্পনা বলে মনে হয় না তার। একেবারে শাস্ত্রসম্মত তার পুরো যাত্রাপথটি। মহেশ্বরী একেবারে শাস্ত্র-পুরাণের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তা।

খুদির-মা আর মহেশ্বরীর যুগলবন্দি শেষ হয় এক সময়।

শুনতে শুনতে ভয়ে, ভক্তিতে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় কাঠ মেরে যায় পড়শিরা। স্বর্গফেরত মানুষটিকে নিয়ে যে কী করবে ভেবে পায় না। কেবল, যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে বেঁচে ফিরে আসা একটি মেয়ে

মনুষ্যসমাজের পক্ষে শুভ নাকি অশুভ, সেই ধন্দের সমাধান করে উঠতে পারে না ওরা। অবশেষে মহেশ্বরী যখন মেয়েমহলে এমন বিধান দেন যে, যমরাজও এক কিসিমের দ্যাবতা, এবং তাঁর আর এক নাম ধর্মরাজও বটে। তাঁর উপর, আসলে, গোটা দুনিয়ার জীবজগতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার গুরুদায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে, কেন কি, জীব যদি কেবলই জন্মায়, কোনওদিনও না মরে, তবে একদিন জীবদের ভারে দুনিয়া তো রসাতলে চলিয়াবে। তাবাদে, পাপীতাপীরা যদি তাদের পাপের নিরিখে যথাযোগ্য সাজা না পায়, তবে তো পাপপুণ্যের ভেদাভেদটাই লোপ পায়াবে। আসলে, মৃত্যু ও নরকের কারবারি হলেও যমরাজ তো স্রেফ ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই নরকের দায়িত্বে রয়েছেন। কাজেই, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসাটা যে-কোনও মানুষের পক্ষে শুভ হতে বাধ্য।

এরপর আর পড়শিদের মনে কোনওরূপ সংশয় থাকে না। তাদের কেউ বা খুদির মাকে ভক্তিভরে প্রণাম সেরে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়, কেউ বা পাদোদক নিয়ে মুখে ঠেকায় পরম ভক্তিতে।

তখন খুদির মা চারপাশের মানুষজনের চোখে এক অলৌকিক রমণী, দয়া করে নেমে এসেছে এই ধুলোর পৃথিবীতে।

ফলে, তার পাড়াপড়শি সমবয়েসিরা, যারা এতকাল খুদির মা বাঁচল কী মরল, একদিনের জন্যও খোঁজ নেয়নি, তারা এখন যেচে যেচে খুদির মায়ের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করতে শুরু করে। পারুল-বুড়ি তাকে একদিন মনে করিয়ে দেয়, কতকাল আগে ভীম-মেলায় ওরা নিজেদের মধ্যে বেলফুল পাতিয়েছিল। একদিন আচমকা বলে ওঠে, ও বেলফুল, সেদিনের কতাটা মনে আছে তোর?

এই সবকিছু দেখেশুনে খুদির মায়ের যমপুরী দর্শনের মধ্যে এক ধরনের মাত্রা যোগ হয়। কেউ বা বাড়িতে ডেকে নিয়ে পেট ভরে ফলার খাইয়ে ছাড়ে। দিনরাত তার বাড়িতে কাতারে কাতারে মানুষ এসে ভিড় করে। আর, তাদের সামনে কিস্তিতে কিস্তিতে ঘটনাটা বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায় বুড়ির। বারবার একই ঘটনা বলতে বলতে মাঝেমাঝে তথ্যগত কিছু ত্রুটি থেকে যায় বটে, প্রাসাদের, উদ্যানের, দরবারের বর্ণনাগুলি কখনও-সখনও একটু-আধটু বদলে যায়, কিন্তু ভক্তিতে গদগদ মানুষ সেটা গা করে না তত। কেউ সেগুলো ধরিয়ে দিতে চাইলে, অন্যরা তাকে সরাসরি উপেক্ষা করে, কিনা, কিছু মানুষ আছে এই দুনিয়ায়, তারা চাষি না হয়্যা উকিল হইলে নাম কত্ত।

আসলে, স্বর্গ-ফেরত একজন জলজ্যান্ত মানুষকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করবার মহার্ঘ অভিজ্ঞতাকে কোনওমতেই খাটো হতে দিতে রাজি নয় তারা।

একদিন চুপিসারে তার বাড়িতে আসে খগেন দলাইয়ের ব্যাটা বঁচু। অতি বাচ্চা বয়েসে বাপকে হারিয়েছে সে। সেই শোক আজও ভুলতে পারেনি। বাপ বিহনে তার কত সাধ-আহ্লাদই মিটল না জীবনে, কত কত শূন্যস্থান পূরণই হল না।

বঁচু এসে সঙ্গোপনে খুদির মায়ের পায়ের তলায় একটা ডাঁসা পেয়ারা রেখে দিয়ে প্রশ্ন করে, স্বর্গে ঘুরে বেড়াবার কালে খুদির মা তার বাপকে দেখেছে কিনা?

নিজের বাড়ির উঠোনে বসে বসে স্বর্গ গমনের যে অভিজ্ঞতা শোনায় খুদির মা, তা যে তিলমাত্র বানানো নয়, বরং ষোলআনাই শাস্ত্রসম্মত, এটা রটে যাবার পর, সন্ধিপুরের সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলোর থেকে খুদির মায়ের ডাক আসতে থাকে। কেন কি, তাঁরা তো আর স্বয়ং খুদির মায়ের ভিটেতে পা দিয়ে শুনে যেতে পারেন না সেসব। মান-সম্মানের প্রশ্ন সেটা। কাজেই, তাঁরা মজুর-মাইন্দার মারফৎ ডেকে পাঠান খুদির মাকে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এক, এমন পুণ্যবতী রমণীকে নিজের ভিটেতে আনলে, তার পদস্পর্শে ভিটে পবিত্র হবে। দুই, নিজের বাড়িতে একান্তে বসে বসে অভিনব স্বর্গারোহণের কাহিনিটি শোনা যাবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জেনে নেওয়া যাবে স্বর্গপুরীর অন্ধিসন্ধি, যা আমদরবারের ভিড়ভাট্টায় ঠিক হয়ে উঠবে না।

কাজেই, ইদানীং প্রায় রোজ বিকেলে খুদির মাকে যেতে হয় সন্ধিপুরের হরেক বাখুলে।

প্রশস্ত দাওয়ায় শতরঞ্চি পাতা হয়। রেকাবিতে পান, ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল। তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে থাকে কেবল ওই বাড়ির লোকজন, বড় জোর একেবারে লাগোয়া বাড়ির খুব ঘনিষ্ঠ দু-

চারজন, যাদের কিনা খরচ-খরচা করে খুদির মাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্বর্গের গল্প শোনার মতো আর্থিক ও সামাজিক কৌলিন্য নেই।

সমবেত জমায়েতের মধ্যমণি হয়ে, ঠিক কথক-ঠাকুরের ভঙ্গিতে তার স্বর্গারোহণের গল্প বলতে থাকে খুদির মা। উপস্থিত জমায়েত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে।

গল্প বলা শেষ হলে পর ভরপেট ফলার খেয়ে ঘরে ফেরে সে।

একদিন জমিদার বাড়ির অন্দরমহল থেকে হিরন্ময় মুখুজ্জার মা মন্দাকিনী ডেকে পাঠান খুদির মাকে। সেই উপলক্ষ্যে মুখুজ্জা-গড়ে এসে হাজির হয় আশেপাশের সম্পন্ন বাড়ির বউ-ঝিরা, যারা তাদের কৌলিন্য, বেশভূষা ও কথাবার্তার চাকচিক্য দিয়ে মন্দাকিনীর মন জয় করে তাঁর সঙ্গে ওঠাবসা করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

জীবনে সেই প্রথম, মুখুজ্জাগড়ের একেবারে অন্দরমহলে চলে যেতে পারে খুদির মা।

মন্দাকিনী তার জন্য একটি মাদুরের আসন বরাদ্দ করেন।

সেই আসনে সামান্য তফাতে বসে খুদির মা ধীরলয়ে শুরু করে তার স্বর্গ-গমনের কাহিনি।

গিন্নি-মা'রা বাটাভরা পান নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সারা বিকেল ধরে শোনেন সেই অলৌকিক কাহিনি।

ইদানীং যমপুরীর বর্ণনাটি খুব সংক্ষেপে শেষ করে খুদির মা অতি দ্রুত স্বর্গপুরীতে পৌঁছে যেতে চায়। এবং প্রথম দিকে যমপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে যেসব আড়ম্বরপূর্ণ কারুকার্য ও সোনাদানা, মণিমুক্তোর কথা বলত, ইদানীং তার বারোআনা খরচ করতে চায় ইন্দ্রপুরীর বর্ণনাতে।

বেশ ঘটা করে ইন্দ্রপুরীর বর্ণনা শেষ করে খুদির মা মন্দাকিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, ইন্দ্রর বাড়িটা দেখিয়া যমদূতগুলাকে কইলাম, এমন রাজবাড়ি আমাদের গেরামেও রয়েছে। আমাদের বাবুর বাখুল, সেও কিছো কম লয়।

তাই শুনে মন্দাকিনীর মুখে মারা দুধের ওপর পুরু সরের মতো শ্লাঘা জমে।



যমপুরী তথা স্বর্গপুরী থেকে ফিরে খুদির মা যখন সন্ধিপুরের নিস্তরঙ্গ দিঘিতে একটা বড়-সড় ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে, যখন তাকে নিয়ে পুরো তল্লাট জুড়ে ভাবাবেগের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তার আগে অবধি খুদি তার মায়ের ধারেপাশে ছিল না। কিন্তু এই ক-দিনে পাড়াপড়শির মধ্যে মায়ের এমন কদর বেড়ে যাওয়াতে সে ধীরে-ধীরে চিত্রপটে মুখ দেখায়।

তখন খুদির আয়-উপায় বলতে তেমন কিছুই ছিল না। পঞ্চায়েতের মেম্বর হওয়ার পর থেকে শশধর পাঁঠাকে খাসি করবার কাজটা আর করত না। কাজেই খুদিও অ্যাসিস্টেন্টের কাজটা খুইয়েছিল। পঞ্চমীকে বিয়ে করবার পর সে খেত-মজুরের কাজ করে সংসার চালাত। বড়ই অনটনে চলত তার সংসার।

খুদির মা-র প্রতি আচমকা সারা সন্ধিপুর গাঁয়ের মানুষজনের মধ্যে এক ধরনের সম্ভ্রম তৈরি হলে পর তার ছিটেফোঁটা খুদির কাছেও পৌঁছে যায়। তার সঙ্গে গাঁয়ের মানুষ সামান্য গা ঘষাঘষি করতে চায়। মুখোমুখি হলে মাখো-মাখো হাসে। কুটুম-বাটুম বা বহিরাগতদের কাছে ওর পরিচয়টা এইভাবে দেয় যে, সেই যে তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে স্বর্গ থেকে ঘুরিয়া আইছে, এ হইল তারই ব্যাটা।

খুদি মনে মনে অনুভব করে, ক-দিনের মধ্যেই সে গাঁয়ের মানুষের মধ্যে এক ধরনের আধা-ভি আইপি-র মর্যাদা পেতে শুরু করেছে। তাই নিয়ে ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিৎ গুমোর পয়দা হয় ওর মনে। গাঁয়ের কোনও জমায়েতে, মজলিশে একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে সে উত্থাপন করে তার পুণ্যবতী মায়ের স্বর্গারোহণের প্রসঙ্গ, কিনা, যেদিন মা স্বর্‌গে গেল.. ।

তখন থেকেই খুদি বোধকরি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একটু-আধটু স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

সেটা বোঝা গেল, যখন সে একে-তাকে একেবারে অযাচিতভাবে বলতে লাগল যে, সে তো বাপের ভিটে ছেড়ে যেতে চায়নি। এখন, মা যদি নিজেই তার একমাত্র ব্যাটা-পুত্তুরটিকে খেদিয়ে দেয়, তো তার না গিয়াই বা উপায় কী ছিল? তোমরা কইতে পার, বউয়ের সাথে বুড়ির একেবারেই পটতোনি। তা, শাউড়ি-বউয়ে কুন ঘরেই বা ঝগড়াঝাঁটি না হয়। বাড়িতে ঘটি-বাটি থাকলেও তো ঠুকাঠুকি হয়, না কী? তাবলে কে আর ব্যাটা-বউকে পির্থক্ করিয়া দেয়। তাবাদে, ব্যাটা-বউ যদি অবুঝ হয়ও, তুমি তো আর অবুঝ নও। তুমি হইলে কিনা মা। পেটের ছেলার হাজারটা দোষ মাপ করে বলিয়াই সে কিনা জননী। সেই বলে না, কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কদাচ লয়। তাবাদে, চলিয়া যাবার পরও আমি কতবার আইসিয়া মাকে বুঝাইছি, কিনা, মা-গো, আমি থাইক্‌তে তুই একলাটি ভিটা জাগবি? তোর বইস হইছে, রাইতে-ভিতে কখন কী ঘটিয়া যায়, বল্ তেবে, ফিরিয়া আইসি। কিন্তু সে দলুইয়ের বেটির আর কিছো না থাক্, জেদটা তো ছিল আঠার আনা। আমার কথা মানলে তো।

যদিও গাঁয়ের মানুষ চিরকালই খুদির মুখে উলটো কথাই শুনে এসেছে, কিনা, যদি আমি পচু দলুইয়ের ঔরসে জাত হয়্যা থাকি তো এই খান্ডার বুড়ির মুখ দেখবোনি জীবনে। এবং যদিও খুদিকে নিজের পৈতৃক ভিটেতে ফিরে যাবার আগ্রহ দেখাতে কস্মিনকালেও দেখেনি কেউই, তবুও ওই নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে না শ্রোতার দল। বরং মুখে বলে, তা তো ঠিকেই। ব্যাটা-বউ ভুল করলে মা কী কখনও তাকে এই মতো সাজা দিতে পারে, না দিবা উচিত?

এইভাবে গাঁয়ের মানুষজনের কাছে এক ধরনের নৈতিক সমর্থন পেয়ে গিয়ে খুদি একটু একটু করে মায়ের কাছে আনাগোনা জোড়ে। তার শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়। এটা-ওটা ফাইফরমায়েশ করে টরে দেয়। তাতে করে বুড়ির মনটা ভেজে কিনা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারে না খুদি।

সম্পর্কটাকে একেবারে মারা ক্ষীরের মতো গাঢ় করবার বাসনায় একদিন পঞ্চমীকে দিয়ে চিতো পিঠা বানিয়ে বয়ে নিয়ে আসে বুড়ির কাছে, কিনা, তুমার বউমা দিয়া পাঠাল। ভেবেছিল, পুরোনো দুর্ব্যবহারের কথাগুলো স্মরণ করে বুড়ি হয়ত বা পত্রপাঠ বিদেয় করে দেবে পুত্রবধূর উপঢৌকন। কিন্তু খুদির মা বিনা প্রতিবাদে খায় তা। খুদি এটাকে এক ধরনের আশকারা বলে ধরে নেয়।

ইদানীং খুদি তার মায়ের কাছেই দিনের অর্ধেকটা সময় কাটায়। এই নিজের বাড়িতে গেল, এই ফিরে এল।

এই নিয়ে প্রথম প্রথম খুব বাদ সাধছিল পঞ্চমী। বলে, ওই ঘাটের বুড়ির পাশ তুমার রোজ রোজ কী দরকার শুনি?কথায়-কথায় অর পাশ দৌড়ে যাওয়া ক্যানে? আমার বাপকে কসাই বলেছিল, এত জলদি ভুলিয়া গেলে কথাটা?

খুদি ওকে প্রথমদিকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিনা, তার মা এখন চারপাশের সব্বাইয়ের কাছে আলোচ্য বস্তু। স্বয়ং হিরন্ময় মুখুজ্জার মা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে বসিয়ে গল্প শোনে। তার ব্যাটা বলে আমিও কত কদর পাচ্ছি পাঁচজনার থিকে। বুঝিসনি ক্যানে?

কিন্তু মেয়েমানুষ যদি বলে, আমি বুঝবোনি, তবে দুনিয়ার কারোর সাধ্যি নাই তাকে বুঝ্ দেয়। কাজেই, বাধ্য হয়ে খুদিকে একদিন বউয়ের ওপর বাঘের ঝাপট নিতে হয়।

বলে, শালী, যা বুঝিস্‌নি তা লিয়া কথা কইতে আসিস ক্যানে? কখন কুন কাজটি কত্তে হয়, আমি ভালোই জানি। ঠিক টাইমটি বুঝিয়া কেমন তোকে গলায় বাঁধছিলাম। খাস জমিনে বাড়ি হইল, গাড়ি-বলদের লোন মিলল, পঞ্চায়েতের জামাই বলিয়া মান জুটল...।

এমন কথায় পঞ্চমীর গুমোরটা বেড়ে যায়। বলে, গলায় তো বাঁধলে, কিন্তু মূল্যটা আর বুঝলে কুথা! সেই বলে না, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা,/ছিঁড়িয়া করে ফালাফালা। তুমার হইল সেই বিত্তান্ত। সে মাগী ঠ্যাট করিয়া শুইয়া রইল, সক্কলে জানল মরিয়া গ্যাছে, শ্মশানে গিয়া যেই না আগুন দিবে, অমনি ভয়ে-তাড়াসে ধড়পড়িয়া উঠিয়া বুসিয়া একটা গপ্পো ছাড়ল বাজারে, আর তাই শুনিয়া অবধি গোটা গাঁ-র লোক অকে লিঁয়া কী কচ্ছে দ্যাখো না!

পঞ্চমীর বাপের কানে কথাটা যেতেই সে মেয়েকে মৃদু তিরস্কার করে, ছিঃ, এমন কথা বলে না।

বলেই মেয়েকে গোপনে শলা দেয় সে।

বলে, তোর শাউড়িকে লিয়া সারা গাঁ যা কচ্ছে, তাতে করিয়া তোদের, আমাদের মান-সন্মান কত বাড়িয়া গ্যাছে। যা, শাউড়ির পাশে গিয়া এইবেলা বুড়ির দখল লে। লচেৎ অন্ন ঝি কিংবা কে এক বোন-পো আছে কুথা যেন, দৌড়িয়া আইসিয়া দখল লিয়া লিবে। তোরা তখন আমড়ার আঁটিটি চুষবি।

বাপের কথায় পঞ্চমীর বুঝি হুঁশ হয়। সে তখন খুদির কথামতো চিতো পিঠা বানাতে বসে যায়।

দিনকয়েক বাদে পঞ্চমী আর ব্যাটা খ্যাঁদাকে নিয়ে খুদি আসে বুড়ির কাছে।

দাওয়ায় উঠেই পঞ্চমী গলায় আঁচল জড়িয়ে ঢুপ করে একটা প্রণাম ঠোকে শাশুড়িকে। তারপর খ্যাঁদার দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় বলে, নানিকে গড় কর্।

সেই মুহূর্তে খুদির মা আবিষ্কার করে, পঞ্চমীর গলার স্বরে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। সেই রুক্ষ, খরখরে গলাটি নেই।

এরপর থেকে খুদি প্রায় রোজদিনই চলে আসে মায়ের কাছে। সঙ্গে আনে পান, সুপুরি, চুন, ভাজা দোক্তা জাতীয় বুড়ির প্রিয় নেশার সামগ্রীগুলি। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই এই বাড়িতে কাটায়।

ইদানীং বুড়ির সুবিধে-অসুবিধের প্রতি তার সর্বক্ষণের নজর। তার শরীর-স্বাস্থ্য কী করলে ভালো থাকবে, তাই নিয়ে তার অষ্টপ্রহরের ভাবনা বুঝি। এবং কিছুদিন বাদে খুদি অনুভব করে, চিঁড়ে যেন অল্প অল্প ভিজছে।

ততদিনে বুড়ির চাহিদা সন্ধিপুর গাঁ ছাড়িয়ে আশেপাশে গাঁ-গুলোতেও বাড়তে শুরু করেছে। দিন দু-বেলা বুড়ির ভিটেতে কৌতূহলী মানুষজনের আনাগোনা তো রয়েছেই, আশেপাশের গাঁয়ের বহু সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও তার ডাক পড়ছে ঘন ঘন। মানুষ শুনতে চায় যমপুরীসহ তার পুরো স্বর্গভ্রমণের বৃত্তান্ত।



খুদির মা চলেছে দক্ষিণপাড়ার দিগম্বর সাউদের বাড়িতে।

অনেকদিন ধরে ডাকছিল। কিন্তু খুদির মায়ের এখন হুট করে কোথাও যাবার জো নেই। তার ভিটেতে ইদানীং দিনরাতের মোচ্ছব। লোকজনে ভরে থাকে অর্ধেক উঠোন। কিন্তু খুদির মনোগত ইচ্ছে, বুড়ি একটিবার সময় করে যাক সাউদের বাখুলে। কেন কী, সচ্ছলতার দিক থেকে সাউয়েরা সারা সন্ধিপুর গাঁয়ে তিন কি চার নম্বরে। তার ওপর তাদের রেশন-শপ এবং তার সঙ্গে লাগোয়া ভুসিমালের দোকান রয়েছে। এমন মানুষের সঙ্গে একটুখানি ভাবসাব থাকা ভালো।

কাজেই, ক-দিনের লাগাতার মেহনতে খুদি পটিয়েছে মাকে। রাজি হয়েছে বুড়ি।

উপস্থিত খুদির মা চলেছে দক্ষিণপাড়ার উদ্দেশে। বগলে একটি কম্বল আসন আর ডানহাতে কাঁসার ঘটি নিয়ে খুদি চলেছে পিছু পিছু। সংকীর্ণ গ্রাম্য পথে উলটো দিক থেকে একাধিক কাউকে আসতে দেখলে খুব বিনীত ভঙ্গিতে বল্ছে, টুকচার গা-আলগা দিয়া হাঁটবে গো, ছুঁয়াছুঁয়ি না হয়্যা যায়।

লোকগুলি সন্ধিপুরের হলে এমন কথার মর্মার্থ বুঝে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গেই। সরু রাস্তার একপাশে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে খুদির মাকে পথ করে দেবে। ভিন গাঁয়ের মানুষ হলে অবশ্য পুরোপুরি বোধগম্য হবে না এহেন সতর্কবাণীর কারণ। তবে খুদির মায়ের কপালে ও নাকে রসকলি আর গলায় গুলাচ ফুলের মালা দেখে তারা হয়তো আন্দাজ করে নেবে যে, এ হল সন্ধিপুরের ওই বুড়ি, যে-কিনা এমন এক আজব কাণ্ড ঘটিয়েছে, এ তল্লাটে কেউ বাপের জন্মেও শোনেনি তেমন কথা।

খুদির মা সাউদের বাড়ির কাছাকাছি হওয়া মাত্তর দু-ধারের বাড়িগুলো থেকে কৌতূহলী বউ-ঝির দল বেরিয়ে আসে কাতারে কাতারে। ভিড় করে যে-যার উঠোনে। ভুলভুল চোখে দেখতে থাকে খুদির মাকে।

উঠোনে পৌঁছনো মাত্তর সাউ-বাড়ির মেয়েরা উঠোনে নেমে এসে জোরে জোরে শাঁখ বাজাতে থাকে।

মাঝ-উঠোনে আগে থেকেই পাতা রয়েছে দু-টো শতরঞ্চি। একটা বড়, অন্যটা ছোট।

খুদি এর মর্মার্থ জানে। বড়টা সাউ-বাড়ির লোকজনদের বসবার জন্য। ছোটটা খুদির মায়ের জন্য বরাদ্দ।

এর নিগূঢ় কারণটা খুদির বোধগম্য হয় না। হতে পারে, খুদির মায়ের মতো মহীয়সী রমণীর সঙ্গে এক আসনে বসতে ওদের সংকোচ। হতে পারে, যতই না কেন মহীয়সী হোক, তাও মাঝি জাতের মেয়া তো, আকাট মাহিষ্য হয়ে ওর সঙ্গে এক আসনে বসলে বাবুদের নিন্দা হবে।

সে যাই হোক না কেন, খুদি ওটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে চায় না। কেন কি, বুড়ি তো আর সত্যি সত্যি ওই ছোট শতরঞ্চিতে বসছে না। সাউ-বাড়ির বউ-ঝিরা বুড়িকে শতরঞ্চির দিকে নিয়ে যাওয়ার মাঝপথেই হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে যায় খুদি। খুব বিনীত গলায় বলে, মা উখেনে বসবেননি।

বলতে বলতে বগলের থেকে কম্বল-আসনটি টেনে নিয়ে পেতে দেয় ছোট শতরঞ্চির থেকে হাতখানেক দূরে।

কিছুদিন আগে হলে বুড়ি তড়িঘড়ি করে বসতে যেত কম্বল-আসনে, এখন খুদির বকাবকির ঠেলায় ধাতস্থ হয়েছে। সে এখন জানে, ওই ধুলোপায়ে বসে পড়া চলবে না।

কম্বল-আসনটি পেতে দিয়েই খুদি ঘটি নিয়ে দৌড় দেয় সদর পুকুরের দিকে। ঘটি ভরে জল আনে।

বুড়ি ততক্ষণে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়েছে উঠোনের একেবারে শেষপ্রান্তে।

খুদি এবার ঘটির জলটুকু একটু একটু করে ঢেলে দেয় বুড়ির দু-পায়ে।

বুড়ি একটুখানি ঝুঁকে পড়ে রগড়ে রগড়ে পা-দুটোকে ধোয়। তারপর খুদির হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে অবশিষ্ট জলটুকু গণ্ডুষে নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকে। একসময় মাথার চারপাশে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দেয় জলটুকু। এরপর পায়ে পায়ে এসে বসে কম্বল-আসনে।

বুড়ির ধীরগতিতে হাঁটা, থমথমে চোখে তাকানো, ঘটির জল হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া—এসব দেখতে দেখতে সাউবাড়ির লোকজনের মধ্যে বুড়ির প্রতি ভক্তিভাব আরও প্রকট হয়। অঘোর চক্কোত্তির বাড়িতে ঢোকার আগে খুদির মা যে সাউদের বাড়িতে মাসকয় কাজ করেছিল, ওই মুহূর্তে দিগম্বরের বউয়ের সে-কথাটা চকিতের তরে স্মরণে এলেও তা চটজলদি ভুলে যেতে চায়, কেন কী, এই মুহূর্তে খুদির মায়ের মতো ধর্মাত্মা রমণীকে একদা-দাসীর আসনে বসাবার কথাটা ভাবাও বুঝি মহাপাপ।

কম্বল আসনে বসে বসে একটুক্ষণ দম নেয় খুদির মা। তাই দেখে উপস্থিত কেউ কেউ খুব মৃদু গলায় মন্তব্য করে, হাঁফিয়া গেছে।

শোনামাত্র পাশের জনটি পোঁ ধরে, হাঁ...বইস তো কম হইলনি। এতটা পথ হাঁটিয়া আইল...।

খুদি ততক্ষণে সাউবাড়ির বউ-ঝিদের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। হাতের ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, টুকচার জল দিতে হবে।

ঘটিভর্তি জল এলে পব খুদি এগিয়ে যায় মায়ের কাছে। বিড়বিড় করে বলে, দু-ঢোক জল খা' তো মা।

খুদির মা ঘটিটাকে শূন্যে তুলে কয়েক ঢোক জল খায়।

এরপর খুদি জলের ঘটিটা নামিয়ে রাখে বুড়ির সামনেটিতে।

ততক্ষণে বড় শতরঞ্চিটাতে বসে পড়েছে সাউবাড়ির লোকজন। রবাহূতরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তাই দেখে খুদি খুব বিনীত গলায় বলে, একটু সরিয়া দাঁড়াও, একদিকটা ফাঁকা কর, হাওয়া আসতে দাও। ঘামিয়া যাচ্ছে মা।

একসময় খুদির মা খুব মৃদু গলায় শুরু করে।

খুব গদগদ গলায় বলে, চক্কোত্তিদের মাইজো-মা যখন শাস্তরপুরাণ পড়তেন, শুনতে শুনতে ভাবতাম, পুঁথিতে লেখা, তার আর এমন কী দাম? কে দেখেছে, কে লিখেছে, তার যে কতটুকু সত্যি, কতটুকু মিছা, ভগবানকে মালুম। কিন্তু সেইসব দিশ্য, চোখেব সুমুখে...দেখিয়া...হায় হরি, আমার তো

দু-চোখের পাতনি পড়ে না!

বলেই সে অনেকক্ষণ ধরে তার যাত্রাপথের এক ডগোমগো ছবি আঁকতে থাকে পরিপাটি করে। সে পথ কখনও হয় বিপদসঙ্কুল, কখনও মনোরম। কখনও তা রামের বনবাসকালীন পঞ্চবটী থেকে লংকা অবধি অসংখ্য যাত্রাপথের সঙ্গে, কখনও-বা মহাভারতের পাণ্ডবের বনবাস, অজ্ঞাতবাসের যাত্রাপথগুলি, কখনও বা পাণ্ডবের স্বর্গারোহণের পথের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়।

আমি তখন কলকাতায় আইন পড়ছি, আর কল্পনাথ ইউনিভার্সিটিতে এম. এ পড়ছে। বহুদিন বাদে আচমকা বাড়ি এসেছে সে। গাঁয়ে ঢোকা ইস্তক আমরা খুদির মায়ের খবরটা শুনেছি। কৌতূহলবশত গিয়েছি সাউদের বাড়িতে। খুদির-মা তখন খুব ঘোরলাগা চোখে বলে চলেছে তার সমুদ্রাদি পার হওয়ার কাহিনি।

—উঁচু-উঁচু পাহাড়, তার পাশেই গভীর খাদ, যেন মরণকুয়া। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তাতে অসংখ্য হিংস্র প্রাণী। রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য-দানব..., দূরে দূরে খাড়া হইয়া দাঁত কিড়মিড় করতিছে। নাগালে পাইলে গিলিয়া খাবে। আবার, পাহাড়ি পথের গায়ে কুলকুল করিয়া বইয়া চলেছে ঝরনা..., পথের বাঁকে-বাঁকে সুদৃশ্য লতা-কানন, ফুল-ফলের বাগিচা, তার শাখে শাখে ময়ূর-ময়ূরী, আরও কত স্বর্গীয় পাখিপাখাল...। ফুলের গন্ধে ম-ম করতেছে চারপাশ...। মাথা ধরিয়া যায়।

—হ্যাঁ, লো, পারিজাত ফুল দেখলু?

খুদির মা বুঝি এমন প্রশ্নে ধন্দে পড়ে যায়। কে জানে, হয়তো বা দেখেছি। দেখবার অতো সময় কুথা? এক নিমেষে যোজন পার। এই পাহাড় তো এই সাগর। সাগর পারাতে না পারাতে আবার পাহাড়, কিংবা ঘন জঙ্গল, পরমুহূর্তে আবার সাগর...। উথলিয়া পড়তিছে পাহাড়ের মতো ঢেউ। গুম গুম আ-বাজ উঠতিছে।

—কীসের সাগর উট্যা?

—মানে? খুদির মাকে এতক্ষণে বুঝি সামান্য বিব্রত দেখায়।

—মানে, এই আমাদের সাগরের মতোই লোনা জলের সাগর, নাকি...শুনেছি, ক্ষীর সমুদ্র, দুধ সমুদ্র..., এমনিতরো সাতটা সমুদ্র আছে এই দোনিয়ায়?

খুদির মা বুঝি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অপ্রস্তুত ভাবখানাকে গিলে ফেলেছে ততক্ষণে। বিজ্ঞজনোচিত গলায় বলে, —ওগুলা আরও পরে। প্রথমে তো লোনা জলেরই সাগর। সেটা পারিয়া যাইতেই বুঝলাম, ভবের সীমানা পারালাম।

এরপর ধীরে ধীরে সাত-সমুদ্রের বর্ণনা দেয় খুদির মা।

একেবারে সবশেষে দেয় বালির সমুদ্রের বর্ণনা। সে এক আজব সাগর। তাতে একবিন্দু জল নেই। চারপাশে কেবল ধু-ধু কত্তিছে বালি...আর বালি...।

আমরা, অর্থাৎ আমি আর কল্পনাথ পাশে বসে মন দিয়ে গিলছিলাম খুদির মা-র কথাগুলো।

কল্পনাথ আমার কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলে—মরুভূমি।

খুদির মা আধো-চোখে ঘোরমাখানো গলায় বলেই চলেছে,—যেদিকে তাকাই, শুধু বালি। মাঝে-মাঝে দু-চারটা কাঁটা কাঁটা গাছ। একজাতের লম্বা গলা-অলা জন্তু ঘাড় উঁচা করিয়া ওই কাঁটাগাছ খাচ্ছে।

কল্পনাথ পুনরায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে, উ-ট।

—যত খাচ্ছে, ততই তার কষ বাইয়া রক্ত ঝরতিছে। তাই দেখিয়া যমদূতটা কইল, প্রাণীটার সাজা চলতিছে। আগের জন্মে ছিল চণ্ডাল, নরখাদক। মানুষ মারিয়া তার গলা কাটিয়া রক্ত খাইত। এ জন্মে তার সাজা চলতিছে। খাইতে গেলেই অর মুখ কাটিয়া রক্ত বারাবে। আর, না খাইলে তো ধুঁকতে ধুঁকতে মরিয়াবে। বুঝতে পারলি কিনা বেপারটা? না খাইলে কষ্ট, খাইতে গেলে ততোধিক কষ্ট। এটাই অর সাজা।

এমনি সময়ে পাশ থেকে খুদি মায়ের উদ্দেশে বলে ওঠে, মা, টুকে থাম। দম লও। দু-ঢোক জল খাও। সেদিন স্বপ্নে তুমাকে কী কইল তেবে মা-কালী? কথা কইলে আয়ু ক্ষয় হয়। দ্যাবতারা কথা

কম কয় বলিয়াই তারা অমর। কুনো দ্যাবতাকে তুমি বকর-বকর কত্তে দেখ্ছ? তাদের হইল দৈববাণী। কিনা, দু-বোল, এক কথা।

ছেলের কথা ইদানীং আর তিলমাত্র অবজ্ঞা করে না খুদির মা। কাজেই, কথা থামিয়ে সে জলের ঘটির দিকে হাত বাড়ায়। সেই সময়টা পাশের লোকজনের উদ্দেশে খুদিই দিয়ে দেয় একপ্রস্থ বক্তৃতা। মা-কালীর সঙ্গে তার মায়ের কেমন সারাক্ষণ ঠারেঠোরে কথা চলে, তারই একটা নাতিদীর্ঘ ধারাবিবরণী দিতে থাকে সে।

বলে, আজই তো সক্কালবেলায় লাগিয়া গেল মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া। বুড়ি বোধকরি ভোগ চড়াতে কিঞ্চিৎ দেরি করিয়া ফেলছিল, কালীবুড়ি আর খাবেনি কিছোতেই। মা কয়, শুধু তোর কথা ভাবলেই আমার চলবে? আমার ঘর-গিরস্থালির কাজকর্ম নাই? তাবাদে রোজই তো ঠিক সময়ে দেই। একটা দিন টুকচার দেরি হয়্যা গেছে বলিয়া কী অমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়্যা গেছে শুনি? অত যে ঘোড়ায় জিন দিয়া বুসিয়া আছু, জলদি জলদি খ্যায়া-দ্যায়া তুই কুন্ পাহাড়টা উলটাতে যাবি শুনি? এই লিয়া দু-জনের মধ্যে জোর রগড়। মা-কালী যত রাগ দেখায়, আমার ঘরের বুড়িটি তত খেপিয়া টং হয়্যা যায়। শেষমেশ মা কইল, ঠিক আছে, খাবিনি তো খাবিনি। বইয়া গেল আমার। বলিয়া মাও গিয়া শুইয়া পড়ল দাওয়ায়।

এই পর্যন্ত বলে খুদি সামান্য সময়ের জন্য থামার সঙ্গে সঙ্গে ওকে প্রশ্নবাণে একেবারে অস্থির করে তোলে চারপাশের মানুষজন, কিনা, তারপর কী হইল, দু-বুড়িই না খাইয়া রইল কিনা, তোর মার রাগরোষ তুই শুনতে পেলু, মা-কালীর কথার্বাতাও ভালা তুই শুনতে পেলু? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার জবাবে খুদি বলে, কথাগুলা আমি অবশ্য, মিছা কথা বলবনি, জিব খসিয়াবে, শুনতে পাইনি, তেবে মায়ের জবাব দিবার ধরন-ধারণ শুনতে শুনতে মা-কালীর কথাগুলা বুঝিয়া ফেলতে কুনোই অসুবিধা হয় না। তুমরাও বুঝিয়া ফেলতে।

সহসা আমাদের দিকে চোখ পড়ে যেতেই কেমন জানি থতমত খায় খুদি। চটজলদি বলে ওঠে, যাগ্‌গা, এসব গুহ্য কথা বেশি বলা ঠিক লয়। তাবাদে, এসব কথা তো বাস্তবিক বিশ্বাস করাও কঠিন। এই ছাইন্সের যুগে...। তবে, এটাও তো ঠিক যে, বিশ্বাসে মিলায় কিষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

অঘোর চক্কোতির ছোটোভাই বাণীবিনোদ, সারা এলাকার মানুষ তাঁকে চিরকাল ঘোর নাস্তিক বলেই জানে, খুদির মায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখে হা-হা করে হেসে ওঠেন। কিনা, ভালো এক গপ্পো ফেঁদেছে খুদির মা। বাজার একেবারে জমিয়ে দিয়েছে।

বিশ্বাসী মানুষজন এমন কথায় নিদারুণ ব্যথা পায় মনে। বলে, বুড়ি সবকিছো বানিয়ে বলতিছে, বলতে চাও? অতে অর লাভ?

বাণীবিনোদ আবারও হাসেন। বলেন, স্বর্গ-নরক বলিয়া কিছো কি বাস্তবিক আছে হে? বলেই তিনি কম্বুকণ্ঠে আবৃত্তি জোড়েন : কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?/মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর,/রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,/আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়,/প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,/স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

বাণীবিনোদের কথাগুলো একেবারেই পছন্দ হয় না মানুষজনের।

বলে, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে গল্প ফাঁদিয়া অর লাভটা কি?

বাণীবিনোদ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেন ব্যাপারটা। কিনা, এই দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কোনও না কোনও ব্যাপারে একটু-আধটু পাগলামো রয়েছে। তবে কার যে কী নিয়ে পাগলামো, তা সাদা চোখে বোঝা মুশকিল। হয়তো মনে মনে স্বর্গে যাবার স্বপ্নই দেখত বুড়ি। হয়তো চারপাশের বাবা-অবতার, মা-অবতারদের দেখে, তাদের গল্প-টল্প শুনে-টুনে মনে মনে তেমন কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখত। হয়তো, আমার দাদার বাড়িতে থাকাকালীন দিনের পর দিন শাস্ত্র-পুরাণ, স্বর্গ, নরক, ইন্দ্রলোক, যমলোক, ইত্যাদির বর্ণনা শুনতে শুনতে তার মনে ওইসব জায়গা সম্বন্ধে নিদারুণ কৌতূহল তৈরি হয়েছিল।

হয়তো আচমকা স্ট্রোক হওয়ার পর কোমা স্টেজে থাকার সময় তন্দ্রার মধ্যে যমপুরী নিয়ে কোনও স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবে, জ্ঞান ফেরার পর সেই স্বপ্নটাকেই সত্যি ভেবে পরিবেশন করছে। তবে, তার পরের কথাগুলো নেহাতই বকোয়াস। মানুষ খুব খাচ্ছে দেখে গল্পবাজ মানুষেরা যেমন গল্পটাকে ফেনাতে ফেনাতে কোথা থেকে কোথা নিয়ে চলে যায়, এই বুড়িও তেমনটাই করছে। মানুষকে চমৎকৃত করে দেবার লোভ সামলানো বড়ই মুশকিল। তার জন্য সে গল্পের গোরুকে গাছে চড়াতেও কসুর করে না। এটাও মানুষের অন্তর্গত পাগলামোর একটা ধরন। বুড়িকে ওই পাগলামোতেই ধরেছে। আমার দাদার বাড়িতে শোনা যাবতীয় রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, যেটুকু মনে আছে, ওগরাতে লেগেছে।

বলাই বাহুল্য, বাণীবিনোদের কথাগুলো অধিকাংশ মানুষেরই মনঃপুত হয় না।

কামাখ্যা ভট্টের ব্যাটা গজানন, সেই ছেলেবেলা থেকেই সারা তল্লাটে ফেরেব্বাজ, ফোট্টুয়েন্টি বলে খ্যাত, ততদিনে বুড়ির একজন বড়সড় সাপোর্টার বনে গিয়েছে। এখন খুদির সঙ্গেও তার গলায় গলায়।

তার কানে বাণীবিনোদের কথাগুলো যেতেই সে বলে ওঠে, তাই যদি হয় তো বলতে হয়, বাণীকাকার মধ্যেও এক কিসিমের পাগলামি রয়েছে। ঠাকরদ্যাবতাসহ দুনিয়ার সবকিছুকে অবিশ্বাস করাটাও তাইলে এক কিসিমের পাগলামি।

খুদি আড়ালে একান্তজনদের কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেবার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, আসলে, জীয়ন্তে স্বর্গে যাওয়া, খোদ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরও যেটা পারেনি, একটা মাঝির মেয়ে সেটা পারিয়ালো, বামুন হয়্যা এটা সইতে পারছেননি ছোট্-ঠাকুর। মাকে খাটো করিয়া গোটা সম্প্রদায়ের কিতিত্বকে নস্যাৎ কত্তে চাচ্ছেন তিনি।

খুদির কথাটা সন্ধিপুরের মাঝি-বাগদিদের খুব মনে ধরে। বাস্তবিক, মাঝি-জাতের একটা মেয়ে স্বর্গ ঘুরে এল, এটা বামুনদের পছন্দ না হবারই কথা। তারা তাই সব্বাই মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলতিছে। বাণী-ঠাকুর কথাটা প্রকাশ করিয়া কইয়া ফেললেন, এই যা। এছাড়া, তারা ওই সূত্রে আরও একটা বিষয়ে একমত হয় যে, শাস্ত্রপুরাণ মুখস্থ করতে করতে লোকটার মাথাটা একেবারেই গ্যাছে। কী ফলের কী বীজ! অর বাপ ছিল কত সাত্ত্বিক মানুষ। দেবদ্বিজে কত ভক্তি ছিল তাঁর। তারই ছেলা হয়্যা লোকটা যে আকাট নাস্তিক হয়্যাবে, কেউ কখনও ভেবেছিল? তাবাদে, মায়ের পেটের দু-ভাই। অঘোর আর বাণীবিনোদ। দু-জনকেই বাপ ভাটপাড়ায় পাঠিয়েছিল টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হয়্যা আসতে। একজন ফিরিয়া আইল সাত্ত্বিক বামুন হইয়া, অন্যটি হইল ঘোর নাস্তিক। একই গাছের ফল, একটি পাকিয়া অমৃত হইল, অন্যটি পচিয়া পাখি-পাখালের খাদ্য।

কিন্তু খুদি-গজাননরা এসব রটিয়ে বেড়ালে কী হবে, ইদানীং বাণীবিনোদের কিছু চেলা জুটেছে সন্ধিপুর গাঁয়ে। তারাও খুদির মাকে নিয়ে সারাক্ষণ ইলচি কাটে।

বলে, দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসা মানুষ দেখেছি ঢের, এমনকি বিলাত-ফেরৎ মানুষও দেখা আছে, কিন্তু এক্কেরে স্বর্গফেরৎ মানুষ বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য। বলে, চাঁদে কবে মানুষ বসবাস করবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু তার ঢের আগে সন্ধিপুর গাঁয়ের এক বিধবা বুড়ি যে স্বর্গে গিয়া ঘুরিয়া আইল, এ তথ্যটা কি আমেরিকা এখনওতক্ক জানতে পারেনি? জানতে পারলে খুদির মাকে উড়াজাহাজে করিয়া আমেরিকা লিয়া যাবে নির্ঘাৎ। তার ফোটো ছাপা হবে দুনিয়ার সব তাবড় খবরের কাগজে। খুদি রে, একটু চেষ্টা করিয়া দ্যাখ না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটা চিঠি ল্যাখ্ না।

বাণীবিনোদসহ এলাকার পড়ালিখা জানা ছেলেছোকরাদের এহেন টিপ্পনির কোনও জবাব দেয় না খুদি। আড়ালে একান্তজনদের কাছে উগরে দেয় তার যাবতীয় ক্ষোভ। কিনা, দু-পাতা ইন্‌জিরি পড়িয়া ফেলছে বলিয়া দুনিয়ার সবকিছোকে তুড়ি মারিয়া উড়িয়া দিবা কি ঠিক? সেই কথায় বলে না, বিশ্বাসে মিলায় কিষ্ণ, তর্কে বহুদূর। মানলে ঠাকুর, না মানলে কুকুর। মানতিছ কিনা?

উপস্থিত সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয় খুদির বচন।

তাই দেখে বুঝি একটুখানি বাড়তি উৎসাহ বোধ করে খুদি। তার চোখেমুখে একটুখানি দার্শনিক ভাব জন্মায়। কপালের তাবৎ বলিরেখায় ভাঁজ তুলে বলে, তবে সার কথাটা হইল, শকুনের শাপে যেমন

গোরু মরে না, তেমনি দু-চারজন নাস্তিকের অসার মন্তব্যে সাচ্চা মানুষের মইমা কিছো কমিয়া যায় না।

—বটে তো। গজানন উরুতে চাপড় মেরে বলে ওঠে, হাতির পিছে পিছে একপাল কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করিয়া চলতে থাকে। তাতে হাতির কচুপুড়াটি। তার কুনো হেলদোলই নাই। সে তার মতন হাঁটতে থাকে, কুত্তার দল তাদের মতো ভুকতে থাকে।

গজাননের এমন সময়োপযোগী উপমায় খুদি মনে মনে যারপরনাই পুলকিত বোধ করে।

কিন্তু, বাণীবিনোদ, যতই নাস্তিক হোন, অঘোর চক্রবর্তীর ছোটোভাই তিনি, সন্ধিপুর গাঁয়ের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অংশবিশেষ, মুখুজ্জা-পরিবারের খুবই নিকটের, তাঁর সম্বন্ধে এমন কুকুর-হাতির তুলনাতে উপস্থিত অন্যরা কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করে। ফলে, কেউই কোনও জবাব দেয় না। কেউ কেউ তো এমন ভাব দেখায়, যেন কথাগুলো শুনতেই পায়নি। গজানন যখন কথাগুলো বলছিল, তখন সে অন্যমনস্ক ছিল। কিন্তু তারা পাশাপাশি অবাক হয়ে যায় এমনটাই ভেবে যে, মায়ের স্বর্গ থেকে ফিরে আসার সুবাদে মনে মনে খুদিটা এতটাই পায়াভারি হয়েছে যে, বাণীবিনোদের মতো সম্মানীয় মানুষ ও তাঁর সমর্থকদের অবলীলায় কুকুরের সঙ্গে তুলনা করাটাকে বেশ তৃপ্তি সহকারে পরিপাক করল!

খুদির আড়ালে তাই কেউ কেউ মন্তব্য করে, পিপীলিকা পক্ষ ধরে মরিবার তরে।

—ঠিক। সেই বলে না, অতি বাড় বেড়োনি, ঝড়ে উড়িয়া যাবে।

—সত্যি, মা গেল স্বর্গে, মাঝের থিক্যা খুদিটার ড্যানক গজাল!

খুদির কানেও ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যায় ওইসব মন্তব্যের টুকরো-টাকরা।

উঠোনের আমগাছটার তলায় বসে খুদির-মা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। বেলা তখন আন্দাজ দু-ঘড়ি।

মাঝেরপাড়া থেকে ফিরে এসে খুদি দেখল, মা তার একেবারে যাকে বলে বেহুঁশ। দৃষ্টি আকাশের গায়ে বিঁধিয়ে দিয়ে একেবারে পাথরের মতো স্থির।

ইদানীং খুদির মা প্রায় সারাক্ষণ আমগাছটির তলায় বসে সামনের আকাশের দিকে থিরপলকে তাকিয়ে থাকে। খুদি তার মায়ের ওই ঘোরলাগা ভাবটাকে ভেঙে দিতে চায় না একেবারেই। বরং চারপাশে খুঁটি পুঁতে মাথায় তালপাতার আচ্ছাদন দিয়ে একটা চালাঘর মতো বানিয়ে দিয়েছে ওখানে। বুড়ি রোদে-বৃষ্টিতে চালার তলায় বসে বসেই থমথমে মুখে আকাশ দেখতে থাকে।

আগড় ঠেলে ঢুকে মাকে অমন পাথরের মতো নিশ্চল বসে থাকতে দেখে সতর্ক হয় খুদি। সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে।

দিনের বিভিন্ন সময়ে আকাশ তার রূপ-রং বদলায়। বছরের বিভিন্ন ঋতুতেও সেই রং, রূপ বদলে বদলে যেতে থাকে। আকাশে নানা রঙের মেঘ জমে প্রায় বারোমাস। জামপাকা বৃষ্টির মেঘ ছাড়াও হরেক রঙের মেঘ। কখনও বুনো হাতির মতো ভুষোকালি রং, কখনও বা পেঁজা তুলোর মতো, কখনও বা ছানাকাটা মেঘের দল আকাশের নীলাভ সমুদ্দুরে ভাসতে ভাসতে কোত্থেকে আসে, কোথায় চলে যায় দিনভর, রাতভর...। ওইসব মেঘ সারাক্ষণ রং বদলায়, রূপ বদলায়, হাতি হয়, ঘোড়া হয়, পাহাড় হয়, নদী হয়, ঘরবাড়ি দিয়ে গড়া শহর হয়...। খুদির মা অবাক চোখে দেখে সেসব।

পূর্ণিমার রাতে মাঝ-আকাশে ছানাকাটা মেঘের মধ্যে চাঁদটা সরসর করে হেঁটে যায়। চাঁদের মধ্যে চরকা বুড়ি যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে বলে মনে হয় খুদির মায়ের।

দেখতে দেখতে আচমকা আবিষ্কারের আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে খুদির মা, ওই পাহাড়টার পাশ দিয়া গেছলাম আমি। ওর পিছনে একটা বড় লদী বইতেছে। বলতে পারু, আমি কী করিয়া জানলাম? তো বলি। ওই পাহাড়টার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে খোব তিষ্টা পাইল আমার। যমদূতগুলাকে কইলাম, আমার খোব তিষ্টা পাইছে, আমি আর হাঁটতে পাত্তিছিনি। যমদূতগুলা তখন আমাকে ওই পাহাড়ের

ধার দিয়া লদীটার পাশ লিয়া গেল। কইল, খা বুড়ি, কত খাবি খা। লদীতে নামিয়া একচোল জল মুখে দিয়া দেখি, এক্কেরে খাঁটি মারা দুধ।

—বলু কি লো! বিস্ময়ে, কৌতূহলে, লোভে-লালসায় চোখগুলো একেবারে আকাশের দিকে লম্ফ মারে শ্রোতাদের। বলে, পুরা লদীটা দুধের! এক ফোঁটাও জল নাই?

—দূর মুখপুড়ি। দুয়ো দিতে থাকে অন্যরা। বলে, একি সদু ময়রাকে দেওয়া তোদের মাসকাবারি দুধ যে, দুধ যত, জল তার চে-বেশি! এ হইল স্বর্গের দুধ।

—সেটা হইল দুধের লদী। বলতে বলতে খুদির মায়ের সারা মুখে যৎপরোনাস্তি প্রাজ্ঞভাব জাগরুক হয়। বলে, লদীটা গিয়া ক্ষীর-সমুদ্দুরে পড়েছে।

আর, দেখবি তো দ্যাখ, একটু বাদেই, সকলের চোখের সামনেই আকাশের বুকে পাহাড়টা বদলে যেতে যেতে এমন রূপ নিল, দেখলে মনে হবে, একটি দু-কূলপ্লাবী বর্ষার নদী। তেমনই কূলছাপানো, তেমনই রুপোলি-সাদা জল...।

দেখা মাত্তর খুদির মা চেঁচিয়ে ওঠে, ওই তো, ওইতো লদীটা! কী? বিশ্বাস হইল তো এবার?

খুদির মার কথা এমনিতে কেউই অবিশ্বাস করত না, তাও তার মনে বুঝি এমন একটি সূক্ষ্ম কাঁটা খচখচ করত, কিনা, তার কথাগুলো বুঝি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে না অন্যের কাছে। সেই কারণেই কোনও কথা বা দৃশ্য তার আগের কোনও বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যাওয়ামাত্র সে বলে উঠত ওই কথা, কী, বিশ্বাস হইল তো এবার?

পারুল মাসি ঠোঁটজোড়াকে বার-দুই চেটে নিয়ে বলে, পাশের ঐ পাহাড়টা তবে কি মাখা-সন্দেশের পাহাড় নাকি লো? আমার তো জিব দিয়া জল সরতিছে। ভাবতিছি, যমদূতেরা আমাকে কেন একটিবার ভুল করিয়া লিয়া যায় না?

ইদানীং খুদির মা নিজের বাড়ির সামনের উঠোনে বসে বসে আকাশের দিকে তাকিয়েই মরুভূমি ও সাতসমুদ্রসহ তার যাত্রাপথের সমস্ত খুঁটিনাটি বাঁকট্যাক ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুগুলিকে, এমন কি, বৈতরণী, অলকানন্দা জাতীয় স্বর্গের নদীগুলোকেও দেখতে পায়। এমন কি, স্বর্গলোকের পাশাপাশি ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোকসহ অঘোর চক্কোতির পুরাণের বইতে যতগুলি 'লোক' রয়েছে, অধিকাংশই তার সাদা চোখে ধরা পড়ে।

সারাক্ষণ মায়ের কাছে কাছে থাকবার সুবাদে খুদিও ইদানীং অনেকখানি চিনতে পারে সেসব। মায়ের পাশটিতে বসে সেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। অবাক হয়ে দেখতে থাকে ওইসব। মায়ের থেকেই একটু একটু করে চিনে নেয় আকাশের বুকে ছড়িয়ে থাকা স্বর্গীয় সব দৃশ্যাবলী।

কিছুদিনের মধ্যেই সেও পুরোপুরি রপ্ত হয়ে ওঠে সেসবে। মায়ের অনুপস্থিতিতে সে পড়শিদের পীড়াপীড়িতে, খুবই দয়া পরবশ হয়ে দেখিয়ে দেয়, ওর মা কোন্ পথে স্বর্গে গিয়েছিল। পথের দু-ধারের যাবতীয় পাহাড়, নদী, সাগর, অরণ্য, বাগিচাকে আঙুল দিয়ে একের পর এক দেখিয়ে দিতে থাকে। এমন কি 'লোক' গুলোকেও। যদিও কালকের সঙ্গে আজকের শনাক্তকরণে কিংবা বর্ণনায় ফারাক থাকে খুবই, তবুও পড়শির দল সামান্য সংশোধনীসহ ওর কথা মেনেই নেয়। কারণ, প্রথম কথা, সেটা ছিল তল্লাটের সবাইয়ের অন্ধ বিশ্বাসের যুগ। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর-দ্যাবতা, স্বর্গ-লরক নিয়ে কথায় কথায় অবিশ্বাস করতে নেই। গজানন, খুদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে মাঝেমাঝেই বলে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। কিনা, মানলে ঠাকুর, না মানলে কুকুর। বিশ্বাস চলিয়ালে, কৃষ্ণও চলিয়াবে।

তবুও মায়ের দু-একটা কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে গিয়ে সামান্য হোঁচট খায় খুদি।

এই যেমন, আকাট শূন্য থেকে যমদূতরা খুদির মাকে ফেলে দিল, অথচ মায়ের হাড়গোড় কিছুই ভাঙল না। বাস্তবিক, এমন কথা পড়শিরা কতটা বিশ্বাস করেছে, তাই নিয়ে খুদির নিজের মনেই সংশয় থেকে যায়।

সেই কারণেই একদিন সর্বসমক্ষেই সে মাকে শুধিয়ে বসে, হ্যাঁ মা, তোকে যমদূতরা অত উঁচা থিক্যা ফেলিয়া দিল মাটিতে, তোর নাগ্‌ল নি?

—না, আমি মাথা খুঁটিয়া পড়লাম একটা পাথরের উপর।

—বলু কী! তোর মাথাটা ত ছেঁচিয়া ছাতু হয়্যা যাবার কথা।

—আমি পড়লাম যেন একটা তুলার বস্তার উপর।

মায়ের কীর্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে খোদ পেটের ছেলের মনে এতখানি সংশয় জন্মাতে দেখে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয় অন্ধ বিশ্বাসীদের একটা অংশ। তারা খুদিকে থামিয়ে দিয়ে বলে, এতে অত অবিশ্বাসের কী আছে রে? গেল বছর বেলদার সিনিমা-হলে 'ভক্ত ধ্রুব' পালায় তো স্বচক্ষে দেখলি, পাহাড় থিকে ধ্রুবকে ফেলিয়া দিল, কিন্তু, তার গায়ে একফোঁটা টুসকিও লাগলোনি। যেন তুলার গাদার উপর পড়ল সে।

—ঠিকই তো। ঠাকুরের করুণা পাইলে সবকিছোই হইতে পারে।

খুদি তো আসলে মায়ের কথাগুলোকে বিশ্বাসই করতে চায়। তবে পাছে চারপাশের মানুষজন এমন ঘোর অলৌকিক বর্ণনাকে মনে মনে অবিশ্বাস করে, সেই কারণেই সংশয়গুলোকে প্রকাশ করে পরোক্ষে ওই নিয়ে পাঁচ-পাবলিকের প্রতিক্রিয়া কামনা করে সে। কিন্তু সেই প্রয়াসে যদি খোদ পাবলিকই আপত্তি জানায়, তাহলে তো আর খুদির ওই নিয়ে বেশি কথা কাচাকাচির দরকারই থাকে না। কাজেই, খুদি এক্ষেত্রে হৃষ্টমনে মেনে নেয় জমায়েতের যুক্তি। বলে, তা বটে। তা-পর কী হইল?

—পাথর আমার সাথ কথা কইল। বলে, তোকে কোলে লিবো বলিয়া সেই কদ্দিন থিকে অবস্থান কচ্ছি, অ্যাদ্দিনে আইলু তুই? আমি বলি, আমি কি আর সাধ করিয়া আস্‌সি? যমদূতগুলা ভুল করিয়া যমের দুয়ারে লিয়া গেছলো আমাকে, ভুল ভাঙল, ছাড়িয়া দিয়া গেল অদ্দুর অবধি। শুনিয়া মিচিক-মিচিক হাসে পাথর। বলে, আমিই ত ভুলটা করাইছি। পরানপুরের পুঁটিবুড়ির বদলে তোকে লিয়া যাবা করাইছি। পাথর হাসতেই থাকে। আমি শুধাই, এমন কাজটা ক্যানে করালে পাথর-বাবা? কী দিগদারি কও দেখি! পাথর বলে, ভুলটা না করালে তুই আমার পাশ আইস্‌তু? আর কদ্দিন এই ঝোপঝাড়ের ভিতর শুইয়া রইব আমি?

খুদির দু-চোখ কপালে উঠে গেছে ততক্ষণে। বলে ওঠে, এসব কী বলতিছু তুই! পাথর আবের হাসে নাকি? কথা কয় নাকি?

—হাসতেই ত দেখলাম বাপ। পুঁটিবুড়ির দু-চোখ সহসা উদাস হয়ে আসে, দেখলাম, পাথরের মুখ আছে, নাক আছে, একজোড়া চোখ আছে, একজোড়া কান...।

—কী কথা কউ তুই? খুদির দু-চোখে কপট বিস্ময়, সাজানো অবিশ্বাস, যুগপৎ,—শুনিয়া বাচ্চাও হাসবে যে!

—হাসু। খুদির মায়ের চোখেমুখে তিলমাত্র ভাবান্তর হয় না, যার হাসবার ইচ্ছা সে হাসু, যার কাঁদার ইচ্ছা, সে কাঁদু। আমি তো পাথরটাকে দেখতে দেখতে, অর কথা শুনতে শুনতে কাঁদিয়া কূল পাইনি সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে কইছি, পাথরের ভিতর কে তুমি, দেখা দাও, বুকে ধরিয়া লিয়া জীবন বাঁচালে যখন, পরিচয় দাও।

শুনিয়া পাথর বলে, নিজের পরিচয় নিজে দিবোনি আমি। আমার পরিচয় খুঁজিয়া লিতে হবে তোকে।

এই অবধি বলে খুদির নির্দেশে দু'ঢোক জল খায় খুদির মা। তারপর পুনরায় শুরু করে।

সেদিন ত কিছোতেই পরিচয় দিলেননি পাথর। কিন্তু ঘর ঘুরিয়া আইসিয়া পরের দিন ফের গেলাম উই থানে, কিন্তু রানীহাঁস দিঘির পাড়ে সেই ঝোপটাকে খুঁজিয়া পাইলাম্‌নি।

দু-একদিনের মধ্যেই স্বপনে তিনি দেখা দিলেন আবের। কী রে, আর কদ্দিন ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়িয়া রইবো আমি?

বলতে বলতে সহসা গুম মেরে যায় খুদির মা। সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে যায়।

খুদি নিজে ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে উপস্থিত সবাইকে চুপ করতে বলে ইঙ্গিতে। তারপর মায়ের মুখের ওপর নিবিড় দৃষ্টি ফেলে পরখ করে কিছু।

একসময় ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব চাপা গলায় বলে, মা-, মা-গো। স্বপনের কথাটা কী বলছিলু যেন?

খুদির মা খুব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় খুদির দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বলে, ইদানীং রোজ রাতে স্বপনের ভিতর আসতেছেন তিনি।

বলি, আমাকে কী কত্তে কও তুমি?

পাথর বলে, আমাকে তুলিয়া লিয়া গিয়া তোর বাড়ির সামনের উঠানে আমগাছটার তলায় পিতিষ্ঠা কর। তোকে দিয়া মাইন্ষের কিছো উপকার কত্তে চাচ্ছি আমি।



সেদিন আকাশে গোলপানা চাঁদটা খুব আলো ছড়িয়েছে। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে খুদির মায়ের উঠোন।

খুদি লক্ষ করে, তারই বেঁধে দেওয়া চালাঘরটিতে বসে আকাশের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে একমনে বিড়বিড় করছে বুড়ি।

খুদি কাছটিতে গিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু একটি বর্ণও বোধগম্য হয় না তার।

একসময় মায়ের গা ঘেঁসে বসে শুধোয়, কী বলছু বিড়বিড় করিয়া? অ মা?

থিরপলকে আকাশের চাঁদটাকে দেখছিল খুদির মা। দেখতে দেখতে একসময় বলে ওঠে, এই চাঁদটাকে কত কাছ থিকে দেখেছি! চাঁদের বাসিন্দা বুড়িটার সাথ কথাও কয়েছি আমি। সে বুড়ির শনের পারা মাথার চুল, মাড়িতে একটাও দাঁত নাই।

খুদির ভুরুজোড়ায় ভাঁজ পড়ে। কথা না বাড়িয়ে সে ঘরের ভেতর ঢুকে যায়।

খানিকবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুদি দেখে, বুড়ি তখনও অবধি বিড়বিড় করেই চলেছে।

খুদি থমকে দাঁড়ায় মায়ের পাশটিতে। বলে, তখন থিকে কার সাথ অত কথা বলতিছু?

খুদির মা বুঝি শুনতেই পায় না।

নাগাড়ে দু-তিনবার একই কথা শুধোবার পর খুদির মা খুদির দিকে মুখ ফেরায়। বলে, কিছো বলতেছিলু বাপ?

—বলতিছি, কার সাথে কথা কইছিস একা একা?

খুদির মা জবাব দেয় না। মৌনী মেরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। একসময় বলে, মা-কালীর সাথ বাপ। একটা কথা জিগাচ্ছিলাম তার পাশ।

শুনে খুদির কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ে। বলে, সত্যি সত্যি মা-কালীর সাথ কথা বলতেছিলু?

—রোজদিনই তো বলি, বাপ।

শুনে খুদির মুখ দিয়ে বাক্যি সরে না। আসলে জমায়েতে সে তেমন কথা জাঁক করে শোনায় বটে, কিন্তু সেটা যে খুদির মা-র জীবনে বাস্তবিক ঘটে চলেছে, এটা জেনে মনে মনে যারপরনাই দমে যায় খুদি।

এরপর খুদির মা-র মধ্যে আরও একটি উপসর্গ প্রকট হতে থাকে। সে মাঝেমাঝেই স্বর্গের অন্য দেবতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে শুরু করে। মূলত শনি ও মঙ্গলবারে তার সঙ্গে কিছু বাছাবাছা ঠাকুরের নাকি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তারা নাকি স্বর্গ থেকে বিদায়কালে খুদির মা-কে পই পই করে বলেছিল, অরে খুদির মা, সাত জনমের পুণ্যের ফলে যখন জীয়ন্তে স্বর্গে আসতে পেরেছু, তখন ফিরিয়া গিয়া বাকি জীবনটা মানুষের উপকার করিয়া কাটিয়া দে।

খুদির-মাকে ইদানীং সেই উপদেশটি খুব বিচলিত করে তোলে। চারপাশে ঘিরে থাকা সই-গঙ্গাজলদের কাছে সুযোগ পেলেই উগরে দেয় সেইসব কথোপকথনের সারাৎসার।

বলে, স্বপ্নের মধ্যে ঠাকুর-দ্যাবতাদের বললম্, বললে তো অন্যের উপকার কর্, কিন্তু কী করিয়া উপকারটা করব? নগণ্য মনিষ্যি আমি, তেমন ক্ষ্যামতা আমার কুথায়?

শুনিয়া দ্যাব্‌তার দল তো হাসিয়া কুটিপাটি। বলে, রামায়ণ পড়ুনি?

বলি, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমি, পড়তে তো শিখিনি, তবে শুনছি কিছো কিছো অঘোর ঠাকুরের বউয়ের থিকে। গোটা শাস্ত্র-পুরাণ উনার কণ্ঠায়।

দ্যাবতারা বলে, রামচন্দর যখন সমুদ্দে সেতু বাঁধছিল, তখন কাঠবিড়ালটি কী কচ্ছিল?

বলি, জানি পর্‌ভু। গোটা গায়ে ধুলা মাখিয়া বাঁধের উপর আইসিয়া ঝাড়িয়া দিত সেই ধুলা। কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে,/লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে।/অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে,/ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে।

শুনে দ্যাবতারা মিচিক মিচিক হাসতে থাকে। বলে, আচ্ছা এবার বল্ দেখি, এই একটা নগণ্যের চাইতেও নগণ্য বেপার, বাল্মীকি এটা লিখতে গেলেন ক্যানে? এটা লিখলে তো রামচন্দ্রের গোঁফে ক-টা চুল, রাবণ তার কুড়ি হাতের শ-আঙুলের নখ ক-দিন অন্তর কাটত, কিংবা সুপ্পনখা তার কাটা নাক-কানের ঘা শুকাইবার তরে কুন পাতার রস লাগাত, কিংবা লক্ষ-কোটি কপিসেনার মধ্যে কুন বাঁদরটি রোজ ক-টা করিয়া পাথর বইতো, তার প্রত্যেকটার ওজন কত, এসবও লেখার দরকার ছিল। তাইলে, এগুলা তিনি লিখলেননি, আর এত-এত কপিসেনার মধ্যে একটা কাঠবিড়ালি কী কল্ল নাই কল্ল, সেটা লিয়া অমন ঢাক বাজালেন ক্যানে?

বলি, ক্যানে পর্‌ভু?

মিচিক মিচিক হাসতে হাসতে দ্যাবতারা বলে, কারণ এটা মোটেই নগণ্য বেপার লয়। কেন কি, পিঠার মধ্যেকার পুরটিকে চিনতে হবে। এই গল্পটি বলিয়া কবি এটাই বুঝাইতে চাচ্ছেন যে, যত নগণ্য জীবই হউক না কেন, মাইন্‌ষের উপকার কত্তে চাইলে কত্তে পারে। সামান্য এক কাঠবিড়ালি হয়্যা সে কিনা সমুদ্দে বাঁধ বাঁধবার বেলায় মদত কল্ল, আর, মানুষ তো দ্যাবতাদিগের ছাঁচে গড়া।

বলি, ঠিক কথা পর্‌ভু। বড় খাঁটি কথা।

দিনের পর দিন এইসব বলতে বলতে খুদির মা বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় তার পরবর্তী কর্মপন্থাটি বেছে নেয়।

একদিন সকালে খুদি মাঝেরপাড়া থেকে খুদির মায়ের ভিটেয় এসে দেখে, মা নেই বাড়িতে।

খুদি এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি করে। একে শুধোয়, ওকে শুধোয়। কিন্তু কেউই তার হালহদিশ দিতে পারে না।

রোজদিন খুব ভোরে উঠে বাহ্যি বসবার জন্য যমুনা খালের দিকে যায় বুড়ি। যমুনা খালে সিনান সেরে ভিজে কাপড়ে ফিরে আসে সূর্যোদয়ের আগেই।এত বেলা অবধি তো তার বাড়ির বাইরে থাকবার কথা নয়।

খুদি মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রায় দু-প্রহর বেলায় ভেজা কাপড়ে খুদির মা ফেরে। হাতে একটা লম্বাটে পাথর। কালো কুচকুচে রং।

খুদি শুধোয়, সাত-সকালে কুথা গেছলু তুই? আমি তো ভাবিয়া ভাবিয়া সারা।

খুদির মা কোনও জবাবই দেয় না। দ্রুতপায়ে চলে যায় চালাঘরের তলায়।

খুদি পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়ায় চালাঘরটার সামনে। বলে, এ পাথর কুথিকে পেলি?

সে কথায় ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে খুদির মায়ের। পাথরটাকে চালাঘরের এক কোণে বসাতে বসাতে বলে, এই মাগিই তো ফি-রাইতে স্বপন দেখাচ্ছিল ক-দিন ধরিয়া।

শোনামাত্তর খুদির সারা শরীরে রোমাঞ্চ! বলে, মা-কালী?

খুদির মা বলে, গেল রাইতে পাকাপাকি হদিশটা দিল। ভোরবেলা গিয়া দেখি, চাকুন্দা ঝোপের মধ্যে শুইয়া শুইয়া ঘুমাচ্ছে মাগি। কী আর করি। রানিহাঁসের জলে সিনান করিয়া মাগির পাশ গিয়া বল্‌লম, অত যদি মাঝির হাতের জল খাওয়ার সাধ হয়েছে, তো চল্। আমি কিন্তু মন্তর-তন্তর কিচ্ছু জানিনি। কী করিয়া পূজা কত্তে হয়, তাও না। বুঝিয়া দ্যাখ্ এই বেলা।

বলতে বলতে খুদির মা দ্রুত হাতে ঘরের ভেতরটা গোবর দিয়ে নিকিয়ে ফেলে।

মায়ের নির্দেশে খুদি ছোটে দিগম্বর সাউয়ের দোকানে বাতাসা কিনতে। যেতে-আসতে যতজনকে পারে, বলে আসে মা-কালীর কথা।

ফলত বিকেল নাগাদ সারা সন্ধিপুর জেনে যায়, স্বপ্নাদেশ পেয়ে খুদির মা একটা কালীমূর্তি এনেছে রানিহাঁসের পাড় থেকে। প্রতিষ্ঠা করেছে বাড়ির লাগোয়া চালাঘরে।

পরের দিন থেকে খুদির মায়ের উঠোনে ভিড় জমে যায় স্বপ্নে পাওয়া কালী ঠাকুরকে দেখতে।

নিজের ভিটেয় মা-কালীকে প্রতিষ্ঠা করবার পর খুদির মায়ের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন দেখা গেল একটু একটু করে।

সবক্ষেত্রে প্রতিবারেই তা আবিষ্কার করতে পারে খুদিই। সে-ই অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকে পরিবর্তনগুলি।

শুধু আবিষ্কার করা নয়, শুধু অন্যদের নজরে আনাও নয়, পরিবর্তন অনুসারে খুদির যা-যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেগুলোও নিজের থেকে নিতে থাকে।

যেমন, খুদি যখন দেখে, তার মা একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে অনেকক্ষণ, খুদি তখন চারপাশের আগন্তুক মানুষজনকে নীরবতা পালনের অনুরোধ জানাতে থাকে। কেন কি, মা ধিয়ান করতিছে। তার জবাবে, ধ্যান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণা নিয়ে, কেউ যদি এমন সংশয় প্রকাশ করে যে, ধ্যান করলে চোখ খোলা কেন, খোলা চোখে কি ধ্যান করা যায়? তার জবাবে খুদি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্নকর্তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, দুনিয়ায় শত কিসিমের ধ্যান-প্রণালী রয়েছে। চোখ খোলা রেখে ধ্যান করাও তেমনি একটি প্রক্রিয়া, এবং তা চোখ বুঁজে ধ্যান করবার চেয়ে ঢের বেশি জটিল প্রক্রিয়া। কেন কি, চোখটি বন্ধ করা মাত্র তোমার সামনে সবকিছু অন্ধকার। তোমার মনঃসংযোগে বিঘ্নসৃষ্টিকারী কিছুই তুমি দেখতে পাচ্ছনি। চোখের ঝাঁপটি পড়িয়ালো মানেই মনের ভিৎরে তুমি একলা। এবার লাও, যত খুশি ধিয়ান কর। কিন্তু চোখ খুলা রাখিয়া ধিয়ান করতিছ মানে, তুমার চারপাশের লোকজন, গাছপালা, আস্তাযাস্তা সব্বাইকে, সবকিছোকে তুমি সারাক্ষণ দেখতে পাচ্ছ। মন-উচাটন হয়, আগল-বাগল হয়, এমন সব দিশ্য দেখতে দেখতেও নিজেকে একলা করিয়া ফেলা, সে এক কঠিন সাধনা। মা আমার সেই সাধনাটাই কচ্ছে।

যেদিন আচমকা বে-মরসুমে খুব বৃষ্টি হল রাতে, খুদি পরের দিনই সবাইকে বলতে লাগল, কাল বিকাল থেকে মা কেবলই বলছিল, ভাসিয়াবে, চরাচর ভাসিয়াবে। আমি কথাটা তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পাচ্ছি, মা আগাম বুঝতে পেরেছিল, বৃষ্টি হবে।

যেদিন কালো দাসের বাচ্চাটা মরে গেল, খুদি বলে বেড়াতে লাগল, তার মা নাকি ক-দিন নাগাড়ে বলছিল, কার কপাল পুড়ল রে! তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতিছি, কালোর বাচ্চাটা মরবে, সেটা আগাম জানতে পেরেছিল বুড়ি।

এইভাবে চারপাশে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই যে খুদির-মা আগাম বুঝতে পারছে, এটা খুদি প্রমাণ করতে থাকে একে একে।

একদিন খুব ঘটা করে খিঁচুনি শুরু হল খুদির মায়ের।

সকাল থেকেই তার চোখমুখে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছিল খুদি। দু-চোখের মণিতে ঘোর।

বেলা যত বাড়তে থাকে, ঘোর-ঘোর ভাবটা ততই গাঢ় হতে থাকে।

একসময় প্রবল খিঁচুনি শুরু হয়। হাতেপায়ে খিল ধরবার মতো অবস্থা। সারা শরীর ভেঙেচুরে অষ্টাবক্র মুনি হয়ে যেতে চায়। চোখের মণি উলটে যায় বারবার। মুখে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকে। খুদি আর পঞ্চমী ওকে প্রাণপণে চেপে ধরেও সামলাতে পারে না।

খবর পেয়ে পাড়া-পড়শিরা ধেয়ে আসে চারপাশ থেকে। ততক্ষণে খুদির মায়ের দাঁত-কপাটি শুরু হয়েছে। তখন কেউ-বা তার মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালতে থাকে। কেউ-বা মুখের মধ্যে গুঁজে দেয় জাঁতির বাঁট, কেন কি, নইলে দু-পাটির চাপে জিব কেটে যেতে পারে।

ঘণ্টাখানেক আছাড়ি-পিছাড়ি খাবার পর একসময় নেতিয়ে পড়ে শরীর। অজ্ঞান হয়ে যায় খুদির-মা। গোটা দিনটা পড়ে পড়ে মড়ার মতো ঘুমোয় বুড়ি।

কিন্তু দাঁতকপাটির পর ঘুমের মধ্যে অনেকখানি সময় কাটিয়ে খুদির মা যখন জেগে ওঠে, একেবারে সুস্থ মানুষের মতো আচরণ তার।

খুদি শুধোয়, অমন দাঁত কিড়িমিড়ি কচ্ছিলে ক্যানে গ-মা?

খুদির মা খুব উদাস গলায় জবাব দেয়, কে জানে বাবু, আমি কিচ্ছোটি জানিনি।

বাস্তবিক, সুস্থ হয়ে যাবার পর খুদির মা আর কিছুই মনে করতে পারে না। খুদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই শুধোয় মাকে। কিন্তু খুদির মা তার একটারও সদুত্তর দিতে পারে না।

সেই দিনই সারা সন্ধিপুরে রটে যায় খুদির মায়ের কথাটা।

বাণীবিনোদ শুনে বলেন, এর নাম হিস্টিরিয়া। নানা কারণে মেয়াদের হয় এটা। খুদি রে, তুই মাকে ডাক্তারের পাশ লিয়া যা।

শুনে খুদির মনে চাপা রোষের উদয় হয়। এই নাস্তিক লোকটা সবকিছুতেই রোগ দ্যাখে।

মনের রাগ মনেই চেপে রেখে বলে, লোকে কিন্তু বলতিছে অন্য কথা। —বলতিছে, মা-র নাকি একটু একটু করিয়া ভর হচ্ছে ইদানীং।

—ভর! বাণীবিনোদের হাসিটা আর গোপন থাকে না। বলেন, কে ভর করিতেছে তোর মায়ের উপর?

—কেউ একটা কচ্ছে নির্ঘাৎ। মাকে তো রোজ রাইতে স্বপ্নে দেখা দেয় মা-কালী। তিনিই ভর কচ্ছেন কিনা, আমার পক্ষে তো বলা সম্ভব নয়। মা জানে।

খুদি এখন দিনের বেশির ভাগ সময়টাই থাকে ওর মায়ের কাছে। খুদির মা যখন বাবুভায়াদের বাড়িতে তার স্বর্গে যাবার গল্প শোনাতে যায়, প্রায় সবক্ষেত্রেই খুদি যায় সঙ্গে। মায়ের যাওয়া, পৌঁছনো, বাবুদের বাড়িতে বসা এবং ওই সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধের প্রতি সারাক্ষণ শ্যেনদৃষ্টি রাখে। মায়ের হয়ে সে নানা কিসিমের তদবির করে। যেমন—তাকে যদি বসবার জন্য চাটাইয়ের আসন এগিয়ে দেওয়া হয়, তবে খুদির-মা তাতে বসে পড়বার আগেই খুদি বলে ওঠে, একটা কম্বল-আসন দউন। মা চাটাইয়ের আসনে বুস্‌বননি। কিংবা মা এনামেলের বা কলাই করা ঘটি-বদনায় জল খাবেননি, কিংবা কলাই করা থালায় ভাত খাবেননি। কাঁসার থালা, নিদেন মাটির হইলেও চলবে। কিংবা চারপাশে খুব ভিড়ভাট্টা হলে সে খুব বিনীত গলায় বলে, মা-জননীরা টুকে পাতলা হউন। মার ইদানীং ভিড়ভাট্টায় মাথা ঘুরে। সেদিন কৈলাশ দন্‌পাটের দোরে মাথা ঘুরিয়া চোখ উলটিয়া...।

এইমতে দিনদিন খুদির খবরদারিটা বাড়ছে। খুদির মা একনাগাড়ে গল্প বলতে থাকলে, খুদি একসময় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, মা, টুকে থামো। দু-ঢোক জল খাও। গলাটা এক্কেরে শুকিয়ে গেছে। এবং খুদির মাও বাধ্য মেয়ের মতো, বাস্তবিক গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, এমনই একটা ভাব দেখিয়ে কয়েক ঢোক জল খায়।

গজেন বিশাইয়ের বাচ্চা ছেলেটার জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না। ডাক্তার-কোবরেজ ফেল মেরেছে। জ্বরের মধ্যে সে বাচ্চা দাঁত কিড়িমিড়ি করতে থাকে রাতের বেলায়।

রানিহাঁস দিঘির পাড়ে গজেনকে একদিন একলাটি পেয়ে বাণীবিনোদ বলেন, বাচ্চাটাকে বেলদায় লিয়া যাচ্ছুনি ক্যানে? অর পেটে কির্‌মি গিজগিজ কচ্ছে।

গজেন মনে মনে বাচ্চাটাকে যখন বেলদার অমল-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথাটা ভাবতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই একদিন খুদির মায়ের আবার দাঁত-কপাটি শুরু হল।

দাঁত-কপাটির পর ঘুম থেকে জেগে উঠে খুদির মা বলে, গজেনের ব্যাটাকে আমার পাশ লিয়া আয়।

—ক্যানে?

—অর জ্বরটা সাধারণ জ্বর লয়।

—তবে?

—কেউ অর জ্বরটা আটকিয়া দিচ্ছে।

পরের দিন সকাল সকাল বাচ্চাটাকে নিয়ে হাজির হয় গজনের বউ। পিছু পিছু গজেন।

বাচ্চাটাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে খুদির মা। একসময় মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে নিজের কোলে শোয়ায়। তারপর তাকে ফুঁকতে থাকে। বিড়বিড় করে কীসব বলতে থাকে, মাঝে মাঝে বাচ্চাটার শরীরে ফুঁ মারে।

আধ ঘণ্টাটাক বাদে আবার বাচ্চাটাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয় খুদির মা। বলে, উত্তর আর পচ্ছিমের জানলা বন্ধ করিয়া রাখবি। অর বিছনার তলায় একটা লোহার জাঁতি, লচেৎ দা, কাতান কিছো একটা দিয়া রাখবি।

গজেনরা চলে যাবার পর খুদি তার মাকে একান্তে শুধোয়, মা, তুই ফুঁকতে শিখলি কুথা? ফুঁকবার মন্ত্রই বা কে শেখাল তোকে?

এমন প্রশ্নে খুদির মা সহসা উদাস হয়ে যায়। জবাব দেয় না।

পরের দিন আবার সকালে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে গজেনের বউ। বলে, কালকের থিকে জ্বরটা কম। রাইতের বেলায় দাঁত-কিড়িমিড়ি করেনি বললেই চলে।

খুদির মা খুব গম্ভীর মুখে বলে, পর-পর ক-দিন ফুঁকতে হবে অকে। আর জ্বর সারিয়ালে মা-কালীর পাশ পূজা দিতে হবে।

বলতে বলতে আচমকা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে খুদির মা। খালি হাতটিকে মুঠো করে বারকয় শূন্যে ঘুরিয়ে এনে যখন মুঠোটা খোলে, হাতের তালুতে একটা মাদুলি দেখতে পায় সবাই।

তখন সেখানে দর্শক বলতে গজেন, তার বউ, আর খুদি।

ব্যাপারটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যে, উপস্থিত সবাই একেবারে থ হয়ে যায়।

খুদির মা মাদুলিটা গজেনের বউয়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে খুব নির্বিকার মুখে বলে, মা-কালীর মাদুলি এটা। মা-কালী স্বয়ং তোকে শূন্য থিক্যা দিলেন। শনি-মঙ্গলবারে পরিয়া দিবি বাচ্চার গলায়। পরাবার সময় মা-কালীর নামে তিন-টাকা বারো আনা তুলিয়া রাখবি আলাদা করিয়া। অসুখ সারিয়া গেলে একদিন আইসিয়া মা-কালীকে পূজা দিয়া যাবি।

গজেন আর ওর বউ এতটাই বিহ্বল ছিল তখন, বিনা বাক্যব্যয়ে ঘোরের মাথায় মাদুলিটাকে নিয়ে তাকিয়ে থাকে খুদির মায়ের দিকে। ফিরে যাবার কথাটা ভুলেই যায় বুঝি।

কথাটা চৈত্রের দাবানলের মতো সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। এব্যাপারে খুদিও একটা বিরাট ভূমিকা নেয়। তার মা যে সাক্ষাৎ মা-কালীর সঙ্গে কথা কয়, এই কথাটা সে সাতকাহন করে রাষ্ট্র করে দেয় সারা এলাকায়।

রাতের বেলায় খুদির মা নিজের কুঠরিঘরে বসে বসে পান সাজছিল। দোক্তাপানের নেশাটা তার ইদানীং বেড়েছে। এখন অবশ্য ওই নিয়ে তার চিন্তা নেই। খুদিই তাকে নিয়মিত পান-দোক্তা-সুপুরি সরবরাহ করে।

কুপির আলোর সামনে বসে পান সাজায় মগ্ন ছিল খুদির মা। একসময় খুদি ঢোকে ঘরে। মাকে একলাটি পেয়ে একান্তে শুধোয়, মাদুলিটা বাস্তবিক কুত্থেকে আইল মা?

—কুত্থিকে আইল মানে? খুদির মা অবোধের চোখে তাকায়।

—মানে, বলতিছি, অটা তো তোর হাতে আগে থাইক্‌তে ছিলনি। খালি হাত তো দেখলাম। তেবে?

খুদির মা বোবার মতো বসে থাকে। পলকহীন তাকিয়ে থাকে খুদির দিকে। ডানহাতটা নিজের গালে বোলাতে থাকে। একসময় হাতটাকে শূন্যে তুলে ধরে বারকয় ঘোরায়। তারপর যখন নামিয়ে এনে মেলে ধরে খুদির সামনে, খুদি দেখে, হাতের তালুতে এক খিলি সাজা পান।

খুদির মা পানের খিলিটা এগিয়ে দেয় খুদির দিকে, লে, খা।

পানটা মুখে পুরে চিবোতে থাকে খুদি। সারা মুখ চাপা হাসিতে ভরে যায় তার। বলে, বুঝলম্।

খুদির মা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। বলে, একটা কথা ছিল বাপ।

খুদি মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

খুব অপরাধীর গলায় খুদির মা বলে, মা-কালী ক-দিন হইল নাগাড়ে স্বপন দেখাচ্ছে। চালাঘরে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা মন্দির গড়িয়া দিতে বলতিছে।

খুদি অবাক হয়ে শুধোয়, তুই তো গেলি যমের বাড়ি। সিখ্‌নে হাজারটা ঠাকুরের সাথ ভেট হইল তোর। কিন্তু মা-কালীর কথা তো বলিসনি কুনোদিনও। সে বেটি আবার কুত্থেকে উড়িয়া আইসিয়া জুড়িয়া বুসলো?

—চুপ মার্। ঠাকুর-দ্যাবতা লিয়া ইলচি করিসনি। খুদির মায়ের দু-চোখে চাপা রোষ ধিকধিকায়।

খুদি থতমত খেয়ে কথা বদলায়। বলে, মন্দির মানে, পাকা না কাঁচা কিছো বলেছে মা-কালী?

—সেটা অবশ্য খোলসা করিয়া কিছো কয়নি। তুই কাঁচারই একটা মন্দির গড়িয়া দে-না। কাঁচা-পাকা লিয়া ঠাকুর-দ্যাবতাদের অত মাথাব্যথা নাই। এসব হইল মানুষেরই ঢাম দেখাবার ছল।

খুদি সামান্য সময় গুম মেরে থাকে। একসময় মৃদু গলায় বলে, দেখি।

পরের দিন থেকেই খুদি আসরে নেমে পড়ে। জনে জনে দুয়োর দুয়োর ঘুরে বলতে থাকে, মা স্বপন দেখছে। মা-কালী আমাদের ভিটায় থিতু হইতে চাচ্ছে। একটা মন্দির গড়িয়া দিতে বলছে।

শুনে মানুষজন বলে, তো গড়িয়া দে। মা স্বয়ং হুকুম করলে গড়িয়া দিতে তো হবেই।

—লচেৎ নিব্বংশ হয়্যাবি।

—তোর ভিটায় আঁটকুড়ির ছাগল চরবে।

—মা-কালীর রোষ হইল এক্কেরে রক্তমুখী রোষ।

খুদি মন দিয়ে শোনে পাড়াপড়শির এবংবিধ উপদেশমালা।

একসময় খুব মিনমিনে গলায় বলে, গড়িয়া দিতে তো পারতাম। কুঁড়িয়া-ঘর হোক, ঝুপড়ি-ঘর হোক, একটা কিছো বানিয়া দিতাম কষ্টেসিষ্টে। কিন্তু মা যে স্বপনে হুকুম জারি করেছেন, পাড়াপড়শি দশজনের থিকে মাগিয়া-যাচিয়া মন্দিরটা গড়তে হবে। একলার টাকায় গড়া চলবেনি। কেন কি, মা তো আর কোনও একজনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি লয়। তিনি সারা দোনিয়ার সক্কলের মা। আমার মা কইল, এ কী হুকুম দিলি তুই রক্তখাকী, আমার কথায় তারা তোর মন্দিরের তরে টাকা দিবে ক্যানে?

মা-কালী তাব জবাবে বলেছে, তুই চাইয়া দ্যাখ না। তারপর যে না দিবে তার তরে তো আমি আছি।

শেষের কথাটা শুনে এতক্ষণে বুকের মধ্যে সামান্য ধুকপুকানি শুরু হয় পাড়াপড়শির। হামলে পড়ে বলে, কী আশ্চর্য, আমি কখন বললাম, দিবোনি?

—না, তা অবশ্যি বলনি, তবে ওই যে বললে না, খুদিয়া তুইই বানিয়া দে মন্দিরটা। শুনিয়া যে-কারোর মনে হইতে পারে যে, তুমার টাকা দিবার ইচ্ছা নাই।

—শালা, এই কথা থিকে ওই বুঝলি তুই? বিকালবেলায় দুয়ারে যাবি। ধানে লিবি না লগদায়?

—সে তুমি যেভাবে দিতে চাও। মা-কালী সে লিয়া কিছো বলেনি।

জনসাধারণের পয়সার একটা অংশ দিয়ে খুদি চালাঘরের জায়গায় একটা মাটির দেয়াল আর টালির চাল দেওয়া মন্দির বানিয়ে দেয়। একটা টিনের কপাটও লাগিয়ে দেয় দরজায়। বাকি টাকা দিয়ে নিজের ঘরটাও সারিয়ে সুরিয়ে নেয়। একদিন বেলদা বাজারে গিয়ে বউ আর ছেলেপুলেদের জন্য জামাকাপড়ও কিনে আনে।

গজেনের বাচ্চাটা পুরোপুরি সেরে যাওয়ায় সারা এলাকা জুড়ে একটা তীব্র শোরগোল পড়ে যায়।

ফলে, খুদির মায়ের উঠোনে পাপীতাপী মানুষের ভিড় একটু একটু করে বাড়তে থাকে। চারপাশের গাঁ-গুলোর থেকে মানুষজন এসে খোঁজ করে। পুঁটিবুড়ির কালীর থানের তত্ত্বতালাশ নেয়। ফলে, দেখতে দেখতে কালীর থানটি প্রথমে 'পুঁটিবুড়ির কালীর থান' ও পরে 'পুঁটিয়া-কালীর থান' হিসেবে পরিচিত হয়।

যদিও এব্যাপারে খুদির মনোগত ইচ্ছাটি ছিল অন্যরকম। সে চেয়েছিল, তার পৈতৃক ভিটেটি 'পুঁটিয়া-কালীর থান' না হয়ে 'খুদির-মার থান' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক। কেন কী, এতে করে থানটির সঙ্গে তার নিজের নামটাও থেকে যাবে চিরকালের মতো।

সেই প্রথম থেকেই খুদির মাকে কেউ পুঁটিবুড়ি বলে ডাকলেই খুদি খেপে যেত। বলে, পুঁটিবুড়ি কী? যদি ডাকতে হয় তো ভালো নামে ডাক, নচেৎ যেভাবে ডাকিয়া আসতিছ চিরকাল, খুদির-মা, ওই নামেই ডাক।

মানুষজন শুধোয়, বুড়ির ভালো নামটা কী বটে?

খুদি গলায় খুব গুমোর ফুটিয়ে বলে, কাত্যায়নী।

বাস্তবিক, খুদির মায়ের যে এমন একটা পোশাকি নাম রয়েছে, তা বুঝি কেউই জানত না। খুদির মুখে নামটা এই প্রথম শুনে চোখ কপালে তুলে তাকায় মানুষজন। বলে কী! এমন একটা রাশভারী নামও ছিল নাকি খুদির মায়ের!

বিস্ময় প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাই বলে ওই নামে ডাকে না কেউই। শেষ অবধি 'খুদির মা'-ও পরিত্যক্ত হয়, এবং টিকে যায় পুঁটিবুড়ি নামটি। সেই সূত্রে খুদির বানিয়ে দেওয়া মন্দির এবং সংলগ্ন উঠোন-এলাকাকে সবাই 'পুঁটিয়া-কালীর থান' বলেই ডাকতে শুরু করে। ওই নামটিই শেষমেশ থিতু হয়।

সব মিলিয়ে টালি-ছাওয়া মেটে বাড়িটা সত্যি সত্যি একটা মন্দিরের আদল পেয়ে যায় এবং দিনদিন সেই মন্দিরের সামনে মানুষের ভিড় বাড়তেই থাকে। ফলে, খুদির সংসারে অকস্মাৎ আমদানিটা আরও বেড়ে যায়।

দেখেশুনে একদিন সন্ধিপুরে ঢোকার মুখে টিনের ওপর চুন দিয়ে 'পুঁটিয়া-কালীর থান এই রাস্তায়' লেখা একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয় খুদি।

খুদির বানিয়ে দেওয়া মন্দিরের দাওয়ায় বসে খুদির মা ইদানীং দিনভর বিড়বিড় করে কীসব বলতে থাকে।

বলে, 'আছে কাজ, তো সকাল সকাল সাজ'। বেশি বেলা হয়্যালে কাজ শেষ করবি কখন?

উঠোন জুড়ে বসে রয়েছে অর্থী-প্রার্থীর দল। যে-যার এক-একটি ব্যথার জায়গা নিয়ে এসেছে ওরা দূর-দূর থেকে। জলদি জলদি ফেরার তাড়া রয়েছে তাদের। কিন্তু তাই বলে খুদির মাকে থামতে বলবে কে!

খুদির মা বলে, সকালবেলাটা সংসারের হাজার মজাতে মজিয়া থাকে যারা, তারা শেষমেশ আট আনার ফলার খায়্যা দু-টাকার ঘটিটি হারাবেই। এ দোনিয়া দু-দিনের বেশি লয় বাপ।

বলতে বলতে উপস্থিত সবাইয়ের মুখের ওপর একে একে দৃষ্টি ফেলে সে। শুকনো মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় বলে, 'আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জনা পাঁচ-সাত,/যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত'।

বুড়ির মুখের শোলোকটি শুনে উপস্থিত সকলেই যে-যার ব্যথার জায়গাটিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠে, আর, চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে থাকে, কখন বুড়ি ওদের ব্যথা-বেদনার তত্ত্বতালাশ নিতে শুরু করে। কেন কি, আগন্তুক মানুষগুলি জানে, এইভাবে ভাবের কথাগুলি আওড়াতে আওড়াতে বুড়ি একসময় হাত ঘুরিয়ে আকাশ থেকে এনে দেবে একটি মাদুলি। ধরে দেবে উঠোনে

বসে থাকা কোনও এক ভাগ্যবানের হাতে।

কাজেই, অখণ্ড ধৈর্য সহকারে বসে থাকে মানুষগুলি। ক্ষণ গুনতে থাকে।

ততদিনে খুদির মায়ের ফি শনি-মঙ্গলবার ভর হচ্ছে। ওইদিনগুলোতে একেবারে কাকডাকা ভোরে উঠে চান সেরে নেয় খুদির মা। একটি রক্তবর্ণ থান পরে নেয়। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকে, ততই তার চোখমুখের ভাবগতিক বদলে যেতে থাকে। দু-চোখে ঘোর জমতে থাকে। মুখের বাক্যি একটু একটু করে লোপ পেতে থাকে।

দু-ঘড়িটাক বেলায় খুদির মা মন্দিরে ঢুকে পড়ে। খুদিও ততক্ষণে চান সেরে তৈরি। মা ঢুকে গেলে পর সে মন্দিরের দরজাটা আলতো ভেজিয়ে দেয়। নিজে একটি কম্বল আসনে বসে পড়ে মন্দিরের বাইরের দাওয়ায়। সামান্য তফাতে বসিয়ে দেয় একটি সিঁদুরে রাঙানো মাটির ঘট।

খুদির মা মন্দিরের ভেতরে বসে বসে কী করে, বাইরের মানুষজন তা দেখতে পায় না। জিজ্ঞেস করলে খুদি বলে, মা ধিয়ান কচ্ছেন। ধিয়ান ভাঙলে নিজেই জানান দিবেন। ততক্ষণ ধৈয্য ধরতে হবে।

তারপর সে উপস্থিত অর্থী-প্রার্থীদের মধ্যে সিলিপ বিলি করে। সিলিপের নম্বর ধরে ডাক পড়বে।

একসময় দরজার গায়ে মৃদু টোকা পড়ে। খুদি বুঝে ফেলে, মায়ের 'ধিয়ান' ভেঙেছে।

মন্দিরের চারপাশে সমাগত মানুষজনকে একেএকে ডাকতে থাকে।

এক নম্বর সিলিপওয়ালা মানুষটি এসে খুদির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে।

খুদি দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েঁ বলে ওঠে, মা, এই লোকটি কী কারণে এসেছে?

ভেতর থেকে খুদির মা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে. কিন্তু তা বাইরের কারোর কাছেই বোধগম্য হয় না। কেবল খুদিই বুঝতে পারে সেকথার মর্ম।

সে আগন্তুক মানুষটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, মা বলতিছেন, তোমার কোনও বিষয়ে মনে বড় কষ্ট। ঠিক কিনা?

—ঠিক।

—মা, লোকটির কীসের কষ্ট? কী বলতিছ? কেউ ক্ষতি করবার চাচ্ছে?

শুনো, কেউ তুমার ক্ষতি করবার চাচ্ছে। ঠিক কিনা?

—ঠিক।

—মা, যে ক্ষতি করবার চাচ্ছে, তার নাম কি? কী বলতিছ? তার নামের প্রথম অক্ষর 'দ'? নামের প্রথম অক্ষর দ, এমন কুনো পড়শি আছে নাকি তুমার?

—বুঝতে পারছি। আর বলতে হবেনি। দয়াল বাগকে আমার পরথম্ থিকেই সন্দেহ হচ্ছিল। শালা সারাটা জীবন আমার সাথ শত্তুতা করিয়া গেল।

—মা, এই লোকটি তাইলে বাঁচবে কী করিয়া? একটা উপায় তো বাতলাইতে হবে মা। হ্যাঁ, কী বললে? একটা গুরুমুখী কবচ ধারণ কত্তে হবে? বলতে বলতে অর্থীর দিকে তাকায় খুদি, মা বলতেছেন, একটা গুরুমুখী কবচ ধারণ কত্তে হবে।

—কত পড়বে? লোকটি শুধোয়।

—পড়াপড়ি নয়। কিনাবেচার দোকান খুলেছে নাকি মা? এ হইল মা-কালীর আশীর্বাদ। যে-যার ইচ্ছামতো মাকে পূজা দিবে। যার যা দিবার ইচ্ছা, এই ঘটের মধ্যে দিয়া যাও। ওই দিয়া মায়ের আরাধনা হবে।

এইমতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে শেষ হয় খুদির মায়ের কবচ-মাদুলি বিতরণ পর্ব। শেষ ব্যক্তিটি চলে গেলে পর খুদি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। মাটির ঘটটি নামিয়ে দেয় মায়ের কাছে।



খুদির মা বলে, 'অতি সাধ', 'অতি বিষাদ'।

মাইন্‌ষের তো জীবনে সাধ-আহ্লাদের ইয়ত্তা নাই বাপ। পারলে পুরা দুনিয়াটাকে গিলিয়া ফেলবার চায়। আর, সেইসব সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার তরে কী-কী নাই করে! চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি...। সম্পত্তির লোভে ভাই ভাইকে মারতিছে। তাতে কি তার লোভের তোরঙ্গটি ভরে? কখ্‌খনো ভরবেনি। বরং এক লোভ তাকে অন্য লোভের দিকে টানিয়া লিয়া যাবে। মানুষ সম্পত্তি সম্পত্তি করে, কিন্তু সম্পত্তির সুখ যত, হ্যাপা তত। আগুন পুহাতে গেলে ধুঁয়া তো সইতে হবেই বাপ। সেই বলে না, লোভে পাপ, পাপে মিত্যু। মানুষ জাতটাকে তাইলে কে বাঁচাবে বাপ?

শ্রোতার দল মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে থাকে। আর অল্প অল্প সমর্থনে মাথা দোলায়।

ইদানীং শনি-মঙ্গলবার বাদে, অর্থাৎ যেদিন খুদির মায়ের 'ভর' হয় না, খুদির মা মন্দিরের চিলতে দাওয়ায় বসে এহেন জ্ঞানের কথাগুলি বলে চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অর্থী-প্রার্থীর দল বসে বসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে। আর তখনই তাদের মনের মধ্যে প্রত্যয়টা আর দৃঢ় হয়, কিনা মাঝি জাতের নিরক্ষর মেয়া, সে কিনা বাবা-অবতারদের পারা গেয়ানের কথা আউড়াচ্ছে! কে জোগাচ্ছে এসব কথা খুদির মায়ের জিভ্‌ভায়?

খুদির মা বলে চলে, যিনি জুগাবার মালিক, তিনি ঠিক জুগাবেন। যিনি দিনকে রাইত করেন, যার কির্‌পায় বোবারা কথা কয়, খোঁড়া-ল্যাংড়ারা পাহাড় টপকায়, তিনিই মানুষকে সবকিছো দ্যান। যাকে যখন দিবার দ্যান। যতটুকু দিবার দ্যান। তাই লিয়াই সন্তুষ্ট রইতে হবে।

এতদ্দারা উপস্থিত সবাই বুঝে ফেলে, সেই তিনিই খুদির মার জিহ্বায় নিত্যিদিন জোগাচ্ছেন অমন ভাবের কথা।

খুদির মা বলে, তাঁর কির্‌পা না পাইলে শিবের বউ পার্বতীকেও বাপের বাড়িতে আত্মহত্যা কত্তে হয়। কিনা, 'অতি সাধের পার্বতী,/তার কপালে দুর্গতি'। রাজার ঝি সে, অদ্দিষ্ট খ্যারাপ হইলে তারও লিস্তার নাই। অদ্দিষ্টের উপর মাইন্‌ষের হাত নাই বাপ। সেই বলে না, 'অদ্দিষ্টের কিল পুতেও কিলায়'।

ইদানীং মায়ের কল্যাণে আমদানিটা ভালোই হচ্ছে খুদির। রোজই দু-দশজনের পায়ের ধুলো পড়ছে খুদির মায়ের দাওয়ায়। মায়ের মানসিক শোধ করতে আসছে উপকৃত মানুষজন। নগদের পাশাপাশি সিধেপাতিও আনছে তারা।

খুদির মা সেসব নিজের হাতে স্পর্শ করে না। বলে, যার তরে আনছু, তার পায়ের তলায় দিয়া দে।

লোকজন চলে গেলে পর খুদিই সেসব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখে। মায়ের অনুমতি নিয়ে কিছুটা গামছায় বেঁধে 'বুড়ির নাতি'-টার জন্য নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে খ্যাঁদাকে এনে বসিয়ে দেয় বুড়ির কোলে। খুদির মা 'না' করে না। বরং কচি বাচ্চাটাকে কোলে পেয়ে ওর সারা মুখ কেমন জানি নরম হয়ে ওঠে। চোখের জমিন ছলোছলো লাগে। সিধেপাতির থেকে একটা আস্ত নাড়ু এনে ধরে দেয় খ্যাঁদার হাতে।

দেখতে দেখতে খুদির প্রাণ গলে জল হয়ে যায়।

ইদানীং খুদির-মা রোজ রাতে স্বপ্ন দেখে। ফি-রাতে নতুন-নতুন স্বপ্ন। মা-কালীই স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে রোজ। খুদির-মার খোঁজখবর লিচ্ছে। উপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছে। সেইমতো খুদির-মায়ের জীবনযাপন প্রণালীটাই বদলে যাচ্ছে দিনদিন।

খুদির মা ইদানীং খুব সাদা ভাষায় খুব গভীর ভাবের কথা বলছিল। অনেকটা রামকৃষ্ণের আদলে। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তার মধ্যে এমন গভীর ভাবের উদয় দেখে ওয়াকিবহাল মহল এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, ও নিজে বলছে না এসব। ওপর থেকে কেউ ওসব বলাচ্ছে ওকে দিয়ে।

খুদির মায়ের কাছে যতই লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে, সন্ধিপুরের গরিব-গুরবোদের কপাল ফিরতে থাকে ততই।

পাঁচিয়াড় থেকে সন্ধিপুর না-হোক চার কিলোমিটার পথ। এতকাল একটা মাত্তর ভ্যান ছিল মন্থেন শীটের। দেখতে দেখতে চটজলদি ভ্যান কিনে ফেলল আরও অনেকেই। সেই ভ্যান দিনভর পাঁচিয়াড় থেকে প্যাসেঞ্জার বয়ে আনে। আবার পাঁচিয়াড়ে পৌঁছে দিয়ে আসে। শনি আর মঙ্গলবারে বেচারাদের নাওয়া-খাওয়ার সময় মেলে না।

মাস ছয়েক আগে খুদির বাড়ির সামান্য তফাতে একটা পান-বিড়ির গুমটি খুলেছিল মাধব দাস। আজ সেখানে না-হোক পাঁচ-সাতটা চা-বিস্কুট, মুড়ি-চানাচুর, তেলেভাজা আর মিষ্টির দোকান গজিয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে লব সাউ একটা ভাত-তরকারির গুমটি বানিয়ে ফেলল। দিনের প্রথম প্রহরে আগন্তুকরা ভাতের অর্ডার দিয়ে মন্দিরে ঢোকে। পূজা-আচ্চার কাজ মিটলে পর ভাত খেয়ে বিদায় নেয়। দুটো শনি-মঙ্গলবার বিকিকিনির ভাবগতিক দেখে লব সাউ দুটো ছোকরা মোতায়েন করেছে রান্নাবান্না, পরিবেশন করার কাজে। লক্ষণ বারিকের বউকে রেখেছে এঁটো বাসনকোসন মাজবার কাজে।

তাবাদে, পান-বিড়ির দোকানিরা ইদানীং ধূপ-ধুনোর মজুত রেখেছে দোকানে।

দেখেশুনে রাতারাতি গুমটি বানিয়ে একটা মনিহারির দোকান ফেঁদে বসে খগেন দলাইয়ের বড় ব্যাটা বলরাম। তাতে ফিতে-কাঁটা, আয়না-চিরুনি, তেল-সাবানের পাশাপাশি ধূপ-ধুনো, প্রদীপ-সলতেও রাখে।

হরিদাস পয়ড়া, খুনের কেসের আসামী হয়ে দীর্ঘদিন ফেরার ছিল সে, সবকিছু ধামাচাপা পড়ে যাবার পর বছরটাক থিতু হয়েছে গাঁয়ে, মন্দিরের সামান্য তফাতে চট বিছিয়ে সাজিয়ে বসে তামার মাদুলি, কবজ, কালো সুতো আর মা-কালীর খুদে মূর্তি। বিক্রিবাটা ভালোই হচ্ছে তার।

একটা জায়গায় এত মানুষের জমায়েত হলে এবং সেখানে খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা থাকলে যা হয়, একপাল কুকুর এসে ঠাঁই নেয় পুঁটিয়া-কালীর থানে। আসে-যায়, খেয়ে-দেয়ে ভেগে যায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে যায় উচ্ছিষ্টের আশায়। তার মধ্যে একটা কালো মর্দা পাকাপাকিভাবে থিতু হয় মন্দিরের সামনে। দিনভর মন্দিরের দোরগোড়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আর খুদির মাকে দেখলে জোরে জোরে লেজ নাড়াতে থাকে।

খুদি দিনকয় ওকে লাঠি মেরে ভাগাতে গিয়েছিল। একদিন খুদির মা-ই বারণ করে ওকে। বলে, থাকু, তাড়াইস্‌নি। এমনি-এমনি আসেনি উ। উপরওয়ালার খেলা আছে এর মধ্যে। লচেৎ এতগুলা কুত্তা আসে, খায়-দায়, উদের মধ্যে এইটাই বা পাকাপাকি ঠাঁই ধরল ক্যানে?

মনে মনে বিরক্ত হলেও খুদি বাধ্য হয়ে নিরস্ত হয়। তাই দেখে কেলোটা আরও জাঁকিয়ে বসে।

একদিন মা-কালীর থেকে আরও একটা স্বপ্নাদেশ পায় খুদির মা।

মা-কালী ওকে স্বপ্নে বলেন, অরে পুঁটি, আমার মন্দিরের সামনে একটা মেলা কর্‌। কার্তিকের অমাবস্যায় সে মেলা শুরু হবে, একটা শনিবার ও একটা মঙ্গলবার চলিয়া সে মেলা শেষ হবে। তার নাম হবে পুঁটিয়া-কালীর মেলা।

খুদির মারফৎ সে খবর পেয়ে যায় সন্ধিপুরের মানুষ। ফলে, মূলত খুদি আর গজাননের উদ্যোগেই মেলার প্রস্তুতিপর্বটি নির্বিঘ্নে এগোতে থাকে।

খুদির মায়ের নামে যে-হপ্তায় মেলাটা বসল, সেই হপ্তায় আমি সন্ধিপুরে গিয়েছিলাম।

বিকেলের দিকে পায়ে পায়ে গেলাম। খুদির মায়ের ভিটার সামনে তখন হাজার মানুষের ভিড়। আবেগে ভরপুর সেই মানুষগুলো খুদির মায়ের নামে মুহুর্মুহু গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল।

শুনতে শুনতে মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় সহসা। মাঝি জাতের মেয়ে হয়েও খুদির মা যে সম্মানটা পাচ্ছে, তার শতগুণ বেশি অপমান নিয়ে মরতে হয়েছে আমার মাকে।

ভাবতে ভাবতে খুদিকে আমার চেয়ে ঢের ভাগ্যবান বলে মনে হয় আমার।

খুদির মায়ের এই উত্থানকে এলাকার কোনও বামপন্থী দলই ভালোভাবে নেয়নি।

তারা এর বিরুদ্ধে হুইস্পারিং ক্যাম্পেন জুড়েছে। যুব ফেডারেশনের লোকাল শাখা থেকে শচীন দাসের নেতৃত্বে ওই নিয়ে বিডিও-র কাছে একটা ডেপুটেশন ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছে ওরা। পরবর্তী কর্মসূচি, সন্ধিপুরে গিয়ে একটা মিটিং করা। মিটিংয়ের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছে। সেই মোতাবেক হাই কমান্ডের নির্দেশে শচীনদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। ইতিমধ্যে পোস্টার মারা শেষ।

যদিও বাণীবিনোদ কস্মিনকালেও বামপন্থী নন, বরং বামপন্থীদের তিনি ঘোর সমালোচক, তবু দক্ষিণপাড়ার শচীন দাসের দল বাণীবিনোদের ভারী ন্যাওটা। তারা সব আজকের যুগের ছেলে। স্কুল-কলেজে পড়ে কিংবা পড়া শেষ করে বাড়িতে বসে থাকে। রানিহাঁস দিঘির পাড়ে বসে আড্ডা, গুলতানি মারে। আর সরকারের নিন্দেমন্দ করে সময় কাটায়। বলে, বেকার ছেলেদের একটা পিয়োনের চাকরিও দিতে পারে না যে সরকার, তার গদিতে বুসিয়া রইবার কোনও অধিকারই নেই।

কথাগুলো এ-কান ও-কান ঘুরে যখন গজাননের কানে আসে, সে অতিমাত্রায় পুলক বোধ করে। কেন কি, খুব সম্প্রতি সে রুলিং পার্টির থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন কোথাও মাথা মুড়োবার কথা ভাবছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের কেশিয়াড়ি শাখায় গিয়ে নীলকমল দাসের সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

নীলকমল ওকে শলা দিয়েছে, এক-আধজনাতে তো আর পার্টি করা যায় না। চারপাশে অন্তত কিছু লোক জুটাও। তারপর আমরা একদিন গিয়া মিটিং করিয়া আইস্‌বো।

—দিদিকে আনা যাবে? গজানন গাছে না উঠতেই এককাঁদির স্বপ্ন দেখতে থাকে।

—দিদি? নীলকমল একটুখানি ভাবে। আড়নয়নে তাকায় গজাননের দিকে। বলে, কত লোক জুটাতে পারবে দিদির মিটিংয়ে?

গজানন একটা মুখে মুখে হিসেব কষে নিয়ে বলে, তা পঞ্চাশ-ষাট হয়্যাবে।

নীলকমল কটমট করে তাকায় গজাননের দিকে। খর গলায় বলে, পঞ্চাশ-ষাটজন লোক দেখলে দিদি হয় ওইখানেই ফিট হয়্যাবে, লচেৎ আমাকে থানা সম্পাদকের পোস্ট থেকে তৎক্ষণাৎ ডিসমিস করিয়া দিবে।

শেষ অবধি গজাননের পিঠে একটা উৎসাহব্যঞ্জক চাপড়ানি সহকারে বলে, আরে, সংগঠনটা তো আগে গড়, পরের কথা পরে।

সেই সূত্রে গজানন ইদানীং শচীনদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে সুযোগ পেলেই। ছোকরাগুলোর হাহাকার কানে গেছে তারও।

বলে, লতুন চাকরি! তোরা হাসালু বাপ। যারা চাকরি কত্তিছে, এদের রাজত্বে তাদের চাকরিগুলাই থাকে কিনা দ্যাখ্। সাধে কী আর আমি পার্টিটা ছাড়লাম! দিদি অবশ্য সাফ বলিয়া দিছে, রাজ্যের সব বেকারের চাকরির দাবিতে আর মুসলমানদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চাকরির দাবিতে খুব শিগ্‌গির ধর্মতলায় অবস্থান কর্মসূচি লিবে।

—কবে আর লিবে! ব্রজেন বাগ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে, এদিকে গোঁফদাড়ি অবধি পাকতে চল্‌ল যে।

—দিদি তো এখন ইখ্‌নে নাই। দিল্লিতে। দিল্লি থিকে ফিরিয়া আইলেই কর্মসূচিটা শুরু হবে।

—খালি তো কর্মসূচির কথাই বলতিছ তখন থেকে, চাকরিটা কবে জুটবে, সেটা বল না, শুনি।

গজানন বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্য ফাঁসে পড়া মুষাটি। পরমুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, দিদির রোখ তো তোরা জানু। যা একটিবার ধরে, এক্কেরে কচ্ছপের পারা আঁকড়িয়া ধরে। চাকরি না হবা অবধি ছাড়বে ভাবছু?

এতক্ষণে আসল কথাটি উত্থাপন করে সে, সবচে' ভালো হয়, যদি একটা মিটিং করা যায়। কেশিয়াড়ির নীলকমল দাসের সাথ আমার কথা সারা। সে আইস্‌বে। কথা দিয়েছে। মিটিং থিকেই আমরা দিদির পাশ একটা দাবিপত্র পাঠাব। মাস পিটিশন। এলাকার সব বেকারের সই থাইক্‌বে তাতে।

ভবিষ্যতে চাকরির বন্দোবস্ত হইলে আমাদের এলাকার দাবিটা থাকবে সবার আগে।

স্কুল কলেজে পড়া ছোকরা সব। গজাননের কথার অসারত্ব তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে।

কেশব বলে ওঠে, ধুশ, চাকরি তো দিবে রাজ্য সরকার, দিদির কাছে মাস পিটিশন দিয়া কী হবে?

—তুমি বলতে চাও, দিদির পাশ দেওয়া মাস পিটিশন ধরিয়া ধরিয়া চাকরি দিবে রাজ্য সরকার?

—দিদি নিজের রেল-মন্ত্রীত্বটা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইল, আর এখন কিনা চাকরির দাবিতে অবস্থান করবে!

—সত্যি, মন্ত্রীত্বটায় থাকলে অন্তত কিছো বেকারের হিল্লে হইলেও হইতে পার্‌থো।

—সেটা ছিল একটা নীতির প্রশ্ন। গজাননের ভুরুজোড়া ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে কপালে ঠেকে যায়, নীতির প্রশ্নে দিদি বেজায় কড়া। কোনও কিছুর সাথ সমঝোতা করবেনি।

শচীনরা এমনিতেই রুলিং পার্টির যুব শাখায় ওপর-ওপর রয়েছে। মিটিং-মিছিলে যায়-টায়। যুববার্তাও চাঁদা করে কেনে একখানা। কিন্তু সবকিছু ওপর-ওপর। চাকরি-বাকরির প্রশ্নে মনে মনে চটে রয়েছে সরকারের ওপর। তার চেয়েও বেশি পার্টির স্থানীয় নেতা সুবল মণ্ডল, ধনপতি হাজরা, কৃত্তিবাস দাসদের ওপর, যারা কিনা ইতিমধ্যেই নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের এখানে-ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাজার ফিকিরে। ফলে, পার্টিতে তাদের দেহটা রয়েছে, মনটা কেবলই চাকরির সন্ধানে হেথা-হোথা উড়ে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ কথা বলেই গজানন বুঝে ফেলে, এরা সব একালের চালাক পাখি। সহজে ডাল বদলাবে না। কেন কি, এতে করে তাদের একূল-ওকূল দু-কূলই যাবে।

কাজেই, বারকয় বুঝিয়ে-টুঝিয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেয় গজানন।



খুদির মা বলে, এই দেখতিছু চোখের সুমুখে গাছপালা, মাঠঘাট, মাথার উপর আকাশ, গোটা বিশ্ব-বম্মাণ্ড, চোখটি বুজিয়া ফ্যাল, আচমকা তোর চোখের সামনে কিচ্ছোটি নাই। শুধু ঝিম আঁধার। সত্যি কি আর নাই? আছে, তবে তুই দেখতে পাচ্ছুনি, কেন কি, তুই চোখ বুজিয়া রইছু। শরীরে লিত্যিদিন কতই না জ্বালাযন্তন্না, কিন্তু হাসপাতালে যখন পেট কাটিয়া বাচ্চা বের করে, কিংবা শরীলের ইখেনে-সিখেনে কাটিয়া চিকিচ্ছা করে, রোগী তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে না। কেন কি, জ্বালাযন্তন্না বুঝবার ক্ষমতাই হরণ করিয়া লেয় ডাক্তার। তো, মা-কালীর শরণ নিলে মা দয়া পরবশ হইয়া মাইন্‌ষের হরেক কিসিমের জ্বালাযন্তন্না হরণ করেন। এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া আছু তুই, অথচ দুনিয়ার জ্বালাযন্তন্না তোকে ভোগ করতে হচ্ছেনি, এর চাইতে সুখের বেপার আর কী আছে, বল্‌? তার মানে, মত্তে রইয়াও তোর স্বপ্নবাস চলতিছে, কেন কি, স্বপ্নে দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্তন্না বলিয়া কিচ্ছোটি নাই। দুনিয়ার সাধুসন্তগুলানকে দেখিয়া বুঝুনি? তাদের কুনো দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্তন্নার বোধই নাই। মাগিয়া-যাচিয়া খায়, কপনি পরে, কিন্তু মনের মধ্যে অপার সুখ। মা-কালীর কাছে আমি তো রোজদিনই আজ্জি জানাই, জমিজিরাত, টাকাপইসা কিচ্ছো চাই না, শুধু আমার শরীল থিক্যা বেথাবেদনা জ্বালাযন্তন্নাগুলা হরণ করিয়া লও মা।

—মা শুনে তুমার কথা?

—ক্যানে শুনবেনি? সে হইল মা। মা কখনও সন্তানের আজ্জি না শুনিয়া পারে? তাবাদে, মা-কালী যখন কারোর অঙ্গে ভর করেন, তখন তার শরীলের যাবতীয় বেথাবেদনা তো তাঁর অঙ্গে গিয়া লীন হয়্যা যায়। আমি তো নিজের শরীল দিয়া অষ্টপ্রহর বুঝতে পারি সেটা।

বলতে বলতে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ব্যাপারটা হাতেনাতে করে দেখিয়ে দেয় খুদির মা। সর্বসমক্ষে শরীরের এখানে ওখানে অবলীলায় বাবলা কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়, কিন্তু তার জন্য খুদির মায়ের চোখেমুখে তিলমাত্র ব্যথাবেদনার রেশও দেখতে পায় না কেউ। তিলমাত্র বিকার থাকে না। বরং তার সারা মুখমণ্ডল এক ধরনের প্রশান্তিতে ভরে যেতে থাকে। এমন নির্বিকার

ভাব করে কাঁটাগুলো ফোটাতে থাকে শরীরের এখানে-ওখানে, যেন শরীরটা ওর নিজের নয়। যেন অন্যের শরীরে কাঁটা ফোটাচ্ছে।

উপস্থিত মানুষজন ভুলভুল চোখে দেখতে থাকে দৃশ্যটা। দৃশ্যত শিউরে ওঠে। বলে, তুমার লাগছেনি পুঁটি-মা?

খুদির মা নিঃশব্দে হাসে, লাগবে কী রে? আমার শরীলে বিঁধছে নাকি কাঁটা?

—তেবে?

খুদির মা সারা মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলে, যার শরীল, যার কাঁটা, তার লাগছে, আমার কুন্ কচুপুড়াটি! বলেই আড়চোখে মিটিমিটি তাকায় মা-কালীর মূর্তির দিকে। ঠোঁটের কোণে গুনগুনিয়ে ওঠে গানের কলি, তুমারি দিয়া বুকে তুমারি দিয়া দুখো,/তুমারি দিয়া প্রাণে তুমাকে অনুভোব...।

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে চক্ষু কপালে উঠে যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের।

ইদানীং রোগ-জ্বালায় মানুষজন ওর দুয়ারে এলেই খুদির মা গায়ে কাঁটা বেঁধাবার জন্য উশখুশ করতে থাকে।

মিনমিনে গলায় বলে, অ খুদিয়া, একটা বাবলা কাঁটা ভাঙিয়া আন্ তো বাপ, মুখপুড়ি শরীলের মধ্যে বড্ডো রগড় জুড়েছে।

ব্যাপারটা খুদিকে যারপরনাই বিস্মিত করলেও অল্পদিনের মধ্যেই সে সামলে নেয়। তখন খুদিই তার নিজের মতো করে জলের পারা বুঝিয়ে দেয় উপস্থিত মানুষজনকে, কিনা, বুড়ির শরীরের মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছে মা-কালী। বুড়িকে সম্ভবত এখানে-ওখানে চিমটি কাটছে। বুড়িও তাই মা-কালীকে কাঁটার খোঁচা মেরে জবাব করতে চাইছে।

এমন অলৌকিক ব্যাপার বাস্তবিক ঘটতে পারে কিনা, মানে, ঘটা সম্ভব কিনা, এমন ধন্দে পড়ে মানুষগুলি পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

পাকা একটা প্রমাণ সাইজের বাবলা-কাঁটা বুড়ির দিকে এগিয়ে দেয় খুদি। ভারি রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকায় মানুষগুলোর দিকে। ম্যাজিকের খেলা দেখাবার কালে, খেলার এক্কেবারে সার অংশটি দেখাবার পূর্ব মুহূর্তে যাদুকর যেমন করে রহস্যময় চোখে তাকায় দর্শকের দিকে, ঠিক তেমনই দৃষ্টিতে উপস্থিত সকলের দিকে তাকায় খুদি।

ফিসফিস করে বলে, কত গভীর অবধি ফুটিয়া দিবে, দ্যাখ।

আর, বাস্তবিক, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, খুদির মা অবলীলায় কাঁটাটা প্রায় এক ইঞ্চির মতো ঢুকিয়ে দিল চামড়ার গভীরে, কিন্তু তার জন্য তার চোখেমুখে তিলমাত্র বিকার দেখা গেল না।

দেখতে দেখতে একদিকে যেমন শিউরে ওঠে ওরা, তেমনি বিস্ময়ে থ-হয়ে যায়। একেবারে বাকরুদ্ধ অবস্থা তাদের।

ঘোরটা কাটলে পর কেউ কেউ খুদিকে আড়ালে শুধোয়, এও কি সম্ভব? একটা মানুষ শরীরের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধিয়া দিল, মুখটা সামান্য বেঁকালোই না। এ কী করিয়া সম্ভব, বাপ?

মানুষগুলির সীমাহীন বিস্ময়টাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকে খুদি।

বলে, ক্যানে সম্ভব নয়? মায়ের কির্পা থাইক্‌লে সবই সম্ভব। আসলে, যিনি শরীলে ব্যথা দেন, তিনিই আবার শরীল থিকে ব্যথা হরণ করিয়া লেন। বেথা-কষ্টও তাঁরই দিবা, সেই কষ্ট সইবার ক্ষ্যামতাও তাঁরই দিবা।

বিষয়টাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য এতক্ষণে একটি উদাহরণের সাহায্য নেয় খুদি। বলে, যোগেন মণ্ডলের বড় ব্যাটা, সবাই যাকে পাগলা ভাবে, যে-কিনা গু আর ভাতে তফাৎ বুঝে না, মারলে কাঁদে না, দুঃখের সময় হি-হি করিয়া হাসে, মাঘের শীতে রাইতের বেলা মাঝপুকুরে ডুব মারে, কী করিয়া পারে বল দেখি?

—ওটা তো এক বদ্ধ পাগল।

—কী কথা! পাগল বলিয়া, মারলে তার ব্যথা লাগবেনি? মাঘের শীতে পাঁক-পুকুরে ডুবলে তার

শীত করবেনি? তেষে বল, খুন করলেও সে মরবেনি। কারণ, সে পাগল।

বলতে বলতে দু-দিকে ঘন-ঘন মাথা দোলাতে দোলাতে নিজের বলা কথাগুলিকে নিজেই নস্যাৎ করে দেয় খুদি। বলে, আসলে, তার মধ্যে সব কিছো আছে। সে খায়, হজম করে, হাগে, মুতে, হাঁটে-চলে, জ্যান্ত মানুষ যা-যা করে, সবই করে ও। কেবল তার শরীল থেকে বোধবুদ্ধিটুকু কাড়িয়া লিছেন মা। এ-ও সেই একোই বিত্তান্ত।

কথাটা যে এলাকায় বেশ প্রচার পেয়েছে, সেটা খুদি বুঝতে পারছে দিনদিন। রাস্তায়-ঘাটে ওকে নানা জনে শুধিয়ে বসে, তোর মা নাকি শরীরের এখানে-ওখানে আস্ত কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়? সত্যি?

দিনরাতের মতো সত্যি ব্যাপারটাকে এমন সন্দেহের মোড়কে পুরে শুধোলে কার না রাগ উথলে ওঠে!

খুদি খুব গোঁসা ফোটায় মুখে। বলে, সত্যি লয়তো কি মিছা নাকি? অন্তত হাজার জন দেখিয়া লিলো এই ক-মাসে।

—কেমন করিয়া পারে? কষ্ট হয় না অর? বেথা লাগে না?

—কী করিয়া লাগবে? মা-কালী অর শরীলে ভর করিয়া থাকে যে। মা-কালী যার শরীলে থিতু হইয়া রয়েছে, দুনিয়ার কুনো বেথা, যন্তন্না তার পাশ ঘেঁসতে পারবেনি। কেন কি, যাবতীয় যন্তন্না তো মা-কালী শুষিয়া লিবে।

খুদি একটুখানি থামে। তারপর বলে, তাবাদে, আরও একখান কথা আছে। যার বেথা লাগবার কথা, সে কি তখন ইহজগতে থাকে নাকি?

—তেবে?

—লিজের শরীলে সে ইদানীং কতক্ষণই বা থাকে!

—কুথা যায়?

—কে জানে? ইদানীং বুড়ি কখন যে কুথা যায়! এই বলে, শিবলোক থিকে ঘুরিয়া আইলাম, এই বলে, বম্মলোকে টুকচার কাজ ছিল। হরিপদর ব্যাটাটার তরে টুকচার তদবির কত্তে গেছলাম। আর, তখন তার শরীলে তুমি যা খুশি কর, বুড়ি জানতেই পারবেনি।

মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটি বেশ গদগদ গলায় বলে, একদিন যাব। দিশ্যটা স্বচক্ষে দেখিযা আইস্‌বো।

খুদি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, আইসো না একদিন। স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করিয়া লাভ কি?

ইদানীং খুদির মায়ের সঙ্গে মাঝেমাঝেই তুমুল ঝগড়া বাধে মা-কালীর। পাড়াপড়শি ইদানীং প্রায় নিত্যদিন শুনতে পায় তা। আর, তার পরপরই ধুম জ্বর আসে খুদির মায়ের। সারারাত আর মাথা তুলতে পারে না। রাতভর জ্বরের ঘোরে মা-কালীর সঙ্গে কথাবার্তা চলে তার। কখনও রাগ-রোষ, কখনও খোশামুদি, এই চলতে থাকে সারাক্ষণ। খুদি, পঞ্চমী, এমনকী খ্যাঁদাও সেসব কথা শুনতে পায়।

খ্যাঁদাটা নেহাতই নাবালক। বাপকে ভয়ে ভয়ে শুধোয়, নানি কার সাথে কথা কইছে বাপ?

—মা-কালীর সঙ্গে বাপ। খুবই নির্বিকার গলায় জবাব দেয় খুদি।

পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ডাল-ভাতের মতো স্বাভাবিক হয়ে আসে ওদের কাছে।

শনি-মঙ্গলবার বাদে বাকি দিনগুলোতেও বিশ্রাম থাকে না খুদির। হপ্তার অন্য দিনগুলোতে খুদির মা জল মন্ত্রায়, তেল মন্ত্রায়, কবচ-তাবিজ দেয়, বাকি সময়টা উপস্থিত মানুষজনকে ধর্মের 'মাহিত্য' বোঝাতে থাকে নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে।

ভক্তরা এসে মা-কালীর মন্দিরের দরজায় সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়লে ইদানীং বুড়ি বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে, মা কী আর মাটির ঘরের ভিতরে আছেন রে, মা আছেন মাইন্‌ষের অন্তরে। লিজের অন্তরে তাকে খুঁজ্।

শুনে পাপীতাপী মানুষের দল কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, অন্তরে তাকে পাই না বলিয়াই তো তাঁর থানে আইসিয়া হইত্যা দিচ্ছি।

পশারওয়ালা ডাক্তার নিজের থেকে বাড়ি বয়ে এসেছে। কাজেই, খুদি ডোবার জলে মুখ ধুয়ে পুকুরপাড়ের বাবলা গাছ থেকে গুটিকয় কাঁটা ভেঙে এনে রাখে মায়ের সামনেটিতে। বলে, কাঁটা বিঁধিয়া দেখা তো মা। ডাক্তারবাবু দেখতে চাচ্ছেন।

খুদির মা নৃপেন ডাক্তারকে আগাপাশতলা দেখে একসময় একটা কাঁটা নিয়ে নিজের পায়ের ডিমে ফুটিয়ে দেয়।

নৃপেন ডাক্তার দেখেন, কাঁটাটা যখন চামড়া ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে গভীরে, তখনও খুদির মায়ের সারামুখে তৃপ্তির হাসিটি অমলিন। একেবারে ভাবলেশহীন তার মুখ।

পায়ের ডিম থেকে কাঁটাটা তুলে নিয়ে খুদির মা পরমুহূর্তে সেটা বাঁ-উরুতে বিঁধিয়ে দেয়। সেখান থেকে ডান পায়ের ডিমে।

দেখতে দেখতে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসে নৃপেন ডাক্তারের মুখ। বলেন, রাতেভিতে জ্বর-টর আসে নাকি?

খুদি সারা মুখে গুমোর ফুটিয়ে বলে, জ্বরজারি তো মায়ের নিত্যিদিনের বিত্তান্ত। মা-কালীর সঙ্গে রোজ পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করবে, আর সারা রাত ধুম জ্বরে কাতরাবে।

নৃপেন ডাক্তার খাটিয়া থেকে উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে যান খুদির মায়ের দিকে। একেবারে কাছটিতে গিয়ে দাঁড়ান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন ওর মুখ। ভুরু কুঁচকে বলেন, নাকের পাটা আর কানের লতিগুলো কতদিন হল ফুলেছে?

এব্যাপারটা খুদি তেমন করে নজর করেনি। বলে, আপনি বলতে চাচ্ছেন নাক-কান ফুলতিছে অর?

—ফুলেছে মানে? চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? দেখতে পাস নে, আঙুরের মতো টসটসে হয়ে ফুলে রয়েছে।

নৃপেন ডাক্তারের কথায় খুদি মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু শহরের ডাক্তার বিবেচনায় ওঁর সঙ্গে আর ওই নিয়ে কথা চালাচালি করে না। নৃপেন ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলে, মায়ের ধিয়ানের সময় হয়্যাল। কিছো জানবার দরকার হইলে জলদি বলুন।

ফিরতি পথে কল্পনাথের কাছে কথাটা ভাঙেন নৃপেন ডাক্তার। বলেন, বুড়ির ব্যাটাকে বল, একবার সদরে নিয়ে গিয়ে লেপ্রোসি-সেন্টারে দেখিয়ে আনুক। আমার কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছে।

কল্পনাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নৃপেন ডাক্তারের দিকে। বলে, আপনার তেমনটা মনে হচ্ছে?

—আরে হচ্ছে বলেই তো বলছি।

নৃপেন ডাক্তারের কথাগুলো কল্পনাথকে তাৎক্ষণিকভাবে কাঁপিয়ে দেয়। এই রোগটার প্রতি মানুষের ঘৃণা, অবিশ্বাস আর আতঙ্কের বুঝি সীমা-পরিসীমা নেই। কথাটা চাউর হলে ওকে মেরে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। আর, তাড়িয়ে দিলেও সে যে দেশেগাঁয়ে অন্য কোনও বাড়িতে ঠাঁই পাবে না, এ ব্যাপারেও কোনও সন্দেহ নেই। এদেশে কুষ্ঠ রোগটাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ কারোর সঙ্গে, কোনও কিছুর সঙ্গে কোনও রকমের আপস করতে রাজি নয়। এমন কি, নিজের বাপ-মায়ের বেলাতেও নয়।

কল্পনাথ একরকম বাধ্য হয়েই নৃপেন ডাক্তারকে অনুরোধ জানিয়েছিল, বুড়ির এই ব্যাপারটা যদি একটুখানি চেপে যান তো বড় ভালো হয়। কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে মানুষ কতটা প্যানিকি, তাতো আপনি জানেনই। কোত্থেকে কী করে বসে। তার চেয়ে বরং আমরা ওর ছেলেকে বলে কয়ে লেপ্রোসি-সেন্টারে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করছি।

কল্পনাথের কথার যৌক্তিকতা মেনে নেন নৃপেন ডাক্তার। কথা দেন।

কিন্তু তখন অন্য সমস্যায় পড়ে যায় কল্পনাথ। বুড়ির যা ঠাকুর-ঠাকুর ইমেজ, তাকে কুষ্ঠ হাসপাতালে যাবার কথা কে বলবে? কথাটা খুদির কাছে পাড়লে সে-ই তো কল্পনাথের মাথা কাটবে হাতে।

তবুও একদিন বসন্ধরী দিঘির পাশে কল্পনাথ দেখা পেয়ে যায় খুদির।

দিঘির পাড়ের ঝোপঝাড়ে ভরদুপুরে ফাঁদ পেতে ডাহুক ধরছিল সে। ফাঁদ পাতা ছিল বেশ খানিকটা

দূরে। খুদি বসে বসে ক্ষণ গুনছিল, কখন ফাঁদে ডাহুক পড়ে।

খুদিকে দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কল্পনাথ। পাশটিতে গিয়ে বসে। গুনগুনিয়ে কথা হতে থাকে, ডাহুকদের কান এড়িয়ে।

এটা-ওটা প্রসঙ্গ ওঠে।

কল্পনাথ একসময় খুদির মায়ের শরীরের নানা জায়গার অসাড়তা এবং নাক-কান ফুলে যাবার প্রসঙ্গটা তোলে।

বলে, নৃপেন জেঠু যখন সন্দেহ করতিছে, যা না একটিবার। মেদিনীপুরেই তো লেপ্রোসি সেন্টার। সকালে যাবি, বিকালে ফিরিয়া আইস্‌বি। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়্যা যাউ।

খুদি একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কল্পনাথের দিকে। থমথমে হয়ে ওঠে ওর মুখ।

একসময় গলায় চরম বিরক্তি ফুটিয়ে বলে, তুইও যেমন! নিপেন ডাক্তর কইল, আর তোরা অমনি লাচতে লাগিয়ালু!

—লাচালাচির কিছু নাই। আমি বলছিলাম, রোগ তো হইতেই পারে। যে-কোনও রোগ। যে-কোনও লোকের শরীরে।

সহসা খুদি কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে। বলে, শুন্ তেবে। আসল কথাটা তেবে কই তোকে। খুদি কল্পনাথের একটুখানি ঘনিষ্ঠ হয়,—মায়ের নামডাকটা বাড়িয়া যাবার ফলে নিপেন ডাক্তরের পশারটা এক্কেরে পড়িয়া গেছে। এই তল্লাটে ডাক্তরের পাশ আর যাচ্ছেনি কোউ। সক্কলে আমার মায়ের পাশ আসতিছে। উ-শালা তাই মায়ের নাম খ্যারাপ করবার চাচ্ছে।

কল্পনাথ সহসা জবাব দেয় না।

একটুবাদে বলে, হইতে পারে, কিন্তু আমি অন্যের পাশ খবর লিয়ে দেখেছি, রোগটার লক্ষণের সাথে পিসির ব্যাপারটা কিছোটা মিলিয়া যাচ্ছে।

সে কথায় খুদির ঠোঁটজোড়া বিদ্রূপে ভেঙে যেতে থাকে। বলে, আমারো তো মনে হইল, নিপেন ডাক্তরের কানের লতিগুলা টুকচার ফুলেছে।

কল্পনাথ আর কথা বাড়ায় না। একসময় উঠে পড়ে।

দু-পা না যেতেই পেছন থেকে ডাক দেয় খুদি। চাপা গলায় বলে, আমার পাশ যা কইছু, কইছু। আর কারও পাশ বলিসনি। শুধুমুদু একটা ভুয়া কথা রটিয়াবে মোর মায়ের নামে।

কল্পনাথ গম্ভীর গলায় বলে, বেশ।

বুড়ির অসাড় জায়গাগুলো আরও অসাড় হচ্ছিল দিনদিন। চাকা চাকা হয়ে ফুলছিল। নাকের পাটা ফুলে গিয়ে চুড়োটা এক্কেবারে বসে গিয়েছে। কানের লতি আঙুরের পারা গোল। ইদানীং রোজ রাতে জ্বর আসে। জ্বর আর ছাড়ে না।

আমি আর কল্পনাথ যেবার একই হপ্তায় বাড়ি গেলাম, কল্পনাথই গোপনে আমাকে কথাটা বলল। ফলে, আমরা একদিন দু-জনে একসঙ্গে গেলাম খুদিদের বাড়িতে।

তখন পড়ন্ত বিকেল। দিনভর খুব গুমোট গিয়েছে। দিনের শেষ প্রহরে সবেমাত্র ফুরফুরিয়ে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

এই সময়টাতে খুদির মা সাধারণত মন্দিরের দাওয়ায় বসে বসে নির্নিমেষ আকাশ দেখতে থাকে। আজ কিন্তু ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পেলাম না।

মাঝ উঠোনে বসে বসে একটা চাবিজাল সারাই করছিল খুদি। আমাদের দেখে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, কী বেপার, এক্কেবারে মানিকজোড় যে!

উঠে গিয়ে দাওয়া থেকে খাটিয়াটা এনে পেতে দেয় উঠোনে।

বলি, পিসি কোথায় রে?

সে-কথায় ইঙ্গিতে মন্দিরের ভেতরটা দেখিয়ে দেয় খুদি। বলে, ইদানীং মা প্রায় সারাটা সময় মন্দিরের ভিতরেই কাটায়। বাইরে আসে কম।

বলি, মন্দিরের মধ্যে কী করে?

—কী আবার করবে! মা-কালীর সঙ্গে কথা কয়, ঝগড়া করে। ঘুম পাইলে ওখানেই শুইয়া পড়ে।

আমি আর কল্পনাথ পরস্পর মুখ চাওয়-চাওয়া করি। বলি, পিসির শরীরটা কেমন আছে?

আমার এমন প্রশ্নে খুদিকে কেমন ম্রিয়মান দেখায়। মিনমিনে গলায় বলে, শরীর তো ভালোই আছে, তেবে—। যাও না, ভিতরে গিয়া দ্যাখ।

আমরা পায়ে পায়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকি।

মন্দিরের মধ্যে মেঝের ওপর চাটাই পেতে শুয়ে ছিল খুদির মা। চোখদুটি বোঁজা ছিল। আমাদের পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকায়। চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, আমাদের সে চিনতে পেরেছে।

বলি, কেমন আছ গো, পিসি?

খুদির মা চাটাইয়ের ওপর উঠে বসে। এদিক-ওদিক তাকায়। কী জবাব দেবে, বুঝে উঠতে পারে না বুঝি।

আমরা ওকে খুব পাশ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। শরীরের অনাবৃত জায়গাগুলোর এখানে ওখানে চাকাচাকা গোলাকার দাগ। মধ্যিখানে ফ্যাকাসে জমিন। পায়ের পাতাদুটো ফুলে মোচার খোলের আকার নিয়েছে। রসে যেন টসটস করছে। আমরা লক্ষ করি, একটু একটু করে রস চোঁয়াচ্ছে পা-দুটো থেকে। চোখের মণি কোটরের গর্তে ঢুকে গিয়েছে। নাকের পাটা এবং কানের লতিও ফুলে টসটস করছে।

—দেখে তো মনে হয়, তুমি একেবারেই ভালো নেই পিসি। কল্পনাথ খুব নরম গলায় বলে।

—কী করবো বাপ, অদ্দিষ্টের লিখন। বুড়ি মিনমিনে গলায় জবাব দেয়।

—অদৃষ্টের দোহাই দিলে তো রোগ সারবে না পিসি। কল্পনাথ একেবারে গার্জেনি গলায় বলে, এইবেলা ডাক্তার দেখাও।

অল্প অল্প হাঁফাচ্ছিল খুদির মা। শরীরের হরেক পাড়ায় অবিরাম প্রদাহ চলছিল বুঝি। ঠোঁটদুটো প্রাণপণে চেপে কোনও রকমে তা সামলাতে সামলাতে বলে, বলতিছি তো খুদিয়াকে। শুনলে তো।

বলতে বলতে খুদির মায়ের সারা মুখে ফুটে ওঠে এক জাতের অসহায়তা। অজান্তে ছলোছলো হয়ে ওঠে চোখদুটি। আর, তখনই আমার মনে হয়, শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিষপোকাগুলির খোঁজ সম্ভবত পেয়ে গেছে সেও।

একসময় কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসি। খুদির কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াই।

শুধোই, পিসিকে বলেছু, অর কী রোগ হয়েছে?

খুদি খুব ম্রিয়মান গলায় বলে, তাই ফের বলা যায়? শোকে-তাপে কী করতে কী করিয়া বুসবে।

—কিন্তু একদিন তো জানতে পারবেই।

পাশ থেকে কল্পনাথ বলে ওঠে, সম্ভবত পিসি তার রোগের কথাটা জানিয়া ফেল্‌ছে।

খুদি চুপ করে বসে থাকে। খুবই ম্রিয়মান দেখায় ওকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব মিনমিনে গলায় বলে, আমাকে তেবে কী করতে বলু তোরা?

বলি, আমি তো মেদিনীপুরে আছিই। সব ব্যবস্থা করিয়া দিবো। তুই একদিন লিয়া আয় না পিসিকে।

কল্পনাথ পাশ থেকে বোঝাতে থাকে খুদিকে, অবস্থা যা দেখলাম, ফুলা পা থিকে অবিরাম জল কাটতেছে, নাকের চূড়া বুসিয়া গেছে। কানের পিছন দিকটা ফুলিয়া ঢোল, এরপর কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলিয়াবে।

খুদি নিথর হয়ে বসে থাকে। একসময় খুব ভেঙে পড়া গলায় বলে, কথাটা কী জানু, এই রোগের কথাটা জানাজানি হইয়া গেলে অর রোগীপত্তর আইস্‌বেনি। পাড়ার সবাই একঘরে করিয়া দিবে। আমাদের অবস্থাটা কী হবে, ভাবিয়া দ্যাখ্।

কল্পনাথ এক ধমক দেয় খুদিকে, রোগী আইস্‌বেনি আর একঘরে করিয়া দিবে বলিয়া তুই মানুষটাকে

চিকিৎসা না করিয়া ফেলিয়া রাখবি? এরপর একটু একটু করিয়া হাত-পায়ের মাংস খসিয়া খসিয়া পড়বে। কতদিন তুই লুকিয়া রাখবি অকে?

খুদি কেমন শিউরে শিউরে ওঠে।

এক সময় মাকে মেদিনীপুর নিয়ে যেতে রাজি হয় সে। খুব মিনতি মাখানো গলায় বলে, কিন্তু এ কথা যেন কাকপক্ষীতেও না জানতে পারে। দোহাই তুমাদের।

অবশেষে একদিন খুদি শেষরাতে মাকে নিয়ে সন্ধিপুর ছাড়ে।

বাসে চড়ে চলে আসে মেদিনীপুর।

আমি ওকে নিয়ে যাই লেপ্রোসি সেন্টারে। সেখানে সাহেব ডাক্তারেরা ওকে ভালোমতো পরীক্ষা করে রায় দেয়, কুষ্ঠই বটে। খুব অ্যাডভান্সড স্টেজ। ভর্তি হয়ে নাগাড়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

খুদির মা সেই প্রথম তার শরীরের অন্তর্গত রোগটার ব্যাপারে ষোলআনা নিঃসন্দেহ হয়।

আচমকা একটা কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে বুড়ি। দু-চোখের তারায় সীমাহীন আতঙ্ক জড়ো করে সবাইয়ের দিকে তাকায়।

ধীরে ধীরে তার চোখদুটি ভরে যায় জলে।

আমি ওকে যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি। বলি, ভয় পেয়োনি পিসি। নিয়ম করিয়া চিকিৎসা করালে ভালো হয়্যাবে।

ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে হাজার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও কিছুতেই রাজি হয় না খুদি। বলে, কী কথা কউ তুই! রাত পুহালে তার মন্দিরের সুমুখে শ-মানুষের ভিড়। কত দূর-দূরান্ত থিকে আসে তারা। কত মানুষ কত রোগ-ব্যাধি, বিপদআপদ লিয়া আসে। হাসপাতালে ভর্তি হইয়া রইলে তাদেরকে ওষোধপাতি মাদুলি-কবচ কে দিবে?

—কিন্তু এইভাবে চললে তো ও আর বেশিদিন মাদুলি-কবচ দেবার অবস্থায় থাকবেনি।

খুদি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, ওষুধ লিয়া যাবো। মাসে মাসে আইস্‌বো। সারলে অতেই সারবে।

বাধ্য হয়ে ডাক্তাররা কিছু ওষুধপত্র, মলমাদি দেয়। তবে বারবার একটা কথাই বলতে থাকে যে, আলগা আলগা ওষুধ খেয়ে এই স্টেজে বড় একটা উপকার হবে না।

অবুঝ খুদি শেষ অবধি ওষুধপত্র নিয়েই ফিরে যায়।

কিন্তু খুদির মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয়, হাসপাতালে ভর্তি হতেই চেয়েছিল সে। কেবল খুদির ধনুর্ভাঙা পণ দেখে নেহাত বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হল তাকে।



তখন আমি ল' পাশ করে মেদিনীপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করছি। কেরানিটোলার দিকটায় বাসা ভাড়া করে থাকি। মাসে দু-টো রোববার সন্ধিপুরের বাড়িতে যাই। গ্রাম এবং আশেপাশের এলাকার যাদের মামলা চলছে মেদিনীপুর কোর্টে, তাদের সঙ্গে মামলা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করি। কিছু নতুন কেসও পেয়ে যাই। সোমবারের প্রথম বাসে ফিরে আসি সদরে।

গাঁয়ে গিয়ে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু খবর এর-ওর মুখে শুনেছি, তাতে করে জেনেছি, খুদির মা ইদানীং মন্দিরের মধ্যেই কাটায় প্রায় সারাটা দিন। কেবল রাত্তিরবেলায় বাইরে বেরোয়। তবে প্রার্থীদের ভিড় আরও বেড়েছে বই কমেনি। খুদির মা নাকি মন্দিরের ভেতর থেকেই সবাইয়ের কথা শোনে এবং সেই অনুসারে যাকে যা দেবার, খুদির মারফৎ দেয়। গেল বছর দু'তিন এভাবেই চলছে।

সেবার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, আচমকা খুদির মা নিরুদ্দেশ হয়েছে। কাউকে কিছু না বলেই সে-রাতের অন্ধকারে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। খুদি নাকি মাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, কিন্তু সে মেয়া যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দিনকতক ধরে খুদির মা নাকি ক্রমাগত খুদিকে বলছিল, আর আমার ইখ্‌নে রইতে সাধ নাই রে।

মা-কালী আমাকে অন্যত্র যাবার তরে সাধাসাধি কচ্ছে। আমি আর ইখনে থাকবোনি।

খুদি নাকি ব্যাকুল গলায় শুধিয়েছিল, তুমার পতিষ্টা করা মন্দির, মন্দিরে জলজ্যান্ত মা-কালীর অধিষ্ঠান, রাত পুহালে তুমার উঠানে এত-এত মানুষ। তাবাদে আমি, তুমার বউমা, আদরের লাতি, এদের ছাড়িয়া তুমি কু-থা চলিয়াবে মাগো? তার জবাবে খুদির মা নাকি বলত, যাদের কথা তুই কইলি, তারা সব মায়া। আমার হাতেপায়ের শিকল এক-একটি। আর আমি এসব মায়া-শিকলে বাঁধা হইয়া রইবোনি। আমাকে মা-কালী অন্যত্র টানতিছে।

তো, যে রাতের ভোরে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল খুদির মা, সে-রাতে নাকি একটা উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছিল খুদি।

সকালে উঠে মাঝেরপাড়ায় বাঁশপাতি পুকুরের পাড়ে বসে দাঁতন করতে থাকা পড়শিদের কাছে সে খোলসা করেছিল স্বপ্নটা। সে নাকি সারারাত স্বপ্ন দেখেছে, মা তাকে বলছে, খুদি রে, আমি তেবে চললাম। মা-কালী আমাকে সাথে লিয়া কুথাকে যেন যেতে চাচ্ছে। আমারও আর সন্‌সারে রইতে সাধ নাই রে বাপ। এখন আমি, যদ্দিন মন চায়, মা-কালীর সাথ ঘুরিয়া বুলবো। যদ্দিন না ফিরিয়া আসি, মা-কালীর ইর্ছা, আমার কাজটা তুই চালিয়ে যা। মা-কালীর থিকে পাওয়া আমার যাবতীয় ক্ষ্যামতা, আপাতত তোর জিম্মাতেই রাখিয়া গেলাম। তবে খবরদার, মাইন্‌সের ইষ্ট বই অনিষ্ট করবিনি। আর বচ্ছরান্তে মায়ের মেলাটা চালিয়া যাবি।

স্বপ্নের সারাৎসারটি বলে জমায়েতের দিকে তাকায় খুদি। ভারি অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। বলে, কী অব্বাক স্বপন দ্যাখ দিকি!

কথাগুলো শুনতে শুনতে উপস্থিত মানুষজন অবাক চোখে দেখতে থাকে খুদিকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে খুদির সম্পর্কে একধরনের সম্ভ্রমবোধের সৃষ্টি হয়।

কেনারাম মণ্ডল ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, তবে আর কী, স্বয়ং মা-কালীর হুকুমেই যখন এহেন বেবস্তা, তখন আর তুমার ভাবনা কী?

—আরে না, না। খুদি প্রস্তাবটাকে পত্রপাঠ নাকচ করে দেয়, সত্যি সত্যি মা চলিয়া যাচ্ছে নাকি? বললাম না, স্বপন দেখেছি। স্বপন আবার সত্যি হয় নাকি? তবে, মানতেই হবে, ভারী আশ্চর্য স্বপন এটা।

উপস্থিত মানুষজন তখন দ্বিধা দ্বন্দ্বে কাহিল। বলে, সত্যি হইতেও পারে। লচেৎ দুনিয়ার এত বেপার থাকতে শুধুমুদু এই স্বপ্নটা দেখলি ক্যানে তুই?

এরপর উপস্থিত মানুষজনেরা একে একে তাদের স্মৃতি থেকে স্বপ্ন ফলে যাবার একাধিক ঘটনা তুলে এনে পেশ করতে থাকে।

খুদি সেসব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ অন্য প্রসঙ্গ পাড়তে চাইলে, তাকে ধমকে থামিয়ে দেয়, কিনা, ভানুকাকা কী বলতিছে শুনো না। একজন মুরুব্বি-মানুষ কথা বলতিছে, কুথা মন দিয়া শুনবে, তা নয় যত হাবিজাবি, ইসিড়-বিসিড় কথা!

বাঁশপাতি পুকুরের পাড়ে দাঁত মাজতে থাকা মানুষজনের মজলিসটা ভেঙে গেলে পর খুদি দাঁতন সেরে মুখ ধুয়ে সোজা চলে আসে মায়ের মন্দিরে।

ততক্ষণে উঠোন জুড়ে অন্তত বিশজনের জমায়েত।

খুদি উঠোনটা পেরিয়ে গিয়ে মন্দিরের দরজায় হাত ছোঁয়ায়। খুব আবেগ মাখানো গলায় ডাকে, মা, মাগো, দজ্জা খুল্। হা-দ্যাখ্, কত পাপীতাপী মানুষ তোর দুয়ারে হাজির হইছে। অদের কষ্ট লাঘব কর্ মা।

অন্যদিন এই অবধি বলার পর পরই ভেতর থেকে খিল খোলার আওয়াজটা পেত সবাই। আজ কিন্তু কোনও আওয়াজই ভেসে এল না।

খুদি আবারও ডাক দেয়। গলাটাকে আরও মিহি করে তোলে। খুল্ মা, দজ্জা খুল্। বেলা অনেক

হয়্যালো। আর কত ধিয়ান করবি তুই!

বলতে বলতে দরজার গায়ে বুঝি একটুখানি চাপ দিয়ে ফেলেছিল খুদি। তাতে করে সামান্য খুলে যায় দরজাটা। বিস্মিত খুদি দরজাতে আর একটু চাপ দিতেই তা কেবল পেছনের দিকে সরে যেতে থাকে।

খুদি এবার মুখ ফেরায় উঠোনে অপেক্ষারত মানুষগুলোর দিকে। মিহি করে হাসে। বলে, ইদানীং আর দরজায় খিল দিবার কথাটা মনে থাকছেনি বুড়ির। বাহ্যজ্ঞান একটু একটু করিয়া লোপ পাচ্ছে।

বলতে বলতে দরজাটা হাতের চাপে পুরোপুরি খুলে ফেলে সে। উঁকি মারে ভেতরপানে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখের ভাষা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। কেন কি, ঘরের মধ্যে খুদির মা নেই।

উপস্থিত মানুষজনও ততক্ষণে কৌতূহলি হয়ে উঠেছে। খুদি তাদের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। পরমুহূর্তে কান্নাভেজা গলায় বলে ওঠে, তবে কি স্বপনটাই সত্যি করিয়া দিলি, মাগো?

এরপর, সারাটা সকাল, খুদি উপস্থিত জমায়েতের সামনে রাতে দেখা স্বপ্নটার কথা বিতাং করে বলে।

এবং তার ফলে, বুড়ির নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার প্রেক্ষাপটটি এমনই প্রচার পেয়ে যায় সারা এলাকায় যে, গাঁয়ে গেলে পর আমাকে সারা সকাল জনে জনে শোনায় সেই ঘটনা। এমনভাবে বলে, যেন তাদের সুমুখেই ঘটেছে সেটা।

বিকেল নাগাদ খুদি এল আমাদের বাড়িতে।

আমি তখন আমার মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। খুদি শুকনো মুখে বসল আমার পাশটিতে।

মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলে পর, যখন সবাই একে একে বিদায় নিল, আমাকে একান্তে পেয়ে খুদি বলল, মা-র কথা সব শুনছ তো?

বলি, কী ব্যাপার বল্ তো? আচমকা কোথায় চলিয়া গেল বুড়ি?

খুদি মুখ চুন করে বসে থাকে। একসময় খুব হতাশ গলায় বলে, আমিও তো সেই ভাবনায় কাহিল হয়্যা পড়ছি।

সারা সন্ধে তার মুখ থেকে একুট একটু করে শুনতে থাকি পুরো ঘটনাটা।

প্রথমে সে আগের রাতের স্বপ্ন দেখবার কথাটা খুব বিতাং করে বলে। তারপর খোলসা করে বুড়ির নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার বৃত্তান্ত।

খুদির মায়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাটা শুনে আমি খুব তাজ্জব বনে গেছি বটে, কিন্তু খুব একটা দুঃখ পাইনি। বরং আমার মনে হয়েছে, খুদির মা খুব সঙ্গতভাবেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। বর্তমানে ওর যা হাল, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াটাই উচিত হয়েছে তার। নইলে, ভবিষ্যতে ওরও লাঞ্ছনার শেষ থাকত না, খুদির পুরো সংসারটাও চরম বিপদে পড়ত। সে যে শেষ অবধি বিবেচকের মতো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, তাতে করে মনে মনে ধন্যবাদই দিলাম বুড়িকে।

খুদির দিকে তাকিয়ে বলি, খোঁজাখুজি করিসনি?

আমার প্রশ্নে খুদি কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। বারকয়েক ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। একসময় বলে, কুথা খুঁজবো, বল দেখি? দিদির বাড়িতে যায়নি। মামাবাড়িতে তো কোনওকালেও যেতনি। তাও খোঁজ লিয়েছি। সিখ্‌নেও যায়নি। একটা বাচ্চা ছেইলা হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু একটা বড়ো মানুষ যদি স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়ে তো, তাকে খুঁজিয়া বার করা সম্ভব?

মনে মনে ভাবি, যে কারণে সে চলে গিয়েছে, কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে অবশ্যই যাবে না। সে যাবে এমন কোনও জায়গায়, সেখানে কেউ ওকে চিনবে না, অথচ ওর দু-বেলার অন্নটাও কোনওগতিকে জুটে যাবে।

বলি, একবার পুরী এবং হরিদ্বারে খোঁজ লিয়ে দেখতে পারতিস।

—পুরী! হরিদ্বার! খুদি দু-চোখ আকাশে তুলে শুধোয়, অদ্দুর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাকি?

—তা অবশ্য ঠিক। অনেক খরচের ব্যাপার। তাছাড়া, খুঁজেই বা করবি কী? খুঁজে পেলেও তো ওকে

বাড়ি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। উচিতও নয় সেটা। থাক্, দূরে গিয়ে যদি শান্তি পায় তো পাক্। আমার মতে, ওকে আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। যে-কটা দিন বাঁচে, শান্তিতে বাঁচতে দে' ওকে।

আমার কথায় খুদির দু-চোখে কৃতজ্ঞতার ছায়া ভাসে।

বলে, তুমার কথা শুনিয়া একটু শান্তি পাইলাম মনে। দুনিয়ার লোক তো আমাকেই দোষারোপ কচ্ছে, কিনা, মা-টাকে নাকি তেমন করিয়া খুঁজলামনি।

—লোকের কথা বাদ দে। ওরা তো আর জানে না, কী কারণে, কোন্ পরিস্থিতিতে সমাজ-সংসার ছাড়তে বাধ্য হয়েছে সে।

সন্ধে নাগাদ মনের মধ্যে একরাশ শান্তি জমিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় খুদি।

আমি একা একা বসে ভাবতে থাকি আকাশ-পাতাল। খুদির মায়ের মুখখানি কেবলই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তাকে পুরী কিংবা হরি দ্বারের কোনও জনবহুল রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখি কল্পনায়। ছলোছলো চোখে সে চলমান পুণ্যার্থী মানুষের করুণা ভিক্ষা করে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে কেবলই মনে হয়, কতখানি বাস্তব বোধ এবং মনের জোর থাকলে এমন একটি পথ বেছে নিতে পারে মানুষ। বিদেশ-বিভুঁয়ে, সহায়সম্বলহীন অবস্থায় একেবারে আতান্তরে পড়বার ঝুঁকি নিয়েও সে খুদি এবং তার পুরো সংসারটাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

সেই কথাটা ভেবেই বুড়ির প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতায় ভিজে যায় মন।



মাসটাক বাদে একদিন পঞ্চমী এল আমার সেরেস্তায়।

খুব বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়াল আমার সুমুখে। বিধ্বস্ত। যেন খড়টুকো ধরতে চাওয়া জলবন্দী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

তখন বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চৈত্রের আগুন। ভেতরের গুমোটে সেদ্ধ হচ্ছিল মানুষ। তারই মধ্যে পঞ্চমীর আকাশ চুঁইয়ে অবিরাম জলের ধারা বইছিল চোরা ঝরনার মতো।

পঞ্চমীকে প্রথম দর্শনে আমি চিনতে পারিনি।

মাসে দু-বার সন্ধিপুরে গেলেও পঞ্চমীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না আমার। তাছাড়া, খুব মনোযোগ দিয়ে কি দেখেছি কখনও ওকে! নেহাত ও খুদির বউ, নইলে, অন্য পাড়ার এক খেতমজুরের বউকে আমার পক্ষে চিনে রাখবার কথা নয়।

পঞ্চমী খুব ছলোছলো চোখে নিজের পরিচয় দিল। এবং আমি ওকে চিনতে পেরেছি, এটা বোঝামাত্তর ওর চোখের কোণার ছিদ্রদুটি বুঝি সহসা আয়তনে বেড়ে গেল। দু-চোখে সহসা বান ডাকল তার।

খুব বিপদে পড়েই সে ছুটে এসেছে আমার কাছে, সেটা বুঝতে দেরি হয় না আমার। এবং খুদির বদলে পঞ্চমী আসায় আমার উদ্বেগটা বাড়ে। কেমন জানি মনে হয়, বিপদটা খুদিরই। এবং এমন সে বিপদ যে নিজে আসতে না পেরে বউকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে।

মাসে-মাসে গাঁয়ে গিয়ে যতদূর জেনেছি, খুদির মা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পরও খুদির মাদুলি-তাবিজের ব্যবসাটা চলছিল। বুড়ির সময় যতটা রমরমা ছিল, ততখানি অবশ্য ছিল না, তবুও মা-কালীর দৌলতে তার আয়-উপায় নাকি ভালোই হচ্ছিল। হঠাৎ এমন কী হল, যাতে করে পঞ্চমীকে ছুটে আসতে হল আমার কাছে?

প্রবল সংকটে পড়ে উকিলের কাছে ছুটে এসে অনেক মক্কেলই প্রথমটা কেঁদে-টেঁদে একসা হয়। এ কোনও নতুন দৃশ্য নয় আমার কাছে। কিন্তু পঞ্চমীর কান্নাটা আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও বিচলিত করে তোলে। কারণ, পঞ্চমীকে আমি যতটুকু চিনি, ও তো সহসা কেঁদে ভাসাবার মেয়ে নয়। সারা পাড়ায় খুবই ডাকাবুকো আর খাণ্ডার হিসেবে খ্যাতি ছিল তার, সেই ছেলেবেলা থেকেই। বিয়ের পরপরই সে খুদির মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল বলে শুনেছি। তারপর তো বাপের কল্যাণে

বাঁশপাতি পুকুরের পাড়ে এক টুকরো ভেস্ট জমি বাগিয়ে নিয়ে শ্বশুরের ভিটে ছাড়ল খুদিকে নিয়ে।

পঞ্চমীর দু-চোখের কোণা দিয়ে অবিরাম গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। বুঝতে পারি, কোনও কারণে প্রচুর জল জমেছে ভেতরে। বাইরে থেকে দৃশ্যমান নয় তা। কেবল শরীরের দুটো অদৃশ্য চোরা ছিদ্র দিয়ে অবিরাম চুইয়ে ঝরবার ধরন দেখে আন্দাজ করে নিতে হয় যে, ভেতরটা একেবারে টইটম্বুর।

তাকে বসিয়ে-টসিয়ে জল-টল খাইয়ে এবার আসল প্রসঙ্গে আসি।

আর তখনই শুনতে পাই তার বিপদের কথাটা।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে পঞ্চমী বলে, তুমার বন্ধুকে পুলিশ বাঁধিয়া লিয়া আস্‌সে।

কথাটা শুনে একটুখানি অবাক হই। শুধোই, কেন? কী করেছে সে? মা-কালীর নামে কারোর সঙ্গে কোনও জালিয়াতি...?

একটুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে পঞ্চমী। একসময় বিড়বিড় করে বলে, পুলিশ অকে খুনের দায়ে ধরেছে।

পঞ্চমীর কথা শুনে আঁতকে উঠি আমি। কারণ, আর যাই হোক, খুদিকে ঠিক খুন করবার মতো অপরাধী বলে ভাবতে কষ্ট হয় আমার।

শুধোই, কাকে খুন করেছে সে?

—পুলিশ বলতিছে, সে নাকি অর মাকে খুন কচ্ছে।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি পঞ্চমীর মুখের দিকে। বলি, খুন করেছে মানে? ওর মা-তো বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছে।

—তেবে? দুনিয়ার মানুষ সেটা জানে, অথচ পুলিশ বলতিছে, তুমার বন্ধু নাকি অকে খুন করিয়া লাশ কুথাও হাফিস করিয়া ফেলছে। আচ্ছা বল দেখি, ব্যাটা হইয়া মাকে খুন করবে উ? খুন করিয়া অর লাভ?

—কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে পুলিশের এমন সন্দেহ হল কেন?

—আমার ননদ আর তার ব্যাটা নাকি পুলিশকে তেমন খবরই দিছে। ননদের ব্যাটাটা তো আবার পার্টির লেতা।

বলতে বলতে পঞ্চমীর দু-চোখে আবার বান ডাকতে শুরু করে।

আমি বসে বসে বিষয়টা নিয়ে আপন মনে ভাবতে থাকি।

পঞ্চমী জানায়, টানা তিনদিন খুদিকে লক-আপে রেখেছিল কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ। অকথ্য অত্যাচার করে শেষ অবধি ওকে দিয়ে খুনের কথাটা কবুল করিয়ে তবে কোর্টে পেশ করছে আজ।

পঞ্চমী কাঁদতে কাঁদতে বলে, সব্বাই বলতিছে, জামিন নাকি পাবেনি উ।

বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকি আমি। একসময় গায়ে গাউনটা চড়িয়ে নিয়ে বলি, চল।

কোর্ট লক-আপে অনেকের সঙ্গে ছিল খুদি। আমাকে দেখে মুখ নামিয়ে নেয়।

এখন ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আগে তো জামিনটার জন্য চেষ্টা করা যাক।

কিন্তু শেষ অবধি জামিন হল না। পুলিশ ওকে এক হপ্তার জন্য লক-আপে নিল। সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। খুনের কেসের আসামী প্রথম তারিখেই জামিন পায় না।

পুলিশ ফাইল শেষ হলে পর আমি সাব-ইনস্পেক্টর বর্ধনের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলি।

মিস্টার বর্ধন শুনে আকাশ থেকে পড়েন। দু-চোখ আকাশের পানে তুলে বলেন, সেই বিখ্যাত পুঁটিয়া-বুড়ির থানটি যে আপনাদের গাঁয়ে সেটা তো জানা ছিল না মিস্টার দত্ত। আমি তো কদ্দিন ধরে ভাবছিলাম, একটিবার যাব বুড়ির থানে। কতজনার মুখে কত কথাই শুনে আসছিলাম। একেবারে অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার ঘটাত নাকি? জানেন আপনি? ওর ছেলেটা তো বললেন আপনার ক্লাসফ্রেন্ড! মাই গড! আগে জানলে তো উইক এন্ডে আপনার সঙ্গেই চলে যাওয়া যেত। একটু স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পাওয়া যেত।

বর্ধনকে শুধোই, আপনারা শিয়োর, খুদিই মেরেছে?

ইতিমধ্যে উকিল হিসেবে কিঞ্চিৎ নাম করে ফেলেছি, পুলিশ মহল কিঞ্চিৎ খ্যাতির করে আমাকে। বর্ধনও আমাকে ভালোই চেনে।

আমার প্রশ্নের জবাবে বর্ধন বলে, না, না, শিয়োর হব কী করে? খুদি তো বলছে, বুড়ি নাকি একরাতে ওকে স্বপ্নে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েই সেই রাতে ভেগেছে। কিন্তু বুড়ির মেয়ে বলছে অন্য কথা। দেখা যাক, খোঁজাখুঁজিও চালাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, খুদি তো বললেন আপনার ক্লাসফ্রেন্ড, ব্যাটার স্বভাব-চরিত্র কেমন?

একটুখানি আমতা আমতা করে বলি, খুবই ধূর্ত স্বভাবের লোক, তবে খুন করবার মতো ক্রিমিন্যাল এলিমেন্ট দেখিনি ওর মধ্যে। তাছাড়া...।

সাব-ইনস্পেক্টর বর্ধন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বলি, তাছাড়া, বুড়ি তো খুদির কাছে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের তুল্য।

—মানে?

—মানে, বুড়ির তো ইদানীং আয়-উপায় খুবই হচ্ছিল। খুদিই তো তার চোদ্দআনা হাতিয়ে নিচ্ছিল। ওকে তো বলতে গেলে কাজকর্ম কিছুই করতে হত না ইদানীং।

—শুনেছি। সাব-ইনস্পেক্টর বর্ধন হাসে, খুব রমরমিয়ে চলছিল বুড়ির কাজ-কারবার।

—তবে? সোনার ডিম পাড়তে থাকা হাঁসটাকে বেমক্কা মেরে ফেলে কেউ? সেই কারণেই বলছিলাম, কোথাও ভুলটুল হচ্ছে না তো আপনাদের? আমার তো মনে হয়, প্রবল লোকলজ্জা আর লাঞ্ছনার ভয়ে বুড়ি দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়েছে।

—লোকলজ্জা? কেন?

—আমাদের দেশে তো কুষ্ঠরোগীদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না। বুড়ি তো রোগটার একেবারে অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে গিয়েছিল।

সাবইন্সপেক্টর বর্ধন শুনে আকাশ থেকে পড়েন, এটা তো আমাদের জানা ছিল না মশাই। ব্যাটা খুদি তো এত জেরাতেও কথাটা বলেনি আমাদের। আপনি বলছেন লেপ্রোসির একেবারে অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে গিয়েছিল বুড়ি?

—অ্যাডভান্সড স্টেজ মানে? ভেতরে ভেতরে গা-হাতের মাংস খসতে শুরু করেছিল। সেই কারণে তো ইদানীং মন্দিরের বাইরে বেরোত না তিলেকের তরে। রোজ বাইরের উঠোনে এসে বসে থাকত অর্থীপ্রার্থীর দল। খুদিই ওদের সামলাত। মায়ের হাল-হকিকৎ শুধোলে খুদি সবাইকে জাঁক করে বলত, মা নাকি সমাধিতে বসেছে। কারোর সঙ্গে দেখা করবে না। শেষের দিকে খুদি তো মায়ের একেবারে পুরোপুরি গার্জেন সেজে বসেছিল। মায়ের নামডাক যতই বাড়ছিল, ততই তার আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছিল। আগন্তুক লোকজনের সমস্যাগুলো নিয়ে সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকত। মায়ের সঙ্গে আলোচনা সেরে বাইরে এসে হরেক কিসিমের নিদান দিত উপস্থিত মানুষজনকে। প্রতিবারেই মন্দিরের ভেতর থেকে একটি করে মাদুলি নিয়ে বেরিয়ে আসত। বলত, মা এই মাদুলিটা দিলেন। শনি কিংবা মঙ্গলবারের ভোরে গা ধুয়ে পরে নিও।

ততদিনে খুদির মায়ের হাত-পায়ের মাংস একটু একটু করে খসতে শুরু করেছে। মেদিনীপুরের ডাক্তারের ওষুধে-মলমে বড়ো একটা কাজ হচ্ছিল না। দেখেশুনে প্রমাদ গুনছিল খুদি। ওর ভয় ছিল, পাছে রোগের কথাটা ফাঁস হয়ে গিয়ে মাদুলি-কবচের অমন রমরমা ব্যবসাটা লাটে ওঠে। আমরা খুদির মাকে যখন লেপ্রোসি সেন্টারে নিয়ে যাই, ডাক্তাররা ওকে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওই রমরমা ব্যবসাটা চৌপট হয়ে যাবে, এমন আশংকায় খুদি রাজি হয়নি কিছুতেই। তবে ও আমাকে কথা দিয়েছিল, মাসে মাসে মাকে এনে দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু দিনদিন খুদির মায়ের এমনই হাল হল, তখন আর খুদির পক্ষে মাকে গোপনে কোথাও নিয়ে যাবার উপায় ছিল না। কেন কী, বাসে উঠলেই ধরা পড়ে যেত ও। আর, একটিবার কথাটা চাউর হয়ে গেলে এমন চালু কাজটা তো মুখ থুবড়ে পড়তই, তার ওপর খুদির পুরো পরিবারের ওপর নেমে আসত এলাকার মানুষের হরেক কিসিমের নির্যাতন। পুরো

পরিবারটা একেবারে একঘরে হয়ে যেত। কাজেই, আমার তো মনে হয়, সাপও যাতে মরে, লাঠিটাও যাতে না ভাঙে, অনেক ভেবেচিন্তে বুড়ি তাই ওই মোক্ষম পথটাই বেছে নিয়ে থাকবে। এতদঞ্চলে এই জাতের রোগীদের অনেকেই এটা করে থাকে। একদিকে প্রবল লোকলজ্জার ভয়, আপামর মানুষের ঘৃণা, তার ওপর রোগীর পরিবারকে একঘরে করে দিয়ে ওদের ওপর সমাজের লাগাতার জুলুম। এসবের থেকেই রেহাই পেতে অনেক কুষ্ঠরোগীকেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে দেখা গেছে। তারা সাধারণত অনেক দূরে কোনও ধর্মস্থানে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে ভিক্ষে করে যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে। এইভাবে তারা নিজেরা বাঁচে, পরিবারের অন্যদেরও প্রবল নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচায়। এক্ষেত্রেও তেমনটা হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এটা বোধ হয় ঠিক যে, বুড়ি আচমকা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে সবচেয়ে বেশি লোকসান হয়েছে খুদিরই। বুড়ি থাকাকালীন যত লোক আসত, কবচ-মাদুলি বিলিয়ে যত আয় হত, তার সিংহভাগ তো খুদিই ভোগ করত। বুড়ির আর কীই-বা খরচ ছিল। তার ওপর সে তো ছিল ওই সর্বনাশা রোগের শিকার। তখন তার যা মানসিক অবস্থা, আয়-উপায়ের টাকাপয়সা গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখা এবং ভোগ করা, দুই-ই তার পক্ষে ছিল বিড়ম্বনা। পরিস্থিতির সুযোগটা পুরোপুরি নিচ্ছিল খুদিই। বুড়ির অবর্তমানে খুদির মাদুলি-কবচের ব্যবসাটা তো অনেকটাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেন কি, প্রায় স্বয়ংসিদ্ধা গোছের একজন স্বহস্তে মাদুলি-কবচ দিচ্ছেন, আর তার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়া একজন দিচ্ছে, দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কাজেই, বুড়ি আচমকা চলে যাওয়াতে সবচেয়ে হাত কামড়াচ্ছে বোধ করি খুদিই। তার সোনার ডিম পাড়া হাঁসটি উড়ে পালাল। সেই কারণেই, আমার তো মনে হয়, মাকে খুন করা খুদির পক্ষে লজিক্যালি খুব অ্যাবসার্ড। একটা মিনিমাম মোটিভ না থাকলে কেউ এত বড় একটা ক্রাইম করে না। কেন কি, পাগলেও নিজের স্বার্থ বোঝে। আর, খুদি তো পাগল নয় যে ইচ্ছে করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবে।

মি. বর্ধন খুব মন দিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। একসময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন তিনি। বলেন, একটা ফুল কোর্স সওয়াল করে ফেললেন যে।

—না, না, ঠাট্টা নয়, আপনার কি মনে হচ্ছে না, আমার এই আরগুমেন্টের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে?

যতই ঠাট্টা করুন, ওঁর মুখ দেখে মনে হলো, আমার যুক্তিতে একটুখানি কাবু হয়ে পড়েছেন সাব-ইনস্পেক্টর বর্ধন।

বলেন, দেখা যাক, ইনভেস্টিগেশন তো চলছে।

পরের হপ্তায় আমি গেলাম থানায়। মি. বর্ধন ডিউটিতে ছিলেন।

বলি, একটিবার খুদির সঙ্গে কথা বলতে পারি একা-একা?

মি. বর্ধন মুচকি হাসেন, কথা বলার অজুহাতে মক্কেলকে টিপস দেবেন তো?

হেসে বলি, তা দিতেই পারি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ওকে গুটিকয় প্রশ্ন শুধোব আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, খুদি ওর মাকে খুন করেছে, এটা আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি নে।

মি. বর্ধন বলেন, বেশ তো। কথা বলুন। কোনও স্কুপ জানতে পারলে আমাদেরও জানাবেন।

ছোটবাবুর ঘরটা ফাঁকা ছিল। মি. বর্ধন ওই ঘরেই আমাকে বসতে দিলেন।

একটু বাদেই পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল খুদি।

ওকে পাশটিতে বসিয়ে একান্তে বলি, ডাক্তারের কাছে রোগ লুকোলে কিন্তু রোগী সুস্থ হবে না কোনওদিনই। কাজেই, বুঝতে পারতিছু, আমার কাছে লুকোলে কিন্তু কেস অন্যদিকে ঘুরে যাবে। আমি আসল ঘটনার হদিশ না পেলে কেস সাজাব কী করে?

খুদি আমার মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই নামিয়ে নেয় দৃষ্টি। মৃদু গলায় বলে, কী জানতে চাউ, বল্।

সরাসরি ওর চোখে চোখ রেখে শুধোই, পুঁটিপিসি কুথা? সে কি বাস্তবিক চলিয়া গেছে, নাকি সত্যি

সত্যি তুই তাকে...।

সে কথার জবাব দেয় না খুদি। চুপ করে বসে থাকে পাথরের মতো।

একসময় হু-হু করে কাঁদতে থাকে।

বলি, কাঁদিয়া কোনও ফল হবেনি। বিচারে যদি তোর ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন হয় তো জেলে বসিয়া কাঁদবার টাইম অনেক পাবি। কিছু বলার থাকলে এইবেলা বল্।

একসময় একটু একটু করে মুখ খোলে খুদি। ব্যাখ্যা করে বলতে থাকে পুরো বৃত্তান্তটা।

চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে বলে, তুই আমাকে বিশ্বাস কর্ ভাই। আমি শুদুমুদু বুড়িকে খুন কত্তে যাব ক্যানে, বল্? বুড়িকে খুন করিয়া আমার লাভ না ক্ষতি? তুই আমাকে একটিবার জামিন করিয়া দে, আমি ওই পুরী, নাকি হরি দ্বার যেখানে-যেখানে যাইতে কইবি, সব জায়গায় গিয়া বুড়িকে খুঁজবো। বুড়িকে একটিবার খুঁজিয়া পাইলে তো সবার সন্দেহ ঘুচবে।

খুদির কথাগুলো খুবই যুক্তিসংগত বলে মনে হল আমার। ও যা বলল, এবং যেভাবে বলল, শুনে আমার মনে আগের বিশ্বাসটাই আরও দৃঢ় হয়। আর যা হোক, বুড়িকে ও খুন করেনি। যে হাঁসটি নিয়মিত সোনার ডিম পাড়ছিল, তাকে মেরে ফেলা তো এক কিসিমের মূর্খামো। খুদি কেনই বা তা করতে যাবে?

খুদির কথাগুলো আমি অনুপুঙ্খ বলি সাবইন্সপেক্টর বর্ধনকে।

শুনতে শুনতে যেন আরও বেশি ভাবনায় পড়ে যান মিস্টার বর্ধন।



সেদিনটা ছিল রোববার। সে রোববারে আমি সন্ধিপুরে যাইনি। মেদিনীপুরের বাড়িতেই ছিলাম।

সাতসকালে বর্ধনের ফোন। বলেন, আজ তো কোর্ট ছুটি, দেশের বাড়িতে যাবেন না?

বলি, গেল হপ্তায় গেছলাম। এ হপ্তায় আর বেরোবার ইচ্ছা নেই। সারা হপ্তা যা ধকল যায়। একটু রেস্ট না নিলে...।

বর্ধন বলেন, গেলে ভালো করতেন। একটা বিরল অভিজ্ঞতা হত। এমন অভিজ্ঞতা সচরাচর হয় না।

বলি, কী ব্যাপার বলুন তো? খুদির ব্যাপারেই কি কিছু...?

—আরে মশাই, সেই জন্যই তো এত তোয়াজ করছি। আপনি তো আবার ওর উকিল।

খুব উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোই, খুদির কী হয়েছে?

ফোনের অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকেন বর্ধন। একসময় বলেন, ফোনে কি অত কথা বলা যায়, মশাই?

মি. বর্ধনের কথা বলবার ধরনে আমি খুব বিচলিত বোধ করি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিই, সন্ধিপুরে যাব।

জয়াকে বলি, যাবে নাকি?

কিছুদিন যাবত জয়া সন্ধিপুরে যাবে-যাবে করছিল। আজ আচমকা আমার থেকে প্রস্তাবটা পেয়ে কেমন সন্দেহের চোখে তাকায়। বলে, কী ব্যাপার? আজ বড় নিজের থেকে বলছ! আমি থাকলে তোমার কাজের অসুবিধে হবে না?

—আরে না, না। আজ তো মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলবার দিন নয়।

জয়ার সংশয় তাও ঘোচে না। বলে, ফোনে যা শুনলাম, তোমার ওই হাজতে থাকা বন্ধুর ব্যাপারেই তো কোনও খবর পেলে। তাই যদি হয় তো, ওই নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তুমি।

বলি, তেমন কিছু নয়। তুমি সঙ্গে থাকলে কোনও অসুবিধে হবে না।

জয়া রাজি হয়। আমরা দু-জনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেশিয়াড়ির বাসে চড়ে বসি।

প্রায় দুপুর নাগাদ গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে খবরটা চলে আসে কানে। খুদির মায়ের হদিশ মিলেছে। পুলিশ ওর পুরো ভিটেটাই ঘিরে রেখেছে।

এমন খবর বাস্তবিক আমার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। কেন কি, যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল খুদির মা, যেভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল খুদির পুরো পরিবারটাকে, আচমকা ফিরে এসে তার সবটাই মাটি করে দেবে সে? মা হয়ে ছেলের অতটা ক্ষতি করবে?

উকিলের গৃহিণী হওয়ার সুবাদে ইদানীং জয়াও বেশ যুক্তি খাড়া করে সওয়াল করতে পারে। আমার কথা শুনে বলে, এমনও তো হতে পারে, ছেলে খুনের কেসে ফেঁসেছে, এই খবরটা হয়ত বুড়িও পেয়ে গিয়েছে। আর, তাতে করে ওর মনে হয়েছে, সশরীরে হাজির না হলে খুদিকে বাঁচানো যাবে না।

আমি দু-চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকি জয়ার মুখের দিকে। ব্যাপারটা এদিক থেকে ভাবিনি আমি! এমনটা হওয়া তো খুবই সম্ভব।

জয়ার দিকে তাকিয়ে, খুব গাঢ়স্বরে বলি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।

খুদির মায়ের ভিটের কাছাকাছি পৌঁছে আমার চোখ কপালে উঠে যাবার জোগাড়। চারপাশে গিজগিজ করছে মানুষ। পুলিশে পুলিশ ছয়লাপ। থমথম করছে পুরো পরিবেশ।

ভিড় ঠেলে ঠেলে মাঝ-উঠোনে পৌঁছনো মাত্তর আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলাম, কুঠরির বাইরে মাঝ-উঠোনে মেঝের ওপর শোয়ানো হয়েছে একটি গলা পচা কঙ্কাল।

কঙ্কালটাকে দেখতে দেখতে বারবার শিউরে উঠি আমি। সারা শরীর নিঃশব্দে ভিজে যায় ঘামে। গলা শুকিয়ে আসে। মি. বর্ধনের দিকে তাকিয়ে কোনওগতিকে উচ্চারণ করি, এটা কার কঙ্কাল?

তার জবাবে বর্ধন আলগোছে হাসেন। বলেন, সেটাও আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে? খুদির মায়ের পচে যাওয়া লাশ মশাই।

প্রবল বিস্ময়ে, আশঙ্কায়, উত্তেজিত গলায় বলি, এ লাশ কোথায় পেলেন?

তার জবাবে বর্ধন ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন মন্দিরের ভেতরটা। বলেন, যান না, গিয়ে দেখুন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। একসময় বাইরে থেকে উঁকি মারি কুঠরির ভেতরে। দেখি, মেঝেতে বিশাল গর্ত।

পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বোধগম্য হতে থাকে আমার। মি. বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বলি, কেমন করে খোঁজ পেলেন?

বর্ধন বলেন, আমরা নয় মশাই, খুঁজে বের করেছে বুড়ির ওই পোষা কালো কুকুরটাই। পচা লাশের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কুকুরটা কুঠরির মধ্যেকার জলনিকাশি ফুটোটাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে বড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেই ব্যাটাই মেঝে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত বানিয়ে লাশটাকে বেশ খানিকটা টেনে আনে গর্ত থেকে। তাতে করে লাশের গন্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায়। উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়াপড়শিরাই মন্দিরে ঢুকে প্রত্যক্ষ করে কুকুরের কাণ্ডকারখানা। তারাই খবর দেয় থানায়।

আমার তখন বাকরুদ্ধ অবস্থা।

অল্প তফাতে জনাকয়েক সেপাইয়ের বেষ্টনীর মধ্যে বসে রয়েছে খুদি। কোমরে দড়ি বাঁধা। আমি দূর থেকে ওর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলি।

আমার সঙ্গে কিছুতেই চোখাচোখি করতে চায় না খুদি। সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি নামিয়ে নেয়।

খুদিকে দেখতে দেখতে আমি মনের মধ্যে ঘটনাটাকে সাজিয়ে ফেলতে পারি।

বুড়ির শরীর জুড়ে কুষ্ঠ রোগের বীজ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখে খুদি ভাবতে শুরু করেছিল, কী করে এ-কুল, ও-কুল দু-কুলই বজায় রাখা যায়। কী করে সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙে। ও বুঝতে পেরেছিল, বুড়ির হাল দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এইভাবে চললে, আর কিছুদিনের মধ্যেই হাত-পায়ের সব মাংস খসে খসে পড়বে। তার চেয়ে বড় ভয়, কথাটাকে বেশিদিন গোপনে রাখা যাবে না। অথচ এ এমন এক সর্বনাশা রোগ, চাউর হলেই এমন জমজমাট ব্যবসাটা লাটে উঠবে। ভাবতে ভাবতে মোক্ষম উপায়টাই বেছে নিয়েছে খুদি। বুড়িকে ওই রাতেই গলা টিপে শেষ করে দেয়। তারপর সারা

রাত ধরে মন্দিরের মেঝেয় গর্ত খোঁড়ে। সেই গর্তের মধ্যে মাকে শুইয়ে মাটি চাপা দেয় এবং মেঝেটাকে লেপেপুছে আগের মতো করে দেয়। তারপর রাতের অন্ধকারেই ফিরে যায় তার নিজের পাড়াতে। সকালবেলাতেই স্বপ্নের কথাটা খুব প্ল্যানফুলি চাউর করে দেয়। আর পাবলিকও তেমন। ইনস্ট্যান্ট খেয়ে নিল ব্যাপারটা। ফলে, সাপটি গেল মরে, লাঠিটি রইল অটুট। খুদি যথারীতি মায়ের আসনটিতে গ্যাঁট হয়ে বসে চোখ মুদে ধ্যান করতে শুরু করল। ধ্যান ভাঙলে পর আগন্তুকদের মধ্যে কবচ-মাদুলি বিলির পালা। অর্থী-প্রার্থীরা ওকে ইতিমধ্যেই খুদিয়াবাবা বলে ডাকতে শুরু করেছিল। আমার ধারণা, এমন নামকরণের পিছনেও খুদির একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল। হয়ত বা কিছুদিনের মধ্যেই পুঁটিয়া-কালীর থান-এর বদলে জায়গাটার নাম হয়ে যেত খুদিয়াবাবার থান। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা রমরমিয়ে চলছিল। একপ্রস্থ নতুন জোয়ার এসেছিল ব্যবসাতে।

আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন মি. বর্ধন।

বলি, আপনারা কি খুদিকে জেরা-টেরা করেছেন নাকি?

—আমি তো ছিলাম না। এইমাত্র এলাম। বড়বাবু জেরা করেছেন। খুদিটার মগজে বুদ্ধি আছে বলতে হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা এমন চমৎকার প্ল্যান, একেবারে পাকা ক্রিমিন্যাল ছাড়া, কারোর পক্ষে কঠিন। খুদি অনেক বড় দরের খেলোয়াড়।

ততক্ষণে হতভম্ব ভাবটা খানিক কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। বলি, আমি কি খুদির সঙ্গে একা-একা একটুখানি কথা বলতে পারি?

বর্ধন খুব সন্দেহের চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর চোখে মুখে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বললেন, কিছু লিগ্যাল টিপ্‌স দিয়ে রাখতে চাইছেন তো, যাতে কেসটা ঠিকঠাক ডিফেন্ড করতে পারেন?

বলি, বিশ্বাস করুন, কেস নিয়ে একটা কথাও বলব না ওর সঙ্গে। আসলে ও-তো আমার এককালের সহপাঠী। জাস্ট এককালের বন্ধু হিসেবে কয়েকটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে ওর কাছে।

—দূর মশাই, ঠাট্টা করছিলুম। যান না কাছে, কথা বলুন না।

বর্ধনের নির্দেশে খুদির কোমরের দড়ির অপরপ্রান্ত পাশের গাছটার গায়ে বেঁধে দিয়ে সেপাইগুলো সরে যায় তফাতে।

এতক্ষণে আমি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই খুদির দিকে।

মেঝের ওপর মুখ নামিয়ে পাথরের মতো বসে ছিল খুদি।

আমি চাপা গলায় বলি, খুদি, মুখ তোল্।

আমার কথায় খুদি ধীরে ধীরে মুখ তোলে। সরাসরি চোখ রাখতে পারে না আমার চোখে। দেখি, তার চোখদুটি জলে টলোমলো করছে।

বলি, তুই এককালে আমার সহপাঠী ছিলি, এটা ভাবতেও আমার লজ্জা করছে। সামান্য কিছু মাদুলি-কবচ বিক্রির টাকার লালসায় নিজের অসুস্থ মাকে খুন করলি তুই! তোর হাতটা একটুও কাঁপল না? তুই মানুষ না কী রে?

আমার তিরস্কারে খুদির চোখের টলোমলো অশ্রুর ফোঁটাগুলি আরও ভরাট হয়ে ওঠে। এতক্ষণে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সে।

খুব ধীরগলায় বলে, তুমাকে একবার মিছা কথা বলেছি আমি। আর কি আমার কথা বিশ্বাস করবে তুমি?

আমি নির্বাক তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। অপেক্ষা করতে থাকি।

খুদি আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, অন্তত আমার একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি। আমি মাকে টাকার লোভে মারিনি। ওষোধপাতি কিংবা কবচ-তাবিচের বেব্‌সাটা চৌপট হয়্যাবে, তাতে আমার লোকসান হবে, এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি আমি।

—তবে? আমি খুদির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি।

একটুখানি দম নেয় খুদি। নিজেকেও বুঝি মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয়। তারপর ধীরগলায় বলতে থাকে,

দ্যাখ, মাঝি জাতে জনম অর। তা সত্ত্বেও প্রায় দেবীর মতন পূজা পাচ্ছিল তল্লাটের সব লোকের পাশ। এ তল্লাটে বামুন ঘরের কুনো মেয়া আজ অবধি যে সন্‌মান পায়নি, উ মাঝি-মেয়া হইয়াও তার শতগুণ বেশি পেয়েছে। কত উঁচা জাতের কত মাইন্য-গইন্য মানুষ অর পায়ের তলায় লুটিয়া পড়ত। অর আয়-উপায়ে আমার সন্‌সার চলত এটা ঠিক, কিন্তু তার চাইতেও যেটা আমার পাশ শতগুণ বেশি ছিল, তা হইল, অর এই সন্‌মান। আমি চারপাশে বুক ফুলিয়া ঘুরতাম, কিনা, আমি পুঁটিয়া-বুড়ির ছেইলা। এক পুড়ামুয়া রোগ আইসিয়া সবকিছো তছনছ করিয়া দিল। একটিবার ভাব দেখি, বুড়ির রোগটা লিয়া যেদি একটিবার পাঁচকান হইতো, এই গদগদ মানুষগুলানই তখন অদের দেবীর গায়ে থুতু দিত। বুড়ির সেটা কেমন লাগত, তার চাইতে বড় কথা, সেই দিশ্য দেখবার আগে আমি লিজের গলায় ফাঁস লাগাতাম।

অনেকক্ষণ কথা বলে একটুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল খুদি। অল্প অল্প হাঁফাচ্ছিল। একসময় আবার বলতে থাকে সে।

—তাবাদে, বেশি দিন তো বাঁচতনি বুড়ি। পাছে পাঁচ কান হয়, সেই ভয়ে ভালো করিয়া চিকিচ্ছা করাবারও তো উপায় ছিলনি। শেষের দিকে বুড়ির যা হাল হইছ্‌ল, তুমি তো দেখনি, হাত-পা দিয়া অষ্টপহর রস চুয়াইতো। হাত-পায়ের আঙুলের মাংস খসিয়া খসিয়া পড়ছিল। এই অবস্থায় বুড়িকে শেষ করিয়া না দিলে, বুড়ি দুনিয়ার সামনে কতখানি হীন হইয়া মরতো বল দেখি? মাঝি জাতের অতখানি নামও ধুলায় মিশিয়া যাইত। কেবলমাত্র তাকে চরম লতি-লাঞ্ছনার থিকে বাঁচানোর তরে এবং জাতের সন্‌মানটুকু রইক্ষা করবার তরেই আমি এ পথ বাছিয়া লিছি, ভাই।

ততক্ষণে খুদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লেগেছে। বলে, বিচারে আমার ফাঁসি হবে, জানি। তুমাকে আমার হয়্যা লড়বার তরেও আমি কইবোনি। শুধু তুমি আমার এই কথা ক-টি বিশ্বাস না করলে ফাঁসিতে ঝুলিয়াও আমার শান্তি হবেনি।

খুদি আমার মুখের দিকে করুণাভিক্ষার মতো করে তাকায়, আর একটা কথা। বুড়ির ঠিক কী রোগ হইছ্‌লো গাঁয়ের মানুষ এখনও অবধি জানেনি। কেবল তুমি আর কল্পনাথই জানো তা। আমার শেষ অনুরোধ, সেটা যদি পাঁচ কান না কর তো বড়ই ভালো হয়। দ্যাখ, দেবীর মতন পূজা পাইতে পাইতে মরেছে বুড়ি। মরবার পরও সে যেন দেবীর মতন বাঁচিয়া রয়, সেই কারণেই সমস্ত মাঝি জাতের হয়্যা এটা তুমার পাশ ভিখ মাগতিছি আমি। কল্পনাথ হয়তো-বা আমার মনের বেদনাটা ঠিকঠাক বুঝবেনি। কিন্তু তুমি তো লিচু জাতের ছা। সন্‌মান আর অপমানের মধ্যেকার ফারাকটা তুমার ভালোই জানা আছে। তাবাদে, তুমার মা-ও অপয়া বদলাম লিয়া আজীবনকাল মাইন্‌সের লতি-লাঞ্ছনা সইয়া সইয়া মরেছে। একটিবার মনে ভাবো দেখি, যখন তুমার সেই ছা-বেলায় তুমার মাকে দুনিয়ার মানুষ পদে পদে অপয়া বদলাম দিয়া হেটা করত, অর মুখ দেখিয়া বাড়ির বাইবে পা বাড়াতনি কোউ, কুনো শুভ কাজে হাতই দিতনি, তাই দেখতে দেখতে তুমার মনের বেদনাটা আর কোউ না বুঝুক, আমি বুঝেছি সেই ছা-বেলা থিকে।

বলতে বলতে একসময় কান্নায় ভেঙে পড়ে খুদি।

খুদির কান্নাভেজা কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি ধীরে ধীরে পেছোতে থাকি।

একসময় পৌঁছে যাই আমার শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোতে, যেখানে নিত্যিদিন আমার মা অপয়া বদনাম নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, পাড়পড়শির লাথিঝাঁটা খেতে খেতে বেঁচে রয়েছেন। এমন কি, আমি যখন সপ্তাহান্তে স্কুল-হোস্টেলের উদ্দেশে রওনা দিতাম, তখন বাড়ির সবাই আমাকে প্রকাশ্যে বিদায় জানালেও জেঠুর নির্দেশে মাকে লুকিয়ে থাকতে হত আড়ালে। আমি যখন সবাইকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতে যেতাম, মা সারাটা সময় দু-চোখে কাপড়চাপা দিয়ে রাখতেন, যাতে করে রওনা দেবার মুহূর্তে আমাকে দেখে না ফেলেন।

মনে পড়ে, মা একদিন রাতের বেলায় বিছানায় আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুধিয়েছিলেন, হ্যাঁরে, খোকা, আমি যদি আচমকা মরিয়া যাই, তোর খুব কষ্ট হবে?

আমি অবাক হয়ে মায়ের অন্ধকারে ঢেকে থাকা মুখখানাকে দেখবার চেষ্টা করতে করতে বলেছিলাম

না, তুমি মরবেনি।

—ধর্, যদি মরিয়া যাই?

আমি ততোধিক জোরগলায় বলেছিলাম, না, তুমি মরবেনি।

—ঠিক আছে, কিন্তু তাও ধর্ মরিয়া গেলাম...।

আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি, বললাম না, তুমি মরবেনি।

অকস্মাৎ মা চুপ মেরে যান, আমাকে বুকের মধ্যে আরও শক্ত করে চেপে রাখেন। একসময় ঘন বরফের মতো শীতল গলায় বলেন, দিনদিন মাইন্সের এত অপমান লিয়া বাঁচা যায় না। এমন বাঁচার চাইতে মরিয়া যাবা ঢের ভালো রে খোকা।

কত বছর বাদে মায়ের সেই বাক্যদুটি আবার কানের কাছে কাঁসরঘণ্টার মতো বাজতে শুরু করে। বাজতে বাজতে আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সবার অলক্ষ্যে নিজের কান দুটোকে দু-হাত দিয়ে চেপে ধরি।

অন্যের ঘৃণা, অপমান নিয়ে বেঁচে থাকবার যন্ত্রণাটাকে আমি নিদারুণভাবে চিনি। কাজেই, বিচারে খুদির কী সাজা হবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু উপস্থিত মাতৃহন্তা খুদির মনের ভেতরটাকে নির্ভুল পড়ে নিতে আমার তিলমাত্র কষ্ট হয় না। এবং একসময় খুদির প্রতি গাঢ় সহমর্মিতায় ভিজে যায় মন।

গাঁ ছাড়ার আগে কোমরে দড়ির পরেও খুদির দু-হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয় পুলিশ। শত মানুষের বেষ্টনী ভেদ করে জিপের দিকে খুব দৃপ্তপায়ে এগিয়ে চলে খুদি।

আমি পেছনে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। ঠায় দাঁড়িয়ে খুদিকে পেছন থেকে নির্নিমেষ দেখতে থাকি।

দেখতে দেখতে একসময় ওকে বিপ্লবীর মতো লাগে। খুব দৃঢ়ভাবে মনে হয়, খুন নয়, চিরকাল অপমান সয়ে আসা ব্রাত্য সমাজের একজন মানুষ বহুকাল বাদে পাওয়া একচিলতে সম্মান আর গৌরবকে টিকিয়ে রাখবার জন্য নিজের মাকে কোরবানি দিয়েছে সম্প্রদায়ের স্বার্থে।

চারপাশের শত মানুষের নীরব ধিক্কার নিয়ে জিপের দিকে নির্বিকার হেঁটে চলেছে খুদি।

একসময় আমি পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠি, ভাবিস নেখুদি, কাল আদালতে তোর হয়ে লড়বার জন্য হাজির থাকব আমি।
